পরিচয়
বর্ষ ৪৩ । সংখ্যা ২-৩
শারদীয় ১৩৮০

সূচিপত্র

স্মৃতিকথা

প্রবন্ধ

গল্প

কবিতাগুচ্ছ ১

বিষ্ণু দে। বিমলচন্দ্র ঘোষ। অন্নদাশঙ্কর রায়। অরুণ মিত্র। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। চিত্ত ঘোষ। রাম বসু। কৃষ্ণ ধর। লোকনাথ ভট্টাচার্য। সিদ্ধেশ্বর সেন। ধনঞ্জয় দাশ। শঙ্খ ঘোষ। অমিতাভ দাশগুপ্ত। শক্তি চট্টোপাধ্যায়। শংকর চট্টোপাধ্যায়। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। শিবশম্ভু পাল। রত্নেশ্বর হাজরা। ২০৬-২২৪

কবিতাগুচ্ছ ২

মণীন্দ্র রায়। দক্ষিণারঞ্জন বসু। তরুণ সান্যাল। বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত। মণিভূষণ ভট্টাচার্য। মৃণাল বসু চৌধুরী। গণেশ বসু। পবিত্র মুখোপাধ্যায়। সত্য গুহ। তুলসী মুখোপাধ্যায়। সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। গৌরাঙ্গ ভৌমিক। অনন্ত দাশ। দীপেন রায়। তরুণ সেন। নবীন সুর। শিশির সামন্ত। অরুণাভ দাশগুপ্ত। শুভ বসু। অমিয় ধর। দুলাল ঘোষ। অজিত পাণ্ডে। বিপ্লব মাজী। ২৯০-৩১৮

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। হিরণকুমার সান্যাল। সুশোভন সরকার
অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে। চিন্মোহন সেহানবীশ
সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস।

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

প্রচ্ছদ : নিতাই ঘোষ

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৪৩। সংখ্যা ২-৩
শারদীয় ১৩৮০

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ত্রিশের দশকের এক অধ্যায়

ধরণী গোস্বামী

ভারতের জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন থেকেই ভারতের শ্রমিকশ্রেণীও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। ১৯০৫ সাল থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সহযোগী শক্তিরূপে মূল্যবান অবদান রেখেছে এ-দেশের শ্রমিকশ্রেণী। ঐ সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বাঙলায় যখন তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তখন ভারত সরকার-নিয়ন্ত্রিত ছাপাখানাগুলিতেও ব্যাপক ধর্মঘট হয়। ১৯০৭ সালে ই. আই. রেলের একাংশেও ধর্মঘট হয়। ১৯২০-২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় আসামের চা-শ্রমিক ও এ. বি. রেলের সাধারণ ও ব্যাপক ধর্মঘটের কথা সর্বজনবিদিত। ১৯২৮ থেকে ১৯৩০ সালের সময়সীমার মধ্যে ভারত এক জটিল অর্থনৈতিক সঙ্কটের আবর্তের মধ্যে অবস্থান করছিল। ১৯২৯ সালের গুরুতর আন্তর্জাতিক অর্থসঙ্কট ভারতের উপরেও তার প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। এই অর্থসঙ্কট ভারতের জনজীবনকে নির্মমভাবে আঘাত করেছিল। ঐ সময়ে জনগণের উপর শোষণ ও নির্যাতনের তীব্রতা চরম পর্যায়ে উঠেছিল এবং জনগণের জীবন-জীবিকা ও নিরাপত্তার সমস্যা জটিল হয়ে পড়েছিল। শাসকগোষ্ঠী এই সঙ্কট ও সমস্যার সকল দায়-দায়িত্ব শ্রমিকশ্রেণীর উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে। নিরুপায় শ্রমিকশ্রেণী আত্মরক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং পুঁজিবাদের অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে জঙ্গী আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। সারা ভারত জুড়ে বৃহৎ বৃহৎ শিল্পগুলিতে—রেলওয়ে, চটকল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও অর্ডন্যান্স কারখানা প্রভৃতিতে এবং সামগ্রিক ও মৌল উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যাপক ধর্মঘটের স্রোত বয়ে

যায়। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী তথা ভারতে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ পুঁজিবাদীশ্রেণীর কায়েমী আর্থনীতিক স্বার্থের বনিয়াদ ভাঙ্গনের মুখে এসে পড়ে। সমস্বার্থী দেশী পুঁজিবাদীশ্রেণী এই আঘাতের প্রতিক্রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য একই পন্থা খুঁজে নেয়। উল্লেখ্য যে, চটকলের ৬৫% অংশেরও বেশি ইতি-পূর্বেই জাতীয় পুঁজিপতিদের মালিকানায় এসে গিয়েছিল। দেশী-বিদেশী পুঁজিবাদীগোষ্ঠী শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য একযোগে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে এক সারিতে দাঁড়ায় এবং শাসকগোষ্ঠীর সহযোগিতায় শ্রমিকশ্রেণীর উপরে যুগপৎ আক্রমণ পরিচালনার ফন্দী আঁটে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের উপরে তার একচ্ছত্র প্রভুত্ব সমূহ বিপদের সম্মুখীন হয়েছে দেখে বিচলিত হয়ে পড়ে এবং বড় বড় জাতীয় পুঁজিবাদীগোষ্ঠীকে সহযোগীরূপে গাঁটছড়ায় বেঁধে শ্রমিকশ্রেণীর উপরে একযোগে আক্রমণের ভূমিকা গ্রহণ করে। তৎকালীন বিদেশী পুঁজিবাদী সংবাদপত্র—Statesman, Englishman, Pioneer, Times of India ইত্যাদি বুর্জোয়াশ্রেণীর মুখপত্রগুলি এক সুরে জনমানসে শ্রমিকশ্রেণী ও কামউনিস্ট আন্দোলন-বিরোধী মনোভাব উস্‌কে দিতে উদ্যোগী হয়েছিল। ভারতে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের ব্রিটিশ মালিকগোষ্ঠী বিলাতস্থিত ভারত-সচিব বা সেক্রেটারি অব্ স্টেটস্-এর দপ্তর, ভারতের গভর্নর জেনারেল ও তদীয় মন্ত্রকের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে; এই চাপের মূল কথা ছিল, যে-কোনো উপায়ে হোক ভারতের আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য ক্রমবর্ধমান সংগ্রামী শ্রমিক আন্দোলন প্রতিহত করতেই হবে।

কমিউনিস্ট জুজুর দিবাস্বপ্ন

শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী আন্দোলনের পুরোধারূপে যেহেতু কমিউনিস্ট কর্মিগণই ছিল এবং আন্দোলনের নেতৃত্বের অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল তারাই, সেইহেতু শাসকগোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য ছিল তাদেরই বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করা এবং একই সঙ্গে কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রচার স্তব্ধ করে দেওয়া। ভারতে রাশিয়ার বলশেভিক নীতি ও কমিউনিস্ট মতবাদ আমদানী ও প্রচারের এক বিরাট গোপন ষড়যন্ত্র চলছে, এই জিগির তোলে শাসকগোষ্ঠী। জাতীয় পুঁজিবাদী ও সামন্তগোষ্ঠীকে তাদের সহযোগী শক্তিরূপে দলভুক্তির উদ্দেশ্যে তাঁরা এদের মনে কায়েমীস্বার্থ বিপন্ন বলে ভীতিরও সৃষ্টি করে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকাগুলি এইসব সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তমূলক প্রচারের শিকার হয়ে পড়ে এবং

চক্রান্তের সহযোগীরূপে ব্যাপক প্রচারযন্ত্ররূপে ব্যবহৃতও হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদী শাসকশ্রেণী কমিউনিস্ট জুজুর এই অলীক ও কাল্পনিক আতঙ্ক ভারতের জনমানসে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, ভারত সরকারের এই কমিউনিস্ট আন্দোলন দমনের চক্রান্তের প্রচেষ্টা প্রকৃতপক্ষে ১৯২৬ সাল কিম্বা তারও পূর্ব থেকেই চলছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম গোড়া পত্তন হয় ১৯২৫ সালে। কিন্তু দেখতে পাওয়া যায়, ভারত সরকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিস্ট আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকল কাজে উদ্যোগী হয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, অর্থাৎ পার্টি সংগঠিত হওয়ার ৯ মাসের মধ্যেই, কেন্দ্রীয় আইনসভায় উপস্থাপিত Public Safety Bill নামে একটি বিশেষ ধরনের আইনের কথা উল্লেখ করা যায়। এর উদ্দেশ্য হল বিদেশ থেকে আগত ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর বন্ধুদের ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা এবং তাদের ভারত থেকে বহিষ্কার করা। এই আইনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সরকারী মন্তব্যে স্পষ্টই বলা হয়েছিল, ভারতে কমিউনিস্ট কার্যকলাপ রোধ করার উদ্দেশ্যে এই আইন প্রণয়ন আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই অদ্ভুত আইনটি যদিও কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক বাতিল হয়ে গেল, তথাপি বড়লাট তাঁর নিজ ক্ষমতার বলে এটাকে অর্ডিন্যান্স বা জরুরী আইনরূপে জারি করেছিলেন। এই আইনের কবলে প্রথম বলি হয়েছিলেন বিলাত থেকে সদ্য ভারতে আগত একজন কমিউনিস্ট ও বিলাতের লেবর রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের বিশিষ্ট কর্মী ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ফিলিপ স্প্র্যাট, যাকে পরে মীরাট-ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল। ঐ একই সময়ে ট্রেডস্ ডিসপিউট এ্যাক্ট সংশোধিত আকারে কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক পাশ করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল কোনো শিল্পের শ্রমিকশ্রেণীর অন্য শিল্প-সংস্থার শ্রমিকদের ধর্মঘটের প্রতি সহানুভূতিসূচক ধর্মঘটের অধিকারকে কেড়ে নেওয়া এবং তাকে বে-আইনী ঘোষণা করা। এই সমস্ত নানা ফন্দীফিকির আঁটা সত্ত্বেও শ্রমিক আন্দোলন স্তিমিত হয় নি, বরং ক্রমে ব্যাপক ও সংগ্রামমুখী হয়ে তা অগ্রসর হতে থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ১৯২৮-২৯-এ সারা ভারতে সমস্ত মৌল শিল্পগুলি শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে প্রায় অচল হয়ে পড়েছিল। ঐ সময়ে পরিস্থিতি এরূপ দাঁড়ায় যে শ্রমিক আন্দোলন ও জাতীয় আন্দোলন একই লক্ষ্য পথে স্রোতস্বিনী গঙ্গা-যমুনার মতো যুক্ত হয়ে যায় এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এক বিপুল আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। প্রধানত উক্ত আইন প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন

থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এবং সে উদ্দেশ্যে আন্দোলন খর্ব করার জন্য নতুন অস্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করা। তদানীন্তন ভারতের বড়লাট শাসকশ্রেণীর মনোভাবকে আর ঢেকে বা চেপে রাখতে পারছিলেন না। তিনি একটি উদ্দেশ্যমূলক প্রকাশ্য উক্তি করে ফেললেন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় লর্ড আরউইনের এক বক্তৃতায় প্রকাশ পেল যে, ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রচার তাদের পক্ষে এক অস্বস্তিকর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছে। ঠিক সঙ্গে সঙ্গে ১৯২৮ সালের শেষে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শাসকগোষ্ঠী, বিশেষত বোম্বাইয়ের ইংরেজ শাসকদের এবং ভারতের বৃহত্তম ও প্রভাবশালী বিত্তবান সংস্থা বেঙ্গল চটকল এসোসিয়েশন প্রভৃতির পরামর্শে অবিলম্বে কমিউনিস্ট আন্দোলন দমনের জন্য একটি উপায় স্থির করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করা হয়। বিলাতের ভারতসচিব পীলও ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে এই মর্মে ভারতের বড়লাট আরউইনকে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। ('মেইন স্ট্রীম'-এ ১৭ই আগস্ট '৭৩-এ প্রকাশিত কনরাড উডের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।—লেখক)।

ঐতিহাসিক বছর ১৯৩০

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বহু উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় ঘটনা ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৩০ সালে সংগঠিত হয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের মোকাবিলা করে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ঐ বছরে ঐতিহাসিক ডাণ্ডি মার্চ ও লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হয় এবং পরে তা ভারতব্যাপী বিরাট আইনঅমান্য আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। আইনঅমান্য আন্দোলন ভারতের জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপে সংগঠিত হয়েছিল। শোলাপুরের শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী জনতা আইনঅমান্য আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ভারতের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট অধ্যায়ের নজির রেখেছে। তারা স্থানীয়ভাবে শোলাপুরে পাল্টা গণ-আদালত স্থাপন করে শাসন-কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করেছিল।

ঐ বছরেই পেশোয়ারে বিদ্রোহী নিরস্ত্র জনতার উপরে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড পরিচালনার জন্য বৃটিশ সামরিক আদেশ অমান্য করে এক রেজিমেণ্ট গাড়োয়াল সৈন্য ব্রিটিশ সামরিক উর্দি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নির্ভীক বীরের ভূমিকা নিয়ে জনতার সারিতে স্থান নিয়েছিল। তাদের সামরিক আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল এবং দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয়েছিল। ঐ বছরেই ১৮ই এপ্রিল, চট্টগ্রামের

স্বাধীনতা-সংগ্রামী বীরবিপ্লবী যুবকদের নেতৃত্বে তথাকার ব্রিটিশ অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়েছিল এবং স্বাধীন চট্টগ্রাম ঘোষিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সামরিক শক্তির সঙ্গে জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবী যুবকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে অনেক যুবকই সেদিন শহীদ হন, ঐ বছরেই কলকাতায় ঠেলাগাড়ির শ্রমিক-গাড়োয়ানরা পুলিশের গুলির মোকাবিলা করে রাস্তার-লড়াইয়ে অগ্রসর হয়েছিল এবং ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ব্যারিকেড লড়াইয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিল। ঐ বছরেই কিশোরগঞ্জের কৃষকশ্রেণী মহাজনী প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ-অভিযান পরিচালনা করেছিল এবং সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ লড়াই করেছিল।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সঙ্ঘটিত এই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধী বিদ্রোহগুলি আপাতদৃষ্টে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে হলেও একথা অনস্বীকার্য যে, শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের হৃদয়ে দীর্ঘকালের জমাট সুপ্ত বৃটিশ-বিদ্বেষ এই আইনঅমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার বহিঃপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছিল। ভারতের শোষিত জনগণের মধ্যে সঙ্ঘটিত এই সমস্ত বৈচিত্র্যময় রুদ্র বিদ্রোহের ঘটনাবলী নানা ক্ষেত্রে নানা রূপে প্রকাশিত হয়েছে এবং ঐ ঘটনা গুলির পরম্পরা ঐতিহ্য বিযুক্ত নয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের জনগণ সুদূর অতীতকাল থেকেই এইরূপ সময় সময় বিদ্রোহের ইতিহাস রচনা করে এসেছে। সেইসব উত্থান প্রবল শক্তিশালী ব্রিটিশ শাসনের নির্মম আঘাতে সাময়িক দমিত হয়েছিল বটে কিন্তু পুনরায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে তা আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই ইতিহাসের আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই যুগে ভারতে, বিশেষ করে বাঙলায় ও বোম্বাইয়ে, ভারতের এই দুটি প্রধান রাজ্যে কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রচার ও কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার উদ্যোগ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করা।

আইনঅমান্য আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা

১৯৩০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারত জুড়ে বিরাট গণ-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময় বোম্বাইয়ের কমিউনিস্ট গ্রুপ কিছুটা সক্রিয় ছিল। এই সময় বোম্বাই ও কলকাতা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশের কমিউনিস্টদের কোনো কার্যকলাপের বিশেষ খবর জানা যায় না। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের চরিত্রের মূল্যায়ন নিয়ে বোম্বাইয়ের কমিউনিস্ট গ্রুপের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। মুখ্যত কমরেড বি. টি. রণদিভে ও এস. ভি. দেশপাণ্ডের নেতৃত্বে পরিচালিত বোম্বাই-এর

কমিউনিস্ট গ্রুপের মধ্যে ১৯৩০-এর অসহযোগ আন্দোলনের চরিত্রের মূল্যায়ন নিয়ে দুটি চিন্তাধারার উদ্ভব হয়। রণদিভের বিশ্লেষণানুসারে গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত এই অসহযোগ আন্দোলন ছিল বুর্জোয়া আন্দোলন। সুতরাং শ্রমিক-শ্রেণীর এতে কোন ভূমিকার স্থান নেই বরং শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য হল এই অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে অসহযোগিতা করা। দেশপাণ্ডে সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা পোষণ করতেন এবং তাঁর এই অসহযোগ আন্দোলনের চরিত্র-মূল্যায়ন ছিল এই যে, ১৯৩০-এর আইনঅমান্য-আন্দোলন বুর্জোয়া নেতৃত্বে পরিচালিত হলেও এই আন্দোলন হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন এবং এটা ব্যাপক গণভিত্তিক জাতীয় আন্দোলন। সুতরাং এই আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর একটি বিশেষ ভূমিকা ও স্থান আছে। শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টি এর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না বরং সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে এবং আন্দোলনকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতা দেবে।

১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের এক বিশিষ্ট প্রতিনিধি হ্যারি, জি. লিণ্ড তখন বোম্বাইতে উপস্থিত ছিলেন। কমিউনিস্ট গ্রুপের মধ্যে এই মতাদর্শগত অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে তিনি হস্তক্ষেপ করেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে দেশপাণ্ডের মূল্যায়নকেই সঠিক বলে তাঁর মত প্রকাশ করেন এবং সমর্থন করেন।

এখানে মনে রাখতে হবে যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কর্তৃক ঐ সময়ে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে ব্যাপক ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মোর্চা সংগঠিত করার ও গণ আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও নিপীড়িত ভারতবর্ষের মুক্তিআন্দোলনের ক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ বিশেষভাবেই যে প্রযোজ্য ছিল তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কমিউনিস্ট ও ট্রেডইউনিয়ন নেতাদের গ্রেপ্তার : মীরাট-ষড়যন্ত্র মামলা

ভারত সরকার, বিলাতের ভারত-সচিব ও পুঁজিপতিদের মধ্যে এতদিন ধরে গোপনে যে অভিনব ষড়যন্ত্র চলছিল অবশেষে তা ফলপ্রসূ হল। তাদের গোপন ষড়যন্ত্র এখন কার্যে পরিণত হল। ১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ

অকস্মাৎ একযোগে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৩১ জন কমিউনিস্ট, ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষাণনেতাকে গ্রেপ্তার করা হল এবং তাঁদের সকলকেই মীরাটের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে সোপর্দ করা হল। আইনের প্রয়োগে যাতে কোন ফাঁক না থাকে সে-সম্বন্ধে হুঁশিয়ার হয়েই মীরাটের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নামেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানাগুলি জারি করা হয়েছিল। বিলাতের আইনজ্ঞদের পরামর্শক্রমে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১/ক ধারার আওতায় এই ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। সারা ভারতজুড়ে বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি ফলাও করে প্রচার করল, পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ-কর্তৃক ভারতে এক ভয়ঙ্কর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং রাশিয়ার সঙ্গে যোগসাজসে ভারতে এক ভীষণ সশস্ত্র বৈপ্লবিক উত্থানের নায়ক হিসাবে কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে সরকারের সহযোগিতায় বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি ফলাও করে প্রচার অভিযান চালাতে লাগল। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১/ক ধারা অনুসারে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হলো যে, এরা ভাবত-সম্রাটকে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের কিম্বা তদন্তর্গত অংশবিশেষের উপর থেকে তাঁর সার্বভৌমাধিকার হতে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভারতের অভ্যন্তরস্থ ও বহিঃরাজ্যের কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগসাজসে ভারতের উপর এক মারাত্মক বিপ্লব সংঘটিত করার আয়োজন করছিল।

কলকাতার প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মিঃ ল্যাংফোর্ড জেমস, যিনি পূর্বাহ্নেই, অর্থাৎ প্রায় এক বছর পূর্বে এই মামলার কাঠামোটি (Brief) তৈরির জন্য ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁকেই এই মামলা পরিচালনা করার জন্য প্রধান সরকারী উকিল নিযুক্ত করা হল। ল্যাংফোর্ড জেমস অন্যান্য খরচ-খরচা বাদে শুধু কোর্টে মামলা পরিচালনা-বাবদ পারিশ্রমিক 'ফি' পেতেন দৈনিক এক হাজার একশত টাকা। শোনা যায়, এই মামলায় কেন্দ্রীয় রাজস্ব থেকে প্রায় এক কোটি টাকা খরচ বরাদ্দ করা হয়েছিল।

ল্যাংফোর্ড জেমস ইতিপূর্বে কয়েকটি রাজনৈতিক মামলায় হাত পাকিয়ে ছিলেন এবং তিনি একজন দক্ষ আইনজ্ঞ বলে সুপরিচিত ছিলেন। তৎকালীন 'ইয়োরোপিয়ান এসোসিয়েশন'-এর চেয়ারম্যানও ছিলেন ল্যাংফোর্ড জেমস। সুতরাং শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ও পুঁজিপতিদের পক্ষে এরূপ একজন জবরদস্ত পাকা ব্যারিস্টারকে নিযুক্ত করা সরকারের পক্ষে নিশ্চয়ই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

মামলার স্থান নির্ণয়

যদিও অভিযুক্তদের মধ্যে গরিষ্ঠ অংশ ছিল বোম্বাই ও বাঙলার নাগরিক, তথাপি মীরাটকেই ভারত সরকার সুচিন্তিতভাবে বেছে নিয়েছিলেন মামলা পরিচালনার কেন্দ্রস্থলরূপে। এর কারণ কি? কারণ, বোম্বাই ও বাঙলা—এই দুই রাজ্যেই প্রচলিত ছিল জুরির বিচার এবং তাতে অনেক সময় রাজনৈতিক মামলা ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যেমন ১৯২৭ সালে পূর্বোক্ত ব্রিটিশ কমিউনিস্ট ফিলিপ স্প্র্যাটের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক আনীত মামলা টেকে নি। জুরির রায়ে ফিলিপ স্প্র্যাট সে-সময় মুক্তি পেয়েছিলেন। সুতরাং জুরির বিচারের উপর ভরসা রেখে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা যে টেকানো যাবে না এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থেকেই ভারত সরকার এবং বিলাতের ভারত-সচিব উভয়ে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভারতবাসীদের মধ্যে অনেকেই যে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও বিদ্বেষ প্রচার সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবীতে তাদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে সহানুভূতিশীল হতে পারেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? এই সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েই পূর্বাহ্নে আঁটঘাট বেঁধে ছিলেন শাসক-শ্রেণী। তাই উত্তরপ্রদেশের মীরাট, পৃথিবীর একটি বৃহত্তম মামলার বিচারের জন্য নির্ধারিত হল। এই স্থান নির্বাচনের পক্ষে ভারত সরকারের হাতে মাত্র একটিই অজুহাত ছিল, সেটা এই যে, ওখানে ১৯২৮ সালের শেষের দিকে উত্তরপ্রদেশ কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ঐ উপলক্ষে একটি ক্ষুদ্র কৃষক সমিতির শাখা সংগঠিত হয়েছিল। সুতরাং ষড়যন্ত্রের কার্যকলাপের অন্যতম স্থান হিসাবে কলকাতা ও বোম্বাইয়ের তুলনায় পশ্চাৎপদ মীরাটকেই মামলা-পরিচালনার পক্ষে অনুকূল স্থান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ ঘটলো।

১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধের স্মৃতিবহনকারী মীরাট ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকার মধ্যে অবস্থিত গার্ডেন হাউসে (চলতি কথায় গার্দ্দন হৌস) * এক বিশেষ আদালত স্থাপিত হল এবং মীরাট-ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি শুরু হল। মীরাট-ষড়যন্ত্র মামলাটি ছিল ভারতের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আনীত তৃতীয়

* এই বাড়ীতে গর্ডন নামে এক ইংরেজ সামরিক অফিসার বাস করতেন ১৮৫৭ সালে। গর্ডন নাম থেকেই চলতি কথায় গার্দ্দন নামের উৎপত্তি এবং তাঁর বাসস্থানটি 'গার্দ্দন হাউস' নামে পরিচিত হয়। উক্ত গার্দ্দন হাউসেই বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট ও জজের 'সেসনস্' আদালত বসিয়ে দীর্ঘ তিন বৎসর দশ মাস ধরে মামলা চলেছিল।

কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র-মামলা। এর পূর্বে আরও দুটি মামলা হয়েছিল : প্রথমটি ১৯২২ সালে অনুষ্ঠিত পেশোয়ার বলশেভিক ষড়যন্ত্র-মামলা ও দ্বিতীয়টি হল ১৯২৪ সালে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র-মামলা।

ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ মিলনার হোআইট নিম্ন আদালতে মামলার প্রাথমিক স্তরের তদন্তকার্য সমাপ্ত করেন ১৯৩০ সালে। তিনি একজন অভিযুক্তকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে বেকসুর খালাস দেন। বাকী ৩০ জন অভিযুক্তকেই বিশেষ ডিস্ট্রিক ও সেসন জজের আদালতে বিচারের জন্য সোপর্দ করেন। এই বিশেষ জজটি ছিলেন ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক দপ্তরের কাজে হাত পাকানো একজন ঝানু আই.সি.এস্.—মিঃ আর. এল. ইয়র্ক। এখানে উল্লেখ্য যে, মীরাট মামলার অভিযুক্তদের মধ্যে সকলেই কমিউনিস্ট মতাদর্শবাদী ছিলেন না। এঁদের মধ্যে ছিলেন কমিউনিস্ট মতাদর্শবাদী (আনুষ্ঠানিক পার্টি-সদস্য ও অসদস্য) ট্রেড ইউনিয়ন নেতা……জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শবাদী (বা গান্ধীবাদী), নির্দলীয় সোশ্যালিস্ট……কৃষক নেতা প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ। অভিযুক্তদের মধ্যে দু'জন, ফিলিপ স্প্যাট (যাঁর নাম পূর্বেই উল্লেখ করেছি) ও বেন ব্রাডলে, যিনি ছিলেন সি. পি. জি. বি.-র (Communist Party of Great Britain.) সদস্য। অন্য আরেকজন ইংরেজ—লিস্টার হিউ হাসিনসন, যাঁকে মামলা শুরু হওয়ার প্রায় তিন মাস পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন নির্দলীয়। তাঁর পিতা-মাতা উভয়েই আই. এল. পি-র সদস্য ছিলেন। হাসিনসন অবশ্য কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।

মীরাট মামলায় ভারতীয় এবং উক্ত তিনজন ইংরেজ ছাড়াও ভারতের বাইরের আরও ৬০ জন বিদেশী কমিউনিস্টকে ও ১৩টি সংগঠনকে সহযোগী অভিযুক্তরূপে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। এই তালিকায় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নামও ছিল। এই মামলায় বাদীপক্ষ, অর্থাৎ ভারতসরকারের পক্ষ থেকে এক মাত্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও জাতীয় আন্তর্জাতিক পুঁথি-পুস্তক, পত্রপত্রিকা, চিঠিপত্র, বিভিন্ন রকমের প্রচারপত্র (Leaflets) এবং অভিযুক্তদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সরকারী রিপোর্ট ইত্যাদি দলিলপত্র ছাড়া কোনরূপ অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহের বা ব্যবহারের কোনো নজির উপস্থিত করা হয় নি—কারণ সেরূপ কোনো ঘটনার অস্তিত্ব ছিল না। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রমাণরূপে দাখিলীকৃত দলিলপত্রের মোট সংখ্যা ছিল দশ হাজার। সর্ব মোট ৬২০ জন সরকার পক্ষের

সাক্ষীর সাক্ষ্য মামলায় লিপিবদ্ধ করা হয়। এদের মধ্যে বিলাতের কুখ্যাত গোয়েন্দা-বিভাগ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ১১ জন সাক্ষীও ছিল। ভারতের জনগণের নিকট থেকে নিঙড়ে নেওয়া অর্থে সৃষ্ট ভারত সরকারের অর্থভাণ্ডার থেকেই তাদের জন্য বিলাত থেকে এদেশের যাতায়াত, খাওয়া-থাকা, যানবাহন ও অন্যান্য যাবতীয় রাহাখরচের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। ঐ সময় ১৯৩০ সালে আইনঅমান্য আন্দোলন উপলক্ষে ভারতভ্রমণে আগত বিলাতের সুবিখ্যাত সাংবাদিক এইচ. এন. ব্রেইলসফোর্ডকেও সাক্ষীরূপে ডাকা হয়েছিল কয়েকজন অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে।

ফলাও করে মীরাট-ষড়যন্ত্র মামলার আয়োজন যে ভারত সরকারের একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক চক্রান্তের ফলশ্রুতি সেসম্বন্ধে ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু শুধু কমিউনিস্টদের দমন ও ভারতে কমিউনিস্ট মতাদর্শের অগ্রগতির পথ-রোধ করাই এর উদ্দেশ্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, এই মামলাটি যখন সেসন জজের বিচারালয়ে উপস্থাপিত করা হল সেই মুহূর্তে ভারতের জনগণের সম্মুখে প্রত্যক্ষভাবে মূর্ত হল দু'টি মতাদর্শের মুখোমুখি সংঘর্ষের চিত্র, তার বিতর্ক ও বিচার্য বিষয়। একদিকে দাঁড়ালেন বুর্জোয়া মতাদর্শের ধারকবাহক পুঁজিবাদ, সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের প্রবক্তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী ও তার সহযোগীরা, অপরদিকে দাঁড়ালেন মার্কস্-লেনিনবাদী বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ ও শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ প্রবর্তনের প্রবক্তা শ্রমিকশ্রেণীর মুখপাত্রগণ।

বাদীপক্ষ কর্তৃক মামলার উদ্দেশ্য বর্ণনা ঃ

চতুর ব্যারিস্টার ল্যাঙফোর্ড জেমস মামলার মুখবন্ধে চারদিন ব্যাপী দৈনিক পাঁচ ঘণ্টা করে প্রদত্ত জোরাল বক্তৃতায় বিশেষ সেসন জজ ও এসেসরদের লক্ষ্য করে যে ভাষণ দিলেন তাতে জুরিদের মনে একটি দৃঢ় ধারণার দাগ কাটতে চেষ্টা করলেন এবং বিরাট প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে ভারতের জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে একটি মাত্র কথার উপরেই তিনি বারংবার বিশেষ জোর দিলেন। তিনি হাকিম ও এসেসরদের মাথায় ঢুকাতে চেষ্টা করলেন যে, কাঠগড়ার আসনে উপবিষ্ট এই মামলার অভিযুক্তগণ মামুলী ধরনের আসামী নন। এঁরা এত কালের সুপ্রতিষ্ঠিত শাশ্বত সামাজিক চিন্তাধারা ও মতাদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। এঁদের আয়োজিত বিপ্লবের উৎস হল মস্কো—আর সেখানকার বলশেভিক দলের মতাদর্শের অনুকরণ ও অনুসরণে এবং সেই বৈদেশিক দলটির যোগ-সাজসে এঁরা ভারতে এক ভয়ঙ্কর হিংসাত্মক বৈপ্লবিক কার্যের মাধ্যমে বর্তমান

সরকারের (ব্রিটিশ সরকারের) পরিবর্তে ভারতেও এক অভিনব শ্রেণীহীন সমাজ ও সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এক কথায় বর্তমান সুপ্রতিষ্ঠিত শাসন ও সমাজব্যবস্থাকে পালটে দিয়ে এদেশে এক কুলিরাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন এই আসামীগণ। এঁদের কল্পিত বিপ্লব জাতীয় বিপ্লব নয়—জাতীয়তা বিরোধী বিপ্লব। আর বল্‌শেভিক আদর্শই হল দেশ-সমাজ-ধর্ম ও ঈশ্বর বিরোধিতা। শুধু তাই বলেই ল্যাঙফোর্ড জেমস ক্ষান্ত হলেন না, তিনি তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন এই বলে যে, এঁরা হচ্ছেন সব কিছুরই বিরোধী—(Anti-everything)। কালনাগের মতো বিষোদ্গার করে ল্যাঙফোর্ড জেমস্ বল্লেন, "প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত অভিযুক্তদের লক্ষ্য হল—একটু পুনরুক্তি করেই আমি বলছি, জাতীয়তার বিরোধিতা করা। তাঁরা অবশ্য এর আখ্যা দেবেন আন্তর্জাতিকতা। তাঁদের নিকট এই দু'টো শব্দের একই অর্থ। সংক্ষেপে বলতে গেলে এঁদের লক্ষ্য ছিল মহামান্য রাজা জর্জের ভারতে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করে সে-স্থলে একটি তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সরকার স্থাপন করা। স্পষ্ট কথায় এটাও বলা যায় যে, মহামান্য ভারত সরকারের পরিবর্তে মিঃ স্তালিনের সরকার প্রতিষ্ঠা করা।...

"এই অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ যে বলশেভিক এটাই প্রমাণ করা হল সরকার পক্ষের মামলার বিষয়বস্তু। অর্থাৎ, এরা যে বলশেভিক আদর্শের লক্ষ্যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং কাজও করেছিলেন যাতে ভারতেও হুবহু রাশিয়ার প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার অনুকরণে একটি শাসনের প্রতিষ্ঠা করা যায় তা প্রমাণ করা।

"কিন্তু একজন বিশুদ্ধ চরিত্রের বলশেভিক হতে হলে তার কয়েকটি নির্দিষ্ট গুণ থাকা চাই। আর সে-গুণাবলী একজন সাধারণ মানুষের অভিলষিত গুণাবলী নয়—এই গুণাবলী অর্জনের জন্য একজনকে তার নিজের দেশকে ভালোবাসার কোনো প্রয়োজন নেই, তাকে হতে হবে একজন দেশদ্রোহী, ঈশ্বরদ্রোহী ও পরিবারদ্রোহী। মোটকথা, আমার মনে হয় একজন খাঁটি নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের বলশেভিককে হতে হবে—সব কিছুরই বিরোধী।"...

ল্যাঙফোর্ড জেমস তাঁর বক্তৃতায় বিচারকের সম্মুখে ভারত সরকারের আর একটি উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাবের অবতারণা করেন, যাতে ভবিষ্যতে কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসীগণ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের 'ক্রিড'-এর সঙ্গে ঐকমত্য হলেই তাঁদের আইনত দোষী সাব্যস্ত করা যায়। তিনি বল্লেন :

"আমরা যারা এখানে সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছি তারা এই যুক্তি উপস্থিত

করতে চাই যে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের 'ক্রিড' গ্রহণ ও তার প্রোগ্রাম কার্যে পরিণত করার জন্য শুধু ঐকমত্য হলেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১/ক ধারা অনুসারে স্বভাবতই অপরাধী বলে গণ্য হবে এবং আমরা এই মামলায় এটাই প্রমাণ করব যে, এই প্রোগ্রাম প্রকৃতপক্ষেই কার্যে পরিণত করা হয়েছিল। মোদ্দাকথা, আমার বক্তব্য এই যে আমরা যুক্তি দর্শাবো যে, শুধুমাত্র 'ক্রিড' কার্যকরী করার জন্য ঐকমত্য হলেই তা অপরাধ বলে গণ্য হবেই।"

সরকারী প্রচারযন্ত্র ভারতের সর্বত্র বুর্জোয়া দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে ল্যাংফোর্ড জেমসের বক্তৃতার বিভ্রান্তিকর বিশেষ বিশেষ অংশগুলি দিয়ে পাতা ভরে দিতে লাগল, কোনো কোনো সংবাদপত্র মামলার দৈনিক বিবরণীও তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্যমূলক মন্তব্যসহ প্রকাশ করতে লাগল, যাতে মামলার আসামীদের প্রতি সাধারণ মানুষের মনে সহানুভূতির বদলে বিরূপ ও বিদ্বেষমূলক ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। অভিযুক্তরা এরূপ দু'টি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করে জিতেছিলেন এবং সংবাদপত্র দু'টির উপর এলাহাবাদ হাইকোর্ট কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের দণ্ডাদেশও হয়েছিল।

মামলায় ল্যাংফোর্ড জেমসের মুখবন্ধ স্বরূপে প্রদত্ত বক্তৃতাটি প্রায় একশত পৃষ্ঠার একখানি বই আকারে ছেপে ভারত সরকারের প্রচার-বিভাগ কর্তৃক কেন্দ্রীয় ও প্রতিটি রাজ্যের উচ্চপদস্থ যাবতীয় সরকারী কর্মচারীদের—জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ও নিম্নে পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের স্তর পর্যন্ত বিলি করা হয়েছিল। ভারত সরকারের শাসনযন্ত্রের প্রধান প্রধান কর্তৃপক্ষকে বলশেভিক মতাদর্শের ভারতে অনুপ্রবেশ ও জালবিস্তার সম্পর্কে হুঁশিয়ার করার উদ্দেশ্যেই ল্যাংফোর্ড জেমসের বক্তৃতার পূর্ণাঙ্গ বয়ানটি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয় এবং এইভাবে জনসাধারণের নিকট থেকে নিংড়ে নেওয়া রাজস্বের এক বিরাট অংশ অপচয় করা হয়েছিল, তাতে আর সন্দেহ কি ?

মীরাট-মামলা প্রায় সুদীর্ঘ চার বৎসর কাল চলেছিল। পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীদের ইতিহাসে এটি ছিল একটি অনন্য বৃহত্তম প্রহসনের দৃষ্টান্ত।* বিচারালয়টি

* ইতিপূর্বে বিলাতে তৎকালীন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংসের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালস্থায়ী মামলা ও আমেরিকায় স্যাকো ও ভেঞ্জেত্তি—এই দুই শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে দীর্ঘকালস্থায়ী মামলার দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু সেগুলির জন্য প্রতিদিন আদালত বসত না।

উভয়পক্ষের—বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শের প্রচারমঞ্চে পরিণত হয়েছিল। ইতিপূর্বের দু'টি কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র-মামলায় সেরূপ সুযোগ ঘটে নি। মামলা পরিচালনায় দীর্ঘ চার বৎসরের সময়সীমার মধ্যে অভিযুক্তগণ মীরাটের দিকে ভারতের শ্রমিক-কৃষক ও সমস্ত জনসাধারণের কৌতূহলোদ্দীপক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

অভিযুক্তদের দ্বারা সরকারী সাক্ষীগণের সাক্ষ্যের উপর সওয়াল-জবাব ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জবাবে ব্যক্তিগত বিবৃতি ও ১৮ জন কমিউনিস্ট মতাদর্শবাদীর যুক্ত বিবৃতি প্রভৃতি ভারতের শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় আন্দোলনের প্রগতিশীল নেতৃবর্গের, বিশেষত ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তাদের উপর মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নব আদর্শের প্রভাব বিস্তার করেছিল। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের তরুণ নেতৃবর্গের মধ্যেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিন্তাধারাব ও বিপ্লবের নতুন পথের সন্ধানের দিকে ধ্যান-ধারণার মোড় ফিরিয়েছিল। ভারত সরকার বিপুল অর্থ ব্যয় করে কমিউনিস্ট আন্দোলন দমনের যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই বৃহদাকার ও বহ্বাড়ম্বরপূর্ণ মামলার আয়োজন করেছিল সেটা যে তাদের আশানুরূপ সাফল্যলাভ করেনি শুধু তাই নয় বরং তার বিপরীত ফলই ফলেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। ভারত সরকারের গোপন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ভবিষ্যতে সরকার আর এরূপ বিপুল অর্থ ব্যয়ে বৃহদাকার মামলা করার মতো নির্বুদ্ধিতার কাজে হাত দেবেন না। প্রয়োজন হলে কমিউনিস্ট আন্দোলন দমনের জন্য তারা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করবেন।

মীরাট পরবর্তী পর্যায়

একথা অনস্বীকার্য যে, ১৯২৯ সালে কমিউনিস্ট নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার ও মীরাট-মামলায় অভিযুক্ত করে দীর্ঘ চাব বৎসর পর্যন্ত বিচারধীন বন্দী হিসাবে রাখার ফলে ভারতের শ্রমিক-আন্দোলন বেশ কিছুদিন পর্যন্ত স্তিমিত হয়ে যায় এবং কমিউনিস্ট পার্টিও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে একরূপ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একটি সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় সংগঠন সবেমাত্র গড়ার পথে অগ্রসর হয়েছিল ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে এবং ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে। ঐ সময়ে সংগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির দু'টি বৈঠক হয়েছিল কলকাতায় সারাভারত ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস্ পার্টির সম্মেলনের সময়। তার পূর্বের, অর্থাৎ ১৯২৫ সালে সর্বপ্রথম সংগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিটি বাস্তবে কাগজে কমিটিরূপেই অবস্থিত ছিল; এবং কোনো

রাজ্যেই এর বিশেষ কোনো সাংগঠনিক সক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় নি। কোনো রাজ্যেই সুসংবদ্ধ রাজ্যভিত্তিক পার্টি ইউনিটও তখন সংগঠিত হয় নি। ব্যক্তিগত বা এক-একটি গ্রুপ হিসাবে কয়েকটি রাজ্যে, বিশেষত বোম্বাই, বাঙলা, লাহোর (পাঞ্জাব) এই তিনটি রাজ্যেই ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্ট মতাদর্শবাদীরা কিছুটা সক্রিয় ছিলেন মাত্র। বাঙলায়, তখন বলা যায়, নামে মাত্র দু'জন কমিউনিস্ট মতাদর্শবাদী (মুজফ্ফর আহমদ ও আব্দুল হালিম) কমিউনিস্ট পার্টির নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯২৬ ২৭ সালের পূর্বে বাঙলায় কোনো শ্রমিক-কৃষক গণ-আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকায় কমিউনিস্টদের দেখা যায় নি। ঐ সময় ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজাণ্টস্ পার্টির মধ্যে নতুন ও সক্রিয় শক্তির অনুপ্রবেশের ফলে শ্রমিক-আন্দোলন নবচেতনা ও নবসংগঠনের পথে অগ্রসর হয়। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সংবিধান সম্বন্ধে তখনও ভারতের কমিউনিস্ট মতাদর্শবাদীদের জ্ঞানের অভাব ছিল বলেই মনে হয়। ১৯২৫ সালে কানপুর সম্মেলনে গৃহীত পার্টির গঠনতন্ত্র, পার্টি-সংগঠন সংক্রান্ত বিধিবিধান ভ্রান্তিমূলক ছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আদি সংগঠকদের মধ্যে অন্যতম শ্রীসত্য ভক্ত একজন নৈষ্ঠিক কমিউনিস্ট মতাদর্শবাদী হয়েও একটি ভারতীয় জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (National Communist Party of India কিম্বা Indian National C.P.) গড়ার প্রবক্তা ছিলেন।

ঐ সময় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতাদের সঙ্গে, বিশেষ করে এম. এন. রায়ের সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট মতাদর্শবাদীদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের মধ্যেই ছিল কাজকর্ম সীমাবদ্ধ। ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের মহাফেজখানাগুলিতে রক্ষিত দলিলপত্রাদিতে দেখা যায়, ঐ সমস্ত চিঠিপত্রের আদান-প্রদানই তখন একমাত্র কাজ ছিল। পার্টি-সংগঠন গড়া ও সম্প্রসারণের উদ্যোগের কোনো একটি নজিরও পাওয়া যায় না। ঐ সমস্ত চিঠিপত্রে ব্যক্তিগত ব্যাপার ও আর্থিক অভাব-অভিযোগ, একে অন্যের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের বিষয় নিয়ে লেখালেখি ছাড়া কোনোরূপ রাজনৈতিক-সাংগঠনিক নীতি বা ভারতীয় সামাজিক-আর্থনীতিক বা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ও সমস্যাদি সম্পর্কিত কোনো আলোচনার বিষয়বস্তু থাকত না; আর থাকলেও তার অতি সংক্ষিপ্ত বা আংশিক উল্লেখ মাত্র থাকত। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাব ও জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ক্ষেত্রে তার সঠিক প্রয়োগ, রণনীতি ও কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব থাকা বশতই তৎকালীন কর্মীদের ও কমিউনিস্ট

মতাদর্শবাদী নেতাদের মধ্যে দুর্বলতা থাকাটা অস্বাভাবিক ছিল না। দুঃখের বিষয় অনেক সময় ব্যক্তিগত কোন্দল মাত্রা ছাড়িয়ে যেত এবং বৈপ্লবিক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে তা সন্ত অঙ্কুরিত পার্টির 'নিউক্লিয়াস'কে একপেশে ব্যক্তিগত প্রভাবাধীনে আড়ালে রাখার চেষ্টা করত। এর ফলে বিশ থেকে ত্রিশের দশক পর্যন্ত, বিশেষত বাংলায়, পার্টি গড়ার যে বিপুল সম্ভাবনা ছিল তা বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নির্দেশে ১৯২৮-২৯ সালে বিভিন্ন রাজ্যের কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিবিশেষ ও গ্রুপগুলিকে একত্রিত করে একটি সর্বভারতীয় সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় পার্টি সংগঠিত করার প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কমিউনিস্টদের মীরাট-মামলায় গ্রেপ্তারের ফলে সে-কাজ অধপথে বানচাল হয়ে যায়।

ইয়ং কমরেডস্ লীগ ও কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রচারের প্রচেষ্টা

এইরূপ অচল ও অব্যবস্থিত অবস্থায় কলকাতায় তখন একমাত্র ইয়ং কমরেডস্ লীগের কর্মীগণই কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রচারে সক্রিয় হয়। এই কর্মীরা কেউই আনুষ্ঠানিক ভাবে পার্টি-সদস্য ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকে ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেন্টস্ পার্টির সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করতেন।

১৯২৮ সালের শেষের দিকে কলকাতায় ইয়ং কমরেডস্ লীগের জন্ম হয়। প্রবন্ধ-লেখক এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তখন থেকেই কিছুটা পরিমাণে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ইয়ং কমরেডস্ লীগের নেতাদের যোগাযোগ ছিল। মীরাট মামলায় নেতৃবর্গের গ্রেপ্তারের পর ১৯৩০ সালে ইয়ং কমরেডস্ লীগের আরও কয়েকটি শাখা সংগঠিত হয়। রাজশাহীতে লীগের প্রাদেশিক সম্মেলন ও কিশোরগঞ্জে জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সমস্ত সম্মেলনে ও কয়েকটি গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে লীগের নেতৃবর্গ কমিউনিস্ট মতবাদ ও কমিউনিস্ট পার্টি-সংগঠনের অস্পষ্ট ধারণা নিয়েই ভবিষ্যতের কর্মপন্থা স্থির করেন। কিশোরগঞ্জে ইয়ং কমরেডস্ লীগের একটি শক্তিশালী শাখা সংগঠিত হয়েছিল এবং নেতৃবর্গ কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ সম্মুখে রেখে কৃষকশ্রেণীর মধ্যে আন্দোলন শুরু করেন। গ্রামে গ্রামে বহু ছোট-বড় সভা ও বৈঠকের মাধ্যমে লীগের তরুণ নেতারা সোভিয়েতের আদর্শ ও কমিউনিস্ট মতবাদের ব্যাপক প্রচার-আন্দোলন গড়ে তোলেন। কমিউনিস্ট মতবাদ ও পার্টি-সংগঠন সম্পর্কে তাদের অস্পষ্ট ধারণা থাকলেও তাঁদের ব্যাপক প্রচারকার্যের ফলে কৃষকশ্রেণীর মধ্যে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। ১৯৩০ সালের কিশোরগঞ্জের বিখ্যাত কৃষক-উত্থান ও মহাজনী প্রথা-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বও দিয়ে-

ছিলেন ইয়ং কমরেডস্ লীগের কর্মীগণ।* ১৯৩০ সালে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন (B.C.L.A. Act.) জারী করে শত শত স্বাধীনতা সংগ্রামীকে গ্রেপ্তার করে ও কারাগারে বা বন্দীনিবাসে আটক করে। ইয়ং কমরেডস্ লীগের নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই তখন এই আইনের কবলে পড়ার ফলে কিশোরগঞ্জের কৃষক উত্থান প্রকৃত নেতৃত্ববিহীন হয়ে পড়েছিল। লীগের নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই গ্রেপ্তার এড়িয়ে আত্মরক্ষার জন্য কলকাতায় এসে গোপন আড্ডায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ইয়ং কমরেডস লীগের নেতারা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে ঐ সময় জল্পনা-কল্পনা করেন। এখানে-সেখানে গোপন বৈঠক করেন ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে নানা আলোচনা করেন। কিন্তু তাঁরা কোনো সঠিক পন্থা স্থির করতে সমর্থ হন নি। এই সময়ে কলকাতায় কমিউনিস্ট বলে পরিচিতদের মধ্যে একমাত্র আবদুল হালিমই কিছুদিন পর্যন্ত জেলের বাইরে ছিলেন। কিন্তু তিনি লীগের নেতাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখতেন না। এই সময়ে মাঝে মাঝে মীরাট মামলার বিচারাধীন বন্দীদের মুক্তির দাবীতে কলকাতায় জনসভা ও পথসভা ইত্যাদি হতো। আবদুল হালিম ও কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী অন্যান্য ছাত্র-যুব দল এবং ইয়ং কমরেডস লীগের কর্মীরা এই সকল পথসভায় বক্তৃতা দিতেন। তাঁদের কাজ এরূপ প্রচার-আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৩০ সালে কলকাতায় যে গাড়োয়ান ধর্মঘট হয়েছিল তার সংস্পর্শে থাকার জন্য আবদুল হালিম রাজদ্রোহ-মূলক অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে যান এবং তাঁর এক বছরের কারাদণ্ড হয়। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি খুলনা জেল থেকে মুক্তি লাভ করে কলকাতায় ফিরে আসেন।

আবদুল হালিম তাঁর স্মৃতিচারণে তখনকার অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন: "……১৯৩০ সালের গাড়োয়ান ধর্মঘট উপলক্ষে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বলি হিসাবে আমি এক বছর কঠোর কারাদণ্ড ভোগের পর ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে খুলনা জেল থেকে মুক্তিলাভ করিয়া কলকাতায় ফিরিলাম। মীরাটে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী তখনও চলিতেছে। ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষ্যে মিটিং মিছিল ও শোভাযাত্রা বন্ধ করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী গভর্নমেণ্ট দমন নীতি শুরু করিল। আমরা তিন সপ্তাহের জন্য

---

* কিশোরগঞ্জের কৃষক-উত্থান সম্পর্কে Marxist Miscellany No. 1. January 1970-তে প্রকাশিত লেখকের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।—লেখক

বিচারাধীন বন্দী হিসাবে আলিপুর জেলে আটক রহিলাম……।" (তিরিশের দশকে কমিউনিস্ট আদর্শ প্রচারের জন্য প্রচেষ্টা, আবদুল হালিম)*

১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে আলিপুর জেল থেকে আবদুল হালিম মুক্তিলাভ করে মীরাট চলে যান, বন্দীদের মামলার সাহায্যের উদ্দেশ্যে। জুলাই মাসে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। ঐ সময়কার পার্টি ও গণ-আন্দোলনের অবস্থা সম্পর্কে আবদুল হালিম তাঁর উক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন: "……আমাদের শ্রমিক সংগঠনগুলিও সাময়িক ভাবে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে……। শ্রমিক কৃষক দলের (Workers & Peasants' Party) অফিসটিও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। …কয়েক দিন ২৬নং হ্যারিসন রোড, চটকল মজদুর ইউনিয়ন অফিসে কমরেড আবদুল মোমিনের সঙ্গে কাটাইলাম। কমরেড মোমিনের আর্থিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার জন্য তিনি অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যস্ত। কিন্তু তাহাকে আর বেশী দিন চেষ্টা করিতে হইল না। একদিন রাত্রে সি. আই. ডি পুলিস বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া চটকল মজদুর ইউনিয়নের অফিসে তালা লাগাইয়া দিল। কমরেড মোমিনের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে চটকল মজদুর ইউনিয়নের কাজও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গেল।"

ইয়ং কমরেডস লীগের অন্যতম নেতা সুধাংশু অধিকারী ১৯৩০ সালে গ্রেপ্তার এড়িয়ে কিশোরগঞ্জ থেকে চলে আসেন এবং আত্মগোপন করে কলকাতায় বাস করতে থাকেন। তিনি তখন মেটিয়াবুরুজে এক শ্রমিক বস্তিতে বাস করতেন এবং গোপনে প্রচার কার্য চালাতেন। কমরেড মণি সিংহের ভগ্নীপতি জিতেন সান্যাল ব্রেথওয়েট কারখানায় ইলেক্‌ট্রিসিয়ানের কাজ করতেন, তাঁরই আশ্রয়ে এবং সহযোগিতায় সুধাংশু অধিকারী মেটিয়াবুরুজে এক গোপন আস্তানায় থেকে শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রচারের কাজ করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছিল। আমাদের পুরাতন বন্ধু বালির অবনী চৌধুরীর সঙ্গে সুধাংশু অধিকারীর ঐ সময় পরিচয় হয়।

লীগের কাজের অগ্রগতি

১৯৩০ সালে রাজসাহীতে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইয়ং কমরেডস্ লীগের প্রাদেশিক সম্মেলনে বিভিন্ন এলাকায় লীগের প্রচার ও সাংগঠনিক কাজ পরিচালনার জন্য কয়েকজন কর্মীর উপর

* আবদুল হালিমের লেখা ও "অনুশীলন" শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬৯-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ হতে উদ্ধৃত। —লেখক

দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। ময়মনসিংহ জেলার ভার দেওয়া হয়েছিল সুধাংশু অধিকারীর উপর, নলীন্দ্র সেনের উপর ঢাকা, রামরাঘব লাহিড়ীর উপর রাজসাহী ও সমগ্র উত্তরবঙ্গ এবং বিভূতি ঘোষের উপর খুলনা জেলার সাংগঠনিক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। শোনা যায়, রাজসাহী সম্মেলনে কমরেড প্রমথ ভৌমিকও যোগদান করেছিলেন এবং খুব হৃদয়গ্রাহী জোরাল ভাষন দিয়েছিলেন। কলকাতায় লীগের প্রাদেশিক অফিস স্থাপিত হয়েছিল কলেজ স্ট্রীটের উপর, মেডিকেল কলেজের উল্টোদিকে। রাজসাহী সম্মেলনে নলীন্দ্র সেনকে প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছিল এবং সুধাংশু অধিকারী, আশু রায়, পরেশ মুখার্জি, রামরাঘব লাহিড়ী, ডাঃ জ্যোতির্ময় শর্মা, যতীন চৌধুরী, নীরোদ চক্রবর্তী, বিভূতি ঘোষ, নির্মল দাস, রতন হাজরা, দেবেন্দ্রবিজয় গুহ প্রভৃতিকে নিয়ে প্রাদেশিক কমিটি সংগঠিত হয়েছিল। রতন হাজরাকে (ছাত্র) কিছুদিন পরে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগের সন্দেহে হত্যা করা হয়। দেবেন্দ্রবিজয় গুহকে পুলিশের চর সন্দেহে বিতাড়িত করা হয়। তার নাকি ঢাকার গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এবং পুলিশের নিকট লিখিত চিঠিপত্র তার নিকট পাওয়া গিয়েছিল।

কিশোরগঞ্জে ইয়ং কমরেডস লীগের কাজ খুব জোরদার হয়ে ওঠার এটাই কারণ ছিল যে, ঐ সময় অনুশীলন পার্টির নেতৃস্থানীয় ছাত্র ও যুবক কর্মীগণ প্রায় সকলেই কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে লীগে যোগদান করেছিলেন এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বর্তমান বাঙলাদেশের অন্যতম কমিউনিস্ট নেতা নগেন সরকার, অলি নোয়াজ, মণীন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ। এই সমস্ত ইয়ং কমরেডস্ লীগের কর্মীগণ ও নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে কিশোরগঞ্জ শহরে শ্রমিক-কৃষকদের বড় বড় সভা ও সমাবেশের আয়োজন হত এবং শোভাযাত্রা পরিচালিত হতো। এই সভা ও শোভাযাত্রায় শহরের সন্নিকটস্থ এলাকাগুলি থেকে বিপুল সংখ্যায় কৃষক যোগ দিতেন। এই প্রচার-আন্দোলনে তাদের স্লোগান ছিল কৃষকের হাতে জমি চাই, (Land to the Peasants) মহাজনী প্রথা রদ কর ইত্যাদি।

রাজসাহী জেলায় রামরাঘব লাহিড়ীর নেতৃত্বে কাজ বেশ অগ্রসর হচ্ছিল। ঢাকায় নলীন্দ্র সেনের নেতৃত্বে লীগের একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। রামরাঘব লাহিড়ী ও নলীন্দ্র সেন উভয়েই মার্কসবাদে ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

কিশোরগঞ্জ রেলস্টেশনের অদূরে ও স্টেশন রোডের উপর জাঁকজমক করে লীগের স্থানীয় কেন্দ্রীয় অফিস স্থাপিত হয়েছিল। কিশোরগঞ্জে কাজের দ্রুত অগ্রগতি

ও সম্প্রসারণের ফলে কলকাতা ও অন্যান্য প্রদেশের নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্টদের সেখানে ডাকা হতো বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতার জন্য এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপর তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য। এই সঙ্গে কর্মীদের নিয়ে বৈঠক-সভাও করা হতো। এই সমস্ত এলাকায় সভা ও বৈঠকী আলোচনায় যাঁরা যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন করাচির তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতা জালালউদ্দীন বোখারী (পরে তিনি কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগ দেন) ও কলকাতার অখিল ব্যানার্জি, বিভূতি ঘোষ, জগজ্জিৎ সরকার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। অখিল ব্যানার্জি জনসভায় নজরুলের গান গেয়ে শ্রোতাদের মধ্যে অদ্ভুত উন্মাদনার সৃষ্টি করতেন। সর্বত্র ইয়ং কমরেডস লীগের এই কেন্দ্রগুলি জনসাধারণের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন বলেই পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়েছিল।

মুজফ্ফর আহ্মদ ও আব্দুল হালিম বরাবরই ইয়ং কমরেডস লীগের সম্বন্ধে একটা বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ফিলিপ স্প্র্যাট ইয়ং কমরেডস লীগ সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং গোড়া থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইয়ং কমরেডস লীগের প্রথম ইস্তাহারটির খসড়ায় বিশেষভাবে তাঁর হাত ছিল। ইয়ং কমরেডস্ লীগ কর্তৃক পরিচালিত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ক্লাস ও আলোচনা সভাগুলিতে ফিলিপ স্প্র্যাট যোগদান করতেন ও বক্তৃতা দিতেন। মুজফ্ফর আহ্মদ এক সঙ্কীর্ণ ধারণার বশবর্তী হয়ে চলতেন এ কথা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। এর ফলে তখন বাঙলায় সত্যিকাবের পার্টি গড়ে উঠতে পারে নি; যদিও তার প্রচুর সম্ভাবনা তখন ছিল। আজ এ কথা খোলাখুলিই বলা যায় যে, তাঁদের ঐ সময় কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সংগঠনের রীতিনীতি সম্বন্ধেও কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বিশেষ করে মুজফ্ফর আহ্মদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে এ কথা জোর দিয়েই বলা চলে। মুজফ্ফর আহ্মদের এরূপ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও একপেশে মনোবৃত্তির জন্যই সুদীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজাণ্টস্ পার্টিতে কাজ করেও কমিউনিস্ট পার্টিতে আমাদের নবাগত সক্রিয় একনিষ্ঠ কর্মীদের অনেকেরই আনুষ্ঠানিক ভাবে সদস্যভুক্ত হওয়া সম্ভব হয় নি। যদিও এম. এন. রায়ের নির্দেশক্রমে পৃথক কমিউনিস্ট গ্রুপের অস্তিত্ব ভেঙে দিয়ে আমরা সকলে তখন ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজাণ্টস্ পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম। মুজফ্ফর আহ্মদের বই "আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি" তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের-ই একটি নগ্ন রূপরেখা বিশেষ। এ সম্বন্ধে বারান্তরে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা আছে।

বোম্বাই-এর কমিউনিস্ট গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ

১৯৩০ সালে বোম্বাইয়ের কমিউনিস্ট গ্রুপের অন্যতম নেতা কমরেড এস. ভি. দেশপাণ্ডের সঙ্গে কলকাতার উল্লিখিত কমিউনিস্ট মতাদর্শবাদীদের যোগাযোগ হয়। এম. এ. জামান (কারখানা গ্রুপ)-এর মাধ্যমে সুধাংশু অধিকারীর সঙ্গে ঐ সময় একজন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতিনিধির সাক্ষাৎ হয়। তিনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কর্তৃক ভারতে প্রেরিত হয়েছিলেন ভারতের বিচ্ছিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপ গুলিকে মিলিত করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে এবং ভারতের তখনকার বিপুলাকার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের ও পার্টি-সংগঠনের কাজে সহায়তা দেওয়ার জন্য। ১৯২৮ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি যাতে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় সেটাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য।

১৯৩০-৩১ সালের মধ্যে ভারতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পক্ষ থেকে পর পর কয়েকজন প্রতিনিধি এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন 'হ্যারি, জি. লিণ্ড' ছদ্ম-নামে পাসপোর্ট নিয়ে আসেন। এই লিণ্ড কে ছিলেন? আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন নেতা আরল ব্রাউডার কি? তিনি বোম্বাই এসেছিলেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রেরিত প্রতিনিধি হয়ে। লিণ্ড-ই আরল ব্রাউডার ছিলেন কিনা তা এখনও সঠিক জানা যায় নি। আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের আগমন সম্বন্ধে পরের অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করব।

বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপের উদ্ভব

১৯৩০-৩১ সালে কলকাতায় কয়েকটি কমিউনিস্ট গ্রুপ গড়ে উঠেছিল। একটি গ্রুপ 'কারখানা' নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। পূর্বোক্ত জামানের সম্পাদনায় 'কারখানা' প্রকাশিত হতো। বিলাত থেকে সদ্য-প্রত্যাগত ব্যারিস্টার কিরণ বসাক, ডঃ বীরেশ গুহ ও নির্মল সেন প্রমুখের উদ্যোগে আর একটি কমিউনিস্ট গ্রুপ (বোধহয় ১৯৩১ সালে) সংগঠিত হয়েছিল। কলকাতার ছাত্র-যুবক ও কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী এই গ্রুপের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই গ্রুপ মার্কসীয় দর্শন, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত ক্লাস চালাত। কমরেড ভবানী সেন কিরণ বসাকদের গ্রুপের ক্লাসে নিয়মিত যোগ দিতেন। নীহারেন্দু দত্তমজুমদার ও তাঁর সহকর্মীরাও এই গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পরে ১৯৩২ সালে নীহারেন্দু দত্তমজুমদারের নেতৃত্বে কলকাতায় লেবার পার্টি

সংগঠিত হয়েছিল। ১৯৩৩-৩৪ সালে লেবার পার্টি পুনর্গঠিত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিল। এ সম্বন্ধে পরে অন্যত্র আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

তৃতীয় একটি গ্রুপ ১৯৩৩ সালে আব্দুল হালিম কর্তৃক পরিচালিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গণশক্তি'কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। কারখানা-গ্রুপের সঙ্গে অন্যান্য যারা যুক্ত ছিলেন তারা হলেন অবনী চৌধুরী, যতীন চৌধুরী, শচীন সিংহ, ধরমবীর সিংহ প্রমুখ। ভবানী সেন এক সময় এই 'কারখানা' পত্রিকায় ভিন্ন নামে প্রবন্ধাদি লিখতেন, এরূপ শোনা যায়। এই গ্রুপের সঙ্গে আব্দুল হালিমের কোনো সম্পর্ক ছিল না বলেই মনে হয়। তিনি এই গ্রুপ গঠনের সময় জেলে ছিলেন।

পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। 'কারখানা' সম্পাদক এম. এ. জামান ছিলেন ঢাকাস্থিত ঢাকেশ্বরী সুতাকলের একজন শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী। তিনি ১৯২৮ সালের শেষের দিকে কিম্বা ১৯২৯ সালের প্রথম দিকে কলকাতায় আসেন এবং ওয়ার্কাস্ এণ্ড পেজাণ্টস্ পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি পরে হাওড়ায় একটি সুতাকলে, সম্ভবত ঘুসড়ীর কোনো এক সুতাকলে কাজে নিযুক্ত হন। কমিউনিস্ট নেতৃবর্গের মীরাট মামলায় গ্রেপ্তারের পর ১৯২৯ সালের মধ্যভাগ থেকে তিনি শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে উঠেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে তার মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতা কমরেড় লিওের সঙ্গে সুধাংশু অধিকারীর পরিচয় ঘটে। কমরেড লিও কলকাতায় গোপনে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং কলকাতায় একটি কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন গড়ে তোলা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি কলকাতা ছাড়ার পূর্বে সুধাংশু অধিকারীকে বোম্বাইতে গিয়ে এক গোপন বৈঠকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করেন। বোম্বাই পৌঁছে কোথায় কি ভাবে কমরেড দেশপাণ্ডে ও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হবে সে-সম্পর্কে একটি গোপন ঠিকানা ও 'কোডওয়ার্ড' দিয়ে যান।

কমরেড লিওের প্রস্তাবানুসারে কলকাতায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একটি অস্থায়ী কমিটি বা নিউক্লিয়াস সংগঠিত হয়েছিল। এই কমিটিই পরবর্তী কালে কলকাতা কমিটি নামে পরিচিত হয়। যাদের নিয়ে এই অস্থায়ী কলকাতা কমিটি প্রথম সংগঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন সুধাংশু অধিকারী (ইয়ং কমরেডস লীগ) অবনী চৌধুরী, এম. এ. জামান (শ্রমিক), জগজ্জ্যোতি সরকার (ছাত্র) এবং নদীয়া জেলার একজন কৃষক (নাম জানা নেই)। বোম্বাইতে সংগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে দেশ পাণ্ডের

সুপারিশ ক্রমে সদাশিবম (ছদ্মনাম) নামে একজন কমরেডও এই কলকাতা কমিটিতে যুক্ত হয়েছিলেন। এই সদাশিবম কে ছিলেন তা অনুসন্ধান করে আমি আজও কিছু জানতে পারি নি। কলকাতা কমিটির সাংগঠনিক কার্যোপলক্ষে কমরেড দেশপাণ্ডে দু'তিন বার কলকাতায় আনাগোনা করেছিলেন, সুধাংশু অধিকারীর এক বিবৃতি থেকেই আমরা একথা জানতে পেরেছি। এইভাবেই ত্রিশের দশকে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো।

ভারতের অবক্ষয়ী পুঁজিবাদ ও বামপন্থা

কল্যাণ দত্ত

ভারতের অর্থনৈতিক সংকটের যে কুফলগুলি জনজীবনকে নিপীড়ন করছে তা হলো :

(১) ক্রমবর্ধমান বেকারী (২) শিল্পায়নের মন্থরগতি (৩) পণ্যমূল্য, বিশেষ করে কৃষিজাত পণ্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি (৪) তীব্র ধনবৈষম্য ও (৫) বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরতা। যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে এই সংকটের উৎপত্তি বামপন্থীরা তাকে এককথায় পুঁজিবাদ বলেন এবং এই পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে নিঃশেষ করার জন্য তাঁরা সংগ্রাম করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুঁজিবাদ আছে এবং তাদের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যও আছে। কিন্তু প্রত্যেক দেশের আবার কতকগুলি নিজস্ব ঐতিহাসিক স্বরূপ থাকে ; তার সঠিক বিশ্লেষণ না করলে পুঁজিবাদ-বিরোধী সংগ্রাম বিপথে চালিত হতে বাধ্য। ভারতীয় পুঁজি-বাদের স্বরূপ বিশ্লেষণে বামপন্থী চিন্তাবিদেরা যাতে অধিকতর যত্ন নেন তার জন্য এ প্রবন্ধের সূচনা।

পুঁজিবাদের ভিত্তি হলো বাজার-অর্থনীতি। এ সমাজের যা-কিছু উৎপন্ন দ্রব্য, এমন কি শিক্ষা-সংস্কৃতির অবদানগুলি পর্যন্ত বাজারে বিক্রি হয় ; বিক্রি না হলে সকল ক্রিয়াকলাপের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ। কৃষক উৎপাদন করে বাজারের জন্য ; বাজার না থাকলে কলকারখানা বন্ধ, শ্রমিক বেকার ; শিক্ষা, বিজ্ঞান ও চারুকলার চর্চা উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে যদি তার বিনিময়ে পয়সা না জোটে। বাজার-অর্থনীতির অনিবার্য ফলশ্রুতি প্রতিযোগিতা। কী করে বেশি পয়সা রোজগার করা যায় এজন্য আজ শুধু ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীতে নয়, কৃষকে কৃষকে, শ্রমিকে শ্রমিকে, বুদ্ধিজীবী বুদ্ধিজীবীতে গলাকাটা প্রতিযোগিতা চলছে। এরই ফলে সমাজের এক অংশ লাভবান হচ্ছে, অন্য অংশ তলিয়ে যাচ্ছে।

যখন অর্থনীতিতে বাজারের আধিপত্য ছিল না তখন প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতা ছিল সমাজের ধর্ম। যারা দরিদ্র, তারা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধবের আশ্রয়ে জীবিকানির্বাহের সুযোগ পেত। শ্রমশক্তির অপচয় নিশ্চয় ছিল, কেননা কোনো কাজ না করে অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকত সমাজের একটা বিরাট অংশ। কিন্তু বর্তমান অর্থে যাদের বেকার বলা হয়, সেই রকম বেকার তখন ছিল না। যারা অন্যের গলগ্রহ হয়ে বাস করত, আপাতদৃষ্টিতে তাদেরও কোনো না কোনো একটা কাজ থাকত, যেমন, সংসারের কাজে অথবা কৃষিকর্মে সাহায্য করা; ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গ যে ভিক্ষাবৃত্তি তাও একটা কাজ হিসাবে গণ্য হত। বাজার-অর্থনীতিতে শ্রম-শক্তির এই অপচয় প্রকট হয়ে পড়ে। পয়সার বিনিময়ে শ্রমশক্তি বিক্রি করতে না পারলে কোনো লোকই আজ বাঁচতে পারে না। সংসারে একটা লোককে ততদিনই আশ্রয় দেওয়া যায়, যতদিন সে কিছু না কিছু রোজগার করে। ফলে যারা ছিল প্রচ্ছন্ন বেকার, আজ তাদের বেকারি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। ১৯৭১ সালের আদমসুমারিতে দেখা যায় যে ভারতের প্রতিটি রাজ্যে বেকারের সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেছে। এর কারণ এই নয় যে আগে লোকে কাজ পেত, এখন পায় না। আগেও তারা ফলপ্রসূ কোনো কাজ করত না, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তাদের একটা "কাজ" ছিল। কিন্তু ঐ "কাজের" বাজারমূল্য না থাকায় আজ তারা বেকার। গ্রাম্য স্বয়ংভর অর্থ-নীতি বা natural economy ভেঙ্গে যাওয়ার ফলশ্রুতি হিসাবেই বেকারির তীব্রতা ধরা পড়ছে।

বাজার-অর্থনীতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যেমন নিঃস্ব ও বেকারের সংখ্যা বাড়ছে তেমনি সমাজের একটা অংশের হাতে পুঁজির পাহাড় জমছে। বাজারে একজনের ক্ষতি মানে অন্যের লাভ। এখন প্রশ্ন এই যে, এই পুঁজি কী ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দাদনে টাকা খাটালে সুদে তার বৃদ্ধি হয়, ব্যবসায়ে টাকা খাটালে তাতেও লাভ হয়। কিন্তু এই দু'ধরনের কাজে দেশের কোনো সম্পদ বৃদ্ধি হয় না; নতুন নতুন কলকারখানা তৈরি হয় না, কৃষিকর্মেরও প্রসার ঘটে না। এই সব কাজের ফলে একজনের ঘরের টাকা অন্যের ঘরে গিয়ে জমে। দেশের সম্পদ বৃদ্ধি না হলে উৎপাদনের উপকরণাদিও বাড়ে না; ফলে বেকারদের কাজও জোটে না। যদি পুঁজিপতিরা উৎপাদনের কাজে টাকা খাটাত, তা হলে দেশের সম্পদ বাড়ত, লোকের কাজ জুটত, পুঁজিপতি-

দের মুনাফাও বাড়ত। পুঁজি তাই তিন রকমের : কুসীদপুঁজি, বণিকপুঁজি ও শিল্পপুঁজি। প্রথম দুটিতে দেশের সম্পদ বাড়ে না, কিন্তু পুঁজিপতিদের লাভ হয়; তৃতীয়টিতে পুঁজিপতিদের লাভ ও দেশের সম্পদ দুই-ই বাড়ে।

ভারতীয় অর্থনীতিতে তিন ধরনের পুঁজিই সক্রিয়। এখানকার পুঁজিবাদের বিশেষ জটিলতা এই যে একই লোক বা একই গোষ্ঠী একই সঙ্গে কুসীদজীবী, বণিক ও শিল্পপতি। গ্রামে দেখা যাবে যে একই পরিবার উৎপাদনের কাজে টাকা খাটাচ্ছে, উৎপন্ন শস্য মজুত করে বাজার-দাম চড়িয়ে লাভ করছে আবার দাদন দিয়ে সুদ নিচ্ছে। শ্রমশিল্পে এই তিন ধরনের কাজের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে একটা ফারাক আছে। শিল্পপতি ধার দেয় না; শেয়ারবাজার ও ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ধার নেয়। তারা নিজেরা জিনিষ কেনাবেচা করে না, তার জন্য আছে ভিন্ন ভিন্ন এজেন্সী। কিন্তু ভারতীয় সমাজে যৌথ পরিবারের বাঁধন এমন শক্ত যে দেখা যায় যে এই তিন ধরনের কাজই এক একটি আত্মীয়-কুটুম্ব গোষ্ঠীর মধ্যে নিবদ্ধ। যিনি চটকলের মালিক, তাঁরই ভগ্নীপতি হয়তো পাট ও চট কেনা-বেচা করেন, আবার তাঁর ভাই হয়তো শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রণ করেন।

বিভিন্ন ধরনের পুঁজির একাত্মীকরণ দেখে কেউ যেন না ভাবেন যে এই তিন ধরনের পুঁজির মধ্যে কোনো অন্তর্বিরোধ নেই। যেমন, যারা পাটের ব্যবসায়ী তাদের লক্ষ্য কত চড়া দামে পাট বিক্রি করা যায়; পাটের দাম চড়া হলে চটকলের মালিকের ক্ষতি। আবার চটকলের মালিককে যেহেতু ধার নিতে হয় তাই সুদের হার চড়া হলেও তার ক্ষতি। বণিকপুঁজি ও কুসীদপুঁজি যত বাড়বে শিল্পপুঁজি ততই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভারতীয় সমাজে যৌথপরিবারের সংহতির জন্য এই অন্তর্বিরোধ চাপা আছে কিন্তু তার অস্তিত্ব লোপ পায় নি। আমাদের সমাজে যদি এমন একটা পরিবর্তন আসে যার ফলে পরিবারগত, ধর্মগত বা বর্ণ-গত ঐক্যে ফাটল ধরে তা হলেই এই তিন ধরনের পুঁজির অন্তর্বিরোধ প্রকট হয়ে পড়বে।

ভারতের এই তিন ধরনের পুঁজির একাত্মীকরণ দেখা যায় বড় বড় পুঁজিপতি গোষ্ঠীদের মধ্যে। যারা ছোট ও মাঝারি স্তরের পুঁজিপতি তাদের ক্ষেত্রে তিন ধরনের পুঁজির মিলনের চাইতে বিরোধটাই বেশি স্পষ্ট। ধনী কৃষক মুনাফার জন্য উৎপাদন করে। সার ও কৃষিযন্ত্রপাতি কেনা, মজুর লাগানো ইত্যাদি কাজের জন্য তাদের টাকার প্রয়োজন। প্রয়োজন যদি বেশি হয় তবে তাদের মহাজন অথবা ব্যাঙ্কের কাছে যেতে হয়। ধান ও পাট বিক্রি করতে

হয় ব্যাপারীদের কাছে। ধনী কৃষক ও শহরের ছোটোখাটো কলকারখানার মালিকদের পুঁজিকে শিল্পপুঁজি বলা হয়, কেননা এ পুঁজি উৎপাদনের কাজে লাগছে। এ পুঁজি কিন্তু ঘা খাচ্ছে কুসীদপুঁজি ও বণিকপুঁজির কাছে। ধনী কৃষক ও ছোটোখাটো কল্‌কারখানার মালিকেরা তাই স্বভাবতই দাবি করে সুদের হার ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানো হোক। এই শিল্প-পুঁজির মালিকেরা, যারা কুসীদপুঁজি ও বণিকপুঁজির সঙ্গে জড়িত নয়, তারাই ছিল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সমর্থক; এবং সেইজন্যই তারা নবকংগ্রেসেরও সমর্থক। কিন্তু এরা যদি দেখে যে সরকার কুসীদপুঁজি ও বণিকপুঁজির দৌরাত্ম্য খর্ব করতে পারছে না তখন এরাও ক্রমশ উৎপাদনের ক্ষেত্র ছেড়ে বণিকবৃত্তি বা কুসীদবৃত্তি অবলম্বন করবে। ধান বা গমের দর নির্দিষ্ট থাকলেও কৃষক লাভ করতে পারে যদি কম পড়তায় বেশি উৎপাদন করার সুযোগ তার থাকে। যদি তা না থাকে তখন সে চাইবে ধান ও গমের দর বাড়াতে। সরকারের উপর সে চাপ সৃষ্টি করবে দর বাড়ানোর জন্য, এবং তাতে সফল না হলে সে মজুতদারি করবে, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যব্যবস্থা বিকল করার চেষ্টা করবে। এগুলি বণিকবৃত্তির পরিচয়। সরকার যতই বণিকপুঁজি ও কুসীদপুঁজিকে খর্ব করতে ব্যর্থ হবে, শিল্পপুঁজি ততই সংকুচিত হয়ে অন্য ধরনের পুঁজিতে রূপান্তর গ্রহণ করবে।

এক কথায়, দেশে পুঁজিবাদ গড়ে উঠলেই যে কৃষি ও শিল্পের বিকাশ হবে সে কথা বলা যায় না। তিন ধরনের পুঁজির অন্তর্বিরোধ কত তীব্র এবং সে বিরোধে কোন্ ধরনের পুঁজির কী পরিমাণ শক্তি তারই উপর নির্ভর করে দেশের শিল্পায়ন ও উৎপাদন। আবার বিভিন্ন ধরণের পুঁজির পারস্পরিক সম্পর্ক ও আপেক্ষিক শক্তি শুধু অর্থনৈতিক কারণের উপর নির্ভর করে না। তা নির্ভর করে নানাবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির উপর। মার্কস বলেছেন:

"......The ruin of rich landowners by usury and spoliation of small producers leads to the formation and concentration of large money capitals. But to what extent this process does away with the old mode of production, as happened in modern Europe, and whether it places in its stead the capitalist mode of production, depends entirely upon the stage of historical development and the circumstances surrounding it".

গত দুশো বছর ধরে কুসীদপুঁজি ও বণিকপুঁজির শোষণে এদেশের সম্পত্তিবানেরা ব্যাপক ভাবে নিঃস্ব হয়েছে, কৃষক জমি হারিয়েছে, ছোটোখাটো কলকারখানা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, অল্প কিছু লোকের হাতে টাকার পাহাড় জমেছে। কিন্তু এর ফলে আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠে নি যেমন গড়ে উঠেছিল ইয়োরোপে। তার কারণ, এদেশের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি (যার মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উপাদানগুলিকেও ধরতে হবে) এখনও শিল্পপুঁজির অনুকূল হয় নি।

একথা বলা অবশ্যই ভুল হবে যে স্বাধীনতা পাওয়ার পরে গত পঁচিশ বছরে ভারতে শিল্পপুঁজির কোনো বিস্তার হয় নি। ভারত একটি বিশাল দেশ; এখানকার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিকও রাজনৈতিক বিবর্তনের গতিপ্রকৃতি এক নয়। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলের রাজ্যগুলিতে শিল্প-পুঁজির বিস্তার আপেক্ষিকভাবে বেশি; পূর্বাঞ্চলে বণিক ও কুসীদপুঁজির আধিপত্য। পঁচিশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটেছে যাতে শিল্পপুঁজি বিকাশের সহায়তা হয়েছে। আবার পরিস্থিতিতে এমন কতকগুলি উপাদান আছে যা বণিক ও কুসীদপুঁজির সহায়ক। ভারতে বর্তমানে এই তিন ধরনের পুঁজির অন্তর্বিরোধ চলছে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিল্পপুঁজির অগ্রগতি দেখা গেলেও বণিকপুঁজি ও কুসীদপুঁজির আধিপত্য এখনও শেষ হয় নি। এর প্রধান কারণ হলো, আমাদের দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ শেষোক্ত দুই ধরনের পুঁজিকে এখনও বাঁচিয়ে রাখছে।

কংগ্রেস সরকারের ভূমিসংস্কার নীতি গ্রামাঞ্চলে শিল্পপুঁজির ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করেছে। বিশেষ করে উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ধনী কৃষকদের হাতে প্রচুর পুঁজি জমেছে এবং এই পুঁজিকে উৎপাদনের কাজে লাগানোর প্রবণতা বেড়েছে। গম, তুলা ও আখের চাষ বহুল পরিমাণে বেড়েছে এবং কৃষিকর্মে যন্ত্র ও আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে কেউ যেন মনে না করেন যে ঐসব অঞ্চলে সাধারণ মানুষদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়েছে। বণিকপুঁজি ও কুসীদপুঁজির মতো শিল্পপুঁজির মুনাফাও আসে সাধারণ মানুষকে শোষণ করে, তাদের নিঃস্ব করে। মূল তফাৎটা হলো শিল্পপুঁজি মানুষকে মজুর হিসাবে খাটিয়ে শ্রমশিল্পের প্রসার ঘটায়; আর অন্য দুই ধরনের পুঁজি উৎপাদনব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটনায় না; এগুলি বৃহদায়তন উৎপাদনে বাধা দেয় এবং ছোটো উৎপাদকদের শোষণ করে উৎপাদিকা শক্তিকে খর্ব করে।

কৃষির ক্ষেত্রে শিল্পপুঁজির বিকাশ কিভাবে ঘটছে দেখা যাক। জমিদারি উচ্ছেদ, মহাজনী আইনের সংস্কার, সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ, কৃষিপণ্যের মূল্য-বৃদ্ধি—মূলত এই তিনটি কারণে কৃষিকর্ম আজ লাভজনক ব্যবসায় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই সুযোগ সকলে গ্রহণ করতে পারে না। যারা পারে, গ্রামের সেই ধনী কৃষক আজ প্রাণপণে চেষ্টা করছে কি করে চাষের জমি বাড়ানো যায়। তাদের যে জমিতে বর্গাচাষ হতো, সেখান থেকে বর্গাদারদের উচ্ছেদ করে তারা নিজ চাষে জমির পরিমাণ বাড়াচ্ছে। দেনার দায়ে গরিব চাষী জমি বিক্রি করে দিলে তারা সেই জমি কিনে নিচ্ছে। আবার খাজনার বিনিময়ে গরীব চাষীর জমি তারা লীজ নিচ্ছে। খামারের আয়তন বড় হওয়ায় তারা নিজে চাষ করছে না, মজুর লাগিয়ে চাষ করছে, ট্রাকটরও লাগাচ্ছে। এই প্রক্রিয়া ভারতের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে এবং দক্ষিণ অঞ্চলের কিছু কিছু রাজ্যে দেখা যায়। পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে অবস্থা অন্যরকম।

যেখানে কৃষিকর্মে শিল্পপুঁজির বিকাশ ঘটে নি, সেখানে কৃষকেরা উৎপাদন করে মূলত নিজেদের ভরণ-পোষণ চালানোর জন্য। মুনাফা বাড়ানোর তাগিদ সেখানে নেই। কৃষকেরা নিজেদের পরিবারের লোকদের দিয়েই জমি চাষ করে; সুতরাং বড় বড় খামার সেখানে বড় একটা দেখা যায় না। যাদের হাতে অনেক জমি, তারাও মজুর লাগিয়ে চাষ না করে, ছোট ছোট বর্গাদারদের মধ্যে জমি বিলি করে দেয়। ক্ষুদ্রায়তন কৃষিই কুসীদপুঁজি ও বণিকপুঁজির প্রধান আশ্রয়। মহাজন ও বণিক ধনীকৃষককে শোষণ করতে পারে না, তারা শোষণ করে গরিব কৃষককে। সুতরাং তারা সব সময়েই চেষ্টা করে ক্ষুদ্রায়তন কৃষি ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে। ২০ একরের চেয়ে বড় আয়তনের খামার যারা চাষ করে তাদের ধনী কৃষক বলা যেতে পারে। ১৯৬১-৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ধনী কৃষকেরা মোট জমির ৭ শতাংশ চাষ করত। অন্যদিকে, পাঞ্জাবের ধনী কৃষকেরা চাষ করত মোট জমির ৪১ শতাংশ। গুজরাত ও মহারাষ্ট্রে এই ধরনের চাষীরা মোট জমির ৫১ ও ৫৫ শতাংশ চাষ করত।

উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে শ্রমশিল্পের বিকাশ হয়েছে আপেক্ষিক দ্রুতগতিতে; পূর্বাঞ্চলের শিল্পগুলি মৃতপ্রায়। স্বাধীন ভারতের সরকার শিল্প-বিকাশের যেটুকু সুযোগ সৃষ্টি করেছেন, তার সবটুকুই প্রায় উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের শিল্পপতিরা গ্রহণ করেছে, কেননা সেখানকার পুঁজিওয়ালা লোকেরা শিল্পে পুঁজি খাটাতে চায়। পশ্চিমবাংলার পুঁজিপতিরা, যারা প্রায় সবাই অবাঙালী, তারা

এখানে কোটি কোটি টাকা ঢেলেছে নতুন শিল্প গড়ে তুলতে নয়, ইংরেজের তৈরী কলকারখানাগুলি কিনে নিতে। এই সমস্ত শিল্পগুলিকে আধুনিক করা বা বাড়ানোর দিকে তাদের কোনো ঝোঁক নেই। বরং ইংরেজদের একচেটিয়া মালিকানা লাভ করে কী করে চড়া দরে মাল বিক্রি করা যায় সেই দিকেই তাদের লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, যে পুঁজিপতি উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে পুঁজি খাটাচ্ছে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য, নতুন নতুন শিল্প গড়ার জন্য, পূর্বাঞ্চলে তারাই আবার উৎপাদন কমিয়ে, নতুন শিল্পের প্রসার বন্ধ করে দাম চড়িয়ে বণিক-মুনাফা লুটতে চাইছে।

উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে ছোট ও মাঝারি শিল্পের ব্যাপক প্রসার হয়েছে, ফলে শিল্পপুঁজির ভিত্তি সেখানে বিস্তৃত; পূর্বাঞ্চলে এই ধরনের শিল্প সংকুচিত হয়েছে। কৃষি ও শিল্পে শিল্পপুঁজির বিকাশ এক জায়গায় একরকম, অন্য জায়গায় আরেক রকম—এর ঐতিহাসিক কারণ বিশ্লেষণ করা বর্তমান লেখকের সাধ্যাতীত। তবে ঐতিহাসিক গবেষণার পক্ষে বিষয়টি নিশ্চয় অত্যন্ত মূল্যবান।

একটি কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে বিমাতৃ-সুলভ ব্যবহার করার জন্যই এ অঞ্চলে শিল্পবিস্তার ঘটে নি। কথাটি শস্তা রাজনীতির। পশ্চিমবাংলা ও বিহারে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের জন্য যত কোটি টাকা খরচ হয়েছে ভারতের অন্য কোনও অঞ্চলে তা হয় নি। দুর্গাপুর, হলদিয়া, বোকারো, রাঁচীর প্রকল্পের মতো একটি প্রকল্পও কি পাঞ্জাব পেয়েছে? অথচ অর্থনৈতিক মানচিত্রে পাঞ্জাবের স্থান কোথায় আর পশ্চিমবাংলা-বিহারের স্থানই বা কোথায়? লোকসভায় পশ্চিমবাংলা তথা পূর্বাঞ্চলের প্রতিনিধির যে সংখ্যা তা উত্তর বা পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ে কিছু কম নয়। তবে কেন নতুন নতুন শিল্পের লাইসেন্স এ অঞ্চলে না এসে অন্য অঞ্চলে যায়? আসল কথা, পূর্বাঞ্চলের পুঁজি-পতিদের বণিকবৃত্তি ও কুসীদবৃত্তির জন্যই এ অঞ্চলে শিল্পপুঁজি বিকাশ লাভ করছে না।

উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে শিল্পপুঁজির আপেক্ষিক বিকাশ ঘটেছে বলতে কেউ যেন মনে না করেন যে সেখানে বণিক ও কুসীদপুঁজির আধিপত্য নেই। সমগ্র ভারতে এখনও বণিক ও কুসীদজীবদেরই রাজত্ব চলছে। ঐতিহাসিক কারণেই আজ ভারতের পক্ষে ইংলণ্ড, আমেরিকা বা জাপানের মতো শিল্পসমৃদ্ধ পুঁজিবাদী দেশ হিসাবে গড়ে ওঠা অসম্ভব। ফলে এখানে পুঁজিপতিদের হাতে যত পুঁজি জমছে তা উৎপাদনের কাজে না লাগিয়ে মজুতদারি, ফাটকা-

বাজি ও তেজারতি কারবারে লাগানো হচ্ছে। ভারতের পুঁজিবাদ যে চূড়ান্ত রকমের প্রতিক্রিয়াশীল ও অবক্ষয়ী তা মূলত এই কারণে।

এখন দেখা যাক আমাদের দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি কি বণিকবৃত্তি ও কুসীদবৃত্তিকে পরিপোষণ করছে? আমাদের রাজনৈতিক চেতনায় বামপন্থী ঝোঁক ক্রমশ বাড়ছে এটা আমরা সকলেই জানি। কোটি কোটি মানুষ যখন বাজার-অর্থনীতির নিয়মে নিঃস্ব হয় তখন স্বভাবতই একটা পুঁজিবাদবিরোধী চেতনা শক্তিশালী হয়। কিন্তু এই চেতনার আদর্শগত ভিত্তি কি? কি ভাবে আমাদের বামপন্থীরা পুঁজিবাদকে খতম করতে চাইছেন? তাঁদের অর্থ নৈতিক-রাজনৈতিক কর্মসূচী কি? এইগুলি যদি পরীক্ষা করে দেখা যায় তবে আমরা দেখব বামপন্থীরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে বণিকপুঁজিরই পরিপোষণ করে চলেছেন। বামপন্থী বলতে এখানে শাসক কংগ্রেসকেও ধরা হচ্ছে, কেননা তাঁরাও দারিদ্র্য দূরীকরণের ও সমাজতন্ত্র গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কংগ্রেস ও অকংগ্রেস সকল বামপন্থীরাই পার্লামেণ্টারি রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তাঁদের কেউ কেউ মনে করেন পার্লামেণ্টারি পথেই সমাজতন্ত্র আসবে, কেউ বা তা মনে করেন না। কিন্তু সকলেই পার্লামেণ্টে নিজের আসন সংখ্যা বাড়িয়ে সরকার দখল করতে একান্ত ভাবে প্রয়াসী। ১৯৫১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত নির্বাচনের খরচ যে ভাবে বেড়েছে তাতে গরিব কোনো পার্টি যে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারি ক্ষমতা দখল করতে পারে না সে কথা না বললেও চলে। নির্বাচনী আইনে খরচের একটা উচ্চসীমা বেঁধে দেওয়া আছে। কিন্তু কোন দল তা মেনে চলে? আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পার্লামেণ্টের প্রথম দিনেই শপথ নেবার সময়ে যে মিথ্যা ভাষণ দিয়ে কাজ শুরু করেন তা হলো যে তাঁরা নির্বাচনের খরচের বিধিবদ্ধ উচ্চসীমা লঙ্ঘন করেন নি। এখন এই টাকা কোথা থেকে আসে? ছোট-বড় সব কোম্পানীই প্রায় সব পার্টিকেই সাহায্য করে থাকে। কিন্তু রসিদ নিয়ে যে সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে তার চেয়ে অনেক বেশী সাহায্য আসে কালো টাকায়। বণিক বৃত্তিতে যে কালো টাকার জন্ম সেই টাকার উপরই নির্ভর করছে আমাদের গণতন্ত্র ও নির্বাচন।

অবশ্যই বামপন্থীরা কালো টাকা বাজেয়াপ্ত করার কথা বলেন কিন্তু তাঁরা ভালো করেই জানেন যে এ সমাজে কালো টাকা বাজেয়াপ্ত করা যাবে না এবং টাকার মালিকেরাও জানেন যে তাঁদের ছাড়া নির্বাচন জেতা চলবে না। তাঁরা জানেন যে আজকালকার দিনে নির্বাচনী লড়াই এমন তীব্র যে জিততে হলে অন্তত

কয়েক হাজার ভলান্টিয়ার, কয়েক শো গাড়ী, প্রচারপত্র, সংবাদপত্র ইত্যাদি দরকার এবং তার জন্য কয়েক কোটি টাকার দরকার। এত কাঁচা টাকা শিল্পপতিদের হাতে থাকে না, থাকে কালোবাজারিদের হাতে।

নির্বাচনের খরচ কমানোর কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু এ প্রস্তাব বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তিগুলির অস্ত্রপ্রতিযোগিতা সীমিত করার মতোই অবাস্তব। নির্বাচনে নামলে জিততে হবে। আমি কালো টাকা না ছুঁলে আমার প্রতিপক্ষই শক্তিশালী হবে। অতএব সদিচ্ছা যতই থাকুক কালো টাকার উপর নির্ভরতা দূর হয় না।

বামপন্থীদের আর একটি কর্মসূচী হলো একচেটিয়া শিল্পকে খর্ব করা। মনোপলি কমিশন কয়েকটি শিল্পকে একচেটিয়া বলে চিহ্নিত করেছেন। তারা যাতে শিল্প বাড়াবার লাইসেন্স না পায় সেজন্য সকল বামপন্থীই একমত। কিন্তু এর ফলে কার্যত কি দাঁড়াচ্ছে? সেদিন পার্লামেন্টের প্রশ্নোত্তরে জানা গেল, পশ্চিমবঙ্গে সিমেণ্ট কারখানা স্থাপনের জন্য একচেটিয়া শিল্পপতিরা ছাড়া আর কেউই কোনো আগ্রহ দেখায় নি, অতএব এখানে সিমেণ্ট কারখানা খোলা গেল না। আজকাল যে কোনও কারখানা খুলতে গেলে এবং লাভজনক ভাবে চালাতে গেলে যে প্রারম্ভিক মূলধন দরকার হয় তা এত বিপুল যে ছোট বা মাঝারি পুঁজিপতিদের দ্বারা তা সম্ভব নয়। দুশো বছর আগেকার কৃৎকৌশল অবলম্বন করে যদি শিল্প গড়া হতো তবে হয়ত ছোট ও মাঝারি শিল্পপতিরা নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলতে পারতেন। যেমন আমরা যদি লাক্‌স্‌, সারফ ইত্যাদি গুঁড়ো সাবান ব্যবহার না করে গোলা সাবান ব্যবহার করতাম, সিগারেট ছেড়ে বিড়ি ধরতাম, টেরিলিন ছেড়ে খাদি পরতাম, সিমেণ্ট ব্যবহার না করে চূণ-সুরকীর বাড়ি করতাম তাহলে বড় বড় পুঁজিপতির প্রয়োজন হতো না। কিন্তু তা হবার নয়। অথচ আমরা বড় বড় শিল্পপতিদের লাইসেন্স দিতে চাইছি না। এই স্ববিরোধিতার দুটি ফল দাঁড়িয়েছে।

প্রথমত, বড় বড় পুঁজিপতিদের মধ্যে যাঁরা সত্য সত্যই উৎপাদন বাড়াতে চান ও নতুন শিল্প গড়তে চান তাঁরা সুযোগ পাচ্ছেন না। কিন্তু পুঁজিপতিদের টাকা ত বসে থাকবার নয়। মুনাফা অর্জন করার জন্য টাকাকে খাটাতেই হবে। সুতরাং সেই টাকা খাটছে বণিক-মুনাফা লোটার জন্য। উৎপাদনের স্বল্পতা সে সুযোগ করে দিচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, কোন শিল্প একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় পড়ে বা পড়ে না, তা বিচার করার ভার সম্পূর্ণত আমলাদের উপর। ব্যবসায় পরিচালনা ও

কোম্পানী আইনের জটিলতা এত বেশি যে সাধারণ মানুষ, কিংবা আইনসভার সদস্য ও মন্ত্রীদের পক্ষে এর বিচার করা সম্ভব নয়। সে সময় বা জ্ঞান তাঁদের নেই। আমলাদের পক্ষে এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বেশ কিছু কামিয়ে নিতে তাঁরা ছাড়বেন কেন? বড় বড় কোম্পানীগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র। লাইসেন্স জোগাড় করার জন্য লাখ লাখ টাকা তাঁরা খরচ করতে প্রস্তুত। অবশ্যই এই টাকা তাঁরা উঠিয়ে নেন তাঁদের এক-চেটিয়া ক্ষমতাকে বাড়িয়ে এবং ক্রেতাদের পকেট কেটে। ভারতে ক্রমশই আমলা-পুঁজির বৃদ্ধি হচ্ছে এবং তারই সঙ্গে বেড়ে উঠছে বণিকপুঁজি, যা দাম বাড়িয়ে মুনাফা উপায় করে।

একচেটিয়া পুঁজিকে খর্ব করতে গিয়ে বামপন্থীরা আমলাপুঁজি ও বণিক-পুঁজির প্রশ্রয় দিচ্ছেন। তার কারণ হলো, তাঁরা এই সত্যটি স্বীকার করতে চান না যে যতদিন বাজার-অর্থনীতি, শিল্পে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং বৃহদায়তন শিল্প থাকবে ততদিন একচেটিয়া শিল্পকে প্রতিরোধ করা যায় না। যদি বাজার-অর্থনীতি না থাকত তাহলে ক্রয়-বিক্রয়ের স্বাধীনতা থাকত না। তখন আমরা বলে দিতে পারতাম যে এমন জিনিস কেউ কিনতে বা বেচতে পারবে না যা তৈরি করতে হলে বৃহদায়তন শিল্পের প্রয়োজন হয়। তখন বড় বড় পুঁজিপতিও থাকত না। কিংবা যদি সমগ্র শিল্পব্যবস্থাই রাষ্ট্রায়ত্ত করা হতো তাহলেও একচেটিয়া পুঁজির অবসান হতো। এর কোনোটি না করে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ আইন করলে একচেটিয়া পুঁজি খর্ব হবে না, বরং আমলাপুঁজি ও বণিকপুঁজিই বৃদ্ধি পাবে।

বামপন্থী অর্থনৈতিক কর্মসূচীর আর একটি বিষয় হলো খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ জারি। উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলি থেকে ঘাটতি রাজ্যে অবাধে গম, চাল, ডাল, তৈলবীজ ইত্যাদি রপ্তানি করার বিরোধিতা তাঁরা করেন এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার এই সব পণ্যের চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণও জারি করেছেন। বামপন্থীদের যুক্তি হলো অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ দিলে নিত্যব্যবহার্য কৃষিপণ্য একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত হবে। এ যুক্তির সত্যতা মেনে নিলেও প্রশ্ন থাকে যে অন্তঃরাজ্য চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করার ফলে দেশের সাধারণ মানুষের কোনো উপকার হয়েছে কিনা। আমাদের দেশে মানুষের চলাচলের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের মানুষ যখন খুশি কলকাতা বা বোম্বাইতে যেতে পারেন, টাকা রোজগার করে দেশে পাঠাতে পারেন। কিন্তু তাঁদের খাদ্য তাঁদের দেশ

থেকে আনাতে পারেন না। ফলে বড় বড় শহরগুলিতে বা শিল্পে অগ্রসর রাজ্যগুলিতে খাদ্য ও কৃষিপণ্যের চাহিদা যেভাবে বেড়ে চলেছে, যোগান তার থেকে ক্রমশই কম হচ্ছে। এরই ফলে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্রে খাদ্যশস্য ও কৃষিপণ্যের অনেক বেশি দাম। দামের এই অসমতা বণিকবৃত্তির এক চরম সুযোগ কেননা শস্তায় কিনে চড়া দামে বিক্রি করাই বণিক মুনাফার উৎস। খাদ্যশস্য চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আছে বলে কেউ যেন মনে না করেন যে চোরাচালান হয় না। দামের অসমতা থাকলে চোরাচালান হবে, বণিকেরা বেশি মুনাফা লুটবে এবং তার সঙ্গে ভাগ পাবে আমলারা।

এ অবস্থার একমাত্র সমাধান সমগ্র দেশে খাদ্যশস্য ও কৃষিপণ্যের পাইকারি বাজার রাষ্ট্রায়ত্ত করা ও সমগ্রদেশে এক সুষম খাদ্যবণ্টন নীতি চালু করা। কিন্তু দেখা গেছে যে গমের পাইকারি ব্যবসায় যখন রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলো তখন কোনো বামপন্থী দলই প্রস্তুত ছিলেন না এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায়ের বিরোধীদের মোকাবিলা করতে। ফলে অন্যান্য পাইকারী বাজার রাষ্ট্রায়ত্ত হবে কিনা তা আজ গভীর সন্দেহের বিষয়।

বামপন্থীদের আরো একটি দাবি হলো গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলির জাতীয়করণ। এ দাবির পক্ষে যে সমস্ত যুক্তি আছে তা মেনে নিলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতের একটি বিশেষ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবেশে আমরা জাতীয়করণ করতে যাচ্ছি। আমাদের অর্থনীতির বিপুলতম অংশ কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্প। সেগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হচ্ছে না। ক্রয় বিক্রয়ের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হচ্ছে না। মুনাফাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার মূলেও ঘা দেওয়া হচ্ছে না। আয়বণ্টনের বিপুল বৈষম্যও বজায় থাকছে। এই অবস্থায় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলি কী করতে পারে? যে কোনও শিল্পের ম্যানেজার চাইবেন তার শিল্প যাতে লাভজনক হয় সে চেষ্টা করতে। তাঁরা এমন জিনিসই তৈরি করবেন যা বড়লোকেরা কিনতে পারে কেননা তাতেই তাঁদের লাভ। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে কিন্তু গরীব চাষী কী ঋণ পাবে? তাকে কম সুদে ঋণ দিতে হলে ব্যাঙ্ক ফেল করবে। হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্প যে হিমক্রীম তৈরি করছে তাতে দরিদ্রের অপুষ্টি কতখানি ঘুচছে? রাষ্ট্রায়ত্ত যন্ত্রশিল্পে যে সমস্ত কৃষিযন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে তাতে কতজন কৃষকের লাভ হচ্ছে? দেশের বিরাট অংশে যখন ক্রয়ক্ষমতার একান্ত অভাব তখন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিই বা কী ভাবে তাদের উৎপাদন বাড়াবে? উৎপাদন না বাড়ার ফলে এই ক্ষেত্রে

উৎপাদন ক্ষমতার বিপুল এক অংশ অব্যবহৃত থাকছে এবং তারই ফলে লোকসানের বিরাট অঙ্ক দেশবাসীর ঘাড়ে চাপছে।

জাতীয়করণের আরো একটি দিক দেখতে হবে। এখনও আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালনায় অভিজ্ঞ হয় নি। তাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগও দেওয়া হচ্ছে না। ফলে এই সকল ব্যবসায়ের মাথায় বসে রয়েছে আমলরা যাদের অনেকেই অপদার্থ এবং দুর্নীতি পরায়ণ। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের শীর্ষে বসার সুযোগ পেয়ে তাদের দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের ক্ষেত্র বহুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। উৎপাদন বাড়ুক বা না বাড়ুক, তাদের চাকুরি যাবে না। ফলে নির্বাধে তাদের লুণ্ঠনবৃত্তি চলতে থাকে।

বামপন্থীদের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর যে সমালোচনা এখানে করা হলো তার অর্থ মোটেই এই নয় যে আমরা গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জাতীয়করণ করার বিরোধী বা একচেটিয়া শিল্পকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী। পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র ভেঙ্গে দেওয়ার কথাও আমরা বলছি না। আমাদের বক্তব্য, একটি বিশেষ রাজনৈতিক চেতনা ও নীতিবোধ সৃষ্টি করতে না পারলে বামপন্থীদের এই কর্মসূচী বণিক ও আমলাদের শোষণ ও লুণ্ঠনকেই সাহায্য করবে। বর্তমানে আমাদের রাজনৈতিক চেতনা ও নীতিবোধ পার্লামেণ্টারি কোন্দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমরা নিজেদের বোঝাচ্ছি যে আমাদের দল ক্ষমতায় এলে তবেই সমাজবিপ্লব হবে। "ক্ষমতা' কথাটিকেও আমরা সংকীর্ণ অর্থে বুঝি। যে সমাজে বণিক ও আমলারাই প্রভু সেখানে তাদেরই সহযোগিতায় যে সরকারি ক্ষমতা পাওয়া যায়, আমরা তারই জন্য লড়ছি। নূতন রাজনৈতিক চেতনা ও নতন নীতিবোধের গোড়ার কথা হলো নূতন এক ক্ষমতার কেন্দ্র সৃষ্টি করা। জাতীয় আন্দোলনের এক পর্যায়ে গান্ধীজি এইরূপ একটি বিকল্প ক্ষমতার কেন্দ্র সৃষ্টি করেছিলেন যার বহিরাঙ্গিক ছিল লবণ সত্যাগ্রহ, চরকা কাটা ও আইন অমান্য। আজ এই বণিক সমাজের সমস্ত দুর্নীতি, জুয়াচুরি ও লুণ্ঠনকে আঘাত করবার জন্য প্রয়োজন এমন একটি ক্ষমতা কেন্দ্রের যার অবস্থিতি পার্লামেণ্টে নয়, সরকারী প্রশাসনে নয়, ট্রেড ইউনিয়নেও নয়। কিন্তু সেই কেন্দ্র টেনে আনবে লক্ষকোটি জনতাকে, যারা সংগঠিত ও অসংগঠিত, যারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভিন্ন ভাষাভাষী কিন্তু যারা উৎপীড়িত। বর্তমান ঘুনধরা সমাজের Super Structure-এ বসে একে আঘাত করা যায় না, আঘাত হানতে হবে বাইরে থেকে।

পশ্চিমবঙ্গে সফল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্বশর্ত

অজিতনারায়ণ বসু

আজকের অবস্থায় পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিম বাঙলাকে গড়ে তোলার জন্য তিনটি মূল লক্ষ্য থাকা উচিত। এগুলি হল : ১. গরিবী দূর করে মানুষে মানুষে আয়ের ফারাকটা কমানো ২. দ্রুত আয় বৃদ্ধি ৩. পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর উন্নয়ন ঘটিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে আয়ের ফারাকটা কমানো।

লক্ষ্য স্থিরীকৃত হবার পরের কাজ হল, কিভাবে ঐ লক্ষ্যের দিকে এগুনো যায় এবং আগামী পাঁচ বছরে কতটা এগুতে পারা যায় তা ঠিক করা।

পরিকল্পনার শুরু যখন লক্ষ্য স্থির করা নিয়ে, তখন এই আলোচনাও ঐ লক্ষ্য-গুলোকে কেন নেওয়া উচিত বলে মনে হচ্ছে তা দিয়েই শুরু করা যাক। প্রথম লক্ষ্য রাখা হয়েছে 'গরিবী দূর করা।' এটা শুধুমাত্র প্রথম লক্ষ্য নয়, এক দিক দিয়ে এটাকে মূল লক্ষ্যও বলা যেতে পারে ; কারণ এই লক্ষ্যের দিকে এগুতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত দেশের আয় এবং পিছিয়ে পড়া এলাকার আয় বাড়াতে হবেই, কারণ ঐ গরিবরাই দেশের অধিকাংশ এবং যে এলাকা যত পিছিয়ে পড়া, সেই এলাকার গরিবদের সংখ্যার অনুপাতও তত বেশি।

আমাদের মতো দেশে গরিবী হটানো মানে ক্ষুধাকে দূর করা। ঐ ক্ষুধাকে দূর করার মতো ক্ষমতা এতদিন আমাদের ছিল না—যদিও যে খাবার এতদিন দেশে ছিল তা সবাই সমানভাবে ভাগ করে খেলে, এবং সেই রকম ভাবেই খাওয়া উচিত ছিল, ঐ ক্ষুধার যন্ত্রণাটা দেশের অধিকাংশ লোকের অনেকখানিই কমত। অর্থাৎ, এতদিন পর্যন্ত সম্ভব ছিল এবং উচিত ছিল ঐ ক্ষুধার সমবণ্টন। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান এবং টেকনলজির অগ্রগতির ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িয়ে ক্ষুধাকে সম্পূর্ণভাবে দূর করা আজ এত বেশি সম্ভবপর হয়ে উঠেছে যে

সেই সম্ভাবনাকে কাজে না লাগানোটাই এখন প্রচণ্ড অপরাধমূলক কাজ হয়ে দাঁড়াবে। এতদিন পর্যন্ত ভারতে গড়পড়তা মাথা পিছু দৈনিক ৪৫০ থেকে ৪৮০ গ্রাম খাদ্যশস্য যোগান দিতেও দুনিয়ার বড়লোক দেশগুলোর দরজায় আমাদের ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়াতে হতো। এই প্রসঙ্গে ঐ মাথা পিছু গড়ে দৈনিক ৪৫ থেকে ৪৮০ গ্রাম খাদ্যশস্য—যা আমরা এতদিন খেয়ে আসছি, সেইটাই আমাদের গড়পড়তা **দরকার** বলে যে একটা বহুপ্রচলিত মত আছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এ কথাটা নিশ্চয়ই ঠিক যে উপরের দিকের শতকরা হয়তো বা ১০ ভাগ লোকের ওর থেকে অনেক কম খাদ্যশস্য পেলেও হয়, কারণ তাঁরা খাদ্যশস্যের সঙ্গে দুধ, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি অন্যান্য আরও অনেক খাবার গ্রহণ করেন। কিন্তু ভূমিহীন ক্ষেত মজুর, গরিব চাষী এবং শহরের আনাচে-কানাচে বস্তিতে-রাস্তায় থাকা বহু লক্ষ শহুরে গরিব বছরের অধিকাংশ দিনই ঐ গড়পড়তা মাথা পিছু ৪৫০ গ্রাম খাদ্যশস্য পান না। এঁদের যদি আয় বাড়ে তবে তার সর্বপ্রথম প্রকাশ হবে তাঁদের পেট ভরে ভাত-রুটি খাবার মধ্যে—এই আয়টা আরও অনেক বেশি বাড়লে তাঁরা নিশ্চয়ই তখন ভাত-রুটি কম খেয়ে দুধ-মাছ-মাংস খেতে শুরু করবেন। আগামী পাঁচ-সাত বছরে এঁদের যে-আয় বাড়ানো সম্ভব তাতে সকলের পেট ভরে ভাত-রুটি খাবার কথাই ধরা হয়েছে। এখন প্রশ্ন এই যে এতদিন যখন দেশের শতকরা ৪০ থেকে শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ অনেক সময়ে অনাহারে অর্ধাহারে থেকেছে, তখনও ভারতে গড়পড়তা মাথা পিছু দৈনিক খাদ্যশস্য খাওয়া হয়েছে ৪৫০ থেকে ৪৮০ গ্রাম; আর আজ যদি ঐ ক্ষুধার্ত মানুষগুলি ক্ষুধার অন্ন পায় তবে ঐ গড়পড়তা মাথা পিছু খাদ্যশস্যের যোগান কি অনেকখানি বেশি লাগবে না? এ ছাড়া আয আরও অনেক বেশি বাড়লে যখন সবাই দুধ-মাংস খেতে শুরু করবে তখনও খাদ্য-শস্য বৃদ্ধির প্রয়োজন যথেষ্টই থাকবে, কারণ দুধ-মাংস পাবার ফলে কম ভাত-রুটি খেলেও বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্য লাগবে গরু-শুয়োর মুরগি ইত্যাদিকে খাওয়াবার জন্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে দুনিয়ার যেসব দেশগুলোকে অগ্রসর বা বড়লোক দেশ বলা হয় সেই সব দেশের মোট খাদ্যশস্যের শতকরা ৭০ ভাগ বা তারও বেশি খায় গরু-মুরগি ইত্যাদি পশুতে যাতে সেখানকার লোক পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ-মাংস খেতে পারে। কাজেই শুধুমাত্র পেটভরে ভাত-রুটি খাবার জন্য বর্তমানে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য লাগবে, পরবর্তী সময়ে আয় আরও বাড়লে যখন লোকে মাংস-দুধ ইত্যাদি খাবে, তখন মোট খাদ্যশস্যের চাহিদা আরও

অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে। এই সমস্ত কথা বিবেচনা করে আগামী পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য মাথা পিছু গড়পড়তা দৈনিক খাদ্যশস্যের প্রয়োজন ৪৫০ গ্রামের পরিবর্তে ৬০০ গ্রাম ধরা হয়েছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের লোক সংখ্যা হবে ৫২০ লক্ষ। এদের সকলকে যদি গড়ে দৈনিক মাথাপিছু ৬০০ গ্রাম খাদ্যশস্য যোগান দিতে হয় তবে মোট খাদ্যশস্য লাগবে বছরে ১৩০ লক্ষ মে. টন। এই হিসাবের মধ্যে উৎপাদনের শতকরা ১২.৫ ভাগ বীজ ইত্যাদিতে যে খরচ হবে সেটাও ধরা হয়েছে।

ক্ষুধার্তের ক্ষুধা দূর করার ব্যাপারে যদি পশ্চিমবঙ্গকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হয় তবে খাদ্যের উৎপাদন ১৯৭৩-৭৪ সালে আনুমানিক ৮০ লক্ষ মে. টন থেকে ১৯৭৯-৮০ সালে ১৩০ লক্ষ মে. টন হতে হবে।

এই উৎপাদনটা করতে পারা তাই গরিবী দূর করার বাস্তব ভিত্তি এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উৎপাদনগত দিক থেকে কেন্দ্রীয় লক্ষ্য থাকা উচিত বছরে ১৩০ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন করা।

সব থেকে সহজে বা সব চেয়ে কম খরচে এই বাড়তি ৫০ লক্ষ মে. টন খাদ্য কি করে উৎপাদন করা যায় এটাই হচ্ছে পরিকল্পনার দ্বিতীয় মূল সমস্যা। ১৯৭০-৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মোট আবাদি জমি ১৩৮ লক্ষ একরের প্রায় ১১০ লক্ষ নীট একর জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ হতো এবং মোট উৎপাদন ছিল প্রায় ৭৫ লক্ষ মে. টন অর্থাৎ গড়ে নীট একরে প্রায় ৭ কুইণ্টাল। এই ১১০ লক্ষ নীট একর জমিতে যদি ১৩০ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হয় তবে একর পিছু উৎপাদন হওয়া দরকার প্রায় ১.২ মে. টন, অর্থাৎ বর্তমান অবস্থার তুলনায় আগামী পাঁচ বছরে একর পিছু উৎপাদন বাড়ানো দরকার শতকরা ৭০ ভাগ। ১৯৭০-৭১ সালের আগের পনের বছরে একর পিছু গড় উৎপাদন বেড়েছে শতকরা মাত্র ২২ ভাগ। এর তিন ভাগের এক ভাগ সময়ে এর তিন গুণেরও বেশি হারে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা আজ যে ভাবা যাচ্ছে এবং তার জন্য পরিকল্পনাও যে করা যাচ্ছে তা সম্ভব হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান ও টেকনলজির অসামান্য অগ্রগতির ফলে। কিন্তু এদের অগ্রগতিটাই একমাত্র কথা নয়। এই অগ্রগতিকে মানুষের সুস্থ সুন্দর জীবনযাত্রার কাজে লাগাতে পারাটাই প্রধান কর্তব্যকর্ম।

বিজ্ঞান ও টেকনলজির অগ্রগতির ফলে যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাকে কাজে লাগাবার পথে সবচেয়ে বড় ত্রুটি বাধা হলো চলতি সামাজিক-অর্থনৈতিক

কাঠামো এবং অনেকাংশে এই কাঠামোরই অন্যতম প্রকাশ—বর্তমানের শিল্প-ব্যবস্থা। বিজ্ঞানের সৃষ্ট সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে গেলে যে বর্তমানে চালু কাঠামোটার এবং সেই সঙ্গে কৃষি ও শিল্প-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন একান্ত দরকার—এই উপলব্ধি এবং সেই অনুযায়ী কার্যক্রম নির্দিষ্ট করা আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত।

কৃষিক্ষেত্রে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা আজ বিজ্ঞান আমাদের দরজায় হাজির করেছে তাকে কাজে লাগানো সম্ভব নয়—(১) যদি মহাজনের কাছে দেনাগ্রস্ত কৃষককে ঐ মহাজনের কাছ থেকে শতকরা ৭৫/১০০ ভাগ বা তার থেকেও বেশি হারে সুদ দিয়ে টাকা ধার করে আধুনিকীকরণের খরচ যোগাতে হয়; (২) যদি ঐ কৃষককে ভাগচাষী হিসাবে উৎপন্ন দ্রব্যের শতকরা ৫০ ভাগ জমির মালিককে দিয়ে দিতে হয়; (৩) যদি বাজার আজকের মতো কতগুলি ফাটকাবাজদের কবলে থাকে; (৪) যদি শিল্প বলতে বোঝায় প্রধানত পাট-শিল্প, রেলওয়ে ওয়াগন-কেন্দ্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ইত্যাদি এবং এই শিল্পকে যোগান দেবার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ; (৫) যদি শহর বলতে বোঝায় কলকাতার মতো একটা আধা-ঔপনিবেশিক পরগাছা, যার কৃষককে দেবার কিছু নেই কিন্তু যে বেঁচে আছে ঐ কৃষককের শেষ রক্তবিন্দুকে শোষণের ওপর ভিত্তি করে।

কাজেই গরিবী হটানোর সমস্যা, বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে শুধুমাত্র কিছু পাম্প, টিউবওয়েল, সার, ভালো বীজ ইত্যাদি সরবরাহের সমস্যা নয়; প্রধান সমস্যা হলো কি ভাবে চলতি সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোটাকেই পরিবর্তিত করা যায়।

এতদিন পর্যন্ত পরিকল্পনা বলতে আমরা বুঝে এসেছি প্রধানত রাস্তা-ঘাট, যানবাহনের উন্নতি, বিদ্যুৎ সরবরাহ, শিল্পের জন্য কিছু মূল কাঁচামালের (লোহা, ইস্পাত ইত্যাদি) যোগান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। মৌলিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাতে প্রধানত কোনো রকমে হস্তক্ষেপ না করে সেই ব্যবস্থার ঐসব বহিরঙ্গ (infrastructure)-কে জোরদার করাই ছিল আমাদের এতদিনকার পরিকল্পনার মূল কাজ। বহিরঙ্গ যে কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত, বহিরঙ্গ জোরদার হলে সেই কাঠামোই জোরদার হয়। এখানে ওখানে অল্প কিছু প্রগতিশীল কাজ করা সত্ত্বেও এবং অনেক বেশি পরিমাণে নানারকম প্রগতিশীল বক্তৃতা বা ঘোষণা সত্ত্বেও গত ২২ বছরের পরিকল্পনার ফলে মূলত লাভবান হয়েছে ব্যবসাকেন্দ্রিক শহুরে একচেটিয়া মালিকরা ও অনেকাংশে তাদের সঙ্গে যুক্ত দেশব্যাপী মহাজন,

ফাটকাবাজ এবং কৃষিজমির আরও ছোট হয়ে আসা মুষ্টিমেয় মালিকগোষ্ঠি, অর্থাৎ- পরিকল্পনার শুরুতে যে অর্থনৈতিক কাঠামো আমাদের ছিল—সেই কাঠামো যাদের স্বার্থে রচিত ছিল তারাই পরিকল্পনার ফলে জোরদার হয়েছে এবং ঔপনিবেশিক আমলের নগ্ন শোষণের বোঝা যাদের পঙ্গু করে রেখেছিল, আজও তারা প্রায় একই রকম পঙ্গু হয়ে আছে। ফলে পরিকল্পনার শুরুতে ১৯৫১ সালে ভারতবর্ষে যত লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে ছিল, পরিকল্পনার ২০ বছর পরেও ঠিক তত লোকই দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়েছে।

ঐ ধরনের পরিকল্পনা করা ঠিক হয়েছে কি ভুল হয়েছে, বা ঐ ধরনের পরিকল্পনা তৎকালীন অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী ছিল কি না—এ জাতীয় কোনো বিতর্কের মধ্যে না ঢুকেও এ কথাটা আজ বলা যায় যে, আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য গরিবী হটানোকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে চলতি সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোটাকেই পরিবর্তিত করতে হবে, এবং পরিবর্তিত কাঠামোকে জোরদার করার জন্য তার প্রয়োজনীয় বহিরঙ্গ সৃষ্টি করতে হবে। আজ সমস্যাটা যে দু-চারটে ভালো স্কীম, দু-চারটে ভালো আইন তৈরি করা বা দু-চার জন 'ভালো লোক'কে উচ্চপদে বসানো নয়, সমস্যাটা যে সামাজিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তনের—এটা খুব সহজেই প্রকাশ হয়ে পড়ে কৃষি আধুনিকীকরণের আজকের প্রত্যক্ষ সমস্যাটা আলোচনা করতে গেলে। আলোচনার সুবিধার জন্য নিম্ন-লিখিত ছকে চলতি এবং আধুনিক এই দুই উৎপাদন পদ্ধতিতে, ছোটো মালিক-চাষী এবং ভাগচাষী এই দুই ধরনের উৎপাদন সম্পর্কে কিভাবে একর পিছু উৎপাদনের খরচ এবং আয় বাড়ে-কমে তার একটা মোটামুটি গড়পড়তা ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই আয়-ব্যয়ের হিসাবটাকে ছোটো মালিক-চাষী এবং ভাগচাষীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে ; তাই দেনার জন্য সুদ এবং ভাগচাষীর ক্ষেত্রে মালিককে দেয় ফসলের ভাগ বা খাজনাকে খরচ হিসাবে দেখানো হয়েছে, কিন্তু শ্রমের জন্য যে খরচ তাকে আয় হিসাবে দেখানো হয়েছে, কারণ এটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে ছোট মালিক বা ভাগচাষী নিজে এবং নিজের পরিবারের লোক দিয়ে জমি চাষ করায়। এটাও ধরে নেওয়া হয়েছে যে চলতি পদ্ধতিতে এই দুই রকমের চাষীকেই মহাজনের কাছ থেকে বছরে ৭৫% সুদের হারে টাকা ধার করতে হয় এবং ভাগচাষীকে ফসলের অর্ধেক মালিককে খাজনা হিসাবে দিতে হয়। এই ধরনের সুদ এবং খাজনা দিয়ে আধুনিক চাষের পদ্ধতিতে কি ব্যবস্থা দাঁড়ায় এবং তারই সঙ্গে যদি ব্যাঙ্কের

কাছ থেকে ১০·৫% হারে টাকা ধার পাওয়া যায় এবং ভাগচাষীর খাজনা যদি অন্তত বর্তমান আইন-মাফিক ফসলের ২৫%-এ নামিয়ে আনা যায় তাহলে কি অবস্থা হয় তাও দেখানো হয়েছে। শ্রম থেকে আয়ের ব্যাপারে ধরে নেওয়া হয়েছে যে চলতি পদ্ধতিতে দৈনিক মজুরি ৩ টাকা এবং আধুনিক পদ্ধতিতে এটা ৫ টাকা। এটাও ধরে নেওয়া হয়েছে যে চলতি পদ্ধতিতে চাষের জন্য একর পিছু ৪০ টাকা দেনা করতে হয় এবং এর পরিমাণটা আধুনিক পদ্ধতিতে ১৭০০ টাকা, যার ৬০০ টাকা বাৎসরিক ধার এবং ১১০০ টাকা দীর্ঘমেয়াদী ধার। এটাও ধরে নেওয়া হয়েছে যে বর্তমানে চালের হিসাবে একর পিছু উৎপাদন ৫ কুইন্টাল এবং আধুনিক পদ্ধতিতে এটা ২৪ কুইন্টাল এবং চালের দাম কুইন্টাল পিছু ১২৫ টাকা। এই ছকের মধ্যে শহরের একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে যুক্ত ফাটকাবাজ ব্যবসাদারদের বাজারের ওপর কর্তৃত্ব থাকার ফলে কি ভাবে ছোটো চাষীরা বঞ্চিত হয় তার হিসাব ধরা হয় নি—এটা ধরলে যে-চিত্র এ ছকে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠত। [ছকটি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

এই ছকের একর পিছু মোট আয়ের লাইনের ('গ' লাইন) দিকে তাকালে এ বিষয়গুলো সহজেই বোঝা যাবে : (১) উৎপাদনের খরচ এবং এর থেকে আয় একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়, উৎপাদন পদ্ধতি এবং উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে এটা অনেকখানি বেশি বাড়ে-কমে। (২) মহাজনের কাছ থেকে ধার নিয়ে এবং ভাগচাষীর ক্ষেত্রে ফসলের অর্ধেক মালিককে দিয়ে, আধুনিক পদ্ধতিতে ছোটো চাষী এবং ভাগচাষীর একর পিছু আয়, চলতি পদ্ধতিতে অনেক কম উৎপাদন সত্ত্বেও যে আয় হয় তার থেকেও অনেক কম। আসলে ভাগচাষীর পক্ষে আধুনিক পদ্ধতিতে ঐভাবে উৎপাদন করতে গেলে তার আয়ের থেকে খরচ অনেক বেশি হবে। অর্থাৎ, চলতি উৎপাদন সম্পর্ক বজায় রেখে আধুনিকীকরণ করতে গেলে সেই প্রচেষ্টায় ছোটো মালিক-চাষী বা ভাগচাষী কেউই চাষী হিসাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। (৩) যদি মহাজনী প্রথার বিলোপ করে কম সুদে ধার দেবার ব্যবস্থা করা যায় এবং ভাগচাষীর খাজনার বোঝা অন্তত বর্তমানের আইনমাফিক (ফসলের ২৫%) করা যায়, তবে এই দুই ধরনের চাষীরই বর্তমানে একর পিছু যে আয় হয়, তার তুলনায় আধুনিক পদ্ধতিতে আয় দু-তিন গুণেরও বেশি হওয়া সম্ভব।

ওপরে যে বিষয়গুলি বলা হল তাই নিয়ে সূক্ষ্মতর ও দীর্ঘতর আরও অনেক আলোচনা নিশ্চয়ই দরকার, কিন্তু এই আলোচনায় যেটা মোদ্দা কথা অর্থাৎ

বিভিন্ন ধরনের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় চলতি পদ্ধতি এবং আধুনিক পদ্ধতি থেকে একর পিছু গড়পড়তা মোটামুটি আয়-ব্যয়—[১৯৭১ সালের মূল্যমানে]

আয়-ব্যয়ের দফা	চলতি কৃষিপদ্ধতি		আধুনিক কৃষিপদ্ধতি			
	ভাগচাষী	মালিক-চাষী	ভাগচাষী		মালিক-চাষী	
			(১)	(২)	(১)	(২)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক। শস্যের বিক্রয় মূল্য	৬২৫	৬২৫	৩০০০	৩০০০	৩০০০	৩০০০
খ। উৎপাদনের খরচ						
১। বীজ, সার, বিদ্যুৎ ইত্যাদি	৫০	৫০	১০৫০	১০৫০	১০৫০	১০৫০
২। ধার শোধের জন্য বাৎসরিক দেয়—						
* মহাজনী প্রথায়	৩০	৩০	১৭০০	×	১৭০০	×
* ব্যাঙ্কের প্রথায়	×	×	×	২৮৫	×	২৮৫
৩। জমির মালিককে দেয় খাজনা	৩১২	×	১৫০০	৭৫০	×	×
৪। পাম্প ইত্যাদি মেরামত	×	×	৫০	৫০	৫০	৫০
৫। অন্যান্য	×	×	×	১১৫	×	১১৫
খ। মোট উৎপাদন খরচ	৩৯২	৮০	৪৩০০	২২৫০	২৮০০	১৫০০
গ। একর পিছু মোট আয় [ক — খ]	২২৩	৫৪৫	—১৩০০	৭৫০	২০০	১৫০০
১। শ্রম থেকে আয়	২৫২	২৫২	৮৭৫	৮৭৫	৮৭৫	৮৭৫
২। মালিকানা' থেকে আয়	—২৯	২৯৩	—২১৭৫	—১২৫	—৬৭৫	৬২৫

কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান আজ উৎপাদন বৃদ্ধির যে বৈপ্লবিক সম্ভাবনা হাজির করেছে তাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে বর্তমানের সামাজিক—অর্থ নৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন দরকার—এই কথাটাকে বোঝাবার জন্য হয়তো আর বেশি আলোচনার দরকার নেই।

ঐ মোদ্দা কথাটা বুঝে পরিকল্পনা শুরু করলে তার সর্বপ্রধান কাজ হয়—এতদিনকার মতো কিছু বহিরঙ্গ (infrastructure) তৈরি করা নয়, বরং এই সব বহিরঙ্গ যে সমাজকাঠামোকে জিইয়ে রেখেছিল এবং আরও শক্তিশালী করতে চেষ্টা করছিল, সেই সমাজকাঠামোকেই পরিবর্তন করা। তাই আগের চারটে পরিকল্পনার তুলনায় আগামী পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে গুণগতভাবে আলাদা একটা পরিকল্পনা হতে হবে।

সমাজপরিবর্তন যখন কোনও পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে তখন পরিকল্পনাটা একটা গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। এই অর্থে আগামী পরিকল্পনার রূপায়ণ এবং বাস্তবে কার্যকরী করা—এর কোনোটাই গণ-আন্দোলনকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। সমাজকাঠামো পরিবর্তনের এই গণ-আন্দোলন আইনসংগত রাখতে গেলে তার জন্য একদিকে দরকার গণ-স্বার্থের দিকে নজর রেখে বর্তমানের আইনের কাঠামোটা ঢেলে সাজানো এবং অন্যদিকে এই নতুন আইনে যারা লাভবান হবে তাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলা যাতে তারা ঐ নতুন ধরনের আইনকে বাস্তবে কার্যকরী করতে পারে। এরই সঙ্গে প্রয়োজন সমস্ত শাসনযন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংস্কার করা যাতে তারা বিনা দ্বিধায় গরিব চাষীর এবং এই রকম অন্যদের আইনসঙ্গত আন্দোলনের পাশে তাদের শরিক হিসাবে দাঁড়াতে পারে।

গরিবী হটানোর মূল লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য দরকার দ্রুত কৃষি-উন্নতি এবং কৃষির এই দ্রুত উন্নতি সম্ভব হবে না যদি না শিল্পের বর্তমান কাঠামোটা সম্পূর্ণ ভাবে পাল্টে যাতে কৃষিকে সাহায্য করতে পারে সেই দিকে নজর দিয়ে নতুন শিল্পব্যবস্থা সৃষ্টি করতে না পারা যায়। খেয়াল রাখা দরকার যে বর্তমানে যে ধরনের শিল্প এবং শহর আমাদের আছে তার বেঁচে থাকবার পূর্ব শর্ত হল অধিকাংশ চাষীর ক্ষুধার্ত থাকা। শহর বর্তমানে গ্রামকে প্রায় কোনো দ্রব্যসামগ্রীই দেয় না, কিন্তু তাকে গ্রাম থেকে শিল্পের জন্য কাঁচামাল (পাট, তুলা, তৈলবীজ ইত্যাদি) এবং শহরের সব লোকের জন্য খাদ্যশস্য আনতে হয়। আমাদের কৃষিতে এখন একর পিছু যে উৎপাদন হয় তা বজায় রেখে যদি গ্রামের সব

মানুষকে এবং চাষীকে পেট ভরে খেতে দেবার ব্যবস্থা করা যায়, তবে শহরের লোকের জন্য গ্রাম থেকে এক কণা খাবারও উদ্বৃত্ত হয়ে আসবে না—শহরের লোককে খাওয়াবার জন্য, শহরের শিল্প বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রায় ২ কোটি টন খাদ্যদ্রব্য এবং এ ছাড়া পাট ইত্যাদি অন্যান্য কাঁচামাল বিদেশ থেকে ভারতে আমদানী করতে হবে, যার ক্ষমতা আমাদের নেই। কাজেই মহাজনী, ভাগচাষী প্রথা যা কৃষককে বাধ্য করে নিজেকে ক্ষুধার্ত রেখেও তার উৎপন্নের একটা বড় অংশকে মহাজন-জোতদারের হাতে তুলে দিতে, কৃষকের ঐ ক্ষুধার অন্নই মহাজনী ইত্যাদি প্রথার মাধ্যমে গ্রামে 'উদ্বৃত্ত' হয়ে শহরে আসে তার পরগাছা সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে। কিন্তু এই অবস্থার আজ মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব। আজ যদি শহর থেকে প্রয়োজন মতো টিউবওয়েল, পাম্প, পাইপ, সার, ওষুধ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি গ্রামকে সরবরাহ করা যায় এবং গ্রামের মানুষ যদি তার সমাজকাঠামোটাকে বদলে ঐসব সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারে তবে কৃষিতে এখনকার তুলনায় তিন-চার গুণ বেশি উৎপাদন হবে। তখন সমস্ত কৃষক এবং গ্রামের লোককে পেটভরে খাইয়েও যথেষ্ট সত্যিকারের উদ্বৃত্ত থাকবে এবং শহরের লোক গ্রামের কৃষির প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে তার নিজের প্রয়োজনের জন্য গ্রামের ঐ উদ্বৃত্ত খাবার ও শিল্পের কাঁচামাল শহরে নিয়ে আসতে পারবে। অর্থাৎ, কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উৎপাদন সম্পর্কে যে বনিয়াদি পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে তা সফল করার একটা পূর্বশর্ত হল আমাদের এখনকার শহরের আধা-ঔপনিবেশিক পরগাছা চরিত্রের আমূল পরিবর্তন করে নিজের শিল্পোদ্যমকে, শিক্ষাব্যবস্থাকে এমন ভাবে পুনর্গঠিত করা যাতে সে কৃষিকে সাহায্য করার মাধ্যমে নিজের উৎপাদনের ভিত্তিতেই স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে।

কাজেই, আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামের জন্য, কৃষির জন্য যে পরিকল্পনা নেওয়া উচিত বলে আগে বলা হয়েছে, তারই একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল শহরের অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন। এই দিকে দৃষ্টি না দিয়ে এখন অবশ্য কলকাতা অঞ্চলের শহরগুলোকে 'আশু বিপদ থেকে উদ্ধার করার' নামে জলের পাইপ, রাস্তা, পাতাল রেল, নদীর ওপর পুল ইত্যাদি শুধুমাত্র বহিরঙ্গ সৃষ্টির মধ্যে শহরের উন্নয়নমূলক কাজকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। আগামী পরিকল্পনায় এর মৌলিক পরিবর্তন হওয়া দরকার। শহরের সমস্ত অর্থনীতিটাকে কিভাবে পাল্টানো শুরু করা যায় এবং এই পাল্টানোর জন্য কি কি বহিরঙ্গ

দরকার—এই কথা মাথায় রেখে শহরাঞ্চলের জন্য নতুন ধরনের পরিকল্পনা করতে হবে।

আধুনিক প্রথায় চাষের দুটি প্রধান পূর্বশর্ত—একটি হল সামাজিক-অর্থ নৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং অন্যটি হল আবশ্যকীয় বহিরঙ্গের সৃষ্টি (যেমন সেচ-ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, যানবাহনের ব্যবস্থা ইত্যাদি) ও শিল্পজ যোগানের (সার, পোকা মারার ওষুধ, পাম্প ইত্যাদি) ব্যবস্থা করা। এর মধ্যে প্রথমটার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সমগ্র দেশ-ব্যাপী ব্যাপক আন্দোলন এবং এই আন্দোলনকে আইনসঙ্গত করার জন্য নতুন ধরনের আইন তৈরি করা। কিন্তু দ্বিতীয়টা সম্বন্ধে এগোতে হবে একই সঙ্গে দুটো কৌশল গ্রহণের মধ্য দিয়ে। আমাদের দেশের সব জায়গায় রাস্তাঘাট, বিদ্যুতের ব্যবস্থা, জলসেচের সম্ভাবনা ইত্যাদি একই রকম ভাবে ছড়িয়ে নেই—কোনো জায়গায় আছে এই সবের আপেক্ষিক প্রাচুর্য এবং অন্য অধিকাংশ জায়গায় হয়তো এ সবের বিশেষ কিছু নেই, হয়তো সে এলাকা প্রায়শই বন্যার জলে ডোবে ইত্যাদি। আলোচনার সুবিধার জন্য ধরে নেওয়া যাক যে, এক ধরনের এলাকায় [যার আয়তন এখন কম] ঐ ধরনের বহিরঙ্গ মোটামুটি আছে, কাজেই ঐ বহিরঙ্গের ওপর বাড়তি খরচ খুব সামান্য করেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে—হয়তো বা এক বছরেরও কম সময়ে—ঐ এলাকার উৎপাদনকে তিন-চার গুণ বাড়ানো সম্ভব। আর অন্য এক ধরনের এলাকা আছে যেখানে ঐ সব বহিরঙ্গ খুব কমই রয়েছে, যেখানে অপেক্ষাকৃত বিপুল অর্থ এবং সময় ব্যয় করে কয়েকটা নদীতে বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করার পরই মাত্র সেখানে কৃষি আধুনিকী-করণের মাধ্যমে উৎপাদন তিন-চার গুণ বাড়ানো সম্ভব। এই ব্যবস্থা করতে এই সব এলাকায় তিন-চার বছর লাগবে কি পনের-কুড়ি বা তারও বেশি বছর লাগবে তা নির্ভর করবে কতটা পুঁজি ওখানে বিনিয়োগ করে কত বেশি লোক আমরা ঐ কাজে লাগাতে পারব এবং শহরের শিল্পের পুনর্বিন্যাস করে কত দ্রুত এবং কত বেশি পরিমাণে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করতে পারব। এখন এই বাঁধ বাঁধবার জন্য কত হাজার লোককে নিয়োগ করা যাবে তার সর্বপ্রধান নিয়ামক হবে—বাড়তি খাদ্যের যোগান। অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া এই এলাকাগুলি স্বাভাবিক ভাবেই অপেক্ষাকৃতভাবে আরও বেশি ক্ষুধার্ত এলাকা। কাজেই এই এলাকায় বহু সহস্র লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এখনকার ঐ বেকার ও আধা-বেকার শ্রমকে রাস্তাঘাট, বাঁধ ইত্যাদিতে

রূপান্তরিত করার চেষ্টার প্রথম ফল হবে কাজ-পাওয়া এতদিনের অর্ধভুক্ত, অভুক্ত লোকগুলি নিজেরা পেট ভরে খেতে এবং তাদের পরিবার-পরিজনকে পেটভরে খাওয়াতে চাইবে। কত তাড়াতাড়ি এবং কত বেশি নতুন যোগান সৃষ্টি করে এই চাহিদাকে মেটাতে পারব, তার ওপরই নির্ভর করবে কত বেশি বেশি ভাবে এবং কত দ্রুত ঐ পিছিয়ে পড়া এলাকার প্রয়োজনীয় বহিরঙ্গ সৃষ্টি করে সেখানেও দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির বাস্তব বনিয়াদ স্থাপন করা যাবে।

এই বাস্তব অবস্থার কথা স্মরণে রেখে একদিকে যে সমস্ত অঞ্চলে খুব তাড়াতাড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব সেইখানে জোর দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করে যতটা বেশি সম্ভব উদ্বৃত্ত খাদ্য-শস্য উৎপাদন করতে হবে, এবং অন্যদিকে ঐ উদ্বৃত্ত উৎপাদনকে ব্যবহার করে যত দ্রুত সম্ভব এখানকার পিছিয়ে পড়া এলাকায় প্রয়োজনীয় বহিরঙ্গ সৃষ্টি করে যাতে সেখানেও উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রকৃত অবস্থা প্রস্তুত হয় সেদিকেও সচেষ্ট হতে হবে। পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই দুই ধরনের কাজই যাতে একসঙ্গে করা যায় তার সুস্পষ্ট ব্যবস্থা আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় থাকা উচিত। এই পরিপ্রেক্ষিতেই পশ্চিমবঙ্গ পরিকল্পনা পর্ষদের তৈরি আঞ্চলিক-সামগ্রিক—উন্নয়ন-পরিকল্পনা (CADP)-র তাৎপর্য বুঝতে পারা যাবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা খেয়াল রাখা প্রয়োজন। উপরে যে ধরনের পরিকল্পনার কথা বলা হল তার ফলে অন্যান্য আরও বহু কিছুর সঙ্গে আর একটা জিনিসও হবে—এবং সেটা হল আধুনিক কৃষিকে যোগান দেবার জন্য এবং কৃষিজাত দ্রব্যের শিল্পজ ব্যবহারের জন্য দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, গ্রামে ছোট-মাঝারি বা এমন কি বড় শিল্প স্থাপনের বাস্তব সম্ভাবনা এবং প্রয়োজনের সৃষ্টি হওয়া। এতদিন পর্যন্ত কৃষি খুব সামান্য শিল্পজ দ্রব্য ব্যবহার করত এবং অতি গরিব গ্রাম্যঅর্থনীতি দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য খুবই কম শিল্পজ ভোগ্যদ্রব্য ব্যবহার করত। ফলে কৃষিতে এবং গ্রামে যাকে আমরা শিল্পের বাজার বলি তা প্রায় ছিল না বললেই চলে। কৃষিকে আধুনিকীকরণের ভিত্তিতে যে নতুন গ্রাম্যঅর্থনীতি গড়ে উঠবে সেখানে কৃষিতে ব্যবহারের জন্য এবং ভোগ্যদ্রব্যের জন্য শিল্পজ দ্রব্যের বাজারের বিরাট চাহিদা বাড়বে, এই চাহিদাকে ভিত্তি করে এই সর্বপ্রথম আমাদের দেশে বিকেন্দ্রীভূতভাবে দেশের অনেক জায়গায় আধুনিক শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়াও আগামী পরিকল্পনার একটা প্রধান দিক হওয়া উচিত।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, চলতি সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করে আধুনিক বিজ্ঞান এবং টেকনলজিকে কৃষিতে প্রয়োগ করে দ্রুত গতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা আগামী পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত। যেখানে এখনই রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা ইত্যাদি বহিরঙ্গ বর্তমান সেখানে সমস্ত একর জমি এবং সমস্ত মানুষের শ্রমকে ব্যবহার করে তিন-চার গুণ উৎপাদন বাড়াতে হবে। এই বাড়তি খাদ্য উৎপাদনকে ভিত্তি করে বর্তমানে হাজার হাজার বেকার, অর্ধ-বেকার শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করে একদিকে এখনকার পিছিয়ে পড়া এলাকায় রাস্তা, বিদ্যুৎ, বন্যা বা খরা-নিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই যাতে সেখানেও দ্রুত উৎপাদন বাড়ানো যায় তার বাস্তব ভিত্তি স্থাপন করা এবং শহরের ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়ে বহু জায়গায় এবং কৃষির উন্নতির সঙ্গে যুক্ত ও সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে নতুন ধরনের শিল্পব্যবস্থা এবং শহর গড়ে তুলতে হবে। এই কথাগুলিকে স্মরণ রেখে যদি আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা একই সঙ্গে গরিবী দূর করার দিকে, দ্রুত আয় বৃদ্ধির দিকে এবং পিছিয়ে পড়া এলাকায় দ্রুত উন্নয়নের দিকে এগুতে পারব।

রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ (২)

চিন্মোহন সেহানবীশ

প্রায় বছর খানেক আগে 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ' নামে এক প্রবন্ধে ('রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও বাংলাদেশ' নামক প্রবন্ধ-সংকলনে প্রকাশিত) রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবীদের কি চোখে দেখতেন, বিপ্লবীরাই বা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কি ভাবতেন, আর উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ ঠিক কতখানি ছিল—এসব বিষয়ে কিছু খবর জড়ো করেছিলাম। প্রবন্ধ প্রকাশের পর ঐ ধরনের আরো কিছু খবর নজরে এসেছে যেগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে সাজানোর জন্যই এই লেখা।

অনুশীলন সমিতির প্রথম যুগের কর্মী যতীন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয় তাঁর পত্নী, শ্রীমতী শেফালিকা শেঠের লেখা 'সঙ্গীতশাস্ত্র কণিকা'র এক জায়গায় লিখেছেন :

'...স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল মুহূর্তে অনুশীলন সমিতির প্রধান কার্যালয় ৪৯, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের সন্নিকটস্থ মদন মিত্র লেনস্থিত ক্রীড়া প্রাঙ্গনে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সমিতির যুবসঙ্ঘের সহিত কয়েকবার মিলিত হন এবং সামান্য একটি কাঠের টুলে বসিয়া তাঁহার নব-রচিত কয়েকটি বাউল গান প্রাণের উচ্ছ্বাসে গাহিয়া শোনান। সেগুলির সাধারণ্যে প্রথম প্রচার এইরূপে হয়' ('অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'—জীবনতারা হালদার, ১৯৬৫, পৃঃ ৩৬)

যতীন্দ্রনাথ ঐ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলির উল্লেখ করে লিখেছেন, '...কবির উদাত্ত কণ্ঠে গীত আহ্বানের শ্রোতা এখনও কয়েকজন জীবিত আছেন' (ঐ, পৃঃ ৩৭) :

১। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা

২। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

৩। তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে

৪। আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে
৫। নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে
৬। আমি ভয় করবো না, ভয় করবো না
৭। এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে
৮। নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার
৯। ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে।
১০। আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।
১১। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।

যতীন্দ্রনাথ আরো খবর দিয়েছেন : '…জোড়াসাঁকো শিবকৃষ্ণ দাঁ লেনস্থিত শিবমন্দির প্রাঙ্গনে অনুশীলন সমিতির একটি শাখা খোলা হইয়াছিল। সেইখানে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ সভ্য হইয়াছিলেন' (ঐ, পৃঃ ৩৭)। রথীন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর 'পিতৃস্মৃতিতে' জানিয়েছেন যে প্রমথনাথ মিত্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হলেও তিনি ব্যারিষ্টার পি, মিত্রের সমিতিতে যোগদানের আহ্বান গ্রহণ করেননি। তবে যতীন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয় একবার রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে কবির সঙ্গে দেখা করেছিলেন আর রথীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার যখন কৃষিবিদ্যা অর্জনের জন্য বিদেশযাত্রা করেন তখন তাঁদের প্রতি শুভকামনা জ্ঞাপনের জন্য সমিতির দপ্তরে (৪৯, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট) একটি প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন হয়। 'তাহাতে রবীন্দ্রনাথ যোগদান করেন, সমিতিকে অভিনন্দন জানান ও সভ্যবৃন্দের সহিত আহারাদি করেন' (ঐ, পৃঃ ৩৭-৩৮)।

খুলনা ষড়যন্ত্র মামলায় ৫ বছর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত অশীতিপর বিপ্লবী শ্রীসুধীরচন্দ্র দে তাঁর 'সাগরঘেরা পাথরকারা' বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে ('কবিসান্নিধ্যে') লিখেছেন :

'মুরারিপুকুর বোমা কারখানা ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন স্থানে ধরপাকড় আরম্ভ হল। ফলে আত্মগোপন করার প্রয়োজন দেখা দিল। ভাবছিলাম কোথাও থেকে কিছুদিন ঘুরে আসব। এই সময়ে শান্তিনিকেতনের বিনয়ের (সহপাঠী বিনয়কৃষ্ণ দাস পরে শান্তিনিকেতনে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন—প্রবন্ধ লেখক) কাছ থেকে আমন্ত্রণ এল। ভূতপূর্ব শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ আইচের পরামর্শ-ক্রমে বিনয় আমাকে লিখল—কবি শান্তিনিকেতনের লাঠিখেলা শেখাবার জন্য একজন ভাল শিক্ষক চান। আমাদের অনুশীলন সমিতি থেকে একজনকে দেওয়া

যেতে পারে কি না, সে বিষয়ে কথাবার্তা হবে আমি গেলে। বহুদিনের ইচ্ছা ছিল শান্তিনিকেতন দেখবার। স্থির করলাম এ সুযোগ ছাড়ব না। কয়েকদিনের মধ্যে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হলাম।...

'কবির সঙ্গে একটু আলাপ করার ইচ্ছে হল—এ জন্য মাষ্টার মশাইকে বললাম। ৩।৪ দিন পরে ব্যবস্থা হল। তিনি গুরুদেবের বসবার ঘরে আমাকে নিয়ে গেলেন। বড় একটা টেবিলে খাতাপত্র নিয়ে তিনি কি লিখছিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি চেয়ারটা ঘুরিয়ে আমার দিকে মুখ করলেন এবং হাসি-মুখে আমার নামধাম পরিচয় প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করলেন। ভৈরব নদী তীরে অলকা গ্রামের ছেলে আমি জেনে বেশ উৎফুল্ল হলেন তিনি। জানালেন, ফুলতলা বাজারের নিকট প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের নীচে তাঁবু ফেলে দু-তিন দিন ছিলেন বহু-লোক সঙ্গে নিয়ে। কবি বিয়ে করতে এসে যে তাঁবু ফেলেছিলেন সে কথা গ্রামের বৃদ্ধদের কাছে আমি আগেই শুনেছিলাম। তিনি বিয়ে করেছিলেন আমাদের পাশের দক্ষিণডিহি গ্রামের রায়চৌধুরী পরিবারে। পরিবারটি আমাদের সমিতিরও পৃষ্ঠপোষক ছিল। আমি অনুশীলন সমিতির সভ্য। এফ. এ পাশ করেছি এবং বি. এ পড়ছি, দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করাই আমার ইচ্ছা জেনে কবি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করলেন। এতটা হৃদ্যতার সঙ্গে কথা বলতে দেখে আমি বিশেষ অভিভূত হয়ে পড়লাম' (পৃঃ ৩৭-৩৯)।

শ্রীসুধীরচন্দ্র দে সেবার কবিকে লাঠিখেলা দেখিয়েও মুগ্ধ করেছিলেন এবং 'আসার ২।৩ দিন আগে একদিন হল ঘরে সান্ধ্য আসরে কবির মুখে দুটি গান শোনার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল। একটি গানের প্রথম কলিটি আজো মনে আছে—শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি' (পৃঃ ৪০)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের মধ্যে মিলিত কর্মোদ্যোগের জন্য একবার কিছুটা আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। তাতে যুগান্তর দলের পক্ষে ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আর অনুশীলনের তরফে প্রতুল গাঙ্গুলি, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ সেন ও নলিনীকিশোর গুহ, শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা সার্থক হতে পারেনি। প্রসঙ্গত নলিনীকিশোর তাঁর 'বাংলায় বিপ্লববাদে' লিখেছেন :

'...যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে আর্যনিবাস, শোভাবাজার ও শ্রীদাম মুন্সী লেনে মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে যে সকল কথাবার্তা হয় তাহা কলিকাতায় গোপন কেন্দ্রে রাস-

বিহারীকে সবিস্তারে বলা হইলে তিনি রবি সেন ও লেখককে বলেন—এর জন্য ভাবিত হইবার কোন হেতু নাই। ইহা বলিয়া রবীন্দ্রনাথের গানটি উদ্ধৃত করেন—

ঘণ্টা যখন উঠবে বেজে
দেখবি সবাই আসবে সেজে—
এক সাথে সব যাত্রী যত
একই রাস্তা লবেই লবে।'
(পৃঃ ৩০০)

মধ্য কলিকাতার সুপরিচিত 'আত্মোন্নতি সমিতি'-র সদস্য, সতীশচন্দ্র দে মহাশয় তাঁর স্মৃতিকথা 'নিঃসঙ্গ' বইটির ভূমিকায় এক জায়গায় লিখেছেন : রবীন্দ্রযুগে মানুষ হয়েছি, জীবনে তাঁর প্রভাব পড়েছে। কলেজে ছাত্রাবস্থায় আমার সহপাঠী বন্ধু তিন চার বার তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল ও কবির মুখে নূতন লেখার আবৃত্তি ও গান শুনবার সুবিধা হয়েছিল। সে কি কম সৌভাগ্য!... কবির ছন্দে ছন্দে স্মৃতির পট ভরে আছে। তাই বহু স্থানে তাঁর কবিতার অংশগুলি কলমের ডগায় এসে গেছে। এইটেই স্বাভাবিক...।'

বাস্তবিকই তাঁর বইটির পাতায় পাতায় আছে রবীন্দ্রকাব্যের উদ্ধৃতি।

অনুশীলন সমিতির কর্মী যোগেন রায় মহাশয়কে তাঁর সহকর্মীরা নাম দিয়েছিলেন 'সাংঘাতিক' কারণ তাঁর মুদ্রাদোষ ছিল কথায় কথায় 'সাংঘাতিক' বলা। অনুশীলন সমিতির উত্তর বঙ্গের অন্যতম নেতা, জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় তাঁর 'নমামি' বইয়ে লিখেছেন :

'সেদিন বাসায় রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' থেকে কবিতা পড়া হচ্ছে। যিনি পড়ছিলেন তিনি চাপা স্বরে অথচ আবেগের সাথে পড়ে যাচ্ছেন—

'...ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে,
নহেরে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ,—
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা
পথে পথে গুপ্ত সর্পফণা—।

নিন্দা দিবে জয় শঙ্খনাদ—
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ'

'যোগেশ চোখ বুঁজে শুনছিল। যেন গিলছিল অন্তর দিয়ে। হঠাৎ সে বললে—'সাংঘাতিক কবি এই রবীন্দ্রনাথ। কি সুন্দর লিখছে। ভূত ভবিষ্যৎ সব যেন নিজ চক্ষে দেখছে। সত্যই সাংঘাতিক—মানে সুন্দর'!

'সকলে হো হো করে হেসে উঠল সাংঘাতিকের বহর দেখে'

(পৃ. ১৭৬-'৭৭)।

বিপ্লবীদের মতামতের কঠোর সমালোচক হলেও রবীন্দ্রনাথ তরুণ বিপ্লবীদের আন্তরিকভাবে ভালোবাসতেন ও নানাভাবে তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। এর দরুন পুলিশের নজর তাঁর উপরেও পড়েছিল। কৃষ্ণ কৃপালনী তাঁর রবীন্দ্রজীবনীতে লিখেছেন একবার ঠাকুর পরিবারের পরিচিত এক ব্যক্তি জোড়াসাঁকো থানায় গিয়েছিলেন চুরির রিপোর্ট দিতে। সেখানে এক পুলিশ-চর এসে নাকি থানার কর্তাকে তখন খবর দিচ্ছিল—'বি ক্লাস, বারো নম্বর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুর থেকে আজ কলকাতা পৌঁছেচে।' কথাটি নিশ্চয়ই কবি এজরা পাউণ্ডকে বলেছিলেন কারণ ১৯৫৯ সালে কৃপালনীজীর সঙ্গে দেখা হলে পাউণ্ড তাঁকে বলেন 'রবীন্দ্রনাথ আমায় একবার বলেছিলেন, আমার দেশে তো আমি বি ক্লাশ, বারো নম্বর সন্দেহজনক ব্যক্তি!' ('Rabindranath Tagore : A Biography', পৃঃ ২০৪, পাদটীকা)।

১৯১৭ সালে বাংলা দেশের লাট সাহেবের একান্ত সচিব গুর্লে সাহেবও এণ্ড্রুজ সাহেবকে জানিয়েছিলেন যে বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের খবর হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রনাথ 'গদর দলের' সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আর ১৯১৬ সালে কবির আমেরিকা সফরের উদ্দেশ্য ছিল নাকি জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন (ঐ, পৃ. ২৫৮)। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে সেই 'গদর' কর্মীরাই ঐ সফরের সময়ে সেবার প্রচার চালিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে। তাঁদেরই একজন, গোবিন্দবিহারী লাল 'সান ফ্রান্সিস্কো একজামিনার' (৬ অক্টোবর, ১৯১৬) পত্রিকায় এক চিঠিতে লেখেন : 'মহাশয়, ভারতীয়রা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কি ভাবে, সে-কথা জানার জন্য কি আপনার আগ্রহ হবে না? রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও দার্শনিক প্রশ্নের তাঁদের এখন যা ধারণা বা অনুভূতি, তাঁরা মনে করেন না যে রবীন্দ্রনাথ কোনোক্রমেই তার প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। ভারতবর্ষের অন্তরে রয়েছে বৃটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন যা ভারতকে দ্রুত রূপান্তরিত করছে আধুনিকতার

ছাচে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে আন্দোলন থেকে দূরে সরে আছেন ঠিক যেমন এক শতাব্দী আগে গ্যয়টে ছিলেন জার্মানির মুক্তি সংগ্রাম থেকে' (ঐ, পৃ. ২৮৩)। এমন কি এমন গুজবও রটেছিল যে 'গদর' পন্থীরা নাকি তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে আর তাই ব্যবস্থা হয়েছিল তাঁর সভাগুলিতে পুলিশ রাখার। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে 'লস এঞ্জেলিস একজামিনার' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকরে বলেছিলেন 'As for a plot to assassinate me, I have the fullest confidence in the sanity of my countrymen, and shall fulfil my engagements without the help of police protection. I take this opportunity emphatically to assert that I do not believe that there was a plot to assassinate me, though I had to submit to the force of being guarded by the police, from which I hope to be relieved for the rest of my visit to this country' (ঐ. পৃ. ২৮৩)।

শারীরিক অসুস্থতার দরুণ সবরকম উত্তেজনা পরিহার করার ব্যাপারে ডাক্তারদের হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ১৯১৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি লাট সাহেবের একান্তসচিব গুর্লে সাহেবকে এই চিঠিটি পাঠান :

"when I wrote to you last I thought it would be of no loss to anybody in the world if I gave up my attempt at rectifying wrongs and stuck to literature. But occasions come when to remain in the shelter of one's own special vocation becomes a crying shame. And a particularly harrowing account of the helpless condition of a state prisoner having come to my notice from a trustworthy source, I am compelled to write to you again. The case is that of Jyotish Chandra Ghosh of Hoogly who is in the Baharampur lunatic asylum.

I am informed that he lies motionless on his back day and night in an unconscious condition, his look vacant, jaws firmly set, legs rigid and crooked, probably paralysed. He can neither open his mouth nor speak and does not respond to any outside stimulus, however strong. It is said that he has been in this condition for the last six months or so, and that during that period, or longer, he has been artificially fed. The force applied for this purpose does not rouse him to a least sign of consciousness and the only thing which shows that he is alive is that he breathes.

After repeated and unaccountable refusals one of his relatives was given permission to see Jyotish at last. I do not wish to discuss what suspicions our people entertain about such cases as this, though these suspicions, whether legitimate or not, should never be ignored. But in the name of humanity I would appeal to His Excellency the Governor of Bengal to look into the case personally and not be satisfied with any report from subordinate functionaries, medical or ordinary. For the sake of humanity I would also urge that the prisoner's mother should now have the consolation of nursing her son in her own home, or if that cannot be, in any other place chosen by Government where he can have the best possible medical treatment ('Rabindranath Tagore: A Biography'-Krishna Kripalani, পৃঃ ২৬১-৬২)।

অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের ('মাস্টার মশাই') মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিপ্লবীর জন্যও সেদিন রবীন্দ্রনাথকে ঐভাবে চিঠি লিখতে হয়েছিল সরকারের কাছে।

শ্রীজটাশঙ্কর ঝা মহাশয়ের 'Early Revolutionary Nationalism in Bihar' পুস্তিকায় এ-খবরটি জানা গেল :

'১৯১৮ সালের গোড়ায় ভাগলপুরে বাংলাদেশের বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রসারের সূত্রে বেশ কিছু ধরপাকড় হয়। বন্দীদের মধ্যে একজন ছিলেন বোলপুর বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। খবর পাওয়া গিয়েছিল তিনি নাকি ভাগলপুরে গিয়েছিলেন সেখানকার এক স্থানীয় গোয়েন্দা অফিসারকে হত্যা করার বন্দোবস্তের জন্যে। বহুল প্রচারিত এক চিঠিতে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "নিরীহ এক ছাত্রের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান" (১৯১৮ সালের পলিটিকাল স্পেশাল ফাইল নং ১৬৯)। এই চিঠিটির হদিশ এখনো পাইনি।

কেন্দ্রীয় ভারত-সরকারের অন্যতম গোয়েন্দা প্রধান, পি. সি. ব্যামফোর্ড ১৯২৪ সালের ২৭ আগস্ট তারিখের এক গোপন রিপোর্টে লিখেছেন :

পূর্বপ্রাচ্য মারফৎ ভারতে চোরাই অস্ত্র আমদানির ষড়যন্ত্র

'১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চ জানতে

পারে যে বার্লিন থেকে এম. এন. রায় কর্তৃক প্রেরিত মস্ত এক দফা অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক সামগ্রীর চালান ভারতের দিকে যাচ্ছে সাংহাই হয়ে। ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা জানতে পারি যে জাপানে রাসবিহারী বসু ও ভারতে শচীন সান্যাল দু'জনেই গভীরভাবে লিপ্ত রয়েছেন এই ষড়যন্ত্রে। ভারতবর্ষ থেকে অমূল্য ব্যানার্জি এপ্রিল মাসে সিঙ্গাপুর পৌঁছন ঐ চালান হাতে নিতে। এরই সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন জনৈক কে. আর. সবেরওয়াল—তিনি এখন জাপানে রয়েছেন রাসবিহারীর সঙ্গে জড়িত। এ ব্যাপারটি খুবই আগ্রহোদ্দীপক যে ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশের মহামহিম লাটবাহাদুরের কাছে সম্প্রতি তদ্বির করেছেন সবেরওয়ালকে ভারতে এসে তাঁর বোলপুরস্থ প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে দেওয়ার অনুমতির জন্য।

'১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে খুবই বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে সুভাষ বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সত্যেন মৈত্র ব্যবস্থা করছেন ডায়মণ্ডহারবারে এক চালান অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার। সুভাষ বসু দু'জন বলশেভিক প্রতিনিধির সহায়তায় ঐ অস্ত্র ভারতে আমদানির বন্দোবস্ত করেছেন। ঐ বলশেভিক প্রতিনিধি দু'জন কলকাতায় এসেছিলেন এবং যোগাযোগ করেন সুভাষ বসু ও অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে। আমরা নির্ভরযোগ্য এমন খবরও পেয়েছি যে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী ও বলশেভিকদের মধ্যে এই বোঝাপড়া হয়েছে যে শেষোক্তরা ভারতের কাছাকাছি দেশ ও দ্বীপগুলিতে অস্ত্রশস্ত্র মজুত করবে যাতে সুবিধামতো সেগুলিকে গোপনভাবে ভারতে আনা যায়। ঐ বলশেভিক প্রতিনিধি দু'জন বোমা তৈরির ব্যাপারে ওস্তাদ এবং কিছু কিছু বাঙালিকে ঐ বিদ্যা শেখাতে প্রস্তুত। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য যে বাড়িগুলির কথা বিবেচনা করা হয়েছে তার মধ্যে আছে কবির এক আত্মীয়, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি।

'ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সবেরওয়ালের মধ্যে যোগাযোগের সূত্রে ঠাকুর বাড়ির এই উল্লেখ খুবই আগ্রহোদ্দীপক' (জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত হোম/পলিটিকাল ফাইল নং ৩৭৯/৩/১৯২৪। আমাকে দলিলটির সন্ধান দিয়েছেন অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়)।

ব্যাপারটি আজগুবি আর আরো আশ্চর্য সেই আজগুবি অস্ত্রশস্ত্রের চোরাই চালানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িত করা। তবে শ্রীযুক্ত কেশোরাম সবেরওয়াল এখনো জীবিত রয়েছেন। তিনি দিল্লীর বাসিন্দা—বয়স প্রায় ৭৯। তিনি ১৯১৫ সালে জাপানে যান এবং ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন রাসবিহারীর সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথ যখন জাপান সফরে যান তখন রাসবিহারীর মতো তাঁরও দেখা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে।

আর রিপোর্টে উল্লিখিত সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর—গগনেন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথের মেজো ভাই। জোড়াসাঁকোয় তাঁদের বিখ্যাত পৈতৃক বাড়িটি আজ আর নেই। তাঁর আলাদা কোন বাড়ির কথা জানি না। তাঁর কোন রাজনৈতিক আগ্রহ ছিল বলে শুনিনি—ভাইদের মধ্যে যাঁর ছিল তিনি হলেন গগনেন্দ্রনাথ।

১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর নজরুল ইসলাম, মুজফ্ফর আহ্মদ প্রমুখ কামউনিস্ট ও তাঁদের সহযোগীরা যখন 'লাঙল' পত্রিকা প্রকাশ করেন তখন নজরুলের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ পত্রিকার জন্য এই দুটি লাইন লিখে পাঠান :

'ধর হাল বলরাম, আন তব মরুভাঙা হল,
বল দাও, ফল দাও, স্তব্ধ হোক ব্যর্থ কোলাহল।'

লাইন দু'টি লাঙলের প্রচ্ছদপটে ছাপা হত।

বক্সা দুর্গে আটক রাজবন্দীদের মতো হিজলী আটকখানার বন্দীরাও রবীন্দ্রনাথের ৭০-তম জন্মদিন উপলক্ষে কবির কাছে একটি অভিনন্দন পত্র পাঠান। ১৯৩২ সালের ১০ জানুয়ারি রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব কমিটির সম্পাদক সুধীর কিশোর বসু যে পত্র পাঠান তার বয়ান এই রকম :

'বাংলার একতারায় বিশ্ববাণীর ঝঙ্কার তুলিয়াছ তুমি, হে বাউল কবি, তোমার জন্মদিনে আজ তোমাকে প্রণাম করি।

'সঙ্কীর্ণ-স্বার্থ-সঙ্কুচিত দ্বন্দ্বপর বিশ্বসমাজকে মৈত্রী, করুণা ও কল্যাণের মন্ত্র দান করিয়াছ তুমি, হে বিশ্বকবি, তোমার জন্মদিনে আজ তোমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

'বন্ধন-বিমূঢ় অবমানিতের মর্মবেদনাকে ভাষা দান করিয়াছ তুমি, হে দরদী, তোমার জন্মদিনে আজ তোমার কল্যাণ কামনা করি।

'বিশ্বদেবতার চরণে গীতাঞ্জলি দান করিয়া বিশ্বের বরমাল্য লাভ করিয়াছ তুমি, হে গুণি, তোমার জন্মদিনে আজ তোমাকে অভিনন্দিত করি।

'এই শ্রদ্ধাঞ্জলি তুমি গ্রহণ কর। ইতি

১৬ই পৌষ, ১৩৩৮ ॥ রাজবন্দীগণ।'

জবাবে রবীন্দ্রনাথ হিজলীবন্দীদের লেখেন :

'কল্যাণীয়েষু,

কারান্ধকার থেকে উচ্ছ্বসিত তোমাদের অভিনন্দন আমার মনকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেচে। কিছুতে যাকে বদ্ধ করতে পারে না সেই মুক্তি তোমাদের অন্তরের মধ্যে অবারিত হোক এই আমি কামনা করি। ইতি

সমব্যথিত

২২শে জানুয়ারি, ১৯৩২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

('ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ'—নেপাল মজুমদার, ৩ খণ্ড, পৃঃ ২৭৩-৭৪)

কবিকে শুধু জন্মদিনে অভিনন্দনপত্র পাঠানো নয়, রাজবন্দীরা তাঁকে বাংলা ভাষা সম্পর্কিত প্রশ্নও করেছেন কারাগার থেকে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল মামলায় দণ্ডিত বিপ্লবী পূর্ণেন্দু দস্তিদার তাঁর 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম' গ্রন্থে লিখেছেন যে তিনি ১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন Detention Camp' কথাটার সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ কি হবে জানতে চেয়ে। জবাবে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণেন্দবাবু প্রস্তাবিত 'আটকখানা' কথাটির পক্ষে মত দেন (পৃঃ ২৭১ পাদটীকা)।

১৯৩২ সালের ৫ জানুয়ারি বিখ্যাত বিপ্লবী, রেবতী বর্মণও ঐভাবে রবীন্দ্রনাথকে এই চিঠি পাঠান :

Passed by Superintendent, Suri Jail : সিউড়ী জেল

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫।১।৩২

পরম পূজনীয়েষু,

রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে বাংলায় একখানা গ্রন্থ তৈয়ারি করিতে শুরু করিয়া পরিভাষার খুবই অসুবিধা বোধ করিতেছি।…

Nationalism-কে জাতীয়তা ও nation-কে জাতি বলিয়া চালানো কি উচিত ? শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশ বিদ্যানিধি মহাশয় nationalist-কে রাস্ট্রীক ও nation-কে 'রাষ্ট্র, জন ও রাষ্ট্রজন' এই তিনটি প্রতিশব্দ দিয়া চালাইতে চাহিয়াছেন কিন্তু এ-বিষয়ে আমার সংশয় রহিয়া গিয়াছে। আশা করি আপনার উপদেশ পাইয়া সংশয়মুক্ত হইব।

আমার অসংখ্য প্রণাম ও অশেষ শ্রদ্ধা আপনি জানিবেন।

একান্ত অনুগত

শ্রীরেবতী বর্মণ

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

কল্যাণীয়েষু,

আমার মনে হয় নেশন, ন্যাশনাল প্রভৃতি শব্দ ইংরেজিতেই রাখা ভালো। যেমন অক্সিজেন, হাইড্রোজেন। ওর প্রতিশব্দ বাংলায় নেই। রাষ্ট্রজন কথাটা চালানো যেতে পারে। রাষ্ট্রজনিক এবং রাষ্ট্রজনিকতা শুনতে খারাপ হয় না। আমার মনে হয় রাষ্ট্রজনের চেয়ে রাষ্ট্রজাতি সহজ হয়। কারণ নেশন অর্থে জাতি শব্দের ব্যবহার বহুল পরিমাণে চলে গেছে। সেই কারণেই রাষ্ট্রজাতি কথাটা কানে অত্যন্ত নতুন ঠেকবে না।

Caste—জাতি   Nation—রাষ্ট্রজাতি   ইতি ২২শে জানুয়ারি, ১৯৩২

Race—জাতি   People—জনসমূহ   শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Population—প্রজন

('ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ'—নেপাল মজুমদার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৬৬-৬৭)।

১৯৩৩ সালের মে মাসে আন্দামান সেলুলর জেলে অনশনব্রতী মহাবীর সিং, মানকৃষ্ণ নমোদাস ও মোহিত মৈত্র মৃত্যুবরণ করেন। রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি এই ঘটনায় বিশেষ বিচলিত হয়ে ইউনাইটেড প্রেস মারফৎ এই বিবৃতিটি প্রচার করেন :

'আন্দামান সেলুলর জেলের অনশনব্রতী বন্দী শ্রীযুক্ত মহাবীর সিং, শ্রীযুক্ত মানকৃষ্ণ নমোদাস ও শ্রীযুক্ত মোহিত মৈত্রের মৃত্যুতে জনসাধারনের মনে দারুণ শঙ্কা ও সংশয় জন্মিয়াছে। বন্দীত্রয়ের মৃত্যু সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট অবশ্যই একটি কৈফিয়ত দিয়াছেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা না করিলে জনসাধারণের আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা দূর হইবে না। অধিকন্তু সরকারী ইস্তাহার এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ হইতে বুঝা যায়, যে কারণে বন্দীগণ গত মে মাসে অনশন ধর্মঘট করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ বৈধ। সেলে রাত্রিতে আলো সরবরাহ, উপযুক্ত খাদ্য, সংবাদপত্র, আত্মীয়স্বজনের সহিত সাক্ষাৎকারের অনুমতি এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার নিমিত্ত আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে টাকা আনাইবার অনুমতি দাবী করিয়া বন্দীগণ অনশন ধর্মঘট করিয়াছিলেন। এই দাবী নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত। জনসাধারণের বিশ্বাস এই যে, বন্দীদের অভাব ও অভিযোগ দূর করিবার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হওয়ার ৪৫ দিন

পর তাঁহারা অনশন ধর্মঘট ভঙ্গ করেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ, স্বরাষ্ট্রসচিব ব্যবস্থা-পরিষদে ঘোষণা করিয়াছেন যে বন্দীদের কোনও কোনও অভিযোগ দূর করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে। বন্দীদের সমস্ত অভিযোগ দূর করা আবশ্যক।

'আরও প্রকাশ যে, কারাগারে বন্দীদের ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহা বিবেচনা না করিয়াই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেল হইতে বন্দী বাছিয়া আন্দামানে প্রেরণ করা হইয়াছে। নির্বাসিত বন্দীদের অধিকাংশই নাকি দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত নহেন। তাঁহাদের অধিকাংশই নাকি চার বৎসর ও তদূর্ধকাল সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। কেহ কেহ চার বৎসরের কম মেয়াদেও দণ্ডিত হইয়াছেন, এই সংবাদেও জনসাধারণ ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। যে সকল বন্দী তাঁহাদের দণ্ডকালের অধিকাংশ ভারতবর্ষের জেলে কাটাইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও কেন মেয়াদ শেষ করিবার জন্য আন্দামানে প্রেরণ করা হইবে, তাহার কারণও বুঝা যায় না। অনেক বন্দী সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষের জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। মাত্র তিন চার বৎসরের জন্য তাহাদিগকে আন্দামান প্রেরণ করা হইয়াছে।

'১৯১৯ সালের ভারতীয় কারা-কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯২৬ সালে ভারত গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে সকল বন্দী আন্দামান যাইতে সুস্পষ্ট সম্মতি দান করিবে, কেবল তাহাদিগকেই আন্দামান প্রেরণ করা হইবে। বর্তমানে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে প্রেরণ করায় গভর্ণমেণ্টের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়াছে।

'উপসংহারে আমরা গভর্ণমেণ্টকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যে, যে-শতাধিক বন্দীকে প্রচণ্ড জনমত উপেক্ষা করিয়া আন্দামানে নির্বাসিত করা হইয়াছে অবিলম্বে তাহাদিগকে ভারতবর্ষে ফিরাইয়া আনা হউক এবং রাজনৈতিক বন্দীই হউন বা সাধারণ বন্দীই হউন বন্দীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে আন্দামানে প্রেরণের নীতি অতঃপর পরিত্যক্ত হউক' (আনন্দবাজার পত্রিকা ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩)।

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বাসন্তী দেবী, সরোজিনী নাইডু, নেলী সেনগুপ্তা, মৌলানা আজাদ, সি. এফ. এণ্ড্রুজ, সি. ওয়াই. চিন্তামনি, জওহরলাল নেহরু, বি. জি. হর্নিমান, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রসচিব ঘোষণা করেন যে কংগ্রেস বিনা সর্তে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করতে সম্মত হলে সরকার কংগ্রেস সংগঠনগুলির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবেন এবং আইন অমান্যকারী সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তি দেবেন। বিপ্লবীপন্থী বা বাংলাদেশের 'ডেটেনিউ'দের মুক্তির প্রশ্নে তিনি উচ্চবাচ্য করলেন না।

এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ১৮ই এপ্রিল (১৯৩৪) শান্তিনিকেতন থেকে এক বিবৃতিতে ঐ রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য আবেদন জানিয়ে বললেন :

'I am glad to read the Home Member's statement promising release of Civil Dis-Obedience prisoners, if calling off movement is ratified by the Congress. For, any further retention of prisoners after ratification will be interpreted as showing a spirit of persecution not worthy of a Government that claims to be civilised. I hope the Viceroy's generosity will rise equal to the occasion and give Bengal detenues also a chance to appreciate the Government's good-will.

'I appeal to the Government to strive for that dignity which is based on its claim to appreciation of human values and not on its mere assertions of power.'

'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার ২০ এপ্রিল ১৯৩৪) সংখ্যায় প্রকাশিত এই আবেদনটি পেয়েছি শ্রীযুক্ত নেপাল মজুমদারের 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ', ৩ খণ্ডের ৪৯৫-৯৬ পৃষ্ঠায়।

১৯৩৭ সালে আন্দামান বন্দীরা অনশন করছেন জেনে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অনশন স্থগিত রাখার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন এবং ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীকে বাংলার লাট, স্যার জন এণ্ডারসনের কাছে পাঠালেন এ-ব্যাপারে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে। ডাঃ চক্রবর্তী লাটসাহেবের কাছ থেকে ফিরে এলে তাঁর মুখে সব কথা শুনে কবি কিছুটা আশান্বিত হন। তবু স্থির থাকতে না পেরে তিনি লাটের কাছে আবার এই চিঠিটি পাঠান :

Personal & Confidential

August 16
1937

Dear Sir John Anderson,

I feel greatly relieved to learn from Dr. Amiya Chakravorty,

who had an interview with you on the 14th instant, that you and your Government are taking the earliest opportunity of bringing about a satisfactory settlement with regard to the Andaman prisoners. It is needless to emphasise that the matter is fraught with grave consequences and I am afraid, if no generous gesture is forthcoming from the Government, the situation might be too embittered for ever restoring a normal atmosphere in the Province. I have sent just now the following cable to the prisoners :

Earnestly appeal to you to call off hungerstrike. Your case taken up by the whole nation. Feel restoration of atmosphere favourable for discussion will be greatly helpful.

and I am also wiring to Mahatma Gandhi and Pandit Nehru, whose words would have great consideration with the prisoners, to issue similar appeals to them. I quite realise that the calling off of the fast would considerably lessen the tension in the country and restore an atmosphere more suitable for a dispassionate discussion. I have every hope that our request would be honoured by the prisoners and the Government will also generously review the whole situation.

Dr. Chakravorty tells me, that a scheme of repatriation has been already accepted by the Government and that you are also considering the question of release of detenus. I feel very strongly on that matters on humanitarian grounds and we should like Great Britain to take the lead in abolishing the system of maintaining penal settlements for political prisoners, entirely cut off from humanising contacts with society and we trust that in India the reform of prisons will follow the advanced technique now being adopted by a modern country.

With kind regards,

Yours sincerely,

Rabindranath Tagore

('ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ', ৪ খণ্ড, পৃ: ২২৭-২৮)

আন্দামান-বন্দী প্রসঙ্গে আর একটা দিকের কথা এখানে বলা যেতে পারে। ১৯৩৩ সালে বিখ্যাত বিপ্লবী শ্রীনলিনী দাস যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন ও ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭—চার বছর আন্দামান কাটান। সাপ্তাহিক 'কালান্তরে' ধারাবাহিক প্রকাশিত তাঁর 'স্বাধীনতা সংগ্রামে দ্বীপান্তরের বন্দী' প্রবন্ধে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন : '…ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেল থেকে খান আবদুল গফুর খান, শ্রীকৃষ্ণ সিং, অনুগ্রহনারায়ণ সিং, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, রফি আহমদ কিদোয়াই প্রভৃতি রাজবন্দীরা আন্দামান-বন্দীদের জন্য কিছু কিছু পুস্তক দিয়েছেন। বাংলাদেশের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনেরা বন্দীদের নামে বহু বইপত্র জমা দিয়েছে। কয়েক হাজার বইতে রাজবন্দীদের লাইব্রেরী সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল। শুনলে আশ্চর্য মনে হবে, রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা, এবং নজরুলের 'সঞ্চিতা' ৪০/৫০ কপি লাইব্রেরিতে এসে জমা হল' (২০ মে, ১৯৭২ সংখ্যা, পৃঃ ৭)।

১৯৩৭ সালে রাজবন্দীরা অনেকেই ছাড়া পেতে শুরু করলেন। তাঁদের অনেকেই তখন যক্ষ্মা প্রভৃতি নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে প্রায় জীবন্মৃত। তারপর সম্পূর্ণ বেকার অবস্থায় তাঁরা চরম দুর্গতির সম্মুখীন হলেন। ঐসব রুগ্ন ও দুর্গত রাজবন্দীদের চিকিৎসা ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য কংগ্রেসের উদ্যোগে গঠিত হল এক Detenu Relief Committee। ঐ কমিটির তহবিলে মুক্তহস্তে সাহায্যদানের জন্য দেশবাসীর কাছে সেদিন এই আবেদন জানান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, কিরণশঙ্কর রায়, জে. সি. গুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি :

'The public are aware that through the efforts of Mahatma Gandhi 1100 internees and externees have been released in course of a few days. That a number of young men and women have been set at liberty after a long incarceration is a matter of some gratification ; at the same time their release has called into being a problem which deserves immediate attention—the problem of their future. Ordinarily the task of relief for these unfortunate youths would rest on the Government of Bengal, but beyond a promise of a very small allowance and an expression of a wish that they be absorbed by the business houses in

suitable employment, the Government do not appear to be prepared to do anything further for their relief. It is, therefore, for the people of Bengal to look after the welfare of those youths. Many of them have regained their liberty in broken health, many families have been financially ruined by their long incarceration ; and many who were students when they were detained have come back to taste all the bitterness of acute unemployment. The responsibility of providing medical attention for them, of easing the distress of those who need monetary help and of relieving their distress till they are set on their feet, has fallen upon the shoulders of the public.

'The Detenu Relief Committee of the Bengal Provincial Congress Committee has been giving such help to ex-detenus as has been possible for them. But unfortunately for want of funds and greater public support it has not been able to give all the relief that they needed.

'The new situation calls for greater cooperation from the public and we hope this will be readily forthcoming.

'We, therefore, appeal on behalf of the Committee to the public and particularly the public institutions and business houses to cooperate whole-heartedly with the effort of the Detenu Relief Committee in their very necessary task of providing relief for the released detenus with money and in helping the Committee in finding employment for them and in all other ways. We fervently hope our appeal shall not have been in vain and the people of Bengal will generously respond to it by sending their remittances to the Secretary Detenu Relief Committee, B.P.C.C., 38/2 Wellington Street, Calcutta, and informing him as well of the member of detenus that the employers can take in.

'All contributions will be thankfully acknowledged in the press.'

('ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ', ৪ খণ্ড, পৃঃ ৩১০-১১)

১৯৩৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে 'নিখিল বঙ্গ রাজনৈতিক বন্দী দিবস' উপলক্ষে এই বানী পাঠান :

'যাঁদের হাতে রাজবন্দীদের মুক্তি দেবার শক্তি, দূরের থেকে তাঁদের কেবল এই কথাই জানাতে পারি যে, শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমা না করবার যে নিষ্ঠুর ভীরুতা ও অনৌদার্য আজ সভ্য আখ্যাধারী প্রায় সকল দেশেই পরিব্যাপ্ত তারই সংক্রামকতা যদি ভারত শাসন বিধিকে অধিকার করে থাকে, তাহলে পীড়িত বাংলাদেশের দুঃখ নিবেদন তাঁদের কাছে ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই দুশ্চিকিৎস বধিরতাকে আমরা রাষ্ট্রনৈতিক সুবুদ্ধির লক্ষণ বলে মনে করি নে। কিন্তু পরামর্শ দেওয়ার অধিকার আমাদের নেই। আমরা কেবল আজ নিপীড়িত বন্দীদের উদ্দেশ্যে আমাদের একান্ত মনের বেদনা জানিয়ে রাষ্ট্রচালন কার্যে অবিলম্বে শুভবুদ্ধির প্রত্যাশা করে থাকব' ('আনন্দবাজার পত্রিকা', ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮)।

১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচনের ফলে তাঁর বিরুদ্ধে গান্ধীজী ও পুরানো কংগ্রেসী নেতাদের মনোভাব কঠোর হয়ে ওঠে। ত্রিপুরী কংগ্রেসে ঐ তিক্ততা চরমে ওঠে। এ হেন অবস্থায় কোন কোন রাজনৈতিক মহল থেকে একটা চেষ্টা হয় গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের একটা বোঝাপড়ার ব্যবস্থা করার। এরই জন্য বিপ্লবী নেতা, সতীন্দ্রনাথ সেন (তাঁর সঙ্গী ছিলেন হরিদাস মজুমদার) অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের বরানগরের বাড়িতে গিয়ে শরণাপন্ন হন রবীন্দ্রনাথের। 'সতীন্দ্রনাথের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রথম বারের লিখিত বার্তা সংশোধিত আকারে প্রেরিত হইল' ('মৃত্যুঞ্জয়ী সতীন সেন'—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৬৩)।

১৯৪০ সালের গোড়ার দিকে ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, রসময় শূর ও সত্য গুপ্ত (মেজর) শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন।

জ্যোতিষ জোয়ারদার মহাশয়েরও তাঁদের সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তিনি যেতে পারেন নি শেষ পর্যন্ত। সত্য গুপ্ত লিখেছেন: 'শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেনের উদ্যোগে আমরা তিন সহযোগী আমন্ত্রিত হই বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে।...তখন গুরুদেবের বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, শান্তি নিকেতনের লোকশিক্ষার ভার ভূপেন্দ্রবাবু নেন। আর শ্রীনিকেতনের ভার (স্বর্গীয় কালীমোহনবাবু তখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন) রসময়বাবু গ্রহণ করেন। অবশ্য এ-সব প্রস্তাব এঁদের introduction ডাঃ সেনই দিয়েছিলেন কবির কাছে' ('রবীন্দ্রসান্নিধ্যে আমরা তিন জন' প্রবন্ধ—মেজর সত্য গুপ্ত, 'শিখা' পত্রিকা, ১১ মে, ১৯৬৮)।

সত্য গুপ্ত মহাশয়ের এই লেখায় আছে কবি তাঁদের শান্তিনিকেতনে কাজের ভার নিতে বলেছিলেন। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন যে কংগ্রেস সভাপতি পদ ছেড়ে দেবার পর সুভাষচন্দ্রকেও তিনি নাকি শান্তিনিকেতনের দায়িত্বগ্রহণ করতে বলেছিলেন কিন্তু তিনি রাজী হন নি—তাঁকে কি একটি জায়গায় আটকে রাখা যায়।'

সত্যবাবু লিখেছেন: 'আমরা কথা দিয়ে এলাম যে আমরা কবির আদেশে শান্তিনিকেতনকে নিজেদের প্রতিষ্ঠান বলে মনে করব। কথা দিলাম যে, অনতিবিলম্বে ভূপেন রক্ষিত রায় এসে কাজে যোগ দেবেন। তারপর ধীরে ধীরে আমরা অন্যান্য বন্ধুদেরও পাঠাব' (ঐ)। কিন্তু ১৯৪০ সালের এপ্রিলেই ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল আর তখন আর তাই সম্ভব হল না সে প্রতিশ্রুতি পালন।

২১ আগস্ট, ১৯৪০ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, সহ-সভাপতি, শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ এবং প্রবীণ বিপ্লবী মনোরঞ্জন গুপ্ত শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখা করেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন '...ইঁহাদের সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারেয় আশু লক্ষ্যে পৌঁছিবার উন্মাদনায় বাংলার রাজনৈতিক কর্মীগণ ভুলিয়া যান যে ভারতবর্ষে সর্বব্যাপী বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিতে হইলে সাংস্কৃতিক প্রগতির প্রয়োজন। তিনি বলেন, ভারতের শোচনীয় সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা বহু অশুভের মূলে রহিয়াছে। ভারতের একাংশ অপরাংশকে কতটুকু চেনে? কাশ্মীর ও কুমারিকা, আসাম ও পাঞ্জাবের মধ্যে কি সাংস্কৃতিক যোগ আছে' ('রবীন্দ্রজীবনী'—৪ খণ্ড, পৃঃ ২৪৬)?

শান্তিনিকেতনে থেকে ফিরে আসার প্রাক্কালে 'এসোসিয়েটেড প্রেস'-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত বলেন 'যদিও আমরা আজ প্রধানত আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেই নিযুক্ত তবু আমরা বিশ্বভারতীকে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র হিসাবেই দেখি। সে-কাজ করার জন্য আমরা যদি নাও বেঁচে থাকি তা হলে আমাদের পরে যাঁরা আসবেন তাঁরা সে-কাজ করবেন। রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের প্রয়াসের সাফল্য স্বভাবতই কবির সেই লক্ষ্যসিদ্ধির পথ করে দেবে যা রূপ পরিগ্রহ করেছে এই প্রতিষ্ঠানে। নইলে অসার্থক হবে সেই প্রয়াস ও ব্যর্থ হবে আমাদের সাফল্য। আমাদের সঙ্গে আলাপকালে কবি দুঃখ জানিয়েছিলেন যে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে না সংস্কৃতিক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর ভূমিকা। এটা হয়তো ঠিক—তবে শুধু কিছুটাই ঠিক। আমাদের মতে লোকশিক্ষা পরিকল্পনাকে যদি তার যুক্তি-সঙ্গত পরিণতি অবধি কার্যকর করা যায় তা হলে বিশ্বভারতী নিশ্চয়ই সুদূর গ্রামবাসীদের কুটিরেও কুটিরেও জড়িত হয়ে পড়বে আর তারাই তো হল ভারত-বর্ষের সত্যকার প্রতিনিধি। এই সফরে আমরা আনন্দ ও লাভ—দুইই পেয়েছি। বিশেষ করে আমরা আনন্দিত এই দেখে যে প্রদেশগুলি যখন ক্রমাগত পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তখন এই শান্তিনিকেতনে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এক সংস্কৃতির উদ্ভবের প্রতিশ্রুতি ও ভরসা পাওয়া যাচ্ছে'... ('অমৃতবাজার পত্রিকা', ২৫ আগস্ট, ১৯৪০, পৃঃ ৮)।

বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে চর্চা করেছেন তার মধ্যে কয়েকজনের নাম আগের প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি। তারই সঙ্গে যোগ করতে হবে শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, শ্রীনেপালচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির নাম। সত্যেন্দ্রনারায়ণের 'রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার', নেপালচন্দ্রের সুবৃহৎ তথ্যনিষ্ঠ 'ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' (এ-প্রবন্ধে ঐ বই থেকে বহু সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে) ও 'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র' সুধীসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। তবে আমার সব থেকে আশ্চর্য লাগে যখন শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্তের মতো অশীতিপর বিপ্লবী নেতাকে দেখি 'রবীন্দ্র চিত্রকলা' সম্পর্কে একটি সুন্দর বই প্রকাশ করতে। শুনেছি ও-বিষয়ে তাঁর আগ্রহ অপরিসীম।

বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের 'বিপ্লবের পদচিহ্ন' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ সবে হাতে এসেছে। তাতে দেখলাম তিনি এক জায়গায় লিখেছেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের

সময়ে রাজসাহী জেলে আটক থাকা-কালীন বন্দীদের মধ্যে যেসব বই নিয়ে সবচেয়ে জোরালো আলোচনা হত তার মধ্যে ছিল গর্কির 'Three of them', শ'-এর 'Mrs Warren's Profession', ইবসেনের 'Doll's House', তুর্গেনিভের 'Fathers and Sons', মেটারলিঙ্কের 'Blue Bird' প্রভৃতির পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে' (পৃঃ ১৩৩)।

আর এক জায়গায় বছরের পর বছর জেলে আটক রাজবন্দীদের অন্তরের সীমাহীন দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন : '…প্রথম জেলে ঢুকেছিলাম প্রেসিডেন্সি জেলের ইউরোপিয়ান ইয়ার্ডে। সেখানকার ৩নং জেলের ভিতরের দেওয়ালে নিচের দিকে এক জায়গায় লেখা দেখলাম—

জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন

আবার তার থেকে কয়েক ইঞ্চিমাত্র দূরে পড়লাম সেই হাতের লেখা—

মা, আর যে পারি না !' (পৃঃ ১৩৭)

ভূপেন্দ্রকুমারের বইয়ে ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর ও আরো অনেক বিপ্লবীর গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

'একে একে এনে একখানি ভ্যানে তোলে। উপেনদা (অর্থাৎ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রবন্ধকার) টেনে টেনে বলেন, 'মনোরঞ্জন (অর্থাৎ মনোরঞ্জন গুপ্ত—প্রবন্ধকার), পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা… !' সকলে একচোট হাসলাম। মনোরঞ্জনদা ও অরুণদা তখন অনিলবরণ রায়ের সঙ্গে একত্রে 'সারথী' বলে সাপ্তাহিক কাগজ বের করতেন। কাগজখানার উপর লেখা থাকত—

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা
যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী
হে চির সারথী, তব রথচক্রে
মুখরিত পথ দিনরাত্রি' (পৃঃ ১৫৮).

বিদেশী এক বিপ্লবীর কথা দিয়ে লেখাটি শেষ করি। ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মকাল। দক্ষিণ ফ্রান্সের এক বন্দীশিবিরে তখন আটক রয়েছেন স্পেন গৃহযুদ্ধের পর সে-দেশ থেকে পলাতক বহু বিপ্লবী। শুধু স্পেনের নয় জগদ্বিখ্যাত 'আন্তর্জাতিক বাহিনী'-ভুক্ত নানা দেশের বিপ্লবীরাও। একটি আন্তর্জাতিক ছাত্র প্রতিনিধি দল গেছেন তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষে। ফরাসী

কারাধ্যক্ষ তাঁদের বন্দীশিবিরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন না—পাছে সেই বন্দী বীরেদের প্রতি দালাদিয়ে সরকারের অমানবিক আচরণ সম্পর্কে বেশি জানাজানি হয়ে যায় সারা দুনিয়ায়। অনেক পীড়াপীড়ির পর কারাধ্যক্ষ রাজী হলেন, ২০ জন বন্দীকে শিবির থেকে এনে ছাত্র প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কথা বলতে দিতে। ঐ ২০ জনের মধ্যে ছিলেন 'আন্তর্জাতিক বাহিনী'-ভুক্ত ব্রেজিল, পোল্যাণ্ড, চীন প্রভৃতি দেশের মানুষ ও কিছু স্পেনের বিপ্লবী। শেষোক্তদের মধ্যে একজন তরুণ মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করতে করতে যোগ দিয়েছিলেন বিপ্লবী বাহিনীতে। আন্তর্জাতিক ছাত্র প্রতিনিধি দলের এক ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে আলাপকালে তিনি জানালেন যে তিনি গান্ধী, টেগোর ও নেহরু সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছেন। তার মধ্যে তিনি প্রথমোক্তকে বাদ দিলেন এই কথা বলে যে "গান্ধী চান ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দিতে—আর আমরা চাই নতুন ও উন্নততর পৃথিবী গড়তে।" তিনি বললেন, তবে টেগোর ও নেহরুর কথা স্বতন্ত্র, যদিও হয়ত তাঁদের উপরেও রয়েছে গান্ধীর ব্যক্তিগত আকর্ষণের প্রভাব। তিনি ফরাসী ভাষায় পড়েছেন রবীন্দ্রনাথের লেখা আর যুদ্ধ-ফ্রণ্টে নেহরুর আত্মজীবনী থেকে কমরেডদের কিছু কিছু পাঠ। তিনি জানতে চাইলেন, ফ্যাসিজমের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কি রকম। সৌভাগ্যক্রমে আমি তখন সদ্য পড়েছি নোগুচির প্রতি কবির উত্তর। আমি সে-কথাই তাঁকে শোনালাম। খুশি হয়ে তিনি বললেন, "জনগণের মধ্যে থেকে হয় তো তাঁর উদ্ভব নয়। কিন্তু তিনি সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন ও সৎ। তিনি প্রগতি ও ন্যায়ের পক্ষে।'

এই উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে Calcutta Municipal Gazette-এর বিখ্যাত রবীন্দ্রস্মৃতি সংখ্যায় প্রকাশিত 'Cameos' প্রবন্ধটি থেকে। সেখানে ঐ স্প্যানিশ বিপ্লবীর নামের কোন উল্লেখ নেই। আর প্রবন্ধকারের নাম দেওয়া হয়েছে 'Vanguard।' আসলে তিনি হলেন সুপরিচিত কমিউনিস্ট সাংবাদিক, শ্রীনিখিল চক্রবর্তী। আন্তর্জাতিক ছাত্র প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে তিনিই সেদিন আলাপ করেছিলেন ঐ বিদেশী বিপ্লবীর সঙ্গে।

তরী হতে তীর

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যে আছে এক বিখ্যাত শ্লোক :

ক্ব সূর্য প্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।

তিতির্ষুর্ দুস্তরম্ মোহাদ্ উড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥

মহাকবির অমিত স্বাভিমানের উপর সমাজপ্রচলিত বিনয়ের মনোরম আচ্ছাদন বিস্তৃত করে তিনি বলেছিলেন 'অল্পমতি আমি কেমন করে তেজঃপুঞ্জ রাজবংশের কথা বলি। এ যেন ভেলায় চড়ে দুস্তর সমুদ্র পার হওয়ার মোহ আমাকে পেয়ে বসেছে!' এটা মনে আসছে কারণ, ভাবছি কেমন করে অল্প কথায় এবং অন্তত কিছুটা অর্থবহ তথ্যের ভিত্তিতে সাড়ে চার বছর ইয়োরোপবাসের জোরে আধুনিক জগতের সবচেয়ে শক্তিধর ও সৃষ্টিশীল মহাদেশের ষড়ৈশ্বর্যমণ্ডিত সত্তার সামান্য একটু পরিচয় প্রদানের প্রয়াস করি! অভয়ে বলে রাখি যে এ বিষয়ে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রকৃত মহার্ঘ তত্ত্ব দিতে পারতেন, কিন্তু মাঝে মাঝে ছড়ানো ভাবে গভীর চিন্তার আভাস তাঁর কাছে পেলেও ইয়োরোপ-সম্বন্ধীয় তাঁর রচনায় ফাঁক, এমনকি ফাঁকিও আছে—'অন্যে পরে কা কথা?' বাংলা-ভাষায় অবশ্য আছে 'ইয়োরোপা' ধরনের বই, যা প্রশংসাও মোটামুটি হয়তো পেয়েছে, কিন্তু তাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতে পারছি না। সে কথা যাক্, কালিদাস প্রতিভাবলে অবলীলাক্রমে ভেলায় চড়ে সাগর পার হতে পেরেছিলেন, যা আমার অসাধ্য—তাই ক্ষান্ত হব। শুধু ক্ষীণ একটা প্রত্যাশা প্রকাশ করব—ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের এই ধ্যানক্লান্ত অর্থাৎ আজও বল্লিমান ভারতবর্ষের সান্নিধ্য নিয়ে দণ্ডী-কৃত 'কাব্যাদর্শ'-বর্ণিত 'শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, ওজঃ এবং কান্তি,' এই নবরত্নখচিত রচনা যেন কখনও দেখতে পারি। অন্নদাশঙ্কর রায়-এর মতো শক্তিমান হয়তো দেখাতে পারতেন যে এটা অসাধ্য নয়, কিন্তু সম্ভবত অচেতনে অল্পায়াসতুষ্টির প্রমাদফলে ভাবের ঘরে

কিঞ্চিৎ চুরির, অপরাধ আমাদের প্রায় সকলেরই যেন চরিত্রগত হয়ে পড়েছে বলে সাহসী, সৎ, সুশোভন সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য যে সুকঠোর সংযম ও সাধনা অল্পমতি আধুনিক বাঙালিকে তাঁর আহ্বান যেন টেনে জাগাতে পারছে না।

'Renaissance' কথাটার বাংলা প্রতিলিপি চালু হয়ে পড়েছে, 'রেনেসাঁ'— কোন এক গুহ্য কারণে শেষের 'স্'-টা উধাও হয়েছে জানি না। কিন্তু দেখে মজা লাগে, যেমন মজা মনে হয় যখন প্রায় আজকাল দেখি 'Sartre'-এর নাম অনেকে বাংলায় লেখেন 'সার্ত্রে,' অথচ আবার হয়তো তাঁরাই 'শার্জে দ্যাফেয়র্'-কে লিখবেন-ই 'শার্জ্ দ্যাফেয়র্।' আগেকার পণ্ডিতমশায়দের মতো 'ষত্বণত্ব'-কাল নেই বা 'হ্রস্ব ই দীর্ঘ-ঈ' তফাৎ কেউ বোঝে না বলে চটে উঠছি না, কিন্তু কেমন যেন উদ্ভট লাগে যখন অনেক বাংলা লেখায় (এমনকি, বিদেশী ভাষায় পণ্ডিতম্মন্য 'রম্য রচনা'-বিশেষজ্ঞদের হাতেও) Paris-কে দেখি 'প্যারী'-রূপে। ইংরিজী ছাড়া অন্য বিদেশী ভাষার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করেই যখন আমাদের বিদগ্ধ সমাজ রয়েছেন, তখন ইংরিজী কেতায় 'প্যারিস্' বলতে আপত্তি কি, কে জানে? যদি ফরাসী উচ্চারণই করতে হয় তো সহজগ্রাহ্য 'পারী' ('ঈ'-টি একটু দীর্ঘই করতে হবে) ব্যবহারে কুণ্ঠা কেন? যদি জবাব পাই ফরাসী 'Cheri'-র অনুবাদ 'প্যারী' ('রাজার নন্দিনী প্যারী, যা করেন তাই শোভা পায়') বাঙালী রসিকজন বাছাই করে নিয়েছেন তো পুলকিত হব। 'প্রিয়ানাম্ ত্বা প্রিয়তমম্ হবামহে' বলার মতো যদি শহরের মধ্যে কেউ থাকে তো তা হল প্যারিস। কোন বিদেশী পথিক না প্যারিসের প্রেমে পড়েছে—উদাসীন, নির্মম, চপল, কুটিল, গভীর অথচ অবয়বের প্রতি কুঞ্চনের মধ্যে আসক্তির মধুরিমা ছড়িয়ে রেখেছে যে মায়াপুরী (১৯৭২ সালে বিমানবন্দর থেকে প্যারিস শহরে ঢুকিনি কয়েক ঘণ্টা হাতে থাকা সত্ত্বেও, কারণ ভয় ছিল যে বুড়ো চোখে কম বয়সের মোহ ভেঙে চুরমার হবে!) এই প্যারিসের Louvre Museum-এ (তথা রোম, ড্রেস্‌ডেন্, লেনিনগ্রাদ প্রভৃতি তীর্থে) এবং অন্যত্র শিল্পসম্ভারের বিস্ময়কর সমারোহ সাক্ষ্য দিচ্ছে ইয়োরোপের অপরিমেয় মহিমার—আর পথে, বিপনীতে, পানাহারগৃহে, নাট্যালয়ে, বিদ্যাপীঠে, কর্মশালায়, জনস্রোতে, সর্বত্র জীবনের যে বিচিত্র চিত্র, মনের চোখে তার অস্পষ্ট প্রতিলিপিকেও মনে হয় এক অসামান্য স্মৃতি। 'রেনেসাঁস্', 'রেফর্মেশন,' 'রেভল্যুশন' তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে বুর্জোয়া যুগকে যে রূপ দিয়েছে তাতে কালিমার অভাব নেই কিন্তু গরিমার ভাতি তো কয়েক শো বৎসর ধরে ইতিহাসের আকাশকে প্রোজ্জ্বল করে রেখেছে, আজ সমাজবাদী

বিপ্লব ও বিবর্তনের পর্যায়ে আছি বলে তাকে নস্যাৎ করা তো সম্ভব এবং সঙ্গত নয়। ভারতবাসী বলেই বুঝি আমরা সেই ভাতিকে সহজে ও অসংকোচে অভিবাদন করতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় ভিত্তিভূমিতে সত্তাকে প্রোথিত রেখে আহ্বান জানাতে পারি। যেমন রবীন্দ্রনাথ ডেকেছিলেন তাঁর 'বিশ্বভারতী'-তে 'যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেক নীড়ম্' ('যেখানে বিশ্ব এক পাখীর নীড়')।

লণ্ডনে Burlington House-এ পারস্য, ইতালী ও ফ্রান্সের শিল্পকলার অপরূপ প্রদর্শনী দেখেছিলাম—সম্ভবত এক বছর হল্যাণ্ডের চিত্রসমারোহও হয়েছিল। মনে সবচেয়ে গভীর দাগ কেটেছিল ফ্রান্সের ছবি। পারসীক চিত্র (আর আশ্চর্য সুন্দর গালিচা) নয়নমনোহর সন্দেহ নেই ; ইতালীর অতুলন শিল্পৈশ্চর্য বিষয়ে বাক বিস্তার করব না, কিন্তু কেমন যেন হাঁফ ধরিয়ে দিয়েছিল ছবির পর ছবির অদ্ভুত জমাট চাপ, আর চোখ আর মন ইতালীর শ্রেষ্ঠ যুগে ক্রমাগত খ্রীস্ট্রীয় পুরাণ থেকে নেওয়া বিষয়বস্তুর পৌনঃপুনিকতায় ক্লান্তি বোধ করত। চিত্রশিল্প সম্পর্কে বিন্দুমাত্র বৈদগ্ধ্যের দাবী আমার নেই, কিন্তু উনিশ এবং বিশ শতকের ফরাসী ছবি হঠাৎ যেন চোখের একটা পর্দা টেনে একেবারে নতুন, অস্থির অথচ স্নিগ্ধ আর মায়াময় আলোর সন্ধান দিয়েছিল। Impressionism, Post-Impressionism, Cubism, Surrealism, Dadaism বাক্য ব্যবহার করে কিছু বোঝাতে পারব না, কিন্তু অকস্মাৎ একেবারে থমকে দিয়েছে Cezanne বা Pisarro—আর কখনও ভুলতে পারব না Gauguin-এর ছবি, দক্ষিণ সমুদ্রের নিতম্বিনী, হাতে ধরা থালায় কয়েকটা আম, আর সর্ব বিশ্ব যেন সেখানে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোণার্ক আর কাঞ্চী, মহাবলিপুরম্ আর এলিফ্যাণ্টা গুহায় অনুভব করেছি সতত সঞ্চয়মান্ বিশ্বকে স্তব্ধ করার শক্তি রাখে মানুষের শিল্পসৃষ্টি। কিন্তু জীবনে প্রথম ছবির মেলায় দাঁড়িয়ে প্রায় যেন বিশ্বরূপদর্শনের আভাস পেয়েছি ইয়োরোপের অনাত্মীয় মাটিতে—ভুলতে চাইলেও তা ভুলতে পারব না।

'ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা' ইত্যাদি কথা শোনা গেলেও বাড়ীতে গানের চর্চা ছিল না। কালোয়াতী বিষয়ে গল্প শুনতাম যে দিলীপকুমার রায় শরৎ চাটুজ্জে মশায়কে কোন্ এক ওস্তাদের গান শোনাবার জন্য জেদ্ করায় শরৎবাবু বলেন, 'হাঁ ভাই, তোমার ঐ ওস্তাদ গায় ভালো তো বটেই, কিন্তু থামে তো?' ব্রহ্মসঙ্গীত থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত (আর কিছু নজরুল, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতির রচনা) মোটামুটি অপরিচিত ছিল না। তবে উচুদরের যন্ত্রসঙ্গীত তখন তেমন শুনেছি

মনে হয় না। ওদেশে সুযোগ এল Kreisler বা Kubelik-এর বেহালা শোনার, একবার তখনকার রুচিতে অবোধ্য (এবং অত্যন্ত কোলাহলবহুল) পিয়ানো শোনা গেল স্বয়ং Stravinsky-র হাতে। রেকর্ডে Bach, Beethoven, Strauss প্রভৃতিকে মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়ার একটা অজ্ঞাতপূর্ব সৌভাগ্য। ক্বচিৎ কদাচিৎ লণ্ডনে দেশদেশান্তর থেকে আনা Philharmonic Orchestra-র ধ্বনি-ঐশ্বর্যে মন ভরে উঠেছে। সাধারণে প্রচলিত সহজ গান—যেমন আমাদের ছাত্র কালে 'Romola', 'My Blue Heaven', Paslez moi d'amour' ইত্যাদি কিম্বা সপ্তদশ শতকের লেখা Ben Jonson-এর 'Drink to me only with thine eyes'-এর মতো বস্তু—ভালো লাগলেও এমন কিছু আশ্চর্য মনে করার মতো ছিল না। গালিকুর্চির নিখুঁত গলায় 'La Paloma', কিম্বা Caruso-র গাওয়া 'O Sole Mio', অথবা Paul Robeson-এর 'Old Man River' কণ্ঠসঙ্গীতের একটা আলাদা স্তরে যেন নিয়ে গেল—অনধিকারী হয়েও দেশের গানের সঙ্গে তুলনার একটা অনিবার্য ইচ্ছা এসে পড়ল। এখানে বলি একটু কথা আমার অনুজোপম সুহৃৎ শঙ্কর মিত্র (তখনকার বিখ্যাত 'স্তর্' ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের পুত্র) সম্বন্ধে। সে চমৎকার গাইতে পারত; অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র ছাত্র। গুরুর শেখানো অনেক গান তার মুখে শুনেছি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে বসে তখনকার পক্ষে নতুন লেখা "একটুকু ছোঁওয়া লাগে একটুকু কথা শুনি" গেয়েছিলেন শুনে একদিন সে যেন মেতে উঠে তখনই গুন্‌গুন্ করে সুন্দর সুরটা ভেঁজেছিল। অক্সফর্ডে ভর্তি হওয়ার আগে মৌখিক পরীক্ষায় চমৎকার তার একটা জবাব মনে আছে। এজন্যই বোধহয় তাকে ভর্তি করে নিতে বিলম্ব ঘটে নি। লণ্ডন থেকে ট্রেনে অক্স্‌ফর্ড আসার সময় সবচেয়ে বেশি কি লক্ষ্য করেছে জিজ্ঞাসা করায় শঙ্কর মিত্র তৎক্ষণাৎ বলে: 'Carter's Little Liver Pills'! বাস্তবিকই রেলপথের ধারে এই ওষুধের বিজ্ঞাপন দৃষ্টিকটু হলেও অসংখ্যবার চোখে পড়ত—এ যেন উনিশ শতকে কোন্ এক গির্জা মেরামত করে দিয়ে সেখানকার উপাসনায় ব্যবহার্য ধর্মসঙ্গীতের মধ্যে Beechaim's Pills-এর সর্বরোগহর গুণ-বিজ্ঞাপনের কাছাকাছি! শঙ্করের একটা কথা ভারি ভালো লেগেছিল বলে মনে আছে: পশ্চিমের উঁচুদরের গানে এক একটা কলি অদ্ভুত বৈভবে ভরা—কারুজো যখন বলেন 'মা-না-তু-সো', তখন অর্থের অপেক্ষা করতে হয় না। ধ্বনিগৌরব দশদিক জুড়ে থাকে।

হয়তো নিছক নির্বোধের মত বাক্‌বিস্তার করে চলেছি, কিন্তু কেমন-যেন

মনে হয়েছে ইয়োরোপের সঙ্গীত যেখানে শ্রেষ্ঠ সেখানে বহু জনসমক্ষে নিখুঁত আনুষ্ঠানিকতাকে পশ্চাদপটে রেখে বুঝি আকাশ থেকে মানুষ কোন্ এক অনির্বচনীয় মহিমাকে টেনে আনে—আর আমাদের সঙ্গীত যেখানে শ্রেষ্ঠ সেখানে সাধক যেন ক্রমশ আরোহন করেন উর্ধে, পুর্বসৃষ্ট গৌরবকে নক্ষত্রকুলের কাছ থেকে আহরণ করে সাধক সহর্ষে সবাইকে দেখাচ্ছেন না, সমুচ্চ উত্তরণের আয়াস ও আনন্দ যুগপৎ তাঁকে সমাহিত রেখেছে। পাশ্চাত্যে যেন পাই মানুষের দৃপ্ত জয়গাথা আর ভারতবর্ষে যেন শুনি প্রশান্ত বিশ্ববন্দনা—পাশ্চাত্যের ঔজ্জ্বল্যের পাশে যেন ভারতবর্ষের কমনীয়তা, একদিকে বুঝি শিল্পমহত্বে পরিপূর্ণ প্রতীতি অপরদিকে বিশ্বরহস্যের জটিলতাজাত বিনম্রতা। এই দ্বিধারায় মনকে অভিষিক্ত করার সাধ্য মানুষ যেদিন পাবে সেদিন তো সে তুরীয়ানন্দ!

কয়েক হাজার বছরের এক সভ্যতার উত্তরাধিকারী আমরা কেউ কেউ হয়তো একটু সহজে তুরীয়মার্গে অবস্থান কল্পনা করতে পারি। কিন্তু মনে হয় সে কল্পনা 'Phoney', তাতে ফাঁকির ভাগ বড় বেশি। রাধাকৃষ্ণনের বক্তৃতা শুনে কৃতবিদ্য ইংরেজকে বলতে শুনেছি 'Oh, what superb wisdom! অথচ আমার সন্দেহ হয়েছে ভাষণটা যথেষ্ট ফাঁপা। আমরা অক্সফর্ডে থাকার সময় এলেন কবি অমিয় চক্রবর্তী, শুনলাম রবীন্দ্রনাথের 'সেক্রেটারী' হিসাবে স্বয়ং গিলবর্ট মরে তাঁর মুরুব্বি, 'বেলিয়ল্' কলেজে ভর্তি হয়েছেন, D. Phil করবেন, ব্রিটেনের 'যুদ্ধোত্তর কবিতা' গবেষণার বিষয়। পরিচয় হল, শান্ত শিষ্ট মানুষটি, কিন্তু কেমন যেন সর্বদা ভাবালু। এক সকালে ইউনিয়ন লাইব্রেরীতে খবরের কাগজ দেখছি, হঠাৎ মনে হল কে যেন এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, একটু অস্বস্তির সঙ্গে লক্ষ্য করি অমিয়বাবু মস্ত 'fire-place'-এর পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছেন এবং অপলকে আমার দিকে চেয়ে আছেন। থাকতে না পেরে জানতে চাই আমায় কিছু বলবেন কিনা, কিন্তু চমক ভেঙে কবি জবাব দিলেন যে কি যেন চিন্তায় তিনি ডুবে ছিলেন আমাকে লক্ষ্যই করেননি। বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী অমিয়বাবুকে উত্তরজীবনে মাঝে মাঝে দেখেছি, আলাপ হয়েছে। কিন্তু ঘটনাটা ভুলতে পারিনি। এরই সঙ্গে মনে আসছে রাধাকৃষ্ণণের কাছ থেকে শোনা কথা; মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপকরূপে বার্ট্রাণ্ড রাসেল্-কে আহ্বান করায় তিনি জবাব দেন যে আজকের দিনে মধ্যযুগে কালাতিপাত তাঁর মনোমত নয়। এতে প্রকাশ পায় সংকীর্ণতা যা ইয়োরোপে নিশ্চয়ই আছে—তবে আমাদের মনের সর্বংসহা ব্যাপ্তিও নিখাদ নয়, তাতে চেতন বা

অচেতন ভাগের অবস্থিতি অস্বীকার করা চলে না।

দেশে থাকতে থিয়েটায় বেশি কখনও দেখি নি, সিনেমার প্রচলনও ছিল অল্প। ওদেশে থিয়েটায় খুব বেশি না দেখলেও মোটামুটি ধারণা পাওয়া গিয়েছিল—Sybil Thorndike-কে দেখলাম St. Joan রূপে ("France is lonely and I am lonely with the loneliness of France"), Cedric Harduicke, Tallulah Bankhead, Elisabeth Berguar, Flora Robson প্রভৃতি অভিনয় চাক্ষুব করা গেল। Max Reinhardt যখন "A Midsummer Night's Dream" মঞ্চস্থ করলেন, তখন তা বাস্তবিকই উপভোগ্য হয়েছিল। কচিৎ কদাচিৎ কোন 'ballet' বা 'revue' দেখা যেত—সমারোহ অনভ্যস্ত চোখে মন্দ লাগে নি। চার্লি চ্যাপ্‌লিন যখন বহুবৎসর পর 'City Lights' ছবি তৈয়ারী করলেন, 'টকি'-কে বিদ্রূপ করলেন, তখকার হৈ চৈ মনে আছে। এমনি ফিল্ম্‌ অসংখ্য দেখা গেছে—মনে পড়ছে J. B. Priestley-র 'The Good Companions'-এর সরস এবং খাঁটি ইংরেজ চরিত্র যা উপন্যাসে এবং চলচ্চিত্রে বেশ প্রকাশ পেয়েছে। ফিল্ম্‌ সোসাইটির কল্যাণে এবং লণ্ডনে তখন 'Academy Cinema'-তে বাছাই করা দামী ছবি দেখাবার ব্যবস্থা থাকায় ফলে অনেক স্মরণীয় ছবি দেখতে পেয়েছি, Eisenstein আর Pudovkin এর 'Battleship Potemkin', 'Storm over Asia', 'October', Paris Commune' 'New Babylon' 'The General Line' ইত্যাদি ছবি জার্মান Pabst-এব 'Kameradschaft' কোন এক ফরাসী পরিচালকের অসম্ভব সুন্দর ছবি (শিশুদের নিয়ে) 'Matemelle', Rene Clair-এর 'Le Million', 'A vous la liberte', প্রভৃতি। সোভিয়েট ছবি 'Mother' (গর্কির উপন্যাসকে ভিত্তি করে) কিংবা 'The Road to Life' (ছন্নছাড়া অনাথ ছেলেমেয়েদের নতুন জীবনে টেনে তোলার কাহিনী) পরে ভিন্ন সংস্করণে দেখেছি, কিন্তু মনে হয়েছে আগেকার কাজই যেন ছিল ঢের বেশি ভালো।

ওদেশের পার্লামেণ্ট ভবনে একদিন মাত্র প্রবেশ করেছি ; সেদিন House of Commons-এর পূর্ণ অধিবেশন ছিল না, চলছিল কমিটি—কিছুমাত্র চাঞ্চল্য ছিল না, একেবারে নীরস লেগেছিল। ওদেশের ধুরন্ধর বাগ্মীদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে অবশ্য শুনেছি অন্যত্র, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির মূলগত দৌরাত্ম্য ভারতবাসী হিসাবে আমাদের চোখে ধরা পড়ত বলে চার্চিল প্রমুখ ব্যক্তিদের সম্পর্কে কখনও কোনও মোহ মনে স্থান পায় নি। মোহ বিস্তার কিছু

পরিমাণে ইয়োরোপ করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তা আসে পশ্চিমের শিল্পসাহিত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও কর্মকাণ্ডের বিপুল গভীর ঐশ্বর্যের স্বল্প আস্বাদের ফলে। খাপছাড়া কতগুলো কথা অগোছালোভাবে এ বিষয়ে লিখলাম জানি। কিন্তু আপাতত এর বেশি তো সাধ্যে কুলাচ্ছে না।

... ...

'৩১ সালের বড়দিনের ছুটি কাটানো গিয়েছিল হুমায়ুন কবির আর শঙ্কর মিত্রের সঙ্গে অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষিত শীতের সুইট্‌জারলাণ্ড ভ্রমণে। Lucerne-এ কিছুকাল অধিষ্ঠান, তারপর পাহাড়ী রেলে Engelberg। যা ছিল বেশ খানিকটা উঁচুতে আগাগোড়া বরফে ঢাকা। নানাদেশের 'টুরিস্ট্' সর্বত্র সেখানে ভ্রাম্যমান্। হরেক ভাষায় কথাবার্তা হোটেল ঘরে এবং বাইরে। লুসের্ন-এ হ্রদ ছিল চমৎকার। নীলজল, একেবারে তলাপর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়, গম্ভীর তুষারাবৃত পাহাড়ের ছায়া জলে ভিজে যেন আরও মনোরম। এঙ্গেলবের্গ-এর গাছপালা পথঘাট তখন বরফে ডুবে ছিল। Ski-ing-এর সরঞ্জাম আমাদের ছিল না, আনাড়ি অবস্থায় সরঞ্জাম ভাড়া করে তুষার ক্রীড়ায় নামার সঙ্গতি বা অভিপ্রায়ও ছিল না। তাই ঘুরে বেড়িয়েছি, বরফের উপর বহুবার আছাড় খেয়েছি ; আশ্চর্যের কথা, চারদিক যখন বরফের শাদায় ঝলমল করছে তখন শীতবোধ তেমন করে নি। পাহাড়ের গায়ে funicular বেয়ে আরও উপরে ওঠা তারপর aerial tramway করে trubsee-নামধেয় শৃঙ্গ পর্যন্ত যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে সময় কেটে যেত। বেশ মনে আছে একটা ছোট 'pension'-এ (পান্থনিবাস) তিনজনের জায়গা খালি ছিল না বলে যেতে হল মামুলি হোটেলে—পরস্পর ঠাট্টা করে বলাবলি হল আমাদের কপাল মন্দ, কারণ 'pension'-এর কর্ত্রীটির বেহারা ছিল বাস্তবিকই অসামান্য। ফিরলাম আমরা ফ্রান্স-জার্মানী সংযোগস্থলে স্ত্রাস্‌বুর্গ হয়ে, এবং যখন লণ্ডনমুখো চলেছি তখন প্রায় নিঃস্ব অবস্থায়—পকেট ঝেড়ে কোনক্রমে পয়লা একত্র করে রেস্তোরা-গাড়ীতে খাবারের দাম দেওয়া যায়। ওদেশে বেড়ানোর সুবিধা এই যে মুটে ভাড়ার বালাই নেই, সর্বত্র স্বয়ংভর কায়দায় সুট্‌কেস্ হাতে নিয়ে ঘোরা সহজ, যেখানেই যাওয়া যাক্ না কেন বিছানাপত্র মিলবেই।

একেবারে একা ঘুরেছি জার্মানীতে '৩২ সালের গ্রীষ্মকালে—ট্রেনে কলোন্ পর্যন্ত (Eau-de-Cologne-এ যার নাম জড়িত)। সেখানকার জগদ্বিখ্যাত 'কেথীড্রল্' বার বার দেখা, রাইন নদীর ধারে ঘোরা তারপর নদী বেয়ে ষ্টীমারে

একেবারে Main পর্যন্ত যাওয়া, নদীর দু'ধারে পুরোনো দুর্গ আর প্রাসাদ, মাঝে মাঝে ছোট্ট গাছে-ভরা দ্বীপ, ক্রমাগত বেঁকে বেঁকে চলেছে নদী, এই নদী যাকে জার্মানরা বলে 'Father' 'রাইন্'। এক জার্মানের সাথে ভাঙা-ভাঙা কথা হল। বললাম আমাদের গঙ্গাকে বলি 'মা')। মাইন্‌ৎস্-এ রাত কাটিয়ে ট্রেনে ইতিহাস প্রসিদ্ধ হাইডেলবের্গ, সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় বহুশত বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল, 'নেকার'-নদীর ধারে পাহাড়ের গায়ে যার অবস্থান, চমৎকার পুরোনো শহর যা না দেখলে নাকি জীবন অপূর্ণ বলে ইয়োরোপে প্রবাদ। হাইডেলবের্গ রেলস্টেশনে নামতে একজন এগিয়ে কথা বল্‌ল, অল্প একটু জার্মান বলতে পারায়, কাজ চালাতে পেরেছিলাম, জানাল সে বেকার। বাড়ীতে 'paying guest' রাখে, আমার থাকা সস্তায় হবে স্বস্তিরও অভাব হবে না, যদি আপত্তি না থাকে তো একটু হেঁটে গেলেই বাড়ী। রাজী হয়ে গেলাম, পরে জানলাম সে ইহুদী। নাম হাইড, বাড়ীতে স্ত্রী এবং কন্যা আছে, গ্রীক ছাত্রও একজন অতিথি হয়ে রয়েছে সেখানে। Blumenstrasse রাস্তায় পুরানো এক চারতলার বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম, আবিষ্কার করলাম যে ব্যবস্থা একটু সাবেকী। স্নান করতে চাওয়ায় bath-tub থেকে কয়লার ডাঁই সরিয়ে পরিষ্কার করে দিল। কিন্তু অন্যদিক থেকে কষ্ট ছিল না। খাওয়া ভালো দাম কম। ঘরবিছানা পরিষ্কার—তা ছাড়া সারা দিনই তো বাইরে। কখনও বা bus-এ চড়ে Black Forest-এ অঞ্চলে যাওয়া। 'বাডেন্-বাডেন্'-এর মতো ছিম্‌ছাম্ আগেকার-নামকরা 'watering place' দেখা। ইউনিভার্সিটিতে অন্যান্য বস্তুর মধ্যে দেখলাম বহুকালের প্রকাণ্ড এক beer-এর জালা—দু'ধারে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। সেটিকে ভর্তি করা হত আগে, beer-পিপাসা ও দেশে তো সামান্য ব্যাপার নয়। শহরের রাস্তায় একদিন দেখলাম ছোট একটা সভা হচ্ছে, হিটলার তখন তার নাৎসি পার্টি নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, আর এক নাৎসি প্রচারক হাত তুলে বলছে 'Versuchen Sie einmal...' (আসুন, একবার সবাই চেষ্টা করি···')—অন্য কথাগুলো মনে নেই, বুঝতেও তেমন পারি নি। আমি যাদের কাছে ছিলাম সেই হাইড-পরিবারের ভবিষ্যৎ কি রূপ নিয়েছিল জানিনা ; শুধু জানি বাড়ীর গিন্নী আমাকে একটু মায়ার চোখে দেখে ফেলেছিলেন, যখন ইংলণ্ডে ফিরে যাচ্ছি বললেন যেন আমি পৌঁছেই ('ankommen') তাঁকে খবর দিই—'ankommen' শব্দটি আজও মনে আছে বলেই লিখলাম। পরে ভেবেছি তাদের কথা যখন হিটলারী দৌরাত্ম্য জার্মানীকে

গ্রাস করল আর প্রথম নৃশংস চোট্ পড়ল ইহুদীদের উপর। মনে আছে জার্মান Reichstag-এর সোসাল ডেমোক্রাট সদস্য Rudolf Breitscheid '৩২ সালের শেষদিকে কিম্বা '৩৩ সালের প্রথম দিকে অক্সফর্ডে ওজস্বী বক্তৃতায় জার্মানীতে 'barbarians in power' সম্বন্ধে সবাইকে সতর্ক হতে বলেন; এই ব্রাইট্-শাইড-কে বিশেষভাবে স্মরণ করছি কারণ ১৯৬৭ সালে দেখেছি Buchcn-wald-এ (গ্যেটে-র Weimar-এর অদূরে) নাৎসি 'concentration camp', যেখানে ১৯৪৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়, শেষ নিঃশ্বাস অবধি হিটলারী দানবিকতার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম চলেছিল। হিটলার-জার্মানী আজ ইতিহাসের এক কাল-স্মৃতি; কিন্তু হিটলার ক্ষমতা দখল করার কিছু পূর্বে জার্মানীতেই্ এক দরিদ্র ইহুদী বাড়ীতে থেকেছি এবং প্রত্যক্ষ করেছি যে মানবীয় অনুভূতি ও আত্মীয়-বোধ দেশে দেশে বান্ধব সৃষ্টি করে রেখেছে।

'৩২ কিম্বা '৩৩ সালে শঙ্কর মিত্রের গাড়িতে ডক্টর ঘোষ এবং আমি ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটা ঘুরে আসতে পেরেছিলাম, সমুদ্রতীরে নামজাদা Torquay-র কাছে Penzance নামে একটা ছোট্ট জায়গায় কদিন কাটালাম, Devon আর Cornwall জেলার বিখ্যাত নিসর্গ সৌন্দর্য আস্বাদ করা গেল, যে প্রান্তে ব্রিটেন দ্বীপের শেষ আর সীমাহীন সমুদ্রের অবিরাম উচ্ছ্বাস সেই Land's End দেখলাম, মৎস্য শিকার যাদের উপজীব্য সেই ধীবরকুল যেখানে প্রধান, উত্তাল সাগরের সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন মোকাবিলা—কত না অখ্যাত অকীর্তিত নির্ভীকতা দেশদেশান্তরের শ্রমজীবীজীবনে! ফেরার পথে Lyme Regis নামক স্থানে ছিলাম এক পুরনো প্রাসাদে। যাকে হোটেল বানানো হয়েছে—খুব একটা দামী জায়গা নয়, তাই ব্যবস্থা শুধু বাহ্যত বনেদী। জ্যোতিশ্চন্দ্রের বিবিধ উক্তি আর শঙ্করের বাংলা গান (কিম্বা মুখ বদ্লাবার জন্য হয়তো Tauber-এর 'You are my heart's delight', অথবা জনপ্রিয় 'I lost my heart in Heidelberg'—ধরনের বিদেশী গান) দিন পাঁচেক খুব শুনলাম আর আবার দেখলাম ওদেশের প্রকৃতির কেমন যেন সযত্ন বিন্যস্ত শোভা। চ্যানেল পার হয়ে কোথাও ঘোরা তখন অর্থাভাবে সম্ভব ছিল না। অক্সফর্ডের বন্ধু N.A.S. Lakshmanan (পরে অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র ডাইরেক্টর-জেনেরল একবার প্রস্তাব করল তার গাড়ীতে ফ্রান্সের উত্তর থেকে দক্ষিণ ঘুরে আসা—সে তখন বিদেশী ভাষা আহরণে উদ্যত, এবং দিলদরিয়া মানুষ বলে অকাতরে অর্থব্যয়প্রবণ, তাই নির্বিত্ত আমি যোগদেবার সাহস পেলাম না। এই লক্ষ্মণন্

কয়েকবার আমাকে অক্সফর্ড থেকে লণ্ডনে নিয়ে এসেছে কারণ আমাদের উভয়েরই প্রয়োজন Bar dinner খেয়ে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার্থীর খাতায় নাম বজায় রাখা। সে ছিল একটু অগোছাল, সময়ানুবর্তিতা তার ধাতে সইত না। নিমন্ত্রিত হয়ে তার ঘরে গিয়ে কয়েকবার দেখা গেছে সে নেই, কোন খবরও রেখে যায় নি। অথচ প্রকৃত দরাজ মানুষ, বুকে জড়িয়ে ধরলে সব নালিশ ভুলে যেতে হয়। তার গাড়ীতে লণ্ডন ছুটে আসা মানে দেরি করে বেরুনো, বিদ্যুৎগতিতে (মাঝে মাঝে ট্রাফিক্ আইনকে কলা দেখিয়ে) দৌড়ানো, Lincoln's Inn-এ প্রায় কাঁটায় কাঁটায় হাজির হওয়া, শৌচাগারে একটু ঢুকে হাত ধোওয়ারও সময় না রেখে! অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো-তে অপর কয়েকজন সমুজ্জ্বল তরুণের মতো লক্ষ্মণম্‌কে আবিষ্কার করেন Lional Fielden ; কিন্তু স্বাধীন ভারতের রেডিও বিভাগের সমুচ্চ আসনে বসে তাকে চক্রান্তকারীদের হাতে বিড়ম্বিত হতে হয়েছিল, অকাল মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নেয়।

*　　*　　*　　*　　*

সরকারী স্কলারশিপের মেয়াদ ফুরোল '৩২ সালের অক্টোবর থেকে—তাই কিছুটা স্বল্প সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে আর বাড়ী থেকে যথাসম্ভব কম টাকা আনিয়ে তার পর থেকে চালাতে হল। কিছুটা কৃচ্ছ্র সাধন অবশ্য ঘটেছিল ; তবে এ শিক্ষাটা পেয়েছিলাম যে ঐ শীতের দেশে অন্তত যুবাবয়সে খাওয়া কমিয়ে অর্থসংকোচ বিপজ্জনক ; বিদেশযাত্রী ছাত্রদের একথা তাই বলি। বিলাতে নিরামিষাশী ভারতীয়েরা অনেক সময় কেমন করে প্রায় হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকত জানি না—তাছাড়া তাদের মতো স্বপাক আহারের প্রবৃত্তি বা অভ্যাস কখনও হয় নি। যাই হোক্, খরচ খুবই সাবধানে করতে হত, দেনা শুধু একটু-আধটু করে যাওয়া গেল ব্ল্যাক্ ওয়েল-এর বইয়ের দোকানে, দেশে ফেরার পরও সেই 'অ্যাকাউন্ট' কিছু কাল চলেছিল। 'বাজে' খরচ অবশ্য বই-কেনা ছাড়া কিছুই ছিল না—লিনকন্‌স্ ইন্-এ ডিনারের সময় প্রথম দিতে চাইত 'beer' কিম্বা 'ginger-beer' আর কিছু পরে 'port' বা 'sherry', সবই প্রত্যাখ্যান করতাম, ginger-beer বস্তুটি ঠিক যে কি জানতামও না (অচিরে দেখা গেল আমার সান্নিধ্য ভোজন টেবিলে, বহু জনের কাম্য, কারণ আমাকে দিয়ে স্বপেয় গুলিকে আনিয়ে সদ্ব্যবহার তারাই করতে পারত !)। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যে পাণ বা সিগ্রেট বা মদ্য স্পর্শ করব না বলে ধনুকভাঙা পণ কখনও করিনি কিন্তু কোনটিই নেশা হয়ে দাঁড়ায় নি, কোনটাকে নিয়ে অভ্যাসও হয় নি—একটু

আশ্চর্য যে ইয়োরোপে ছাত্রাবস্থায় কখনও মদের আস্বাদ চাই নি। ১৯৩৬ সালের শেষাশেষি কলকাতায় বন্ধু হমফ্রি হাউস-এর নির্বন্ধে জীবনে প্রথম হুইস্কি চেখে দেখি, বুঝি বস্তুটি কথোপকথনে সহায়ক, চিত্তবর্তিকাকে একটু উজ্জ্বলও সম্ভবত করে। কিন্তু আসক্তির দড়িতে বাঁধা হওয়ায় অবস্থা কখনও ঘটে নি।

কিছুটা অসুবিধার মধ্যেই গবেষণা সম্পূর্ণ করা এবং ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা চুকিয়ে ফেলার যুগপৎ প্রচেষ্টায় থাকতে হয়েছিল। অক্সফর্ডের Worcester College-এ বিখ্যাত Clarke Manuscripts থেকে রিচার্ড ক্রমওয়েল-এর সময়-কার কিছু অনাবিষ্কৃত তথ্য খুঁজে পেয়ে হৃষ্ট হয়েছিলাম ; লণ্ডনের পুরোনো পত্র-পত্রিকা 'Notes and Queries'-এ তার কিছু ছাপা হয়েছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়মে আর লণ্ডনের পাবলিক রেকর্ড অফিসে প্রাচীন বই আর হস্তলিপি ঘাঁটার মধ্যেও একরকম আনন্দ ছিল ; অক্সফর্ডে Bodleian গ্রন্থালয়ে Clarendon এবং অন্যান্য পুঁথি থেকে মাদকতাও কিছু যেন মিলত। Worcester College-এ ছিল বিরাট জলাশয়, সেখানে বিচরণ করত কয়েকটা রাজহাঁস ; শোনা যেত তারা মাঝে একটু হিংস্র হয়ে ওঠে ! ব্রিটিশ মিউজিয়ম ছিল লণ্ডনে আমার সান্ত্বনা—ঐ বিপুল,জনাকীর্ণ অথচ নিঃসঙ্গ শহরে কালাতিপাত অন্যথা বড় বেশি কঠোর হয়ে পড়ত। গবেষণা করে যেতে ভালো লাগত ; মুশকিল হল সংগৃহীত তথ্যকে সংহতভাবে লিখে ফেলতে গিয়ে। এরই ফাঁকে বারপরীক্ষায় প্রথম অংশ শেষ করতে হয়েছিল—দেখা গেল প্রায় সকলকেই 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা' বারপরীক্ষায় বৈতরণী পার হতে হয় ! সেটা মুলতুবি রেখে 'থীসিস্' সম্পূর্ণ করে দাখিল করা গেল—বেশ একটু আশঙ্কা নিয়ে, কারণ নিজেই জানতাম নিবন্ধের বিষয় বাছাই অতিরিক্ত দুঃসাহসী হয়ে গেছে, যদিও আমার 'সুপারভাইজর' Ogg আমার রচনার অংশবিশেষ দেখে খুব তারিখ করেছিলেন। বিলাত বাসের সবচেয়ে কষ্টকর আঘাত পেলাম (যদিও খুব আশ্চর্য হই নি) যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জানা গেল যে 'ডি-ফিল্' দিতে হলে আরও কিছু পরিবর্ধন ও পরিমার্জন পরীক্ষকরা চাইছেন যদিও তৎক্ষণাৎ 'বি-লিট' দিতে তাঁরা প্রস্তুত। এরকম ঘটনা ওদেশে প্রায় হয়ে থাকে, কিন্তু আমার পক্ষে হল উভয় সংকট। বার পরীক্ষার দ্বিতীয় (এবং শেষ) ভাগ তখনও বাকি ; সময় হাতে নেই অর্থেরও একান্ত সংকুলান, অথচ 'ডি-ফিল' নিশ্চিত করা এবং ব্যারিস্টারীর সনদ নিয়ে যাওয়া যখন লক্ষ্য, তখন উপায় কি ? সর্বনাশ সমুৎপন্ন হলে যা ঘটে তাই ঘটল ; নিরানন্দ মনে স্থির করা গেল যে 'বি-লিট' ডিগ্রীই

নেওয়া যাবে, আর যা হোক্ করে বারপরীক্ষাটা শেষ করতে হবে। আমার মা-বাবার মনে এ সময় মস্ত একটা আঘাত নিশ্চয়ই লেগেছিল—আমাকেও অপরাধ বোধে তখন কিছুকাল পীড়া পেতে হয়েছিল।

এককালে নাকি ব্যারিস্টারী পরীক্ষাটা পরীক্ষাই ছিল না, কিন্তু আমাদের সময়ে (এবং বোধ হয় এখনও) ব্যাপারটা তেমন সহজ নয়। বেশ পাকা আইনজ্ঞ ব্যক্তি ফেল করেছেন পরীক্ষায়, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। আমাদের আগে নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং পরে সুবিমলচন্দ্র রায় পরীক্ষায় প্রথম হয়ে স্বর্ণপদকাদি অবশ্য পেয়েছিলেন। কিন্তু শুনেছিলাম বোধহয় Jennings নামে একজন আইনেরই অধ্যাপক 'ফেল' করেন কোন এক 'পেপারে', আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফৌজদারী আইন পড়িয়ে যাওয়ার পর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো বহু-গুণান্বিত ব্যক্তি ঐ বিষয়ই বুঝি একবার অকৃতকার্য হন। আমি তো প্রথমে পণ করেছিলাম যে Garcia-নামধারী একজনের "In a Nutshell' Series-এর পুস্তিকা পড়ে পাশ করব, কিন্তু জীবনে প্রথম 'ফেল' হওয়ায় অভিজ্ঞতায় ঠোকর খেয়ে বুঝলাম যে অত সহজে কার্যোদ্ধার সম্ভব নয়। লণ্ডনে তখন আকছার ভারতীয় ছাত্র, যাদের পক্ষে ক্রমান্বয়ে বার-পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়া একেবারে গা-সওয়া। পরে শুনেছি একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং পেশায় সফল ব্যারিস্টারের কথা, যিনি অনেককে আইনে 'কোচ্' করলেও নিজে বারবার পরীক্ষায় বিড়ম্বিত হতেন কিন্তু একেবারে গায়ে মাখতেন না। নাম করে বলব না, কিন্তু উত্তরজীবনে যাঁরা ডাকসাইটে ব্যারিস্টার হয়েছেন। হাইকোর্ট-সুপ্রীম কার্টের জজ হয়েছেন, এটর্নী-জেনারলের পদে বসেছেন, তাঁরা অনেকে একাধিকবার ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় অকৃতকার্য। Garcia-র চটি বই পড়ে পাশ করা সম্ভব নয় এটা রীতি মতো ঠেকে বুঝে মরিয়া হয়ে কতকগুলো প্রকাণ্ড বই কিনে Comman Law, Equity ইত্যাদি ব্যাপারে মনঃসংযোগের চেষ্টা করে অবশেষে কোনক্রমে পার পাওয়া গেল। মাঝে একবার কথা হয়েছিল দেশে ফেরার। কিন্তু ডক্টর ঘোষ পরামর্শ দিলেন 'খবরদার, ব্যারিস্টারীর সনদটা হাতে নিয়ে তবে ফিরো—না হয় মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের কিছু কষ্টের টাকা এদেশে খরচ হয়ে গেল, খরচটা বাঁচলেও বিশেষ ফয়েদা নেই, বাঙালী ভদ্র পরিবারের জীবনে তাতে ইতর বিশেষ তেমন ঘটে না।'

স্বীকার করব বিদেশবাসের শেষ কয়েক মাস কষ্টে কেটেছিল—বাস্তবিক মনঃকষ্টে। কতকটা সেজন্য বোধ হয় কিছুটা মনকে ভুলিয়ে রাখার জন্য তখন

পড়েছি Detection, Myster and Horror—সম্পর্কিত বহু বই, E. C. Bentlay থেকে M. R. James প্রভৃতি বহু গুণীর লেখা। মাঝে মাঝে পড়ে চলেছি পুরোনো 'favourite' লেখকদের রচনা—P. G. Wodehouse আর W. W. Jacobs—কিম্বা হয়তো ডুবে গিয়েছি Walter de la Mare-এর অদ্ভুত সুন্দর 'Memorirs of a Midget'-এর মতো রচনায়। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করব, সহায়তা দিয়েছিল বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর 'The Conquest of Happiness'—তাতে আছে 'Envy' সম্বন্ধে এক চমৎকার পরিচ্ছেদ, যার একটা কথা নানা উপলক্ষ্যে ব্যবহার পরে করেছি। রাসেল সুন্দরভাবে বলেছেন যে নেপোলিয়ন ঈর্ষা করতেন জুলিয়স্ সীজর্-কে, সীজর্ ঈর্ষা করতেন হ্যানিবল্‌কে, হ্যানিবল্ ঈর্ষা করতেন আলেকজান্দারকে, আর আলেকজান্দার ঈর্ষা করতেন হারক্যুলিস্-কে—যে-হারক্যুলিস্ হলেন কাল্পনিক ব্যক্তি, বাস্তবে যার অস্তিত্বই ছিল না! আরও মনে পড়ে তখন পড়েছি Somerset Maugham-এর বিবিধ কাহিনী, আর হঠাৎ হয়তো মনের মেঘ কেটে গেছে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল বাক্য আবিষ্কার করে: "The Professor of Gynaecology began his course of lectures as follows: 'Gentlemen, woman is an animal that micturates once a day, defecates once a week, mensturates once a month, parturates once a year, and copulates whenever she has the opportunity? "I thought it a perfectly balanced sentence". (**The Writer's Notebook,** 1895).

বার্ট্রাণ্ড রাসেল একবার লেখেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিবেক অনুসরণ করে যুদ্ধোয়োজনে যোগদানে আপত্তির অপরাধে যখন তাঁর কারাদণ্ড হয়, তখন জেলের গেটে নামধামের সঙ্গে 'ধর্ম কি?' প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন: 'Agnostic' (অজ্ঞেয়বাদী) লিখতে গিয়ে ওয়ার্ডার স্বগতোক্তি করে: 'না জানি কত ধর্মই আছে, তবে সব ধর্মেরই লক্ষ্য এক!' এই মন্তব্যটি তাঁকে জেলখানায় অন্তত সপ্তাহকাল প্রফুল্ল রাখতে পেরেছিল! রাসেল-এর বেশ কয়েকটা কথা আমাকেও দুঃসময়ে একটু স্বস্তি দিয়েছিল। একবার বুঝি দেখলাম তিনি লিখছেন যে এক ভারতীয়ের মুখে শোনা গেল যে পৃথিবীটা ভর করে আছে এক হাতীর মাথায় আর হাতীটা নাকি রয়েছে এক কচ্ছপের পিঠে—কে যেন জিজ্ঞাসা করল কচ্ছপটা কার ওপর, তখন ভারতীয়টি বললেন, 'ঢের হয়েছে, এবার বিষয়টা বদলালে হয় না?' রাসেল একটা শুধু রহস্য করেই

বলেন নি ; ভগবান্ যদি স্বয়ম্ভূ হতে পারেন তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও তো আপনা হতে গজাতে পারে, তাই মূল প্রথম কারণ রূপে ঈশ্বর-কল্পনাকেই তিনি আক্রমণ করছিলেন। সে যাই হোক, আমার কাছে এমন সরস গভীর কথা তখন যেন প্রশান্তির প্রলেপ এনে দিচ্ছিল। আজও ভুলতে পারি নি রাসেল-এর গল্প যে একদিন কে একজন এসে বললেন, 'মশাই, আপনার গ্রন্থাবলী পড়ে চলেছি কিন্তু একবর্ণও বুঝলাম না, আর যেটুকু বুঝলাম তা দেখি ভুল কথা !' কি ভুল, প্রশ্নের জবাব এল যে রাসেল লিখেছেন—জুলিয়াস সীজর্ মৃত। এতে ভুল কোথায় জানতে চাওয়ায় ভদ্রলোক রুষ্ট হয়ে বললেন, 'আরে মশাই, আমিই তো জুলিয়াস সীজর্ !'

*   *   *   *   *

সন-তারিখ মনে নেই, কিন্তু অক্সফোর্ডে যখন আমি পুরনো হয়ে গেছি, তখন হঠাৎ খবর পেলাম যে ডক্টর ঘোষের মা মারা গেছেন। তখনই ছুটলাম Boar's Hill-এর চড়াই রাস্তায়, তাঁর বাসায়, দেখলাম দেশ থেকে মর্মান্তিক খবর পেয়ে তিনি মুহ্যমান, প্রায় বাহ্যবোধ রহিত। মা ছাড়া দেশে আর কারও সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তখন ছিল না, তাই আঘাত হয়েছিল প্রচণ্ড। বিহ্বল ভাবে একটু আধটু কথা বললেন—স্পষ্ট মনে আছে শুধু মা নয়, স্বদেশের জন্যও তখন তিনি আকুল হয়ে পড়েছিলেন, বারবার বললেন যে এই শোকের ঘায়ে বুঝছি যে এ-দেশ আমাদের জায়গা নয়, 'Our roots touch different soil'। তাঁর এই ইংরাজী বাক্যটি আমার স্মৃতিতে আজও জ্বল জ্বল করছে—আজও (১৯৭৩) প্রবাসী এই প্রকৃত গুণাঢ্য বাঙালি মাতৃবিয়োগকালে সেদিন অনুভব করেছিলেন যে আমাদের সত্তার শিকড় স্পর্শ করে আছে যে-ভূমিকে, তা হল আমাদেরই স্বদেশেরই ভূমি, অন্যত্র নয়। বোধ হয় পরদিনই তাঁকে দেখেছিলাম ভারতীয় মজলিস-এর সভায়, বেশ নিজেকে সামলে নিয়েছেন, মুখচোখের চেহারা স্বাভাবিক, কিন্তু আমার মনের সংগ্রহে রয়ে গেল তাঁর শোকদীর্ণ মূর্তি আর সেই পরম শোকের মুহূর্তে জননী ও জন্মভূমির অচ্ছেদ্য মায়া যে অভিমানী, দেশত্যাগী সন্তানকেও অমনভাবে বিভোর করতে পারে তার পরিচয়।

হঠাৎ মনে পড়ছে ১৯৩০ সালের মে-মাসে দেশে তখন আইন-অমান্য

আন্দোলন পুরোদমে চলেছে, তখন রাধাকৃষ্ণন-এর মতো ব্যক্তি, যাঁকে স্থিতধী বলা হয়তো অত্যুক্তি কিন্তু যিনি মোটামুটি সাবধানী ও সুবিবেচক সজ্জন (মনে রাখতে হবে তখন তিনি বহন করতেন ইংরেজ সরকারের দেওয়া 'নাইট্‌হুড'-এর বোঝা বা ভূষণ), অক্সফোর্ডে ম্যাকেস্টার কলেজের Unitarin গির্জাঘরে এক রবিবার Sermon দিলেন, text বাছাই করলেন বোধ হয় St. Luke থেকে : And I say unto you: Overturn···শুনতে গিয়েছিলাম অনেকে এবং দেখলাম অধ্যাপক যেন অবসন্ন, পরে জানলাম গায়ে একটু জ্বর তখন তাঁর ছিল,—কিন্তু সেই পরিশ্রান্তির ভাব যেন তাঁর ভাষণকে দিয়েছিল এক অদ্ভুত দীপ্তি, কারও মনে সংশয় রইল না ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রাম তাঁর হৃদয় ও চিত্তবৃত্তিকে অধিকার করে রয়েছে, 'ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ কারা'—যেন সর্ববিধ বৈষয়িক বাধা ঠেলে বলতে চাইছেন শ্রুতকীর্তি বিদ্বান। পুরো এক বছর (১৯২৯-৩০) তিন "টার্ম" ধরে রাধাকৃষ্ণন্ সপ্তাহে দুটো বা তিনটে বক্তৃতা দিয়ে তখন মুগ্ধ করেছিলেন, কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে 'Overturn' Sermon-টি অবিস্মরণীয় থেকে গেছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণনের সম্পর্কচ্ছেদ তখনও হয় নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন থেকে তার ভার ছিল তাঁর হাতে। তিনি স্থির করে রেখেছিলেন হুমায়ুন কবির এবং আমাকে ওয়ালটেয়ারে নিয়ে যাবেন। আমি ব্যারিস্টার হই বা না হই সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না, তবে লিখিতভাবে কিছু না দিলেও স্পষ্ট জানিয়ে রেখেছিলেন যে দেশে ফিরে আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে যোগ দিতে হবে। অমন একজন ব্যক্তির আগ্রহাতিশয্যকে অবহেলা করা সম্ভব ছিল না; হুমায়ুন এবং আমার দু'জনেরই তাই অধ্যাপনায় হাতে খড়ি ওয়ালটেয়ারে, আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে। দেরিতে (১৯৩৪) দেশে ফিরে দেখলাম যে বহু পূর্ব থেকে আন্ধ্র ছাত্রমণ্ডলীর কাছে আমি রাধাকৃষ্ণনের কল্যাণে পরিচিত হয়ে পড়েছি। এমন কি অনায়ত্ত 'ডক্টরেট'-টিও এই অভাজনের নামের সঙ্গে এভাবে আরোপিত হয়েছে যে তাকে ছাড়িয়ে নেওয়া প্রায় অসাধ্য। বিলাত প্রবাসকালে মাঝে মাঝে রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘট্‌তো। কাজে যোগদানের তাগাদাও শুনতে হতো। রাধাকৃষ্ণন কয়েকবার এসেছিলেন জেনীভা শহরে তৎকালীন জাতিসংঘের (League of Nations) Commission on International Intellectual Co-operation-এ ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধি রূপে। তখন দেশভ্রমণ কালে তাঁর মালপত্র কোথাও কোনো শুল্ক (customs) কর্মচারী পরীক্ষা করতে পারত না, রাষ্ট্রদূতদেরই মতো এ-বিষয়ে অব্যাহতি (diplo-

matic immunity) তাঁর ছিল। সুযোগ বুঝে আমার বন্ধু সজ্জাদ জহীর মতলব করেন যে 'প্রোফেসর' ইয়োরোপে এলে তাঁর জিম্মায় কম্যুনিজম্-সম্পর্কিত যথাসম্ভব বইপত্র দেশে পাঠানো যাবে, কোথাও ব্রিটিশ সরকারের নেকনজরে সেগুলো আটকে পড়বে না। গ্রন্থ-প্রেমে রাধাকৃষ্ণন অপরাজেয়। মনের প্রসারও তাঁর প্রচুর, কম্যুনিজম্ মানেন না কিন্তু তার প্রচার নিষিদ্ধ করা বর্বরতা বলতে কুণ্ঠিত নন। আমাদের তো প্রায় বলতেন (এবং পরে দেশে ফিরেও বলেছেন) যে কম্যুনিজম থেকে 'শ্রেণীযুদ্ধ' কাণ্ডটা কেটে দিলে তিনি নিজেকে কম্যুনিস্ট বলতে রাজী ('Cut out the "class war" stuff from communism, and I am a Communist !')। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন Knight হওয়া সত্ত্বেও তাই বিনা সংকোচে এই 'নিষিদ্ধ'বইয়ের বোঝা তিনি নিয়ে যেতেন এবং জমা দিতেন আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থালয়ে। পরে বলব এই গ্রন্থালয়ের কথা, যেখানে মার্ক্সবাদ অনুশীলনের প্রচুর সুবিধা পেয়েছি—আর মর্মাহত হয়েছি আবিষ্কার করে যে রাধাকৃষ্ণনের উত্তরাধিকারী আর এক 'Knight' ভাইস চান্সেলার 'কম্যুনিস্ট' বই বাছাই করে পুলিশের জিম্মায় সেগুলিকে তুলে দেন।

'২৮ সালের মতোই '৩২ সালে অলিম্পিক হকি-তে ধ্যানচাঁদ প্রমুখ মহারথীর কল্যাণে ভারতবর্ষ আবার বিশ্বজয়ী হয়েছিল—'৩৬ সালে শ্বেতচর্মের উৎকর্ষ ঘোষণায় উন্মাদ হিটলারশাহীকে যেন বিদ্রূপ করে বার্লিন অলিম্পিকেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। পরে দেখেছি ধ্যানচাঁদ, তার ছোট ভাই রূপসিং এবং অন্যান্য দেশের মুখোজ্জ্বলকারী খেলোয়াড়কে কত বিড়ম্বনা ভুগতে হয়েছে—একবার বিলেত থেকে ফেরার পর আমাদের বাড়ীতে তাদের কাছে থেকে দেখেছিলাম, আমার যে ছোট ভাই অমিয় প্রেসিডেন্সি কলেজের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন ছিল তার নিমন্ত্রণে। বিশ্ববিশ্রুত হয়েও বিনয়ী ও সদালাপী এধরনের মানুষ স্বাধীন ভারতে যেন যথাযোগ্য স্বীকৃতি ও মর্যাদা পেল না অথচ. স্বাধীনতার পূর্বে এদের নিয়েই আমরা অহঙ্কার করতাম, এদের কৃতিত্বে পরাধীনতার জ্বালা কিছুটা প্রশমিত হতো। '৩২ সালে আবার বুক দশহাত হয়েছিল ইংলণ্ডে আমাদের ক্রিকেট 'টীমকে' পেয়ে। পোর বন্দরের মহারাজাকে ইংরেজ ক্যাপ্টেন করে পাঠায় কিন্তু তাঁর সুবুদ্ধির ফলে খেলায় অধিনায়কত্ব করতেন সি.কে.নায়ুডু , যার কথা আগে লিখেছি এবং পুরো এক কথকতা যাঁকে নিয়ে করা চলে। 'লর্ডস্' মাঠে প্রথম পদার্পণ করে "সেঞ্চুরী" করলেন নায়ুডু, "Wisden'-এর প্রসিদ্ধ পাঁজিতে তাঁর স্থান হল 'Cricketer of the Year'

হিসাবে, ভারতীয় দল সম্বন্ধে নিরুৎসাহ বিলাতী কাগজও মন্তব্য না করে পারল না যে তাড়াতাড়ি 'রান্' তুলতে হলে World XI-এ নায়ুড়ু বিনা চলবে না, দেখলাম অক্সফোর্ডের মতো জায়গায় ছোট ছেলেরা মিলে রাস্তায় ক্রিকেট খেলছে, একজন বলছে 'আমি হলাম না-য়ু-ডু'! সে বছর একটা মাত্র 'টেস্ট' খেলা হয় ইংলণ্ডের সঙ্গে—অসম্ভব চাঞ্চল্য চারদিকে যখন প্রথম ইনিংস-এ ইংলণ্ডের তিন উইকেট পড়ে গেল মাত্র ১৭ 'রানে', Sutcliffe Holms এবং Woolley-র মতো ডাকসাইটে খেলোয়াড়কে ফিরে যেতে হল। মাঠে ভারতীয় 'টীম' নামলে চমৎকার দেখাত, কারণ অনেকেরই দশাশয়ী অথচ সুঠাম চেহারা (অক্সফোর্ডের মাঠে দর্শককে এ বিষয়ে মন্তব্য করতে শুনেছি)—সি.কে.নায়ুড়ু, ওয়াজির আলি, নাজির আলি, নাওমল, লাল সিং, মুহম্মদ নিসার, অমরসিং ব্যাটে-বলে-ফিল্ডিংয়ে—এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্। এমন নয় যে সাফল্য সর্বদা এসেছে—আসে নি, কিন্তু খেলা দেখিয়ে দর্শকের মন ভরাবার জাদু যেন জানা ছিল সেই 'টীম'-এর। পর বৎসর '৩৩ সালে ইংলণ্ড এল ডি. আর. জার্ডীন-এর অধিনায়কত্বে ভারতবর্ষে খেলতে এল। বেশ মনে আছে স্বয়ং Hobbs তার বইটা দেশের কাগজে লিখে পাঠাতেন, 'Close of Play' সংস্করণের সান্ধ্য পত্রিকার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম—আনন্দ আর গর্বের অবধি রইল না যখন পড়লাম বোম্বাইয়ে M. C. C.-র বিপক্ষে তরুণ অমরনাথের 'সেঞ্চুরী'-র কথা। Hobbs-এর যে বর্ণনা বেরিয়েছিল সেই ক্রীড়ামালা বিষয়ে তা কোথাও পুনর্মুদ্রিত দেখি নি, কিন্তু হলে ভালো হতো। ক্রিকেট-লেখার কথায় মনে আসছে (কালানুক্রমিকতা অনুসরণ করছি না) Neville Cardus-এর অনবদ্য রচনার অবিস্মরণীয় রেশ—একবার দলীপ সিং-এর ব্যাটিং সম্বন্ধে লিখলেন, বিকেলের রোদের মতোই যেন তা মাঠকে আলো করে রেখেছিল, আবার বোধ হয় ১৯৩৬ সালে Old Trafford-এ মুস্তাক আলী আর অমর সিং-এর ব্যাটিং দেখে অনবদ্য ভাষায় ব্যক্ত করলেন ভারতবর্ষীয় ক্রিকেটের ইন্দ্রজালের কথা, যে-ইন্দ্রজালের রাজা একদা ছিলেন রঞ্জিৎ সিংজী; আর একবার আমার বিশেষ বন্ধু বিজয় মার্চেন্ট-এর অনিন্দ্য ক্রীড়াশৈলী সম্বন্ধে বললেন,বিজয় হল 'India's only European!' নেভিল কার্ডুস্-এর মতো ক্রিকেট-লেখক আমার অভিজ্ঞতায় জানা নেই; ভাবি বুঝি এর কারণ হল যে তিনি লেখেন সঙ্গীত আর ক্রিকেট উভয় বিষয়ে, আর হয়তো কোথায় যেন সঙ্গীত আর ক্রিকেটে মিল আছে। উভয়েই যেন আছে সময়কে আচ্ছন্ন-করে-

রাখা আনন্দ আর সময়ে অতিক্রম-করে-থাকা তার রেশ।

কোথা থেকে কোথায় চলে এসেছি, এবার আবার সূত্র ধারণ করা যাক। ব্যারিস্টারী পাসের বিষম হাঙ্গামা চুকিয়ে অক্সফোর্ড-বাসের পাট উঠিয়ে দেশে ফেরার আয়োজন করতে হল। অক্সফোর্ডে তখন আমার অনেকটা নিরাসক্ত অবস্থান। প্রায় যেন ডক্টর ঘোষেরই মতো—Mallalien, Irvine, Anthony Green Wood প্রভৃতি যারা ব্রিটিশ রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ কিছুটা ছিল, কিন্তু ক্রমশ নানা কারণে নিজেকে গুটিয়ে নিতে হচ্ছিল। ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে নতুন যারা, তাদের মধ্যে জে. কে. অটল, হিম্মৎ সিং, বি. পি. এল. বেদী (যে ফ্রীডা নামে এক সহপাঠিনীকে বিয়ে করে এবং উদ্যোগিতা সহকারে কতকগুলো বই ইয়োরোপে প্রকাশ করে একটু খ্যাতি পেয়েছিল বহু পরে তাকে দিল্লীতে দেখেছি কিন্তু কেমন যেন নিভে-যাওয়া অবস্থায়)। কচিৎ কদাচিৎ আহ্‌মদাবাদের খ্যাতনামা শেঠ অম্বালাল সারাভাইয়ের ছোট মেয়ে ভারতী (যার ইংরিজী কবিতার কিছু চল্ হয়েছিল, হুমায়ুনও একখণ্ড কবিতার বই ইংরিজীতে বার করেছিল) প্রভৃতির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হতো। এরিক ডে কস্টা তো আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, যেমন ছিল লক্ষ্মণন্, যাদের কথা আগে বলেছি—তারা এখনও ওদেশ ছাড়ে নি। বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র বসুর কনিষ্ঠ পুত্র প্রশান্তকুমারের সঙ্গে হৃদ্যতার কথা আর কি বলব—তার মতো অজাতশত্রু মানুষ দুনিয়ায় খুব বেশি মেলে না। কিন্তু সে এবং তার প্রায় নিত্য সহচর জি. সি. ব্যানার্জি (ইংরিজী সাহিত্যে যার ব্যুৎপত্তি মহারাষ্ট্রে বিখ্যাত, অর্থাৎ বোম্বাইবাসী এই কৃতবিদ্য বাঙালিকে বাঙলা কেন স্মরণ করে না জানি না) তখন দেশে ফিরে গেছেন। শঙ্কর মিত্রের কথা আগে লিখেছি—সে বোধ হয় আমার পরে দেশে ফিরেছিল, আর যখন আমি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়েস ম্ভবত সেই সময় হঠাৎ কলকাতায় সর্দি-জ্বরে মারা যায়। তার স্মৃতিতে শঙ্কর মিত্র কীর্তন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু আমার অনুজোপম এই সুকণ্ঠ, সুদর্শন সুহৃদের অভাব আজও ভুলতে পারি নি। প্রশান্ত বসু এবং জি. সি. ব্যানার্জি (গোপাল-চন্দ্র) ওখানে থাকা কালে মাঝে মাঝে গল্প করতে নিয়ে যেতেন ওদেরই সহ-পাঠিনী (ইংরিজী বিভাগে) কুমারী ব্যানার্জির কাছে (পরে ইনি বি. জি. রাও নামে এক আই. সি. এস. কর্মচারীকে বিবাহ করেন)। সেখানে দেখতাম তাঁর মাতুলকে, যিনি সাইকেলে বিশ্ব-পরিভ্রমণ করেছিলেন, বোধহয় হকিতেও নামজাদা খেলোয়াড় ছিলেন। প্রশান্ত বসুর ভালো মানুষ বলে সুখ্যাতি এমন ছিল যে একবার

তাঁর মোটরগাড়ীতে তিন ছাত্রীবন্ধু প্রায় জোর করে কয়েক ঘণ্টার 'নোটিশে' তাদের Stratford-on-Avon-এ পৌঁছিয়ে দেওয়ালো ; ব্যাপারটা স্থির হল আমার ঘরে বসে, আর বেশ মনে আছে প্রশান্তবাবু যথেষ্ট অসুবিধা সত্ত্বেও প্রশান্ত মনে রাজী হলেন। বলা বাহুল্য কোনো প্রকার প্রত্যাশাই এ ব্যাপারে তাঁর ছিল না। অক্সফোর্ডের পালা চুকিয়ে নিতে চললাম যখন, তখন আমার পুরনো বন্ধুরা প্রায় নেই এবং নতুনেরা (যেমন 'মক্কি' অটল বা হিম্মৎ সিং) কেমন যেন আমাকে 'elder statesman' ভাবতে আরম্ভ করেছে—অস্বস্তিকর অবস্থা বই কি! যা থেকে নিস্তার পাওয়া দরকার ছিল।

* * * * *

ওদেশের মায়া কাটাতে কষ্ট যে হয় নি তা একেবারে নয়। যার স্বভাবই হল নিঃসঙ্গ, ওখানকার পরিস্থিতি তার পক্ষে সাধারণ অর্থে সুখকর অবশ্য নয়—কিন্তু স্বস্তি আর সুখের সন্ধানে যে সর্বদা থাকতে হবে এমন কথা নেই, অল্পায়াস-লব্ধ সুখের জন্য ব্যগ্রতাও ছিল না। সে দেশে দেখেছিলাম যে সাম্রাজ্যবাদের পীঠস্থান হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত সদ্‌গুণের সমাবেশ বহুজনের মধ্যে রয়েছে, বুঝে ছিলাম যে মতভেদ ও প্রকৃতিভেদকে অতিক্রম করে সে দেশের মানুষের সঙ্গে গভীর এবং সর্বথা নির্ভরযোগ্য সৌহার্দ্য সম্ভব। অনুভব করা গিয়েছিল পরাধীন দেশ থেকে এসেও সেখানকার মুক্ত মানসক্ষেত্রে কথঞ্চিৎ বিচরণের স্বাচ্ছন্দ্য। অক্সফোর্ড রেলস্টেশনে বিদায় দিতে কয়েকজন বন্ধু এসেছিল—আমাদের বাঙালীর চোখে জল একটু সহজে আসে, তবুও একটু অপ্রতিভ ভাবে স্বীকার করছি যে চেষ্টা করে চোখের জল ঠেকাতে হয়েছিল। লণ্ডন—প্যারিস—মার্সাই হয়ে আবার 'পি-এণ্ড-ও' জাহাজে পাড়ি দিলাম (জাহাজ ভাড়া সরকার না দিলে আসতাম আমাদের পক্ষে পছন্দসই ইতালিয়ান জাহাজে) বোম্বাইয়ে কালবিলম্ব না করে সোজা রেলে চেপে কলকাতা, সেখানে মা, বাবা, দাদু, ভাই বোনেরা ও অন্যান্য স্বজনের সান্নিধ্য পেলাম অনেকদিন বাদে। উল্লাসে অভ্যস্ত নই কিন্তু আনন্দ অবশ্য হয়েছিল—তবু স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই যে মনের কোণে একটা খচ্‌খচ্‌ ভাব বেশ কিছুকাল ছিল, নিজের অকিঞ্চিৎকর সত্তারই একটা অংশ কেমন যেন বৈরী দেশে ফেলে আসা গিয়েছিল, একেবারে অসম্ভাব্য ও হাস্যকর জেনেও তখনকার 'স্টেটসম্যান'-জাতীয় কাগজের প্রথম পাতায় Homeward Sailings'-এর বিজ্ঞাপন দেখে কল্পনা কিছুকাল চলেছিল আবার ভবিষ্যতে ও

দেশটা দেখে আসা নিয়ে! আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের তাড়া ছিল বলে আবার ঘর থেকে বিদায় নিতে হল; সপ্তাহ খানেক মাত্র সেবার কলকাতায় ছিলাম, মনে আছে পাঁচ বছরের অভ্যাস অনুযায়ী কলকাতায় দোকানদারকে 'অনেক ধন্যবাদ' জানিয়ে অবাক করে দিয়েছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভালো ব্যবহার পেয়েছি। 'সাহেব' কখনও যে হইনি তা হলপ করে বলতে পারি, কিন্তু কতকগুলো 'ইংরিজিয়ানা' হয়তো ধাতস্থ হয়েছিল (বেশ ক বছর বাদে প্রাতঃস্মরণীয় শিল্পী যামিনী রায় যখন বলতেন যে তাঁর পরিচিতদের মধ্যে শুধু কবি বিষ্ণু দে এবং আমি খাঁটি বাঙালি হয়েও 'সাহেব', তখন মজা লাগত)—আর একটা জিনিস বুঝেছিলাম যে 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যে একেবারে গোঁড়া, একগুঁয়ে দেশাভিমানী চরিত্রকে শেষ পর্যন্ত আইরিশ বানিয়ে দিলেন তার সঙ্গত, শিল্পসম্মত, চিন্তাপ্রসূত হেতু আছে। What do they know of India who only 'India knows?'

বিলাত থেকে জামাকাপড় জুতো ইত্যাদি এমন কিছু সঙ্গে করে আনি নি, যা কারও চোখ ধাঁধায়। বর্তমানে এদেশে 'craze for foreign' বলে যে-বস্তু চালু আছে তা তখন ছিল না। তবে কারও কারও ঔৎসুক্য ছিল Bond Street না হোক কাছাকাছি ঘেঁষতে পারে এমন ফ্যাশানদার কাপড়-চোপড় সম্পর্কে। আমার আকৃতি এমন যে সহজে তৈরী পোষাক গায়ে বেশ লেগে যেত—মনে আছে ১৯২৯-এর অক্টোবরে লণ্ডনে হর্নব্রাদার্স দোকানে ফ্ল্যানেল প্যাণ্ট ('bags') এবং একটা Tweed কোটের সন্ধানে হুমায়ুনের সঙ্গে গিয়েছিলাম—দর্জি মাপ নিয়ে বলল 'Sir, did anybody ever tell you that you have a film star's waist?' বুড়োবয়স পর্যন্ত আর কিছু না থাকুক, আমার ঐ 'film-star's waist' এখনও আছে শুনি, বাড়তি মাংস অবয়বে অল্পই। রীতিমতো মাপ দিয়ে 'স্যুট' যে ওদেশে বানাই নি তা নয়। কিন্তু Burton কোম্পানীর দৌলতে কলে-সেলাই 'রেডি-মেড' স্যুট-ও আমার বেশ চলে গিয়েছে। কেতাদুরস্ত ছাতা কিনে আনি নি; 'ম্যাকিণ্টশ' (ওয়াটার প্রুফ) যেটি এনেছিলাম, সেটিও সাদা-মাটা; ওভারকোটটি অবশ্য ভালো, অদ্ভুত টেক্‌সই, আজও তা বর্তমান, পরকালে সাক্ষ্য দেবার জন্য তৈরী, কিন্তু তারও কোনো আভিজাত্য নেই। আমাদের মাস্টার মশাই নিবারণবাবু—যাঁর কথা আগে বলেছি—সৌখীন মানুষ ছিলেন, নিজে Cuthbertson & Harper থেকে সুন্দর বিলাতী 'K' Shoe কিনে পরতেন; তিনি দেখতে চাইলেন আমার বিলাত থেকে আনা জুতো,

এবং দেখে বললেন, 'আরে ছিঃ, এর চেয়ে ভি-সিন-এর মতো চীনা বাড়ীতে ভালো জিনিস মেলে !' সেযুগে আজকালকার হরেকরকম gadget-এর জন্য লালায়িত হওয়ার প্রচলন ছিল না, তাই বিদেশ থেকে সম্ভার তেমন কিছু আনার কথা ভাবি নি। তবে এনেছিলাম বই, যা সারা পথ জাহাজে ভেসে কলকাতা বন্দরে হাজির হল, আর 'কাস্টম্‌স্'-এর হাত থেকে রেহাই পেল অনেক হাঙ্গামা-হুজ্জুতের পর। ওয়ালটেয়ারে বসে চিঠি পেলাম ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জি কোম্পানীর কাছ থেকে যে আমার গ্রন্থরাজি বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, তবে কিনা মহামান্য সরকারের হুকুমে চারখানা বই আটকানো হয়েছে। সেগুলো এই 'নেটিভ' দেশের রাজনৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বলে ; যতদূর মনে পড়ে তার মধ্যে ছিল 'The Condition of India' বলে এক প্রামাণিক বামপন্থী সংকলন, লেনিনের একটা জীবনী (গ্রন্থকারের নাম মনে নেই)। 'Brusski : A Peasant Novel' (রুশ লেখকের নাম মনে পড়ছে না)। আর সম্ভবত 'India under British Terror' নামে ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টি সংগৃহীত কতকগুলো তথ্য, যার মধ্যে ছিল ১৯৩০ সালে মেদিনীপুর এবং পেশওয়ারে মুক্তিসংগ্রামদমন বিষয়ক বহু তথ্য। বিলাতে পিক্‌ফর্ড কোম্পানী এবং B.I.S.N. জাহাজের জিম্মায় অক্ষত অবস্থায় আমার সাধের Encyclopaedia মেহগনি-টেবিল সমেত এসেছিল, কিন্তু পূর্বোক্ত গ্রন্থচতুষ্টয়কে পরাধীন ভারতবর্ষে অবাঞ্ছিত ও আপত্তিকর বলে সরকার বাহাদুর বাজেয়াপ্ত করে নিল। রুষ্ট হয়ে। আর হয়তো তখনও বিদগ্ধ ব্রিটিশ সাংবাদিকতার উপর কিঞ্চিৎ আস্থা থাকায়, প্রতিবাদ-পত্র পাঠালাম 'New Statesman and Nation'-এ। সেটি যে ছাপা হয়েছে জানতাম না ; একদিন স্বয়ং ভাইসচান্সলার রাধাকৃষ্ণন্ আমায় ডেকে বললেন—আরে কি ব্যাপার, নিউ স্টেটসমান্ তোমার চিঠি ছেপেছে, আর নিজেই মুখে মুখে বলে গেলেন চিঠির সারাংশ (যারা রাধাকৃষ্ণনের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির কথা জানে, তাদের কাছে এটা একেবারেই আশ্চর্য কিছু নয়) : "…I have lived some of the happiest years of my life in England, I count English man and woman among my best firends, I love England, her sights and sounds, more than I care to tell. But I cannot help hating, with all the hate of which I am capable, the abominable relationship between our two countries to day." কয়েকবার তারিফ করলেন রাধাকৃষ্ণন 'I cannot help hating

with all the hate of which I am capable' কথাগুলির—আমার সৌভাগ্য, কারণ এই পত্র প্রেরণের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সন্তপ্রাপ্ত পদ থেকে অপসারণের প্রস্তাব আসে সিণ্ডিকেটের সাহেব-সভ্য বিশাখাপত্তনম্ জেলার কলেক্টর মিন্টরউড-এর পক্ষ থেকে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণনের আন্তর্জাতিক প্রতিপত্তির কাছে শ্বেতাঙ্গপুঙ্গবের পরাজয় ঘটে। তবে উড্ সাহেবকে ধন্যবাদ, পরাধীনতার দহনকে তীব্রতর করে তুলতে তিনি সহায় হয়েছিলেন এভাবে ; না বুঝে উপায় ছিল না! 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ?'

'মনীষা গ্রন্থালয়' থেকে আশু প্রকাশিতব্য 'তরী হতে তীর' গ্রন্থের অংশ

সংবাদ-সেবক কিন্তু নিজে রচয়িতা

বিষ্ণু দে

অথচ সে বুদ্ধিমান, সংবাদ-সেবক, নিজে রচয়িতা বটে,
নামডাক-ও অর্জেছে সে, পটু ডট্‌ কলমের ত্বরিত এলেমে,
কুঁড়ে নয়, দ্রুত লেখে বাঁহাতে-ডানহাতে, ভেবে বেশি না ঘেমেই,
তবল্‌চির মতো পারে সংবাদের তালফেরতা বাঁয়ার সঙ্কটে
লাফ দিতে সার্কাসের মতো। ফুলস্‌ক্যাপের কর্তৃত্ব আয়ত্ত
করেছে যে পড়লেই বোঝা যায়। অথচ বন্ধু ও বিদগ্ধ জনেরা,
ভদ্র মহাশয় যাঁরা পরিশ্রমে পটু সাহিত্যশক্তির ভক্ত—
তাঁরা সব হঠাৎ লজ্জিত ক্ষুব্ধ, সকলেরই মনে হয় vera

Incessu patuit dea অর্থাৎ যথার্থ দেবতা যিনি
তাঁর চলনেই বোঝা যায় স্বর্গমর্ত্যব্যাপী দেবী বটে তিনি।

সাহিত্য বা শিল্পকর্ম যে দৈবত বিনিদ্র আয়ত্ত দুই চোখে
মৃত্যুহীন রূপ পায়, সত্য পায়,—কুৎসা বা কেচ্ছায় নয়,—সত্য
নান্দনিক সত্তা পায় নিবিষ্ট-শিল্পের ধ্যানে, নয় তুচ্ছ ঝোঁকে।

মহৎ শিল্পের শ্রম দেখতে বুঝতে চায় যদি, ছেড়ে বিকিকিনি
মনের বিকার ধুয়ে হতে হবে শিল্পে স্বীয় ঈমানের ভক্ত।

তবে বুঝবে চুরাশি বছর ক্রমান্বয়ে কী শ্রম কী বীর মহত্ত্ব ॥

চতুর্দশপদী

বিমলচন্দ্র ঘোষ

জনগণমন-অধিনায়কের অপার দয়ার
বিশাল ক্ষেত্র কৃষিভারতের ছন্দ পয়ার
সাতলাখ ভুখা গ্রামের পাঁচালি গলা ছেড়ে গায়
ফতুর ফকির থেরীগাথা গায় সংঘে ফয়ার ॥

গাধাবোট ভাসে রাষ্ট্রীয় কাছি আঁকড়ে বন্যার
জোতদার ফড়ে ব্যাপারীরা প্রেতশিলায় গয়ার
জাতীয় পিণ্ডি গোগ্রাসে গিলে সান্ত্বনা চায়
বৈশ্যপালিনী ভারতলক্ষ্মী সর্বজয়ার ॥

গণতন্ত্রের পুঁজিতান্ত্রিক চাতুরীর ফলে
সংহতি নাশে প্রাদেশিকতার চিতাগ্নি জ্বলে
দলপতিদের দলীয় দাঙ্গা চাঙ্গা রাখার
মহিমায় যুবশক্তি প্রেরণা পায় দলে দলে ॥
মিথ্যে প্রয়াস রেশমী কাপড়ে আগুন ঢাকার
গণমহানাগ আড়ামোড়া ভাঙে ভূগর্ভতলে ॥

বেড়াল খোঁজে নরম মাটি

অন্নদাশঙ্কর রায়

কেউ বা ভোলে চোলাই মদে
কেউ বা ভোলে খোসামদে।
কেউ বা ভোলে নারীর কোলে
কেউ বা ভোলে মাছের ঝোলে।
　　মনে রেখো এই কথাটি
　　বেড়াল খোঁজে নরম মাটি।

কেউ বা ভোলে নগদ টাকায়
কেউ বা পায়ে তৈল মাখায়।
কেউ বা ভোলে পদের মায়ায়
কেউ বা ভোলে রাজক্ষমতার।
　　এই কথাটি জেনো খাঁটি
　　বেড়াল খোঁজে নরম মাটি।

এই ইস্পাত

অরুণ মিত্র

ইস্পাতের ভঙ্গিটা মনের পরতে বসে যায়
ঠিক যেমন ক'রে মাংস চেয়ে।

ফার্নেসের ভীষণ গনগন থেকে
সেই যে বেরিয়ে এল
তাকে তুষিয়ে বুঝিয়ে শান্ত করো।
পিতৃহননের রোখ
তখন টগবগ করছিল,
'হুঁশিয়ার' বলতে বলতেই
বুড়ো হাড়গুলো ঝাঁঝরা হয়ে মাটিতে।
তবু আমরা স্নেহের সঙ্গে বললাম :
'দেখো জমি কেমন সুফলা হয়।'
বাবলা শেয়ালকাঁটা যত বাড়ে
ততই যেন ঐশ্বর্য পৃথিবীর ভাঁড়ারে।
তখন সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে
আমিও বললাম :
'ঠাণ্ডা হোক না, ও আমাদের নিবাসকে
এমন চমৎকার গড়ন দেবে।'

ওর শীতল মূর্তিটা
এখন আমি আন্দাজ করি,
শুধু আন্দাজ,
কারণ তার ছায়া আমাকে চোখ খুলতে দেয় ন
আর আমি রাতভোর
ঘরদোর ভাঙার শব্দ পাই,
এবং আমার চব্বিশ ঘণ্টায়

রক্তের তাজা গন্ধ,
আমার যা কিছু স্বপ্নের ভিতরে
তাও বিপন্ন হয়ে পড়ে।

আমি বীজের সঙ্গে
মানুষের সঙ্গে
এই ইস্পাতকে কি ক'রে মেলাই ?

কোজাগরী। লায়লাতুল কাদার

ওলঝাস স্থলেমেনভ

জাগরণে যায় বিভাবরী।
আবহে উষ্ণতা
বিছানো ফরাসে বুড়োদের ফিসফাস।
চাঁদ—যেন বাঁকানো ভুরুতে
অবাক বিস্ময়।
দামালো নদীর খরস্রোতে
নুড়ি পাথর।

অজু করে
রাত্রি আর দিন।
আল্লার কাছে মানুষ পৌঁছে দিচ্ছে
যথাবিহিত বাসনাকামনা।
মানুষ ফিরে ফিরে সকাতরে দোয়া করছে
তাদের রাতের ইচ্ছাগুলো যেন পূর্ণ হয়।
লায়লাতুল কাদারের রাত্রে অভাগা মুসলমানেরা
একরত্তি পার্থিব সুখের জন্য
মোনাজাত করছে।

মাটিতে স্খলিত হচ্ছে দৃষ্টি।
ধূলিকণাগুলো রাস্তায় ভালুকের মত
গা ছড়িয়ে,
লোকে হেঁটে যায়,
মসজিদের রোদে-পোড়া ইটের দেয়ালগুলো স্তব্ধ।
ধুলোগুলো মসজিদের পাশ কাটায়
যেমন যেমন বছরগুলো যায়।

বাঁকা তরবারির ছায়া ধারণ ক'রে আছে
কুঁকড়ে-যাওয়া মিনার।
ঘাসের মাঝখানে একটা গড়খাই জ্বল জ্বল করছে,
খোলা পাগড়ির গায়ে বুটিদার রেশমের মতন,
আপেল গাছগুলো তাদের শিকড় ধুয়ে নিচ্ছে
পলিতকেশ জলের মধ্যে,
আজ যখন লায়লাতুল কাদারের রাত্রি।

তিন কাল খোয়ানো এক থুনথুনে বুড়োর মত
শানবাঁধানো চৌখুপী জাজিমের ওপর আমি ঘুরে বেড়াই
শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলি আর তোমাকে স্বপ্নে দেখি।
আমার ইচ্ছেগুলো আহা সফল হোক॥

অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বৃষ্টিতে

গোলাম কুদ্দুস

বৃষ্টিতে গৃহে আবদ্ধ সারাদিন,
প্রায়ান্ধকার দিনমানে শুয়ে শুয়ে শুনছি
ঝমঝম ঝিমঝিম রিমঝিম ঝিরঝির
এবং আবার ঝমঝম।

কী আরাম !
ঈষৎ তন্দ্রায় শিরায় উপশিরায় প্রবেশ করছে
বিশ্বচরাচরের সঙ্গে মিশে যাওয়ার আবেশ।
মন আমার ইক্ষুচারা,
অকৃপণ ধারায় স্নান ক'রে দুলছে সহর্ষে,
একটু একটু ক'রে বেড়ে উঠছে,
একটু একটু ক'রে ভিতরে জমিয়ে তুলছে মিষ্টত্ব।
কী ক'রে সঞ্চিত ক'রে রাখব
অন্তরের মধু ?
পাকা ইক্ষুর মত কঠিন আবরণ সৃষ্টি ক'রে ?
চতুর্দিকে যে ঘুরছে আখ-মাড়াইয়ের কল,
আচম্বিতে চেপে ধ'রে
নিঙড়ে নিয়ে কি ফেলে না ছিবড়ে ক'রে ?
মেঘের কোল আলো ক'রে বিদ্যুৎ মুচকি হাসি হাসল,
যেন বলতে চাইল, না, না, না, পারবে না !
হয়ত তাই বিদ্যুৎ-মহাশয়, যদি না আপনি
আলো দেখতে গিয়ে বজ্র হ'য়ে নামেন আমার মস্তকে !

ভুল মন্ত্রের জন্যে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

বন্ধ কপাট খোলবার জন্যে চতুর্দিকে চীৎকার
একবার দরজা খুলতে পারলেই
বাইরের ভয়াবহ অন্ধকারের হাত থেকে,
হিংস্র শ্বাপদের আক্রমণ থেকে
নির্বিঘ্ন মুক্তি ;

তখন শরীরের ভেতর স্বাভাবিক রক্তচলাচল।

অথচ ভুল উচ্চারণের জন্যে
দরজা খুলছে না ;
ভুল মন্ত্রের জন্যে চতুর্দিকে সব জানলাগুলিও বন্ধ

হাসে দ্বারকার পথে ঘাটে ভাড়াটে জল্লাদ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জীবন কেমন স্থির হ'য়ে গেছে নতজানু ক্রীতদাসদের সান্ধ্য-
সংগীতের অবাক সভায় !

মাঝে মধ্যে কোলাহল ভেসে আসে, গুলিবিদ্ধ শার্দুলের
মাংস ছিঁড়ে নিতে সারমেয়গণ দ্রুত ছুটে যায় ;
তাদের অশ্লীল বাহবায় কাঁপে ভুবনমোহিনী রাত্রি, ম্লান
হ'য়ে যায় জ্যোৎস্নার নক্ষত্র, বিতৃষ্ণায় মাথা নাড়ে দীর্ঘ
তরুবিথি

আহা জীবন ! আবাদ করলে হ'তো সোনা সেই মানব
জীবন আজ এমনি ইতর রসিকতা !
হাসে দ্বারকার পথে ঘাটে ভাড়াটে জল্লাদ, জননীর
পরিত্যক্ত নবজাত শিশুর কান্নায় ··

অনন্ত তালিকা

চিত্ত ঘোষ

সংসারে বাড়ন্ত সবই
তবু কারা এঁকে যায় লক্ষ্মীর পা
পিদ্দিমের শীতল আলোয়
লেখা হয় অনন্ত তালিকা।

খাঁটি আবেগ আর অনুভূতি
আর খোলাখুলি ভাব
শক্ত পাথরে দাঁড়ানো
আর সহজ সবল গড়ন
চূড়ার দিকে নজর
আর শিকড়ের দিকে মুখ
স্বচ্ছ জলের ধারা
আর ধান বোনার বৃষ্টি
স্বভাবের ঠাণ্ডা ছায়া
আর উদাস ঝড়ের বাতাস
বলবান বুকের চওড়া পাটা
আর ঘনিষ্ঠ হৃদয়
ভালোবাসায় ভরপুর থাকা
আর ভরাট গলার গান
এসবের জন্যই বুক পাতা যায়
স্বভাবে আনা যায় একটা অনমনীয় ভঙ্গি।

যে জীবনে আমি

রাম বসু

একই বৃত্তে ঘুরে ঘুরে যে মৃত্যু মরেই চলেছি
একই বৃত্তে ঘুরে ঘুরে যে জীবনে বেঁচেই চলেছি
ঠিক তারই নিচে গোলাপের পরাজিত পাপড়ি
ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রেম ও হত্যার দেবতার পাঁজর
আবহমানের গাঢ়তম অন্ধকারের যা খিলান গম্বুজ
সেখানে নগ্ন ঢেউ ছিল

সেই সব নগ্ন ঢেউ পাথরের মতো, স্তব্ধতার মতো
সময়ের আঙুলের যাদুতে সে হয় স্বরোদ

তার শরীরের ভাঁজে ভাঁজে বয়সের পরিণত গন্ধ
সমস্ত সংকেত পিতৃপুরুষের আত্মার মতো অতন্দ্র
অথবা ফুটপাতে অনাদৃত শিশুর কপালে এক ফোটা শিশির

জাফরি-কাটা জানলা থেকে দেখা যায় বিকেলের জেব্রা
হলুদ মাঠের ওপারে পর্বতের শাণিত বল্লম
ধাতব নৈঃশব্দ্য বাজে পতঙ্গের গলার আওয়াজে
নারীর দেহের তাপ পুষ্পের পরাগে
আর পৃথিবীর আলো না লাগা আমার বুকের ভিতরে
সমাহিত পল্লবে ঢাকা নিটোল সমুদ্র, যার
দীর্ঘ বেলাভূমি জুড়ে আহত অশ্বের খুরের শব্দ
দেখি, আমার দেহ গঠিত ভস্মে ও হীরায়

যে মৃত্যুতে আমি বেঁচেই চলেছি, যে জীবনে আমি মরেই চলেছি—

বাঁড়ুজ্যেই উত্তর দেন

কৃষ্ণ ধর

কেন বলেছিলেন তিনি, নদী ছাড়া আর সবই বাহুল্য ?
কেন এই সুগভীর দ্যোতনার কথা ?
দেখেছি কি মহানদী কী ভাবে ঢেউকে নাচায়
প্রাণের মোচড়ে ?
দুকুল ভাসায় রাগে, প্রেমে, ধানের গোড়ায়
জীবনের হামুখে দেয় জল ?

কেন তিনি মোহানার আশ্চর্য রূপে মুগ্ধ হন,
দেখান উজাড় করে তাহাদের ছবি ?
কেন তিনি তৃষ্ণার শিকড়ে দেন জল ?

কেন তিনি মিখায়েল এঞ্জেলোর টানে
ভেঙেচুরে দেখান ঈশ্বর, মানুষেরই মানে
জলন্ত ক্যানভাসে ?
কেন তিনি নদীতে মেলাতে চান জীবনের স্রোত
প্রাণকে জাগান মরা ঘাসে ?

কলসের তলানি

লোকনাথ ভট্টাচার্য

পরিখা-ঘেরা ছোট জায়গা, আনাচ-কানাচ চেনা বহুবার, মুখস্থ চত্বরের প্রতিটি ঘাস, বদ্ধ ভূমিতে স্বাভাবিক আকাশের যে-নিশ্বাস বা প্রায়ই বাতাসের অভাবে পৃথিবীর কথা-শেষ-হয়ে-আসা অধীরতা—

শুধু ভাগিস ময়ূরটা এখনো রয়েছে, মাঝে-মাঝেই দেখা যাচ্ছে, উড়ে এসে এই বসে পরিখার শীর্ষে, এই অদৃশ্য হয়।

এবং বেলায়-বেলায় সূর্যও যেহেতু রঙ পাল্টায়, বৈচিত্র্যের কাঙাল চোখ পাখিটার গ্রীবায় এখনো চলতে চায়, যেখানে আলোর স্পন্দন বুঝে নীল, পরে সবুজ, পরে লালের মিছিল।

অর্থাৎ, প্রায় কঙ্কালে এসে ঠেকেছে যদিও দেহ, প্রেমের কণা কলসের তলানিতে নেই, এবং যদিও এককালীন উদ্ধত স্তনের অনেক সঙ্গিনী সত্ত্বেও কামনার সব প্রদীপ সাত-সকালে নির্বাপিত,

আমরা সকলে জড়ো হয়ে জমেছি কোণে, যেন একে-অন্যের শরীরেই মন্ত্রে বিভোর, গাদাগাদিতে স্যাঁতসেঁতে ঘামের গন্ধ মেশে অদূরের অপর্যাপ্ত যূথী-মল্লিকায়,

রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা, কতক্ষণ, আর কতক্ষণ আছে ঘণ্টাটা বাজার, ও তা বাজলেই উঠব ঝাঁপিয়ে পড়তে, নিজেদের ছিঁড়ে খেতে।

পিছু

সিদ্ধেশ্বর সেন

চমকে উঠে
পেছনে তাকাতেই দেখলাম
সে আমার পিছু নিয়েছে

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে
যতোই এগোই, সে
আমার পিছু—

কিছুতেই এড়ানো যাবে না, যাকে,
তার নাম কি

এগোতে-এগোতে, তাই
থেমে পড়লাম

সে-ও গেল থেমে

কী আতান্তরেই না পড়লাম আমি

শেষমেশ ভাবি, ফিরে গিয়েই না' হোক
তার নাগালটা ধরি

সে কিন্তু আর এগোল না

ভাবলাম, যাক আপদ চুকেছে

কিন্তু, এগোতেই ফের
মন বল্‌লে
সঙ্গ তো সে ছাড়েনি

তবে কি সঙ্গেই ডেকে
নিতে হবে, তাকে

উল্টোমুখো, তাই
হাতটা
অসম্ভব বাড়িয়ে দিতে গেলাম
সে এসে ধরে তো ধরুক

তাহলে, সোজা বরাবর
চলে যেতে, আর
অস্বস্তি রইবে না

ভাবতে ভাবতে
আবার পা বাড়ালাম

আর, হঠাৎ-ই
মনে হল
আমার পেছনে আমারই খানিকটা
ফেলে আসিনি তো ! !

দয়া করে নড়ুন-চড়ুন

ধনঞ্জয় দাশ

আপনাকে দেখছি দীর্ঘকাল
এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছেন বৃক্ষের মতন
পাশে পচা ডাস্টবিন, নড়ন-চড়ন নেই
মাথার উপর ঝরছে অঝোর শ্রাবণ।

আপনি কী ভাবছেন বলুন :
আপনার সাধের এই কলকাতা তিলোত্তমা হবে
কিংবা, এই খোঁড়া-গর্ত নর্দমার পাঁকে
দীঘি ভেবে নেমে আসবে বসন্ত—ফাগুন !

দেখুন, এই অধমের কথাটা শুনুন
এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকা মানে—
নদীর স্রোতের মতো বহমান সময়কে খুন ;
দোহাই আপনার, ডান-বাঁ যেদিকে ইচ্ছে
দয়া করে এখন একটু নড়ুন চড়ুন ॥

ধর্ম

শঙ্খ ঘোষ

শুয়ে আছি শ্মশানে। ওদের বলো
চিতা সাজাবার সময়ে
এত বেশি হল্লা ভালো নয়।

মাথার উপর পায়ের নিচে হাতের পাশে ওরা
সবাই তোমার বান্দা
ওদের বলো

বলো যে এই শূন্য আমার বুকের উপর দাঁড়াক
খুলুক তার গুল্‌ফ-ছোঁয়া চুল
মুকুট-ভরা জলে উঠুক তারা। ওরা পালাক

আর, নাম-না-জানা মুণ্ডমালা থেকে
ঝ'রে পড়ুক, ধর্ম ঝ'রে পড়ুক
ঠাণ্ডা মুখে, আমার ঠাণ্ডা বুকে, ঠাণ্ডা !

গঞ্জ থেকে উঠে এসেছে একটি মানুষ

অমিতাভ দাশগুপ্ত

গঞ্জ থেকে উঠে এসেছে একটি মানুষ
দুই চোখে দুই জবাকুসুম নিয়ে।

তাকে দেখে

পালায় কোটাল, পালায় নগর-পালক।

ঠিক যেখানে

সবুজ ঘাসে ঢলো ঢলো শহরবাসীর

রঙ্গ, প্রণয়, মেলা—

তার কেন্দ্রে শক্ত, ডাঁটো দাঁড়াল তার পা।

তাকে দেখে পালায় সবাই,

সাক্ষী একটি বালক

অবাক চোখে সরেজমিন মাপছে তাকে—

পলক পড়ে না।

বালক তাকে এটা-ওটা দেখায়

'গ্রাম্য' বলে মিষ্টি ক'রে ক্ষ্যাপায়।

লোকটি ঘুরছে।

আলতো ছুঁচ্ছে নশ্বর শরীর ময়ূরপঙ্খী গাড়ির,

নাকের সামনে হু-উশ্ ক'রে

তুলছে পাঁচিল আলাদিনের বাড়ি,

মনে পড়েছে কি নাম

পেটের নাড়ি খিম্‌চে ধরে

বাসমতীর গন্ধে ভরা গুদাম,

দেখছে সে আনাড়ি

দুঃশাসনের ছাপ-মারা লাল হলদে সবুজ শাড়ি।

বালক তাকে শহর জুড়ে যা কিছু সব দেখায়—

'গ্রাম্য' ব'লে মিষ্টি করে ক্ষ্যাপায়।

একা-একা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আকাশে চিকুর দিচ্ছে থেকে থেকে, মেঘে ধরেছে ফাট্
ঘরদোরের চৌকাট মাড়িয়ে, টলোমলো, মানুষ ফিরছে অন্দরে
বাইরের ঘাস পাতা, জুতোর নিচের কাদা বারান্দায় পেটমোটা
জোঁকের মতন রক্ত ঢালছে, ঝোপের নিচে ঘুমকাতর সেন্টি্
রেনট্রির ঝোড়ে চুলে অন্ধকার ঝড়—
তারপর? তারপর গল্পটা খুবই ছোটো।
একটু ওঠো, জেগে-জেগেই ঘুমোবে! ওঠো, উঠে বসো
অনেকদিন রাগ করোনি, অভিমানে-অভিমানে পড়োনি ভেঙে
অনেকদিন, বাতির গায়ে লেগে থাকতো মোমের ফোঁটা
আজ নেই, কিচ্ছু করার নেই আজ, দেয়াল থেকে আছড়ে
মাটিতে পড়ছে এঁটেল মাটির টিকটিকি, লম্বা লম্বা ছায়া
দুলছে কেবল, ডাঁই-করা ছাড়া-কাপড়ে ভ্যাপ্‌সা গন্ধ
কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছে, পাথর পাথর
সবখানেই পাথর, সবখানেই ভাঙা-নোড়ার শব্দ—বাইরে,
ভেতরে নয়, ভেতরে কলে জল পড়ার আওয়াজ হচ্ছে
বাসন পত্তরে, কয়েকটা পোড়া শুকনো রুটি আর ডালজল
বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা—লোনা, না মিষ্টি? টেবিলের ওপর
খ্যাংটো হয়ে প'ড়ে—ফুরফুর করে উড়ছে আরশুল।
দুধগরমের পোড়া কাগজ উড়ে বেড়াচ্ছে হাওয়ায়, চমৎকার!
আকাশে চিকুর দিচ্ছে থেকে থেকে, মেঘে ধরছে ফাট্
ঘরদোরের চৌকাট মাড়িয়ে আবার কে এসে ঢুকলো—ঘরে,
তারপরে? লোকটা মাথা পর্যন্ত চাদর টেনে তার ভেতরেই
একা-একা তৎক্ষণাৎ ঘুমোতে লাগলো॥

ফর্দমাফিক

শংকর চট্টোপাধ্যায়

বসিয়ে দাও মানুষ—তার মাথার ওপর ভাঙা—আটচালা রঙের একখানা মেঘ
ছবি ছবি একটা দুটো গাছ দেউড়িতে

আস্তাকুড়টা পেছনে—বউ পুতুলের ভাঙা হাত, ক্ষয়া চাবি—বাতিল তুলো
আর জন্মমৃত্যুর পুঁটলি বাঁধা ছিরকুটে সংসারটা চৌদিকে।

ধরিয়ে দাও নেশা-ছুটবে মাতাল শুধু চোঁ চোঁ দৌড়—দিনের থেকে রাত্রে
গাময় বিষ—বিষের পুতুল ধুলোয়—দুচোখ আঁধার
নুনের পাশে হলুদ—ডাঙায় দাঁড়—ঘুনঘুনে দু দশ খানা সাধ আহ্লাদ
আর সারি সারি পিতৃপুরুষ--এক ভাঙলে দুই-দুই ভাঙলে একের পর এক সমুদ্দুর।

বসিয়ে দাও মানুষ—ধরিয়ে দাও নেশা—ছুটবে মাতাল
যেনবা দাঁতাল—ফুরছে মাটি দাঁতে
তাতে, ছিরকুটে সংসার দিচ্ছে তালি—বসাচ্ছে নখ পাঁজরে
তবু নুনের পাশে হলুদ—ডাঙায় দাঁড়—আর ঘুনঘুনে দু দশখানা সাধ আহ্লাদ
চৌদিকে।

সন্ধান

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

আমি গাছটিকে খুঁজি, গাছটিও খুঁজছে আমায়।
এই অসাধ্যসাধন খোঁজা কেউ টের পেতে পারে ভেবে আমি
আজকাল খুব সাবধান হয়েছি ;
একদিন, একা
কিশোরের চোখের জলের নৌকায় যে এসেছিল
সে এখন জাহাজ শিখেছে ;
মাল্লার কষ্টের পাশে
হঠাৎ বাষ্পীয় ভোঁ শেখানো কি ভাবে
বিদায়ের আগে মানুষের শব্দ নষ্ট করে দিতে হয়
যান্ত্রিক উদ্যোগে !

এরা কিন্তু স্থিতি চায়, এরা কিন্তু পৌঁছে যাবে
লক্ষ কিলোমিটার জলে
পরে কোনো নারী অধ্যুষিত উল্লোল বন্দরে ; আমি
সর্বদা সন্দিগ্ধ থাকি,
কথ্য ও লেখ্য ভাষার মধ্যবর্তী গূঢ় অন্ধকারে
চ্ছলাৎ চ্ছল শব্দ বসাই।
দিনে দীর্ঘ ছায়া পড়ে
তাই রাত আমার অবিঘ্ন চারণভূমি ;
আমি ছায়াহীন, পশ্চাৎধাবনহীন
পৌঁছুতে চাইনা কোন ত্রাণে ; একা
ঢুকে পড়ি জন্তুর সংকুল বনে, পশুর অত্যন্ত কাছে খুঁজি
নিসর্গ সেনানী, খুঁজি
আমার সাধ্যের গাছ, এ প্রকার সেও বহু খুঁজেছে আমাকে।

বিচারকমণ্ডলীর কাছে

শিবশম্ভু পাল

বলার কিছুই নেই, তবুও আমায় কিছু বলাতে চেয়েছ
অথচ সময় হয়ে এল
আমার কাজের মধ্যে সেকেণ্ডের শব্দ ক্রমাগত
বেজে যায় বেজে যায় ; ওদিকে আসর পাতা, বিস্মৃতির ফ্যাশনপ্যারেড
ওখানে আমায় যেতে হবে, যেতে হয় কাজকর্ম সেরে।

কি বলব ? হ্যাঁ কিংবা না ?
সভাকক্ষে নীরবতা বেমানান যেমন আমিও একটি মূর্ত বেমানান
বোতলের চৌকো ছিপি হতে গিয়ে পুড়িয়েছি কত কাঠ খড়।

আমি তো সৌভাগ্যবান ;　কত লোক ব্যর্থ হয় বেখাপ্পা কর্মের
　　　　　　　　　　　　　গুরুচণ্ডালী দোষের
নিরাপত্তাগ্রস্থ দায়-দায়িত্ব বহনে।
নরকে যাবার মতো যোগ্যতাও এনে দেয় না বিশ্ববিদ্যালয় !

ওই তো আমার সামনে কাঠগড়ায় উজ্জ্বল তরুণ
ঘৃণা ছুঁড়ে মেরেছিল আমাদের শান্তিপ্রিয় সেফ্‌ডিপোজিট ভল্‌ট, নীল
লুঙ্গির মেজাজ আর ভোররাত্রে মশারির দড়ি কেটে বিস্রস্ত বিছানা······
আমি তার বিচারক, সপক্ষে বিপক্ষে কিছু বলে
আমায় প্রকাশ্যে জল খেতে হবে গ্রীষ্মকালে ওয়াটারকুলার থেকে, আহ্‌,
অথবা দারুণ বৃষ্টি পায়ে নিয়ে যেতে হবে শহিদ কলোনি
কেননা কোথাও নেই অন্তরীক্ষ বলে কোন কিছু।

ঠিক তাই। আমার নামেও
শমন রয়েছে জুরি মহোদয়, আপনার আমার সকলেরই
গীতাস্পর্শ করে কিছু ভেজাল সাংবাদিকতা পেশ করতে হয়
মহামান্য আদালতে, দ্বিতীয়-আমি'র চেয়ে যোগ্যতর বিচারক নেই।
আমি কিছু বলব না, আমার বলার ভাষা বহুদিন আগে
চুরি হয়ে গেছে
যেদিন আমার দীপ্ত দিবালোক তারার যামিনী
লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ঝাঁজালো, মাদক গিলে জালিয়াতি সেরে প্রাত্যহিক,
ভাষার সমস্ত রস, অভিমান, বর্ণছটা, সহস্র বর্ষের
ভাঙাগড়া, স্বর্ণাক্ষর দিকচিহ্ন, বিবেকের শোণিতক্ষরণ
সব চুরি গেল।
আমার গলায় শুধু শব্দ ওঠে বেনিয়াটোলার
আমার দু'চোখে শুধু চাউনি আছে, দৃষ্টিপাত নেই
আমার ঘুমের মধ্যে ঘুম ছাড়া অন্যতর আশীর্বাদ নেই।

ছেড়ে দাও। তারপর উত্তর-দক্ষিণ থেকে দু'জন চেম্বার
উঁচিয়ে ট্রিগার চেপে ধরো
আমি ঠিক বেঁচে যাব, আমার লোহার চামড়া, লোহা মানে
ব্রহ্ম-অভিশাপ··
ওদিকে হাসতে থাক ডোরাকাটা শার্ট পরা কাঠগড়াব অর্বাচীন
সত্তর দশক!

ম-য়ে মানুষ

রত্নেশ্বর হাজরা

তখন দেখা ম-এর সঙ্গে
ভিড়ের মধ্যে এবং ফাঁকায়··· ··
যখন গভীর অরণ্যময় বৃক্ষসকল
এবং লতার সবুজটবুজ
নির্জনতা
তখন দেখা
ঘন বনভূমির মধ্যে—ঋষির বাগান—বাগানে সে
একটা মানুষ
চারপাশে গাছ—লতাপাতার
সবুজ গন্ধ ঘ্রাণ হয়ে যায়
হাওয়ার মধ্যে পায়ের চিহ্ন
কে যেন যায়—একটা মানুষ। মানুষ শব্দ
ছড়িয়ে পড়ে। তখন দেখা
কোথায় যেন—কবে যেন
একটা মানুষ—ভিড়ের মধ্যে
এবং ফাঁকায়
কেবল 'মানুষ' 'মানুষ' শব্দ·····

করিমের জাগরণ

অসীম রায়

হাসপাতালের জানলার ফ্রেমে ভোরের অপরাজিতা আলো। আর সেই নীলাভ মখমলে যা করিমের প্রবল বিস্ময়ের কারণ ঘটায়, সাদা গোলাপী কড়িয়াল ফুলের ছড়া। এ ফুল তো গরমের কিংবা কচি বর্ষার, এ পর্যন্ত ভাবতে না। ভাবতেই সে সোয়ারীঘাটে চলে যায়।

সেদিন সে আন্দাজ করেছিল। অবশ্য আন্দাজ সব সময়ই আন্দাজ। পল্টন ময়দানে যে বিশাল জমায়েতের সংখ্যাতত্ত্ব যা এক-একটা কাগজে এক-এক রকম বেরিয়েছিল তাও তো আন্দাজ। আর সেই ভাবে, অর্থাৎ, যেখান থেকে সাইকেল-রিক্সার কাতার শুরু এবং যেখানে সেই কাতার বুড়ীগঙ্গার গায় অসংখ্য প্যাণ্ট শাড়ি লুঙ্গি বাক্স উনুন বিছানার হিজিবিজিতে শেষ—সেই দীর্ঘ প্যানোরামা করিমের মতে খুব কম করেও দেড় মাইল। এই দেড় মাইল ধরে বৃদ্ধ শিশু মহিলা জোয়ানে টলমল, পাশাপাশি, কখনও দুটো কখনও তিনটে কখনও চারটে সাইকেল-রিক্সার সারি করিম দেখেছিল অপলক দৃষ্টিতে।

সেই অপলক দৃষ্টিতেই করিম চেয়েছিল হাসপাতালের জানলার দিকে। এখন কটা? করিমের দৃষ্টি দেয়ালঘড়ি খুঁজতে গিয়ে ইংরেজের তৈরি ভারী উঁচু চকোলেট দরজার ওপরেই পড়ে। দেয়ালঘড়িতে বারোটা পাঁচ কিন্তু দিনের বেলা বারোটায় কি এমন নীলাভ আলো ফোটে? করিম মাথা না নাড়িয়ে চোখ ঘুরায় এবং চোখে পড়ে হলের তিনটে ঝুলন্ত আলো। তিনটেই জলছে, তবে মান পিত্‌পিতে, কড়িবর্গায় তিনটে পিতপিতে আলোর গোল। তবে কি এখন রাত?

করিম আর ভাবতে পারে না এবং সংজ্ঞা হারাবার আগে যে ছবিটা তার চোখের সামনে ছিল সেই ছবিটাই আবার ভেসে ওঠে। তার এই বাইশ বছরের জীবনে প্রথম এক সর্বগ্রাসী জাতীয় আতঙ্কের সামনে সে দাঁড়িয়েছে। সকাল থেকে উঠে ট্যাঙস ট্যাঙস করে গোটা শহরটা ঘুরছিল। করিম দেখেছিল একটা শহর নয়, দুটো শহর। একটা শহর থাকছে যেখানে আছে সেখানে,

তাদের অধিবাসীদের চোখে অবিশ্বাস হতাশা ক্রোধ। রোয়াকে জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা আর একটা শহরের অধিবাসীদের দিকে চেয়ে থাকে নিঃশব্দ হতাশায়, ঘৃণায়। আর একটা শহরের অধিবাসীরা তাদের বিছানা বালিশের মতো নিজেরাই এক একটা আতঙ্কের পুঁটলি। এই পুঁটলিরা সব তিন-চাকার মাথায় চেপে ছুটে চলেছে এক নির্ভরতার মরীচিকার পেছনে। বুড়ী-গঙ্গা দিয়ে ধলেশ্বরী, তারপর অজস্র খাল। খালের গায়ে গায়ে বাঁশের ঘরের নীচ থেকে গরম ভাতের গন্ধ উঠছে, হাঁক উঠছে দিনরাত্তির, আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবের হাঁক। অর্থাৎ সেই খালের ধারে কাদায় লণ্ঠনের আলোয় পায়ে হাঁটা পথে যারা হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে আছে তারাই বাঙলাদেশ। আর এই শহর আত্মীয়হীন বন্ধুহীন আশ্রয়হীন এক মৃত্যুকূপ।

আতঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের হাবভাব এমন মায়াটে লাগে করিমের, এমন পল্‌কা ভঙ্গুর মানুষ আর তার দু-তিন হাজার বছরের সভ্যতা, তার শৌর্য বীর্য ছাপিয়ে এই ভঙ্গুরতা করিমকে স্পর্শ করে। এক মাঝবয়সী প্যান্ট বুশশার্ট পরা ভদ্রলোক তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির যতখানি সম্ভব দুখানা সাইকেল-রিক্সা চাপিয়েও খুশি হন নি, একটি দশ বছুরে চিকন-ত্বক বালকের হাত থেকে ডাগর মোরগটা ছিটকে সরবে হাওয়ায় ওড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের 'হায় হায়' রবে হন্তদন্ত ছুট ও সেই ছুটন্ত ঘুরন্ত কল্পিত পাতাবাহারের রঙের দিকে প্রতিবেশীদের সমুত্থিত হাত, তারপর শক্ত হাতে সেই কল্পিত পাখি ধরতেই মানুষটার কি অকৃপণ অনাবিল আনন্দের হাসি। ঠিক এমনি সময় মেঘের গর্জন শোনা গেল এবং সেই ভদ্রলোকের দিকে চোখ থাকায় করিমের নজরে পড়ে সেই অনাবিল হাসি ক্রমে জমে থিতিয়ে স্থির নিস্পন্দ কান্নার মতো। সবাই তাকায় চিকচিকে জল নদীর বুকে নোঙরফেলা পাকিস্তানী গানবোটের দিকে। সেদিক থেকেই কি গোলাবর্ষণ? সঙ্গে সঙ্গেই ভুল বুঝে লোকে আকাশের দিকে চায়। নীচু ফর্মেশানে ইণ্ডিয়ান প্লেন শীতের ধূসর আকাশের ঠিক পেট কেটে এগিয়ে আসে। সকলেরই চোখ ওপরে কিন্তু হাজার হাজার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা আতঙ্কের ঝর্ণা গড়িয়ে পড়ে মিলিয়ে যায়। ক্যাণ্টনমেণ্ট লক্ষ্য করে প্লেনগুলো অদৃশ্য হতে না হতেই আবার মেঘগর্জন। চারপাশের বন্ধ নিশ্বাস আবার পড়তে শুরু করে। আবার নৌকো ভাড়া করার দরাদরি, বিস্কুট লজেন্স ভেণ্ডরের হাঁক। করিম ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিতে এগিয়েছিল, এতক্ষণে খেয়াল হয়, তাকে গুঁতোতে গুঁতোতে একেবারে ঘাটের কাছে ঠেলে দিয়েছে ভিড়। সেই-

খানে অনেকগুলো ভিড়ে টলমল নৌকোর মধ্যে একটা নৌকোর দিকে চোখ পড়ে করিমের। বুশশার্ট পরা ভদ্রলোকটির মুঠিতে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় সেই জ্বলন্ত মোরগ।

আবার করিম চোখ খোলে। এখন জানলা রোদে ঝলমল, মখমলের আলোর বদলে চড়া আলো। করিম ঘাড় ফেরায়। সারি সারি খাটের মাথা। বালিশ থেকে নিজের মাথা তুলবার চেষ্টা করেই পরিশ্রান্ত বোধ করে। তাহলে এই শূন্য হাসপাতালে সে একা? অন্তত এই বিরাট হলে সার সার শূন্য খাট আর বন্ধ দেয়ালঘড়ির সাক্ষী সে ছাড়া আর কেউ না। আজ তা হলে কী বার? সোমবার? আর সোয়ারীঘাটের সেই জ্বলন্ত মোরগ সে দেখেছিল শুক্রবার না শনিবার? তার মানে সে সংজ্ঞাহীন আটচল্লিশ ঘণ্টা না বাহাত্তর ঘণ্টা?

তার ঘাড়ের অবস্থা ছেলেবেলায় পড়া গালিভার্স ট্র্যাভেল-এর নায়কের মতো। বিছানাটা তার চুলের সঙ্গে অসংখ্য অদৃশ্য খুঁটিতে বাঁধা। ঝলমলে রোদের আলোয় ইলেকট্রিক বাল্বের পিতপিতে আলো ভৌতিক লাগে। যেন কেউ এখনই মস্করা করেছে, দিনের বেলা আলো জ্বালিয়ে ঘাপটি মেরে লুকিয়েছে। করিম আর চেষ্টা করে না।

ঘাড় উঁচু করার জন্যে যে ইতিমধ্যে সামান্য চেষ্টা তাতেই সে হাঁফায়। এবার পায়ের বুড়ো আঙুল ছড়িয়ে বিছানার চাদরের শৈত্য অনুভবের চেষ্টা করে, হাত যতসম্ভব এলো করে দিয়ে আরাম পায়। কিন্তু এই স্নায়ুর আরাম বেশিক্ষণ থাকে না। করিম টের পায়, তার খিদে পেয়েছে। আর খিদে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজীর কথা মনে পড়ে। কাজীর নামের সঙ্গে সচরাচর সমাজ পাল্টানোর কথা, বিপ্লবের কথা মনে পড়া উচিত; কিন্তু করিমের মন বেয়াড়া। কবে কতদিন আগে কাজী কথাচ্ছলে কি একটা মনের কথা বলেছিল সেইটাই তার মনের মধ্যে এখনও পতাকা হয়ে পতপত করে উড়ছে।

সোয়ারীঘাট থেকে ফেরার পথেই কাজীর সঙ্গে করিমের দেখা। কাজী মানে বেঁটেখাটো চটপটে মানুষটি যে করিমের চেয়ে বয়সে অনেক বড়, অথচ যার বয়স গায়ে লাগে নি। কাজীর চাপা উৎফুল্ল মুখ বাঙালি আবেগে টলমল। সচরাচর সে চুপচাপ, ধীর, কথা না বললে কথা বলে না। যেন সে সব সময় এক অনির্দিষ্ট আণ্ডারগ্রাউণ্ডের লোক। অন্তত সেই ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই কাজী চারপাশের আন্দোলনের নিঃশব্দ নেতা। কখনও সে মাইকের সামনে দাঁড়ায় নি, খবরের কাগজে নিজের দন্তবিকশিত ছবি বার করে নি, অথচ

এই প্রচারমাধ্যমের অনেকের কাছেই সে শ্রদ্ধার লোক। করিম তাই অবাক হয়েছিল। কাজী তাকে জাপটে ধরে পাশের গলিতে টেনে নিয়ে হাত পা নাড়িয়ে অনর্গল কী সব বলে গিয়েছিল।

আসলে ঢাকার আকাশে বাতাসে তখন বিজয়উল্লাস এবং এই উল্লাসের বিরাট ছায়াপথে লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে সেও সামিল। অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে কলকাতায় যে রকম বিরাট প্রত্যাশা আকাশে মানুষের মনে পতপত করে উড়েছিল যার ফলে অগণিত মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে চব্বিশ পরগণার ভাঙড়ের লুঙ্গিপরা চাষী একহাঁটু ধুলো পা নাচিয়েছিল রাজভবনের সিংহাসনে বসে, সেই রকম বিরাট অদৃশ্য সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল ঢাকার আকাশে বাতাসে। আর করিম সেদিন সোয়ারীঘাটে যাওয়ার আর ফেরার পথে হাওয়ায় শুঁকেছিল সেই স্বাধীনতার অমর প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশা বিচারসাপেক্ষ নয় কারণ ভাঙড়ের চাষীর সেদিন খেয়াল ছিল না কয়েকদিন পরেই তাকে কান ধরে খেদিয়ে দেওয়া হবে রাজভবন প্রাঙ্গণ থেকে, তেমনি ঢাকার মানুষের এই প্রত্যাশার তরী কোন আঘাটায় শেষ পর্যন্ত ঠেকবে কাজী তা নিশ্চয় বিচার করে নি। তার অফুরন্ত কথার মধ্য দিয়ে যেটা পরিষ্কার তা হল স্বাধীনতাকামী যুবসমাজের জয় হয়েছে, আর এক সপ্তাহের মধ্যেই ঢাকা মুক্ত। 'একটা স্বাধীন দেশ, কী কও! কারিম সাহেব, কী কও!'

'তুই বলতিস না একটা কথা?'

'কী?'

'লাল ভাত আর জামির লেবু দিয়া তোলা গরু।'

'দূর! তুই একটা পাগল!'

অথচ কাজীর সেই বহুদিন আগেকার উক্তির সঙ্গে আজকের স্বাধীনতাকামী অধীর মুখের এক প্রবল সামঞ্জস্য অনুভব করে করিম। সে স্পষ্ট দেখে কাদা উঁচু থালায় লাল ভাত আর তেলা গরুর মাংসের সঙ্গে কট কট করে জামির লেবু চিপে কাজী খেতে বসেছে। গরাসে গরাসে ভাত তোলার শব্দ ওঠে। চারপাশের প্রবল আতঙ্কের মধ্যে, আগামী স্বাধীনতার জন্যে অধীর অপেক্ষার ভিতর এই সাধারণ আটপৌরে নিবিড় ছবিটা করিমের মন উষ্ণতায় ভরে।

এবং ঠিক এই সময় করিমের খিদে নড়ে। এবার সামান্য চেষ্টা করতেই বিছানায় উঠে বসে। জানলায় আলো পড়ে এসেছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে এবং ইলেকট্রিক বাল্বের পিতপিতে আলোগুলো আবার

যৌবন ফিরে পেয়েছে।

খুব ধীরে, যেন হড়কাবে পিছলে, এই ভাবে করিম নামতে চেষ্টা করে লোহার খাট থেকে কিন্তু তার পা যে এমন টলমলে বোঝে নি। একেবারে মেঝেতে থেবড়ে বসে করিম। বোধহয় দু-তিন দিন ঝাঁট পড়ে নি। মেঝে থেকে কনুইয়ে ভর দেওয়া হাতখানা সরাতেই ধুলোয় তার পাঁচ আঙুলের ছাপ ফোটে। এক দিকে আটখানা এবং তার সমান্তরালভাবে আটখানা লোহার খাট, কোনোটার ওপর কম্বল পাট করে গোটানো কোনোটায় এলোমেলো বালিশের গা দিয়ে ঝুলন্ত, খাটের নীচে একটা বালিশ নীচে পিক্‌দানির গায়ে। করিম মেঝেতে থেবড়ে বসে সিনে ক্যামেরার মতো তার ঘাড় ঘুরায়। এ হলের সামান্য স্মৃতি নেই তার মনে, চকোলেট দরজার মাথায় কাঁচের ওপর বড় বড় উল্টানো ইংরেজী অক্ষর অনেকক্ষণ নজর করে করিম পড়লে—কারডিয়াক। সঃ. সব কিছুর ওপরেই এই মুহূর্তে তার প্রথম চাহনি। ঘরের চারটে উঁচু চকোলেট দরজার তিনটেই বন্ধ। কারডিয়াক দরজাটা খোলা। এখন সে স্পষ্ট বুঝতে পারে তার স্মৃতিবিভ্রমের কারণ। সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তার এ ঘরে প্রবেশ আর বোধহয় আজকেই যখন জানলায় ভোরের অপরাজিতা আলো সেই মুহূর্তে তার জাগরণ।

এতক্ষণে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে দুই খাটের সারির একেবারে শেষপ্রান্তে একটা স্টীল র‍্যাক নজরে পড়ে। চোখদুটো গাড়া গাড়া করে দেখতে চেষ্টা করে করিম। র‍্যাকটা নানারকম জিনিসে ঠাসা কিন্তু সবই ছায়াময়, কোনো বস্তুর কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। করিম উঠবার চেষ্টা করে অবাক হয়। এবার তার শিরদাড়া পশ্চাদ্দেশ থেকে শক্ত দড়ি দিয়ে অদৃশ্য খুঁটিতে বেঁধে রেখেছে কেউ। করিম হামাগুড়ির ভঙ্গীতে এগোয়। তার বাইশ বছরের জীবনের দিকে তাকিয়ে কোনো ভয়ঙ্কর বিপদের তুলনা মনে মনে খোঁজে। একবার পাঁচ বছর বয়সে তাদের গাঁয়ে ফড়িং ধরবার প্রয়াসে এগোতে এগোতে সে একেবারে নিঃশব্দে সলিলসমাধি লাভ করেছিল ঠিক বাড়ির দাওয়ার নীচে বর্ষা ছাপানো পুকুরে এবং নেহাত দৈবক্রমে সেই মুহূর্তে তার ছোট্ট শরীর স্নানরতা পাটজোয়ান ফুফার পায়ে লাগায় সে বেঁচেছিল। কিন্তু বর্তমান অবস্থা এবং শৈশবের সে অবস্থার মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। তখন তার কষ্টের সাক্ষী সোরগোল-তোলা সমস্ত বাড়ির লোকজন, আর এখন তার কষ্টের সাক্ষী একমাত্র সে নিজে।

করিম সাঁতারটা ভালোই জানত। বলতে কি ঐ একমাত্র পরিশ্রম তার প্রিয় ছিল কারণ ব্যায়াম প্রক্রিয়ার সঙ্গে যে সচেতন প্রচেষ্টা অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত তা তার মনঃপূত নয়। সাঁতারে জলের গলাগলিতে ব্যায়ামের সচেতনতা লুপ্ত। করিম এখন খুব ধীরে অর্ধেক হামাগুড়ি অর্ধেক সাঁতারের ভঙ্গীতে স্টীল র‍্যাকের দিকে এগোয় আর হাঁপায়। এমন বিশ্রীভাবে কোনোদিন তার বুক ধড়ফড করে নি, এমন কি রাবেয়াকে যখন একবার জোর করে চুমু খাবার চেষ্টা করেছিল তখন সামান্য ধড়ফড করলেও রাবেয়া যেই 'কী পাগলামো করস্' বলে তার ঠোঁট সরিয়ে তার কানের লতিতে ছোট্ট চিমটি দিয়েছিল সেই মুহূর্তেই আবার যে কে সেই। কিন্তু এখন বোধহয় এগোনো আর সম্ভব নয়।

করিম ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেয়। তারপর ঝিম মেরে বসে থাকে। এই শীতেও যখন মেঝে তার শরীরে লেগে ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে তখন তার পিঠ দিয়ে কুল কুল করে ঘাম নামে। একবার মনে হয়, ঢাকা কি মুক্ত হয়েছে? তাহলে নিশ্চয় চারদিকে এমন মড়কের নৈঃশব্দ্য থাকত না। কিছু না হোক, বাজি ফুটাবার মতো কয়েকশো গুলি নিশ্চয় ছুটত বেসরকারী রাইফেল ও অটোমেটিক গানের নল দিয়ে। কিন্তু এ চিন্তার চেয়েও স্টীল র‍্যাকের দিকে এগোনর চিন্তা করিমের কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ লাগে। আবার কাজীর কথাটা মনে আসে, 'জামির লেবু চিইপ্যা ত্যালা গরুর মাংসের সাথে লাল ভাত।' এবারে খিদেটা বেশ হল্লা করে ওঠে তার পেটের মধ্যে।

'মরলে মরুম। কী আছে? খাইয়া লই!' ক্ষুৎ পিপাসার এই শাব্দিক অনুলিপি সহসা করিমের হাতে পায়ে বল দেয়। এবারে আর্ধেক সাঁতার ও আর্ধেক হামাগুড়ির প্রক্রিয়ায় একেবারে স্টীল র‍্যাকের কাছে এসে পড়ে। ঠাণ্ডা স্টীল স্ট্যাণ্ডে হাত পডতেই করিম যেন লাল ভাতের গন্ধ পায়। তারপর সম্বিত ফিরে পেয়ে সে বোঝে এ গন্ধ সে গন্ধ নয়। এ গন্ধ বেশির ভাগই ওষুধের। করিমের আঙুলে ঠেকে ছোট বড় মাঝারি ট্যাবলেটের বাক্স, কোনোটা খোলা, কোনোটা বোর্ডের বাক্সবন্দী, যান্ত্রিকভাবে তার আঙুল চলে। লম্বা পেস্ট-বোর্ডের বাক্স খুলতেই ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জে হাত পড়ে। এবার কতগুলো কাগজের তাড়া, বোর্ডের সঙ্গে ক্লিপ্ আঁটা। বোধহয় প্রত্যেক রুগীর চার্ট। করিম আবার পরিশ্রম বোধ করে। বসে বসে র‍্যাকের নীচের দুটো তলা আতিপাতি হাতড়ায়। এবং সেই মুহূর্তে তাদের বাড়ির সামনে তার পরিচিত বেকারীর চেহারাটা ভেসে ওঠে। কাঁচের জারে রকমারি সুস্বাদু বিস্কুট। বিভিন্ন

ধরনের পাঁউরুটি। হাসপাতালের কিচেনটা কোথায়? অবসন্নভাবে করিম নিজেকে প্রশ্ন করে।

ঝিম মেরে বসে থাকতে থাকতে আবার রাবেয়াকে সে দেখতে পায়। কাজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে রাবেয়ার কাছে গিয়েছিল। টেলিভিশান কেন্দ্রটি যেন একটা দ্বীপের মতো। চারদিকে শহরের নিথর অবাস্তবতার মধ্যে সচল সজীব আলোয় ও গানে ঝলমল একটি প্রাণকেন্দ্র। রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে একটা লোকও তার চোখে পড়ে নি, মেয়েছেলে তো স্বপ্ন। আর এই-খানে চমৎকার টুলটুলে মেয়েটা পূর্ব পাকিস্তানের কালচারের নিদর্শন 'আমার প্রাণবন্ধুরে……' ভাটিয়ালি সঙ্গীত ধরেছে। ছেলেবেলায় চলন্ত নৌকোয় ছইয়ের নীচ থেকে যখন ভাটিয়ালির কলি পাটক্ষেতের বাঁকে মিলিয়ে যেত তখন ভালোই লাগত কিন্তু রাবেয়ার গলায় ভালো লাগে না। তার চেয়ে তার ফর্সা গলার ডিম ওঠা নামা, কণ্ঠার হাড় আরও আকর্ষণীয় লাগে। কাঁচের পার্টিশানের ওপারে বসা রাবেয়াকে সে চোখ দিয়ে গিলে আরাম পায়। তাদের গ্রাম ছেড়ে এই নগরবাসের একটা মস্ত বড় আনুষঙ্গিক অর্থাৎ নারীসঙ্গ থেকে সে ক্রমান্বয়ে বঞ্চিত। এই বঞ্চনাজনিত হ্যাংলামি রাবেরা সহ্য করে, এজন্যে মনে মনে সে রাবেয়াকে ধন্যবাদ জানায়।

প্রোগ্রাম শেষ করে বেরিয়ে আসে রাবেয়া। 'অমন হাবার মতো তাকাও ক্যান?'

'রফিকের লগে আসছি।'

রাবেয়া হাসে, 'রফিক ভাইয়ের ডিউটি সকালে। আমারে ত্যাখবার লগে আসছো, ত্যাখো।'

বেশ সাফ সাফ রাবেয়া, সে জন্যেই তাকে আকর্ষণ করে। অবশ্য করিম বলদ নয়। রাবেয়ার বাবা পূর্ব পাকিস্তানের উঠতি মধ্যবিত্তের অন্যতম, গুলসানে তাদের চমৎকার নতুন বাড়িতে রাবেয়া তাদের টয়োটায় চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছে কয়েকবার। রফিকদের বাড়ি তাদের প্রায় লাগোয়া। দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে রফিকের চাকরিতে পদোন্নতি সমাসন্ন। যতদিন না তা হয় ততদিন করিমের হ্যাংলামি সামান্য প্রশ্রয় দেবে রাবেয়া, বড় জোর কিছু চকিত চুমু কিংবা হাতে হাত সহ্য করবে। কিন্তু তার বেশি নয়।

'বাড়ি যাও, বাড়ি যাও, দিনকাল ভালো নয় করিম ভাই।' মৃদু ধমক রাবেয়ার গলায়।

নিরালা রাস্তায় পা দেয় করিম। পা অল্প অল্প ভারী লাগে। কিন্তু এক মৃদু উষ্ণতায় মাতালের মতো হাঁটে করিম রাস্তার মাঝ বরাবর। সারি সারি বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ, আলো নেভানো। যেন ছেলেবেলায় দেখা থিয়েটারের উইং-স্ক্রিনে আঁকা বাড়ি, অল্প হাওয়াতেই বোধহয় নড়ে উঠবে। বেশ রাজকীয় ভ্রূক্ষেপহীন আনন্দে করিম এগিয়ে চলে। এবারে ডান দিকে মোড় নেয়। এ রাস্তাও তেমনি নির্জন। চকচকে মসৃণ নতুন ঢাকার চওড়া রাস্তা যেন কাদের পদক্ষেপের অপেক্ষায় স্থির। খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, বাড়ি-গুলোর ভেতরের এক-আধটা ঘর থেকে চাপা আলো। নইলে ঠিক আগের রাস্তার মতোই সারি সারি বন্ধ দরজা জানলা, যেন শিশুদের আঁকা দ্বিমাত্রিক বাড়ির সার, অথবা দরজা জানলা আঁকা দোতলা তেতলা চারতলা সমান উঁচু পাঁচিল। এবারে রাস্তার মোড়ে বন্ধ খাবারের দোকানটার সামনে জিপ গাড়িটা নজরে আসে। একজন সেন্ট্রি এগিয়ে আসে হাত বাড়িয়ে এবং সেই অভ্যস্ত সন্ধানী হাতে টেলিভিশান কেন্দ্রের গেটপাস্‌টা গুঁজে দিয়ে করিম মৃদু অকম্পিত গলায় বলে, 'হাম টেলিভিশানকা ফান্‌কার (শিল্পী) হ্যায়' বলেই, সচরাচর যে ক্ষেত্রে যা ঘটে অর্থাৎ ত্বক পরীক্ষার সুবিধার্থে সে তার প্যান্টের বোতাম গুলো পটাপট খুলতে থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে, পেছন থেকে, পাকিস্তানি হাবিলদারটি চেঁচিয়ে উঠল, 'চালা যাও, চালা যাও।'

হঠাৎ ঠক্ করে কি পড়ার শব্দে করিমের স্মৃতিচারণ চমকায়। স্টীল র‍্যাকের দ্বিতীয় র‍্যাকে তার আঙুলগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছিল নিজের অজান্তেই। এবারে চ্যাপ্টা গোল কৌটোটা ঠক্ করে পড়ে গড়াতে থাকে এবং কী পরম সৌভাগ্য, তার হাতের বৃত্তের মধ্যেই থমকে দাঁড়ায়। যান্ত্রিকভাবে করিম হাত বাড়ায় মেঝেয় বসে বসে। ওষুধের কৌটোটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে, তারপর অন্যমনস্কভাবে ঢাকনার ওপর লেখাটা নজর করেই অভিভূত হয়ে পড়ে। ঠিক এই জিনিসটাই রাবেয়া তাকে তাদের বাড়ির বাগানে বসে খাইয়েছিল না? প্ল্যাস্টিকের ঢাকনির ওপর লাল ইংরেজী হরফে লেখা—'স্প্রেডেবল্‌স্' এবং ঠিক তার নীচে 'চিকেন স্যালাড'। কৌটোটার গন্ধ শুঁকবার চেষ্টা করে করিম এবং সেই সাগর-পারের কৌটোয় নাকের সামান্য তৃপ্তি না হলেও তার কল্পনা উদ্দাম—'লাল ভাত ত্যালা গরুর সঙ্গে জামির লেবু চিইপ্যা' কাজীর উক্তির সেই সুস্বাদু স্মৃতি তার গাল ভরে দেয় লালায়। ভাগ্যিটি বিলাতি, নইলে দিশী টিনের কৌটো কাটবার সরঞ্জাম খোঁজার পরিশ্রম তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। একটা হাল্কা ক্লিপ অল্প চাপ

দিতেই খুলে যায়। আর করিম সেই কৌটোটা কোলে নিয়ে বসে। বোধহয় কোনো সৌখীন ডাক্তার সাহেবের টিফিন। প্রায় আড়াই দিন পর ঠাণ্ডা মেঝেতে বসে আস্তে আস্তে সেই রসা চিকেন স্যালাড মুখে তোলে, ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করে চিবোয়।

আড়াই দিন আগের সেই পথপরিক্রমা এখন তার কাছে জলের মতো স্পষ্ট। সোয়ারীঘাট থেকে ফিরতি পথে কাজীর সঙ্গে দেখা, তারপর টেলিভিশন কেন্দ্র। তারপর সেই পাকিস্তানী পেট্রোলের সঙ্গে সরাসরি মোলাকাত। এবং এখন তার কাছে আরও স্পষ্ট সেই মুহূর্তে আতঙ্কের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। এবং সেই ফর্সা হাল্কা ছোকরা সেন্ট্রির প্রসারিত হাতের দিকে চেয়ে তার মায়া লেগেছিল। তিন চার মাস আগে লাগে নি। তখন পাকিস্তানী সৈন্য মাত্রেই মনে হয়েছিল রক্তপ রাক্ষস। কিন্তু এখন, ঢাকার আকাশে বাতাসে যখন জয় উল্লাস এই নিঃশব্দ নিনাদ ভুতুড়ে রাস্তা সত্ত্বেও, যখন ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ করে ট্রানজিস্টারে অনবরত কান পাতা সমাসন্ন মুক্তির খবরের অপেক্ষায়, যখন চারপাশে হিংস্রতা অনেক বেড়ে গেছে, মানুষ মরছে চারদিকে, তখনও করিম কেমন মমতা বোধ করেছে তার চারপাশের পরিবেশের দিকে চেয়ে। এবং ঠিক এই সময়েই তার মনে হয়েছিল, চারপাশে এমন উত্থান-পতনের মুহূর্তে মরে যাওয়াটা যেমন বিরাট ব্যাপার নয় তেমনি বেঁচে থাকা বড্ড দরকার। হঠাৎ সে আবিষ্কার করেছিল, বোধহয় সেটা এলিফ্যান্ট রোড কিংবা ঠিক কোন রাস্তা ভুলে গিয়েছে, অর্থাৎ সেই সারি সারি বন্ধ দরজা বন্ধ জানলা নিষ্প্রদীপ উঁচু নীচু পাঁচিলের মোড়ে একটি সচল সাইকেল-রিক্সা এবং আর কোনো চিন্তা না করে সে চড়ে বসেছিল। এবং সেই রিক্সাতেই তার সংজ্ঞাহীনতার ইঙ্গিত এসেছিল তার হৃদযন্ত্রে।

রাত এগারোটায় চোখ খোলে করিম। এবং চোখ খুলতেই দু-সারি লোহার খাটের মধ্যবর্তী ধুলোয় ভরা আলোকিত মেঝে তার কাছে বিশাল চওড়া রাস্তায় পরিণত হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে দেখে লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝখানে সেই রাস্তায়। এয়ারপোর্টের মতো চওড়া রাস্তা ধরে অজস্র মানুষের মধ্যে সে কাজী রাবেয়া রফিক চেনা অচেনা অসংখ্য মানুষ চলেছে। সকলেই চলেছে কেউ বাদ নেই, নির্ভীক কাপুরুষ আদর্শবাদী ধান্দাবাজ আত্মদানে উন্মুখ এবং ঠগ জোচ্চর সবাই সবাই। সমস্ত দেশ হাঁটছে স্বাধীনতার উৎসবে। এখন হিসেবের সময় নয়, বিচারের সময় নয়, এখন প্রত্যাশার সময়;

এবং করিম চেয়ে দেখে পূর্ব বাঙলার আকাশজোড়া মেঘের মতো এই প্রত্যাশা ঘনিয়ে উঠেছে মানুষের মুখে চোখে। কেউ কাঁদছে কেউ হাসছে হাত নাচাচ্ছে বন্দুক ফোটাচ্ছে, বিজ্ঞের মতো ঘটনার বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করছে কেউ, কেউ ভিয়েতনাম কেউ চীন কেউ রাশিয়ার কথা বলছে, কেউ আর কোনো দেশের কথাই ভাবছে না—পৃথিবীর মানচিত্রে এখন কেবল একটাই দেশ।

করিমের মনে হয় তার বড্ড দেরি হয়ে গেছে এবং ঠিক এই মুহূর্তে আড়াই দিন আগে সাইকেল-রিক্সায় যে ব্যথায় আচ্ছন্ন হয়েছিল সেই ব্যথায় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এবার নিজের শরীরের সমস্ত ক্ষমতা এক করে সে ধুলো ভর্তি মেঝে দিয়ে তার খাটের দিকে এগোতে থাকে। কোনো দর্শক কাছে থাকলে সেই পীড়িত অভিভূত মানুষটির নিজেকে ধুলোয় হেঁচড়ে নিয়ে যাবার প্রয়াস এক আশ্চর্য রূপকে রূপান্তরিত হতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রাণীটি নেই রাত বারোটা অবধি হাসপাতালে। আর সেই অবসন্ন যন্ত্রণার তালটি একা একা আধেক সাঁতারের ভঙ্গীতে আধেক হেঁচড়ে শেষ পর্যন্ত পারে উঠেই স্থির হয়ে পড়ে।

পরদিন হাসপাতালের জানলার ফ্রেমে আবার ভোরের অপরাজিতা আসে। এবং সেই নিলাভ মকমলে সাদা গোলাপী কড়িয়াল ফুলের ছড়া কারুর বিস্ময়ের কারণ ঘটায় না। পাকিস্তানী সৈন্যদের যে মুর্দাস্কোয়াড ঘরে ঢোকে তাদের সেদিকে তাকাবার সময় নেই। তাদের একজন করিমের দেহটা ঝোলাতে ঝোলাতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

শোকমিছিল

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনয়ভূষণকে দেখে বৃত্তাকার ভীড়টা পথ করে দিল। ধীর পায়ে তিনি সামনে এগোলেন। যুববাহিনীর ইউনিফর্ম পরা ছেলেরা মিলিটারি কায়দায় ট্রাকটা ঘিরে ছিল। কমাণ্ডার পরেশ বিনয়ভূষণকে দেখা মাত্র চাপা গলায় গর্জে উঠল: 'টেনশন। গোড়ালির সঙ্গে গোড়ালি ঠুকে রাস্তার বুকে সম্মিলিত পদাঘাত করে ছেলেরা য়্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল। পরেশ তার সাদা দস্তানা পরা ডান হাতে পতাকার দণ্ডটা শক্ত মুঠোয় ধরে আছে। পতাকা অর্দ্ধনমিত।

বিনয়ভূষণ পরেশের ঠিক সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন। চোখে চোখ পড়তেই আস্তে মাথা হেঁট করলেন। পরেশ দণ্ডের গোড়াটা নাভির কাছে ঠেকিয়ে রেখেছিল। শক্ত মুঠি। ছুরির রুপোলি ফলা আমূল বসে গেল। ধবধবে সাদা দস্তানা। পতাকা অর্দ্ধনমিত।

পলকের জন্য চোখ বুজে অস্ফুটে বিনয়ভূষণ বললেন: না। আর তাতে কাজ হল। মুহূর্তে স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়ে যেন অভ্যাসবশেই একবার লাল পতাকার দিকে তাকালেন। তারপর পরেশের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলেন: রুট ঠিক হয়েছে ?

পরেশ এক পা এগিয়ে লাইনের বাইরে এসে দাঁড়াল। বলল: পার্টি-অফিস হয়ে, পত্রিকা-অফিস হয়ে, যুববাহিনীর অফিস হয়ে, কলেজ পাড়া ঘুরে…

পরেশ হঠাৎ চুপ করে গেল। তার চোখে মুখে অস্বস্তি। বিনয়ভূষণ বুঝলেন শ্মশান শব্দটা উচ্চারণ করতে পরেশের বাধছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। না, আমি বিচারক নই। কোনোদিনই ছিলাম না। তাছাড়া, পরেশ তো সমষ্টিরই সৃষ্টি। ইতিহাসের অনিবার্যতা। না কমরেড বিনয়, তুমি বিচারক নও। চিরকাল সমষ্টির অভিপ্রায়কেই বহন করেছ। আজও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না।

বিনয়ভূষণ বললেন: তাহলে শ্মশানে পৌঁছতে তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

পরেশ বলল: তাই তো মনে হচ্ছে।

: সকলে এসে গেছে ?

: নীহারবাবু ফোন করেছিলেন। ফোটোগ্রাফার নিয়ে আসছেন। উনি বলবেন, আপনি বলবেন, তারপর আমরা স্টার্ট করব।

: হুঁ। বিনয়ভূষণ মনে মনে জপ করছেন—ইতিহাসের অনিবার্যতা।

: নীহারবাবু বললেন পার্টি-অফিসে সকলে অপেক্ষা করছে।

: আচ্ছা। বিনয়ভূষণ ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন—প্রসন্ন মুখ স্তালিন হাত বাড়িয়ে একটি বালককে আদর করছে। সোনালী ফ্রেমে বাঁধা প্রকাণ্ড সেই ছবির নিচে চেয়ার। অনিবার্য বৃদ্ধটি উদাস অন্যমনস্কতায় শোকমিছিলের জন্য অপেক্ষারত। ঠিক তার বাঁ দিকে লেনিনের ছবির নিচে ছিমছাম সেক্রেটারিয়েট টেবিলে বসে নীহার, হাতে টেলিফোন। আরেকবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিনয়ভূষণ মনে মনে বললেন—ইতিহাসের অনিবার্যতা।

: পার্টি-অফিস থেকে আপনাকে সোজাসুজি বাড়ি পাঠিয়ে দেবে।

'বাড়ি' এই শব্দটির উচ্চারণে বিনয়ভূষণের মনে ভূমিকম্প ঘটাল। নিষ্পলক দৃষ্টিতে পরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। না, মনে করতে পারছেন না বাড়ির চেহারাটা, মনে পড়ে না পারুলের মুখ। শুধু ফটকের সামনে কাদের যেন ভীড়, রক্ত…বারান্দায় বেড়ালটা আর্তস্বরে ডাকছে…ঘরের ভেতরে…না, মনে পড়ছে না, মনে পড়ে না…

প্রায় দমচাপা স্বরে বিনয়ভূষণ প্রশ্ন করলেন : বাড়িতে কেন ?

: বিকেলে সময় হলে আবার নিয়ে যাবে। সারাদিন পথে পথে, লম্বা রুট তো ?

বিনয়ভূষণ চকিতে লক্ষ্য করলেন পরেশের গলা সমবেদনায় আর্দ্র হয়ে উঠেছে। অস্ফুটে জবাব দিলেন : তা ঠিক !

: নীহারবাবু মাসীমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। বললেন—

বাধা দিয়ে বিনয়ভূষণ শুকনো গলায় প্রশ্ন করলেন : এখানকার সকলে এসে গেছে ?

পরেশের চোয়াল শক্ত হল। চোখ জ্বলে উঠল। তার স্বাভাবিক ভঙ্গি, এই জেনারেশানের স্বাভাবিক ভঙ্গি। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, বাধা পেয়ে মুহূর্তে ফণা তুলেছে। বিনয়ভূষণ যেন স্বস্তি বোধ করলেন। পরেশের সামনে দাঁড়িয়ে গা এতক্ষণ ছমছম করছিল। এইবার কথা বলা অনেক সহজ হবে।

কিন্তু পরেশের মুখভাব চোখের পলকে পালটে গেল। হেসে বলল : নীহার-

বাবু বলছিলেন যমুনাকে একবার মাসীমার কাছে পাঠাতে।

রুদ্ধশ্বাস বিনয়ভূষণ প্রশ্ন করলেন : কেন ?

: মাসীমা যদি এইখানে একবার আসতেন, তার ইমপ্যাকটটা—

ইচ্ছে হল প্রচণ্ড জোরে চীৎকার করে বলেন—না ! কিন্তু বিনয়ভূষণকে চেষ্টা করে সে-ইচ্ছা দমন করতে হল না। এক অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মে তাঁর অস্তিত্ব ইতিমধ্যেই ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যেতে শুরু করেছে। নীহারের কৌতুক ভরা মুখটা তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন, ঠোঁটের কোণে চুরুট, চুরুটের ডগায় ইঞ্চিখানেক ছাই,

: হ্যাঁ, বিপ্লবীরা মৃত্যুকেও শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখে। অতি-বামপন্থার ছদ্মবেশে প্রতিক্রিয়া আজ শ্রমিকশ্রেণীকে আক্রমণ করছে, অস্ত্র তুলে দিচ্ছে সমাজবিরোধীদের হাতে। এখান থেকে ওখান থেকে প্রতিদিন পার্টির বাছা বাছা কর্মীহত্যার সংবাদ আসছে। এই এলাকায় প্রথমেই তারা অজয়ের মতো কমরেডকে খতম করল।

ঠিকই তো। শোকমিছিলের শুরুতে অজয়ের মা দাঁড়িয়ে যদি হত্যাকারীদের অভিশাপ দেন, তার ইমপ্যাকট হয় সাংঘাতিক। ঠিকই তো। পার্টির স্বার্থের থেকে ব্যক্তিগত শোকতাপ বড় হতেই পারে না। বিনয়ভূষণের এই একটি 'না' থেকেই প্রমাণ হয়ে যাবে ফিউডাল মূল্যবোধ ও বুর্জোয়া উদারনীতিবাদ তার মনের কত গভীরে বাসা বেঁধে আছে। সেই সঙ্গে হঠকারী সমাজবিরোধী ও সি. আই. এ. এজেন্টদের সম্পর্কেও তাঁর দুর্বলতা কত প্রত্যক্ষ। একসট্রিম লেফট আর একসট্রিম রাইট যে একই টাকার দুপিঠ, বিনয়ভূষণ কি তার চমৎকার উদাহরণ হয়ে যাচ্ছেন না ?

টিক টিক টিক। চাপা আর মৃদু সেই অমোঘ টিকটিকির ডাক বিনয়ভূষণ স্পষ্ট শুনতে পেলেন। চমকে পরেশের দিকে তাকালেন। ওর মুখে কোনো ভাবান্তর নেই, শুনতে পায় নি তাহলে। মুহূর্তে ভাবনাগুলো সতর্ক হয়ে উঠল। তাকালেন আশেপাশে। শোকে উত্তেজনায় মাখামাখি অনেকগুলো চোখ স্তব্ধ তাঁকে দেখছে। কিন্তু কে ডাকে ? কিভাবে ডাকে ? চিন্তার তরঙ্গ কোন যাদুতে বাঙ্ময় হয়ে যায় ? শোকমিছিলের শুরুতে নীহার বক্তৃতা করবে। তার ভাষণে অনিবার্যভাবে নিজের ভাবনার প্রতিধ্বনি শুনব। বুঝব, পুত্রের শবদেহের সামনে দাঁড়িয়েও আমার চিন্তাভাবনাগুলো স্বাভাবিক, না না, বিশ্বাসঘাতী হলে চলবে না।

বিক্রয় বিক্রয়, কিছুই আর গোপন নেই। বোতাম টিপে পৃথিবী থেকে নির্দেশ যাচ্ছে, মানুষ ঘড়ির কাঁটা ধরে হুকুম মতো চাঁদে হেঁটে বেড়াচ্ছে। লোকে ঘরে বসে টেলিভিসনে সেই দৃশ্য দেখছে। ইমপিরিয়ালিজমের হাতে সায়েন্স এবং টেকনোলজির এই অলৌকিক শক্তি। তুই পাড়ার দেওয়ালে বিশ্ববিপ্লবের দিনক্ষণ বেঁধে দিলেই হল? প্রকাণ্ড দেশ ভারতবর্ষ। ধূর্ত আর শক্তিশালী এখানকার বুর্জোয়াজি। মাটি চিনলি না, মানুষ জানলি না, পাঁচ-দশটা ছেলে তোরা পরাক্রান্ত এই শত্রুর বিরুদ্ধে ভাবছিস গোপন আন্দোলন করে যাচ্ছিস! শ্রমিক-কৃষক কোথায় রইল, স্কুল-কলেজের কিছু ছাত্র পাইপ গান হাতে স্বপ্ন দেখছিস কৃষিবিপ্লব চলবে! ওরে, আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশ সালে আমরাও কয়েকটা মুক্তাঞ্চল করেছিলুম। অজু তখন মায়ের পেটে, তোর মা—

পরেশ বলল : যমুনা গিয়েছিল মাসীমার কাছে।

বিনয়ভূষণ চমকে পরেশের দিকে তাকালেন। না, মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন কী সাংঘাতিক কো-ইনসিডেন্স। বললেন : তাই নাকি?

: হ্যাঁ। মাসীমা এলেন না।

: ও।

: আপনি যদি একটা চিঠি—

: আমি কেন? চিরকে বলো—ও তার এল. সি. সেক্রেটারি। ওর চিঠির একটা ফর্মাল ভ্যালু আছে।

পরেশ বলল : তা ঠিক। তবে চিরঞ্জীবদা যে গ্লাস ফ্যাক্টরিতে গেছে।

: কেন?

পরেশ কি-একটা বলতে গিয়ে সামলে নিল। তারপর বলল : জানি না। হৃদয়বাবু জরুরি খবর পাঠিয়েছেন।

বিনয়ভূষণ সব বুঝতে পারলেন। অর্থাৎ সাড়ে তিন পার্সেন্টেই রাজি হতে হবে। আর রিস্ক নেওয়া যায় না। মুখ্যমন্ত্রী কার্জন পার্কে নিজের সরকারের বিরুদ্ধে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন। মানে, ইলেকশান। হৃদয়রা তাহলে সত্যিই ফ্রন্টে থাকছে? চির চেয়েছিল সাড়ে আট, ওরা সাড়ে বারো। ম্যানেজমেণ্ট আড়াই থেকে সাড়ে তিনে উঠল। ইন্দিরা কংগ্রেস আর এ.আই.টি.ইউ.সি. কখনো রাজি হবে না। ওয়ার্কিং ক্লাসের স্বার্থকে এখন ওরাই তো চোখের মণির মতো রক্ষা করছে! চাই কি মনোপলির বিরুদ্ধে

ওদের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট এই নির্বাচনের আগেই পয়দা হয়ে যেতে পারে। ত্রিবেণী, হিন্দ মোটরে আমাদের ইতিমধ্যেই বিড়লার দালাল বলতে শুরু করেছে। কিন্তু নীহার, নীহার···তিন বছরে কি রাজনীতি করলে তোমরা যাতে প্রায় পঞ্চাশ বছর আন্দোলনের পর কমিউনিস্টদেব লোকে বিড়লার বন্ধু জোতদারের দালাল বলতে সাহস পায় ?

এক বিচিত্র কোরাস বিনয়ভূষণকে আক্রমণ করল। কেউ শপথ ঘোষণাব মতো গম্ভীর গলায়, কেউ চটুল গানের সুরে, কেউ খি খি হাসির ঢঙে উচ্চারণ করছে—সাড়ে তিন পার্সেণ্ট। হাতেব আঁজলায় তেঁতুলের বিচি নাড়লে-চাড়লে যেমন শব্দ হয়, যুগ যুগ জিও যুগ যুগ জিও বলে বিজুরা যেভাবে নাচত, কানে সুড়সুড়ি দিয়ে কারা সেইভাবে যেন অবিরাম গুনগুন করছে—সাড়ে তিন পার্সেণ্ট সাড়ে তিন পার্সেণ্ট। বিনয়ভূষণ বুঝলেন তিনি উত্তেজিত হচ্ছেন। পরেশের দিকে তাকালেন। না, ঠিকই। ওব চাউনিটা অবিকল নীহারের মতো। সেণ্ট্রাল জেলে নীহারকে সবাই···ও, মনে পড়েছে, সিকিউরিটি প্রিজনার হিসেবে বক্সায় তাঁরা রোজ সাড়ে তিন টাকা য়্যালাউন্স পেতেন। ইচ্ছে হল চীৎকার করে হেসে ওঠেন। পরেশেব চোখে পলক নেই। যেন বিনয়ভূষণকে পড়ে নিতে চাইছে। ঠোঁটেব কোণে কি চাপা হাসি ? রাগ করে মনে মনে বললেন—ছোকরা ! তারপর একটু বাঁকা সুরেই প্রশ্ন করলেন : ট্রাকটা কে দিলে ?

: নস্বররা।

: ওদের ঘেরির ট্রাক ?

পরেশ বাঁকা সুরেই জবাব দিল : হু। সাফা করে দিয়েছে।

ছোট্ট দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বিনয়ভূষণ বললেন : আমাদের সকলে এসেছে ?

: সব। ক্লাব-লাইব্রেরি-গণসংগঠন···প্রত্যেকে তোড়া আর মালা দিচ্ছে। বাড়ি বাড়ি থেকে ধামা করে ফুল দিয়ে গেছে। রিকশা ইউনিয়ন দিয়েছে লাল-ঝাণ্ডা। আপনার পাঁচটা ইউনিয়ন একসঙ্গে ঘাটখরচের দায়িত্ব নিয়েছে। মহিলা সমিতি সেণ্ট ধূপ এইসব পাঠিয়েছে। বন্ধ্ কালকে, তবে বিমলরা গিয়ে স্কুলগুলো আজই ছুটি করিয়েছে। ছাত্র কমরেডদের ইচ্ছে সবগুলো স্কুলেই যাওয়া হোক। এদিকে থানা থেকে খবর পাঠিয়েছে পূর্ব কলোনির দিকটায় এ্যাটাক হতে পারে। ওখানকার ফাঁড়িটা আবার নকশালদের প্রটেকট করছে। আজ আর ঝামেলায় যাওয়া ঠিক নয়, সময়ও নেই। আমরা শুধু জগবন্ধুতে একবার দাঁড়িয়ে সোজা বেরিয়ে যাব। এখন নীহারবাবু এসে পড়লেই···

আমি ইস্কুলে যাব না—অজয় জেদ ধরেছে। পারুল তাদের অক্ষমতা গোপন করার জন্য, হয়তো বা নিজের কাছেই অস্বীকার করার ইচ্ছেয়, অজয়ের সেই প্রবল অভিমান গায়ে না মেখে হেসে কুটোপাটি যাচ্ছে। গোঁজ হয়ে বসা অজয়কে গোল হয়ে ঘিরে বিজয় হাতে তালি দিয়ে গাইছে : আমার সোনার হরিণ চাই, তোরা যে যা বলিস ভাই। পারুল কৃত্রিম ধমক দিয়ে বলছে : এ্যাই বিজু, দাদার পেছনে লাগছিস! ও কি সোনার হরিণ চায়? ও তো চেয়েছে ইনস্‌ট্রুমেণ্ট বক্স। জানো না কাল যতীন স্যার ওকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন? সঙ্গে সঙ্গে বিজয় গান ধরেছে : আমার ইনিস্‌ট্রুমেণ্ট চাই, আমার ইনিসট্রুমেণ্ট চাই, তোরা যে যা বলিস ভাই...। অজয় উঠে পারুলের পিঠে চড় মারছে। ভাইয়ের ওপর রাগ হলেই ও পারুলকে মারত, কখনো বিজুর গায়ে হাত তোলে নি।

: মেসোমশাই।

: বলো।

: মাসীমার জন্যই একবার মাসীমার আসা দরকার।

বিনয়ভূষণ অভিভূতের মতো পরেশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন দৈববাণী শুনছেন।

: কাল থেকে মাসীমার কি অবস্থা। এখানে মানুষজনের মধ্যে এলে হয়তো ভালো লাগত। শোককে ক্রোধে পরিণত না করলে মাসীমা বাঁচবেন কি করে?

'শোক নয় ক্রোধ'। গান্ধীহত্যার পর 'স্বাধীনতা'য় লাহিড়ীর এডিটোরিয়াল মুখে মুখে ফিরেছিল। পরেশ তো জন্মায়ই নি তখন। ও কি জানে সম্পাদকীয়টা কার লেখা? কিন্তু কি চমৎকার বলেছে, এবং একেবারে আঁতের কথা। জানো কমরেড, এই পরেশকে তুমি চিনতে না, চিনবে সে আশাও করো নি। তাই তো বলি, তুমি বিচারক নও হে বিনয়ভূষণ। কোনোদিনই ছিলে না। চিরকাল সমষ্টির অভিপ্রায়কে বহন করেছ, আজও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। সত্যিই তো। ঐ বাড়িতে একা পারুল নিঃশ্বাস নেবে কি করে? শোককে ক্রোধে পরিণত না করলে পারুল বাঁচবে কি নিয়ে? কিন্তু পারুল যদি চীৎকার করে ওঠে—হ্যাঁ ক্রোধ, তবে তা তোমার বিরুদ্ধে, তোমাদের বিরুদ্ধে। এই তো সেদিনই বলছিল—পঞ্চাশ বছরে কোন রাজনীতি করলে তোমরা যাতে আজ ছেলে তার বাপকে দাদাকে মনে করে পুলিশের লোক, আর দলত্যাগী ছেলেকে

তার বাপ-দাদার পার্টি ভাবে সমাজবিরোধী, সি. আই. এ.-র এজেন্ট ? যদি এইখানে এসে ও বলে—আমি অজয়ের মা, আমি বিজয়ের মা, আমি তোমাদের অভিযুক্ত করছি !

বিনয়ভূষণ শিউরে উঠলেন। পরেশকে বললেন : না, ওকে এখন আনাটা রিস্কি হবে।

পরেশ মুহূর্তে ব্যাপার বুঝে ফেলল। তার চোখেমুখে অনেক অনেকদিন পর বিনয়ভূষণের জন্য এক ধরনের শ্রদ্ধা ফুটে উঠল। আর তা দেখে বিনয়ভূষণের জীবনে এই প্রথম ছোকরার পেটে একটি লাথি মেরে তার হাত থেকে পতাকাটি ছিনিয়ে নেওয়ার প্রবল বাসনা হল। আবার এই কুৎসিৎ ইচ্ছেটার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই বড় লজ্জা পেলেন তিনি। মনে মনে বললেন—না কমরেড। আত্ম-বিস্মৃতি তোমাকে মানায় না।

টিক টিক টিক। চাপা আর মৃদু টিকটিকির ডাক। চমকে পরেশের দিকে তাকালেন। কোনো ভাবান্তর নেই। শুনতে পায় নি। ও কি জানে ? টিক টিক টিক। না বোধহয়। টিক টিক টিক। ক্লান্ত বিনয়ভূষণ আস্তে বললেন : ঠিক আছে। তুমি লাইনে গিয়ে দাঁড়াও। আমি এদিকটায় অপেক্ষা করছি।

মুহূর্তে পরেশ সামরিক কায়দায় য়্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল। তারপর পতাকার দণ্ডটা শক্ত হাতে ধরে পা ফেলে পা ফেলে লাইনে ফিরে গেল।

এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতায় সবাই বিনয়ভূষণকে দেখছিল। কখনো একটা-দুটো কথা, কখনো নিছক নীরবতা। বৈপ্লবিক শৃংখলায় তারা নিজের জায়গা থেকে নড়ছিল না বলে ভাবনায় হারিয়ে যেতে যেতে বিনয়ভূষণ মাঝে মাঝে কি বলছিলেন পরেশকে তা কেউই প্রায় শুনতে পায় নি। কিন্তু ধীর স্থির কিছুটা বা উদাসীন বিনয়ভূষণকে দেখে অনেকেরই চোখে জল আসছিল।

পরেশ নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে যমুনা এপাশ থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল : অজয় তোমায় ভুলি নি—

বিনয়ভূষণ ও পরেশের দিকে তাকিয়ে থাকা সেই রুদ্ধশ্বাস জনমণ্ডলী হঠাৎ যেন চমকে উঠে গলা মেলাল : ভুলছি না ভুলব না।

আলুথালু চুল যমুনার, মুখের ওপর উড়ে উড়ে পড়ছে। চোখদুটো লাল। শাড়ির ভাঁজ ঠিক নেই। যেন কি-এক ক্ষ্যাপা কান্না আর ক্রোধ সে প্রাণপণে চেপে রেখেছে। যমুনা কি অজয়কে, বিজয়ের সঙ্গেও তো ওর খুব খাতির ছিল। টুনি, বোকন, চন্দনা···ওরাও তো রয়েছে। ঠিক জানেন না বিনয়ভূষণ।

এখনকার ছেলেমেয়েদের অনেক কিছুই তিনি বোঝেন না। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। শুধুই কি এই যুগ? নিজেদের সময়টাকেও কি ঠিকমতো বুঝে উঠতে পেরেছে বিনয়ভূষণ? এক সর্বব্যাপ্ত অবসাদ আর ব্যর্থতাবোধ তাঁকে আচ্ছন্ন করল।

হয়তো ঠিকই বলে শ্রীনাথ। পার্টি-হোলটাইমাররা অধিকাংশই হল লায়েবিলিটি। নিজেদের যোগ্যতায় চাকরি করে সংসার করে বাঁচতে পারত না। জনসাধারণের চাঁদা ও পার্টি-মেম্বারদের লেভি কতগুলো শরীরে মনে বুড়ো আর অলসের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। বাজার করতে হয় না—কত ধানে কত চাল সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই, দুপুরে একটু ঘুম, সন্ধ্যায় পার্টি-অফিসে গ্যাঁজাগেঁজি···ইনিশিয়েটিভ বা ইমাজিনেশনবিহীন এই এদেরই জন্য পার্টি বাড়ছে না। শ্রীনাথ একটা কলেজের প্রিন্সিপাল, একদা কবিতা লিখত এখন নামজাদা তাত্ত্বিক, স্ক্রুটিনি ফর্মে নিজের আয় কম করে দেখালেও প্রয়োজনে মোটা চাঁদা তুলে দেয়। পার্টি-পত্রিকায় মাঝে মাঝে ওর বক্তৃতা বেরোয়, ছবি। শ্রীনাথের কথার দাম আছে বৈ কি! হয়তো ঠিকই বলে পরেশরাও। বিনয়-ভূষণ কৌপিনআঁটা কমিউনিস্ট। নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে একেবারেই খাপ খাওয়াতে পারছেন না। পার্টির এখন গুছিয়ে নেওয়ার সময়—যেখানে যেভাবে পারা যায়। জোতদার-মালিক-সরকারী আমলা-পুলিশ···পার্টির প্রকাণ্ড শক্তির সামনে প্রত্যেকে নতিস্বীকার করেছে। এইবেলা সংগঠন ঠিক করে নাও, প্রতিটি অঞ্চলকে দুর্গে পরিণত করো, যাতে ঠিক সময়ে ঠিক আঘাত হানা যায়। বিনয়ভূষণরা তাঁদের নীতিফিতি সহ রিটায়ার করুন--পার্টি পেনসন দিক। অনেক ত্যাগ অনেক সংগ্রাম করেছেন—এটুকু ওঁদের প্রাপ্য।

শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মায়াকভস্কি, নাকি লোরকা—কার কবিতা যেন? প্রৌঢ় বিনয়ভূষণ বহুকাল বাদে নিজের যৌবনের দিকে ফিরে তাকালেন। কী সেই লাইনটা? হে ঈশ্বর, আমাকে এমন মৃত্যু দিও যেন আমার মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠে বন্ধুরা তাদের মুখ না ফিরিয়ে নেয়।

ঝাউতলা কমিউনে ঘরের দেয়ালে শ্রীনাথ বড় বড় হরফে কবিতাটা লিখে রেখেছিল। বেআইনী যুগে প্রায়ই আবৃত্তি করত। মুসলিম হোটেলে তখন দু-আনার রুটি আর শিক দিয়ে প্রায়ই দুজনকে ব্রাহ্মণভোজন সেরে নিতে হত, সারা দিনে তিনটে বিড়ি ছিল বরাদ্দ। পারুল মাঝে মাঝে সিগারেটের প্যাকেট কিনে দিলে বা সংসারী কমরেডরা মাঝে মধ্যে খাওয়ার নেমন্তন্ন করলে জীবনে

উৎসবের ছোঁয়া লাগত। হোলটাইমাররা সেদিন পার্টির নয়নের মণি ছিল। সেইসব দিনে শ্রীনাথ আবৃত্তি করত : হে ঈশ্বর, আমাকে এমন মৃত্যু দিও···

ঈশ্বর কথা শুনেছেন। শ্রীনাথ যুক্তফ্রণ্টের আমলে প্রিন্সিপাল হয়েছে, আর সে আজ তার পুত্রের শোকমিছিলে বক্তৃতা করবে। শুধু দু-পুরুষ স্বদেশীর পরিণাম হিসেবে তার নিহত ছেলেদের মুখগুলো ফুল দিয়ে ঢেকে দিতে হয়েছে।

বিনয়ভূষণ চমকে উঠলেন। না না, ছেলেদের নয়, ছেলের! অজয়! অজয়ের শোকমিছিল! শহীদ অজয়! বিনয়ভূষণ শিউরে উঠলেন। জীবনে কত কোটিবার কতভাবেই না শহীদ এই অক্ষরত্রয় উচ্চারণ করেছেন। ব্যবহারে ব্যবহারে জীর্ণ শব্দটা আজ প্রথম যেন তাঁর অস্তিত্বের মূল ধরে টান দিল।

ততক্ষণে 'জনপ্রিয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' থেকে হাতে হাতে দুটো চেয়ার চলে এল। রাস্তার ওপর পেতে হরিজীবন বলল : বসুন বিনয়দা, এইখানটায় বসুন। সে হাত ধরে বিনয়ভূষণকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল।

বিনয়ভূষণ শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরেশের সুঠাম বুক আর নাভিতে আড়াআড়িভাবে প্রোথিত পতাকাদণ্ডের মধ্য দিয়ে ট্রাকের মাঝখানটা দেখা যাচ্ছে। খোলা ট্রাকে সুদৃশ্য পালঙ্কের ওপর আপাদমস্তক ফুলে ঢাকা অজয় শুয়ে আছে। কোন দিকে মাথা কোন দিকে পা বোঝা যায় না। বুকের ওপর একটা রক্তপতাকা টান টান করে পাতা। টিকলো নাক, চওড়া কপাল আর উড়ু উড়ু চুলে অজয়কে সুন্দর দেখাত। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তার মুখটুকু বার করে রাখা গেল না। বোমাটা ফেটেছিল ঠিক মাথার ওপর। চোখের মণি একটা পাওয়া গেছে, একটা বোধহয় কাকে নিয়ে গেছে।

বিনয়ভূষণ ট্রাকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বড় বড় সাদা রাঁদ, গোছা গোছা রজনীগন্ধা, লাল গোলাপ। কারা যেন অনেকগুলো সূর্যমুখী দিয়েছে। গাঁদার মালা ··

: দে, পরিয়ে দে।

ছেলেটা জেদ করে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রইল।

: অজু, এই বোকা। মালাটা পরিয়ে দে বাবাকে···পারুলের চোখেমুখে উত্তেজনা, খুশি। ছেলের গোঁয়ার্তুমিতে একটু যেন বিব্রতও।

বিনয়ভূষণ হাসি মুখে আর অবাক হয়ে অজয়কে দেখছেন। নিতান্ত শিশু ছেলে, শরীরের তুলনায় মাথাটা বড়, হাত-পাগুলো রিকেটি, পাতলা ভুরুর নিচে ভাসা ভাসা চোখ, ঘাড় অব্দি চুল।

আর স্টেশানটা যেন এক ভাসমান জেটি, জোয়ারের ধাক্কায় দুলছে। গাঙ-চিলের মতো ইঞ্জিনের সিটি, শুশুকের দীর্ঘশ্বাস। চাকায় ধাতব শব্দ তুলে মাল বোঝাই ঠেলা নিয়ে খবর্দার খবর্দার কুলিরা ছুটছে। যেন শান্ত জলের বুক তোলপাড় করছে কয়েকটা বেপরোয়া লঞ্চ। একটা ট্রেন এইমাত্র এল, একটা এখুনি ছাড়বে। যাত্রীদের কেউ স্বাগত জানাচ্ছে, কেউ বা বিদায়। আর পরস্পরকে ধাক্কা দিয়ে পাশ কাটিয়ে স্রোতের মতো মানুষ।

এরই মধ্যে একটা বেঞ্চি ঘেঁষে সকলে দাঁড়িয়েছে। বেঞ্চিতে পেট অব্দি চাদর টেনে শুয়ে একজন কাগজ পড়ছে, তার পায়ের কাছে কোনো রকমে জায়গা করে নিয়ে একটি কচি বৌ কোলের বাচ্চাটার সঙ্গে গলা ছেড়ে খুনসুটি জুড়েছে। যেন নোয়ার নৌকো, চারপাশের কিছুই তাদের স্পর্শ করছে না।

বন্যা-ফেরত বিনয়ভূষণদের ঘিরে ধরেছে যে-কমরেডরা, পরিপার্শ্ব সম্পর্কে তারাও এমনি উদাসীন। সেই ঊর্ধ্বশ্বাস জনস্রোত পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে বৃথাই তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে।

: দে, পরিয়ে দে মালাটা···

: না বিনয়দা, ছেলের তোমাকে পছন্দ হয় নি।

: আহা, মোটেই না, অজু বলে কতদিন তার বাবাকে মালা পরাবে বলে—

বিনয়ভূষণ সস্নেহে পারুলের হাত ধরলেন, বললেন : দাঁড়াও, বাবুর সঙ্গে ভাব করে নিচ্ছি।

পারুলের হাত ধরতে দেখে শিশু অজয় তীব্র ভ্রূকুটি করে বিনয়ভূষণের দিকে তাকাল। বিনয়ভূষণ দুরুদুরু বুকে তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন, জেলখানা থেকে লেখা চিঠিতে যা বলে একটি অপরিচিত শিশুকে তিনি খ্যাপাতেন। শুনে অজয়ের কোঁচকানো ভুরু আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হল, ঠোঁটের কোণে একটু বা হাসি ফুটল। গোপন আর অমোঘ সেই নামে আরেকবার ডাকতেই অজয় পারুলের কোল থেকে মালা শুদ্ধ তার কচি হাতদুটো বাড়িয়ে দিল।

বিনয়ভূষণ ট্রাকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বড় বড় সাদা বীদ, গোছা গোছা রজনীগন্ধা, লাল গোলাপ। কারা যেন অনেকগুলো সূর্যমুখী দিয়েছে। কাঁপতে কাঁপতে বিনয়ভূষণ উঠে দাঁড়ালেন, একটা হাত সামনের দিকে বাড়ানো।

: দাদা।

বিনয়ভূষণ ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন ভূপতি। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বসে

পড়লেন। বললেন : কিছু না, একটু মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

: জল খাবেন ?

: হুঁ।

ভূপতিকে কিছু বলতে হল না। অর্চিরা কয়েকজন দৌড়ে চলে গেল। অর্চি, পিকলু, টোনা আর অজয় একসঙ্গে পার্টি-মেম্বারশিপ পেয়েছিল। এল. সি. অফিস থেকে সোজা এসেছিল দেখা করতে। পারুল সকলকে একটা করে রসগোল্লা খাইয়েছিল, বিজয়কে দুটো—কারণ মেম্বারশিপ পাওয়ার বয়েস হতে ওর এখনও চার বছর বাকি। বিজয় বলেছিল—দাদা, আমি কেন তুই হলুম না রে !

অর্চিরা চলে যেতে বিনয়ভূষণ পারুলকে বললেন : পতাকাটা বের করো।

সেই পতাকা। রথতলার হাটে পুলিশ গুলি চালায়। সুখীর মা পড়ে গেল—হাতে ঝাণ্ডা। বিনয়ভূষণ হাঁটু গেড়ে বসে সুখীর মা-র মাথাটা কোলে তুলে নিলেন। দশাসই সুখীর মা চোখ মেলে তাকাতে পারছে না যেন, ঠোঁট কাঁপছে···কিছু বলতে চায়। বিনয়ভূষণ সুখীর মা-র শক্ত মুঠি শুদ্ধ পতাকাব দণ্ডটা সোজা করে ধরলেন। কষ্টে সুখীর মা একটিবার চোখ তুলে তাকাল, তারপর মরে গেল। আস্তে তার মাথাটা নামিয়ে বিনয়ভূষণ উঠে দাঁড়ালেন। বাঘের মতো গজরাতে গজরাতে মিছিলটা থম মেরে আছে। বিনয়ভূষণ সকলের সামনে, হাতে সুখীর মা-র রক্ত লাগা পতাকা।

: অজু, তুই জেলখানায় জন্মেছিলি। আমি তখন আরেক জেলে। তোর কথা খুব ভাবতুম, আমার প্রথম সন্তান, কিন্তু কোনো চেহারা মনে আসত না। দ্বিতীয় দফা হাঙ্গার স্ট্রাইকের সময় একদিন স্বপ্নে একটি শিশু আমাকে প্রচুর ভালো ভালো খাবার খেতে দিল। বহু সময় ভেবেছি—সে কি তুই ? তোকে প্রথম দেখলাম—হাঁটতে পারিস, কথা বলিস ; যত শিশু ভাবতাম—তার থেকে অনেক বড। তারপর সাতান্ন সালে নক্করদের মামলায় জড়িয়ে আবার তিন বছর ঠুকে দিল। জেল থেকে ফিরে দেখলাম তুই আর ছোট্টটি নেই, প্রায় কিশোর। বাষট্টি সালে ফের আটক করল। বেরিয়ে এসে বুঝলাম ভারতরক্ষা আইন, সন্ত্রাস, পার্টি ভাঙাভাঙির মধ্যেই আমাদের অজু কবে অজয় হয়ে গেছে।

বিজু সুর করে বলল : কমরেড দাদা, লাল সেলাম।

অজয় চাপা স্বরে ধমক দিয়ে বলল : সব সময় ইয়ারকি, না ?

বিজু বলল : ছাখো মা, মেম্বারশিপ পেয়েই দাদার কিরম ডাঁট বেড়ে গেছে।

পারুল হেসে বলল : তুই যেদিন পাবি সেদিন তো হাতে মাথা কাটবি।

বিজু ঠোঁট ফুলিয়ে উত্তর দিল : তুমি তো একথা বলবেই। চিরকাল তুমি দাদাকে বেশি ভালোবেসেছ।

পারুল তোরঙ্গ খুলে বসেছিল। মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল : তোকে তো এইজন্যই হাঁদু বলে ডাকি।

: দেখি মা দেখি। বিজু সারসের মতো তোরঙ্গের মধ্যে নাক ঢুকিয়ে বলল : আ, ঠিক যেন আলুর চপ আলুর চপ গন্ধ।

পারুল বিজুর পিঠে একটা চড় মেরে বলল : ছ্যা ছ্যা ছ্যা, ঠাকুমার ঝুলিও তো বলতে পারতিস ?

: ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। বুঝলে মাদার ?

: বুঝেছি বুঝেছি, এখন সর। তোর বাবা শুকতারা দেখে লিখেছিল রাত্রির চোখে একফোঁটা জল।

: তখন যে তুমি জেলে ছিলে। আমার বৌ যখন জেলে থাকবে তখন পূর্ণিমার চাঁদ দেখে আমি লিখব—

: যেন প্রমাণ সাইজের তালের বড়া। পারুল মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে উঠল।

: কক্ষনো না, কিছুতেই না। বিজু পারুলের পিঠে কিল মারতে লাগল।

: নে, চুপ করে বোস। পারুল একে একে তার সম্পত্তি বার করতে লাগল। মায়ের কড়ির ঝাঁপি, বাবার ছেঁড়া শাল, শাড়ির গোটানো পাড়, বাচ্চাদের কানঢাকা টুপি, সাদা হয়ে আসা গোটাকতক তামাক পাতা, বিবর্ণ আর ভাঁজের জায়গাগুলোয় ট্রেসিং পেপার লাগানো 'পীপলস এজ' পত্রিকার একটি সংখ্যা যাতে তরুণ বয়েসে বিনয়ভূষণের ছবি বেরিয়েছিল, ঐ সময়েই প্রকাশিত বিনয়ভূষণের একমাত্র কবিতাপুস্তিকা যার উৎসর্গপত্রে পারুলের নাম ছাপা আছে, পার্টির নানা সময়ে ছাপা কয়েকটা ইশতেহার—লেখকের নাম না থাকলেও আসলে যা বিনয়ভূষণের রচনা, প্রথম পরিচয়ের পর পারুলকে লেখা বিনয়ভূষণের কতগুলো চিঠি—প্রায় যক্ষিনীর মতো পারুল যা পুলিশের থাবা থেকে রক্ষা করেছে, একটা লালঝাণ্ডা…

মুহূর্তে ঘরের আবহাওয়া গম্ভীর হয়ে গেল। বিনয়ভূষণ বললেন : জানিসই তো হাজার বিপদের মধ্যে তোদের মা কী কষ্টে, খেয়ে না-খেয়ে, তোদের মানুষ করেছে। কত সময় এটা-ওটা চেয়েছিস। দিতে পারি নি, খুব একটা চাইও নি দিতে। শুধু অপেক্ষা করেছি এমন একটা দিনের জন্য। এই পতাকা, মনে রাখিস—কমরেড অজয়কে আমার উপহার!

বিনয়ভূষণ পারুলের মুখে সেই হাসি দেখলেন যা শতাব্দীতে একবারই চোখে পড়ে। বললেন : হ্যাঁ, অপেক্ষা রইল আরও একটা দিনের জন্য। যদি সেদিন না থাকি, তাহলে বিজুকে আমার উপহার দেবে পারুল, বিকল্পে অজু।

আবেগে বিনয়ভূষণ একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেলেছিলেন। পারুল তো বরাবরই বলত—ঐ তোমাদের দোষ, বাসরেও পার্টি মিটিং। বিনয়ভূষণ বুঝলেন উৎসবের মেজাজটিই তিনি নষ্ট করতে বসেছেন। হয়তো শেষ কথা কটার জন্যই ঘরের বাতাস এমন ভারী হয়ে উঠেছে। তিরস্কারের লোভে পারুলের দিকে তাকালেন, কিন্তু পারুল মুখ খোলার আগেই বিজু তার চিকণ গলায় চীৎকার করে উঠল : কমরেড বাবা, যুগ যুগ জিও…

পারুল অনেকদিন পরে বিনয়ভূষণের কবিতার বইটার পাতা ওল্টাতে লাগল। বিনয়ভূষণ আড়চোখে দেখে—

: মেসোমশাই!

: উঁ?

: জল।

: উঁ?

: জল চেয়েছিলেন? এই যে…

: হ্যাঁ, দে।

বিনয়ভূষণ এক নিঃশ্বাসে গেলাস খালি করে বুঝলেন খুব তেষ্টা পেয়েছিল। চোখেমুখে একটু জল দিতে পারলে ভালো লাগত। আশেপাশে সকলেই চেনা মুখ। কেউ এসে কলোনির পত্তন করেছিল, কেউ বা এখানেই জন্মেছে। বলবেন আরেক গ্লাস জল আনতে? পাশের চেয়ারটা খালি। নীহার না পৌঁছনো পর্যন্ত ওখানে কি কেউই বসবে না? যদি ইদ্রিস খবর পায়, যদি হাসি বৌদি…

: যেতে দে আমায়, এই ছোঁড়ারা—যেতে দে বলছি।

ননীদির গলা। বিনয়ভূষণ ভেতরে ভেতরে আবার কুঁকড়ে গেলেন।

ননীদিকে এই দিনে বাড়ি থেকে ছেড়ে দিলে ? হ্যাঁ বৌমা—এ তোমাদের কেমন বিবেচনা ?

হরিজীবন বলছে : চলো ননীদি, বাড়ি চলো। এখানে তোমার থাকতে নেই।

: কেন ? কেন থাকতে নেই ? আমি কি পাগল যে···

: ছি ছি, তাই কি আমি বলেছি ?

: বুঝি রে, বুঝি। নিজের ব্যাটা-ব্যাটার বৌ পাগল ভাবে, তুই ভাববি না ? কিন্তু এই জেনে রাখ হরি—ওঁ আবাগীর সাধ্য কি আমাকে আটকে রাখে ? অজু-বিজু পুলিশের গুলিতে শহীদ হল, মিছিল বেরোবে—আমি ঘরে বসে থাকব ?

যেন বজ্রপাত হল। পাগল ননীদি নিষিদ্ধ নাম উচ্চারণ করে ফেলেছে। প্রতিক্রিয়ার এজেন্টকে শহীদ বলেছে।

: আহ্, চুপ করো ননীদি, চুপ করো।

: না জেনে কি যা তা বলছ খুড়ি।

: বুড়িকে নিয়ে যা না ধরে।

: কে রে ? কে আমাকে ধরে নিয়ে যাবি—আয়। কোন মায়ের দুধ খেয়েছিস দেখি।

: আহ্ ননীদি, ছেলেপিলের কথা ধরতে আছে ? এই পান্তা, ক্ষমা চা পিসির কাছে।

: ও, তুমি। যোগিনের ব্যাটা। তোমার এত বড় মুখ না হলে কার হবে ? তোর বাপ ছিল নস্করদের পা চাটা—বৌমা যখন আঁতুড়ে, সেই সে বছর গো, জগৎ আর বিনয়কে ধরিয়ে দিয়েছিল না যোগিন ? কিচ্ছু ভুলি নি আমি। আজ হাওয়া পাল্টেছে আর তুমি এসে ভিড়েছ ইদিকে ?

: গ্যাখো পিসি, যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বোলো না। আমার বাপ কি করেছিল তার জন্য আমি দায়ী ?

: তুমি একেবারে বিল্বপত্তর এসোছো। এই মোড়ে দাঁড়িয়ে ছেন্তাই করতে না বাপ ? চট্টরাজদের বিউটিকে···

: আহ্ ননীদি। এইবার আমি রাগ করব। শোকতাপের সময় এসব কি কুকথা বলছ ? চলো, বাড়ি চলো।

: ছেড়ে দে, আমায় ছেড়ে দে। অজু-বিজু শহীদ হল···ও ভূপতি, ও

নিবারণ একটু যে গঙ্গাজল এনেছিলুম গো। এই খোকা…তুই কাদের বাড়ির ছেলে রে? আমাদের বিনয়কে দেখেছিস, আমাদের বিনয়? এই খোকা…

কারা যেন টানতে টানতে ননীদিকে নিয়ে চলে গেল। মানুষের বেড়া ভেঙে ননীদি আসতেই পারল না ভেতরে। যদি আসত, যদি প্রশ্ন করত—বিজয় কোথায়, শহীদ বিজয়!

বিনয়ভূষণ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ফুলময় পালঙ্কের দিকে তাকালেন। দেখলেন যেন বিজু শুয়ে আছে। সেই খ্যাপাটে চোখ, ঠোঁটের কোণে ঠাট্টার মতো হাসি।

: ডিসিপ্লিন? পার্টির ভেতরে থেকে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি মেনে আই. পি. এস.? কমরেড বাবা, ইনার পার্টি স্ট্রাগল দেবে তোমরা করতে? দিয়েছ কোনোদিন? পত্রিকা থেকে বেছে বেছে সবাইকে তাড়িয়েছ, জনসভায় তোমরাই বক্তা—জনগণকে আমাদের বক্তব্য আমাদের অভিজ্ঞতা জানাব কি করে?

বিজুর সদ্য গোঁপওঠা সুকুমার মুখটা ঘৃণায় ক্রোধে জ্বলছে, ডান দিকের ভুরু ছাপিয়ে একগোছা চুল আগুনের শিখার মতো লকলক করছে। বিজু বলছে: আর পার্টির ভেতরে? যাকে খুশি একসপেল করছ, সাসপেণ্ড করছ। প্রতিটি ইউনিটে কংগ্রেসের মতো মাথা গুণে মেম্বারশিপ করে রেখেছ—এত মেজরিটি সত্ত্বেও এত তোমাদের ভয়। আমরা রেকমেণ্ড করলে কেউ সহজে সভ্যপদ পায় না—কোনো না কোনো ফ্যাকড়া বের করো, ঝুলিয়ে রাখো, মাসের পর মাস এমন কি বছরের পর বছর। ইচ্ছে হলে সেল মিটিং ডাকো—অবশ্য য়্যাজেণ্ডা ঠিক করার মালিক তোমরা। মাইনরিটি কথা বলতে গেলে ধমকে চুপ করিয়ে দাও। মিথ্যে গুজব রটিয়ে কমরেডদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নাও। ভয়ে অনেকে মুখ বুজে থাকে। তাছাড়া তোমাদের হাতে পার্টি-সংগঠন, ফাণ্ড—যেখানে খুশি যাকে পছন্দ হোলটাইমার করে দাও। আর এই বিপুল সংখ্যক পার্টি-আমলা পার্টিতে গণসংগঠনে নেতৃত্বের বিশ্বস্ত য়্যালসেসিয়ানের কাজ করে, নইলে চাকরি…

: বিজয়!

রান্নাঘর থেকে পারুল উঠে এসেছে। হাতে খুন্তি। নাকের পাটা কাঁপছে। দাঁত দিয়ে তলাকার ঠোঁট কামড়ে ধরেছে।

বিজুও অবাক হয়ে তার মাকে দেখছিল। পারুল বলল: কাকে কি

বলছিস ? কি জানিস তুই, কতটুকু দেখেছিস ? রাজনীতি ফলাচ্ছ ? বিপ্লবী ?

হাতে খুন্তি আছে সেটা এতক্ষণে খেয়াল হল। ছুঁড়ে ফেলে পারুল বিজুর চুলের মুঠি শক্ত করে ধরে বলল : দূর হয়ে যা। তোর মুখ দেখলে পাপ হয়।

: পারু, ওকে ছাড়ো।

প্রায় অর্ধ-উন্মাদিনী পারুলের মুঠোয় বিজুর একগোছা চুল। বিনয়ভূষণ পারুলকে বসালেন। আহ্, কি নিঙরনো ক্ষয়ে যাওয়া পারুলের মুখ। কপালে হাতে রগগুলো ফুলে পাকিয়ে আছে। পৃথিবীর কত সন-তারিখ তোমার মুখস্থ। কিন্তু কমরেড বিনয়ভূষণ, বলতে পারবে কবে পারুলের কচি বাঁশগাছের মতো শরীরটা আখের ছিবড়ে হয়ে গেল ? কবে তোমার বৌয়ের চুলে পাক ধরল ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিনয়ভূষণ বললেন : আয় বিজু, এইখানে বোস।

বিজয় চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। পারুল যখন চুল ছিঁড়ে নিয়েছে তখনও এতটুকু নড়ে নি। বিনয়ভূষণ ডাকতে বাধ্য ছেলে যেন চৌকিতে গিয়ে বসল। মায়ের দিকে একবার তাকিয়ে অপ্রতিভ হাসল। তারপর একটু কেশে গলা সাফ করে নিয়ে বিনয়ভূষণকে বলল : আমি তোমায় মীন করি নি।

: বলার অধিকার তোমার একশোবার আছে, তবে সব সময় জানবে আমার পার্টিকে বলা মানেই আমাকে বলা।

: আমি তা মনে করি না। তুমি এবং তোমার পার্টি আমার কাছে এক হয়ে গেলে এ-বাড়িতে আর একদিনও থাকতুম না। এমন কি মা-র জন্যও না।

: তুই কমিউনিস্ট হলে এমন কথা বলতিস না। শোন, তোর দাদাদের আমি আজ থেকে চিনি না। চিরকাল তারা পেটিবুর্জোয়া ইনডিভিজুয়ালিস্ট। প্রুধোঁ-বাকুনিনদের বিরুদ্ধে লড়াই করেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। য়্যানার্কিক হ্যাবিটস আর রোমান্টিসিজম সম্বল করে বিপ্লব হয় না।

: বাবা, রোমান্টিসিজম ছাড়া মানুষ স্বপ্ন দেখবে কি করে ? আর, স্বপ্ন ছাড়া বিপ্লব হয় ? অনেকে তো চে-কেও য়্যানার্কিক বলতে ছাড়ে নি। আজ দেখতে পাচ্ছ লাতিন আমেরিকায় কি শুরু হয়েছে ? আর, সেদিক দিয়ে হো-চি-মিনের থেকে বড় রোমান্টিক কে ? সাউথ ভিয়েতনামে প্রায় তীরধনুক দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিল, এখন গোটা দেশ জুড়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কবর খোঁড়া চলছে। সেদিন তুমি আমায় বোঝাচ্ছিলে ইমপিরিয়ালিজমের হাতে অলৌকিক শক্তি, ইণ্ডিয়ান বুর্জোয়াজিও কিছু কম যায় না। অতএব বুঝে চলো। বিপ্লবীরা

কি ব্রোকার যে শেয়ার মার্কেটের তেজি-মন্দা বুঝে বিপ্লব করবে বা চাপবে? কাগুজে বাঘের ভয়ে…

বিনয়ভূষণ বললেন: তোরা মাও-সে-তুঙের নামে দেয়াল লিখেছিস— বর্তমান সমাজব্যবস্থায় যে-যত পড়ে সে-তত মূর্খ। হায়রে হায়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গোটা জীবন ধরে পড়তে হয়, বুঝতে হয়। তোরা তাকে প্রেরিত পুরুষের কয়েকটা কোটেশানে বেঁধে ফেলেছিস। তাই এখন এ-দেশে পথেঘাটে মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট।

খাপ খোলা ছুরির মতো বিজু হেসে উঠে বলল: অব্রাহ্মণের যেমন বেদ পড়ার অধিকার নেই, এদেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ চর্চার বার্থ রাইটও তো তেমনি শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদের।

: সেটা আমাদের অ্যান্দোলনের ব্যর্থতা। মার্কসিজমের মেডইজি ছাপিয়ে তা এড়ানো যাবে না। তোদের বুঝতে হবে গুটিকয়েক লোকের মনে রেভোলিউশন করার ইচ্ছে দানা বাঁধলেই বিপ্লব হয় না। সেটা করে জনসাধারণ। তাদের নেতৃত্ব দেয় বিপ্লবী শ্রেণী। তাকে নেতৃত্ব দেয় বিপ্লবী পার্টি। আর, সময় হলে যথার্থ বিপ্লবী মুহূর্তটিকেও ঠিক মতো চিনে নিতে হয়। তাই অজ্ঞাতবাস থেকে লেনিন বলে পাঠান সিকসথ উইল বি টু আরলি য়্যাণ্ড এইটথ উইল বি টু লেট। ফলে, সাতই নভেম্বর শুরু হয়ে যায় রুশ বিপ্লব। বিজু, নেতৃত্ব যদি ভুল করে— তার মূল্য দিতে হয় গোটা পার্টিকে, দেশকে, জনসাধারণকে। উনপঞ্চাশ সালে আমরাও ভুল করেছিলাম। তাই তো আজ ভুল করতে এত ভয়।

বিজু হেসে বলল: রাইট পার্টির মেম্বার হলে এখানে ইন্দোনেশিয়ার উদাহরণ দিতে পারতে। বাবা, ইলেকশান ছাড়া তোমরা কিচ্ছু বোঝো না। কোনোদিন বোঝো নি।

: তোর অভিযোগ যদি সত্যিও হয় তবু আমি বলব পার্টির মধ্যে থেকে পার্টি নর্মস মেনে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ছাড়া একজন কমিউনিস্টের আর কোনো রাস্তা নেই।

: কমরেড বাবা, চৌষট্টি সালে তোমরা তবে আলাদা পার্টি করলে কেন?

চমকে উঠে বিনয়ভূষণ পারুলের দিকে তাকালেন। পারুলও চকিতে তাঁর দিকে তাকিয়েছে। ওর চোখে ইদ্রিসের মুখ। ইদ্রিস বলছে: তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আমি তোকে ধরিয়ে দিয়েছি এমন কথা উচ্চারণ করতে পারলি? বিনয়ভূষণ বলছেন: তোর নেতারা লিস্ট সাপ্লাই না করলে

পুলিশ চীনকে যারা য়্যাগ্রেসর মনে করে না, যারা ন্যাশানাল কাউন্সিল-বিরোধী, তাদের নাম জানল কি করে ? ভারতরক্ষা আইনে ধরে ধরে শুধু তাদেরই জেলে পুরল কেন ? ইদ্রিস বলছে : অন্তত তোর জানা উচিত বাড়ি বসে চিন্তা করলে তা-ও গোপন থাকে না। সব জেনেও তোরা ক্যাডার খ্যাপাবার জন্য নেতাদের বলছিস স্পাই। এ-পাপের কোনো তুলনা আছে ? পারস্পরিক সন্দেহটা আরো বাড়াবার জন্য, রাজনৈতিক মতান্তরকে পার্টিভাঙার পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কংগ্রেস যে-ফাঁদ পেতেছে তোরা স্বেচ্ছায় তাতে পা দিলি। ভেবে ছাখ বিনু—কার লাভ এতে, কার লাভ ! বিনয়ভূষণ বলছেন : তোরা দালাল হয়ে গেছিস। গা বাঁচাবার জন্য চীনের কুৎসা নেহেরুর পা চাটা... কিছুই বাকি রাখলি না। ইদ্রিস গর্জে উঠেছে : গা বাঁচাবার জন্য ? ইংরেজের সৈন্যকে একখানা পা দিয়েছি, কংগ্রেসের পুলিশকে একখানা হাত দিয়েছি... আমার দেশের স্বাধীনতার জন্য, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য। বিনয়ভূষণ একটু থেমে কিছু বা স্নেহের সঙ্গে বলেছিলেন : তাই তো মনে করি তোর জায়গা ওখানে নয়, আমাদের পাশে। ইদ্রিস বলেছিল : একজন কমিউনিস্টের জায়গা কমিউনিস্ট পার্টিতে। বিনয়ভূষণ গর্জে উঠে বলেছিলেন : ঠিক তাই এবং একজন কমিউনিস্টের বন্ধু একজন দালাল হতে পারে না। তোকে অপমান করতে চাই না; চলে যা, আর কোনোদিন আসিস না। পলকের জন্য মুখ ফিরিয়ে ইদ্রিস রুদ্ধস্বরে বলেছিল : পারুল ! চোখের কোণে জল নিয়ে পারুল পাথরের মূর্তির মতো বসেছিল, কোনো উত্তর দেয় নি। ইদ্রিস উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল : মন্ত্রী হওয়ার লোভে লীগ আর কংগ্রেসের নেতারা দেশ ভাগ করেছিল। এই উপমহাদেশকে একদিন অনেক মূল্যে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বিনু, সারা ভারতে তোরা মাইনরিটি। তাই অল ইণ্ডিয়া লীডার হওয়ার জন্য তোর নেতারা পার্টি ভাঙছে। কিন্তু তাদের আমি চিনি। একদিন প্রমাণ হবে বিপ্লবের নামে ছেলে খ্যাপালেও প্রকৃত শোধনবাদী হচ্ছিস তোরা। নির্বাচন ছাড়া কিছুই বুঝিস না। বিনয়ভূষণ জানলা দিয়ে দেখেছিলেন ক্রাচে ভর দিয়ে ইদ্রিস টলতে টলতে চলেছে। একটা দুটো ক্রমে অনেকগুলো বাচ্চা ছেলে ভীড় করে তার পেছনে হাঁটছে আর হাতে তালি দিয়ে সুর করে বলছে : সংশোধনবাদ দূর হটো, ডেঙ্গু ডেঙ্গু। সেই ভীড়ে অজয় বিজয় পরেশ টোনা... সকলেই ছিল।

বিনয়ভূষণ পারুলের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বললেন : আলাদা পার্টি তো করি নি, সংশোধনবাদীদের বহিষ্কার করেছি। লেনিন যেমন মেনশেভিকদের

দল থেকে বার করে দিয়েছিলেন। পরে বলশেভিক পার্টির মধ্যেও বহু ব্যাপারে মতবিরোধ ঘটেছে, কিন্তু দল ভাঙে নি। যারা বেরিয়ে গেছে, বহিষ্কৃত হয়েছে—ইতিহাসের ডাস্টবিনেও তাদের ঠাঁই মেলে নি।

বিজু হেসে বলল : চৌষট্টি সালে রাইট পার্টি তোমাদের ঠিক এই কথাই বলেছিল।

: বলেছিল। কিন্তু ইতিহাসই তাদের ভুল প্রমাণ করেছে। মাত্র ছ বছরে পার্টির শক্তি, ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য আমাদের রাজনীতির নির্ভুলতা প্রমাণ করেছে।

: তোমাদের হাতে পুলিশ দপ্তর, তাই পার্টি বাড়ছে। এই শক্তিকে কি তুমি বিপ্লবের শক্তি মনে করো? এই পার্টিকে বলো লেনিনের পার্টি?

: নিশ্চয়ই। নইলে বেঁচে আছি কেন?

বিজয় উঠে দাঁড়াল। কি অসম্ভব বয়স্ক দেখাচ্ছে ওকে, কি পরিণত কণ্ঠস্বর। পারুলকে বলল : কমরেড মা, তুমি আমায় তাড়িয়ে দিও না। আমি নিজেই চলে যাব।

চোখের কোণে জল নিয়ে পারুল পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল। বিজু বলল : বাবা, তুমি খাঁটি লোক। তোমার মতো মানুষ রাইট পার্টিতেও আছে। শুনেছি পরাধীন দেশে কংগ্রেসেও এমন কিছু খাঁটি মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় নি। একটা কথা তোমায় বলি। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি কোনোদিন ছিল না। তাকে গড়তে হবে। একেবারে গোড়া থেকে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আর চেয়ারম্যান মাওয়ের চিন্তার আলো আমাদের পথ দেখাবে। চেয়ারম্যান বলেছেন সত্তরের দশক মুক্তির দশক। এ-দেশকে মুক্ত করার দায়িত্ব ইতিহাস আমাদেরই দিয়েছে।

তারপর দুজনে চুপ করে বসে রইলেন। পোড়া ডালের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠল। বিনয়ভূষণ গিয়ে কড়াইটা নামিয়ে রেখে এলেন।

আর, বৃষ্টি নামল। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে পারুল বলল : বিজুকে তুমি মিথ্যে কথা বললে?

বিনয়ভূষণ চমকে উঠে প্রশ্ন করলেন : কি মিথ্যে?

: তুমি না বলেছিলে সবাই আমাদের মেনে নিচ্ছে, কিন্তু ভয়ে বা সুবিধের আশায়। গলায় লাল রোমাল বাঁধা ছেলেদের দেখলে প্রত্যেকে সাবধান হয়ে যায়। ট্রামে বাসে ট্রেনে মানুষের কথা কমে আসছে—অপরিচিতের সামনে

কেউ মুখ খোলে না। তুমি না বলেছিলে কমিউনিস্টদের মানুষ ভয় পাচ্ছে—এ কি রকম হল ? যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মাথায় ডাণ্ডা মেরে বলা হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রাম —কোন শ্রেণীর বিরুদ্ধে এটা কোন শ্রেণীর সংগ্রাম ?

: বলেছিলুম।

: তুমি না বলেছিলে স্কুলে ঢুকে ক্লাশ থেকে টেনে বার করে সমস্ত শিক্ষক এবং ছাত্রের সামনে তেরো বছরের ছেলের মুখে পাইপ গান ঢুকিয়ে ঠেলতে ঠেলতে দেয়াল পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। তুমি না বলেছিলে ভোর রাত্রিবে থানা থেকে আসছি দরজা খুলুন বলে ভেতরে ঢুকে বৌ আর শিশু কন্যার সামনে জোয়ান বাপকে খুন করা হয়েছে। তুমি না বলেছিলে রাজনৈতিক হত্যা আগেও হত, কিন্তু আজকাল মেথড অফ মার্ডারে যে নিত্য নতুন নৃশংসতা দেখা যাচ্ছে তা সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয় হতে পারে।

: বলেছিলুম।

: তুমি না বলেছিলে টালিগঞ্জে তোমাদের নেতা নকশালবাড়িদের লিস্ট করে পুলিশের গাড়ি চেপে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের য়্যারেস্ট করিয়েছে। তুমি না বলেছিলে তোমাদের পি.সি. সেক্রেটারি আনন্দবাজারের সাংবাদিককে হেসে বলেছেন পুলিশ বন্দুকে নিরোধ লাগিয়েছে তাই তাদের গুলিতে লোক মরে না। তুমি না বলেছিলে বিভিন্ন অঞ্চলে থানাগুলো ভাব করছে যেন পার্টিদপ্তর আর লোকাল কমরেডরা ভাবছে কত শক্তিমান তারা। তুমি না বলেছিলে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বৃটিশ-সৃষ্ট কংগ্রেস-পুষ্ট এই পুলিশ দপ্তরের সাফাই গান, তাঁর কণ্ঠে অনেক সময় ব্যুরোক্র্যাটের সুর শোনা যায়। তুমি না বলেছিলে এই ব্যুরোক্রাসি আর পুলিশ দপ্তরই তোমাদের পার্টিকে শেষ করে দেবে। বলেছ না ক্ষমতার গর্বে আর লোভে সকলে পাগল হয়ে গেছে।

: বলেছিলুম। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের আমলে গ্রামের কৃষক আর ক্ষেতমজুর যে স্বাধীনতার তেইশ বছর পর এই প্রথম পুলিশকে জোতদারের লাঠিয়ালের ভূমিকায় দেখছে না তা-ও সত্যি। কারখানার মালিক যে কথায় কথায় মজুর পেটাতে পুলিশের সাহায্য পাচ্ছে না তা-ই বা কে অস্বীকার করবে ? আমার সমালোচনাটা অন্য। পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্যে পার্টি বাড়ানো মানেই গোদের অসুখ। ফোলে অনেকখানি, ভেতরে পচা জল।

: তাহলে আজ বিজুকে বললে কেন এই শক্তি বিপ্লবের শক্তি, তোমাদের পার্টিই লেনিনের পার্টি।

: পারুল, রাগ করে খালি তোমাদের তোমাদের বলছ কেন? পার্টি তোমারও। তুমি আমার কমরেড। পার্টির সমালোচনা বা আত্মসমালোচনা তোমার কাছে করতে পারি। কিন্তু বিজু ভুল পথে গেছে। স্বীকার করতেই হবে সে আজ পার্টির শত্রু। তার কাছে আমি কার সমালোচনা করব?

: তাই বলে মিথ্যে বলবে?

: প্রয়োজন হলে বলব। তবে মিথ্যে তো বলি নি। নেতারাই সব নয়। আমরাও আছি, মানুষ আছে, ইতিহাস···। নইলে কোন ভরসায় বাঁচব?

পারুল বলল : পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। পার্টি ভাঙার পাপ। জেলে যে পাশে দাঁড়িয়ে পুলিশের বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিয়েছে—তার নামে মিথ্যে অপবাদ রটাবার পাপ। বন্ধুকে শত্রু করার পাপ। সবাই স্বদেশী করছ—কিন্তু কোথায় তোমাদের দেশ? কথাসর্বস্ব রাজনীতিতে আছে সবই, শুধু মানুষ হারিয়ে গেছে। নইলে গোটা ভারত পড়ে রইল—পাড়ার একটা দেয়াল দখল নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে খুনোখুনি হয়?

বিনয়ভূষণ শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ক্রাচে ভর দিয়ে একটা ছায়া টলতে টলতে হেঁটে যাচ্ছে। আর তাকে ধাওয়া করেছে এক পাল ছেলে—অজু, বিজু! অরিজিনাল সিন, আদি পাপ···

চমকে মুখ ঘোরালেন। কাঁধ থেকে আঁচল খসে গেছে। পারুলের কণ্ঠার দুটো হাড় কি প্রকট! বিনয়ভূষণ অবাক হয়ে ভাবলেন—কতদিন, কতদিন তিনি পারুলের দিকে ভালো করে তাকান নি। অথচ সংসার করেছেন, ভালোও বেসেছেন। সে কাকে? রক্তমাংসের পারুলকে, নাকি ভালোবাসি—এই বিমূর্ত আইডিয়াকে? আর দিনগুলো বছরগুলো কেটে গিয়ে কবে যেন দুজনেই বুড়ো হয়ে গেলেন। কিন্তু কমরেড বিনয়ভূষণ, সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতভাবে এই যে আত্মউৎসর্গ—কোনোদিন তার জমাখরচ মিলিয়ে দেখেছ? বলতে পারো এতবড় মূল্যের বিনিময়ে কতটুকু তোমার অর্জন? বলতে পারো—

: কমরেড? কমরেড দাদা?

: উঁ?

: হামিলোগ এসে গেছি কমরেড।

বিনয়ভূষণ ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন : লাল সেলাম কমরেড।

: লাল সালাম কমরেড দাদা। ছুটি করিয়ে দিয়ে হামিলোগ সকলে চলে এলম।

বিনয়ভূষণ দেখলেন কালিঝুলিমাখা শশী, তার সঙ্গে কালিঝুলিমাখা দশ-পনের জন শ্রমিক।

: কমরেড দাদা, খালের ওপার হামিলোগ সাফ করে দিব, অজুর খুনের বদলা নিব। যদি না নিলম তো হামার জন্ম খানকির পেটে।

বিনয়ভূষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে শশীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বাবড়ি চুল, প্রকাণ্ড গোঁপ, হাফ প্যাণ্টের নিচে লোমশ আর সমর্থ দুটো পা, দড়ির মতো মোটা পাকানো শিরা। হিন্দি-বাঙলা মেশানো এক নিজস্ব ভাষায় কথা বলে সে, উচ্চারণেও বৈশিষ্ট্য আছে।

: ইয়াদ রাখবেন কমরেড দাদা। মজদুর তৈয়ার আছে। শশী তার বিশ্বকর্মা হাত দুটো বিনয়ভূষণের দিকে বাড়িয়ে ধরল। একজোড়া টাঙির ফলা সূর্যের আলোয় ঝকমক করে উঠল।

ছেলেবেলায় শশী ডান বাহুতে উলকি দিয়ে রামসীতা লিখেছিল। বড় হয়ে সে লেখা আর মুছতে পারে না তাই লজ্জা! কয়েকরাত না ঘুমিয়ে এক উত্তেজিত মুহূর্তে পার্টি-অফিসে ঢুকে শশী বলল হাত কেটে ফেলবে। কারণ মার্কসবাদ যখন বলে দিয়েছে ঈশ্বর নেই তখন মিথ্যে এই অভিজ্ঞান বহন করার মতো পাপ কি আছে! বিনয়ভূষণ তাকে বুঝিয়েছিলেন রামসীতা ভগবান নয়, পৌরাণিক মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকা, তাদের ছবি হাতে থাকলে দোষ কি? কৃতজ্ঞতায় শশীর চোখে জল এসেছিল। তারপর এক ছুটির দিনে বিনয়ভূষণকে সে তাদের বস্তিতে নিয়ে যায়। শশী সেদিন সেজেছে। চকচকে পরিপাটি বাবড়ি। পাকানো গোঁপ। গায়ে হলুদ রঙে ছোপানো গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গির মতো ফেত্তা দেওয়া ধবধবে সাদা ধুতি। বর্ষা কাল তখন। বদ্ধ নালা দিয়ে গ্যাস উঠছে। আর অন্ধকার ঘুপচি ঘর, দেয়াল ভেঙে মাটি পড়ে। সেই ঘরে বেতের খাঁচায় ছোট্ট চন্দনা পাখি। শশী খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে তার ডাগর চোখে প্রেম আর স্নেহের ফল্গু ঝরিয়ে বলল: সোনিয়া, বোলো লেনিন বোলো স্টালিন। শশী লেনিন বলতে পারত না কিন্তু শশীর পাখি অভ্রান্ত উচ্চারণে ডেকে উঠল: লেনিন স্টালিন। শশীর চোখে বিনয়ভূষণ সেদিন স্রষ্টার অহংকার দেখেছিলেন, তৃপ্তি। শশী বলেছিল: আগে একটা মুনিয়া ছিল, ডাকত রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বলে। ও পাখিটো উড়ায়ে দিয়েছি। বলে হা হা করে হেসে উঠেছিল।

: কমরেড দাদা, কমরেড বৌদিকে হামিলোগের লাল সালাম জানাবেন। বলবেন শশী বলেছে অজুর খুনের বদলা না নিলে শশী খানকির ব্যাটা। না না,

উ কথাটি বলবেন না। বলবেন শশী বলেছে—কমরেড ভাবী, রোও মৎ। শশীরা বদলা নিবে।

শশীর সেই ডাগর চোখদুটোর দিকে বিনয়ভূষণ নির্বাক তাকিয়ে রইলেন।

: বদলা নেবো। অজয়ও বলেছিল। কবে যেন? কাল? নাকি পরশু? নাকি তারও আগে···

দুপুরে খেতে বসে অজয় ফেটে পড়ল : কৃষিবিপ্লব! রবীন্দ্রপল্লীর মানুষ আধপেটা খেয়ে স্কুলবাড়ি তুলেছিল। তোমার গুণধর পুত্র কিছু সমাজবিরোধীকে সঙ্গে নিয়ে তাতে আগুন দিল। লাইব্রেরি থেকে টেনে টেনে উঠোনে জড়ো করে সব বই একসঙ্গে জ্বালিয়ে দিল। বইয়ের গাদায় একটা লেনিনের জীবনী ছিল। এক ছোকরা সেটা পয়েণ্ট আউট করতে সেই আধপোড়া বই তুলে বিজু নাকি বলেছে : ও, মস্কো পাবলিকেশন! সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা মিথ্যে জীবনী লিখেছে। লেনিনের নতুন জীবনী লিখব আমরা। বলে বইটা ছুঁড়ে আগুনে দিয়েছে।

পারুল ভাতের থালা এগিয়ে দিয়ে বলল : তোদের তো খুশী হওয়া উচিত। রাশিয়ার বিরুদ্ধে বলেছে!

: মা, এখনও তুমি বিজুর দিকে টেনে কথা বলছ? একমাত্র ফ্যাসিস্টরাই বই পোড়ায়, মূর্তি ভাঙে। রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর—কাউকেই বাদ রাখল না। কালচারাল রেভলিউশন! কৃষিবিপ্লব! কলকাতা আর শহরতলীতে যত রাজ্যের খুনে ওয়াগনব্রেকার লুম্পেন একজোট হয়েছে। পার্টি থেকে বহিষ্কৃত কিছু আবর্জনা, জনকয়েক মস্তমস্ত চাকুরে, বড়লোকের গণ্ডা দুই আদুরে ছেলেমেয়ে এই আজব দলের নেতা। কংগ্রেস সি. পি. আই. আর পুলিশের একাংশ হোল গ্যাঙটাকে প্রটেক্ট করছে। পাড়ায় পাড়ায় টেরার, অরাজকতা। বহু জায়গায় আমাদের কমরেডরা ঘরবাড়ি বৌবাচ্চা ফেলে সেফ জোনে সরে গেছে। কত মা···

পারুল বাধা দিয়ে বলল : কি বলছিস বল না?

: বলছি পরিস্থিতিটা একটু বোঝো। চীফ মিনিস্টার আইনশৃংখলার অবনতির প্রতিবাদে কার্জন পার্কে নিজের অসভ্য বর্বর সরকারের বিরুদ্ধে অনশন শুরু করেছে। চমৎকার। এই অজুহাতে মন্ত্রিসভা ভেঙে দাও। তারপর নকশালরা নির্বাচন হতে না দিক। চলুক কেন্দ্রের শাসন।

: শালগ্রাম শিলার আবার ওঠাবসা!

: বাবা, আমি কিন্তু তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি। মা ক্রমেই পার্টিবিরোধী কথাবার্তা বলা শুরু করেছে। একে তো বিজু। তার ওপর মা। তুমি-আমি বিপদে পড়ব।

অত্যন্ত শান্ত গলায় পারুল বলল : কি বিপদ অজয়? তোর নেতৃত্ব চলে যাবে? আরও ওপরে উঠতে অসুবিধে হবে? ভয় কি? মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে বলিস—আমার মা মনে করে এই পার্টি আর কমিউনিস্ট পার্টি নেই। বলে—ক্ষমতার দম্ভে আত্মহারা হয়ে সাতষট্টি সালের কংগ্রেসের মতোই কেউ বুঝছি না। সামনের নির্বাচনে আমরা মুছে যাব। এবং তাতে ভালো হবে। অনেক দুঃখের মধ্যে আবার শুরু করলে একদিন আমরা মানুষকে ভালোবাসার দেশকে ভালোবাসার অধিকার অর্জন করব। বলিস আমার মা আমাদের পরাজয় চায়। তারপর আমাকে এক্সপেল করার প্রস্তাবটা তুই-ই আনিস। পার্টির গুড বুকে তো আছিসই, নাম তাহলে পাকা কালিতে লেখা হয়ে যাবে। আর একটা কাজ যদি পারিস তোর এম. এল. এ. হওয়া ঠেকায় কে? পারবি না বিজুকে খুন করতে? পারবি না বাছা?

: মা! অজয় আর্তনাদ করে উঠেছিল।

: পারুল! বিনয়ভূষণ আর্তনাদ করে উঠেছিলেন।

: না, এখনও পাগল হই নি। ভয় নেই তোমার। ভয় নেই অজয়। ননীদির জন্য সুকুকে যেমন বিপদে পড়তে হয়, আমার জন্য তোর সে-বিপদ হবে না। তার আগে গলায় দেবার মতো একগাছা দাড় আমার জুটবে।

আর ঠিক তখনই টিকটিকিটা শব্দ করে ডেকে উঠেছিল। বিনয়ভূষণ বলেছিলেন : পারুল, আমার জন্য তোমার ভয় করে না?

: না। এই বুড়ো বয়েসে ভয় একমাত্র নিজের জন্যই করে। তোমাদের অভাব কি? তোমার পার্টি আছে, অজুর যুববাহিনী আছে, বিজুর চেয়ারম্যান আছে। আমার? আমার কি আছে?

বিনয়ভূষণ মাথা হেঁট করলেন। এমন প্রশ্ন যে কোনোদিন উঠতে পারে, বিশেষত পারুল যে কখনো এ-প্রশ্ন করবে—তা বিনয়ভূষণের জানা ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন পারুল তাঁকে নিয়ে তার দুই ছেলে নিয়ে পার্টি নিয়ে কানায় কানায় ভরে আছে। এই সংসারকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য বিয়ের পর থেকে পারুল এতই ব্যস্ত ছিল যে নিজের বলে কিছু চাইবার অবসর সে কখন পেল—বিনয়ভূষণ কিছুতেই তা বুঝে উঠতে পারলেন না। তাছাড়া নিজের বলে কিছু কি

চাইবার আছে ? কি সেটা ? কেমন সেটা ? অত্যন্ত আনাড়ি আর কাঁচা গৃহস্থের মতো বিনয়ভূষণ পারুলের মুখের দিকে তাকিয়ে সেই রহস্যময় চাওয়ার স্বরূপটি খুঁজতে লাগলেন।

তারপর আরও আনাড়ি আরও কাঁচাভাবে বললেন : উনপঞ্চাশ সালে আমার খোঁজে এসে বাড়ি সার্চ করতে করতে শোবার ঘরে লেনিনের ছবি দেখে এক বুড়ো সাব ইনস্পেক্টার রসিকতা করেছিল। মনে পড়ে পারুল ?

: পড়ে বৈ কি !

: তুমি তোমার পায়ের চটি খুলে তাকে ছুঁড়ে মেরেছিলে। সেই অপরাধে জেলে যেতে হল। অজয় তখন পেটে। মনে পড়ে পারুল ?

: পড়ে বৈ কি !

: আমরা তো নিজেদের উৎসর্গ করেছিলাম—লেনিনের ঐ ছবির সম্মান রাখার জন্য। আমরা তো কিছু চাই নি।

পারুল উঠে গেল। তার শোবার ঘর থেকে লেনিনের সেই ছবি দু-হাতে খুলে এনে বলল : ভুলটা ঐখানে হয়েছে। ছবির সম্মান রাখার নামে জীবনের অসম্মান। আর তা হয়েছে বছরের পর বছর। আজ প্রায়শ্চিত্ত করি। এই দেখো—এই যে।

পারুল উঠোনে ছবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। শব্দ করে ভাঙা কাঁচ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। জানলার শিক দুহাতে আঁকড়ে ধরে পারুল বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

অভুক্ত থালা রেখে অজয় আর বিনয়ভূষণ উঠলেন। ফ্রেম শুদ্ধ ছবিটা তুলে নিয়ে অজয় বেরিয়ে গেল। বর্শার ফলার মতো এক টুকরো কাঁচ ফ্রেমের সঙ্গে লেগে থেকে লেনিনের হাসিমুখকে পাহারা দিচ্ছে যেন। বিনয়ভূষণ পারুলের কাঁধে হাত রেখে বললেন : পারুল, নিজেকে হত্যা কোরো না।

পারুল বিনয়ভূষণের বুকে মুখ রেখে হা হা করে কেঁদে উঠল। বিনয়ভূষণ পারুলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন : পারুল, আমায় ক্ষমা করো।

: না, আমি কাউকে ক্ষমা করব না। তোমাকে না, ইদ্রিসকে না, নিজেকেও না।

: পারুল, এত বড় মূল্য দিয়ে এত বড় পরাজয়কে স্বীকার কোরো না। এতে তোমার-আমার যে অপমান হয়।

: আমরা সব সময় নিজেদের অসম্মান করছি। আর অজু-বিজু তো মূর্তিমান অসম্মান।

বিনয়ভূষণ বললেন : পারুল, তুমি আজ কাঁদলে, কত বছর পরে। কিন্তু আমার চোখ দিয়ে জল বেরোয় না কেন ?

পারুল হাতের পিঠে চোখ মুছে হাসল। বলল : আর কেন ? পাথরের ঠাকুর কি কাঁদে ? ছাপা বই কি কাঁদে ? বাঁধানো ছবি কি কাঁদে ? গাছ কি কাঁদে ?

বিনয়ভূষণ বললেন : নিজেকে আমার ভয় করছে, এই প্রথম যেন পায়ের নিচে মাটি পাচ্ছি না। পারুল—আমাকে তুমি বকো, কিন্তু দোহাই ঠাট্টা কোরো না।

পারুল বিনয়ভূষণের হাত ধরে বলল : বুড়োমানুষের মতো কথা বোলো না। তুমি যা তাইই থেকো। আমার একটু যে অহঙ্কার আজও অবশিষ্ট আছে তা ভেঙে দিও না।

বিকেলে পার্টি-অফিসে বসে বিনয়ভূষণ বিস্তারিত খবর পেলেন। কার্জন পার্কে প্রকাণ্ড তাঁবু খাটিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অনশন ধর্মঘট শুরু হয়েছে। মনুমেণ্টের নিচে জেলা কমিটির র‍্যালি ছিল। সেখানে এই অবাস্তব আন্দোলনের তীব্র নিন্দা করে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। নির্দেশ ছিল মিটিং ভাঙলে কার্জন পার্কের দিকে যেন কেউ না যায়। কতগুলো ছেলে মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে কলার খোসা চায়ের ভাঁড় ছুঁড়ে মেরেছে। মুহূর্তে রটে গেছে তাঁদের পার্টি অনশনরত বৃদ্ধ মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেছিল, জনগণ ঠেকিয়েছে।

: এজেন্ট প্রোভোকেটার, বুঝলেন না ?

দেয়ালে টিকটিকিটা ডেকে উঠল। বিনয়ভূষণ চিন্তিতভাবে বললেন : হুঁ।

: যুক্তফ্রণ্ট আর নেই, এবার সাইনবোর্ডটাও উঠে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিসভা গড়ার সুযোগ চাইব। রাজ্যপাল আমাদের বন্ধু। আশা করি সে-সুযোগ পেতে অসুবিধে হবে না। তারপর…

বিনয়ভূষণ হাসলেন : রাজ্যপাল আমাদের বন্ধু ?

: বুঝলেন না ? লোকটার কিছু কিছু ভ্যানিটি আছে। পারলে তার সুযোগ নেওয়া উচিত নয় ?

: নিশ্চয়ই। কিন্তু দেখো, মন্ত্রিসভা গড়ার সুযোগ আমরা পাচ্ছি না।

: সে ক্ষেত্রে আমরা ইমিজিয়েট ইলেকশান চাইব। রাষ্ট্রপতির শাসন চলবে না। চলতে দেওয়া হবে না।

: বটেই তো। ভেতরে ভেতরে নির্বাচনের প্রস্তুতি তো অনেক আগেই শুরু হয়েছে। এবার সেটা প্রকাশ্যে করা যাবে।

: ঠিক তাই। এবার আমাদের অন্তত তুশোটা সীট চাই। বাকি আশিটা আর সকলে নিক। মিডটার্ম ইলেকশনে আমরা এই কনসটিটুয়েনসিতে মাত্র আড়াই হাজার ভোটে হেরেছি। যুক্তফ্রণ্টের আমলে এবং কংগ্রেসের স্প্লিটের পর বিধানপুর থেকে চিত্তরঞ্জন কলোনি পর্যন্ত পুরো আমাদের কবজায় এসে গেছে। কিন্তু মুশকিল হয়ে গেছে খালের ওপারটা নিয়ে। আমাদের এত বড় ট্র্যাডিশ্যনাল বেস পুরো নকশালরা দখল করে আছে। আর, বিজু ওদের সঙ্গে থাকায় ওরা বাড়ি বাড়ি আশ্রয় পাচ্ছে।

: জানি।

: আজ-কালের মধ্যে ওপারটা দখল করতে না পারলে এ-যাত্রা আর হল না। রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হওয়া মাত্র কাঠের পোলের তুধারে সি.আর.পি. বসে যাবে। কেন্দ্রের পুলিশই তখন ওদের তুর্গ পাহারা দেবে। রাইট পার্টি-কংগ্রেস মোর্চা হলে ওদিককার ভোটেই তারা এ-সীট জিতে নেবে। আর, যদি বোঝে জেতার সম্ভাবনা নেই—তাহলে ওরা নকশালদের দিয়ে এই কনসটিটুয়েনসির ইলেকশান ভণ্ডুল করিয়ে দেবে। পশ্চিমবঙ্গে দশ-বারোটা কেন্দ্রে নির্বাচন নষ্ট হলে গোটা ইলেকশানটাই বাতিল হয়ে যেতে পারে। মানে, রাষ্ট্রপতির শাসন।

: জানি। কি সাজেস্ট করছ ?

: দখল।

: অনেক লাশ পড়বে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে…

: হাওড়ায় ওরা চলন্ত বাসে উঠে আমাদের বুড়ো নৃপেনদাকে মেরেছে। গোটা পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই আমাদের জনা পঞ্চাশ বাছা বাছা ক্যাডার খতম হয়েছে।

লিস্ট দেখেছেন বিনয়ভূষণ। সাতচল্লিশ জন! ষাট না পেরুনো পর্যন্ত ঐ জনা পঞ্চাশই বলা হবে। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: ঠিক আছে। আমি সামনে থাকব।

: আপনি ?

: হ্যাঁ। আমার কিছু হলে সেই ইস্যুতেই গোটা অঞ্চল মুক্ত হয়ে যাবে।

বিজুরা বুঝুক পার্টি বেস তাদের বাবারাই গড়ে তুলেছিল—গোটা জীবন ধরে, একটু একটু করে।

পরের দিন সেই অবিশ্বাস্য মিছিল বেরোল। পায়ে পায়ে মিছিলটা ক্রমেই বড় হচ্ছে। গলায় স্লোগান। হাতে হাতে লাল পতাকা, পতাকার দণ্ডগুলি লাঠি অথবা লোহার পাত হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া টাঙি বল্লম তলোয়ারও আছে।

ক্ষুধার্ত বাঘের মতো দীর্ঘ পথ পেরিয়ে মিছিলটা কাঠপোলের এপারে এসে থমকে দাঁড়াল। প্রত্যেকের চোখ সরু হয়ে গেছে, নাক বিপদের গন্ধ শুঁকছে। পোলের মুখে দুধারের পানবিড়ি চায়ের দোকানে ঝাঁপ ফেলা। ক-পা এগিয়ে রাস্তাটা ডানে বাঁয়ে মোড় নিয়েছে। দুদিকেই বসতি। কোথা থেকে যে বন্দুকের গুলি ছুটে আসবে অথবা গ্রেনেড কেউ জানে না। অনেক দূরে আকাশ-ছোঁয়া বাঁশের ডগায় একটি মস্ত বড় লাল পতাকা পাখির মতো উড়ছে।

বিনয়ভূষণ স্থির করলেন বাঁ দিকেই যাবেন। আর চাপা গলায় টিকটিকি ডেকে উঠল। বিরক্ত বিনয়ভূষণ ভাবলেন—না, ডান দিকে। আশ্চর্য যে ওদিকেও একটা লাল পতাকা পতপত উড়ছে। বাঁ দিকের রাস্তা ধরে বিনয়ভূষণ ধীর পায়ে হাঁটছে শুরু করলেন। বুকের ওপর দুটো হাত আড়াআড়ি ফেলা। নিয়তি তাড়িতের মতো ঐ প্রথম দেখা লাল পতাকার দিকেই তিনি এগোচ্ছেন। বছর পাঁচ-ছয়ের দুটি ছেলে একটা বাড়ির রোয়াক থেকে চকিতে অদৃশ্য হল। কতগুলো কুকুর কোথা থেকে দৌড়ে এসে মিছিলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। দুটো পা সামনের দিকে বাড়ানো, পেশি ফুলে উঠেছে ; গলা উঁচিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তারপর সামনের পা দুটোর নখ দিয়ে কুকুরগুলো পিচের রাস্তা আঁচড়াতে লাগল। গলায় চাপা শব্দ।

বিনয়ভূষণ হাঁটতে লাগলেন। যেন অনেক দূরের শঙ্খধ্বনির মতো সমবেত স্লোগান উচ্চারিত হল : আমাদের মন্ত্র জনগণতন্ত্র। সামনে দিন জোর লড়াই জোট বাঁধো তৈরি হও। এ লড়াই বাঁচার লড়াই এ লড়াই জিততে হবে। তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম।

দুপাশের প্রতিটি বাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ। বিনয়ভূষণ প্রতিটি বাড়ি চেনেন, বাসিন্দাদের নাম জানেন। বড় জলতেষ্টা পাচ্ছে। কিন্তু কার কাছে চাইবেন ?

আস্তে আস্তে পা দ্রুত হচ্ছে। আস্তে আস্তে মিছিল দ্রুত হচ্ছে। আস্তে

আস্তে স্লোগানটা গর্জন হয়ে উঠছে।

আর সূর্যাস্তের আকাশের মতো বিনয়ভূষণের মন—এলোমেলো রঙ, টুকরো টুকরো ছবি, দুটো-একটা তারা ফুটছে। গোটা অঞ্চলটা হাতে হাতে গড়ে উঠল। রাস্তা, স্কুল, লাইব্রেরি তৈরি করেছি—যেন নিজের সংসার। আজ সেখানে হাঁটতে ভয় করে, তেষ্টা পেলে জল চাইবার লোক দেখি না। কমরেড বিনয়ভূষণ—এই রকম তো কথা ছিল না।

টিক টিক টিক। সেই অমোঘ টিকটিকির ডাক। বিনয়ভূষণ নিজের অজ্ঞাতে থমকে দাঁড়ালেন। মিছিলটা থমকে দাঁড়াল। দেখলেন কিছু লোক মাঝামাঝি জায়গা থেকে মিছিল ভেঙে বেরিয়ে পাশের বাড়ির বন্ধ দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বিনয়ভূষণ দৌড়ে গিয়ে দেখলেন পরেশ অজয় সেণ্টু টোনা।

: পরেশ দাঁড়াও। আমি ম্যানডেট দিচ্ছি, দাঁড়াও।

ঝকঝকে ছুরির বাঁট দাঁত দিয়ে চেপে পরেশ চৌকাঠের সামনে উবু হয়ে বসেছে, একটা লোহার সরু পাত চৌকাঠ আর দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে তার সমর্থ দুই হাতে চাপ দিচ্ছে। পাতের মাথায় লাল পতাকা, পাপোষের মতো মাটিতে পড়ে। সেণ্টু টোনার হাতে পাইপ গান। সেণ্টুর নল দরজার দিকে টোনার নল বাইরের দিকে উঁচনো, দক্ষ সৈনিক যেন পরেশকে তারা পাহারা দিচ্ছে। অজয় পরেশের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলের দিকে তাকিয়ে বিনয়ভূষণ ভাবলেন তাহলে কি অজয় এখনো বোমা-পিস্তলটা রপ্ত করতে পারে নি ?

আর, মড় মড় শব্দে দরজা ভেঙে পড়ল। পরেশ স্প্রিঙের মতো লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই বিনয়ভূষণ খপ্ করে তার কলার চেপে ধরে বললেন : কি হয়েছে, কি ব্যাপার ?

পরেশ কোনোরকমে আত্মসংবরণ করে বলল : এ্যাটাক করেছিল, ঢিল মেরেছে এ-বাড়ি থেকে।

: আমি দেখছি। আমার ম্যানডেট—কেউ বাড়ির ভেতর ঢুকবে না।

এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পরেশ অপরিসীম ঘৃণার সঙ্গে বলল : ওসব ম্যানডেট পার্টি-আপিসে গিয়ে মারাবেন। আমরা য়্যাকশন স্কোয়াড্। আমাদের ওপর মাস্তানি করতে আসবেন না।

ছুরি আর পাইপগান নিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকে গেল। দরজার সামনে অজয় বিনয়ভূষণ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

অজয় বলল : বাবা, আমাদেরও ভেতরে যাওয়া উচিত।

বিনয়ভূষণ বুঝতে পারলেন না অজয় পরেশদের সন্তুষ্ট করার জন্য ভেতরে যেতে চাইছে, নাকি বিনয়ভূষণকে তাঁর কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। বিনয়ভূষণ যেন চমকে জেগে উঠে বললেন : হুঁ, চল। আর টিকটিকিটা অমোঘ ডেকে উঠল।

দরজার একটা পাল্লা ভেঙে পড়ে আছে। হলুদ চকে কোনো বাচ্চা লিখে রেখেছে—আমাদের বাড়ি। ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বিনয়ভূষণের মনে পড়ল এটা নকুল সমাজপতির বাসা।

ভেতরে দু-তিনটে শিশুকণ্ঠ প্রায় কোরাসের মতো একসঙ্গে চীৎকার করে কেঁদে উঠল। তীব্র আতঙ্কে ভরা এক বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর : চুপ যা, চুপ যা। ভারী আর ক্ষিপ্র কয়েকটা পদশব্দ। বিনয়ভূষণ বুঝলেন পিস্তল হাতে পরেশ সৈন্যের তৎপরতায় ঘরগুলো প্রথমে উঁকি মেরে দেখছে।

বাইরের ঘরে কেউ ছিল না। ঘর পেরিয়ে সরু বারান্দা। পরপর তিনটে ঘর। বারান্দার পর এক ফালি উঠোন, উঠোনটা উঁচু পাঁচিলে গিয়ে মিশেছে।

বিনয়ভূষণ দেখলেন প্রথম ঘরটার দরজায় দাঁড়িয়ে সেন্টু পাহারা দিচ্ছে, ভেতরে পাইপ গানের নল আধাআধি ঢোকানো। কাৎ হয়ে ঘরে ঢুকে বিনয়ভূষণ থমকে দাঁড়ালেন। একটা চৌকির নিচে দু-তিনটি বাচ্চা গুঁড়ি মেরে বসে আছে। তাদের ভয়ার্ত চোখে জল, কিন্তু গলায় কান্নার শব্দ নেই। একটি কচি হাতে একখানা ডাগর পুতুল। পুতুলটা ছেলে না মেয়ে বোঝা যায় না, কচি হাতটা ছেলের না মেয়ের বোঝা যায় না। চৌকির ওপর একটি সধবা বৃদ্ধা আর-একটি মেয়েকে প্রায় ডানা দিয়ে ঢেকে বসে আছেন। তাঁরও চোখে অপরিসীম আতঙ্ক।

ঘরের এই কেন্দ্র থেকে বাইরে দাঁড়ানো সেন্টুকে মনে হচ্ছিল যেন পাথরে গড়া কোনো সৈন্য। তার হাতের নলটা যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যু বর্ষণ করতে পারে। বিনয়ভূষণের চকিতে সিনেমায় দেখা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কথা মনে পড়ল। আর বাইরে থেকে ভেসে এল সমবেত গর্জন : তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম। মুক্তি যুদ্ধের অপর নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম।

বিনয়ভূষণ প্রশ্ন করলেন : নকুল কোথায়? নকুলের স্ত্রী সাবিত্রী?

বৃদ্ধা কাঁপতে কাঁপতে উঠে বিনয়ভূষণের থেকে যথাসম্ভব দূরে দেয়াল ঘেঁষে

দাঁড়ালেন। মাথার ঘোমটা আরও খানিক টেনে দিলেন। কপালে সিঁথিতে গাঢ় সিঁদুর। ভয়ার্ত চোখে জোড় হাতে বললেন : জানি না আইজ্ঞা। আমরা কিছু জানি না। আমরা কারোরে চিনি না কর্তামশয়।

বৃদ্ধার আতঙ্ক বিনয়ভূষণকে চাবুক মারছিল। অপমানে অভিমানে ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে। একটু যে ভরসা দেবেন—সে-আত্মবিশ্বাসও খুঁজে পাচ্ছেন না। তবু বললেন : ভয় কি! খাটে গিয়ে বসুন। নকুল আর সাবিত্রীকে চেনেন না?

বৃদ্ধা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বিনয়ভূষণের পা দুটো চেপে ধরলেন। কেঁদে উঠে বললেন : চিনি না, আমরা কারোরে চিনি না আইজ্ঞা। তাঁর কথার সঙ্গে চৌকির তলাকার বাচ্চাদের কান্না মাখামাখি হয়ে গেল।

: আহ্ সেজো দিদু, কি হচ্ছে? খাটে শোয়া মেয়েটি বলল : নকুলবাবুরা আজ মাস ছয়েক এ-বাড়ি থেকে উঠে গেছেন।

: তাই নাকি? কোথায় গেছে?

: দমদমের দিকে।

: আপনারা এখানে কদ্দিন আছেন মা?

: ঐ মাস ছয়েক। বাড়ি বদলের সময় সেজো দিদু এখানে ছিলেন-না। নকুলবাবুদের উনি দেখেন নি।

কথা বলতে বলতে মেয়েটি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছিল। যেন কোনো প্রচণ্ড যন্ত্রণা চাপছে। অথচ কি সফিসটিকেটেড উচ্চারণ। বিনয়ভূষণ অবাক হয়ে ভাবলেন মেয়েটি কি অসুস্থ?

পরেশ ঘরে ঢুকে সোজা মেয়েটিকে প্রশ্ন করল : পেছন দিকের পাঁচিল ডিঙিয়ে কে পালাল একটু আগে?

মেয়েটি বলল : পালাবার মতো বাড়িতে কেউ ছিল না। তাছাড়া পাঁচিলের ওপাশে খাল। কি ভাবে পালাবে?

পরেশ হাতের রিভলবারটা নাচাতে নাচাতে বলল : তাও তো বটে! কেউ যখন ছিলই না তখন পালাবে কে? আর পাঁচিলের ওপাশেই যখন খাল তখন পালাবেই বা কিভাবে?

বিনয়ভূষণ পরেশকে অবাক হয়ে দেখছিলেন। কী আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কথা বলছে সে। চোখেমুখে কোনো উত্তেজনা নেই। কণ্ঠস্বরে একটু বা ব্যঙ্গ।

পরেশ বলল : আপনার নাম কি?

: মৃদুলা।

ঃ কি বললেন ? অনিমা

শান্ত দৃঢ় স্বরে মেয়েটি উত্তর দিল ঃ না, মৃদুলা।

ঃ ও, অণিমা নয়, মৃদুলা। একটু উঠুন তো আপনি—পরেশ কেটে কেটে বলল ঃ মৃদুলাদেবী !

বৃদ্ধা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বললেন ঃ না না। অর ব্যথা উঠসে, ভরা পোয়াতি। অরে উঠতে কইয়েন না। আমরা কিছু জানি না, কারোরে চিনি না।

ঃ শাটাপ। পরেশ গর্জন করে উঠল ঃ কই, চলুন। উঠোনটায় একবার যেতে হচ্ছে আপনাকে।

অভিজ্ঞ বিনয়ভূষণ বুঝলেন পরেশ কিছু জানে। তিনিও যেন মেয়েটিকে চিনতে পারছেন। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পরেশ বলল ঃ আমরা দরজার বাইরে অপেক্ষা করছি। আপনি গোছগাছ করে আসুন। অজু, তুই আমার পাশে পাশে থাকিস তো !

বিনয়ভূষণ প্রায় চমৎকৃত হয়ে পরেশের দিকে তাকালেন। তারপর দ্রুত বাইরে চলে এলেন।

ভেতর থেকে মৃদুলার শান্ত গলা শোনা গেল ঃ সেজো দিদু, ওদের নিয়ে তুমি ভেতরে থেকো। বেরিয়ো না, বুঝলে ?

উত্তরে একটা চাপা ফোঁপানি শোনা যায়। মন্থর পায়ে মেয়েটি বেরিয়ে এল। হ্যাঁ, গর্ভবতী। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে পা টেনে পা টেনে হাঁটছে।

পরেশ বলল ঃ দাঁড়ান। এই রিভলবারটা একটু ধরুন তো ?

ঃ আমি ? মেয়েটি অবাক হয়ে বলল ঃ রিভলবার ধরব ? কেন ?

ঃ ভয় করবে নাকি অণিমাদেবী ?

ঃ অণিমা নয়, মৃদুলা।

ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। অণিমা নয়, মৃদুলা। উঁ, টোনা ? মৃদুলা। একটু ধরুন না রিভলবারটা।

মেয়েটি স্থির দৃষ্টিতে পরেশের দিকে চেয়ে ঝট করে বাঁ হাতটা এগিয়ে দিল।

ঃ না না, বাঁ হাতে নিলে অপমান করা হয়। ডান হাত।

মেয়েটি দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে পরেশের দিকে চেয়ে আঁচলের তলা থেকে তার ডান হাতটা আস্তে বাড়িয়ে দিল। পরেশ বলল ঃ একি ! ব্যাণ্ডেজ, পোড়া দাগ …চুক চুক চুক…কি হয়েছিল আপনার অণিমাদেবী ?

: অণিমা নয়, মৃদুলা। মেয়েটি হাত প্রসারিত রেখেই বলল : ট্রেন য়্যাকসিডেণ্ট।

: আহাহা। আপনার স্বামী?

: তিনি ঐ য়্যাকসিডেণ্টেই—

: আহাহা! আসুন আপনি। ঐ উঠোনটায়, হুঁ, ঐ দেয়ালটার সামনে, হুঁ, দাঁড়ান—সোজা হয়ে।

বিনয়ভূষণ দেখলেন পরেশ তার পিস্তল তুলেছে। সেণ্টু আর টোনা একজন দেয়ালের দিকে একজন বাইরের ঘরের দিকে পাইপ গান উদ্যত করে পজিশন নিয়েছে।

পরেশ চোয়াল শক্ত আর চোখ সরু করে বলল : বিজু কোথায়?

: কে বিজু?

: বাস্টার্ড। বিজুকে চেনো না? ঐ যে ভদ্রলোক—ওঁয়ার ছেলে, এই যে অজয়—ওর ভাই। বিজয়। কোথায় সে?

ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েটি একবার বিনয়ভূষণের দিকে তাকাল। আস্তে আস্তে তার মাথা নিচু হল। অস্ফুটে বলল : জানি না।

: আমি জানি সে এই বাড়িতে আছে, মানে ছিল; সে নণ্টে সুরেন—তিনজন। আমি জানি তুমি অণিমা দত্ত, স্যাটা, বোমা তৈরি করতে গিয়ে য়্যাকসিডেণ্টে পড়েছ। পলাশপুর অপারেশনে বাঁ হাতে গুলি চালিয়ে আমাদের তিনজন কমরেডকে খতম করেছ। খানকি, তোর পেটে যে ছেলে—তার বাবা কে?

: আমার স্বামী ট্রেন য়্যাকসিডেণ্টে গত হয়েছেন।

: টোনা, সেণ্টু...রেডি।

বিদ্যুৎগতিতে টোনা আর সেণ্টু বারান্দায় বিনয়ভূষণের দুই পাশে গিয়ে দাঁড়াল—একজনের মুখ বাইরের দরজার দিকে, একজনের মেয়েটির দিকে। অজয় পরেশের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়েছিল। পরেশ বাঁ হাতে রিভলবার ধরে ডান হাতটা ট্রাউজারের পকেটে ভরে বলল : মৃদুলাদেবী, আমি ওয়ান টু থ্রি বলব। তার-পরেই...বুঝতে পারছেন?

মেয়েটি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। বিনয়ভূষণ দেখলেন মেয়েটির গর্ভের অন্ধকারে জন্মের পদধ্বনি, মেয়েটির চোখের আলোয় মৃত্যুর পদসঞ্চার।

: ওয়ান

: টু

কে হঠাৎ চীৎকার করে উঠল : নকশালবাড়ি লাল সেলাম

বিনয়ভূষণ চোখের পলক ফেলার আগেই ব্যাপারটা ঘটে গেল। তাঁর মনে হল বিজুর গলা ; তিনি দেখলেন পরেশ যেন জানত, তৈরিই ছিল—স্প্রিঙের মতো লাফিয়ে সরে গেল ; আর বোমার শব্দ—অজয় পড়ে গেছে। পরেশ মেয়েটির পাশে।

টোনা সেণ্টু বিজুকে ধরে আনল। পরেশ তার ছুরিটা বিজুর পেটে আমূল বসিয়ে দিল। দেয়ালের গায়ে সাঁটা স্থির সেই রমণীমূর্তির পায়ের কাছে বিজু পড়ে রইল, একটু দূরে অজু।

টিক টিক টিক। অন্যমনস্ক বিনয়ভূষণ টিকটিকির ডাকটা যেন শুনেও শুনলেন না। টিক টিক টিক। এবার একটু জোরে। ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসলেন। লক্ষ্য করলেন ভীড়ে ঢেউ উঠেছে। একটা দিক ফাঁক হয়ে গেল। নীহার। পরনে নিজের হাতে কাচা নিজের হাতে ইস্তিরি করা ধবধবে ধুতি আর পাঞ্জাবি, তেলের ছোঁয়া না লাগা পরিপাটি আঁচড়ানো এক মাথা চুল, বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ। নীহার সোজা এসে বিনয়ভূষণের সামনে দাঁড়াল, কাঁধে হাত রাখল, বলল : বিনয়দা।

বিনয়ভূষণ চমকে উঠে দাঁড়ালেন। কত, কত বছর পরে নীহার নাম ধরে দাদা বলে ডাকল !

চিরঞ্জীব বলল : তাহলে আমরা শুরু করি ? আর দেরি করলে…

নীহারকে এগোতে দেখেই পরেশ চাপা স্বরে গর্জে উঠল : 'টেনশন। গোড়ালির সঙ্গে গোড়ালি ঠুকে রাস্তার বুকে সম্মিলিত পদাঘাত করে ছেলেরা য়্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল। পরেশ তার সাদা দস্তানা পরা ডান হাতে পতাকার দণ্ডটা শক্ত মুঠোয় ধরে আছে। পতাকা অর্ধনমিত।

নীহার য়্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল। আকাশে বজ্রমুঠি তুলে লাল সেলাম জানাল যুববাহিনীকে। তারপর একটা টুলে পা দিয়ে ট্রাকে উঠে বিনয়ভূষণের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

ট্রাকে উঠেই বিনয়ভূষণ ব্যাকুলভাবে অজয়ের মুখের দিকে তাকালেন। ফুলে ফুলে মুখ ঢাকা। গোলাপ আর অগরুর ভারী গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। হে ঈশ্বর আমাকে এমন মৃত্যু দিও…পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে…বাবা আমাদের বোধহয় ভেতরে যাওয়া উচিত…টিকটিকটিক…একটা চোখ কাকে নিয়ে

গেছে…বাড়ির বারান্দায় অজয়ের শবদেহ…চাপ চাপ রক্ত…পুলিশের গুলিতে অজু-বিজু শহীদ হল আমি দেখব না…অজু তুই আমার পাশে থাকিস…বিজুর নাভিদেশে ছুরি আমূল বসে গেল…বিজু মরতে মরতেও পরেশের ডান চেটোয় ছুরি বসিয়ে দিল দস্তানা পরা হাত…পতাকা অর্ধনমিত

চির বলল : বিনয়দা, তুমি আগে বলবে ?

: না, নীহার রয়েছে।

: তাহলে পরে বোলো।

: কি বলব ?

বিনয়ভূষণের কাঁধে হাত রেখে নীহার বলল : কিছু বোলো।

ফোটোগ্রাফার তার ক্যামেরার শাটার টিপল। ক্যামেরা দেখে যুববাহিনীর পাথরপ্রতিম ভলান্টিয়ারদের মধ্যেও একটা চাপা উসখুস ভাব।

নীহার বলল : তুমি কিছু বললে তার ইমপ্যাকটটা কত বেশি হয় বোঝো তো ? পারুল কোথায় ?

: বাড়িতে।

: হুঁ। কিছু বোলো তুমি।

কিছু বোলো বিনয়ভূষণ, কিছু তোমায় বলতেই হবে কমরেড। অভিভূতের মতো জমাটবাঁধা সেই ভীড়ের দিকে বিনয়ভূষণ তাকিয়ে রইলেন।

দীর্ঘ, বড় দীর্ঘকাল এই অঞ্চলে কাটল। রেল লাইনের পাশে মাইলের পর মাইল জলা ছিল, জঙ্গল। সাপ আর জোঁকের কামড় খেয়ে জমি হাসিল করতেই নস্করদের লাঠিয়াল এল, পুলিশ ! তবু পরপর কলোনি উঠল। এই মোড়ে গুলি চলেছিল—তিন দিন। সুখেন, যশোদার দিদি, বাগলা…আরও কতজন শহীদ হল। নস্করদের, কংগ্রেসের, পুলিশের বোমা-বন্দুক উপেক্ষা করে এই মোড় থেকে সেদিনও শোকমিছিল শুরু হয়েছিল। সে কবে ? কত যুগ আগে ?

: কমরেডস ! নীহার তার ভাষণ শুরু করল : বন্ধুগণ ! মনে আছে আপনাদের সেইসব দিনের কথা ? কংগ্রেসী গুণ্ডা আর সমাজবিরোধীরা পুলিশের সাহায্যে রেল লাইনের ওপারটাকে তাদের দুর্গ বানিয়েছিল। ওরা চেয়েছিল আপনাদের আরেকবার উদ্বাস্তু করতে। আপনারা কমরেড বিনয়ভূষণের নেতৃত্বে বছরের পর বছর দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়ে বারবার জীবন বিপন্ন করে কেউ জেল খেটে ঐ দুর্গে শ্রমিকশ্রেণীর পতাকা উড়িয়েছেন। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছেন। তারপর কংগ্রেস মুছে গেছে। ইতিহাস

এবং বিপ্লবী জনগণ গোটা পশ্চিমবঙ্গেই তাদের নিশ্চিহ্ন করেছে। এই রাজ্যের শাসক আজ আপনারা। শত শহীদের রক্তদান বৃথা হয় নি।

স্লোগান উঠল : শহীদ তোমায় ভুলি নি, ভুলছি না ভুলব না।

যশোদার নাতনিকে এক হাতে ধরে সেদিন বিনয়ভূষণ বক্তৃতা করেছিলেন : দেশ তোমরা ভাগ করেছ, আমরা উদ্বাস্তু হয়েছি। তবু কোনো দোষ দিই নি। তোমরা মন্ত্রী হয়েছ ; আমরা স্টেশনে ফুটপাতে কুকুরের মতো মাথা গুঁজেছি, মরেছি। তবু কোনো দোষ দিই নি। ভারতবর্ষ তোমাদের বাবার জমিদারি নয়, এ-মাটিতে আমাদেরও অধিকার আছে। তোমরা দাও নি, আমরা নিজেরাই অর্জন করেছিলাম। যে-মাটি তোমরা বন্ধ্যা করে রেখেছিলে, জলে জঙ্গলে যে-মাটিতে পচ ধরেছিল—আমরা সেখানে লক্ষ্মীর পিঁড়ে পেতে খড়কুটোর বাড়ি তুলেছিলাম। সাহায্য তোমরা কাণাকড়িও করো নি। আজ এসেছ আমাদের পা রাখবার জায়গাটুকুও কেড়ে নিতে।

স্লোগান উঠল : খুন কা বদলা খুন হায় ভুলো মৎ ভুলো মৎ

নীহার বলছে : হ্যাঁ, বিপ্লবীরা মৃত্যুকেও শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখে।

টিক টিক টিক। চমকে উঠে বিনয়ভূষণ নীহারের বক্তৃতায় নিজের ভাবনার প্রতিধ্বনি শুনতে লাগলেন। নীহার বলছে : অতি-বামপন্থার ছদ্মবেশে প্রতিক্রিয়া আজ শ্রমিকশ্রেণীকে আক্রমণ করছে, অস্ত্র তুলে দিচ্ছে সমাজ-বিরোধীদের হাতে। এখান থেকে ওখান থেকে প্রতিদিন পার্টির বাছা বাছা কর্মী হত্যার সংবাদ আসছে। এই এলাকায় প্রথমেই তারা অজয়ের মতো কমরেডকে খতম করল।

: সমাজদ্রোহীদের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও। কমরেড অজয় যুগযুগ জিও যুগযুগ জীও যুগযুগ জিও…

অজয়ের নামে জয়ধ্বনিরত সেই জনমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে বিনয়ভূষণের মনে পড়ল সেদিন তাঁর বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন : হ্যাঁ, আমাদের পা রাখবার জায়গাটুকুও এখন কেড়ে নিতে চাও। ঘরে আগুন দিয়েছ। মানুষ মেরেছ। কোন মানুষ ? না যশোদাদিদির মতো মানুষ। প্রথম যৌবনে দেশের জন্য যাঁর স্বামী ফাঁসি গেছেন। কোলের মেয়েকে নিয়ে যিনি আইন অমান্য করে জেল খেটেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধান রায় যখন বিলেতে বসে ডাক্তারি পড়ছিলেন, যশোদাদিদি তখন জেনানা ফাটকে ঘানি ঘুরিয়েছেন। আর সেই ইংরেজের পুলিশকে দিয়ে সেই বিধান রায় আমাদের যশোদাদিদিকে গুলি

করেছে। এই তার নাতনি বিচারের আশায় আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে। বন্ধুগণ, বালিকার মুখের দিকে তাকান। বিচার করুন। রায় দিন। শোক নয় ক্রোধ। চীৎকার করে আপনাদের মনের কথাটি দুনিয়াকে জানিয়ে দিন।

: শ্রেণীসংগ্রাম চলছে চলবে—চলছে চলবে। সংশোধনবাদ হটছে হটবে—হটছে হটবে। নীহারের বক্তৃতার মধ্যেই গানের স্বরে গর্জন উঠল : এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে।

নীহার বলতে লাগল : হ্যাঁ, জনগণ কংগ্রেসকে মুছে দিয়েছে। বিশ্বাসঘাতক মুখ্যমন্ত্রী আজ যত চেষ্টাই করুন, যুক্তফ্রণ্টের ঢালের আড়ালে থেকে কমিউনিস্ট নামধারী কোনো একটি দল জহরলাল-কন্যার যতই লেজুড়বৃত্তি করুক—কংগ্রেসকে আর কোনোদিন পশ্চিমবঙ্গে অন্তত মাথা তুলতে হবে না। শ্রমিক এবং কৃষকের আন্দোলন, শ্রেণীসংগ্রাম, জনগণের যথার্থ বিপ্লবী মেজাজ দিনে দিনে দুর্বার হয়ে উঠছে। আজ স্বরাষ্ট্রবিভাগ পর্যন্ত জনগণের হাতে। পুলিশ জানে আগের মতো জোতদার-মালিকের স্বার্থে চললে আপনারা সহ্য করবেন না। কিন্তু তাদের একাংশকেও জনবিরোধী কাযকলাপে উস্কানি দিয়ে অভিযোগ আনা হচ্ছে আমরা নাকি পার্টির স্বার্থে পুলিশ-প্রশাসনকে ব্যবহার করছি। পুলিশকে যারা বিদ্রোহ করতে শেখাচ্ছে, তারাই আবার দিল্লী থেকে সি. আর. পি. আনতে চাইছে। উদ্দেশ্য আমাদের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সাফল্যগুলিকে খাটো করে দেখানো। কিন্তু সে যাই হোক, একটা কথা এখানে পরিষ্কার বলা ভালো। জনগণের স্বার্থে শ্রেণীসংগ্রামের স্বার্থে পুলিশ ও প্রশাসন বিভাগকে ব্যবহার করা যদি অপরাধ হয়—তবে আমার দল সে অপরাধে অপরাধী। আর, এই অপরাধের জন্য আমরা গর্বও অনুভব করি।

: ইনকিলাব জিন্দাবাদ। দুনিয়াকা মজদুর এক হো। সংগ্রাম চলছে চলবে—চলছে চলবে। সি আর. পি. হটাও সি. আর. পি. হটাও। এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে।

নীহার বলতে লাগল : নানা ষড়যন্ত্র চলছে। পশ্চিমবঙ্গ দিল্লীর ঘুম কেড়ে নিয়েছে। দেশী-বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির মৃগয়াক্ষেত্র এই পশ্চিমবঙ্গ দিনে দিনে বিপ্লবী হয়ে উঠছে। অতএব আঘাত করো। ভেতর থেকে বাইরে থেকে। কংগ্রেস তো নেই এ রাজ্যে। প্রশ্ন করি দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে তারা যে সমাজবিরোধীদের পুষেছিল—কোথায় গেল সেই মাস্তানবাহিনী? আপনারা জানেন তাদের অনেকে আশ্রয় নিয়েছে যুক্তফ্রণ্টেরই কোনো কোনো শরিক দলে।

বাকিরা কৃষিবিপ্লবের নামে শুরু করেছে সুপরিকল্পিত অরাজকতা, কমিউনিস্ট হত্যা। আমাদের রাজ্যস্তরের নেতা, আমাদের আঞ্চলিক নেতা, আমাদের সাধারণ কর্মী—সত্তর বছরের বৃদ্ধ থেকে চোদ্দ বছরের ছোকরা মানে কিশোর পর্যন্ত—আমাদের বাছা বাছা কমরেডরা তাদের আক্রমণের লক্ষ্য। বন্ধুগণ, মনে রাখবেন দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়ার সুচতুর এই ষড়যন্ত্রেরই শিকার আমাদের কমরেড অজয়।

: তোমার ভাই আমার ভাই কমরেড অজয় আর তো নাই। সি. আই. এ.-র কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও। আমাদের মন্ত্র জনগণতন্ত্র।

নীহার বলছে : কমরেড অজয়ের হত্যা রাজনৈতিক হত্যা। সুতরাং শুধু ভাবাবেগ নয়, একে বুঝতেও হবে পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি দিয়ে। আপনারা সচেতন বিপ্লবী মানুষ। আপনাদের সামনে একথা নতুন করে না বললেও চলত যে কমিউনিস্টরা সমস্ত ঘটনাকেই দ্বান্দ্বিকভাবে ব্যাখ্যা করে। বন্ধুগণ, মধ্যবর্তী নির্বাচন আসন্ন। জনগণ এবার সরকার আমাদের হাতেই তুলে দিতে প্রতিশ্রুত। দু-দুটো যুক্তফ্রন্টের ব্যর্থতা তারা দেখেছে। দেখেছে গান্ধীবাদী মুখ্যমন্ত্রীর নির্লজ্জ ডিগবাজি, বৃদ্ধ বয়েসে অনশন ধর্মঘটের ন্যাকামো ভাঁড়ামোর মধ্য দিয়ে কেন্দ্রের মনিবদের হাতে এই রাজ্যের শাসনক্ষমতা তুলে দেওয়ার চক্রান্ত। দেখেছে ডাঙ্গেপন্থীদের ঘৃণ্য লীলাখেলা—দিল্লীতে ওঁয়ারা প্রধানমন্ত্রীর বাছুর, কলকাতায় সার্কাসের বাঘ। দেখেছে যুক্তফ্রন্টেরই ছোটো দু-একটি দলের কমিউনিস্টবিরোধিতা বা পেটিবুর্জোয়া দোদুল্যমানতা। কিন্তু, কিন্তু বাঙলাদেশের বিপ্লবী জনগণ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে নিয়েছে প্রকৃত বামপন্থী কারা, কাদের হাতে তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ। তারাই আমাদের শিখিয়েছে আর ওসব পাঁচমিশেলি ব্যাপার নয়, কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে এবার চাই শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট।

: সংগ্রাম চলছে চলবে, বিপ্লব চলছে চলবে।

নীহার বলছে : জনগণের এই বিপ্লবী মেজাজ দেখে প্রতিক্রিয়া নির্বাচনকেই ভয় পাচ্ছে। এইসব মুহূর্তেই নির্বাচন হয়ে ওঠে বিপ্লবী সংগ্রাম। তাই আত্মরক্ষার জন্য মরীয়ার মতো ওরা গোটা ইলেকশানটাই বানচাল করতে চাইছে। আর এদেরই পেইড এজেন্টরা স্লোগান তুলছে ইলেকশান বর্জনের। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির শাসন। অর্থাৎ কেন্দ্রের মাইনরিটি গভর্নমেন্টের শাসন। কী সাংঘাতিক বিপ্লব। জনগণ ওদের স্লোগান বর্জন করেছে। তাই ওরা ব্যক্তিহত্যার পথ

নিয়েছে, বেছে বেছে কমিউনিস্টদের হত্যা করছে। আমরা আক্রান্ত, আমরা মরছি—অথচ প্রতিদিন শুনতে হচ্ছে পুলিশ-প্রশাসনকে নাকি পার্টির স্বার্থে আমরাই ব্যবহার করছি। আর এই সুযোগে কংগ্রেসের সেবাদাস পত্রিকাগুলো আওয়াজ তুলেছে—পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলার নাকি অত্যন্ত অবনতি হয়েছে। এই অবস্থায় নির্বাচন অসম্ভব। আপনারা তো জানেনই প্রতিক্রিয়া এক হাতে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়, অন্য হাত সেই দিকে উঁচিয়ে গেল গেল আর্তনাদে কেন্দ্রের ইণ্টারভেনশ্যন প্রার্থনা করে। কিন্তু বন্ধুগণ, জনগণকে আজ আর প্রতারিত করা যায় না। যায় না ইতিহাসের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করা।

: আমাদের মন্ত্র জনগণতন্ত্র। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।

নীহার বলছে : সামনের নির্বাচনে এই কেন্দ্রে আমরা আপনাদের প্রবীণ নেতা কমরেড বিনয়ভূষণের ছেলে, রাজ্য যুববাহিনীর তরুণ নেতা কমরেড অজয়কে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাব ভেবেছিলাম। কিন্তু প্রতিক্রিয়া যৌবনকেই আগে মারতে চায়। জানি না আমাদের আরো কত প্রার্থী কত কর্মী কতজন নেতাকে এইভাবে শহীদ হতে হবে। কিন্তু, কিন্তু তথাপি শহীদ অজয়ের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে আমি বলছি—নির্বাচন হবে, আমরা জিতব। অজয় নেই, আছে তার স্বপ্ন, তার পার্টি। প্রিয়তম পুত্রের অকালমৃত্যুর শোক বিস্মৃত হয়ে মিছিলের সামনে আছেন কমরেড বিনয়ভূষণরা—দীর্ঘদিনের ত্যাগ সংগ্রাম অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাঁরা জেনেছেন হঠকারিতা আর শোধনবাদ একই টাকার দুপিঠ। অভ্রান্ত পথ আমাদের পার্টির পথ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পথ।

নীহারের বক্তৃতা শেষ হতেই শুরু হল স্লোগানের ঝড়।

: আমাদের মন্ত্র জনগণতন্ত্র।

: তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম, মুক্তিযুদ্ধের অপর নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম

চিরঞ্জীব ঘোষণা করল : রবীন্দ্রনগর আপনারা কাল মুক্ত করেছেন। মিছিল শ্রীপল্লী রবীন্দ্রনগর হয়ে···

একটা জান্তব চীৎকারে চিরর গলা ডুবে গেল। তারপর আবার স্লোগান।

: অজয়ের খুনের বদলা চাই, বদলা চাই বদলা চাই

: মুক্তিযুদ্ধ চলছে চলবে, চলছে চলবে

: কমরেড অজয় যুগ যুগ জিও, জিও জিও যুগ যুগ জিও

আর হঠাৎ ট্রাকটা চলতে শুরু করল, হঠাৎ শোকমিছিল শুরু হয়ে গেল।

বিনয়ভূষণ নীহারের দিকে না তাকিয়েই বুঝলেন তাঁকে কিছু বলতে হবে না।

চৌরাস্তায় নীহার নেমে পার্টি-অফিসে চলে গেল। বিনয়ভূষণ বাড়ি ফিরলেন।

পারুল চেয়ারের হাতলে কনুই ঠেকিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। বিনয়ভূষণকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

বিনয়ভূষণ বললেন: বোসো। মিছিল বেরিয়ে গেছে! সময় হলে গাড়ি আসবে।

পারুল বলল: বাসেই যাব।

বিনয়ভূষণ চুপ করে রইলেন।

: ইদ্রিসের ঠিকানাটা জানো?

: বৌবাজারে ওদের পার্টি-কমিউন। কি হবে?

: থানার লোক খবর দিয়ে গেল, মর্গ থেকে বিজুকে আনা যেতে পারে। তুমি তো যাবে না।

: না।

: ইদ্রিসকে সেইজন্যই খুঁজছি।

: পারুল, আমি পঁচিশ বছরের পার্টি-হোলটাইমার। আর বেশিদিন বাঁচব না।

: জানি।

: পারুল।

: বলো।

: পারুল। বিনয়ভূষণের চোখে কি জল?

: শোনো। পারুল তার কাঁধের ঝোলানো ব্যাগ থেকে ঘাড় বেঁকিয়ে একটা ছোট্ট আর সোনালি মেডালিয়ান বের করল—বুকে লেনিনের মুখ, নিচে রুশ হরফে লেখা: ত্নুনিয়ার শ্রমিক এক হও।

: শোনো।

: বলো।

: বিজু পার্টি-মেম্বার হলে তাকে এই লেনিন উপহার দেবে ভেবেছিলে। আমাদের বিয়েয় ইদ্রিসের উপহার। পরে তুমিই আবার বারণ করেছ। আজ আমি এটা বিজুকে দি? বিজুর মৃতদেহকে?

: দাও।

: এই নাও সেই পতাকা। অজুর মাথাটা ঢেকে দিও।

: দেবো।

বিনয়ভূষণের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে পারুল দ্রুত পা বাড়াল। তারপর দরজার সামনে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল : শ্মশানে দেখা হবে।

সারা দিনের তৃষা

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকদিন প্রেম করা হয় নি। হপ্তা তিনেক।

না, তারও বেশি। মশারির মধ্যেই বারো দিন। তাও দিন দশেক। বারো আর দশে বাইশ। তিন হপ্তা। কিন্তু প্রেম করেই তো মশারিতে আটকে পড়ে নি? শেষ প্রেম করেছি—

রাজীব খোঁচা মেরে বলে, 'এই।'

আদিত্য শুধায়, 'কী?'

—'ও-ই দোকানের মালিক?'

—'ম্যানেজার।'

—'ওই হল। বাড়াবাড়ি করলে এই ঘাড় ধরে বের করে দেবো।'

—'তেমন বুঝলে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়াও ব্যবস্থা কর।'

—'কিন্তু গেরুয়া জামা কেন?'

—'জানি না।' শেষ প্রেম করেছি মশারিতে আটক পড়ার ছ, না সাত দিন আগে। তাহলে তোমার দাঁড়াল গিয়ে সাত প্লাস বারো, প্লাস দশ—উনত্রিশ।

আটত্রিশ বছরের জোয়ান শরীরটা উনত্রিশ দিন প্রেম করে নি। আদিত্য গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে।

—'এই থাম থাম, লেবু আনছে।'

—'টেস্ট নষ্ট হয়ে যায়।' এক চুমুকে খতম গেলাসটা ঠকাস করে টেবিলে আদিত্য নামিয়ে রাখে।

—'টেস্ট!' ডবল ডিমের মামলেটটা একসাথে মুখে পোরায় সোমনাথ বিষম খায়। প্রণবের সারা মুখে মামলেটের কুচি ছড়িয়ে দেয়।

—'ধেৎ মশাই। কী যে করেন।'

—'একসকিউজ মি।' সোমনাথ তাকায় রাজীবের দিকে, আদিত্যের দিকে।

কাঁচুমাচু মুখ। চোখে জল ছল ছল। বিষম খাওয়ার? ফ্যানের হাওয়ায় সিগারেটের ধোঁয়া বেরোতে না পেরে জোট বেঁধে দুচোখে এসে ঝাপটা মারছে বলে? নাকি আদ্ধেকটা মামলেট বরবাদ হয়ে যাওয়ার শোকে?

বেচারা! ফ্যান চালাতে মানা করেছিলাম। জানুয়ারিতেও গরম লাগে। চাতালে যেতে চেয়েছিলাম। যদি চেনাজেনা কারো সাথে দেখা হয়ে যায়।

চোখ তার আরো ছলছলাবে। এরপর জ্বালাজ্বালা করবে। না রগড়ে পারবি না। এই ঘর থেকে যখন বেরুবি চোখজোড়া হবে রাঙাজবা। স্রেফ মামলেটেই রাঙাজবা। তাও আধখানা মামলেট।

—'গন্ধেই আমার গা—আর আপনি বলছেন টেস্ট।'

—'ঠিকই বলছে।' প্রণব বলে, 'যার যেরকম টেস্ট।'

—'কী জানি মশায়।'

—'জেনে রাখুন—মালপো খেতে ভালো, ফুলুরির থেকে মালপো উপকারী, খেতেও আপত্তি নেই—কিন্তু ফুলুরিতে কামড় দিয়ে যদি মালপোর টেস্ট পাই।'

খ্যাখ, খ্যাখ, প্রণবের মুখে কেমন সবজান্তা ভাব ফুটে উঠেছে খ্যাখ। হঠাৎ ওকে কাতুকুতু দিলে কেমন হয়।

—'তা ঠিক।' রাজীব সায় দেয়, 'তবে কিনা লীভার।'

—'ধেত্তেরি লীভার। লীভারের জন্যই যদি এত দরদ তবে হবিষ্যি কর। নাকিরে আদিত্য?'

—'বটেই তো!' তুই তো লেবু দিয়ে খাস। অবিশ্যি সেই সাথে যুক্তি পাকা করে। দু-নম্বর বিনা সোডায় খাওয়া যায় না। সোডার পরিণাম অ্যাল-কোহলিক ফ্যাট। লেখা আছে কাগজে / আলু খেলে মগজে / ঘিলু যায় ভেস্তে ইত্যাদি। অতএব তিন-নম্বর। নির্জলা, তবে লেবুর রস কয়েক ফোঁটা। অন্তত দু-তিন সিপে।

—'যেমন একেক সিগারেটের একেক স্বাদ তেমনি নাকিরে আদিত্য?'

—'বটেই তো।' কিন্তু আজ তো দিব্যি দু-নম্বর টানছিস? বেধড়ক সোডা ঢেলে?

রাজীবের পয়সায় বলে?

তাই। দু-নম্বরে দুই পনের, সোডা পনের—দুই তিরিশ। তিন নম্বরে এক-নয়, এবং ছেষট্টি—এক-পঁচাত্তর। দু-নম্বরের একটা পাঁইট ইজুকুয়ালটু তিন-নম্বরের একটা পাঁইট একটা ফাইল। লেবু বাবদ পাঁচ। ফুটপাথ থেকে

আনলে। বয়কে দিয়ে আনলে হয়। টিপস্ যখন দিতেই হবে—লেবু বাবদ যাক এক নয়া বাড়তি। এক-পঁচাত্তর প্লাস একাশি। দুই-তিরিশ মাইনাস এক-একাশি। নীট উনপঞ্চাশ।

কিন্তু এত হিসেব করে বলা সত্ত্বেও পনের তারিখ না পেরোতেই ধার কেন তোকে করতে হয় প্রণব ?

রবি লেবু কেটে নিয়ে আসে। শালপাতাটা সাবধানে টেবিলে রেখে বলে, 'একটা টুকরো পড়ে গেলো।'

—'ঠিক আছে।'

—'আর কিছু আনতে হবে ?'

এক মুঠো সল্টেড বাদাম মুখে পুরে সোমনাথ বলে, 'কিছু ফ্রুটস হলে হত না ?'

—'ফ্রুটস'

চোখের ইসারায় সোমনাথ পাশের টেবিল দেখায়।

—'অঃ। শশা, টম্যাটো ?'

প্রণব, ফ্রুটস খাওয়ায় আপত্তি তুললি না ? এর সঙ্গে ফ্রুটস খেলে নাকি ডবল ফারমেনটেশন হয়। তেলে ভাজাও খারাপ। হয় মাংস নয় সাদা মুড়ি। খালি পেটে খাওয়া—

আমি তো খালি পেটে খেলাম। শশার কুচিও মুখে ফেলি নি। কিন্তু কই পেটের ভেতর তো জ্বালা জ্বালা করে উঠল না। মুখে নাম মাত্র স্বাদও লেগে নেই।

নাকি উঠেছিল জ্বালা জ্বালা করে। আমি টের পাই নি ? নাকি লেগে আছে স্বাদ। আমি টের পাচ্ছি না।

প্রণব, টাকা-পয়সার মতো শরীর নিয়েও তুই বড্ড ভাবিস। তবু দিনকে দিন হাড্ডির হাল হচ্ছে কেন ?

—'দু-আনার শসা, দু-আনার টম্যাটো।'

—'আর পাঁপড়—'

—'পাঁপড় ? পোড়া পাঁপড়—খেতে পারবেন ?'

—'পোড়াই তো ভালো মশায়। তেলে যা ভেজাল।'

—'এনো, চারটে পাঁপড়—'

—'মামলেটটা কেমন গন্ধ গন্ধ ছিল। তখন ডিমসেদ্ধ নিলেই ভালো হত। আদিত্যবাবু ঠিকই বলেছিলেন।'

—'একটা ডিম সেদ্ধও—'

—'না না। শুধু আমার জন্যে কেন আপনারা—'

—'দুয়ানা শশা, দুয়ানা টম্যাটম, চারটে পাঁপড়, একটা ডিম সেদ্ধ?' যাচাই করে নিয়ে রবি বলে, 'একটা টাকা আমি রাখছি। বাকি হিসেবটা বুঝে নিন।' রবি বুকপকেট থেকে কয়েকটি নোট আর ঝুলপকেট থেকে একমুঠো খুচরো বের করে।

—'পরে দিও। আবার তো আনতে হবে।'

—'না বাবু, গোলমাল হয়ে যাবে। মালের চার-একষট্টি।'

—'একষট্টি?'

আদিত্য বলে, 'বোতলের দাম একত্রিশ'

অ। ওয়েস্টার্ন স্ট্রীটে কিন্তু। যাকগে —'সোডা পঁয়তাল্লিশ। আমি এক টাকা নিচ্ছি। বাকি—'

—'ঠিক আছে।' থাবা দিয়ে টাকা পয়সা নিয়ে রাজীব পকেটে পোরে। 'ও-গুলো তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।'

—'এক্ষুণি এনে দিচ্ছি।' বলে পাশের টেবিল থেকে সোডার খালি তিনটে বোতল খপাখপ তুলে নিয়ে রবি ভেতরের ঘরে নিয়ে ঢোকে।

—'দোকান তো বাইরে, ও ভেতরে কেন—'

আদিত্য বলে, 'অর্ডার নিতে।'

তার মানে ও-ই সব অর্ডার সাপ্লাই করে।

—'সোমনাথবাবু, তুই কি আজ অফিসে টিফিন করিস নি? নাকি বাড়ি গিয়ে খাবি না? শুঁড়িখানার জীবন দেখতে আসাটা তোর অজুহাত নয় তো?

—'দেখি, দেখি।' রাজীবের হাত থেকে সোমনাথ ছোঁ মেরে লেবুর টুকরোটা কেড়ে নেয়।

—'খাব্ বাবা।' বলে রাজীব আরেকটা টুকরো তুলে নেয়।

—'পেটে-কাটা।' সোমনাথ মোহিত হয়ে যায়।

—'এখানে এভাবেই কাটে।'

—'এখানে মানে শুধু এখানে, না সব দেশী মদের দোকানে?'

—'সব দেশী মদের দোকানে।'

—'আচ্ছা।' সোমনাথ মোহিত হয়ে দেখে লেবুর টুকরো।

আদিত্য দেখে সোমনাথকে। সোমনাথের বোকাসোকা মুখখানা যেন

আয়না। চোখ বুজলে ওই আয়নায় অতীতকে দেখা যায়। আমিও একদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। নামতে নামতে তখন দেশীতে এসে ঠেকেছি। প্রথম দিন এখানেই আসি। কিন্তু চাতালে শ-কয়েক লোকের জটলা আর হইহল্লায় গায়ে কাঁটা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরি।

: না না, এখানে ইম্পসিব্ল্। এত ছোটলোকের সঙ্গে ইম্পসিব্ল্।

: বেশ, পরে আপনাকে ফার্স্ট‌ক্লাস জায়গায় নিয়ে যাব। একেবারে গঙ্গার ওপারে, দোতলায়—

: আজই চলুন

: আজ দেরি হবে। যেতে যেতে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

: ট্যাক্সি করে যাব।

ওয়েলিংটন থেকে ট্যাক্সি করে মল্লিকঘাট। গঙ্গার একেবারে ওপারে। ছাদ-হীন দোতলা। আলো নেই। মাত্র তিনটি লোক। নড়বড়ে কয়েকটা বেঞ্চি। ঝিরি ঝিরি হাওয়া দিচ্ছিল।

তবু চমৎকার লেগেছিল জায়গাটা।

গেলাস মুখের কাছে আনতে গা গুলিয়ে ওঠায় ভুপেশ লেবু আনায়।··· দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে লেবুর বিচি···খসাতে গিয়ে চোখে পড়ে। পেটে-কাটা। হাড ভুল করে কেটেছে।

কিন্তু না, ভুল নয়। তারপর হাওড়ার সন্ধ্যাবাজার। আকাশ মেঘলা ছিল। বৃষ্টি এলে ভিজতে হবে বলে মল্লিকঘাটের বদলে ভুপেশ সন্ধ্যাবাজার নিয়ে যায়। সে একেবারে দালান বাড়ি। ভেতরের দিকে উঠোন। কামিনী ফুলের গাছ।

সেদিনও লেবুর পেট-কাটা—

[: কী ব্যাপার বলুন তো। লেবু ওর—

[: মালের দোকান বা পানের দোকান লেবু এভাবেই কাটে। নিমক সোডা খান নি ?

: কিন্তু কেন ? এতে লাভ ?

: কে জানে মশায় কেন ? লাভ ভেবে সব কাজ হয় ? এই যে আমায় বলুন, মাল খাওয়ায় কোনো লাভ আছে ?

আছে আছে অনেক লাভ আছে। সে তুই বুঝবি না ভুপেশ। তোকে আমি খুলে বলতে পারব না বলে বুঝবি না। তোর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তুই

আমার খরচ বাঁচিয়ে দিয়েছিস বলে কৃতজ্ঞ।

: বেশ ফূর্তি ফূর্তি লাগে। বেশি খেলে মন বেখেয়াল হয়ে যায়। রাত্তিরে তোফা ঘুম হয়। সকালে এক বারেতেই পেট সাফ—এগুলো যদি লাভ বলেন, লাভ। কিন্তু রোজ তো আর এমন লাভ ওঠানো যায় না। আপনার কি, একা মানুষ, সাত কুলে কেউ নেই—হাসছেন।

—'হাসছিস যে?'

রাজীবের খোঁচা খেয়ে আদিত্য তটস্থ হয়ে ওঠে। 'একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেলো। মাংস খাবেন সোমনাথবাবু।'

—'মাংস? মাংস এখানে—'

—'মোড়ের পাঞ্জাবীর দোকান থেকে—'

বাধা দিয়ে রাজীব বলে, বেয়ারা অদ্দুর যাবে না। পিক আওয়ার, শশা-টম্যাটো এখন অব্দি—'

—'আমি এসে দিয়ে যাচ্ছি।' তোর ভয় নেই রাজীব। আর তোর খরচ করাব না। 'আমি উঠব।'

—'মানে?' কোরাসে প্রশ্ন করে রাজীব প্রণব সোমনাথ।

—'তুই উঠবি মানে?'

—'তিন আউন্সও তো খাস নি?'

—'যাবেন কি মশায়।'

—'হঠাৎ একটা কাজের কথা।' আমার ভালো লাগছে না প্রণব। ভালো লাগছে না ভালো লাগছে না। রাজীব তোর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ থাকব। যেমন আছি ভূপেশের প্রতি। সবাইকে বলে বলে আমি এই কৃতজ্ঞতার ঋণ শুধে দেবো। সোমনাথ, তোকে যদি এক খুড়ি মাংস দিয়ে যাই, আমার চলে যাওয়ায় নিশ্চয় আপত্তি করবি না।

কিন্তু আমায় যেতেই হবে। আটত্রিশ বছরের শরীরটা আমার উনত্রিশ দিন প্রেম করে নি। ভাবা যায়। আটত্রিশ বছরের যোয়ান ছেলেটা যার সাতকুলে কেউ নেই।

কেউ নেই। যা মাইনে পাই সব খরচ করি। আমার ব্যাঙ্ক নেই, ইন্সিওরেন্স নেই। আমার শত্রু নেই, আপনও কেউ নেই। অসুখের সময় তোরা সব গিয়েছিলি। রঘুনাথ ভালোবেসে সেবা করেছে। আমার মানা সত্ত্বেও সারারাত ঘরের মেঝেতে রাত কাটিয়েছে। তবু কেন আমার কান্না পেত?

প্রেম ! প্রেম ! প্রেম ! আটত্রিশ বছরের যোয়ান শরীরটা আমার—

—'তোর যাওয়া হবে না।'

—কী ভাবছিস বলতো ?'

—'কিছু না।'

—'বললেই হল। এসে ইস্তক গুম হয়ে আছিস। দেখি গেলাসটাকে—'

—'আর খাব না।'

—'ইয়ারকি নাকি।'

গেলাসটা আদিত্য টেবিল থেকে সরিয়ে আনে। পাশ থেকে সেটা খপ করে কেড়ে নিয়ে প্রণব রাজীবের দিকে এগিয়ে দেয়।

গেলাসের মুখে রুমাল রেখে মদ ঢালতে ঢালতে রাজীব বলে, 'মিথ্যে ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস। আমি বলছি, দেখিস কালই ও তোর কাছ থেকে মাপ চেয়ে নেবে। তোর আবার কলেজের ফ্রেণ্ড—বাড়ি না গিয়ে হাজির হয়।'

কী কাণ্ড ! যে কারণে রাজীব তাকে মাল খাওয়াতে নিয়ে এল, সেটাই ভুলে বসে আছি। অফিস তোলপাড় করা যখন ব্যাপারটা ভুলে বসে আছি।

গলা ভিজলে কোথায় মুখের লাগাম খসে পড়বে, অফিসে গুম মেরে বসে থাকলেও কেঁদেকেটে এখানে নাটক করব, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দরদ ঢালার মওকা পেয়ে রাজীব বর্তে যাবে, তাল বুঝে প্রণব পকেট থেকে জয়েণ্ট পিটিশনটা বের করে দিল যে, তা নয়, আমি ভাবছি প্রেমের কথা।

স্রেফ প্রেমের কথা। আদিত্য বুকে হাত দেয়। এও প্রেম। আরেক ধরনের প্রেম। জন্মের মতো এই প্রেমের বারোটা বেজে গেল। ওদের বলব ?

তাহলে কাঁদতে হবে। হাউ হাউ করে বুক চাপড়ে সারা ঘরের লোক তাজ্জব বনে না যাওয়া পর্যন্ত, রাস্তায় বের করে না দেওয়া পর্যন্ত কান্না চালিয়ে যেতে হবে। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে পুরোনো কাসুন্দি না ঘাঁটলে এ ধরনের কান্না জমবে না।

—'অফিস নিয়ে এখনও মাথা ঘামাচ্ছেন মশায়।' সোমনাথ বলে, 'আপনার ধাত তো এমন না।'

গেরুয়াধারী ম্যানেজার ছুটে না আসা পর্যন্ত অফিস নয় অফিস নয়। আমার মনে পড়ছে বিভূতির কথা। মরা বাপকে আঁকড়ে কেমন আথালি পাথালি করছিল। কী সব আবোল তাবোল বকছিল।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুর পর স্টুডেন্টস হল (কলেজ স্কোয়্যার, কলকাতা)-এ শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে একটি জনাকীর্ণ শোকসভা হয়।

সভায় শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্থাপিত একটি শোকপ্রস্তাব সর্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়:

"আমাদের প্রিয় শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে তাঁর অনুরাগী শিল্পী-সাহিত্যিকদের এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে এই সভা আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছে। শান্তিরঞ্জনের সাহিত্যকীর্তিগুলি যাতে পাঠক-সাধারণের কাছে ঠিকমতো পৌঁছয় তার যথোচিত উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সহধর্মী সাহিত্যিকদের কাছে এই সভা আবেদন জানাচ্ছে।"

শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীরণজিৎকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীপ্রদ্যোৎ গুহ, শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ, শ্রীধনঞ্জয় দাশ, শ্রীবিমল রায়চৌধুরী, শ্রীতরুণ সান্যাল, শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত, শ্রীদ্বীপেন্দ্র সেনগুপ্ত শ্রীশচীন বিশ্বাস প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিক এবং কলেজ জীবনে শান্তিরঞ্জনের সহপাঠী শ্রীননী দত্ত ঐ সভায় বক্তৃতা করেন।

শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যেও উপস্থিত ছিলেন অনেক বিশিষ্ট কবি এবং সাহিত্যিক।

শান্তিরঞ্জন-দুহিতা শ্রীমতী অনন্যা দাশের সৌজন্যে প্রাপ্ত শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অসমাপ্ত রচনাটি প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পশ্চিম-বঙ্গের কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি উপরে-উদ্ধৃত শোকপ্রস্তাবটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বানান ও যতিচিহ্ন ছাড়া এই রচনায় আর কোনো পরিবর্তন করা হয় নি।

—সম্পাদক

ঢাকা-রোডের দীপালি

শিবশঙ্কর মিত্র

ঠিকই মনে আছে কাশেমের সরশুনা গ্রামের অদূরে বুনোপাড়ার লোকেরা কেমন করে সড়কি উঁচিয়ে করে ঘুরে বেড়াত সদ্য ধান কেটে নিয়ে যাওয়া ভিজে বিলের কিনারে কিনারে। তাই সেও আজ বেরিয়েছে বস্তা কাঁধে ফেলে তেমনি ধারা এক সড়কি হাতে নিয়ে। সড়কি বলতে যা বোঝায় তা ঠিক নয়। মানুষ-মারা ঝকঝকে সড়কির দরকারও ছিল না কাশেমের। কাঁধেই তো বারুদের গন্ধ লাগানো স্টেনগানটি ঝুলছে। সড়কি বলতে বুনোপাড়ার লোকদের হাতে যা থাকত—একটা লম্বা সরু লোহার শিক মাত্র।

কাশেমকে এখন গোটা এলাকার ছেলে বুড়ো সবই 'কাপ্তেন' বলেই ডাকে। খালি পা, পরনে হাঁটু অবধি তোলা লুঙি, গায়ে হাত-কাটা জামা আর মাথায় লাল গামছার ফেটা বাঁধা। ছোট ছেলেরা তো কারও মাথায় গামছার ফেটা আর কাঁধে বন্দুকের নল দেখলেই দূর থেকে 'কাপ্তেন' 'কাপ্তেন' বলে চিৎকার করে ওঠে। মধুমতী অঞ্চলে কাপ্তেন ৪নং গেরিলা দলের নেতা। যশোর ও ফরিদপুরের সীমানা বরাবর মধুমতীর এপার ওপার এই দলের আধিপত্য সুবিস্তৃত। এদেশের নদীরও যেমন শেষ নেই, তেমনি তাদের নামেরও যেন শেষ নেই—পদ্মা, গৌরি, কুমার, নবগঙ্গা, চিত্রা, ফটকী, বারাসিয়া, মধুমতী, আতাই, আরও কত! তারপরও আছে এদের শাখাপ্রশাখা—কালীগঙ্গা, আত্তরাই, মুচিখালি, চন্দনা, বাণকর্ণা, মজুদখালি—এমনি ধারা অগণিত শাখা-প্রশাখায় আকীর্ণ হয়ে আছে এই শ্যামল অঞ্চল। বিল-বাওড়েরও তো অন্ত নেই। প্রতি গ্রাম ও গঞ্জ ঘিরে আছে যেন বদ্ধ জলাভূমির প্রাচীর।

এরই ফলে বাইরের অঞ্চলের সঙ্গে এই এলাকার বিচ্ছিন্নতা সুবিদিত।

অধুনা কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতা ভেদ করে চলে গেছে ঢাকা-রোড—যশোর কেল্লার অন্যতম মূল সরবরাহ পথ। যশোর থেকে বিদ্রোহী বাঙালি পল্টন পিছু হটার পর গত পাঁচ মাস ধরে এই ঢাকা-রোডকে কেন্দ্র করে দূর-দূরান্তের গ্রামে খান-সেনাদের যে অত্যাচার ও অনাচার শুরু হয়েছিল, তার তুলনা পাওয়া ভার। তারই মোকাবেলায় ৪নং গেরিলা দলের জন্ম। শ্রাবণ মাস অবধি খান-সেনাদের ছিল যেন সর্বত্র অবাধ আনাগোনা। তারপরই কিন্তু শুরু হয় ক্ষিপ্ত মানুষের প্রত্যাঘাত। ৪নং দল তেমন বড় নয়, তবুও তারই দুর্ধর্ষ আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে খান-সেনারা তাদের বর্বরতা ও লালসা মেটাতে এই অঞ্চলের গ্রাম ও গঞ্জে প্রবেশ করার সাহস হারিয়েছে। সেই সঙ্গে এলাকার দালালরাও প্রায় নিশ্চিহ্ন।

আশ্বিন মাস পার হতে চলেছে; এবার ৪নং দলের লক্ষ্য ঢাকা-রোড। খান-সেনারাও ঘাঁটির পর ঘাঁটি বসিয়ে কড়া পাহারায় রেখেছে এই দীর্ঘ সরবরাহ লাইন।

কিন্তু কাপ্তেন এবার মুস্কিলে পড়েছে খোপঘাটার ঘাঁটি নিয়ে। ধোপাদহ অঞ্চলে যেখানে নবগঙ্গাকে ঢাকা-রোড অতিক্রম করেছে তারই মুখে শত্রুর এই পাকা বিবরঘাঁটি। কাপ্তেনের দৃঢ় পণ, ঘায়েল করতেই হবে এই আস্তানাকে। কিন্তু পণ করলেই তো হয় না। ঘাঁটির পূব দিকে একসারি কিছু গাছ থাকলেও, অন্য সবদিকে ধু ধু ফাঁকা মাঠ। অতর্কিতে আচমকা আঘাত হানার কোনও আড়াল পাওয়া দুষ্কর।

৪নং দলের গোপন সভা। সবাই মিলে একটা কিছু ফন্দি বের করতে চায়। কোনও ফন্দিই যখন কারও মাথায় আসে না তখন হাঁটুর ওপর উঁচু হয়ে বসে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে কাদের ভাই বলল,—"ভাইজান! অতো ভাবাভাবির কাম কি। মুহোমুহি ফাটাফাটি হইয়া যাক।···সোজা ঝাপায় পড়লে যাইবো কোহানে হালারা!"

কাদের-ভাইয়ের বাজখাঁই গলার আওয়াজটা থামতেই নিস্তব্ধ ঘরে সবারই হাতের রাইফেল আর স্টেনগান নড়েচড়ে আওয়াজ করে উঠল। ইস্পাতের সবল গ্রন্থিগুলির ভারিক্কি আওয়াজ। মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণচঞ্চল বেপরোয়া যোদ্ধাদের সম্মতি জানাবার এ এক অদ্ভুত প্রতিবেদন। অবিনাশ মণ্ডল ঘরের বাইরে পাহারায় ব্যস্ত, কিন্তু কান তার খাড়া ঘরের কথাবার্তায়। সেও হাতের রাইফেল ঝমাৎ করে কাঁধে রেখে ঠোঁট কামড়ে ধরে গলায় খাঁকার দিল। সম্মতি

জানাবার যেটুকু বাকি ছিল, তাও বুঝি জানানো হয়ে গেল।

না, কাপ্তেন তো এখনও কোনও সায় দেয় না। একবার ঘাড় নাড়লেই তো সবাই তৈরি হয়ে নিতে পারে। সবারই লক্ষ্য কাপ্তেনের দিকে। কাপ্তেন সহসা দৃঢ় হয়ে বলে, "না আজ না। ঝাপায় মোরা পড়বানে, ঠিকই পড়বানে, পড়তেই হইবনে।...তবে মধুমতীর খেল এগ্‌বার দেহাইতে হইবো হালাদের।" কাপ্তেন 'ভানুমতীর খেল্'কে রসিয়ে 'মধুমতীর খেল্' বলে। ৪নং দল কাপ্তেনের এই খেল্ অনেকবারই দেখেছে। তাই সবাই উৎসাহিতও যেমন হল, তেমনি উৎসুকও হল।

'মধুমতীর খেল্'-এর সূত্রেই আজ সাতসকালে সড়কি আর বস্তা নিয়ে কাপ্তেন বেরিয়েছে সরগুনা গাঁয়ের প্রান্তে। সঙ্গে কাদেরভাই আছে। পথে মতলবের কিছুটা শুনতেই সে মাথা চুলকিয়ে বলে ওঠে, "তা তো হইলো, কাপ্তেন! কাছিম তো মোরা মারি না!"

—"ধ্যুৎ, তুই কিচ্ছু জানস না। মারবো কির লাইগ্যা? একডাও মরবো না।"

—"তা তুমি তো কম ঠ্যাটা না। আইগাও।"

কাপ্তেন নরম মাটিতে সড়কি মেরেই চলেছে। কোনও হদিস মেলে না। খানিকটা হতাশ মনে বসে পড়ে কাদেরকে বলল, "যা না এগ্‌বার, ছালা রাখ্, গোড়ায় যা বুনোপাড়ায়। হগলে তো অহোনও ভিটাছাড়া হয় নাই। যারে পাইস্ তাড়াতাড়ি আইতে কইস্।"

আশপাশের সর্বত্র কাপ্তেন তো এখন প্রায় রূপকথার নায়ক। তার নাম করতেই বুনোপাড়ার এক বুড়ো ছুটে এসে দূর থেকেই বলে, "কিগো কাপ্তেন! তলব ক্যান? বুড়ারেও তোমার কামে লাগবো? তা মুই বন্দুক চালাইতে পারুম। দেবা নাহি এগ্‌ডা?"

—"না, তোমার বন্দুক হাতে লইতে হইবো না। তুমি কিছু কাছিম ধইরা দাও দেহি।"

বুড়ো সড়কি দেখেই বুঝে নিয়েছে—কাছিম না এগুলো, ঠিক কাছিম না। "এ হইলো গা সুঁদি, সুঁদি কচ্ছপ। তোমরা তো খাবা না জানি। তা কচ্ছপও লড়াই করবো নাহি?...তাও দিহিনি। তোমাগো কাম না। যার যা কাম্, তাও দিহিনি।"

বুনো-বুড়োর দক্ষ হাতে সুঁদি কচ্ছপের বস্তা বোঝাই হতে সময় লাগে না।

কাপ্তেন ও কাদেরভাই বোঝাই বস্তা মাথায় করে নিয়ে যাবার সময় বুনো বুড়ো কোমরের পেছনে দু-হাতের ঠেকো দিয়ে খাড়া হয়ে এক-নাগাড়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। ওরা আড়ালে পড়তেই বিড় বিড় করে বলল, "পাগল হইছস তোরা! পাগল!"

রাত্রের অন্ধকার। হয়তো অমাবস্যা রাতের অন্ধকার। তা না হলে অমন গাঢ় হবে কেন! সড়কের বেশ নিচুতে খানা-খন্দের আড়ালে এগিয়ে চলেছে কাপ্তেনের দল ঢাকা-রোড ধরে। ধোপাঘাটার ঘাঁটি এখনও বেশ দূর। মাঝে একবার শত্রুর কনভয় এসেছিল। অনেকগুলি ট্রাকের কনভয় যশোরের দিকে ছুটে চলেছে। লোভও যে হয় নি কাপ্তেনের তেমন নয়। কিন্তু আজ রাতের লক্ষ্যকে বিপর্যস্ত করতে চায় না। সড়কের ওপর হেড লাইটের ঝিলিক পড়তেই কাপ্তেনের আদেশে সবাই খানার মধ্যে লেপটে রইল। স্টেনগান আর রাইফেল সবারই বুকের তলায়—বিচ্ছুরিত আলোকে অস্ত্রের ইস্পাত যাতে চিকমিক করে না ওঠে। সৈনিকের অজানিতে বারুদের গন্ধও যেমন মাদকতা আনে, তেমনি খোলা বুকে শীতল ইস্পাতের স্পর্শও আত্মক্ষমতার উন্মাদনা আনে যুবকের উষ্ণ বুকে। তবু যেতে দেয় ওরা কনভয়কে।

ঘাঁটির কাছাকাছি এসে গেছে। সামনে সড়কের সামান্য বাঁক। ঘুরতেই দেখা যাবে, অন্ধকার আকাশের পটে ঘাঁটির আবাছায়া অবয়ব, আর তারই গা ঘেঁষে নদীর জলের বিচ্ছুরিত ঈষৎ ক্ষীণ আলোকচ্ছটা। রাইফেলের আওতার মধ্যে এবার। কাপ্তেন দ্রুত দলকে দুভাগ করে নেয়। বড় দলকে মাঠে নেমে ডাইনে এগিয়ে ঘাঁটিকে উত্তর থেকে বেড় দিতে হবে। কিন্তু খবরদার—কাপ্তেন মশাল না জ্বালা অবধি কোনও গুলি করা নিষেধ। ওরা পলকের মধ্যে ভিজে মাটি ও আগাছার ওপর প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে অমানিশির অন্ধকারে মিশে গেল।

বাকি সবাই কাপ্তেনের পাশেই রইল। কাদেরভাই সঙ্গেই আছে। তার জিম্মায় সুঁদি-কচ্ছপের বস্তা। সড়কের ঢালু পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে কিছুদূর এগিয়ে সহসা থমকে যায় কাপ্তেন। অন্ধকারকে আরও ঘন অন্ধকার করে সামনে কয়েকটা পিচের ড্রাম পড়ে আছে বুঝি। কাপ্তেন আর এগোয় না। নিশ্চুপ পড়ে থাকে মাটিতে। বুঝবার চেষ্টা করে ড্রামের পেছনে কেউ আছে কিনা। নিঝুম স্তব্ধতায় কিছু সময় কাটার পর ড্রামের পাশ থেকে একটা ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডেকে ওঠে। না, শত্রু নেই ওখানে।

ক্যাপ্টেন আর দেরি করতে চায় না। দ্রুত এগিয়ে ড্রামগুলির আড়ালে বস্তা খুলে ফেলল। ক্যাপ্টেন এবার বেপরোয়া। তাড়াতাড়ি এক খণ্ড মোমবাতি ধরিয়ে একটা কচ্ছপের পিঠে সেঁটে দিল। তারপর কচ্ছপটাকে আলতো ধরে পিচের রাস্তায় ছেড়ে দিল। মাথাটাকে খাঁটি বরাবর করতে ভোলে নি। চারপায়ে মাটির স্পর্শ পেয়ে কচ্ছপ তার দীর্ঘায়ত গ্রীবা ক্ষণিক উদ্যত করে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপরই গুটিগুটি এগিয়ে যায়।

কাদেরভাই আরেকটি কচ্ছপ ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দিতে দিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে চলন্ত দীপিকার গতিপথ। মনে তার দ্বিধা। চুপি চুপি বলে, "এ মুহো যদি ফির‍্যা আসে!"

ক্যাপ্টেন যেন চাপা গলায় ধমক দেয়, "দ্যাখ্ না! ঐ দ্যাখ্ শুড় উচা করছে, পানির বাস লবার লাগছে।...নদী মুহো যাইবই। ফেরবো ক্যান?"

দেখতে না দেখতে আরেকটি একই ভাবে ছাড়তেই সেও প্রথমটিকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলে। সঙ্গী পেয়ে তার মনে কোনও দ্বিধা জাগে না। তারপর আরেকটি...তারপর আরেকটি...তারপর আরেকটি...দশ-বারোটি সার বেঁধে চলেছে ঢাকা-রোড ধরে। ঢাকা-রোড আজ দীপান্বিতা। সচল দীপালি!

এই ঔদ্ধত্য সহ্য হবে কেন দানবদের। গুলির আওয়াজ!...প্রথমে একটা দুটো...তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি। ভ্রূক্ষেপ নেই তবু আলোকবাহী এই সৈনিকদের—ওদেরও জন্ম তো বাঙলার মাটিতেই। ঝাঁকের পর ঝাঁকের গুলি ঢাকা-রোডের পাথরে ঠক্কর খেয়ে চমক দিচ্ছে—তবু ওরা এগিয়ে চলেছে। গুড়্—গুড়্—গুড়্ করে এগিয়ে চলেছে দীপবাহী সৈনিকের সারি—ঢাকা-রোডের দীপালি।

হতবাক্ করেছে নিশ্চয় দানবদের। তা না হলে স্টেনগানের ব্রাসিং চালাতে আরম্ভ করবে কেন! মাটির বুকে লেপ্টে থাকা লক্ষ্যবস্তুকে অতো সহজে হাতের নিরিখে ঘায়েল করা দুরূহ। আর সে হাত যদি আতঙ্কে ও ত্রাসে কম্পান্বিত হয়ে পড়ে, তাহলে তো কথাই নেই।

ক্যাপ্টেন এবার সাবধানবাণী উচ্চারণ করে, "আবডাল্ লইস্। লেইপ্টা থাকিস। গুলি বাস্প করতেছে। তাল-বেতালে ছিটকাইতেছে।"

বেপরোয়া দীপালি, কেন কে জানে, সড়ক পার হয়ে ওপারে যেতে চায়। ক্যাপ্টেন দ্রুত গুলির আদেশ দিল। পাল্টা গুলির ইঙ্গিত পেয়ে দানবেরা প্রায় ক্ষিপ্তের মতো ঝাঁকের পর ঝাঁক একটানা গুলি করতে থাকে।

এতক্ষণে শত্রুর গুলি নিশ্চয় নিঃশেষ হবার মতো। কাপ্তেনও তৈরি, মশাল ধরিয়ে দিয়েছে। দেখতে দেখতে মাঠের স্টেনগান গর্জে উঠল। শুধু মেশিনের গর্জন নয়—কাপ্তেনের গোটা দল দুদিক থেকেই সমতালে সিংহনাদ করে ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। মধুমতীর মানুষের অভ্যস্ত 'কাজিয়া' লড়াইয়ের মত্ত রণহুঙ্কার—রা—রা—রা—রা!

একবারের হুঙ্কারে ওরা কতটুকুই বা এগিয়েছে। তাতেই মানুষখেকো দানবের দল স্তব্ধ। স্তব্ধই শুধু নয়, পলাতক। সোজা যশোর কেল্লার দিকে পালিয়েছে। সেতুর উপর দিয়ে পলাতক আবছায়া মূর্তিগুলি স্পষ্ট অনুমান করা যায়। ৪নং দল তাদের নিরিখ করতে কার্পণ্য করে নি। আহত হয়ে কজন দানব নদীর জলে পড়েছে তার হিসাব নেবার অবকাশ হয় নি। ঘাঁটিতে অস্ত্রপাতি যা পেয়েছে, তাই লুটে নিতেই ওরা ব্যস্ত।

কাদেরভাই কিন্তু সবার অলক্ষ্যে ছুটছে বস্তাটা আনতে। বস্তা হাতে ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, কাপ্তেন তুমি দেহোনি, ওরা যে নদীতে নাইমা পড়তেছে! শিগ্‌গির চলো।"

বস্তা দেখেই কাপ্তেন যেন অপরাধীদের মতো এগিয়ে এল। সড়কের অপর পাশে একটা গাছের আড়াল থেকে দেখে—দীপালির মালা নদীর ঢালু পাড় বেয়ে তরতর করে নেমে চলেছে।

একটানে কাদেরের হাত থেকে বস্তাটা প্রায় কেড়ে নিয়ে অন্য হাতে তাকে আগলে কাপ্তেন দীপালির দিকে তাকিয়ে রইল। একে একে ওরা জলে নামে আর এক একটি দেউটি নিবে যেতে থাকে।

শেষ দেউটি নিবে গেছে। কাপ্তেন এবার আগল দেওয়া হাতখানি নামিয়ে অন্ধকারেই কাদেরভাইয়ের মুখের পানে তাকাল। কি যেন বলতে চায়।… বলার অবকাশ হয় না—দিগন্তে আগন্তুক আরেক কনভয় বাহিনীর হেডলাইট প্রতিফলিত। দুরন্ত বেগে ছুটে আসছে। আসুক,—ওরা হাজার হেডলাইট দিয়েও খুঁজে পাবে না ৪নং দলকে আর বিবরঘাঁটির বীরপুরুষদের, তেমনি ঢাকা-রোডের দীপালিকেও।

গল্প এখানে শেষ হলেও একটা কথা না বললে নয়—কূর্ম অতি দীর্ঘজীবী। তাই অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে মধুমতী অঞ্চলে কোনো সিঁদু-কচ্ছপের পিঠে যদি গলা মোম দেখা যায় তবে বুঝতে হবে, সে-ও ১৯৭১ সালে বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিবাহিনীর এক অপরাজেয় সঙ্গী ছিল।

পৃথিবী আমার, পৃথা

মণীন্দ্র রায়

আকাশ থেকে মাটির দিকে,
মানবী, তুমি ধারণ করেছিলে তার বেগ,
ঐ সাতঘোড়ার রথ, আর পূর্বতোরণ,
লালন করতে পারো নি তবু তাকে বুকের তাপে,
আর ভেসে গিয়েছি আমি তাই নদীর জলে,
মৃত্যু আব জীবন আমার দু'দিকের প্রহরী,
একটা ছিন্নবৃন্ত জবার মতো তামার থালায়।

আর সারাজীবন আমি তাই মৃত্যুর নখর,
সারাজীবন আমি তাই জীবনের চিৎকার!
ঐ অপুত্রক বৃদ্ধ, আর সন্তানহীনা জরতী,
ঐ খর্ব বামন সংসার, আর
ঘোড়ার লাগাম ধ'রে দিনের পর দিন,
আর রাজার বাড়ির উচ্ছিষ্ট লাভের আহ্লাদ,
আমার তৃষ্ণার অঞ্জলিতে ঢেলে দিয়েছে জ্বলন্ত অঙ্গার,
আমাকে খেপিয়ে তুলেছে তীরবেঁধা রণতুরঙ্গের ক্রোধে,
আমি বাজপড়া গাছের মতো
জ্বলতে জ্বলতে বলে উঠেছি—না,
আর পূর্বতোরণে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেছি, ঐ আমি!

॥ ২ ॥

ত্যাখো, পতন আমাকে ভীত করে নি,
জন্মে তো আমার বেজে ওঠেনি শাঁখ,
আমি অবাঞ্ছিত, তবু এসেছি,
ঐ সাতঘোড়ার রথ, আর পূর্বতোরণ,

মানবী, তুমি লালন করো নি তাকে তোমার স্বপ্নে,
আর দিনের পর দিন আমি তাই ভেঙে যাই,
দিনের পর দিন আমি বিকার,
এই খর্ব বামন সংসার, আর আস্তাকুঁড়ের আহ্লাদ,
খুঁচিয়ে তুলেছে আমার আক্রোশ,
আমার কৈশোরের হরিণের বুক থেকে ভাখো
লাফ দিয়ে বেরিয়েছে একটা দাঁতাল শুয়োর,
আমি রুখে দাঁড়িয়েছি আমার নিয়তির মুখোমুখি,
এই বিশ্রী কর্কশ স্পর্ধা আমার আমরণ,
মানবী, তুমি চিরকালের জন্যে—চিরকাল
বঞ্চিত করেছ আমাকে আমার স্বপ্নে !

তবু,
এক-একটা সময় আসে, আমি
আমারও এ অনুর্বর টিলার
যোজনের পর যোজন জ্বলে ফাল্গুনের পলাশ,
নদীর ওপর জ্যোৎস্নায়-ভাঙা ঢেউয়ের চূড়ায়
ঝলমল ক'রে ওঠে আমার যৌবন সম্রাটের মতো,
আর মুহূর্তগুলোকে দু-হাতের তালুতে পিষে
ফোঁটায় ফোঁটায় আমি নিঙড়ে বার করতে চাই
আমি তার মদ

এক-একটা সময় আসে, আমি—
আমারও কামনা জাগে ফতুর হয়ে যেতে,
একটা উন্মত্ত বাঘিনীর হাঁ-এর গহ্বরে
ঢুকিয়ে দিতে সাধ যায় আমার মুণ্ড,
আর মানবী তুমি চিরকালের জন্যে—চিরকাল
বঞ্চিত ক'রেছ আমাকে আমার স্বপ্নে,
পাঁচজনের গলায় মালা পরায় যে নারী,
ঘৃণায় ভাখো মুখ ফিরিয়ে নেয় সেও !

কিন্তু, কেন আমি তাকাব না
ঐ সুঠাম তন্বী শরীরে ?
আগুন থেকে বেরিয়ে আসা—
যেন আগুনেরই এক নীলাভ শিখায় বন্দী,
ঐ কাশ্মিরী তুরঙ্গমার মতো সুশ্রী তেজের
দীপ্তি পাবো না আমিও ?
কেন ভালবাসার জানালায় আমি
কোনদিন পাব না আমার নির্বাচিতা হৃদয়ের
প্রতীক্ষা ?
কেন সারাজীবন থাকবে আমার শুধু
জীবনধারণ আর বাঁচা ?
ঐ রাজার বাড়ির উচ্ছিষ্ট লাভের আহ্লাদ
আর ঐ খর্ব বামন সংসার ?
কেন দিনের পর দিন থাকবে আমার শুধু
হিংসে-ভরা জ্ঞাতিবিরোধের ইন্ধন,
আর ঐ ইতর লম্পট দাম্ভিকদের
ঘোড়ার লাগাম ধরে তোষামোদ,
সারাজীবন আমার শুধু এই পীড়ন,
এই নির্বাসনের হাহাকার ?

ছাখো, মানবী, তুমি চিরকালের জন্যে—চিরকাল
বঞ্চিত করেছ আমাকে আমার স্বপ্নে !
আমি জলের আশায় এগিয়ে গিয়েছি ঝর্ণার দিকে,
আর আমার তৃষ্ণার অঞ্জলিতে
ঝ'রে পড়ল ছাখো জ্বলন্ত অঙ্গার—
পাঁজনের গলায় মালা পরালো, আর
ঘৃণায় ছাখো মুখ ফিরিয়ে নিল প্রেম !
একি বজ্রাঘাতের দাহন, একি ধিক্কার !
আমি বজ্র দিয়েই ঢেকে দেব তার জ্বালা—
ঘৃণাই তাহলে সারাজীবন হোক স্তোত্র,

ঘৃণার চিতা দিয়েই আরতি করব আমি
বঞ্চনার ঐ অমাবস্যার মুখ !

॥ ৩ ॥

আমি তো চাই নি এই শ্মশান !
মৃত্যুতে কারই বা কী লাভ ?
আমার ছিল সাতঘোড়ার রথ আর পূর্বতোরণ,
আমার সহজাত কবচকুণ্ডল আর একাঘ্নী ;
সূর্যকে হৃদয়ে ধারণ করেছি আমি প্রতিদিন,
প্রতিদিন আমি উজাড় করে দান করেছি
আমার অকৃপণ মমতা ;
বিলিয়ে দিয়েছি এমন কি আমার বেঁচে থাকার বর্ম ;
আর সারাজীবন তবু তোরণের বাইরে আমি ভিক্ষুক ;
শুধু উচ্ছিষ্টের আহ্লাদ আর
মর্মযাতনার গোপন কীটের দংশন !
শুধু প্রতিযোগিতার আঙিনার বাইরে
আহত হৃদয়ের গর্জন !—
এই নিষ্ফল কামনা, এই পদাহত পৌরুষ,
আর দিনের পর দিন শুধু অভিশাপ,
আমার বুকের গহ্বর থেকে খুঁচিয়ে বার করেছে
মাতাল একটা রোখা শুয়োর,
আমার দাঁতের লাঙলে উল্টে ফেলব আমি পাতাল,
আর আমার নিয়তির বুকের ওপর
চাপিয়ে দেব আমি আমার বাঁ পা ;
এই বিশ্রী কর্কশ স্পর্ধা আমার আমরণ !

॥ ৪ ॥

না, আজ আর নয় তাহলে ভালবাসার কথা,
আজ ঘৃণা !

এই তিক্ত কষায় ওষুধ, হয়তো বিষ,
আমাদের ইতর লম্পট স্নায়ুতে আনুক
বিদ্যুতের চাবুক !
এই ঘিন্‌ঘিনে ভালবাসা, আর ঐ
চট্‌চটে রসের কলসে মাছি-আটকানো প্রহর,
বন্দী করে কেবলি আমাদের
খর্ব বামন সংসারে,
আর দিনের পর দিন আমরা কেমন
শিখা থেকে অঙ্গার,
আর অঙ্গার থেকে ছাই,
না আজ আর নয় তাহলে ভালবাসার কথা,
আজ ঘৃণা !

ভেবো না, আমি প্রলুব্ধ ঐ স্বর্গে,
তোমাদের ঐ শাল্‌মা-চুম্‌কি রাজবেশকে দেখেছি,
দেখেছি তার উপদংশ আর ক্লীবতাকে আড়াল
করার চেষ্টা ;
ভেবো না, আমি জানি না তোমাদের ঐ
নীতিবিহীন নীতি—
অন্ধ থেকে জন্ম নিয়েছে যেখানে
একশটা গোঁয়ার অন্ধ,
আর ধর্মপুত্র নিজেই যেখানে জুয়াড়ী,
কার যুদ্ধ, কেইবা জেতে,
এই রক্তাল্পতার অসুখে আক্রান্ত জগৎ,
এই স্বাভাবিকতার স্বাদ হারানো জিহ্বাগুলোর
তৃপ্তিবিহীন ক্ষুধা,
এই ব্যাধিত বিকারের রক্তপানের তৃষ্ণা,
আর এগারো অক্ষৌহিণীর উরুতে চাপড় মারা উল্লাস,
আর সাত অক্ষৌহিণীর গদা ঘোরানো আস্ফালন,
না, আমি প্রলুব্ধ নই তোমাদের ঐ স্বর্গে,

যতো ধর্ম স্ততো জয়—
শূন্যের ঘণ্টার মতো শূন্যে বেজে উঠে
শূন্যে গেছে মিশে !

॥ ৫ ॥

কী লাভ সেই তাঁতীর মায়ের
যার ছেলে গেছে যুদ্ধে ?
কী লাভ সেই জেলের বৌয়ের
যার স্বামী গেছে যুদ্ধে ?
উত্তরে দক্ষিণে কিম্বা অগ্নিকোণ থেকে নৈঋতে
কৃষকেরা মাথায় পাগড়ি বেঁধে, কাকতাড়ুয়া, নির্বোধ,
দু' একটা তীর ছুঁড়ে কি না ছুঁড়েই চিৎপাত,
তারা এগারোর দলে বা সাতের যাই হোক
কী লাভ সেই বাজা মাঠের,
কে জিতল, কেইবা হারল !

এই উপদংশ আর নপুংসকের রাজ্যে,
এই ব্যাধিত বিকারের রক্তপানের তৃষ্ণায়,
অন্ধ থেকে জন্ম নিয়েছে যেখানে
একশটা গোঁয়ার অন্ধ,
আর ধর্মপুত্র নিজেই যেখানে জুয়াড়ী,
কার যুদ্ধ, কেইবা জেতে ?
হাসতে পারলে আমি নিজেই লিখে যেতাম
প্রচণ্ড একটা প্রহসন !
নিজের মৃত্যু দিয়েই আমি রেখে যাব বরং
　　　　আমার বিদ্রূপ,
আমার প্রতিবাদ !

ছাখো, আকাশ থেকে মাটির দিকে,
ঐ সাতঘোড়ার রথ, আর পূর্বতোরণ,

নেমে এসেছিলাম আমি দারুণ একটা প্রতিশ্রুতি,
মানবী, তুমি লালন করতে পারো নি তোমার
বুকের তাপে,
ভেসে গিয়েছি তাই কালের কল্লোলে
একটা ছিন্নবৃন্ত জবার মতো তামার থালায় !

আর দিনের পর দিন আমার অতৃপ্ত পিপাসা,
দিনের পর দিন আমার অসমাপ্ত স্বপ্ন,
এই খর্ব বামন সংসার, আর তার তোষামোদ,
খেপিয়ে তোলে আমাকে শয়তানের ক্রোধে,
আমি ধ্বংস ক'রে দিয়ে যাব এই ছেলেখেলার
জয়-পরাজয়,
আর তার সাজানো আহ্লাদ, আর নকল বিরোধ,
একটা মাতাল শুয়োরের দাঁতের লাঙলে
উল্টে ফেলব আমি পাতাল,
আর, বারবার আমি আসব,
আমার অতৃপ্ত কামনা, আমার অসমাপ্ত স্বপ্ন,
ঐ সাতঘোড়ার রথ, আর পূর্বতোরণ,
শতকে শতকে আর দেশে দেশে আমি আসব,
যতোবার আমার রথের চাকা রাক্ষসী মাটি
গিল্‌বে,
যতোবার আমাকে টেনে তুলবে ফাঁসির মঞ্চে,
আর জ্বলন্ত সীসের গোলকে ঝাঁঝরা করে
দেবে শরীর,
বারবার আমি আসব,

আর মানবী, তুমি ধারণ করো সেদিন আমাকে
তোমার রক্তে,
লালন করো তোমার বুকের তাপে,

আমি তোমার ভেঙে-যাওয়া স্বপ্ন, আমি অসমাপ্ত
প্রতিশ্রুতি,
দেখো, সূর্যের মতো কবচকুণ্ডলে
দীপ্ত হব সেদিন মধ্য গগনে,
আর মাথায় তোমার সেদিন পরিয়ে দেবো না
আমি সোনার মুকুট,
শুধু হাতে তুলে দেবো ধানের গুচ্ছ,
আর পৃথিবী আমার, পৃথা,
মানবী নয়, ডাকব আমি তোমাকে সেদিন
মা ব'লে !

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে

দক্ষিণারঞ্জন বসু

সকালকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে খেতে
আমি অন্ধকারের রাজ্য থেকে বেরিয়ে এলাম।
সূর্যের আলোয় পেঁচক আততায়ীরা সব পলাতক ;
অহেতুক জরিমানা গুণতে গুণতে আমি প্রায় ফতুর।
তাই সকালকে দু' হাতে জড়িয়ে চুমু খেতে খেতেই
অন্ধকারের রাজ্য থেকে আমি বেরিয়ে এলাম।
আলোর জগতে এসেই বেশ অনুভব করতে পারছি,
মস্ত একটা আশার গাছের শেকড় ক্রমশই যেন
আমার বুক জুড়ে সর্বত্র ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে।
এই আশার গাছের শীতল ছায়ায় এবং তার শব্দের
সুরভির মধ্যে আমি আরো আনন্দে বেঁচে থাকতে চাই।
ভালোবাসার রাজসূয় যজ্ঞে যখন আমি মেতে আছি
সে সময়ে আমায় যেন আর জরিমানা দিতে না হয়।
দিনের আলোয় পেঁচক আততায়ীরা এখন পলাতক,

কড়া চোখে ঐ পেঁচকদের দূরে সরিয়ে রাখতেই হবে
আর যারা মানুষের হাড় চুষে চুষে খায় তাদেরও।
সৃষ্টির বিপুল বৈচিত্র্য থেকে, শূন্য ও অরণ্য থেকে
বিন্দু বিন্দু বিশুদ্ধ অক্সিজেন কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে
আরো অনেককাল আমি বাঁচতে চাই বলেই তো
সকালকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে খেতেই
অন্ধকারের রাজ্য থেকে আমি বেরিয়ে এলাম !
আলোর রাজ্যে এসে আমি সবার সাথে সামিল হলাম !

নেরুদার পাশে একই সঙ্গে

তরুণ সান্যাল

ঠাণ্ডা সমুদ্রের ফেনা ধারালো পাথরে ভাঙছে, পাথরের ভিতরে বাহিরে
কেমন জীবাশ্ম হয়ে দাবানল, আগ্নেয়গিরির হাড়, খাড়া শিরদাঁড়ায় আন্দিজ
নেরুদার হাত ধরে
আঙুর, জলপাই-বন, সোরার পাহাড়ে, ঘন অরণ্যের উত্তর দক্ষিণ
ছিঁড়ে চিরে

ওয়াগন, ট্রাকের সজ্জি, গান ও গিটার
দীর্ঘ খনি ধর্মঘট সাঙ্গ হলে কালো মেয়েদের হাসি সমুদ্রের হাওয়ার পাল্লায়
দেখে এসেছি কবিতার শব্দের নিভৃতে বহে যায় বড় অবলীলায়
কেমন সময়, যায় ছড়িয়ে মাটিতে বীজ
কেমন অমোঘ বিস্ফোরণে উঠে আসে ধ্বনি ডিটোনেটারের পায়ে
মুক্তি পেয়ে হেসে ওঠে ঝকঝকে তামার পাত, টিন, ম্যাঙ্গানিজ

অথচ অনেক দূরে, অনেক পশ্চিমে
প্রস্তরিত পিতামহদের মুখ স্থির চোখে চেয়ে থাকে ক্রিসমাস আইল্যাণ্ডে
বড়ো একা

ক্রমশ লিয়ানালতা সাঁড়াশি বাড়ায় মাচ্চু পিচ্চুর শিয়রে
দেবদূতেরাও বড় দীর্ঘদিন ঘুম যায় পাথরের নিষিদ্ধ ভুবনে, যায়

পিজারোর খড়্গের পিছল খাতে, কর্টেজের বন্দুকের লক্ষ্যবেধে, যায়
এলদোরেদোর সোনা ব্রিটেনে কারখানা হতে
ঢাকার মসলীন-তাঁতিদের কাটা বুড়ো আঙুলের স্তূপে
বাংলার ধানের ক্ষেতে হেস্টিংস-এর পাল্কী বেহারার বোলে
গম্ভীর বিষাদে

চিলি, তুমি ঢের দিন আমারো বুকের মধ্যে ঘুমে ছিলে
মায়া, ইউকাতান, পেরু, মেক্সিকোর পাশাপাশি শুয়ে
তোমার ঘুমন্ত মুখে দেখতাম ভারতবর্ষ, বাঙলার নিভৃত মুখ
টিয়েরা ডেল ফুয়েগোর খাড়াই শ্লেটে
দক্ষিণ সমুদ্র যত ছবি লিখতো ফেনার ছোবলে, মনে হতো
কেমন মেরুর ঠাণ্ডা জল এসে ধুইয়ে দিচ্ছে বিবেকানন্দ-রক
কেমন দক্ষিণী পুরোহিতদের সোনার প্রদীপ ঘুরছে
অ্যান্দিজে ইনকার দেশে কন্যাকুমারীর কেশপুঞ্জ ঘিরে
মুক্তা ও হীরায়

নেরুদার হাত ধরে
আলেন্দের হাত ধরে
মার্তি ও কাস্ত্রোর হাত ধরে
লাতিন আমেরিকা ঘুরতে ঘুরতে, আসি
মন্দিরে যক্ষিণীদের মাথায় প্রদীপ দেখতে দেখতে, আসি
কোয়াজিকোটল পিরামিড থেকে এক দৌড়ে পৌঁছে যাই সান্টিয়াগো,
আর
গারিবলদি ধীর পায়ে ক্রমশ দেখিয়ে দেন চলচ্ছবি, দেখি
ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, ভগৎ সিং-এর সঙ্গে
গ্রানমার অজেয় যাত্রীদের, দেখি মনকাডায় অভিষেক,
সিয়েরা মায়েস্ত্রোয় দিগ্বিজয়
প্রবল বৃষ্টির মধ্যে চলে যাই চে-র সঙ্গে বলিভিয়া
তারপর চিলি

শুনতে পাচ্ছি, আমাজান নদী বেয়ে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে চলে যায়
আদিবাসী ক্যানোর বৈঠার শব্দ

লাতি ফান্দিয়ায় কৃষ্ণকেশী রমণীর বড় বিপদ করুণ সুর
কেমন আদরে তুলে নিয়ে যায় প্যাসিফিক ভেজা লোনা হাওয়ায় হাওয়ায়
মুনরো থেকে ডালেস বা নিকসন কেমন
টেলিফোন কোম্পানির পাতাজাল আরো পাতে
কলা, আখ আনারস
তামা টিন সণ্টপিটার চলে যায়
উত্তরে উত্তরে

ঘৃণা, আক্রমণ, হত্যা
পুঁজির মন্থনে বিষ সমুদ্রের সব নীলে নীলকণ্ঠ
কেমন লাতিন আমেরিকা

যখন পুড়ছিল স্পেন
হিটলার ও মুসোলিনি
ব্রাসেলস লণ্ডন পারী লক্ষ্য করে আক্রমণ চালাচ্ছিল মাদ্রিদে, তখনো
হাসছিল কেমন যেন কিছুই ঘটেনি বলে
ব্রাসেলস লণ্ডন পারী
কেবল স্পেনের বুকে বিষ দাঁড়া ঘুরছিল ঢালছিল বিষ
ভাঙা করোটির ধুলো ছড়িয়ে ট্যাঙ্কের বিছাগুলি
তখন সমাজতন্ত্র গড়তে গড়তে তৈরি ছিল বড় একা
স্তালিনগ্রাদ মিনস্ক লেনিনগ্রাদ
সেই বিছাগুলি, সেই ভ্যাম্পায়ারগুলি
ঘুরলো, উড়লো ভিয়েতনামে
বিষ ঢালছে মোজাম্বিকে, কেপভার্দি, চিলিতে

আজ শুধু একা স্তালিনগ্রাদ নয়, আমরাও ভারতে সঙ্গে আছি
আজ শুধু একা বার্সিলোনা নয়, আমরা হাভানায়
আজ শুধু একা নই
আমরা অনেক আছি কলকাতায় মস্কো ও বার্লিনে
আমরা অনেক আছি ব্যুনোস এআর্স, পারী
ন্যু ইঅর্ক মানট্রিল হ্যানয়ে

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি
আলেন্দের বীজগুলি লাতিফান্দিয়ায় সমবায় স্বপ্নে, হার্ভেস্টার
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　কম্বাইনে
　　　ফসল ফলাচ্ছে, তুলছে ঘরে
আন্দিজের খাড়া শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে শক্ত পায়ে
　　　শাদা, কালো, লাল মানুষেরা
আ সমুদ্র এত নীল
এত ফেনা ঠিকরে পড়ে ঢেউয়ের পান্নায়
এমন বিস্তৃত শস্য সমাগমে সমুদ্র, সবুজ মাঠ এক হয়ে যায়
কেমন ঝলমল লাল দিগদিগন্তে আলেন্দের
　　　　　　　　　　　　　বড়ো ভালোবাসার পতাকা

নেরুদা, তেমন দিনে, আমাকে তোমার পাশে
　　　　　　　　একবার দাঁড়াতে দিয়ো
কৃষ্ণকেশী রমণী ও স্বর্ণকেশী বালিকার
　　　　　　　　যৌবন মিছিলে, ভিক্টোরি স্ট্যাণ্ডে ॥

মুঠোভরা খিল তার আধখানা চাঁদের গর্তে

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

কখনো আলাদা ভাবে এসব ভাবনা আসে না,
যেমন আসতে চেয়েও মুঠোভরা খিল তার আধখানা চাঁদের গর্তে
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ডুবে আছে,
তার আসা হয় না।
তারবার্তা আসে,
এসে না-পৌঁছনো পর্যন্ত খেলা পড়ে থাকে—
　　　　　　　　　　খেলা ভেঙে যায় ;

পায়ের পাতাদুটি ছিঁড়ে-আনার জন্য
হাতদুটি চিরকিশোর
স্প্রিং-ভাঙা শৈশবেরই দিকে তার পিছুটান
তাকে অন্তরীণ করেছে,
তারও আসা হয় না।

এই ভাবে শিথিল হয়ে আসে সব ;
রোদ মরে গেলে, শুকনো উঠোনের গা-থেকে ওঠে
কবেকার চেনা গন্ধ,
ঢেঁকিশালের শব্দে…যেন কার থেঁতো আঙুলের রক্ত আর দূর্বাদলে
একফোঁটা জোনাকি…
তার আলো ও ভাসমান নৈঃশব্দ্যে
নাভি থেকে পা, পা থেকে ভূগর্ভ এবং মই ও তার অন্তর্বর্তী দেশকাল
আর অবিরাম জলধ্বনির দিকে
পিতলের ঘণ্টা ও মুগুর
চালনা করে
সে-কোন হৃদয়।

সে কি বুঝে নেবে তার উপঢৌকন,
যে-ভাবে আলোবাতাসের মধ্যে
কাঁচা পয়সা হাতে কাঁতর মানুষ
বলে, মানবতা, বলে, ওয়াইফ্ এবং কখনো-কখনো
নকল হুইসিলের শব্দ ছাপিয়েও ফুকরে ওঠে ঃ
জীবন !

আর এইভাবেই তা চলে যায়…
যে-ভাবে মুঠোভরা খিল তার আধখানা চাঁদের গর্তে…ইত্যাদি।

স্ফুলিঙ্গ

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

ক্রমশ চতুর রোদ খেতখামার ছেড়েদিয়ে পশ্চিমী পল্লবে মিহি
জাল পেতে রাখে
উত্তরে ইটখোলা থেকে ঝুড়ি ও কোদাল কাঁধে ফিরে আসে নির্মল মেয়েরা
পেটের জ্বালায় সন্ধ্যা হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে মহাজন রজনীর ডাকে
কুপির আলোয় খোলে খেজুরপাতায় ঘেরা কুলিদের ডেরা,
চুরুট, ফোলিও হাতে আতরের গন্ধখানি দেখা দেয়—
খুদের জাউয়ের সঙ্গে মিশ খায় সুদ বাদে অর্ধেক মজুরি,
সেদিন যে রাত্রি ছিলো রাত্রির ডানহাতে ছিলো ছুরি।
রেশমী পাঞ্জাবী লোটে চাটাইয়ের একপাশে
অন্ধকার জ্ব'লে ওঠে সোনার বোতামে,
কবজির ডায়ালে কাঁপে আমিষাশী রেডিয়াম
সংবিধান ভিজে যায় তেজারতিঘামে—
দু'চোখে গড়ায় জল শব্দহীন, ভারতমাতার বুকে নখের আঁচড় আর
অনন্ত দেহাতি হাহাকার,
ততক্ষণে চাঁদ গেছে, বাঁকা চাঁদ, ততোধিক বাঁকা এক নদীর ওপার।
দু'ভাঁজ অশোকস্তম্ভ ওঁৎ পেতে বসেছিলো তেলচিটে বালিশের পাশে
হীরের আংটি-সাঁটা নিবাচনী থাবা জুড়ে সংসদীয় শান্তি নেমে আসে,

ওঁ

শান্তি!

রাত্রি যায় টলমল বাবুর পেছনে, আর যায় রাত্রি,—
শালবন পার হয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে রটে যায় ধারালো কাহিনী,
কেবল ছত্রিশগড়ি উল্লাসে মেয়েরা দেখে ভোরের প্রান্তর জুড়ে
ফিনকি দেয় রোদের বাহিনী।

সন্ধিপত্রে থামে না সময়

মৃণাল বসুচৌধুরী

লুণ্ঠনের ভয়ে তুমি
উপবীতে বেঁধেছো সংসার
যেন ধর্মেরই দু'হাতে থাকে সুখ
যেন শৌখিন কাঠামো ঘিরে
স্নায়ুর বিশ্রাম

অথচ কেমন
নিরুত্তাপ ধুলোর ভেতরে কাঁপে
দীর্ঘকায় মানুষের ছায়া
আয়াসবিহীন ঠোঁট
উদাসীন
শিথিল শিকড় থেকে
খসে পড়ে মাটি

সন্ধিপত্রে থামে না সময়
থামে হাত
উর্ধ্বমুখী ডালপালা ভেঙে
মাথার ওপরে রাখে
নীলিম আকাশ

এ সময়ে আমি

গণেশ বসু

পারিনি তোমার কথা মেনে নিতে, কেউ কেউ পারেনা এখনো

বুকের ভিতর থেকে উঠে আসে পাপ যেন কুয়াশার স্রোত,

দিগন্ত বিস্তৃত জলা বোবা মোষ,
কিছু স্মৃতি পায়ে পায়ে, কিছুটা অঙ্গার
বুকের ভিতর থেকে হেঁকে ওঠে, আমি
এগোতে এগোতে কোন্ খানাখন্দে, আপোষের সিঁড়ি
ভেঙে ভেঙে আর কতদূর যাবো, কোন্ দিকে
তোমারই চোখের মতো ছাদ, বিভাস আকাশ ?
হাঁটি আমি, আমারই নিজের দায়, হায় আমি
সেই শস্য, সেই রক্তকরবীর গানগুলি, বাঘের থাবায় ?

সাঁকো চলে গেছে দূরে মাকড়শার সোনালি শিয়রে
আমার নিজের তৈরি সাঁকো জুড়ে জটিলতা, পাপ
আমারই বাঁচার সাধে গ্রন্থি ছিঁড়ে কষ,
সকলে আমায় নিয়ে মেতে ওঠে মায়াবী খেলায়
সকলে আমায় যেন টেনে নেয় কোন্ এক সীমানার শেষে।
ভুলি, দীনতায় ভুলে যাই স্বপ্ন, আবেগ মনন
সামান্য বাঁচার দায়ে, হায় আমি পোষমানা ছেঁড়া মেঘ !

কে অমন হেঁকে যায় আপোষের ভিতরে আপোষ।

সাজানো পোশাকগুলো একে একে ছিঁড়ে যায় জটিল সময়ে

আত্মজৈবনিক সনেটকল্প

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

এ দেশ মুমূর্ষু ক্ষয়ে রক্তাল্পতাজনিত অসুখে মৃত্যুগামী।
বহে যায় দিনমান বৈরাগ্যে, উদাস দুঃখে, কন্দুক ক্রিয়ায় ;

তাহাদের জন্ম ভাসে জলজগুল্মাদি যেন পারাপারহীন মধ্যজলে ;
এই জন্ম তাহাদের নষ্টতায় যায়, যাবে—জেনে ওই কিম্পুরুষ পিতা
অন্তস্থ ভ্রূণের কাছে মার্জনা চাহেন।—হায় পিতৃত্ব ! স্বদেশ !
নিষ্কাম কর্মের দেশ—সন্তদের লীলাভূমি—পুণ্যতাপ্রসূত জম্বুদ্বীপ !
নিয়েছো সর্বস্ব এই জন্মলাভহেতুশুল্ক, শেখালে লোভের পরিণতি ;
আজন্ম নিরন্নে কাটে জাতকের, জন্ম, জীবলীলা সাঙ্গ পথে।

উহাদের ভোজসভা জমেছে উদ্বেগহীন গেণ্ডুয়া খেলায় ;
নরত্ব দুর্লভ, জেনে লুণ্ঠনে ধর্ষণে ধ্বস্ত করে প্রসূতির গর্ভগৃহ ;
মাটি—তার শেষ রক্ত শুষে লয়, জীবিতের শেষ বস্ত্রখণ্ড কেড়ে নিয়ে
সমাধি ভূমির স্মৃতিফলক নির্মাণ করে ; অন্নসত্র, আরোগ্য ভবন।
কিসা গোতমীর পুত্র মরে রক্তদূষণের কূট ষড়যন্ত্রে শিশুবেলা ;
সর্বস্ব লুণ্ঠনে যায়…গভীর নির্বেদে ডোবে আমস্তক পরদেশ আমার স্বদেশ।

আমি এবং মানুষ মাত্রেই

সত্য গুহ

দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য
কার কেমন পছন্দ ভেবে জামা পাল্টাতে পারি না
এবং মুখের যা গড়ন
কোনো মুখোশই খাপ খায় না

মেলায় থাকি কি মিছিলে
জাহির বাঁড়ুজ্জে রামা রায়হানের ছাঁচেই যে আমি গড়াগাঁথা
এ বুঝতে কোনো আয়নার দরকার হয় না
মানুষের রক্তের স্বাদ যারা জানে

আমার রক্তের রঙ শাদা দেখেনি—তিতো বা ঝাল বলে ফেলে দেয় নি,
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার একশ' ভাগই মনুষ্যত্ব

ভীড়ে বা নির্জনে, তা, যেখানেই থাকি
দূরের কাউকে ডাকতে আমার ভাষার দীনতা নেই
গোটা আকাশখানা নাড়িয়েই জানিয়ে দিয়েছি
আমার সঠিক অবস্থান
এবং যে শত্তুর সেও দেখতে পায়
অনন্ত নক্ষত্রবীথির তলায় আমি ও মৃত্তিকা মুখোমুখি শ্রোতা এবং আশাকার

সত্যটা সরল
প্রচলিত আইনাদি নিয়ম কানুনের বাইরে আমাদের দাম্পত্য
আমার ধ্যান এবং ধান উঠলে উৎসব করবো বলে দিন গুনছি
এবং বলতে কি
ভালোবাসা ছাড়া কোনো ধর্ম হয়
আমার অজানা

আমার ঐ এক মাত্র গর্ব এবং সে জন্যেই প্রবল প্রতাপান্বিত শত্তুরের আশঙ্কা
আমার জীবন নেয়া যায়
কিন্তু বিশ্বাস ভাঙা যায় না এবং এর ওপরও বিপদ এই
মানুষমাত্রেই তথাকথিত অবৈধ প্রেমে জোয়ার দিচ্ছে ॥

পথের দুধারে

তুলসী মুখোপাধ্যায়

প্রতিজ্ঞা রাখার মতো আর কোনো প্রতিজ্ঞা নেই পথের দুধারে
অথচ সব আয়োজন পরিপাটি আছে

ভরাট মেঘের মতো হাঁকডাক আছে
আগুনের ফুলকি আছে
স্বপ্নের মতো উদ্ভাসিত প্রতিচ্ছবি আছে
আসলে বন্‌বন্‌ তরোয়াল যেন ধুমধাম যাত্রার আসরে !

দুচোখ ধাঁধানো সেই লাফঝাঁপ দেখে
কতিপয় গাঁমানুষ ছাড়া
আর সকলেই মুখ টিপে হো হো করে হাসে
কেননা, একবার বেসিনে গিয়ে মুখ ধুয়ে এলে
ধুয়ে মুছে সাফ্‌ হয় সব আস্ফালন
ধুপ্‌ করে খসে পড়ে নকল পোশাক ।

বস্তুত বাকল ছাড়া কোনো দেবদারু গাছই নেই পথের দুধারে ।

জনৈক সৈনিকের আত্মকথন

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার হলো না বুঝি আর
আগুন হয়ে জ্বলে ওঠা
মুঠোপোরা বারুদ ফেলে
গোলাপ আমি তুলে নিলাম
সভয়ে শুইয়ে দিলাম হাতের রাইফেল
শিশুর চিবুকে রেখে হাত
বিস্মৃত হলাম আমি
মার্চ-পাস্টের কঠিন নিয়ম

মনে পড়লো সেই নারীকে
বিদায়ের ক্ষণে যার চোখের জলে
আমার ওষ্ঠে ছিল
লবনের স্বাদ
স্মৃতি তিক্ত, বিষণ্ন মুহূর্ত যায়
খোঁড়া পায়ে হাঁটে যেন উদ্ভ্রান্ত পথিক
নির্জন দ্বীপে এক
নির্বাসিত হৃদয়
হন্যে হয় ফেরে

হায় স্বাধীনতা...
তোমার নামে বন্দী আমি ক্রীতদাস
অলক্ষ্যে কখন দেখি
বুকের তলে সূর্য ঢলে পড়ে
স্বপ্ন ভেঙে চুর চুর
খসে পড়ে জীর্ণ পাতা, ফুল
স্মৃতি খান খান
অচেনা স্বদেশ আমার
পরবাসী নিজভূমে
মানুষ বলে কোন পরিচয় দেবো
জন্মে অভিশাপ

রক্তমাখা ফুল যেন
মাংসপিণ্ড গর্ভপাত জননীর
সহসা উদ্যত দেখি তাই
আমার বুকে
আমারি হাতের রাইফেল

অক্ষম আবেগ নিয়ে ব্যথাতুর আমি
বজ্র বুকে যেন আহত পাখি
ক্রোধে আগুন হয়ে জ্বলে উঠতে
ব্যথায় হলাম নীল।

পোষাক বদলে গেলে

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

কথা ছিল,
ঘণ্টা বাজলেই আমরা দৌড়ে চলে যাব প্রান্তরের দিকে।
তা ছাড়া, আমাদের কোনো দায় ছিল না, দায়িত্ব ছিল না, কিংবা
গগন চুম্বী মিনার বানাবার অঙ্গীকার।

ফলত, যে যার পোষাকে আমরা স্বচ্ছন্দ ছিলুম গাছের ছায়ায়।
উদ্যানে সংসার পেতেছিলুম পিতামহের সংলাপ শুনতে শুনতে। আর,
আত্ম-পরিচয়ের প্রয়োজনে পোষাকের পরিচয় দিতুম
সিংহের গলা নকল করে,
বাঘের থাবা দেখিয়ে,
বন্ধু ও প্রেমিকের কণ্ঠ ধার করে—
কেউবা দ্রোহী, কেউ দাতা, কেউবা বন্ধু, কেউবা প্রেমিক। আর
ঈশ্বরের অলৌকিক দণ্ড নিয়ে শাসন করতুম—একে অন্যকে।

সেদিন পুনর্মিলন উৎসবের আয়োজন হয়েছিল মহানির্বাণ মঠে।
আমরা যে যার পোষাক কুলুঙ্গিতে রেখে
প্রাচীন অনুশাসন মুখস্থ করেছিলুম মৃত নক্ষত্রের আলোয়।
এমন সময় জরুরী ঘণ্টা বাজল:
বন্ধুগণ, এবার আত্ম-পরিচয়ের পালা।
যে যার পোষাকে দাঁড়িয়ে পড়ুন।
আইডেনটিটি কার্ড পরীক্ষা করা হবে
আগ্নেয় বৃক্ষের নিচে।

সেই আহ্বানে আমাদের সতর্ক হবার কথা ছিল,
তবু কেউ কারো মুখ দেখতে পাইনি।
কুলুঙ্গিতে-রাখা পোষাক পরে—গাছের ছায়া, মহানির্বাণ মঠের আশ্রয়
যেই না ছেড়েছি,
দেখি, শত্রুর পোষাকে আমি শত্রু হয়ে গেছি,
বন্ধুর পোষাকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে গতকালের শত্রুরা,
আর বিপ্লবীর পোষাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে
কাপুরুষের দল।

তীরন্দাজ

অনন্ত দাশ

আমি তীক্ষ্ণ তীরন্দাজের মতো চরম প্রস্তুতি নিয়ে আছি
নাগালের বাইরে যে পাখি, শব্দ ও ছায়ারা ঘোরাফেরা করে
কোনদিন হাতের মুঠোয় পাবো বলে
আমুখ আশঙ্কা আর উৎকণ্ঠা নিয়ে
আমি তার প্রতীক্ষায় থাকি

প্রতিটি মুহূর্ত তাই ইতিহাস
সময় কপাল থেকে অবিরত মুছে ফেলছে ঘাম
হৃদ্‌পিণ্ডে বয়ে যাচ্ছে একটানা আগুনের স্রোত
আর ঐ পাখিগুলি ছায়াকে অতিক্রম করে
মহাকাশে মিশে যাচ্ছে
শব্দের করুণ স্মৃতি পড়ে থাকে পৃথিবীর কঠিন হাওয়ায়

আমি এই শূন্যহাতে একসাথে তুলে নিই জল ও আগুন
শিরা-উপশিরা দিয়ে বয়ে যায় শীর্ণ ছায়াপথ
জিহ্বায় নোনতা স্বাদে স্মৃতি, রক্ত, ভালবাসা নিয়ে
আমি জাগরণে আছি
বহুদিন যেন এক সমুদ্রের ঢেউ স্তব্ধ হয়ে আছে এই বুকে
যদিও এখনো বৃক্ষে ফুল নেই, পাখি নেই
ছায়া নেই, শব্দ নেই
আমি তার সম্মোহিত শিকড়ের টানে
নিজস্ব তূণীর থেকে বেছে নিচ্ছি শব্দভেদী বান।

আত্মচরিতের কবিতা

দীপেন রায়

শব্দ থেকে বেরিয়ে এসো বাইরে
বাঙলাদেশ থেকে পা রাখো ভারতবর্ষে

কয়েক লক্ষ গ্রাম হাতের কাছে ধরে এখন সময়
পায়ের বুড়ো আঙুল ভেঙে আঁক কাটছে মাটিতে
দাঁতে দাঁত ঘসে পড়ে আছে মাঠের পর মাঠ
হাত পা গুটিয়ে বসে আছে মানুষ :
দেশী-বিদেশী পুঁজির একচেটে মূলধনতন্ত্র
ঘাড় মটকে আদায় করে নিচ্ছে
বাড়ন্ত শ্রমের কড়ি
পুঁজিবাদ যেহেতু এখানে
মাকড়সার লালসায় জাল বুনে
তৈরি করছে রাজার উদ্যান।

বহু মলিন হয়ে যাওয়া অনেক হাতের ভেতর
ময়লা জমতে জমতে এখন তেজহীন বজ্রের মতো
পড়ে আছে মানুষের ছাল
ব্যবহৃত কিছু শব্দ কিছু চিত্রকল্প
কিছু উপমা
কুড়িয়ে পাওয়া অনেকদিনের এই পুরনো অভ্যাস
সামন্ততন্ত্রের দেওয়া মাদুলীর মতো
জড়িয়ে রয়েছে শরীরের ভেতরের
ক্ষোভে বিক্ষোভের ফেটে পড়া
দাউ দাউ আগুনের মুখ।

বেরিয়ে এসো বাইরে
বাঙলাদেশ থেকে পা রাখো ভারতবর্ষে।

তা হলে

তরুণ সেন

তা হলে এখানে এসো।
একদিন পাথর ভেঙেছো। গাছের সংসারে খুব নিবিড়তা ছিল

একদিন। কিছু গূঢ় কথা আস্তিত্বের খাঁজে পাওয়া যাবে
হয়ত এখনো। স্তব্ধতার মুখোমুখি হাওয়ায় হাত রেখে
বলেছিলে, একটা দেয়াল বড় প্রয়োজন।

শববাহকের কাঁধে হাওয়ার ভারটা একটু বেশী—স্বাভাবিক
এবং সঙ্গত। খুব অকরুণ মনে হয়। ফুল বেশ ভারী
আর বাসি না হলে এই উৎসবের মানেই হত না।
কেউ কেউ প্রার্থনার উচ্চারণে শুনতে পায়—নাভিকুণ্ড থেকে
একটা কোলাহল উঠে আসছে। আমাকে ওদের কেউ
ডেকে বলেছিলো এসো, ফুলে রক্তের দাগ, ধূপ ও
বারুদের এই হাত ধরাধরি দেখে যাবে।

আমি দেখেছি, যেমন লোক সমুদ্র দেখে একটু দূর থেকে।
ও ভাবেই দেখতে হয়। শব্দটা বুকের ভেতর বাজতে থাকে।

এখানে দেয়ালগুলো ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত—আমি জানি।
আমি এর স্বরূপটা বোঝার চেষ্টা করেছি, আজও করছি।
হাওয়া বড় বেহিশেবী। আমি তাকে সহিষ্ণুতা শেখাতে
পারছি না। মাটির ব্যবহার ত এমন রুক্ষ হওয়ার কথাই
ছিল না। আমারই শরীরে এত রহস্য লুকোনো
—জানতে বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। আশা
করছি আমার আবিষ্কার আমাদের কাজে লাগবে
একদিন।

আমি এখানে। একবার এসো। একটু করো হাওয়া এখানে
বন্দী। তার বুকে হাত রেখে তোমরা ঠাণ্ডা, সাদা জড়
হাতগুলো সেঁকে নেবে।

তখন দেখবে বারুদটা হাতে বেশ খেলছে। এক হাতে ফুল
আরেক হাতে বারুদ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেও কেউ আর
তখন ভেল্কিঅলা বলবে না।

অভিজ্ঞতা

রবীন সুর

এই সব অভিজ্ঞতা কেন আগুনের দীপ্রতায়
এখন ধ্রুপদী উচ্চারণে
সম্ভাবিত মিনারের মহিমায় একটি মুহূর্তের মধ্যে
দোলনার চঞ্চল হাত ট্রাফিক ব্যগ্রতা মেঘ জ্যোৎস্না বা রোদ্দুর
চিরায়ত স্তব্ধতায় স্ফটিক করে না
কেন প্রেমিকের উদ্যতসংরাগ মনোযোগ
সুরম্য শরীর থেকে উত্তীর্ণের শুদ্ধতায় বাহিরে আসে না
এখনও জিহ্বায় তেমন আশ্চর্য শব্দ পা-রাখে নি
যে-ধ্বনি ব্যঞ্জনা সংকেতে
স্থূলতম সম্রাটের আরোপিত সিংহাসন পারিষদসমেত ধ্বসাবে
না অতিমাত্রিক দিগন্তের সার্থক উদ্ধারে
এখনও পর্যন্ত
করোটি গহ্বর থেকে তামসিক অসাড়তা মুছে দিয়ে
তার ভয়ানক চক্ষুকোটরের হাড়ে নীলিমা জাগে নি
প্রাচীন জীর্ণতা ছিঁড়ে
আকাশের মধ্যে কোনো নতুন আকাশের চন্দ্রাতপ থাবায় ওঠে নি।

বরণ

শিশির সামন্ত

যদি কিছু ঘটে থাকে ভুল, এই যে মানুষ তার
পরাজয় মানে, আমাকে শেখাবে
এই যে মানুষ, তার বেদনার ক্রম পরিণতি
ছোমুখোশের অন্তরালে! সমুখ দর্পণ হাসে
স্বভাব চিনতে তার হয়েছিলো ভুল।

সেই দর্পণেই আমি বিছিয়ে রেখেছি আজ
নিজের স্বকীয় প্রতিরূপ;

আমাকে শেখালো শেষে মানুষের ভুলগুলো
চরিতার্থ আত্মনেপদী।

স্বতঃই ভাঙ্গলো ভুল, আজ এই
নীরব মনন ;
মননের কূয়া থেকে জল তোলা, অনু বুঝি
তাও এক ধরনের শ্রম,

কতো বেশী মননের পুষ্ট সেই স্তন,
ভুলভাঙ্গে, নিজের অনেক কিছু ত্যাগ করে বিপুল বরণ।

দূরতম দ্বীপের প্রতীকে

অরুণাভ দাশগুপ্ত

দুঃখ ঘিরে আছে ঢের, ঘিরে আছে তার অপচ্ছায়া—
বান্ধববিহীন এই অপরাহ্ন যার অন্য নাম নির্বাসন
এই রাত—যার রহস্যময়তা নেই, অনাঘ্রাত বড় দীর্ঘ রাত,
খাঁচাবন্দী মন, দেহ টানটান পড়ে আছে আপাদপ্লাস্টারে।

বেডের পাশেই জানলা, সেদিকে ফেরালে চোখ ভোরের রোদ্দুরে
বিশ্রামের মত স্বস্তি ছুঁড়ে দেয় গাঢ় কৃষ্ণচূড়া,
বৃথাই আড়াল খুঁজি, দৃষ্টি ফিরে ফিরে আসে ওয়ার্ডের সারি সারি বেডে
বিষণ্ণ শিশুর হাসি, মৃত্যুপথযাত্রী সেই কিশোরের মুখ প্রতিভাসে।

সেবিকার মৃদুস্পর্শে কখনো বা চৈতন্যের লুপ্ত অনুভূতি
অকস্মাৎ নাড়া দেয়, মুহূর্তেই বুজে আসে সিরিঞ্জের তীক্ষ্ম সূচীমুখে
রক্তচাপ, তাপমাত্রা পরীক্ষার পর কিছু লাল সাদা বড়ি
আনে ক্লান্তি—বোধভান্তি জুড়ে নামে বটের ঝুড়ির মতো ঘন আচ্ছন্নতা··

প্রতীক্ষারও শেষ থাকে, ঘড়ির নিয়মে তুমি উঠে আস বিষণ্ণ প্রতিমা
দুর্লভ মুহূর্ত দ্রুত কেটে যায় মৃদু সম্ভাষণে
তোমার ফেরার পথে প্রাঙ্গনের প্রান্তে নামে বিপন্ন গোধূলি
আকাঙ্ক্ষার ঝড় বুকে নিষ্পলক চেয়ে থাকি দূরতম দ্বীপের প্রতীকে।

আড়ালে উদ্‌গ্রীব নটরাজ

শুভ বসু

রাত্রি হলে, মড়ার খুলির মতো জ্যোৎস্না
ছেয়ে গেলে নিসর্গ আকাশ,
চোখের সামনে থেকে আবরণ সরে।
গৃহস্থের ঘরবাড়িগুলি তার
যথার্থ আদল নিয়ে ধরা দেয়, দেখি
খ'সে খ'সে পড়ে মেদ, মজ্জা, ঝরে
আপাত সুন্দর সব ডালপালাগুলি।
রূপ ঝ'রে গিয়ে তার কঙ্কালশরীর ধরা পড়ে। তার
আজীর্ণ শরীর থেকে মড়াদের দীর্ঘশ্বাস
পতনের শব্দ পাওয়া যায়। সেই সব শব্দ শুনে শুনে
নন্দী, ভৃঙ্গী, আর সেই পুরাণবর্ণিত সব অনুচর নামে।
দিনের অলক্ষ্যে দেখি প্রকৃতবাস্তবে ঠিক ধরা দেয় সমস্ত শহর
যত কিছু প্রতিষ্ঠিত, পুরষানুক্রমিক সুন্দর,
তাদের তাণ্ডবনাচে ভাঙে, ভেঙে গুঁড়ো হয়।
তাদের গলার থেকে হি হি হি হি শব্দ উঠে আসে।
বোঝা যায়, প্রলয়ের পূর্বাভাস এই।
এরকম অন্ধকার যে সমস্ত অনুষঙ্গ আনে
তার কেন্দ্রে থাকে সেই পুরাণপুরুষ
যার কাছে ধ্বংস আর লয়
নূতন সৃষ্টিরই অন্যনাম।

এই দেশ, আশ্বিনের প্রাচীন পয়ার

অমিয় ধর

রাত্রির কপাট খুলে ভাস্বতী সকাল
হেসে ওঠে খিল খিল মিঞা-কি টোড়িতে
আত্মহারা কিশোরীর লাবণ্যবিভাস
বিচ্ছুরিত সপ্তস্বরা রৌদ্রের জোয়ারী।
গৌরবিনী স্তনভারে অবনত শীষ
প্রত্যয়ী সুবর্ণ-চিত্রে আশ্বিনের মাঠ,
পৃথুলা নদীরা আজ প্রৌঢ় পারাবতী
মৌসুমী মেঘেরা সব প্রবাসী নাগর।
একান্ত প্রাকৃত সজ্জা, হিরণ্যকমলে
শেফালী শিশিরে স্নিগ্ধ রৌদ্র আর মেঘে
চিরপুরাতন সে যে শাশ্বত-সুন্দর
বর্ণোজ্জ্বল চিত্রপটে নীলিমায় নীল
এই দেশ, আশ্বিনের প্রাচীন পয়ার
বিশদকাশের গুচ্ছ দেয় তালে তাল।

দরজা খোলো

দুলাল ঘোষ

বুকের ভেতর কে আছো, দরজা খোলো
বাইরে বৃষ্টি, ঝড়ো হাওয়া
উথাল-পাথাল
ভেঙে পড়ছে বোধিবৃক্ষ
বুকের ভেতর কে আছো, দরজা খোলো
সারাশরীর ভিজে যাচ্ছে
গলে গলে জলের রেখা
কড়া নাড়ছি ভীষণ জোরে
শুনতে পাচ্ছো
বুকের ভেতর কে আছো, দরজা খোলো

এখন কৃষ্ণচূড়ার দিন

অজিত পান্ডে

কথা ছিলো—
শিমূল পলাশের কুঁড়িতে
রং ধরলেই
সে আসবে।
তবুও মানুষটির দেখা নেই।

এখন কৃষ্ণচূড়ার দিন
জ্যৈষ্ঠের ঝড় এসে
দরজা জানলা খুলে দিয়ে যায়
এখনো মানুষটির দেখা নেই—

আমি প্রতীক্ষায় রয়েছি
আরো একটি বসন্তের ॥

এখানেই পুর্নজন্ম

বিপ্লব মাজী

এখানেই পুর্নজন্ম ; এই মাটিরই শেকড়ে শেকড়ে জন্মদিনগুলি
ভ্রূণ হয়ে আছে ; ভালোবাসা নদী হয়ে আছে ; এখানেই
স্মৃতির রেণুতে রেণুতে যন্ত্রণা দীর্ঘশ্বাস বেদনা হাহাকার বিশ্বাস অবিশ্বাস
ঘনবাষ্পে পুঞ্জীভূত আছে ; লক্ষফণা বাসুকীও এই বুকে আছে ;

তাই পাহাড়ের ফাটলে ফাটলে বৃষ্টি নামে ; বেদনায় ডুকরে ডুকরে
কেঁদে ওঠে মাটি ; ঝড়ের আঘাতে কাঁপে ভ্রমরকৃষ্ণ চোখ ;
স্বপ্ন-সাধে থরো থরো নাচতে নাচতে উল্লাসে ছুটে যায় নদী
বেদনা ওঠে ; জন্মের মাহেন্দ্রক্ষণ ক্রমশ ঘনিয়ে আসে ; জন্ম নেয় শিশু।

রামমোহন রায় ঃ সংস্কারক ও শিক্ষাদাতা

ই. কোমারভ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের জাতীয় জাগরণের সূচনা ঘোষণা করে একটি নতুন সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এই সময়ে ভারতের যুগ-প্রাচীন সংস্কৃতির উপযুক্ত এমন একজন ব্যক্তিকে ভারত সৃষ্টি করে যিনি একজন মহান চিন্তাবিদ এবং প্রকৃতই একজন বিরল ব্যক্তিত্ব। শতাব্দীক্রমে ভারতীয়রা যে বুদ্ধিবেত্তার ক্ষমতা সঞ্চয় করেন রামমোহন রায়ের মধ্যে সেই ক্ষমতা স্পষ্টভাবে প্রকাশলাভ করে। এর ফলে তিনি মধ্যযুগীয় ভারতের ধর্ম-দর্শনের স্তর থেকে সমসাময়িক ইউরোপের প্রগতিশীল সামাজিক চিন্তার স্তরে উন্নীত হন।

সচেতন প্রবক্তা

ভারতের জাতীয় পুনরুজ্জীবন এবং তার অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রগতির পক্ষে রামমোহন রায়ই প্রথম সচেতন প্রবক্তা। রামমোহন রায়ের বিশ্ববীক্ষা এবং কর্মজীবনে সামাজিক চিন্তার ঐতিহাসিক উন্নতির দুটি সুসঙ্গত স্তর যৌথভাবে প্রকাশলাভ করে। ইউরোপে এই প্রক্রিয়াটি ঘটতে কয়েক শতাব্দী লেগেছিল কিন্তু উনবিংশ শতকের ভারতে স্তরগুলি সন্নিবিষ্ট হয়ে একটি একক সম্পূর্ণতায় পরিণত হয়। এই স্তরগুলি হল সংস্কারসাধন এবং আলোকপ্রাপ্তির যুগ।

রামমোহন রায়ের ধর্মীয় এবং সংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপগুলি তৎকালীন ঐতিহাসিক অবস্থানির্ভর ছিল। ভারতে তখন নতুন শ্রেণীগুলি গড়ে উঠছিল কিন্তু সমাজ ছিল প্রধানত মধ্যযুগীয় ধাঁচের। ধর্মীয় সচেতনতার স্বাতন্ত্র্যের জন্য যে কোন সামাজিক আন্দোলনই ধর্মীয় মতাদর্শগত রূপ গ্রহণ করত। কট্টর ধর্মের সংস্কারমূলক সমালোচনা হয়ে উঠেছিল, মার্কসের ভাষায় বলতে গেলে "যে কোন সমালোচনার সূচনা।"

ভারত ও ইউরোপে মধ্যযুগের শেষভাগে ধর্মীয় সংস্কারকরা যেভাবে জনগণকে বোঝাতেন সেইভাবে তাঁর সংস্কারমূলক প্রচেষ্টায় রামমোহন জনগণকে *ধর্মচিন্তা থেকে বাড়তি বিকৃতিগুলি দূর করে দেবার জন্য আহ্বান জানান। এর মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে তিনি নতুন সামাজিক চিন্তার প্রচার করেন যার সার মর্ম হল* মানুষে মানুষে সাম্য।

একই সময়ে রামমোহন একটি বিপ্লবী সাফল্য অর্জন করেন, কারণ ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম ইউরোপে নতুন ঐতিহাসিক পর্যায়ের তাৎপর্য বুঝতে পারেন।

এই তাৎপর্যগুলিকে তিনি ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। যুক্তিতে বিশ্বাস, বিজ্ঞান ও শিক্ষা, মানব ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব, অসাম্য এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—রামমোহন প্রগতিশীল চিন্তাগুলিকেই বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর অস্তিবাদী ধর্মীয় তত্ত্ব এবং একেশ্বরবাদের প্রচার প্রকৃতপক্ষে ছিল একটি যুক্তিবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃরূপ। মধ্যযুগের শেষভাগে ধর্মীয় সংস্কারকরা সামন্তবিরোধী সমাজ সংস্কারের জন্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁরা এসম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না বা থাকলেও অত্যন্ত কম। রামমোহন সচেষ্টভাবে হিন্দু ধর্মে "পরিবর্তনের" জন্য সংগ্রাম করেছিলেন—তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের জন্য "রাজনৈতিক এবং সামাজিক সুবিধা" আদায় করা।

সামাজিক কর্মসূচী

নারীপুরুষ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সমান সামাজিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। নারীজাতিকে সমান মর্যাদা দেবার জন্য তিনি সংগ্রাম করেছিলেন এবং নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথা রদ করতে তিনি সক্ষম হন।

নাগরিক সাম্যের আদর্শের পক্ষে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সামাজিক বিভাজনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে রামমোহন ভারতীয় জাতিকে দেশগতভাবে সুসংবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি ভারতে প্রথম আধুনিক শিক্ষা প্রচলন করেন এবং জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকতার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রথম জনসাধারণের জন্য একটি সংস্থা গড়ে তোলেন যেখানে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা গেলেও সর্বসাধারণের জন্য সভা করা হত। এই সভাগুলিতে "সর্বস্তরের মানুষ" যোগদান করত। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই ঘটনা একটি প্রতিবাদ।

একজন মানবতাবাদী শিক্ষক হিসেবে রামমোহন আন্তরিকতার সঙ্গে জন-

গণের সঙ্গে সহমর্মিতা অনুভব করেছিলেন। কৃষকদের ওপর সামন্ত এবং জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন "কৃষি শ্রমিকদের অবস্থা এমনই মর্মন্তুদ যে এই কথা ভাবলেই আমার কষ্ট হয়।" পশ্চিমের শিক্ষাদাতাদের মতই রামমোহন সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সংস্কারের কথা বলেছিলেন তার মধ্যে আপসের মনোভাব দেখা যায়। তবুও এই কর্মসূচী সামন্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধ পক্ষ নিয়েছিল। বিশেষ করে ১৮৩১ সালে তিনি বলেন যে "জমিদারদের আর খাজনা বাড়ানো নিষিদ্ধ করতে হবে।"

দুটি ধারা

রামমোহন রায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে দুইটি ধারার সৃষ্টি করে—উদারনৈতিক আপসের ধারা এবং র‍্যাডিকাল ধারার। উদাহরণস্বরূপ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও কৃষি-সমস্যাবলী সম্বন্ধে রামমোহনের আপসমূলক কর্মসূচী ভারতের নেতৃস্থানীয় জাতীয় সংগঠনগুলির কাছেও অত্যন্ত বেশি বিপ্লবী বলে মনে হয়েছিল এবং তারা জমিদারদের খাজনা বাড়াবার অধিকার আংশিক হ্রাস করার কথা বলবার সাহস-টুকু মাত্র অর্জন করে। অন্যদিকে উনবিংশ শতকের সত্তর ও আশির দশকেই অবনীচরণ দাসের মত কয়েকজন প্রগতিশীল বাঙালী নেতা জমিদারী প্রথার বিলুপ্তির জন্য দাবি জানান।

রামমোহন এমন একটি সময় তাঁর কাজগুলি করেছিলেন যখন ভারতীয় সমাজে নতুন বুর্জোয়া শক্তিগুলি প্রথম প্রকাশ লাভ করে এবং জনগণের সচেতনতা তখনও সুদূরে অপেক্ষমান। বৃটিশ রাজশক্তির প্রতি তাঁর দ্বৈত মনোভাব এই কারণে সৃষ্ট হয়। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনায় ভারতে বুর্জোয়া বৃটেনের ভূমিকা সম্বন্ধে মোহগ্রস্ত ও অস্পষ্ট ধারণা প্রকাশ লাভ করে। আসলে তিনি ভারতীয় জমিদারদের শক্তির চেয়ে বৃটিশ ক্ষমতাকে কম অশুভ বলে মনে করতেন। তিনি মনে করতেন যে ঔপনিবেশিক শাসন একটি সাময়িক ঘটনা এবং ভারতীয়রা যখন অত্যাচার ও কুশাসনকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অর্জন করবে তখন ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটবে। ঔপনিবেশিক রাজ এবং ভারতকে শোষণ করার বিরুদ্ধে রামমোহন একজন প্রথম প্রবক্তা। তিনি তাঁর জনগণের জাতীয় মর্যাদা রক্ষায় সদাতৎপর ছিলেন এবং মধ্যযুগের উত্তরাধিকার এবং

ঔপনিবেশিক শাসনজনিত চৈতন্যের দাসত্বের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এই কারণেই সামন্ত জমিদারচক্র এবং ঔপনিবেশিক শাসকবৃন্দ—ভারতের ধর্মের প্রধানরা তাঁর ক্রিয়াকলাপের তীব্র বিরোধিতা করে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, রামমোহন নিজের মত করে বুঝতে পেরেছিলেন যে বিশ্বব্যাপী প্রগতির জন্য সংগ্রামের সঙ্গে ভারতের ভাগ্যও জড়িত। তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনগুলিকে সমর্থন করেছিলেন, গভীরভাবে চেয়েছিলেন "ইউরোপ, এশিয়া এবং বিশেষ করে ইউরোপীয় উপনিবেশগুলি যাতে করে স্বাধীনতা লাভ করে" এবং জয়যুক্ত হয়। তিনি নির্দেশ করে বলেছিলেন যে "সমগ্র মানবজাতি একটি বিশাল পরিবার এবং বিভিন্ন দেশ ও জাতি সেই পরিবারেরই বিভিন্ন শাখামাত্র" এবং তাদের মধ্যে "গভীর শান্তি এবং বন্ধুত্বের বোধ" থাকা আবশ্যক।

রয়ানী পালা

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

গায়েন ॥ বাবুমশাইয়রা, আইজ যে পালা আপনাগো শুনাব, সে খুব পুরান পালা। পুরান, আবার নতুনও কইতে পারেন।

দোহার ১ ॥ এই তোমার বড় দোষ।

দোহার ২ ॥ হ, সোজা কথা কইতে পারো না।

গায়েন ॥ আমার এই ব্যাটা দুইটি বড় লায়েক হইছে, আমারে কথা শিখায়। বাবুমশায়রা, এই যে নদী, ধরেন গঙ্গা নদী কি পদ্মা নদী, এ তো বাপ-পিতামর আমল থিক্যা, কি তার আগে রামচন্দর যুধিষ্ঠিরের আমল থিক্যা বইতে আছে। খুব পুরান তো। আবার আপনি আইজ গিয়া খাড়ান নদীটার কিনারে, গ্যাখবেন—একেবারে নতুন, এই জন্মাইল, এই চলতে শুরু করল।

দোহারদ্বয় ॥ আহা নতুন পুরান হৈল, পুরান নতুন।

দো ১ ॥ বাবুমশায়রা এখন থিক্যা নতুনরে পুরান কইবেন—

দো ২ ॥ আর পুরানরে নতুন।

দো ১ ॥ বলি এই আশ্চর্য কাণ্ড কার গুণে সম্ভব হইল ?

দো ২ ॥ আমাগো গায়েনের গুণে গো গায়েনের গুণে। আমাগো গায়েন কি যে সে লোক।

গায়েন ॥ তাহলে থাক। থাক নতুন পুরানে ধন্দ।

দো ১ ॥ হ, পালার বেত্তান্তটা ধরো।

গা ॥ ধরো হে, বন্দনাটা ধরো।

দো ২ ॥ আবার বন্দনা ?

দো ১ ॥ বাবুদের অত টেইম্ নাই গো।

গা ॥ টেইম্ নাই! যেখানেই যাই খালি শুনি টেইম্ নাই। টেইম্‌গুলা কোন ছ্যাশে চইল্যা গেল। টেইমের বড় আকাল পড়ছে।

দো ২ ॥ তোমার প্যাচাল থামাও হে গায়েন।

দো ১ ॥ আসল বেত্তান্তে আইস।

গা ॥ বাবুমশায়রা, নগরের নাম চম্পকনগর। সে বড় সোন্দর নগর। সোনার বরণ যে চম্পক, সেই ফুলোমটির মতো সোন্দর। সেইখানে থাকে একটা মানুষ। তার নাম চান্দো। লাম্বা গড়ন—একেবারে দেবদারু বিক্ষের মতো—মাথাটা ওঠছে খ্যান আকাশ ফুইড়্যা। ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা ছিল। লক্ষ্মী পর্‌তিমার মতো বৌও ছিল—সনকা। জোয়ান সাত ব্যাটা ছিল। বাবা মহেশ্বরের কির্‌পায় কিছুর অভাব ছিল না।

দো ১ ॥ তোমার বন্ননাটা খাটো করো হে।

গা ॥ হ, বাবুদের টেইম্ নাই।

দো ২ ॥ তোমার সাত কাহন বন্ননাতে বাবুদের মনও নাই।

গা ॥ মন নাই! সেখানি আবার গেল কোথায় হে ?

দোহারদ্বয় ॥ বাবুদের টেইম্ নাই, বাবুদের মন নাই। টেইমের বড় আকাল গো, মনের বড় আকাল।

গা ॥ বাবুমশায়, জাউলা যখন জাল তোলে শুধু ছাঁকা মাছ কি ওঠে ? কন। চারটি শ্যাওলাও ওঠে। শ্যাওলা খাবার না, কিন্তু শোভার। তা থাক। শুনছি, কোন এক দ্যাশে নাকি এক রকমের গরু আছে, তার ওলান থিক্যা দুধ পড়ে না, একেবারে ক্ষীর পড়ে। আমিও ঐ রকম গরু হইয়া যাই, বাবু।

দো ১ ॥ একেবারে ক্ষীরটুক দ্যাও।

দো ২ ॥ বাবুদের য্যান জ্বাল দিতে না হয়।

গা ॥ চম্পকনগরে মনসার বড় পর্‌কোপ হইল।

দো ১ ॥ সপ্পকুলরানী—

দো ২ ॥ মা মনসা।

দো ১ ॥ মনসার সব্বাঙ্গ কালী বন্ন—

দো ২ ॥ লোভে আর হিংসার বিষে।

দো ১ ॥ তার শুকন্যা চুল বাতাসে ওড়ে—

দো ২ ॥ আর হিসহিস শব্দ হয়।

দো ১ ॥ তার চলনখানি বাঁকা—

দো ২ ॥ এক চলনেই এদিকও যায় ওদিকও যায়।

দো ১ ॥ তার চেখে সাপিনীর ধার—

দো ২ ॥ অনেক দূর থিক্যা য্যান না ছুইয়্যাই কাটে।

দো ১ ॥ খ্যান ছোবল ছুঁইড়্যা দ্যায়—

দো ২ ॥ চোখের চাউনিতে।

দো ১ ॥ সেই চাউনি বিন্ধ্যা লোকে অসাড় হয়।

দো ২ ॥ মায়েরা শিউর‍্যা ওঠে—

দো ১ ॥ ছাওয়ালরে বুকে আগলায়।

দো ২ ॥ তার বসনখান অজগরের বুনুনিতে বোনা—

দো ১ ॥ দেখায় বড়ই চক্কর-বক্কর।

দো ২ ॥ বুকে দেয় সবুজ চেলি—

দো ১ ॥ লউাডগায় বোনা।

দো ২ ॥ বসন আর চেলি গায়ে লেইপট্যা থাকে—

দো ১। সাপের মুণ্ডুগুল্যা শুধু চক্কর তুইল্যা গজরায়।

দো ২ ॥ তাদের নিঃশ্বাসে মাটি শুষ্যায়, আকাশ শুক্যায়।

দো ১ ॥ জিভগুল্যা ঝলকায়—

দো ২ ॥ সরু ছুরি য্যান, একশো হাজার।

দোহারদ্বয় ॥ চম্পকনগরে মনসা আইল রে, আইল। পা নাই তবু য্যান বায়ুগতি ধাইল।

দো ১॥ সেই সপ্পদেবতার পায়ে সবাই মাথা নোয়ায়।

দো ২ ॥ পূজা দেয় ঘটে ঘটে।

দো ১ ॥ কেউ মানে—

দো ২ ॥ কেউ বা না মেনে পারে না।

দো ১ ॥ কারুর ভয় অভিশাপে—

দো ২ ॥ কেউ বা বর মাগে।

দোহারদ্বয় ॥ মাথা নোয়ায় সবে মাথা নোয়ায়। মাথা নোয়ায় সবে মনসার পায়।

গা ॥ শুধু এক জনা—বিন্ধা ঘাস আর শর ক্ষ্যাতের মইধ্যে দেবদারু বিক্ষের মতো খাড়া—চান্দো সাধু।

দো ১ ॥ মনসা কয়—ঐ খাড়া মাথাটা আমি চাই।

দো ২ ॥ এত মাথা পাইছ, মনসা, আর মাথায় কী কাম?

দো ১ ॥ লতার মাথা আপনি নিচ্যা। বিক্ষের মইধ্যে যে মহীরুহ, তার মাথাটি পাইলে আমার পূজা পর্চারে সুবিধা হয়।

দো ২ ॥ মাথা নিয়ো না গো বিষময়ী, চান্দোর মাথা নিয়ো না।

দো ১ ॥ উচ্যা মাথা আমার দুই চক্ষের বিষ। চান্দো, মাথা নোয়াও।

গা ॥ চান্দো কয়—বিষময়ী, আমারে ঘাটাইয়ো না।

দো ১ ॥ পূজাটি দাও, নিশ্চিন্ত থাকো, সুখে থাকো।

গা ॥ না, আমার দেব্‌তা অন্য। তুমি তোমার মতো থাকো, আমি আমার মতো।

দো ১ ॥ আমার মতে থাকলেই তুমি থাকবা—

গা ॥ নাইলে ?

দো ১ ॥ মুইছ্যা যাবা। দ্যাখো না, সারা চম্পকনগর—

গা ॥ হ, এট্টু এট্‌টু কইর‍্যা কালো হইয়া যাইতেছে। চম্পক বরণ ছিল আমার নগরের। তোমার তো পূজার অভাব নাই।

দো ১ ॥ একটা খাড়া মাথা থাকতে আমি নিশ্চিন্ত না। মাথা—বাতির মতো। একটা থিক্যা অনেকগুল্যা জ্বইল্যা ওঠে।

গা ॥ আমার মাথার ভিতরটা এখন জ্বইল্যা ওঠতেছে।

দো ১ ॥ চান্দো, তোমার পূজা পাইলে সারা চম্পকনগর আমার দখলে আসবে। তুমি একটা মান্যগণ্য লোক।

গা ॥ তুমি দূর হও।

দো ১ ॥ চান্দো পূজা দিলে তোমার বাড়বাড়ন্ত হবে। তোমার সব আশা পুন্ন কইর‍্যা দেব আমি।

গা ॥ ঘুষ দিয়্যা তুই দেব্‌তা ভুল্যাবি, ওরে বিষমুখী !

দো ১ ॥ সুখ চাও না! সোয়াস্তি ? সোনাদানা ?

গা ॥ অন্যেরটা চাই না। ভিক্ষা চাই না। ঘুষ চাই না। বাবা ভোলানাথের কিরপায় আমার যা আছে তাতেই আমার চইল্যা যায়।

দো ১ ॥ ওর কিছুই থাকবে না। আমার বিষনজরে সব পুইড়্যা ছারখার হবে।

গা ॥ আর তো সহ্য হয় না। বাড়ি বইয়া শাপাইতে আইছে।

দো ১ ॥ রাজী হও, চান্দো। নাইলে তোমার সব যাবে—সব।

গা ॥ ওরে আমার হেতালের বাড়ি-টা আন তো, বিটীর বিষ ঝাইড়্যা দেই।

দো ১ ॥ খাড়াও, খাড়াও। আমারে তোমার এত অপছন্দ ক্যান ?

গা ॥ তুমি কানী।

দো ২ ॥ বাবুমশায়রা, চান্দো বোধহয় সেই বাইক্যটা পড়ে নাই—কাণাকে কাণা বইলো না, খোঁড়াকে খোঁড়া বইলো না।

দো ১ ॥ আমি কানী।

গা ॥ হ, কানী। তুমি কম গ্যাখো, ছোট কইর‍্যা গ্যাখো। তুমি একপাইশ্যা, একচউখ্যা। এক চোখ— অমঙ্গলের। আমার দেবতা মঙ্গলের। শিব আমার ইষ্ট।

দো ১ ॥ আমি কাণা বইলা আমারে এত অছেদ্দা। তোমার ইষ্টি দেব্‌তার কয়টা চোখ হে ?

গা ॥ তিন।

দো ১ ॥ তিন চোখ! সেটি দেবতা না অপদেবতা ?

গা ॥ এক চোখের থিক্যা তুই চোখ বেশি গ্যাখে। তিন চোখ যার সে তো ভিতর পর্যন্ত গ্যাখতে পায়।

দো ২ ॥ বাবুমশায়রা, তিনচউখ্যা দেবতা হি হি। ভূত পেরেতের সঙ্গে থাকতে থাকতে দেবতাটিও ঐ রকম কিছু হইয়্যা গেছে।

দো ১ ॥ ভূতের দেব্‌তা নিয়্যা তোমার এত অহঙ্কার!

গা ॥ আমার জীবনের সব থিক্যা বড় গৌরব।

দো ১ ॥ আমি মারলে ঐ ভূতের দেব্‌তা তোরে ঠেকাইতে পারবে ?

দো ২ ॥ যে মাইর ঠেকাইতে পারে না সে আবার কেমন দেবতা। অত তুব্বল দেব্‌তা দিয়া মাইনষের চলে ? আপনাগো চলে, ও বাবুমশায়রা ?

দো ১ ॥ তোমার দেব্‌তা ঠেকাইতে পারবে না। সে সাইধ্য তার নাই।

গা ॥ তার ঠেকানো আমি চাই না।

দো ১ ॥ চাও না ?

গা ॥ অত ছোট জিনিস তাঁর কাছে চাওয়া যায় না। কত বার কত ছোট প্রার্থনা নিয়া তাঁর কাছে গেছি। তাঁর সামনে খাড়াইয়া খ্যাবে লজ্জায় মরি। তাঁর দিকে তাকাইয়া সব ছোট প্রার্থনা মন থিক্যা ঝইর‍্যা পইড়্যা যায়। ইচ্ছাও করে না সেগুল্যা ধইর‍্যা রাখতে। তার সামনে খাড়াইয়া মনে হয়, আরো বড় কিছু চাই।

দো ১ ॥ সুখ, সোয়াস্তি, সোনা—এর চেয়্যা বড় আর কী চাইবার পারো ?

গা ॥ মনে হয়, তাঁর কাছ থিক্যা মঙ্গল চাইয়্যা নেই—সবাইর জন্ম মঙ্গল। আমার দেব্‌তা যে মঙ্গলের দেব্‌তা। তাঁর সামনে খাড়াইলে আর কিছু মনে থাকে না।

দো ১ ॥ চান্দো হে, ভাইবা গ্যাখো।

গা ॥ ভাবা আছে আমার।

দো ১ ॥ সব দিক ভাবো। মাটিতে খাড়াইয়া ভাবো। আকাশে ওড়তে ওড়তে ভাইবো না। নিজের মঙ্গল আগে ভাইব্যা গ্যাও।

গা ॥ আর, আমার ভাবনের কিছু নাই।

দো ১ ॥ তাইলে তোমার সব্বনাশ হইল।

গা ॥ তবে রে বিষমুখী! কে আছিস, দে তো আমার হেতালের বাড়ি।

দোয়ারদ্বয় ॥ চান্দোর নাশ হইল রে, সব্বনাস হইল। দেবদারু বিক্ষেব মাথে বজ্র নামিল। বিষের শ্বাসে ফুল-পাতা সব্ব ঝরিল। বিষের ঝড়ে ডালপালা সব্ব ভাঙ্গিল।

দো ১ ॥ ক্যান, সব্বনাশ ক্যান?

দো ২ ॥ শক্তিমানের কাছে মাথা নিচ্যা করতে হয়। ছোট গাছ ঝড়ে বাঁচে। এইটাই বাঁচবার কৌশল।

দো ১ ॥ যে কৌশল শেখে নাই, শেখতে চায় না—

দো ২ ॥ তার চান্দোর দশা হয়।

গা ॥ একদিন মনসার চেলাচামুণ্ডারা ঝাঁপাইয়া পড়ে—চান্দোর বাগানের উপরে। বিক্ষ ভাঙে, ফল ছেঁড়ে, ডালপাতা নষ্ট করে। আগুন জ্বালায় চাইর দিকে। দাউদাউ আগুনের মইধ্যে চান্দো হেতালের বাড়ি নিয়্যা তাড়া করে। চেলারা পালায়, কিন্তু চেঁচাইয়া কয়—

দো ১ ॥ চান্দো, মনসার পূজা গ্যাও।

গা ॥ না। যাক একটা বাগান।

দো ১ ॥ বাগান তো সবে শুরু। আরো অনেক দুঃখু আছে তোমার।

গা ॥ যে হাতে পূজিয়াছি দেব শূলপাণি, সেই হাতে পূজিব কি চ্যাংমুড়ী কানী।

দো ২ ॥ সনকা চান্দোর সামনে আইস্যা খাড়ায়। থমথম করে তার মুখ। কী যেন কইতে চায়।

গা ॥ সনকা, কোনো কথা কইস না। কান্দিস না। আবার সব হবে। আবার আমি বীজ রুয়ে দেব, আসছে সনে বিক্ষ হবে, তার পরে ফুল হবে ফল হবে।

দোহারদ্বয় ॥ চান্দো, পূজা গ্যাও হে পূজা গ্যাও, মনসার পূজা গ্যাও। কপালের অশেষ দুঃখু ত্বরিতে ঘুচ্যাও।

গা ॥ মনসার চেলারা এবার চান্দোর পশরা-ভরা ডিঙার উপর ঝাপাইয়্যা পড়ে। ডিঙা ডুবায়, পশরা লুঠ করে। চান্দো ঘরে ফেরে এক বস্ত্রে।

দো ২ ॥ সনকা গেছিল গাঙুড়ের ঘাটে। হাতে কুলা। কুলায় প্রদীপ, ধান, *দূর্বা, হলুদ। দূর থ্যাশ থিক্যা ফেরে নাও গুভেলভে—তারে বরণ করতে* হবে তো। জোকারে বাতাস কাঁপে। প্রদীপের আলো গাঙুড়ের জলে দোলে। হঠাৎ কুলা পইড়্যা যায় সনকার হাত থিক্যা। এ কী দশা তোমার সাধু? সপ্ত ডিঙা মধুকর কই? নাও-ডুবি হইছে? ঝড়ে?

গা ॥ গাঙুড়ে গেরাস করছে।

দো ২ ॥ আমরা তো গাঙুড়ের কোলে মানুষ। গাঙড় তো আমাগো খাইয়্যা ক্ষিধ্যা মিটায় না।

গা ॥ গাঙুড়ের ঢেউ ঠাস কইর‍্যা আইস্যা পড়ে চান্দোর গায়। না রে সোনা, গাঙুড়ে খায় নাই।

দো ২ ॥ তাইলে? মনসা?

গা ॥ হ, সেই রাক্কসী।

দো ১ ॥ চান্দো, শিবরে ভুইল্যা যাও। মনসায় পূজা দ্যাও। সুখে বাঁচো, সবারে বাঁচাও।

গা ॥ হে আমার শিব, তোমারে পরণাম। ধন চাই না, রক্ষণ চাই না। তুমি সব্বদা আমার স্মরণে থাকো।

দো ২ ॥ সনকা কান্দে। তার চোখের জল গাঙুড়ে মেশে। গাঙুড় ছল ছল করে—সনকার পা জড়াইয়া ধরে—কল কল কইর‍্যা কয়—কান্দস ক্যান? সনকা রে, কান্দস ক্যান? কাইন্দো না, ও সোনা বৌ, কাইন্দো না।

গা ॥ কান্দিস না রে সনকা, কান্দিস না। ডিঙা আমি আবার বানাবো। সওদায় তারে আবার ভইর‍্যা তোলব। আমার মাথা আছে, আমার হাত আছে। আমার মাথা কি একটা? না, আটটা। আমার হাত কি দুইখান? না রে, ষোলোখান।

দো ২ ॥ কী কও ছাতা-মাথা! সব হারাইয়্যা তোমার কি মাথা খারাপ হইয়্যা গেল?

গা ॥ সোনা বৌ, আমার সাত সাতটা ব্যাটা আছে।

দো ১ ॥ চান্দো, পূজা দ্যাও হে, পূজা দ্যাও। নাইলে ডুবিবে তোমার নাও। আবারো ডুবিবে। দুর্গতি ঘুচাও চান্দো, দুর্গতি ঘুচাপ। মনসায় পূজা দ্যাও। ভোলানাথরে ভুইল্যা যাও।

গা ॥ শিবো হে, আকাশের চান্দো থাকে তোমার মাথায়, মাটির চান্দো থাকে

তোমার পায়। তাই থাকবে চিরটা কাল। বহু উচ্যা খোলা আকাশে তোমার মাথা, সেইখানে চান্দো তোমার ভূষণ। শক্ত ভিতে মাটিতে তোমার পা, সেইখানে চান্দো তোমার অধীন। চিরটা কাল তাই থাকবে।

দো ২ ॥ আমার ডাইন চক্ষু কাঁপে ক্যান ? কোন অমঙ্গল বুঝি বা আসে। ওরে পোড়া চক্ষু, তুই সুস্থির হ।

গা ॥ মনসার চেলারা এক কালো রাইতে, আন্ধার মুড়ি দিয়্যা গায়, সাপের মতো নিঃসাড়ে চান্দোর বাড়তে আসে। বুকের মধ্যে থিক্যা বাইর করে বিষ, চুপিসারে খাবারে মিশায়। তাই খাইয়্যা ছয় ব্যাটা ঢইল্যা পড়ে। চান্দো চেঁচাইয়্যা ওঠে—হেতালের বাড়িটা আন তো, কানীর মাথা ভাঙি। কানীর চেলারা পালায়। কিন্তু চান্দোর ছয় ব্যাটা আর ওঠে না। ছয়খান দেবদারু বিক্ষের চারা কে য্যান ভুঁয়ে কাইট্যা রাইখ্যা গেছে।

দো ১ ॥ চান্দো, শিবরে ত্যাগ দ্যাও।

গা ॥ মঙ্গলের দেব্‌তা, তোমার কাছে মানুষের মঙ্গল ছাড়া কোনো দিন কিছু চাই নাই। আইজ চাই। তোমার অধীনরে শক্তি দিয়ো।

দো ২ ॥ উঠানে সনকা আছাড়ি-পিছাড়ি করে।

গা ॥ শান্ত হ রে সোনা।

দো ২ ॥ সনকা পাগলের পারা। খায় না, শোয় না। মুখে অন্ন নাই, নয়নে নিদ্রা নাই। চোখের জল আর থামে না সনকার।

গা ॥ সোনা আমার, কান্দিস না। তুই যত কান্দবি, তত আমার হাইর হবে।

দো ২ ॥ তবু সনকার চোখের জলে গাঙুড়ের বুক ফুইল্যা ফুইল্যা ওঠে।

গা ॥ সোনা, ক্ষ্যান্ত দে, বুক বাঁধ।

দো ২ ॥ সাধু, তুমি না কইছিলা, গাছগাছালি কইর‍্যা দেবা, সাত ডিঙা মধুকর ভইর‍্যা দেবা। ও আমার কিছু চাই না। আমার ছয় ছাওয়াল ফিরাইয়্যা দ্যাও। তুমি না সাধু, কথা দিছিলা, কথা রাখো!

গা ॥ সোনা, তুইও অবুঝ হইলে আমি দাঁড়াই কোথায়।

দো ২ ॥ সাধু, এইবার তোমার জেদ ছাড়ো, আমার বুক ভাইঙ্যা যায়।

গা ॥ জানি রে সোনা, তোর দুঃখু নিজের ভাঙা বুকের মইধ্যে জানি।

দো ২ ॥ তাইলে ছাড়ান দ্যাও সাধু, ছাড়ান দ্যাও।

গা ॥ ইষ্টদেবরে কি ছাড়ান দেবার পারি! শিবরে কি ফেইল্যা দিতে পারি ? আমি বিজয় সাধুর ব্যাটা, শিব ঠাকুরের চেলা।

দো ২ ॥ সাধু, আমাগো আর একটা ছাওয়াল আছে।

গা ॥ লখাই। আমাগো শিবরাইতের সইলতা।

দো ২ ॥ চাইর দিকে ঝড়ের দাপাদাপি। সইলতাটারে বাঁচাইয়া রাখো।

গা ॥ লখাইরে মহাজ্ঞান দেব। মরা মানুষ পরাণ পায় তাতে।

দো ২ ॥ আমার ভরসা আসে না গো।

গা ॥ লখাইর বিয়্যা দেব। ওর ছাওয়াল হবে। নাতিরেও মহাজ্ঞান দেব। ওরা বাঁইচ্যা থাকবে। মহাজ্ঞান বাঁইচ্যা থাকবে।

দো ২ ॥ তোমার মহাজ্ঞানের যদি এতই গুণ, তয় ছয় ব্যাটারে বাঁচাও।

গা ॥ তা হয় না। এ জ্ঞানের মন্তর নিজে পড়তে হয়। অন্যে পইড়্যা দিলে ফল হয় না।

দো ২ ॥ ফাতরা কথা।

গা ॥ ফাতরা কথা না। আমি ব্যাঁইচ্যা আছি কী কইর‍্যা। আমি বাঁইচ্যা আছি আমার মন্তরের জোরে। মহাজ্ঞানের মন্তর যার যার তার তার পড়তে হয়।

দো ২ ॥ তাইলে লখাইর বিয়্যা গ্যাও। ওরে মাইয়্যা গ্যাখ রে, মাইয়্যা গ্যাখ।

দো ১ ॥ গাঙুড় বাইয়্যা কত নাও আসে, আসে কত ঘটক। আসে মাইয়্যার বাপ-দাদা। কিন্তু চান্দোর মাইয়্যা আর পছন্দ হয় না। শ্যাষে এক ঘটক আইস্যা কয়—কেমুন মাইয়্যা তোমার পছন্দ গো সাধু সোন্দরী ?

গা ॥ তা চাই। লখাই আমার সোনার ছাওয়াল। তার বৌ। ছাওয়ালের পছন্দ হওয়া চাই তো।

দো ১ ॥ তন্‌খা কেমন চাও খুইল্যা বলো দেখি।

গা ॥ তন্‌খা! আমি কি ভিখারির ব্যাটা ? ছাওয়াল বেইচ্যা টাকা নেব ?

দো ১ ॥ তাইলে আর কী ?

গা ॥ শিরদাঁড়া-টা এট্টু শক্ত চাই। সহজে নোয়ায় না। মানে লতাইন্যা না।

দো ১ ॥ উজানি গাঁয়ে ঠিক এমুন একটি মাইয়্যা আছে। নাম বেহুলা।

গা ॥ উজানি! যে দিকে হাওয়ার স্রোত, সেদিকে গা ভাষায় না। নিজের মতে দাঁড়ায়। দরকার হইলে উলটা পথে যাইতে পারে। হ, এই মাইয়্যাই চাই। উজানির কইন্যাই হবে আমার ব্যাটার বৌ।

দো ২ ॥ বেহুলা সাজেরে; সানাই বাজে।

দো ১ ॥ লখাই সাজে রে, টোপর মাথে।

দো ২ ॥ আইয়োরা জোকার দেয়, গান গায়।

দো ১ ॥ শিবদুর্গার গান।

দো ২ ॥ রামসীতার আখ্যান।

দো ১ ॥ আইয়োরা পান খায়।

দো ২ ॥ ঠোঁটের রঙ রাঙা টুকটুক।

দো ১ ॥ তারা রঙ্গ করে।

দো ১ ॥ রসের কথা কয়।

দো ১ ॥ রসে ভাসে।

দো ২ ॥ সবাইরে ভাসায়।

দো ১ ॥ তারা সাজে, তারা সাজায়, কইন্যা সাজায়।

দোহরদ্বয় ॥ কইন্যা সাজেরে, সানাই বাজে।

গা ॥ এরি মইধ্যে দূরে একলা বইস্যা থাকে চান্দো সাধু। মাঝে মাঝে হাঁইক্যা ওঠে—সজাগ থাইকো হে মাইয়্যারা, বাসরে সজাগ থাইকো। সনকার পায়ে য্যান চাক্কা বাঁইধ্যা দিছে। ব্যাটার বিয়্যা বইল্যা কথা। তাও আইস্যা এটটু খাড়ায় চান্দোর কাছে। চান্দো কয়—সোনা তুই সুখী তো?

দো ২ ॥ হ সুখী। বড় সুখী আমি।

গা ॥ তয় তোর চোখে জল ক্যান রে সোনা?

দো ১ ॥ সানাই বাজে রে, সানাই বাজে। হাইস্যা হাইস্যা সানাই বাজে। বাজে রে, বাজে।

দো ২ ॥ মাইয়্যারা জল খেলাইছে, ছিট্যা লাগছে বুঝি।

গা ॥ তোর ঠোঁট কাঁপে ক্যান রে সোনা?

দো ১ ॥ সানাই বাজে রে, সানাই বাজে। নাইচ্যা নাইচ্যা সানাই বাজে। বাজে রে, বাজে।

দো ২ ॥ আর শুধাইয়ো না সাধু। ছয় ব্যাটা আমার চক্ষুর পাতায়। আমার ঠোঁটরে তারাই কাঁপায়।

দো ১ ॥ সানাই বাজে রে, সানাই বাজে। চান্দোর বাড়িতে সানাই বাজে। বাজে রে, বাজে।

গা ॥ মঙ্গল দিনে চক্ষুর পাতা ভিজাইস না রে। অমঙ্গলের ছায়া পড়ে ওতে।

দো ২ ॥ তাই, তাই গো সাধু। কই রে মাইয়্যারা, তোরা ঝিম মাইর‍্যা গেলি যে।

গান কি তোদের ফুরাইয়্যা গেল ? গা রে, জোর গলায় গা। তুব্বল লাগলে তুইট্যা খাইয়্যা নে। সারা রাত জাগবি কেমনে ? বাইত্তকররা কি ঘুমাইয়্যা পড়ল না কি ?

দো ১ ॥ সানাই বাজে রে, সানাই বাজে। নাইচ্যা গাইয়্যা সানাই বাজে। হাইস্যা হাইস্যা বাজে। চান্দোর বাড়িতে আইজ বাজে। পরাণে পরাণে বাজে। সানাই বাজে। চলায় বলায় আইজ বাজে। সানাই বাজে। আকাশে বাতাসে বাজে। সানাই বাজে। গাঙুড়ের জলে বাজে। সানাই বাজে।

গা ॥ হঠাৎ সানাই থাইম্যা যায়। বাইত্ত বন্ধ হয়। মাইয়্যাদের গলায় গান আটকাইয়া যায়। কী হইল রে, কী হইল ? ও বাসরঘরের মাইয়্যারা, তোরা থম্ মাইর‍্যা গেলি ক্যা ? কী হইছে ?

দো ২ ॥ লখাইরে কাটছে। মনসার চেলা। ছুরির মতো জিভ ঝইলক্যা ওঠছে। লখাই ঢইল্যা পড়ে।

গা ॥ শরীলে বন্ধন গ্যাও হে, বন্ধন গ্যাও।

দো ২ ॥ শিরে দংশন। বন্ধন কোথায় দেই।

গা ॥ বৈত্ত ডাক রে, বৈত্ত ডাক। এখনও টলটল করে লখাইয়ের মুখ।

দো ২ ॥ বৈত্তরা আসে। কিছু করবার পারে না। শিরে দংশন।

গা ॥ তাইলে ? লখাই ভাইস্যা যায় মরণের কূলে ? আহা, বিষের অঙ্গ পোড়াইয়ো না। গাঙুড়ের কোলে শোয়াইয়্যা গ্যাও।

দো ২ ॥ ওর বিয়্যার ব্যাশে রক্তের ছিট্যা।

গা ॥ আর উজানির মাইয়্যা ? বেহুলা ?

দো ২ ॥ বাসর-বিধবা। খণ্ড-কপালিনী। কিন্তু কপাল চাপড়ায় না। চোখে পলক নাই। মুখখান এখুন য্যান মনে হয় উমা হইছেন পঞ্চতপা।

গা ॥ - চান্দো বাজ পড়া বিক্ষ। বেহুলা ফুলের শয্যা ছাইড়্যা উইঠ্যা আইস্যা খাড়ায়। পায়ে তোড়া বাজে ঝমাৎ ঝমাৎ ঝম্। হাতে শঙ্খবালা। তার গলায় মালা মাথায় মুকুট কপালে সিঁদুর। নতুন বৌ তবু নিলাজ হইতে হয়। গহিন চোখটা তুইল্যা কয়—

দো ১ ॥ বাপো, বাঁচাবার চেষ্টা তো গ্যাখতে হয়। তারে তো গাঙুড়ে ভাসাইয়া দিবার পারি না।

গা ॥ হ, মা, হ।

দো ১ ॥ বৈদ্য ডাইক্যা আনি। ভারী নামী বৈদ্য।

দো ২ ॥ বেহুলা বৈদ্য ডাইক্যা আনে। বৈদ্য কয়—মরা মানুষ জীয়াইতে পারি।

গা ॥ জীয়াও।

দো ২ ॥ কিন্তু—

গা ॥ কিন্তু ?

দো ২ ॥ কইতে ডর লাগে।

গা ॥ কও, কও। সময় হরণ কইবো না। লখাইর অসাড় শরীর থিক্যা বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরে।

দো ২ ॥ চম্পকনগর এখন মনসার এলাকা। তার লোক ছাড়া কারুকে চিকিৎসার হুকুম নাই আমার।

গা ॥ তুমি না বৈদ্য। লোকের পরাণ দেওয়া তোমার ধর্ম। লোকে মরে আর তুমি কানী দেখাও।

দো ২ ॥ ধর্ম কোথায় আছে চান্দো। আমি বৈদ্য, আমার সামনে লোক মরে। হাত ছোঁয়াইলেই বাঁচাইতে পারি। হাত ছোঁয়ানো মানা। সে কি আমারই কম জ্বালা। তুমি শিবের লোক। তোমাগো চিকিচ্ছা করলে আমি ধনেপ্রাণে মরব।

গা ॥ তোমার মরাই উচিত। তুমি না জাত বৈদ্য! গাঙুড় সবাইরে পরাণ দেয়। সে কি কোনো ঘাটে কইতে পারে—জল দেব না!

দো ২ ॥ তা ঠিক। ধর্ম হারাইয়্যা বাঁচার কোনো মানে নাই। কিন্তু এ ছাড়া বাঁচার আর পথ দেখি না। রুগী বাঁচে, আমিও বাঁচি।

গা ॥ তুমি বাঁইচ্যা নাই। তুমি মইর‍্যা গেছ।

দো ২ ॥ চান্দো, এখন রাগের সময় না। মনসার অধীন হও। লখাই পরাণ বিন্দু বিন্দু ঝইর‍্যা যায়।

গা ॥ না, তা আমি পারি না। শিব আমার ইষ্ট।

দো ২ ॥ ইষ্টরে না ছাড়লে কোনো উপায় নাই।

দো ১ ॥ বেহুলা ডাকে—বাপো।

গা ॥ মা।

দো ১ ॥ কথা কও, বাপো।

গা ॥ আমার বাক্‌রোধ হইয়্যা গেছে, মা।

দো ২ ॥ চান্দো, সময় হরণ কইরো না। সময় আর পরাণ এক সুত্যায় বাঁধা।

গা ॥ না, না।

দো ১ ॥ কথা কও, বাপো।

গা ॥ মা, কী কথা কই!

দো ১ ॥ কথা ভাও বাপো।

গা ॥ যেই হাতে পূজিয়াছি দেব শূলপাণি, সেই হাতে পূজিব কি চ্যাংমুড়ী কানী!

দো ২ ॥ বাঁ হাতে করো। এই পাতাখানের উপর বাঁ হাতে একটা একটা সই ভাও। মনসার অধীন, এইটুকু শুধু কও। বাঁ হাতেই কও।

গা ॥ না, ও-ও ছলনা। শিবরে ছলনা করতে পারব না।

দো ১ ॥ বাপো।

গা ॥ মা।

দো ২ ॥ বিন্দু বিন্দু পরাণ করে। গাঙুড়ের জল ঝরে, আবার ভরে। মানুষের তা হয় না।

গা ॥ ওরে কালনাগিনী, তুই আগে আমারে দংশাইলি না ক্যান?

দো ১ ॥ বাপো।

গা ॥ মা, এই হাতে আমি আমার শিবরে ফুল দেই।

দো ১ ॥ বাপো, ঐ হাতে কি তুমি আমার সিঁদুর মুছবা?

গা ॥ ওরে উজানির মাইয়্যা, তোরে বুঝাই কেমনে?

দো ২ ॥ চান্দো, বাতি যখন ধুঁয়ায়, তখনও তারে জালবার পারি। একেবারে শীতল হইলে বাতি আর জ্বলে না।

গা ॥ সনকা, তুই যে কোনো কথা কস না। বৌরে বুঝি আগাইয়্যা দিছিস।

দো ২ ॥ বাতি যে শীতল হইয়্যা যায়। রাইত বুঝি বিহান হয়।

গা ॥ সোনা রে, তুই থম্ ম্যাইরা আছিস ক্যান?

দো ২ ॥ সনকা কয়—সাধু, আমার চোখের জল কোনো দিন শুকায় নাই। গাছ, ডিঙা, সোনা, রূপা—কিছু চাই না আমার। লখাইরে ফিরাইয়্যা ভাও।

দো ১ ॥ বাপো।

গা ॥ তয় নে, এই নে। বাঁ হাতখান নে। সইসাবুদ করাইয়্যা নে।

দো ১ ॥ ভাও বাপো তোমার বাঁ হাতখান।

গা ॥ তোর সিঁদুর অক্ষয় হোক মা। সোনা, আমারে এটটু ধর। আমি আর খাড়াইয়্যা থাকবার পারি না রে।

দো ২ ।। লখাই বাঁচে। বেহুলার সিঁদুর জলজল কইর‍্যা ওঠে। লখাই বাঁচে রে, সবাই হাসে।

দো ১ ।। গাছপালা, মধুকর ডিঙা, ছয় ব্যাটা—সব ফেরত দেয় মনসা। ভরভরন্ত সংসার—শাওনের গাঙুড়ের মতো। সুখ থই থই করে। সোনাদানা উপছ্যা পড়ে। সারা বাড়ি আলোয় আলো।

গা ।। শুধু একটা ঘর আন্ধার। আলো সেই ঘরের চৌকাঠ থিক্যা ফির‍্যা যায়। সেইখানে আছে, চান্দো। সেই যে পড়ছে, আর ওঠে নাই। সবুজ পাতা নাই, ফুলের সুবাস নাই, ভিতরে রস নাই। চৌকাঠ থিক্যা ফির‍্যা যায় অন্য লোকেরাও।

দো ২ ।। শুধু একজন আসে—সনকা

দো ১ ।। দিন যায়। লখাইর বাড়বাড়ন্ত হয়। আহা বড় সুখ হইল। সুখের সাগরে সবাই ভাসিল।

গা ।। সেই আন্ধারে শুধু সনকা আসে। কয়—

দো ২ ।। সাধু, তুমি আর উঠবা না ?

গা ।। চান্দো, কথা কয় না। নড়েও না। শুধু চাইয়্যা থাকে—অনেক দূরে। চোখের পাতা নড়ে না।

দো ২ ।। সাধু, তুমি আর কথা কইবা না ?

গা ।। চান্দো বুঝি শোনতেই পায় না।

দো ১ ।। দিন যায়। লখাইর ধন হয়। আহা বড় সুখ হইল। সুখের বাঁশিটি সপ্তমে বাজিল।

দো ২ ।। সাধু, তোমার কিসের অভাব ? গাছগাছালি, ক্ষ্যাত ভরা ধান, ডিঙা, পসরা, সাতমহলা বাড়ি, ব্যাটা, ব্যাটা-বৌ, নাতি—

গা ।। নাতির কথায় চান্দোর চোখের পাতা নড়ে।

দো ২ ।। সাধু, আবার বাচতে সাধ হয় না তোমার ?

গা ।। মৃত্যুর পরোয়ানায় সই কইর‍্যা দিছি আমি।

দো ২ ।। বাইরে চাইয়্যা গ্যাখো।

গা ।। তাই তো দেখি সারা দিনমান। চম্পক কুসোম আমার কালি বন্ন ধরছে।

দো ২ ।। ঐ গ্যাখো কী সোন্দর আকাশ।

গা ।। আকাশ ! বিষে নীল। সাদা সাদা দু-একটা মান্দাস। ভাসে, আবার ডুইব্যা যায় বিষের ঢেউয়ে।

দো ১ ॥ দিন যায়। লখাইর মান হয়। আহা বড় সুখ হইল। সুখের গাঙুড় শাওনে ভরিল।

দো ২ ॥ সাধু, তোমার শরীরে কিসের অসুখ ?

গা ॥ জরজর আমার শরীর। রোজ এট্টু কইর‍্যা দংশায় কালনাগিনী।

দো ২ ॥ সাধু—

গা ॥ আর আমারে সাধু কইস না। আমি সাধুর ব্যাটা অসাধু। বিজয়ের ব্যাটা পরাজয়।

দো ১ ॥ দিন যায়। লোকে লখাইর গুণ গায়। আহা বড় সুখ হইল। ব্যাটার সুখ্যাত শুইন্যা শুইন্যা সনকা হাসিল।

দো ২ ॥ সাধু, কী হইছে তোমার ?

গা ॥ জ্বইল্যা যাই, কিন্তু পুইড়্যা ছাই হই না।

দো ২ ॥ আমি তোমার উদলা গায়ে হাত বিছাইয়্যা দেই।

গা ॥ গায়ে না রে। রক্তে আমার সাপিনী দংশায়। সেখানে তোর হাত যায় না। বান্ধনেরও জো নাই। রক্তে কি দড়ির বান্ধন লাগে। সোনা, আমার সময় হইয়্যা আইছে।

দো ২ ॥ ও কথা কইয়ো না সাধু।

গা ॥ সোনা, তুই ঝুঁইক্যা আছিস আমার মুখের পর। তোর চোখে জল টলমল করে। পড়ে এক ফোঁটা। দুই ফোঁটা। পড়ে আমার চোখে। আমার মুখে চৈতী মাটিতে বিষ্টির ফোঁটা। থাক। মুছিস না সোনা। আমার চোখের জলের সঙ্গে মিশুক।

দো ২ ॥ সাধু, সুস্থির হও।

গা ॥ আর আমার স্থির নাই রে। আমি যে আমার শিবরে হারাইছি।

দো ২ ॥ লখাইরে ডাকবো ?

গা ॥ না। ভাবা ছিল, লখাইরে নাতিরে আমার মহাজ্ঞান দিয়্যা যাব।

দো ২ ॥ দ্যাও। তাগো দ্যাও।

গা ॥ আমিই হারাইয়্যা ফেলছি। আমার শিব আমারে কইছিল—মাথাটি বিকাইয়ো না। খাড়া থাইকো। হেতালে বাড়ি হাতে রাইখো। কোনো নাগিনী কোনো দিন তোমার মাথা নোয়াইতে পারবে না। বাবা আমার শূলপানি। তাঁর হাতে থাকে ত্রিশূল। আমার হাতে দিছিলেন হেতালের বাড়ি।

দো ২ ॥ ডাকি লখাইরে। তারে মহাজ্ঞান খ্যাও।

গা ॥ না। আইজ আমিও দিতে পারব না। লখাইও নিতে পারবে না। শুদ্ধ স্বার্থশূন্য ভয়শূন্য মনে দিতে হয়। নিতেও হয়। মরণের পর আমার শিব সখন শুধ্যাবে—মহাজ্ঞান হারাইলি কী কইর‍্যা? লোভে? ভয়ে? পুত্রসুখের আশায়? তখন তারে কী উত্তর দেব সোনা?

দো ২ ॥ সাধু, আমার দুঃখও কম না। বাইরে ব্যাটার কাছে যাই। তার সুখে হাসি। আর বুকে বিন্ধ্যা থাকে তোমার মুখখান। বেদনা লুক্যাই, চোখ মুছি, হাসি, সুখী হই লখাইর সুখে। তোমার ঘরে আইস্যা আমার মতো দুঃখী আর কে! তবু মনে মনে কই, লখাই আমার বাঁইচ্যা থাক, সুখে থাক। মাঝে মাঝে মুখে দম বন্ধ হইয়্যা আসে। গাঙুড়ের ঘাটে তখন চইল্যা যাই। গাঙুড়ের কলকলানি আমার কান্দনের শব্দরে ঢাইক্যা দেয়। আমার চোখের জল সে তার বুকে নিয়্যা নেয়। তার বুক ভরা জল। কত মাইনষের কান্দন। বুঝি তার নিজেরও।

গা ॥ সোনা, চোখে আন্ধার দেখি রে। পিরথিবি মুইছ্যা যায়। চম্পকনগরের শ্যাষ মানুষ মুইছ্যা যায়।

দো ২ ॥ ওগো আমার শেষ মানুষ, ওগো আমার পরথম মানুষ, আমারে সঙ্গে নিয়্যা যাও। তোমার সোনারে ফেলাইয়্যা যাইয়ো না।

দো ১ ॥ সনকা কান্দে, কান্দে রে। লখাইর সুখে সুখী সনকা, কান্দে। চান্দোর জন্যে দুঃখী সনকা, কান্দে। সোনার পালঙ্কে চিতার শয্যায়, সনকা কান্দে। গাঙুড় কান্দে।

গা ॥ বাবুমশায়রা, এইখানেই আমার নতুন পুরান পালা শ্যাষ। রজনীর গীত, তাই, এর নাম রয়ানী গান। এখন তো রজনী আন্ধার হইছে। ফেরার পথে এট্টু দেইখ্যা যাবেন। আন্ধার পথে সাপের বড় উৎপাত। দ্যাখবেন, নাগিনীতে না কাটে। পরণাম, বাবুমশায়রা, পরণাম।

———

স্বর্গ-মর্ত সংলাপ

মিহির সেন

আত্মা-টাত্মায় কোনোদিনই আমি খুব বিশ্বাস নই। স্বভাবতই, প্ল্যানচেটেও। আছে না নেই জানি না, সে রকম একটা জগৎ থেকে বিদেহী আত্মা এসে তার বক্তব্য দাখিল করে যাবে—ভাবতেও কেমন যেন অস্বস্তি লাগে।

কিন্তু সেদিন এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে এক প্ল্যানচেট বৈঠকে হাজির হতে হল। বন্ধুরও যে খুব বিশ্বাস ছিল, তা নয়। নেহাৎ কৌতুহলেই গিয়েছিলাম। একা যেতে ভালো লাগছিল না বলে সঙ্গে জুটি সে নিয়েছিল আমাকে।

আগে থেকে কিছু না বলায় অকুস্থলে হাজির হয়ে একটু হকচকিয়ে গিয়ে ছিলাম। জনা তিনেক ভদ্রলোক একটা টেবিলে গম্ভীর মুখে বসেছিলেন। আত্মা-টাত্মা নিয়েই কী যেন গভীর আলোচনা হচ্ছিল নিজেদের ভেতর। বন্ধুকে দেখে একজন বললেন, 'আসুন আসুন। আপনায় দেরি দেখে ভাবলাম আসবেন না।'

বন্ধু হেসে বলল, 'আত্মার টানেই চলে এলাম।'

উপস্থিত ব্যক্তিরা ওর এই রসিকতায় খুব খুশী হলেন মনে হল না। একজন ঘড়ি দেখে বললেন, 'চৌধুরীবাবু আসবেন তো?'

আর একজন বললেন, 'ঠিক বুঝছি না। একবার অবশ্য বলেছিলেন যে সাতটার ভেতর না এলে আর নাও আসতে পারেন।'

তৃতীয় জন বললেন, 'সাতটাতো অনেকক্ষণ হয় বেজে গেছে। ওঁর জন্য আর অপেক্ষা করে লাভ আছে?'

আমার বন্ধুটি জিজ্ঞেস করল, 'চারজন না হলে হয় না বুঝি?'

প্রথম বক্তা বললেন, 'হলে ভালো হয়। তা, আপনিই বসে পড়ুন না?'

বন্ধু সভয়ে বলল, 'ওরে বাবা, আমার দ্বারা ওসব হবে টবে না। বরং আমার এই বন্ধুটিকে নিয়ে বসুন। কি করতে হবে একটু বলে টলে দিন।'

আমি বিব্রত বোধ করি। কিছুটা কৌতূহলও। এতদিন দূর থেকে অবিশ্বাস করেছি, একবার একটু প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিয়েই দেখা যাক না। খুব বেশি আপত্তি করলাম না তাই। দু চার-বার অনুরোধের পরই টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম।

ঘরের মাঝখানে টেবিলটা। ওপরে ধপধপে সাদা একটা টেবিলক্লথ পাতা। কোণে সুন্দর একট ফ্লাওয়ার ভাসে একাগুচ্ছ রজনীগন্ধা।

একজন গিয়ে ঘরের দরজা-জানলাগুলো বন্ধ করে দিয়ে এলেন। টেবিলের ওপর এবং ঘরের চারপাশে কয়েকটা সুগন্ধী ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দেওয়া হল। কিছুক্ষণের ভেতরই ঘরের ভেতর একটা আধিভৌতিক পরিবেশ হয়ে গেল।

আমার বন্ধুটি কিছু দূরে একটা চেয়ারের বসে। কৌতুহলের সঙ্গে লক্ষ্য করে যাচ্ছে সব।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠল, আজ কাকে আনা যায়। একজন বললেন, রবীন্দ্রনাথকে আনা যাক। ওখানেও নতুন কিছু লিখছেন-লিখছেন কিনা খোঁজ নেওয়া যাবে।'

আর একজন বললেন, কী দরকার? হালে আমাদের এখানে হাতে-গরম যা সব লিখে-টিকে লেখকরা বাড়ি-গাড়ি-নাম করছে, সেগুলো সম্বন্ধে বুড়ো হয়তো এমনিতেই চটে আছে। তাদের হাতের সামনে না পেয়ে কোন আমাদের ওপরই হয়তো ঝাল ঝাড়বেন। তার চেয়ে বরং বাপুজীকে আনা যাক।

আমার উল্টো দিকের ভদ্রলোক আপত্তি জানালেন। বললেন, 'ও বুড়োকে নিয়েও তো সেই একই সমস্যা। দেশের এই ডামাডোল অবস্থায় আমরাই মেজাজ ঠিক রাখতে পারছি না। ওঁর তো দেশ সম্বন্ধে কত স্বপ্ন ছিল। পরিকল্পনা ছিল। বরং দেশ কাল মানুষ নিয়ে যাদের কোনো স্বপ্ন-টপ্ন ছিল না তাদের কাউকে আনা যাক।'

আমি বললাম, 'তা হলে বিখ্যাত, কিন্তু বর্তমানে মৃত কোনো কুস্তিগীরকে আনা হোক। ওদের এখন তো আর কোনো দেহ নেই, কোনো কারণে চটে-মটে গেলেও কোনো প্যাঁচ পয়জার করতে পারবে না। মুখে যা খুশি বলে যাক না।'

একজন ক্ষুণ্নস্বরে বললেন, 'দূর মশায় এত কষ্ট করে আনব, ওঁদেরও আসতে খুব কষ্ট হয়, এখন কারো কথা ভাবুন যিনি এলে আমরাও গর্ব বোধ করি। পাঁচজনকে বলতে পারি।'

বললাম, 'তাহলে বড় কোনো অভিনেতাকে ডাকা যাক। নেতার পর অভিনেতারাই সবচেয়ে বেশি নামডাকওয়ালা।'

প্রস্তাবটা অন্যদের মনে ধরল বোধহয়। একজন বললেন, 'সেটা মন্দ নয়। ধরুন, যদি ছবিবাবুকেই সাধ্য-সাধনা করে এনে ফেলা যায়। নাম করা অভিনেতাও, সবাই শ্রদ্ধাও করত। আর, শুনেছি রসিকও ছিলেন ভদ্রলোক।'

সর্বসম্মতিক্রমে ছবি বাবুই ঠিক হলেন। প্ল্যানচেট টেবিলে একজন মীডিয়াম প্রয়োজন হয়। যার মাধ্যমে, যার হাতে ভর করে আত্মা আসবেন। ওঁদের ভেতরই একজনের ওপর সে ভার পড়ল। তার সামনে এক দিস্তা সাদা কাগজ রেখে হাতে একটা পেন্সিল ধরিয়ে দেওয়া হল।

তারপর আমরা সবাই চোখ বুজে একাগ্রচিত্তে ছবিবাবুর মূর্তি ধ্যান করতে শুরু করলাম।

ঘরের আধিভৌতিক পরিবেশের জন্যই কিনা জানি না, কিছুক্ষণের ভেতরই আমার বহির্চেতনা কেমন যেন ঝাপসা হয়ে এল। যেন অন্য এক জগতের দিকে যাত্রা করেছি। চার দিকের সব কিছু অচেনা, অজানা।

হঠাৎ এক সময় টেবিলের একটা পায়া নড়ে উঠল।

একজন জিজ্ঞেস করলেন 'আপনি কি এসেছেন ?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আবারও প্রশ্ন, 'এসে থাকলে টেবিলের একটা পা তুলে একটু জানিয়ে দিন।'

আশ্চর্য, টেবিলের একটা পায়া একটু উঁচু হয়ে উঠে ঠকাস্ করে আবার মেঝেতে নেমে এল। কারো কৌশলে কি না জানি না।

আর একজন প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি ছবি বাবু ?'

পেন্সিল ধরা হাতটা একটু নড়ে উঠে কাগজের ওপর জবাব রাখল, হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তা কৃতার্থ ভঙ্গীতে বললেন, 'আপনার আগমনে আমরা গর্বিত। প্রখ্যাত অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের মতো একজন—'

পেন্সিলটা আবার নড়ে উঠল—আমি বিশ্বাস নয় বাবা, ব্যানার্জি। ছবি ব্যানার্জি। নিজের তাগিদেই বিশ্বাসকে বসিয়ে রেখে এলুম।

আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়। কাগজের ওপরের হস্তাক্ষরটা ভালো করে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করি, 'কোন্ ছবি ব্যানার্জি ?'

কাগজের বুকে এবার হস্তাক্ষর আরো স্পষ্ট।—ঠিকই ধরেছ গোবিন্দ, আমি তোমার দাদু।

বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'দাদু। তুমি হঠাৎ, মানে—'

দাদু লিখিত জবাব দিলেন, অনেক দিন থেকেই তোর কাছে একটা আর্জি নিয়ে আসব ভাবছিলাম। কিন্তু আসার পথ পাচ্ছিলাম না। আজ তাই সুযোগ পেয়েই চলে এলাম। থাকগে, আগে আর্জিটা পেশ করে নেই। কারণ,

আমার বর্তমান স্বদেশ—তোরা যাকে স্বর্গ বলিস—বেশিক্ষণ তার বাইরে থাকতে কষ্ট হয় আমাদের।

আমি সহানুভূতির সঙ্গে বলি, 'বেশ তো, বলো না।'

আবার পেন্সিলটা নড়ে ওঠে। কাগজের বুকে দাদুর আর্জি ফুটে ওঠে।—আমি আবার তোদের কাছে আসতে চাই। যে পবিত্র ভূমির জন্য গোটা জীবন উৎসর্গ করেছিলাম, জীবন দিয়ে শহীদ হয়েছিলাম, সেই স্বপ্নের ভূমিতে আর একবার ভূমিষ্ঠ হতে চাই আমি।

শুনে চমকে উঠি। আমরাই এখন যে ভূমি থেকে চিরতরে সরে যেতে পারলে বাঁচি, দাদু স্বেচ্ছায় সে ভূমিতে ভূমিষ্ঠ হতে চান! বেশ বুঝতে পারি এ-ভূমির হালফিল সঠিক সংবাদগুলো স্বর্গ পর্যন্ত গিয়ে পৌছায় না।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখেই বোধহয় দাদু আবার শুরু করেন।—আর, তোর ঘরেই আসতে চাই। জানিস তো আমি কেমন বেহিসেবী, বেখেয়ালী ছিলাম। নতুন, না-চেনা কোনো সংসারে গিয়ে আবার মুখ ঝামটা খাব! তার চেয়ে—

আমি সভয়ে বাধা দেই। বলি, 'তা হয় না দাদু। এদিককার হালের কোনো খবর-টবর তোমাদের জানা নেই বলে ঠিক বুঝবে না। কিন্তু—'

দাদুর ক্ষুব্ধ জবাব আসে, কেন হয় না? বৌমার কচি বয়স। বিয়ের পর তিন বছরের ভেতর মাত্র দুটি বাচ্চা হবার পর এই পাঁচ বছর তো ঝাড়া হাত পায়েই বসে আছে। আমি এলে কি এমন ঝামেলাটা হবে শুনি?

বৌমার কচি বয়স হলেও বুদ্ধি কাঁচা না। ওর পরামর্শ আর উৎসাহেই আমাদের সংসার এখন লাল ত্রিকোণের সীমারেখায় আবদ্ধ। ও কি রাজী হবে জীবনে কোনোদিন দেখে নি যে দাদাশ্বশুরকে তার আবেদনে এই বাড়তি ঝামেলা ঘাড় পেতে নিতে?

তাই অন্য দিক দিয়ে দাদুকে নিরস্ত করার চেষ্টা করি। বলি, 'তুমি আসবে, এতো আনন্দের কথা দাদু। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তুমি ইংরেজের হাতে প্রাণ দিয়ে শহীদ হয়েছিলে বলে আজও পাড়ার প্রবীণরা আমাদের বাড়িটার দিকে সশ্রদ্ধ ভাবে তাকান। কিন্তু আমাদের দারিদ্র্যের সংসারে এসে তোমারই কষ্ট হবে দাদু।'

দাদু শুনে অবাক হন।—সেকি, বুকের রক্ত দিয়ে তোদের স্বাধীনতা এনে দিলাম, এখনও দারিদ্র্য কেন? না কি, ঠাঁট বাট খুব বাড়িয়ে ফেলেছিস তুই, মাইনে পাস কত?

বললাম, 'একএক সময় একএক রকম।'

— মানে? কোনো ধরাবাঁধা মাইনে নেই এখন?

বললাম, 'আছে, আবার নেইও। ধরো, আমি মাইনে পাচ্ছি চার শ' টাকা। কিন্তু ব্যবসায়ীরা কালকেই যদি রাতারাতি জিনিসপত্রের দাম চারগুণ বাড়িয়ে দেয় আমার সত্যি মাইনে কমে হয়ে যাবে এক শ' টাকা। কারণ টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে যাচ্ছে।'

দাদু বললেন, কিন্তু ব্যবসায়ীরা তো আর সত্যিই ইচ্ছে হলেই দাম বাড়াতে পারে না? এখন তো আর মগের মুল্লুক নেই?

বললাম, 'পারে দাদু। পারছে। এক দাম একঘেয়ে লাগলেই ওরা দামটা পালটে দেয়। বাড়িয়ে পাঁচগুণ দশগুণও করে দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাইনের টাকার দামটাও কমে যায়। একটা প্রত্যক্ষ হিসেবই ধরো না ১৯৬২তে টাকার যে দাম ছিল, মানে, ক্রয়ক্ষমতা, এখন, '৯৭৩এ তার মূল্য দাঁড়িয়েছে মাত্র পঁচিশ পয়সা।'

দাদু বললেন, দাঁড়া, দাঁড়া। আমার ঠিক মাথায় ঢুকছে না জিনিসগুলো।

ওষুধ ধরেছে দেখে আমি আর এক ধাপ এগিয়ে যাই। বলি, 'তাছাড়া টাকার কথা ছেড়ে দিলেও এসে উঠবে কোথায়? দেশে এখন দারুণ গৃহ সমস্যাও। আমরাই ছোট ছুটো ঘরে কোনোরকমে মাথা গুঁজে আছি।

দাদু একটু সন্দেহের সঙ্গে জানালেন, কিন্তু আমাদের যে স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা ছিল, তাতে তো এ হবাব কথা নয়? সত্যি কথা বল তো, তুই কি আমাকে এড়ানোর জন্য এসব ভয় দেখাছিস?

আমি জিভ কেটে বললাম, 'ছি, ছি, এ-কথা কেন ভাবছ দাদু? আমার কথা বিশ্বাস না হয়, একটা সরকারী হিসেবই নাও না। এই কলকাতায় আমাদের মাথা গোঁজার জন্য ১৯৮৬ সালের ভেতর ১৩ লক্ষ ইউনিট বাড়ির দরকার। মানে বছরে ৫৩ হাজার ইউনিট। সেখানে গত দশ বছরে আমরা কটা বাড়ি তুলেছি জানো? মাত্র ছয় থেকে নয় হাজার ইউনিট।

কাগজের ওপর দাদুর মন্তব্য এবার কিছুটা বিমর্ষ যেন।

—তাহলে সত্যিই তোরা একটু অসুবিধের ভেতরই আছিস দেখছি। তবে, তুই তো জানিস, আমার বরাবরই কষ্টবোধটা ভীষণ কম। ও আমি ঠিক ম্যানেজ করে নিতে পারব। তুই আপত্তি করিস না দাদুভাই!

আমি সবিনয়ে বলি, 'আপত্তি আমার নিজের জন্য নয় দাদু। এই পঁচিশ

বছরে আমাদের অদ্ভুত, অলৌকিকও বলতে পারো। একটা সহ্য শক্তি তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি এলে তোমারই পদে পদে অসুবিধে হবে।'

দাদু বললেন, আর কিসের অসুবিধে ?

বললাম, 'কিসের নয় ? একেবারে শুরু থেকেই ধরোনা। তোমার ভূমিষ্ঠ হতে গেলে একটি ভূমির দরকার তো ? তোমাদের সময়ের মতো নিজ বাসভূমে প্রসব এখন উঠে গেছে। তোমায় প্রসবিত হতে হবে হাসপাতালে। কিন্তু ইদানিং আমাদের হাসপাতালের যা অবস্থা তাতে আমরা অনেকেই আত্মীয় স্বজনদের বলে রাখি, অজ্ঞান অবস্থায় ছাড়া ওদিকে নিস না। তাহলে আতঙ্কে পথেই মারা যাব। তোমরা তো সেকালের স্বাধীনতা সংগ্রামী, জন্মেই হয়তো রেগে একটা তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে। তারপর, জন্মানোর কদিন পর থেকেই তোমার জন্য দুধ বা বেবিফুড দরকার হবে। কিন্তু একমাত্র গরুর বাঁট ছাড়া এখানে ইদানিং খাঁটি দুধ পাওয়া যায় না। ভেজাল বেবিফুডও যখন তখন বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়।'

দাদু বললেন, কেন ?

—'দাম বাড়ানোর জন্য। ব্যবসায়ীরা মাঝে মাঝেই দাম বাড়ান কিনা।'

দাদু একটু অবাক হন—সে কি ? ইচ্ছে হলেই দাম বাড়াবে ? সরকার কিছু বলে না ?

বললাম, 'বলার ইচ্ছে হয়তো থাকে। কিন্তু বলতে গেলেই ব্যবসায়ীরা রেগে সব মাল বাজার থেকে কোথায় যেন সরিয়ে দেয়। শিশুরা তা অবোধ, কিন্তু শিশুর বাবাদের তখন যা অবস্থা হয় না! ইচ্ছে হয়, শিশুটিকে আবার মাতৃগর্ভে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

দাদু বললেন, তা, এদের শাস্তি দেওয়া হয় না কেন ? নেহেরুজী তো সেই কবে ফরমান জারী করে দিয়েছিলেন, এইসব চোরাকারবারী আর মজুতদারদের লাইট-পোস্টে ঝুলিয়ে দেওয়া উচিত।

আমার মুখোমুখি বসা ভদ্রলোক বললেন, 'ওটাতো কথার কথা। গণতান্ত্রিক দেশে তো আর সত্যিই বিনা বিচারে ওভাবে কাউকে লটকে দেওয়া যায় না।'

দাদু রাগতভাবে জানান, বেশ তো, বিচার করেই শাস্তি দেওয়া হোক।

আমার মুখোমুখি ভদ্রলোক কোন দলের, কি করেন, কিছুই জানি না বলে বিষয়টা ধামাচাপা দেবার জন্য বললাম, 'ধরতে পারলে বিচার হবে না কেন ?

তবে, ওরা এত চালাক যে ধরাই যায় না। ধরতে পারলে অবশ্য, যতদূর শুনেছি, ছয় মাস পর্যন্ত জেল বা হাজার দু-তিন টাকা ফাইনও করা যায়।'

দাদু সবিস্ময়ে বললেন, মাত্র ?

আমি ও কথায় জবাব না দিয়ে আরো এগিয়ে যাই। বলি, 'ধরো, তোমার নাত-বৌ যদি রাজীও হয়, তুমি বড় হবার পর আছে শিক্ষা সমস্যা। তোমাকে তো আর নিরক্ষর রাখতে পারব না।'

দাদু অবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, নিরক্ষর। দেশে এখনও নিরক্ষর আছে নাকি ?

বললাম. 'আছে। গোটা দেশে এখনও শতকরা সত্তর জনই নিরক্ষর। আর, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশই এখনও অক্ষর জ্ঞানে পৌছাতে পারে নি।'

দাদু বললেন, অসম্ভব। স্বাধীনতার, গণতন্ত্রের প্রধান স্তম্ভই তো শিক্ষা।

দাদুকে উত্তেজিত দেখে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বললাম, 'না না, স্তম্ভটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, একটু বেঁকে, এই যা! যেমন ধরো, ১৯৬১ থেকে ৭১ —এর মধ্যেই রাজ্যে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ৫৫ লক্ষ বেড়ে গেছে।'

দাদু বললেন, তাহলে কি বিদ্যালয়-টয় সব উঠে গেছে ? –

বললাম, না, না, বিদ্যা লয় পেতে বসলেও বিদ্যালয় প্রচুর বেড়েছে। কষ্ট করে আর পড়াশুনা করতে হয় না বলে ছাত্রদেরও দারুণ ভীড়। একটু নামকরা স্কুলে ভর্তি করতে হলে আমরা আজকাল গর্ভে সন্তান আসা মাত্র ছেলেদের, মেয়েদের, দুটো স্কুলেই এ্যাপ্লিকেশন করে রাখি।'

দাদু একটু বিভ্রান্ত বোধ করেন যেন—দাঁড়া, দাঁড়া। আমার হিসেবটা মিলছে না। তা, স্কুলে পড়াশুনা না হলে ছাত্ররা পাশ করে কি করে ?

হেসে বলি, 'গণতন্ত্রের পথে। গণ টোকাটুকি করে।'

—শিক্ষকরা কিছু বলেন না ?

বললাম, 'না, যা বলার আজকাল ছাত্ররাই বলে। শিক্ষক বা গার্ডরা পরীক্ষার হলে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে গেলে কথাটা শেষ করতে হয় হাসপাতালে শুয়ে। অনেক সময় সে সুযোগও পান না তাঁরা। মৃতরা কথা বলতে পারে না বলে।'

কাগজের বুকে দাদুর কলম থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। আমার উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। কথাটা আর থামাই না তাই।

—'ধরো, ঐ গণতান্ত্রিক পথে পাশ করে বেরুলে তুমি। কিন্তু পরদিন থেকেই আর এক সমস্যা। বেকার সমস্যা। সে এক অসহ্য যন্ত্রণা দাদু।'

সাদা কাগজে দাদুর সরস জবাব গড়িয়ে যায় এবার।

—বুঝেছি, তুমি আমার সঙ্গে রসিকতা করছ দাদুভাই। কর্মবিমুখ একটা-দুটো লোক চাকরিবিহীন থাকতে পারে কিন্তু বাপুজীর পরিকল্পিত সেই স্বাধীন ভারতবর্ষে—

আমি বাধা দিয়ে বলি, 'না দাদু, বিশ্বাস করো। ঠিক আছে, আমার কথা বিশ্বাস না হয়, থোক সরকারী বিবরণটাই নাও। হালে লোকসভায় আমাদের শ্রমমন্ত্রীই বলেছেন, ১৯৭৩ সালের গত মে মাস পর্যন্ত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত বেকার সংখ্যাই আমাদের দেশে ৭৪ লক্ষ। ১৯৭০ সালেও এ সংখ্যাটা ছিল ৪০ লক্ষ। ৭১-এ বেড়ে হয়েছে ৫১ লক্ষ। ৭২-এ এসে হয় ৬৯ লক্ষ। অবশ্য ভগবতী কমিশনের হিসেবে সংখ্যাটা আরো অনেক বেশি। ২ কোটির কাছাকাছি। ৭০ থেকে ৭৩ এর বেকার বৃদ্ধি হারটা হিসেব করে দেখো তাহলে, তুমি জন্মে শৈশব কৈশোর পেরিয়ে চাকুরিক্ষম যৌবনে পৌছাতে পৌছাতে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। তখন তো তোমার বাবার, অর্থাৎ আমার, রিটায়ার্ড অবস্থা। সংসার চলবে কি করে? খাবে কি?'

দাদু এবার কেমন যেন চুপসে যান। কাগজের ওপর থেমে থেমে চলতে শুরু করা দাদুর হস্তাক্ষরও কাঁপা কাঁপা।

— আমার সমস্ত হিসেব কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে গোবিন্দ। তাহলে স্বাধীনতার জন্য আমরা যে রক্ত দিলাম সেই রক্তেই কি কোনো দোষ ছিল? না হলে তোদের এ-দশা হবে কেন?

আমি এবার বিব্রত বোধ করি। আপন সামর্থ্যে জীবিত কোনো স্বজনেরই উপকার করার ক্ষমতা নেই আমার। কিন্তু আপন পুণ্যে যিনি স্বর্গে গিয়ে একটু শান্তিতে আছেন তাঁর শান্তিভঙ্গের নিমিত্ত হতে মন চায় না।

বলি, 'নানা, সবার এ দশা হবে কেন? লোকে কিছুটা কর্মবিমুখও হয়ে গেছে দাদু। এরই ভেতর যাঁরা কর্মযোগী, করিৎকর্মা তাঁরা অনেক উন্নতি করেছে। যেমন, টাটা, বিরলা এঁদের কথাই ধরো না। গত পঁচিশ বছরের মধ্যে এঁরা ৫০ কোটি টাকা থেকে আজ প্রায় এক হাজার কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছেন। এটা কম কথা নয়। দোষ দাদু আমাদেরও আছে।'

দাদু কেমন যেন বিভ্রান্ত তবু। —কি জানি, আমার হিসেব মিলছে না তবু।

ভন্টু যে আমাকে অন্যরকম কি সব কথাবার্তা বলল।

বললাম, 'ভন্টু কে ঠিক জানি না। কিন্তু বিশ্বাস করো, তুমি আমাদের কাছে আমার জন্য যতটা উৎসুক, আমাদের শতকরা নব্বই জনই আজ তোমাদের কাছে যাবার জন্য তার চেয়ে অনেক বেশি উৎসুক। তোমার নাত-বৌকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি রাজী করতে পারিও, তুমি এসে বড় কষ্ট পাবে দাদু। তোমার মঙ্গলের জন্যই বলছি।'

কাগজের ওপর দাদুর পেন্সিলটা কিছুক্ষণ থেমে থাকল। বুঝলাম, দাদু মনস্থির করতে পারছেন না।

একটু বাদেই কাগজের উপর পেন্সিলটা দ্রুত নড়ে উঠল।

—একটু বস তো, আমি আসছি।

দাদু কোথায় গেলেন ঠিক বুঝলাম না। দেশটা এক পাক ঘুরে সরজমিনে পরীক্ষা করে দেখে আসতে, না কি, স্বর্গের কোনো মহাত্মা শহীদ বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করতে, কে জানে।

একটু বাদেই কাগজের উপর পেন্সিলটা আবার নড়ে উঠল। দাদুর সিদ্ধান্ত ফুটে উঠল কাগজের বুকে—তবু আমি আসব, বুঝলি?

একটু অবাক হয়ে বললাম, 'কেন কেন?'

—ভন্টুর কাছ থেকে সব শুনে এলাম।

—'ভন্টু কে?'

—এই গত মাসে তোদের ওখান থেকে আসা একটা মস্তান ছেলে।

একটু অবাক হয়ে বললাম, 'তা, তোমাদের স্বর্গে ঢুকল কি করে? গেটে কেউ বাধা দেয় নি?'

দাদু জানালেন দিয়েছিল। কিন্তু ভন্টু শুধু একবার চোখ পাকিয়ে বলেছিল নাকি, 'সাবধান. লাশ পড়ে যাবে যে!

বললাম, 'তাতেই গেট ছেড়ে দিল দারোয়ান?'

দাদু বললেন, হ্যাঁ। লোকটি সৃষ্টির আদি থেকে ঐ পোস্টেই আছে। কিন্তু এই ভাষা ও ভঙ্গীতে নাকি কোনোদিন কাউকে ধমকাতে শোনেনি ও। ভয়েই তাই কেমন হকচকিয়ে গিয়েছিল। সেই ফাঁকে ভন্টু ভেতরে ঢুকে পড়ে। ওকে এখন এখানে সবাই খুব সমীহ করে।

বললাম, 'আমরাও করতাম। তা, শ্রীমান ভন্টু কি বলল তোমাকে?'

দাদু বললেন, ও তোর কথাগুলো অস্বীকার করল না। কিন্তু হেসে বলল,

আপনার নাতি শালা একটু বুদ্ধু মার্কা আছে বোধ হয় দাদু। খাদ্য সমস্যা, বেকার সমস্যা, আর্থিক সমস্যা, মানে, লাইফের সব সমস্যা আছে দেশে, কেউ ডিনাই করছে না। কিন্তু তার সঙ্গে লাইফের সুখ, উন্নতি এসবের কি সম্পর্ক? এখন স্কুলে না গিয়ে, চাকরি না করেও সুখে থাকা যায়। আর, সত্যি সুখের লাইন সেটাই।

আমি কৌতুহলে জিজ্ঞেস করি, 'কি লাইনের কথা বলল ও?'

দাদু বললেন, মস্তানি। একমাত্র মস্তানির লাইনেই নাকি আজকাল সুখে থাকা যায়। কিন্তু দিনকাল পাল্টে গেছে বলে আজকাল শুধ্ মস্তানিতে ঠিক হয় না, হাওয়া বুঝে কোনো রাজনীতির দলে ভিড়ে পড়তে হয়। ব্যস, রাজার হালে খাও আর ঘুরে বেড়াও। অবশ্য চোখ সব সময় খোলা রাখতে হবে। হাওয়া কোনদিকে পাল্টাচ্ছে সেটা ওয়াচ্ রাখতে হবে।

একটু থেমে সোৎসাহে জানালেন দাদু, ভন্টু আমাকে খুব উৎসাহ দিল। বলল, চলে যান দাদু, এই মওকা ছাড়বেন না। আপনার ল্যাণ্ড করতে তো দশমাস দশদিন লেগে যাবে, তার ভেতর আমি আপনাকে তালিম দিয়ে তৈরী করে দেব। তুই আর আপত্তি করিস না গোবিন্দ। বৌমাকে বলে কয়ে আমার এই ছোট্ট সাধটুকু পূর্ণ করে দে ভাই।

আমি আর আপত্তি করতে পারলাম না। কিন্তু ব্যাপারটা দ্বিপাক্ষিক। তাই ওঁর নাতবৌয়ের সঙ্গে আলোচনা করে ফাইন্যাল কথাটা পরের মিটিং-এ জানিয়ে দেব বলে সেদিনের মত বিদায় নিলাম।

অবশ্য আমি স্থির নিশ্চিতই ছিলাম, নিজের সামর্থ্যে যে সুখ দিতে পারি নি অণুকে, মস্তান দাদুর দৌলতে সে সুখ এখন মাফৎ জুটে গেলে গররাজী হবে না ও।

বয়সে কচি হলেও বুদ্ধিতে তো আর কাঁচা নয় দাদুর নাত-বৌটি!

জেল থেকে বলছি

সৌর ঘটক

ভোর হয়েছে? মনে হল বাইরে যেন কাক ডাকল?

কে জানে? আমার ত কিছু বোঝার উপায় নেই! আমার কাছে দিন আর রাত সব সমান! সব অতল অন্ধকারে ঢাকা!

লালবাজার লক আপের যে সেলটায় আমি আছি এটা একটা ঘরের মধ্যে ঘর। এর সামনের দিকে বারান্দার মত চওড়া করিডোর। পাহারাদার সিপাই একটা রুল হাতে করে বুট জুতো পরে খটখট করে তার সামনে দিয়ে পাহারা দিয়ে যায়। আবার পেছন দিকেও বোধ হয় একটা এই রকমই বারান্দা আছে। সেখান থেকেই ঐ রকম জুতোর খট্‌খট্‌ শব্দ শুনি।

আমার সেলের পেছন দিকের দেওয়ালের মাথায় একটা ছোট ঘুলঘুলি আছে। সেখান দিয়ে দিনের আলো আসে না, আসে বিদ্যুতের আলো। এখানে আমি ত বাইরের কোনো শব্দ শুনতে পাই না। শুনি পাহারাদার সিপাইয়ের পদচারণার শব্দ, মাঝে মাঝে শুনি অন্য সিপাই কি এখানকার অফিসারদের টুকরো টুকরো কথাবার্তা। আর শুনি আমার আশে পাশের সেলের বন্দীদের আর্ত চিৎকার, গোঙানি, মাঝে মাঝে অসংলগ্ন কিছু কথা বার্তা।

তারাও নিশ্চয়ই আমার গোঙানি শোনে। গোঙাই বইকি আমি! প্রচণ্ড গোঙাই! প্রচণ্ড কাতরাই! আমার কাতরানির শব্দ আমি নিজেই শুনতে পাই ত পরে শুনবে এ আর বিচিত্র কি?

বাবা তুমি যদি তোমার খোকনকে এখন দেখ তাহলে চিনতেই পারবে না? এ আমি দিব্যি করে বলতে পারি! আমার সে পাতলা ছিপছিপে চেহারা আর নেই। প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে মারের পর মার খেতে খেতে আমার সারা দেহের মাংস থেঁথলে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে। আমার চোখ দুটো ফুলে উঠে ঢাকা পড়ে গিয়েছে, আমি আর ভাল করে তাকাতেও পারি না, তাকালেও দেখতে পাই না একেবারে! ঘুঁষির পর ঘুঁষিতে ওপরের পাটির সব কটি দাঁত ভেঙে

গিয়েছে। ঠোঁট ক্ষতবিক্ষত। খানিকটা কেটে ঝুলে পরেছে। সারা মুখে শুধু চাপচাপ শুকনো রক্ত, দিনরাত সেটা চরচর করে। আর ব্যথা! বলতে পারব না। আর আমার ব্যথা লাগে না। মুখের মত সর্ব্বাঙ্গও কেটে ফুলে এমন হয়েছে যে সব অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গিয়েছে।

বাবা মানুষ বিপদে পড়লে মা মা বলে ডাকে। কিন্তু আমার খালি মনে পড়ছে তোমার কথা? কেন বলত? খালি মনে মনে হচ্ছে মরবার আগে তোমার কোলে যদি একবার মাথা রেখে শুতে পেতাম! তুমি যদি আমার সারা গায়ে একবার হাত বুলিয়ে দিতে তাহলে হয়ত আমার সব ব্যথা সব যন্ত্রণা দূর হয়ে যেত।

আমার এই ছোট্ট সেলের মধ্যে কোনো বাল্ব নেই। বাইরে করিডোরে যে বাল্ব আছে তারই আবছা আলো এসে পড়ে আমার ঘরে। আজ এই ক্ষত বিক্ষত দেহ নিয়ে অর্ধঅচেতন অবস্থায় এই অস্পষ্ট অন্ধকারে বার বার শুধু মনে হয় তুমি বুঝি আমার সেলের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছ আর আমি তোমার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করছি। শেষের দিকে—তুমি বারবার বলতে ডোণ্ট মিকস ষ্টুপিডিটি উইথ রেভোলিউশন! নিজেদের মূর্খতার সঙ্গে বিপ্লবকে ঘুলিয়ে দিও না। এখন ভাবি সত্যই কি আমি বিপ্লবী নীতির সঙ্গে নিজের মূর্খতাকে ঘুলিয়ে ফেলে দিলাম।

বাবা আমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগের অন্ত নেই। আমরা রাস্তার নিরীহ ট্রাফিক পুলিশ খুন করেছি। জোতদার মজুতদার চোরাবাজারীদের গলা কাটার নাম করে আমরা বড়দের গায়ে হাত দিইনি। মেরেছি ছোটদের। একজনও ক্যাপিট্যালিস্ট, একজনও বড়বাজারের কোটিপতি মজুতদারের গায়ে আমরা আঁচড় দিই নি। এমন কি এ দেশের সন্ত্রাসবাদীরা যেমন ভাইসরয়, গভর্নর, পুলিশ কমিশনারকে হত্যার চেষ্টা করেছিল তা না করে আমরা খুন করেছি কিছু নিরীহ কনেস্টবল। আমরা দেওয়ালে লিখেছি 'গলাকাটা চলছে চলবে', আমরা লিখেছি 'যে যত লেখাপড়া শেখে সে তত মূর্খ হয়', আমরা বিদ্যাসাগরের মাথা ভেঙেছি—আরও কত কি।

এমনি অজস্র ঘটনা সত্যি করেই ঘটেছে। আর তোমরা সেগুলোকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে উত্তেজিত হয়েছ, আমাদের ঘৃণা করেছ।

এ সব ঘটনা ঘটেছে, ঘটেছে ঠিক। কিন্তু এই সব ঘটনার সব দায় দায়িত্ব কি শুধু আমাদের প্রাপ্য।

ইংরাজিতে একটা গল্প পড়েছিলাম, মানুষ ছবি আঁকতে পারে তাই সে বাঘকে

দেখায় হিংস্র রক্ত লোলুপ করে! কিন্তু বাঘ যদি ছবি আঁকতে পারত? ছাগল যদি ছবি আঁকতে পারত? মাছ যদি ছবি আঁকতে পারত? তাহলে তাদের ছবিতে হত্যাকারী মানুষের মূর্ত্তিটি কেমন হয়ে ফুটে উঠত!

ট্রাফিক পুলিশ খুন হয়েছে। কিন্তু সব ট্রাফিক পুলিশকেই কি আমরা খুন করেছি? যত গলাকাটা হয়েছে সব গলাগুলো কি আমরা কেটেছি? তাহলে ঐযে এ দশের মাঠে মাঠে তরুণদের ছড়ান মৃতদেহ পাওয়া গেল ওদের কে খুন করল। প্রতিদিন সংঘর্ষের নাম করে যে শতশত তরুণ নিহত হল তাদের কে খুন করল? লালবাজারের এই লকআপে প্রতিদিন পিটিয়ে পিটিয়ে কে খুন করছে আমাকে?

কত সহজেই না তোমরা বলতে আমরা সব সি. আই. এ. এজেণ্ট। কথাটা শুনতাম আর আমার রাগ হত, হতে পারে নেতৃত্বের মধ্যে ছিল সি. আই. এ. এজেণ্ট। কিন্তু যত সতী সব অন্যদলে আর যত অসতী আমাদের দলে—বিষয়টা কি এতই সরল। পুলিশের এজেণ্ট, বিদেশী গুপ্তচর সব দলের নেতৃত্বেই থাকা সম্ভব। লেনিনের বলশেভিক পার্টিতেও গুপ্তচর ছিল। কিন্তু কোন দলের কোথায় কে গুপ্তচর আছে তা দিয়ে ত দলের বিচার হয় না। দলের বিচার হয় তার নীতি দিয়ে।

সেই নীতি দিয়ে তোমরা যেমন আমাদের বিচার করেছ তেমনি নীতি দিয়েই আমরা বিচার করেছিলাম তোমাদের। এটা আমাদের মাথায় কিছুতেই ঢোকে নি কেন এদেশে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেও কমিউনিস্ট আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল না! আর শুধু আমি নই আমার মত হাজার হাজার তরুণ যারা এই কবছরে জীবন দিল তাদের মনের সমস্ত ক্ষোভ নিয়ে জমাট বেধেছিল ঐ একটি মাত্র জায়গায়?

বাবা তুমি বিশ্বাস কর তোমার খোকোন সি. আই. এ. এজেণ্ট ছিল না। ছিল না তোমার খোকনের মত ষোল সতের বছরের শতশত ছেলে। এত ছেলেকে ত সি. আই. এ. এজেণ্ট করে না। এজেণ্ট থাকে দু চারজন তারা থাকে দলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়। আমাদের মত সাধারণ কর্মীরা সব দলেই সরল বিশ্বাস নিয়ে কাজ করে। তুমি বিশ্বাস কর আমি যা করেছি তা বিপ্লব হবে বলেই করেছি।

টিক, টিক, টিক, টিক, টিক। সেলের ভেতরে কোথায় একটা টিকটিকি ডেকে উঠল। টিকটিকি সব জায়গাতেই থাকে। টিকটিকির ডাক শুনতে যে এত মিষ্টি সেটা আগে কে জানত।

কোনদিকে টিকটিকিটা ডাকল? ঘাড় ঘুরিয়ে যে দেখব সে ক্ষমতাও নেই।

বীরভূমের গ্রাম থেকে ধরে এনে যেদিন প্রথম আমায় এই সেলে ভরল সেদিন এই ঘরটার দিকে তাকিয়েছিলাম। এক কোণে উঁচু করা দুখানা থান ইট তার মাঝে একটা টিনের টুকরি, প্রস্রাব পায়খানা যাওয়ার জন্য। আর এক কোণে একটা জলের কলসি। ঘরে ভরে আমাকে দিয়ে গেল দুখানা কম্বল। পরিশ্রান্ত শরীর নিয়ে সেই কম্বলের ওপর শুয়ে তাকিয়েছিলাম দেওয়ালের দিকে। বহুদিন আগেকার চুনকাম করা দেওয়াল। ওপরের রঙটা বেশ ময়লা হয়ে গিয়েছে। সেই ময়লার ওপর কে যেন মাটি দিয়ে দিয়ে দাগ টেনে লিখেছে 'আমি এখানে ছিলাম, সুমন্ত।'

কে এই সুমন্ত! চোর ডাকাত? রাজনৈতিক বন্দী? কে জানে? আর একধারে শুধু একটা নাম, নিত্যানন্দ। সারা দেওয়ালের গায়ে অনেক জায়গায় ফোটা ফোটা রক্তের দাগ। দেখে মনে হয় আমার আগে যারা এখানে ছিল তারা বিনিদ্র রাতে হয়ত ছারপোকা ধরে মেরেছিল এই দেওয়ালে।

স্তব্ধ হয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম। আমার আগে কত চোর ডাকাত খুনি বাস করে গিয়েছে এই সেলে। আবার হয়ত বাস করেছে কত বিপ্লবী। হয়ত গত শতাব্দীর কয়েক বিদ্রোহের কোন নেতা, হয়ত উনিশশো পাঁচ সাত সালের কোন বিদ্রোহী হয়ত ত্রিশ দশকের কোন সন্ত্রাসবাদী এমনি করেই এই ঘরে কম্বলে মাথা রেখে ভেবেছে কত ভাবনা। কি তাদের নাম, কোথায় তাদের ঘর, কি হল তাদের পরিণতি তার কোনো ইতিবৃত্তই লেখা নেই এই ঘরের দেওয়ালে। তা না থাক কিন্তু এই ঘরের বাতাসে মেশান আছে তাদের প্রাণের আকুতি,—এই অস্পষ্ট অন্ধকারে জড়িয়ে আছে তাদের মনের স্বপ্ন। গভীর রাতে যখন সবকিছু স্তব্ধ হয়ে যায়, যখন পাহারাদার সিপাইটাও বসে বসে ঢোলে তখন হয়ত সেইসব স্বপ্ন এই ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে কাঁদে, মুক্তি চায়! স্বাধীনতা চায়।

বাবা আমি কমিউনিস্ট পরিবারের ছেলে। জন্ম হয়ে থেকে শুনে আসছি—আমরা কমিউনিস্ট। দেশের যারা শোষক, যারা অত্যাচারী আমরা তাদের বিরুদ্ধে, আমরা গরীবের পক্ষে। আমাদের কাজ হল ঐ সব শোষক অত্যাচারীদের ধ্বংস করে গরীবদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

তাই যখন ছেলেবেলায় পেট ভরে খেতে পেতাম না। যখন একটা ভাল জামা পড়তে পেতাম না, তখন মনে কোন ক্ষোভ থাকত না। আমরা সেই ছেলেবেলা থেকেই জানতাম যতদিন গরীবের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা না হয় ততদিন

আমাদের এ কষ্টভোগ করতে হবে। তারপর যেদিন গরীবের রাজত্ব হবে, শোষণ করা ধ্বংস হ'বে, সেদিন আমরাই হব সবচেয়ে সুখীমানুষ।

তাই ছেলেবেলায় পুলিশ যখন তোমায় এসে ধরে জেলে নিয়ে যেত তখন ত আমরা কাঁদতাম না। উল্টে গর্বে ফুলে উঠত আমাদের বুক। আমি দাদা বলাবলি করতাম গরীবদের জন্য বাবা জেলে গেলেন। যখন তুমি জেল থেকে ফিরে এসে জেলের গল্প করতে, যখন বলতে সুপার, জেলার, জমাদার, কয়েদি, বি ক্লাশ এমনি আরও কত শব্দ,—বলতে ডাণ্ডাবেড়ী, মাড়ভাত, ষ্ট্যাণ্ডিং লক আপ—কত শাস্তির কথা,—গল্প করতে সেলের মধ্যে দিনরাত বসে বসে কি করতে, টেলিগ্রামের টক্কাটরের মত দেওয়ালে টোকা বাজিয়ে পাশের ঘরের বন্দীদের সঙ্গে কথা বলতে, তখন সেই অল্প বয়সে এই সব শুনে যে কি ভীষণ রোমাঞ্চ হত ? মনে হত কতদিনে বড় হব, কতদিনে যে জেলে যাব ?

তুমি গল্প করতে জেলখানার খাওয়ার কথা। এক বাটি ভাত। পাতলা জলের মত একটু ডাল, শাক পাতা পচা বেগুন কুমড়ো দিয়ে একটা ঘ্যাট আর একটু তেঁতুলের অম্বল। জেলখানায় খাওয়া নিয়ে তোমরা সে গানটা বেঁধেছিলে গানটা যখন মাঝে মাঝে বাড়ীতে গাইতে—

জেলখানাতে কষ্টে আছি কে বলে !
এমন সুখে কে আর কোথায়
রেখেছে ভূমণ্ডলে !
এক ডাবু ভাত, এক ডাবু ডাল
একটু ডাঁটার চচ্চরি
গৌরপ্রেমে বান বয়ে যায়
তেঁতুল গোলা অম্বলে।

তখন এই গান শুনে তোমাকে মনে হত তোমার মত ত্যাগ, তোমার মত দুঃখ কষ্ট বুঝি এ সংসারে আর কেউ স্বীকার করে নি।

বাবা মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ছাড়াও অনেক নেতার অনেক কাহিনী ইতিহাসে, বইয়ে পড়েছি, কিন্তু আমার শিশু চোখে আদর্শ বীর ছিলে তুমি।

সেই শিশু বয়সে কত রূপে যে তোমায় দেখতাম তার ঠিক আছে ? পাড়ার এক প্রান্তে ছোট্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা—তোমায় দেখতাম মজুরদের সভায় মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছ,—কি তোমার বলার ভঙ্গী, কি তোমার উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর ! দেখতাম তোমার বক্তৃতা শুনে উত্তেজনায় মজুররা রেগে মেগে উঠে

দাঁড়াত। তোমায় দেখতাম আমাদের শোওয়ার ঘরে বুড়ো বুড়ো লোকদের নিয়ে পার্টির ক্লাস করছ, তাদের মার্কসবাদ বোঝাচ্ছ!—তোমায় দেখতাম পাড়ার বৈঠকে ড্রেনের জল নিকাসী সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছ! তোমায় দেখতাম খাদ্যের মিছিলের সব আগে হাঁটছ!—দেখতাম তোমার কাছে আগত গরীব কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা, মেয়ের বিয়ের জন্য কিছু চাঁদা তুলে দেওয়ার আবেদন নিয়ে! —আসত রুগ্ন স্বামীর স্ত্রী—স্বামীর জন্য হাসপাতালে একটা সিটের ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে!—আসত দরিদ্র অভিভাবক স্কুলে তার ছেলের যাতে ফ্রি হয় তার ব্যবস্থা করে দিতে। এত কাজে তোমায় দিনরাত—দেখতাম আর গর্বে আমার মন ভরে উঠত। সেই সাবেক কালের রাজপুত্ররা কেমন করে পথে হাঁটত জানি না তবে তোমার ছেলে বলে আমি হাঁটতাম বুক ফুলিয়ে—শুনতাম লোকে বলাবলি করত 'অমুকের ছেলে নয়! বা বেশ ছেলে।'

এইজন্যেই বোধহয় মাকে বাদ দিয়ে তোমার কথা আজ বেশি করে মনে পড়ছে। কেননা মাকে দেখে আমার খালি মনে পড়ত সেই একবার গ্রামে গিয়ে একটা ছোট্ট নদী দেখেছিলাম সেই নদীর কথা। সেই নদীর জলে গ্রামের মানুষ স্নান করছে। বাসন মাজছে, কাপড় কাচছে। সেই নদীর জলে সবাই তৃষ্ণা মেটাচ্ছে—কিন্তু সেই নদীর কি তৃষ্ণা তা নিয়ে ত কেউ কোনদিন ভাবে নি।

আমার কাছে মা ছিল অবিকল সেই ছোট নদীটির মত। রান্না করছে, ঘর মুচছে, কাপড় কাচছে, আমরা এসে বলছি 'খেতে দাও? মা খেতে দাও!' —মা খেতে দিচ্ছে, তুমি ভর্ দুপুরে দুজন কমরেড এনে বলছ –'খাবে',—মা নিজের খাবার এনে তাদের দিয়ে উপোষ করে থাকছে, তুমি রাতে কমরেড সঙ্গে করে বলছ—'শোবে', মা বিছানা ছেড়ে আমাদের ঘরে একখানা মাদুর পেতে শুয়ে পড়ছে। এমনি করেই নীরবে সংসারের সবার দাবি মিটিয়েছে মা; মা কি চায় তা ত আমরা কেউ কোনদিন ভাবি নি।

তাই ত আজ মায়ের কথা তত মনে পড়ছে না মনে পড়ছে তোমার কথা। আমার শিশু মনের কল্পনার বীর তুমি। অথচ সেই তোমাকে যত ভালবাসতাম ঠিক ততখানি ঘৃণা করতে শুরু করলাম যখন মনে হল তুমি বিপ্লব করতে চাও না।

হ্যাঁ প্রশ্নটা ত আমাদের সামনে সেই ভাবেই এসেছিল? কেন পঞ্চাশ বছরে আমাদের দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠল না? ভিয়েৎনাম

ঐ টুকু দেশ হয়ে যা করতে পারে। আমরা এতবড় দেশ হয়ে তা পারি না কেন ?

এইখান থেকেই তোমার সঙ্গে শুরু হল আমার বিচ্ছেদ।

খট্ খট্ খট্ খট্,—অনেকগুলো জুতোর শব্দ ভেসে আসছে না ? তাহলে ? ওরা কি আমাকে নিতে আসছে ! এইবার কি ওরা আমায় ধরাধরি করে তুলে নিয়ে যাবে ? তারপর গত তিনদিন যেমন করছে—তেমনি ভাবে একটা ঘরের মেঝেয় ফেলে জিজ্ঞেস করবে 'কোথায় আছে অস্ত্র ! কোথায় লুকিয়ে আছে অন্য আত্মগোপনকারী কমরেডরা। আমি উত্তর দেব না আর, ওরা আমায় গায়ে ইলেকট্রিক তার ঠেকিয়ে শক দেবে ?

উঃ, সে কি অসহ্য যন্ত্রণা। আমি শুধু গোঙাব আর মৃগীরোগীর মত পড়ে পড়ে খিঁচব ? তারপর যখন অজ্ঞান হয়ে যাব আবার আমায় এনে ফেলবে এই ঘরে।

আমি যে কদিন বাঁচব হয়ত এমনি করেই অত্যাচার করবে আমার ওপর। কিন্তু সেজন্য আমার কোনো দুঃখ নেই। পৃথিবীর কোন দেশের বিপ্লবীরা আমাদের চেয়ে কম দুঃখ ভোগ করেছে ? বিপ্লবীদের মাথায় যে চিরকালের কাঁটার মুকুট পড়িয়ে রেখেছে ইতিহাস।

তাই আমার ওপর এই অত্যাচারের জন্য কোনো দুঃখ নেই। দুঃখ শুধু এইখানে সে এদেশে যারা নিজেদের প্রগতিশীল, আদর্শবাদী বলে দাবি করে সেইসব তথাকথিত সমাজসেবী বুদ্ধিজীবীরা সব অভিযোগের বোঝা আমাদের মাথার ওপর কি করে চাপাচ্ছে—?

হ্যাঁ সেই বছরকটিতে খুনের মহোৎসব শুরু হয়েছিল। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে শুধু খুনের কথা ছাড়া আর কোনো কথা ছিল না। গ্রাম গঞ্জ থেকে সহর নগর সর্বত্র শুধু বোমাফাটার শব্দ আর খুনের আতঙ্ক। ঝড়ের সময় যেমন ক্ষুব্ধ সমুদ্রকে দেখে তার ব্যাপ্তি, তার গভীরতা বুঝতে পারা যায় না, শুধু সামনের ঢেউটাকেই মনে হয় আকাশচুম্বি। ঠিক তেমনি সেদিন অতগুলো খুনের মাঝখানে হয়ত অনেক জিনিষই স্পষ্ট হয়ে বুঝতে পারা যায় নি। কিন্তু আজ যখন সে যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। আকাশের বুকে অস্তগামী সূর্যের রক্তিম বর্ণমালার মত আজ যখন সে যুগের কিছু ব্যথিত স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই তখন আজ প্রশ্ন করতে দোষ কি এই খুনের রাজনীতি শুরু করেছিল কে ?

যত খুন হয়েছে সব খুন কি আমরাই করেছি ? আজ পুলিশ থেকে অন্য প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলো সবাই গলায় শহীদের মালা পড়ে সাধু সাজতে চাইছে। কিন্তু এই সত্য কেউ কি কোনদিন প্রকাশ করবে না যে এ দেশের হাজার হাজার ছেলে,—যারা খুন হল, তারা কার হাতে কতজন খুন হল ?

বাবা যখন আমি বীরভূমের গ্রামে আত্মগোপন করে কাজ করতাম তখন সেখানকার চাষীরা একটা কথা বলত। কথাটা হল, 'আঁধার ঘরে ভুতে ভুত কিলোয়।'

এও যেন সেই আঁধার ঘরে ভুতে ভুত কিলোনোর মত। পুলিশ খুন করল পুলিশকে। রাজনৈতিক রেষারেষিতে একদলের কর্মী খুন করল অন্য দলের কর্মীকে। আর সব দোষ এসে চাপল আমাদের ঘাড়ে।

বাবা এদেশের অনেকেই ত কথায় কথায় তদন্ত কমিশন দাবি করে। এই বিষয় নিয়ে একটা তদন্ত কমিশন হোক না যে গত ক'বছরে এ দেশের মোট কতজন খুন হল এবং সবচেয়ে বেশি খুন করেছে কে বা কারা ? তা হলেই ত সব দায় দায়িত্ব ন্যায়সঙ্গতভাবে ভাগ বাটোয়ারা হবে।

হ্যাঁ অকপটে স্বীকার করছি নৃশংসতা আমাদের পক্ষেও করা হয়েছে। আমি জানি আমাদের দলের নাম নিয়েই একজন পাড়ার ভেতরে একটি তরুণের গলা কেটে সেই রক্তাক্ত কাটা মুণ্ডটা হাতে ঝুলিয়ে ডান হাতে সিগারেট খেতে খেতে আধঘণ্টা ধরে পায়চারি করেছে পাড়ার রাস্তায়। আর সেই দৃশ্য দেখে ঘরের দরজা বন্ধ করে ঠক ঠক করে কেঁপেছে পাড়ার লোকজন।

হ্যাঁ আমি স্বীকার করি গুপ্তচর সন্দেহে আমাদের হাতে খুন হয়েছে নিরীহ ফেরিওয়ালা—নিঃস্ব ভিখারী। কিন্তু এটা ত ঘটনার একদিক। এবং অপরদিকে কাটা তরুণদের গলা কেটে বাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে ? কারা পাড়ার মধ্যে তরুণদের ধরে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে মেরেছে ? কারা দিনের পর দিন পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের কথা বলে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে গিয়ে নির্জন জায়গায় দাঁড় করিয়ে গুলি করেছে ? কারা জেলখানায় লাঠিপেটা করে হত্যা করেছে ? ফ্যাসিষ্ট হিটলারের মত লিকুইডেশন স্কোয়াড কারা তৈরি করেছিল ? এর কোনো হিসাব নিকাশ হবে না।

বুদ্ধিজীবীর জাত বলে বড় বেশি জাতিদম্ভ বাঙালীদের। কিন্তু এই কি বুদ্ধিজীবীদের বিচারের পদ্ধতি ? খুনের গুপ্তহত্যার সন্ত্রাসের কি আংশিক বিরোধিতা করা যায়, না সামগ্রিক বিরোধিতা করতে হয় !

এই নির্জন সেলে শুয়ে শুয়ে অর্ধ অচেতন অবস্থায় সেই কথাই ভাবি। মনে পড়ে কার যেন লেখায় পড়েছি আই ক্যান নট রিমেন সাইলেণ্ট—আমি নীরব থাকতে পারি না। আর ভাবি এই কলকাতার রাজপথেই ত সমুদ্রের মত বিশাল হৃদয় সিংহের মত বিরাট সাহস নিয়ে চলাফেরা করেছেন আমাদের পূর্ব্বপুরুষ বিদ্যাসাগর দীনবন্ধুরা। আজ সেই পথ ধরে যারা হাঁটতে চাইছে তারা কি ওদের সমতুল্য। সব বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার এই প্রচেষ্টা দেখে আজ মনে পড়ছে সেই সংস্কৃত উপমা, যে বনে একদিন সিংহ বিচরণ করেছে আজ সেই বনে বোধ হয় শিয়াল রাজা হয়েছে।

জুতোর শব্দগুলো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কোথায় গেল? আত্মগোপনের ডেরা থেকে আমার সঙ্গে যে ধরা পড়েছিল তার ঘরে? সে কি অত্যাচারে সহ্য করতে না পেরে সব বলে দিয়েছে?

মরার আগে ও সব ভাবনা আর ভাবছি না। আজ আমার শুধু মাঝে মাঝেই মনে পড়ছে তুফানের কথা। ছেলেবেলায় আমি ওকে কোন দিন মারি নি কিন্তু পার্টির যে সভায় ওকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হয় সে সভায় আমি ছিলাম আর তাতে মতও দিয়েছিলাম।

বাবা তুমি বিশ্বাস কর তুফানকে আমি ভালবাসতাম, প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসতাম। দাদাকে চিরকালই আমার মনে হত একটু বোকা বোকা ধরণের। কিন্তু তুফান, ওর ওপর ছিল আমার অসীম প্রত্যাশা।

কিন্তু কি দেখলাম! আমাদের বিরোধিতার নাম করে তুফান হয়ে উঠল পুলিশের দালাল। থানায় গিয়ে আমাদের দলের কাজের রিপোর্ট দিত, পুলিশকে চিনিয়ে দিত আমাদের দলের কর্মীদের, আমাদের হত্যা করার জন্য ওসকাত পুলিশদের। বাবা এটা কোন বিপ্লবী দলের কাজ? এটা কোন রাজনীতি? এদেশে এর আগে সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যেও ত বহু দল উপদল থেকেছে। কিন্তু কোন দল ত অপর দলের কর্মীদের পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয় নি।

আচ্ছা তুফান কি বেঁচে আছে। জানি না। কেন না ঐ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই আমি চলে যাই গ্রামে কৃষক গেরিলা দল তৈরি করতে। যদি সে বেঁচে থাকে তাহলে মরার আগে তাকে বলে যাব বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া ঘৃণার কাজ। পৃথিবীর সব দেশের বিপ্লবীরা একে ঘৃণা করেছে—করবে।

ঢং ঢং ঢং রাত তিনটে বাজল। আমি ভুল করে ভেবেছিলাম বুঝি ভোর

হয়েছে। এইবার ডিউটির সিপাই বদল হবে। নতুন সিপাই আসবে সে আমার সেলের তালাটা নেড়ে খটখট করে দেখবে ঠিক আছে নাকি তারপর অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করবে, নিশ্বাস নিচ্ছি কিনা—বেঁচে আছি কিনা? তারপর আবার একটা দিন আসবে। আবার অত্যাচার শুরু হবে।

উঃ। এই শেষরাতে বাড়ীর কথা ভাবতে যে কি ভালই না লাগছে। মনে পড়ছে সেই ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা। তখন কমিউনিস্ট বলতে বুকখানা কি রকম ফুলে উঠত। কমরেডদের পরস্পরের মধ্যে কি দরদ কি ভালবাসা, আর সাধারণ ছেলেদের পরম আত্মীয় হল তাদের মামা মেসো পিসে। কিন্তু আমাদের মামা মেসো পিসেকে চিনতামই না। আমাদের বুক ফুলে উঠত একজন কমরেডকে দেখলে। আমার মনে পড়ে আমরা সারাক্ষণের কর্মী। ভাল খেতে পাই না বলে গাঁয়ের চাষী কমরেডরা আমাদের জন্যে পুকুরের মাছ, জমির আলু নিয়ে আসত। মনে পড়ে শ্রমিক কমরেডরা কি ভালই না বাসত আমাদের। সেই পরিবেশ, সেই আবেগ, সেই রোমাঞ্চ, সেই ভালবাসা আজ যেন বহুদূরের স্বপ্ন। সন্ধ্যার শুকতারাটির মত গভীর রাতে কোথায় যেন মিলিয়ে গিয়েছে।

বাবা কি মনে হয় জান আমরা যখন নীতির লড়াই বলে দল ভেঙেছি, পরস্পরকে হত্যা করেছি লোকে তখন আমাদের দেখে মনে করেছে আত্মকলহ করে ধ্বংস হচ্ছি। এক বাড়ীর পাঁচ ভাই প্রকাশ্যে ঝগড়া করে সংসার ভাঙলে লোকে যা মনে করে আমাদের সম্পর্কেও তাই মনে করেছে। আমরা যখন বোমা ফাটিয়েছি, খুন করেছি তারা সভয়ে দরজা বন্ধ করেছে, ছুটে দূরে সরে গিয়েছে। শুধু আমাদের ওপর নয় গোটা কমিউনিস্ট আদর্শের ওপরই তাদের আস্থা শিথিল হয়ে গিয়েছে।

বাবা আমার কি মনে হয় জান! যে বোমা ছুড়তে পারে কি গুলি চালাতে পারে আজকের দিনে সে খাঁটি কমিউনিস্ট নয়। আজকের দিনে সেই হল সত্যি করে কমিউনিস্ট যে এই হানাহানি আর অবিশ্বাসের ধ্বংসস্তূপ থেকে আত্মবিশ্বাস আর আবেগের পতাকাখানা উর্ধে তুলে ধরতে পারবে। যে ফিরিয়ে আনতে পারবে সেই কমিউনিস্ট রোমাঞ্চ সেই কমিউনিস্ট আবেগ।

খট! খট! খট! খট! অনেকগুলো জুতোর শব্দ। হ্যাঁ আমার সেলের দিকেই ভেসে আসছে। হ্যাঁ আমার দরজার তালা খুলে দুজন আমার দুটো হাত আর দুজন দুটো পা ধরে চ্যাংদোলা করে টেনে তুলল। ও বুঝেছি। আমায় নিয়ে যাচ্ছে হত্যা করতে। একটা প্রিজনভ্যানে তুলে আমায় নিয়ে যাবে ময়দানে,

কি গঙ্গার ধারে। তারপর ভ্যান থেকে নামিয়ে আমায় দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরে ফেলবে। কাল সকালের কাগজে একটু ছোট সংবাদ তুমি পড়বে 'পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে একজন উগ্রপন্থী নিহত।' এমনিভাবেই আমার শত শত সহকর্মীর মৃত্যু সংবাদ বেরিয়েছে কাগজে।

হ্যাঁ তাই। ওরা আমায় পুলিশের ভ্যানে তুলল। বাবা তোমার খোকন চলল। আমার পার্টি সভ্যপদের প্রস্তাবক ছিলে তুমি। তারপর সব কিছুই ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো আমার কাজের যে মূল্যায়ন ইতিহাস করুক আমার মনের স্বপ্ন ছিল এই সমাজ থেকে শোষণ আর অবিচারের শেষ হোক।

আজও সেই বিশ্বাস নিয়েই আমি মরতে চলেছি। ইতিহাস যদি আমার কাজকে ভুল বলে কোনো ক্ষোভ নেই। একটা কুড়ি বছরের ছেলে ভুল করবে এটা কি খুব আশ্চর্যের কথা। কিন্তু আমার এই ভুলটুকুকে মূলধন করে যারা ঠাণ্ডা মাথায় শত শত তরুণকে খুন করল, যারা একটা গোটা জেনারেশন গ্যাপ ঘটিয়ে দিল ইতিহাস নিশ্চয়ই তাদেরও একদিন বিচার করবে।

মহাবিশ্বে গ্রহজগতে প্রাণের বিচিত্র রূপ

শঙ্কর চক্রবর্তী

আমাদের তারাজগতে এবং দূরবীনের নাগালের মধ্যে মহাবিশ্বের যত তারাজগত ধরা পড়েছে, ওদের নক্ষত্রের সংখ্যার বিচারের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, দৃশ্যগোচর মহাবিশ্বে নক্ষত্রের মোট সংখ্যা দাঁড়াবে $১০^{২০}$-রও (এক লক্ষ মিলিয়ন বিলিয়ন—এক-এর পর ২০টি শূন্য বসালে এই সংখ্যাটি দাঁড়ায়) বেশি। এ যে কত বিশাল একটি সংখ্যা তা আমরা চিন্তাই করে উঠতে পারি না। (আমাদের নাগালের বাইরে রয়েছে মহাবিশ্বের যে অংশ, তার হিসেব ধরলে সমগ্র মহাবিশ্বে নক্ষত্রের মোট সংখ্যা দাঁড়াবে আরো অনেক বেশি)। এরমধ্যে শতকরা কয়েক ভাগই হল একক নক্ষত্র, যাদের চার পাশে গ্রহজগত গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। এই গ্রহদের মধ্যেও আবার শতকরা কয়েকভাগই হয়তো ওদের নক্ষত্র থেকে সঠিক দূরত্বে রয়েছে এবং এদের মধ্যেও আবার সম্ভবত শতকরা মাত্র একভাগ গ্রহ এমন একটি নির্দিষ্ট মাপের কক্ষপথে ওদের নক্ষত্রকে পরিক্রমা করছে, যাতে সেখানে প্রাণসৃষ্টির উপযোগী তাপমাত্রার একটি সুষম অবস্থা বজায় থাকতে পারে।

জটিল প্রাণসৃষ্টির উপযোগী গ্রহের সংখ্যাকে আমরা আরো কয়েকটি সর্ত আরোপ করে সীমাবদ্ধ করে তুলতে পারি, যেমন—ওদের বায়ুমণ্ডল এবং জলভাগকে হতে হবে প্রাণধারণের উপযোগী এবং কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন প্রভৃতি উপাদানের মধ্যে যে রাসায়নিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় পৃথিবীতে একদিন প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল—তার প্রাথমিক পর্বকে ওখানে নিশ্চয়ই শুরু হতে হবে। এভাবে জটিল প্রাণসৃষ্টির প্রয়োজনীয় সর্তের বিচারে প্রাণধারণের উপযোগী গ্রহের অধিকারী নক্ষত্রের সংখ্যাকে যতই নামিয়ে আনা যাক না কেন, তিনটি ঘটনাকে অস্বীকার করার উপায় কিন্তু আমাদের নেই,—যারা মহাবিশ্বে জটিল প্রাণসৃষ্টির এক বিপুল সম্ভাবনাকেই সূচিত করে তোলে। প্রথমত আমাদের সূর্যের বিভিন্ন ঘটনাচক্রের মধ্যে যে একটি নিয়মের রাজত্ব চলেছে, যার ফলে পৃথিবীতে প্রাণসৃষ্টির পরীক্ষা একদিন সফল হতে পেরেছিল।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীতে যে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নবিদ্যার সঙ্গে আমরা পরিচিত, সমগ্র মহাবিশ্বে ওদেরই নিয়মকানুনকে আমরা কার্যকরী হতে দেখছি। তৃতীয়ত, এক বিপুলসংখ্যক নক্ষত্রের (১০২০) অস্তিত্ব প্রাণসৃষ্টির পরীক্ষানিরীক্ষার এক অপরিমিত সম্ভাবনার দ্বারকেই উন্মুক্ত করছে।

সংখ্যার গোলকধাঁধাঁর মধ্যে

মনে করা যাক, বিভিন্ন মহাজাগতিক কারণে এক হাজারটি নক্ষত্রের মধ্যে মাত্র একটির ক্ষেত্রে গ্রহজগত গড়ে উঠেছে। (হারলো স্থাপলির মতে পঞ্চাশটি নক্ষত্রের মধ্যে একটির ক্ষেত্রে সম্ভাবনা রয়েছে এবং যারা ধূলো ও গ্যাসের মেঘরূপী নীহারিকার মধ্যে ঘনীভবনের ফলে নক্ষত্র সৃষ্টির ধারণায় বিশ্বাস করেন, তাঁদের মতে দশটির মধ্যে একটিতে এ সম্ভাবনা থাকবে।) এক গ্রহজগত রয়েছে হাজারটি নক্ষত্রের মধ্যে ধরা যাক, মাত্র একটি নক্ষত্রের। এক বা একাধিক গ্রহ নক্ষত্রটির কাছ থেকে এমন নির্দিষ্ট দূরত্বে রয়েছে, যাতে প্রাণসৃষ্টির প্রয়োজনীয় জল ও উত্তাপ গ্রহটি ধারণ করছে। আমাদের সৌরজগতে মাত্র দু-তিনটি গ্রহ সূর্য থেকে এই নির্দিষ্ট দূরত্বে রয়েছে। আবার ধরা যাক, ঐ নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করছে, এরকম গ্রহদের অধিকারী এক হাজারটি নক্ষত্রের মধ্যে মাত্র একটি নক্ষত্রের এমন নির্দিষ্ট আয়তনের একটি গ্রহ রয়েছে, যার অভিকর্ষ-বল একটি বায়ুমণ্ডলকে ধরে রাখতে পারে। আমাদের সৌরজগতে ৯টি গ্রহের মধ্যে সাতটিতে বায়ুমণ্ডল রয়েছে। এই রকম চুলচেরা হিসেবে শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে ১০০ কোটি গ্রহের মধ্যে মাত্র একটি গ্রহেই জটিল প্রাণসৃষ্টির সম্ভাবনা বিদ্যমান।

সংখ্যাতাত্ত্বিক সমস্ত সম্ভাবনার বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত যেখানে এসে আমরা পৌছলুম. তা হল এই—এক লক্ষ কোটি নক্ষত্রের মধ্যে মাত্র এককোটি নক্ষত্রই জটিল প্রাণসৃষ্টির উপযোগী গ্রহের অধিকারী হবার যোগ্যতা অর্জন করছে। সম্ভাব্যতার এই অতি নিম্ন পরিমাপ থেকে আমরা যেখানে এসে দাঁড়াচ্ছি, তা হল —আমাদের দৃশ্যগোচর মহাবিশ্বে জটিল প্রাণসৃষ্টির উপযোগী গ্রহের সংখ্যা দশ কোটির কাছাকাছি পৌছে যেতে পারে। হারলো স্থাপলি অবশ্য এই সংখ্যাটীকে এক হাজার গুণ বাড়ানোর পক্ষপাতী। সংখ্যাবৃদ্ধির এই হিসেব দাখিলের জন্যে তিনি দুটি কারণকে উপস্থাপিত করেছেন। একটি হল এই মহাবিশ্বে নক্ষত্রের মোট সংখ্যা ধরা হয়েছে খুবই কম। দ্বিতীয়টি হল, শুধু কার্বনঘটিত প্রাণ নয়, অন্য ধরণের প্রাণের সম্ভাবনাকেও হিসেবের মধ্যে ধরা উচিত।

বিচিত্র পরিবেশে প্রাণ

পৃথিবীতে প্রাণের বিবর্তনের একটিমাত্র ধারার সঙ্গেই আমাদের পরিচয় ঘটেছে —কার্বন হল সে প্রাণীদেহের মূল উপাদান। এই মহাবিশ্বে পৃথিবীর মত যে সব গ্রহে প্রাণের উদ্ভব সম্ভবপর হয়েছে, সেখানেও কি জীবের বিকাশ ঘটবে একই রকমভাবে?

পৃথিবীতে যে রাসায়নিক পরিবেশ এবং অবহমণ্ডলের মধ্যে এখানকার প্রাণী-জগত গড়ে উঠেছে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে একই প্রাণী-জগতের ক্রমিকভাবে খাপ খাইয়ে নেবার ব্যাপারটাকে বিচারের মধ্যে ধরা উচিত। বর্তমানে যে পরিস্থিতিটা আমাদের পক্ষে মনে হচ্ছে মারাত্মক, সুদীর্ঘকালব্যাপী খাপ খাইয়ে নেবার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাই একদিন আমাদের পক্ষে সহনশীল হয়ে উঠতে পারে। মারাত্মক বিষ খুবই স্বল্প অথচ ক্রমবর্ধমান পরিমাণে গ্রহণ করতে করতে কালক্রমে জীবদেহের ওপর ওর মারাত্মক প্রভাবটাই আর কার্যকরী হয় না। সাপের বিষকে নেশার জন্যে ব্যবহার করে থাকে, এরকম অনেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এজাতীয় ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। বহু যুগ ধরে অতিবেগুনী রশ্মির বিকীরণকে বেশি মাত্রায় গ্রহণ করে চললে একদিন আমাদের বংশধরেরা বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে ঐ রশ্মিটিকে গ্রহণ ও সহ্য করতে পারবে।

পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার ব্যাপারে মানুষের জুড়ি নেই। যান্ত্রিক সভ্যতার বিভিন্ন উপকরণকে এ ব্যাপারে সে কাজে লাগিয়েছে। অক্সিজেন ট্যাংক পিঠে বেঁধে বায়ুর নিম্নচাপকে উপেক্ষা করে এভারেস্টের চুড়োয় যেমন সে উপস্থিত হয়েছে, তেমনি খনির খাদে বা সাগরের গভীরে উচ্চচাপের পরিবেশে প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা নিয়ে সে নেমেছে। বহু প্রাণী এবং গাছপালা এব্যাপারে মানুষকেও হার মানাবে। উষ্ণ প্রস্রবণের বিপুল তাপের মধ্যে পতঙ্গজাতীয় প্রাণী, মেরু অঞ্চলের হিমশীতল পরিবেশে লিচেনজাতীয় উদ্ভিদ এবং সাগরের তলদেশে বিপুল চাপের পরিবেশে প্রাণের অস্তিত্ব পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রাণের বিবর্তনের সম্ভাবনাকে রূপায়িত করে তুলছে।

প্রাণী ও উদ্ভিদ

প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মহাবিশ্বে প্রাণধারণের উপযোগী

সব কটি গ্রহে এই পরিস্থিতিই বিরাজ করছে কি না, তা অবশ্য সঠিকভাবে বলা যায় না।

উদ্ভিদ প্রশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইডকে এবং প্রাণী অক্সিজেনকে গ্রহণ করে। নিশ্বাসের সঙ্গে ওরা যথাক্রমে নির্গত করে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডকে। প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং অক্সিজেনের এই পারস্পরিক আদানপ্রদান যেন প্রাণের হৃৎস্পন্দনের মতো। একটি গ্রহে যদি আদৌ প্রাণীজগত না থাকে, তাহলে সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার ওপরে নির্ভরশীল উদ্ভিদদের প্রয়োজনীয় কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণে ঘাটতি দেখা দেবে। উদ্ভিদদের ঐ বস্তুটির জন্যে তখন নির্ভর করতে হবে আগ্নেয়গিরির অনিয়মিত অগ্ন্যুদগার, বনের দাবাগ্নি এবং ওদের দেহের পচনজাত সামগ্রীর ওপরে।

কোন গ্রহে উদ্ভিদজগত আদৌ না থাকলে প্রাণীজগতের গড়ে ওঠার সম্ভাবনাই থাকবে না। সোজা কথায় বলা যায়, উদ্ভিদ ও আমরা পুষ্টিগতভাবে পারস্পরিক এক উপকারিতার সম্পর্কের (symbiosis) মধ্যে যেন বসবাস করছি। আমরা প্রাণীরা উদ্ভিদকে ব্যবহার করি কার্বনকে বেঁধে নিয়ে (fixation) অক্সিজেনকে মুক্ত করার জন্যে, অর্থাৎ খাদ্য ও প্রাণবায়ু সরবরাহের জন্যে আর উদ্ভিদেরা আমাদের ব্যবহার করে কার্বন ডাই-অক্সাইডের অন্যতম উৎস এবং সাররূপে। এক আদর্শ অর্থ নৈতিক আদানপ্রদান ব্যবস্থা আর কি !

প্রাণীদেহের বৈচিত্র্য

যে কোন গ্রহজগতেই প্রাণীদেহের আকৃতিগত একটি সীমা নির্ধারণ করা থাকবেই। একটি প্রাণীদেহকে সব সময়ে এতটাই বড় হতে হবে, যাতে প্রাণীটি ওর ক্রমিক বংশরক্ষার (replication) জন্যে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন কয়েকটি জৈবিক কাজ সম্পন্ন করতে পারে। পৃথিবীতে সবচেয়ে ক্ষুদ্র যে প্রাণীর পক্ষে এটা সম্ভবপর হতে দেখা গেছে, তাকে বলা হয় PPLO বা প্লিউরোনিউমোনিয়া-জাতীয় প্রাণী। এর ব্যাস হল $১০^{-৫}$ সেন্টিমিটার বা এক সেন্টিমিটার এক লক্ষভাগের একভাগ। জমির ওপর বসবাসকারী যে কোন প্রাণীদেহের সর্বোচ্চ মাপ আবার কয়েকটি ব্যাপারের ওপরে নির্ভরশীল। একটি প্রাণীদেহ যদি অস্বাভাবিক মাপের বড় হয়, তাহলে ও ওর নিজের ওজনই বহন করতে পারবে না। প্রাণীদের বড় হবায় আর একটি সীমাবদ্ধতা হল, বাইরের জগত থেকে আসা একটি উত্তেজনা প্রবাহ কত দ্রুতবেগে ওর স্নায়ুকেন্দ্রে গিয়ে পৌছতে পারে। একটি বিশালদেহী প্রাণীর ক্ষেত্রে

হয়তো দেখা গেল, ওর স্নায়ুকেন্দ্রের দর্শন এলাকা (occipital area) একটি সংকেত পাঠাচ্ছে, যার নির্গলিতার্থ হল—আর এগিও না, সামনে একটি গভীর গর্ত রয়েছে। কিন্তু অনেক দূরে পায়ের মাংসপেশীর কাছে সচল হবার জন্যে সংকেতটা পৌছল হয়তো অনেক দেরীতে।

পৃথিবীর বিবর্তনের মেসোজোয়িক পর্বে ডাইনোসর জাতীয় বিশাল চেহারার প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই বিপত্তির আংশিক সমাধানের জন্যে ওদের লেজের প্রান্তে বাড়তি কিছু স্নায়ুব্যবস্থা ছিল। আসল মগজটা অবশ্য যেখানে থাকার, সেখানেই ছিল। দু দুটো মগজ নিয়ে ডাইনোসর জাতীয় প্রাণীরা সবকিছু ল্যাজেগোবরে করে ফেলত কিনা, তা অবশ্য জানা নেই। বিশাল চেহারার প্রাণীদেহ নিয়ে টিকে থাকা সম্ভব, যদি একটি গ্রহে সমুদ্রের মত ভেসে থাকার কোন প্লবতাযুক্ত (buoyant) মাধ্যম বা অত্যন্ত ঘন ও চাপযুক্ত বায়ুমণ্ডল পাওয়া যায়।

মানুষেরই মত জটিল জীব

পৃথিবীতে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডল এবং প্রাণধারণের অনুকূল অন্যান্য যে প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্তমান, ঠিক সেই একই পরিবেশ রয়েছে যে সব গ্রহে, সেখানে বির্বতনের ক্রমবিকাশে মানুষের মত প্রাণীদের বসবাস করবার কথা।

একটি গ্রহের অভিকর্ষ-বল যত বেশি হবে, সেখানকার বৃহত্তম প্রাণী দেহের আকারও হবে সেই অনুপাতে ক্ষুদ্রাকার। বুদ্ধিমান জীবের বিকাশ সেখানে ঘটে থাকলে ওদের চেহারা হতে পারে গোল বলের মতো বা চাপটা আকারের। গ্রহের জোরালো অভিকর্ষের টান সামলাবার জন্যেই ওদের এ-জাতীয় দৈহিক গঠন গড়ে উঠেছে। কম অভিকর্ষযুক্ত একটি গ্রহে যেসব প্রাণী বাস করে, তাদের চেহারা হবে খুবই লম্বা, হাড়কাঠের মতো। এই দু জাতের গ্রহে যদি কোন সভ্যতা গড়ে ওঠে, তাহলে ওর বিভিন্ন উপকরণ এবং স্থপনবিদ্যার প্রকৃতিও অভিকর্ষের মাপ অনুযায়ী বিশেষত্ব গ্রহণ করবে।

এমন গ্রহজগতের সন্ধান পাওয়া বিচিত্র নয়, যেখানে শ্বাসপ্রশ্বাস জাতীয় জৈবিক প্রক্রিয়ার হয়তো কোন প্রয়োজনই নেই এবং সম্পূর্ণ অক্সিজেনবিহীন পরিবেশে বেশ উন্নত ধরণের জীবের সন্ধান পাওয়াও বিচিত্র নয়। শ্বাসপ্রশ্বাসের পদ্ধতির ওপরে একটি জীবদেহের আকৃতিও নির্ভর করে থাকে। একফুট বা আড়াই সেন্টিমিটারের চেয়ে আকারে বড় কোন কীটের সন্ধান পাওয়া যায় না, কারণ কীটেরা ওদের দেহের অভ্যন্তরভাগে ব্যাপন (diffusion) বা সূক্ষ্ম

ছিদ্রযুক্ত কোন ব্যবধানের মধ্য দিয়ে সহজভাবে চলাচলের পদ্ধতিতে অক্সিজেনকে প্রবেশ করায়; রক্ত সংবহনের সঙ্গে তুলনায় এ হল অনেক মন্থর এবং নিকৃষ্ট ধরণের একটি পদ্ধতি।

অন্য গ্রহজগতে জটিল প্রাণীদেহে অর্থবহ সংকেত গ্রহণের প্রত্যঙ্গ-রূপী যে ব্যবস্থা, তার সংখ্যাও সীমাবদ্ধ থাকারই সম্ভাবনা। হাত পায়ের সংখ্যা অবশ্য দুয়ের তুলনায় বেশি হতে বাধা নেই। যে সব গ্রহে যথেষ্ট বিস্তৃত বায়ুমণ্ডল এবং সমুদ্র রয়েছে, সেখানে বাতাস বা জলের অণুদের সরাসরি রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্যে প্রাণীদেহে অর্থবহ গ্রাহকব্যবস্থাই হবে সবচেয়ে কার্যকরী। জৈব-সংশ্লেষ পদ্ধতির মধ্যে নানারকম বৈচিত্র প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা থাকলেও আমাদের স্বাদ এবং গন্ধ গ্রহণের প্রত্যঙ্গের অনুরূপই হবে ওখানকার প্রাণীদেহের ঐ প্রত্যঙ্গগুলি। শ্রবণেন্দ্রিয়ের কার্যকারীতা বায়ুমণ্ডলের গঠন এবং তাপমাত্রার ওপরে নির্ভর করে থাকে। আমাদের স্পর্শানুভূতির সাহায্যে দেহের ওপর চাপের সামান্যতম পরিবর্তনকেও আমরা অনুভব করে থাকি। যে কোন গ্রহজগতে যে কোন পরিবেশেই এই প্রত্যঙ্গটির একটি কার্যকরী ভূমিকা থাকবে।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই, যদি দেখা যায়, কোন গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীদের পক্ষে অক্সিজেন হয়তো বিষ; ওরা বাস করে কার্বন ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া বা মিথেন গ্যাসে ভরা একটি বায়ুমণ্ডলে, আমাদের জীব-দেহের পক্ষে যা মারাত্মক। ওদের দেহযন্ত্রও সেই পরিবেশ অনুযায়ীই গড়ে উঠবে।

কোন গ্রহজগত হয়তো ওর সূর্যের কাছ থেকে আমাদের তুলনায় কিছু বেশি পরিমাণে তাপ পাচ্ছে। সেখানে কোন বুদ্ধিমান জীবের বিকাশ ঘটে থাকলে ওদের দেহযন্ত্র অতিরিক্ত তাপধারণের উপযোগী-রূপেই গড়ে উঠবে, সন্দেহ নেই।

সবচেয়ে বিয়োগান্ত পরিস্থিতি হবে সেইসব গ্রহে যাদের ভর নির্দিষ্ট মাপের চেয়ে সামান্য কম হওয়ার দরুণ অভিকর্ষ-বলের জোরটাও হবে প্রয়োজনীয় মাপের চেয়ে খানিকটা কম। ফলে ঐ সব গ্রহ ওদের বায়ুমণ্ডলকে বরাবরের মতো ধরে রাখতে পারবে না। সেখানে কোন বুদ্ধিমান জীবের বিকাশ ঘটে থাকলে শ্বাসবায়ুর অভাবে একদিন মৃত্যু তাদের অবধারিত। বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব অতি ধীরগতিতে কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওদের জীবদেহও আপ্রাণ চেষ্টা করে চলবে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে কোনরকমভাবে টিকে থাকার। কিন্তু সেই প্রচেষ্টাও একদিন তার সর্বশেষ পর্যায়ে উপনীত হবে।

রেডিও চোখ

মহাবিশ্বের কোন গ্রহের কোন বুদ্ধিমান জীব কোন বস্তুকে আলোক তরঙ্গের মাধ্যমে নয়, রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে দেখে থাকে, এজাতীয় একটি ঘটনা কি সম্ভব ? যদি আদৌ তা হয়, তাহলে সে অবস্থায় দর্শনেন্দ্রিয়রূপী বেতার তরঙ্গের সংগ্রহ এলাকাকে হতে হবে বিরাট আয়তনসম্পন্ন। ৫০০০ অ্যাংষ্ট্রম (১০-১০ মিটার বা এক মিটারের এক হাজার কোটিভাগের একভাগ) তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি আলোকরশ্মিকে বিশ্লেষণের যে ক্ষমতা আমাদের চোখের রয়েছে, মাত্র ৫ সেন্টিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একটি রেডিও তরঙ্গকে সেই বিশ্লেষণের ক্ষমতা অর্জনের জন্যে অন্য গ্রহের সেই বুদ্ধিমান জীবের মাইক্রোওয়েভরূপী (অতি ক্ষুদ্র মাপের বেতার তরঙ্গ গ্রহণের ক্ষমতা সম্পন্ন) অক্ষিগোলকের ব্যাস হতে হবে প্রায় ১·৩ কিলোমিটার। ব্যাপারটা খুবই অবাস্তব হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর কি ?

তাহলেও 'রেডিও চোখ' বিশিষ্ট বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব পৃথিবীর বিচারে অবাস্তব মনে হলেও একেবারে নস্যাৎ করা যায় না। অতি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বেতার তরঙ্গ মানবদেহের ওপরে ছোঁড়া হলে তার একটা অনুভূতি হয়, যদিও আমাদের দেহে এই তরঙ্গ গ্রহণের সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল ব্যবস্থাটার পুরো ছবিটা আজও জানা নেই। আমাদের মধ্যে যে অনুভূতি খুবই স্বল্পভাবে পরিস্ফুট, অন্য গ্রহের জীব দেহে তা অনেক সমৃদ্ধ পর্যায়ে পৌছতে পারে।

একটি চোখে কোন বস্তুর দ্বিমাত্রিক ধারণা পাওয়া যায়। দু-চোখে ত্রিমাত্রিক ধারণা জন্মায়। তিনটে চোখ থাকলে একটির জায়গায় দুটিতে যে কাজ হয়, তা হবে না বরং তৃতীয় চোখটি পেছনের দিকে থাকলে অনেক বেশি কাজ পাওয়া যেত। মেসোজোয়িক যুগে কিছু জীবের সামনের দিকেই নাকি তিনটে চোখ ছিল। শারীরবিদদের ধারণা অনুযায়ী আমাদের চোখের কোলে যে ডুমো মতন ছোট্ট মাংসপিণ্ডটি রয়েছে, তা নাকি কপালের মাঝখানে একটি তৃতীয় নেত্রেরই চিহ্নস্বরূপ। উভচর জাতীয় প্রাণী ব্যাঙ বা স্যালামাণ্ডারের ক্ষেত্রে এই তৃতীয় নেত্রের একটি লক্ষণ আজও নাকি রয়েছে—ওদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কটা এভাবেই আমরা ধারণ করছি।

তৃতীয় নেত্রধারী মানুষরূপী বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব অন্য গ্রহে প্রয়োজনের তাগিদে সম্ভব হলেও হতে পারে।

মানুষের মত বুদ্ধিমান সভ্যতা আমাদের বিশ্বে আরো অনেক গড়ে উঠেছে,

এটা যদি ধরে নিই, তাহলে ওদের সঙ্গে কিভাবে প্রাথমিক যোগাযোগ সাধন করব, সে কথাটা ভাবতে হয়। যোগাযোগের গরজটা শুধু যে আমাদেরই, এটা ভাবাটা ঠিক নয়। ওই অজানা সভ্যতার অধিকারীরা হয়তো অনেক আগে থেকেই পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ষাধনের কাজে নেমে পড়েছে। ওদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগসাধিত হলে মহাবিশ্বে উন্নত সভ্যতার সমাজে আমাদের সদস্য পদভুক্তি ঘটবে এই আর কি।

মনীষা গ্রন্থালয় (প্রা লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিব্য লেখকের 'মহাবিশ্বে আমরা কি নিঃসঙ্গ' গ্রন্থের একটি অধ্যায়।

৮০ বছরের ঐতিহবাহী জনপ্রিয়—

সত্যম্বর অপেরা

৩৩৩এ, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬ ফোন—৫৫-৮১১০

ঃ এবারের শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ ঃ

রাত্রি ও রমণী

রচনা—সত্যপ্রকাশ দত্ত

সুর—প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্য্য

রচনা—হারু রায়

সুর—প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্য্য

তুফান

রচনা ও নির্দ্দেশনা—বীর সেন

সুর—প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্য্য

পান্না চক্রবর্তী

রাখাল সিংহ

মাখন সমদ্দার

মৃত্যুন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবাশীষ গঙ্গোপাধ্যায়

ক্ষিতীশ রায়

মীনা কুমারী

কল্পনা নায়েক

কুমারী মীরা কুমারী মহুয়া

মিস্ রেশমী

চিত্রা মল্লিক

পরিচয়

বর্ষ ৪৩ । সংখ্যা ৬-৭ । পৌষ-মাঘ ১৩৮০ । জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

সূচীপত্র

সমালোচনা সংখ্যা

বিয়োগপঞ্জী

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য । হিরণকুমার সান্যাল । সুশোভন সরকার
অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র । গোপাল হালদার । বিষ্ণু দে । চিন্মোহন সেহানবীশ
সুভাষ মুখোপাধ্যায় । গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণ সান্যাল

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

বর্ষ ৪৩ । সংখ্যা ৬-৭ । পৌষ-মাঘ ১৩৮০ । জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

মুক্তি প্রসঙ্গে

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায

হার্বার্ট মার্কুসের 'এ্যান এসে অন লিবারেশন'* পুস্তিকাটি চার বছর আগে প্রকাশিত হয়। তখন এই বইটি নিয়ে দেশবিদেশের পত্রপত্রিকায় বেশ কিছু আলোচনা হয়েছিল এবং আমেরিকার বুদ্ধিজীবী ছাত্র ও নযাবামদেব একাংশের কাছে মার্কুসের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বর্তমানে যদিও আলোচনা তেমন কিছু আর চোখে পড়ে না, তবুও মনে হয় বইটি সম্পর্কে তরুণ সমাজের আগ্রহ এখনও অব্যাহত আছে। তাই বোধহয় এক বছর শেষ হতে না হতেই পেলিকান-সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণও নিঃশেষিত হতে চলেছে। আমার ধারণা মুক্তি প্রসঙ্গে মার্কুসের বর্তমান বক্তব্যের সমালোচনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি এবং দেরিতে হলেও এ আলোচনা খুব বেশি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

হার্বার্ট মার্কুস আমেরিকার এবং ইয়োরোপের অনেকের কাছে আধুনিকতার প্রতীক বলে পরিগণিত। তাঁর বিপ্লবী ও র‍্যাডিক্যাল ভাবধারায় বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী তরুণ-তরুণী অভিভাবিত। এক সময় এরিক ফ্রম মার্কসবাদের সংস্কার সাধন করে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের নতুন পথের নির্দেশ দিয়ে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের আকৃষ্ট করেছিলেন। তাঁর প্রভাব স্থায়ী হতে পারে নি। কেননা তিনি সমাজপরিবর্তনের পূর্বশর্ত হিসেবে ব্যক্তিমানসের পরিবর্তন দাবি করেছিলেন এবং সেই পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিতে। তাঁর পদ্ধতিতে আশু বিপ্লবের সম্ভাবনা ছিল না বলেই বোধহয় ষাটের দশকের র‍্যাডিক্যাল ভাবধারায় আবিষ্ট তরুণ-তরুণী তাঁকে পরিত্যাগ করে মার্কুসের তত্ত্বের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। হার্বার্ট মার্কুস নৈরাজ্যের প্রশ্রয়দাতা ও সব রকম প্রতিষ্ঠান

---

* AN ESSAY ON LIBERATION: HERBERT MARCUSE. Pelican Book, 1972. First Published in U. S A by Beacon Press in 1969,

ও সংগঠন বিরোধী। কাজেই তাঁর তত্ত্বের মধ্যে আমেরিকার 'র‍্যাডিক্যাল' ও 'নয়াবাম'রা খুঁজে পেয়েছে নিজেদের তরুণমানসের আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। হার্বার্ট মার্কুস এরিক ফ্রমের একজন প্রাক্তন সহকর্মী। জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে পুঁজিবাদের সংকট নিয়ে এঁরা, আরো কয়েকজনের সঙ্গে, গবেষণায় ব্রতী হয়েছিলেন। হিটলারের অভ্যুত্থানের পর তাঁরা স্বদেশ ত্যাগ করে আমেরিকাতে এসে বসবাস করতে থাকেন। 'ইরোজ এ্যাণ্ড সিভিলিজেশন' (১৯৫৫) প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কুসের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। 'সোভিয়েত কমিউনিজম' (১৯৫৮) সোভিয়েতবিরোধীদের কাছে তাঁর প্রতিপত্তিকে বাড়িয়ে তোলে। 'ওয়ান ডাইমেনশনাল ম্যান' (১৯৬৪) প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জগদ্বিখ্যাত হন। আলোচ্য পুস্তিকাটিতে 'ইরোজ এ্যাণ্ড সিভিলিজেশন' এবং 'ওয়ান ডাইমেনশনাল ম্যান'-এর প্রধান বক্তব্যগুলি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির সারমর্ম পরিবেশিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। অন্য দুই তাত্ত্বিকের সহযোগিতায় লেখা 'এ ক্রিটিক অফ টলারেন্স' (১৯৬৭)-এর তত্ত্বেরও সম্প্রসারণ করা হয়েছে নতুন বইটিতে। কাজেই পুস্তিকাটির সমালোচনা মার্কুসের সামগ্রিক মতবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে শুরু করছি।

মার্কুস মূলত দর্শনের ছাত্র। প্রথম দিকের লেখায় (১৯৩৪-৩৮) নয়া-হেগেলীয় ধারণার প্রতিফলন থাকলেও ঐ দলের অধিকাংশের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। নাৎসী-দর্শন খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। মার্কসবাদকে তিনি হেগেলীয় দর্শনের সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধান্ত রূপে দেখতে চেয়েছেন। মার্কসবাদের অন্যান্য উৎস মার্কুস অবহেলা করেছেন বা অশ্রদ্ধাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর মতে এঙ্গেলস ও লেনিন মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ করেন নি, মার্কসবাদের মধ্যে বাইরের বিষয় আমদানী করে মার্কসবাদকে জটিল ও অপবিত্র করেছেন। জার্মানিতে থাকতেই পুঁজিবাদের সংকট সম্পর্কে তিনি গবেষণা করতে থাকেন এবং মার্কসবাদকে সময়োপযোগী করে গড়ে তুলতে মনস্থ করেন। পুঁজিবাদের সংকটের যে দিকটি তাঁকে অভিভূত করে, সেদিকটির প্রতি শিল্পী-সাহিত্যিকদেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। পুঁজিবাদের নিষ্করুণ শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার অবলুপ্তি ঘটেছে। মানুষ এখানে নিজের উপর, সমাজের উপর, নিয়ন্ত্রণক্ষমতা হারিয়ে উৎপাদকশক্তির অসহায় ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, মানুষ এই সমাজে এক দিকে নিজের

ব্যক্তিত্বকে বিলীন করে দিতে চায় একচেটিয়া পুঁজি-পরিচালিত গণমাধ্যম-অভিভাবিত সংখ্যাগরিষ্ঠের বশ্যতাপ্রণোদিত মানসিকতার মধ্যে, অন্যদিকে আবার খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন মানসিকতার পীড়নে অন্যকে অবিশ্বাস করে, সন্দেহ করে, সমাজ থেকে দূরে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করে। ব্যক্তি-মানসে বশ্যতা স্বীকারের ও অত্যাচারিত হবার যে স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, সেই প্রবণতা দূর করা না গেলে বিপ্লব ও মুক্তি সম্ভব নয়। অতীতের সব সংযোগসূত্রগুলোকে সমূলে উৎপাটিত না করা পর্যন্ত মানবমুক্তির আশা করা দিবাস্বপ্ন দেখার মতোই অলীক হতে বাধ্য। ফ্রাঙ্কফুর্টের এই দার্শনিকের ধারণা—এই সামগ্রিক পরিবর্তনের কাজে, পুরনোর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পরিকল্পনায় শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের কোনো ভূমিকা নেই। প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ শ্রমিক ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখতেই চাইবে, ভাঙতে চাইবে না। তিনি ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করেন, অবিচ্ছিন্নতাকে ব্যর্থ করেন, কার্যকারণ সম্পর্ককে মুক্তিবিরোধী মনে করেন। সমাজবাদী ব্যবস্থা মানুষের মুক্তির পথকে প্রশস্ত করতে পারে, কিন্তু তার আগে নিয়মতান্ত্রিক বিধিনিষেধের সব গণ্ডী ভেঙে ফেলা দরকার। মার্ক্সের মতে মার্কসবাদীরা অতীতের মোহ ও মায়া কাটাতে নিরুৎসাহী, কাজেই তাঁদের দিয়ে সত্যিকারের বিপ্লব ঘটানো যাবে না। ব্যক্তি-মানুষের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রাখার সমাজ মার্কসীয় পন্থায় দীক্ষিত বিপ্লবীরা কখনও গড়ে তুলতে পারবেন না।

অন্য এক ধরনের স্বাধীনতার কথা শুনিয়েছেন মার্ক্সের এক সময়কার সহকর্মী এরিক ফ্রম। তিনি দুরকমের ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেছেন। উনিশ শতকে ব্যক্তি প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভের ফলে পেয়েছিল সদর্থক বা 'পজিটিভ ফ্রিডম', আবার সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে পেয়েছিল নঙর্থক বা 'নেগেটিভ ফ্রিডম'। এই দুই প্রবণতা সমান হবার দরুণ কোনো রকমে সে স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে পেরেছিল। একচ্ছত্র পুঁজির দাপটে আজ ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে, নঙর্থক স্বাধীনতার ভারে ব্যক্তি আজ পীড়িত, ভীত, অবসন্ন। ফ্রমও বলেছেন যে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই মানুষ সুস্থ ও মুক্ত হতে পারে; কিন্তু মার্কস-নির্দেশিত পথে সেই সমাজতন্ত্র বা মুক্তি আসবে না। 'সেইন্ সোসাইটি'র আবাহক ফ্রম আর 'লিবারেশন'-এর পন্থাপ্রদর্শক মার্ক্স—দুজনেই ফ্রয়েডের মন্ত্রশিষ্য। তাঁদের মতে মানুষকে যুক্তিবাদী বুদ্ধিচালিত জীব মনে করে

মার্কস ও তাঁর অনুগামীরা মারাত্মক ভুল করেছেন। মানুষ মাত্রেই নির্জ্ঞান প্রবৃত্তি ও বাধ্যকারী নিউরোটিক প্রবণতা দ্বারা তাড়িত ও পরিচালিত—ফ্রয়েডের এই তত্ত্বকে অবহেলা করার ফলে মার্কসবাদীরা মানবমুক্তির সঠিক পন্থার সন্ধান দিতে পারছেন না। দুই তাত্ত্বিকই ফ্রয়েড বাদ দিয়ে মার্কসবাদকে সংশোধিত ও উন্নীত করার চেষ্টা করেছেন। ফ্রম সর্বজনীন সাইকো এ্যানালিসিসের সাহায্যে শ্রমিক ও অন্যান্য বিপ্লবী শক্তিকে সুস্থ করার পর তাদের সাহায্যে বিপ্লব আনার পক্ষপাতী। তা না হলে, ধনতান্ত্রিক সমাজের বাধ্যকারী নিউরোসিস, যা শ্রমিক ও অন্যান্য বিপ্লবী শ্রেণীকেও সংক্রমিত করেছে, নতুন সমাজের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বিপ্লবের উদ্দেশ্যকে, ব্যক্তির স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যাহত করবে। আগেই বলেছি, পঞ্চাশের দশকের কিছু বুদ্ধিজীবীকে আকৃষ্ট করলেও, ফ্রমের এই বিলম্বিত পন্থা ষাটের দশকের র‍্যাডিক্যাল মনোভাবাচ্ছন্ন তরুণ-তরুণীকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারে নি। মার্কুস ফ্রমের মতো সংস্কারপন্থী নন। তিনি আশুবিপ্লবের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। ছাত্রসমাজ, লুম্পেন প্রলেতারিয়েত এবং অনুন্নত দেশের কৃষকদের বিশ্ববিপ্লবের শরিক মনে করেছেন, সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক শ্রমিকদের বিপ্লবচেতনায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। প্রযুক্তি-বিপ্লবের ফলে দুনিয়ায় যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সেই পরিস্থিতিতে মার্কুসের মুক্তিতত্ত্ব স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকার ছাত্র-ছাত্রী তরুণ-তরুণীকে বিশেষভাবে অভিভাবিত করেছে এবং তিনি ছাত্রসমাজের কাছে ষাটের দশকের 'প্রফেট' বলে অভিনন্দিত হয়েছেন। র‍্যাডিক্যাল ভাবধারার সমর্থনে মার্কুস অনেক কিছু বলেছেন। তার মধ্যে একটির উল্লেখ করছি। মার্কুস মনে করেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজের নিন্দা-সমালোচনায় এ যাবৎ তাত্ত্বিকরা, বিশেষ করে মার্কসবাদীরা, তথাকথিত অবৈজ্ঞানিক ইউটোপিয়ান দূরকল্পনাভিত্তিক আলোচনা সযত্নে পরিহার করে এসেছেন। সমকালীন ব্যবস্থার মধ্যে ভবিষ্যতের যেটুকু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, কেবলমাত্র সেইটুকুরই বিকাশ ও বর্ধনকে বৈপ্লবিক কর্মধারা বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর মতে এই কারণেই ব্যক্তিমুক্তির সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ হয়েছে এবং তরুণ-তরুণীরা নতুন পথে বিপ্লব ঘটাতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। আজকের প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলে 'ইউটোপিয়া'র সংজ্ঞা বদলে গেছে। এই সমাজের মধ্যে হাজার চেষ্টা করেও সাম্য বা মুক্তি আনা যাবে না। শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালিত হলেও ব্যক্তির মুক্তি আসবে না। সেই

ব্যবস্থাতেও শোষণ ও জুলুম সমানে চলতে থাকবে।[১] এবার গ্রন্থটির সমালোচনা করা যেতে পারে।

আলোচ্য বইটির প্রথম অধ্যায়ে সমাজতন্ত্রের জৈবিক ভিত্তির আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার নীতি-দুর্নীতি, শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। জৈবিক বা বায়োলজিক্যাল কথাটি তিনি মৌলিক বৈজ্ঞানিক অর্থে ব্যবহার করেন নি।[২] পুঁজিবাদী সমাজে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আচার-ব্যবহার এমন এক রূপ নিয়েছে, যে, সেগুলো চরিতার্থ না হলে তার দৈহিক ও মানসিক প্রক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে। এই সব সামগ্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা আচার-ব্যবহারের সমষ্টিকে তিনি 'বায়োলজিক্যাল' আখ্যা দিয়েছেন। এক জায়গায় তিনি এইরকম বলেছেন। আবার অন্যত্র এই আচরণসমষ্টিকে তিনি দ্বিতীয় প্রকৃতি বা 'সেকেণ্ড নেচার' বলে অভিহিত করেছেন।[৩] এইভাবে তিনি ফ্রয়েডীয় সহজাত প্রবৃত্তি এবং পরিবেশ-প্রভাবিত শর্তাধীন পরাবর্তকে প্রায় এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন, এবং এর ফলে অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এ-কথা তিনি বেশ জোর দিয়েই বলেছেন যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রয়োগের ফলে পণ্যভিত্তিক মানসিকতা, চারিত্রিক অধোগতি ও প্রতিষ্ঠানবশ্যতা দেখা

---

১ But. we know now that neither their rational use nor—and this is decisive—their collective control by the 'immediate producers' (the workers) would by itself eliminate domination and exploitation. (Marcuse : 'An essay on Liberation.' Pelican, 1972. p 13-14)

২ I use the term 'biological' and 'biology' not in the sense of the scientific discipline but in order to designate the process and the dimension in which inclinations, behaviour patterns and aspirations become vital needs, which if not satisfied, would cause dysfunction of the organism. (Ibid. p 20, footnote)

৩ The so-called consumer economy and the politics of the corporate capitalism have created a second nature of man which ties him libidinally and aggressively to the commodity form. (Ibid. p 20)

দিয়েছে—এই প্রচার একেবারে যুক্তিহীন। তিনি মনে করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিপ্লব মানবমুক্তির অগ্রদূত ও উপায়। বর্তমান সমাজব্যবস্থার দরুণ মানুষ যন্ত্রের দাস হয়ে পড়েছে এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যা একচ্ছত্র মালিকাধীন বলেই উৎপীড়কের ভূমিকা নিয়েছে। এদিক দিয়ে তিনি মার্কসবাদীদের সঙ্গে একমত। অটোমোবাইল বা টেলিভিশন ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানোর পরিবর্তে তার অস্তিত্বের অঙ্গীভূত হয়ে তাকে পুঁজিবাদী সমাজের সঙ্গে একাত্মীভূত করে ফেলেছে। শক্তিকে যখন গঠনাত্মকের পরিবর্তে ধ্বংসাত্মক কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তখন সাধারণ মানুষ সেই ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করছে। 'একচ্ছত্র পুঁজি-পরিচালিত প্রতিষ্ঠান বা সরকার গণমাধ্যমের প্রচার-সাহায্যে মানুষকে মুনাফা-লালসার অংশীদার এবং নিজেদের অভিসন্ধি পরিপূরণের ক্রীড়নকে পরিণত করেছে। এইসব বক্তব্য নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু যখন তিনি বলেন যে, সংগঠিত ধনতন্ত্র মানুষের সহজাত ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির উদ্‌গতি (সাব্‌লিমেশন) ঘটিয়ে এবং তার অতৃপ্তি ও হতাশাকে রূপান্তরিত করে সমাজের গঠনাত্মক কাজে লাগিয়ে বিপ্লবের পথ রোধ করে রেখেছে, তখন আমরা তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারি না। প্রথমত, আমরা মনে করি না যে সব মানুষ আমেরিকায় বা যে কোনো ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সুখী ও তৃপ্ত বোধ করছে। দ্বিতীয়ত, আমরা মনে করি না প্রচার, তা সে যত কৌশলীই হোক না কেন, সব মানুষকে রাষ্ট্র বা সমাজের একান্ত বশম্বদ ও অনুগামী করতে পেরেছে। ঐ সমাজব্যবস্থায় লাভবান হচ্ছেন, এমন অনেকের চেতনাতেও সমাজের নিপীড়ন, উৎপীড়ন, শোষণ প্রতিফলিত। তা না হলে মার্ক্স এই ধরনের কথা লিখতে পারতেন না এবং তাঁর লেখার পাঠকও জুটত না। তা ছাড়া, আক্রমণাত্মক ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি সহজাত—এই ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সমর্থক নন, এমন মনোবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানীর সংখ্যাও কম নয়। জৈবপ্রবৃত্তির 'সাব্‌লিমেশন'-এর ফলে সৃজনাত্মক ধর্মের বিকাশ ঘটে—এই তত্ত্বও বিজ্ঞানসমর্থিত নয়। সংগঠিত পুঁজিবাদী দেশে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে সংগঠিত দুর্বৃত্ত দুষ্ক্রিয়াকারীর দল। ভিয়েতনামের মতো যুদ্ধে সৈন্যসংগ্রহ করার ব্যাপারে সহজাত আক্রমণ-প্রবৃত্তিকে গণপ্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে দেশের শোষক অত্যাচারী-শ্রেণীর বদলে বাইরের কাল্পনিক শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত করা হয় বললে সব কথা বলা হয় না। সামরিক বাহিনীতে যারা নাম লেখায় তারা সকলেই ধ্বংস-

দেবতা থ্যানাটসের পূজারী অথবা যুদ্ধের মাধ্যমে প্রজাতিনিধনযজ্ঞে নিয়োজিত হয়ে নিজের মনের জিঘাংসা প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করতে চায়—এইসব বহুপ্রচারিত ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব শ্রুতিবিনোদক ও জনপ্রিয় বটে, কিন্তু সঠিক নয়। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার কঠোর সমালোচক মার্কুস এই সব ফ্রয়েডীয় ধ্যানধারণার উপর অতি-গুরুত্ব স্থাপন করার ফলে পাঠকের মনে বিভ্রান্তি জাগা বিচিত্র নয়। ফৌজী-বাহিনীতে নাম না লেখালে যদি বেকার থাকা ছাড়া গত্যন্তর না থাকে, তবে সেই নাম লেখানোকে তার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না বলে বাধ্যতামূলকই বলা উচিত। মার্কুস অবশ্য একথা বলেছেন যে সমৃদ্ধ দেশে প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাস করেও ব্যক্তিমানসে উচ্চ স্তরের চেতনা ও র‍্যাডিক্যাল ভাবধারার বিকাশ ঘটতে পারে কিন্তু এ যুগের 'করপোরেট ক্যাপিটালিজম'-এর গণমাধ্যম সেই বিকাশের পথ রোধ করেছে কৌশলী কূটপ্রচারের সাহায্যে। ভোগ্যপণ্য এবং সংস্কৃতি-পণ্য প্রায় সমানভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল মধ্যবিত্ত এবং সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর কাছে; ফলে শ্রমিকশ্রেণীর মানসিকতায় বিপ্লবী চেতনার বিকাশ ঘটার সম্ভাবনা বর্তমানে সুদূরপরাহত, এবং সেই কারণে তারা অনগামী বুদ্ধি-জীবীদের প্রতি, র‍্যাডিকাল মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছাত্রতরুণদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন।[8] শ্রমিকশ্রেণী আজও বিষয়গত দিক থেকে বিপ্লবের 'হিস্টরিক্যাল এজেণ্ট'। কিন্তু বিষয়ীগত দিক থেকে তারা সংরক্ষণশীল, বলা চলে, প্রতিক্রিয়ার স্তম্ভ। তারা প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখার স্বপক্ষে থাকতে বাধ্য, কারণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তারা মানসিক আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। সমৃদ্ধ দেশের যেসব মানুষ প্রতিষ্ঠানবিতরিত সুখ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত (যেমন আমেরিকার ঘেট্টো-অধিবাসীরা), যাদের মধ্যে পুঁজিবাদী পণ্যপূজার সংস্কৃতি এখনও অনুপ্রবিষ্ট হয় নি—তারা সুবিধাভোগী ও বঞ্চিত শ্রেণীর মধ্যেকার আসমান-জমিন ফারাকটা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে এবং তারাই র‍্যাডিক্যাল ভাবধারা সহজেই গ্রহণ করতে সক্ষম। অনুন্নত দেশের

---

৪ ···The majority of organised labour shares the stabilizing, counter-revolutionary needs of the middle classes, as evidenced by their behaviour as consumers of the material and cultural merchandise, by their emotional revulsion against non-conformist intelligensia. (Ibid. p 24)

শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষেও এই কথা প্রযোজ্য।[৫] মার্কসের এই মতবাদের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন না তুলেও বলা চলে যে ঘেট্টো-অধিবাসী এবং অনুন্নত দেশের শ্রমিক-শ্রেণী কিভাবে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ও প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারে, তার কোনো সঠিক নির্দেশ মার্কুস দিতে পারেন নি। 'ওয়ান ডাইমেনসনাল ম্যান' (১৯৬৪)-এর পরিশিষ্টে প্রতিবাদ ও অননুগামিতা ছাড়া বিপ্লব ঘটাবার আর কোনো সুপরিকল্পিত ফর্মুলার নির্দেশ আছে কি? সমৃদ্ধ দেশের 'লুম্পেন' ও অনুন্নত দেশের নির্যাতিত বঞ্চিতের দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সামাজিক পরিবর্তনকে তিনি দৈব ঘটনার সামিল বলে ভেবেছেন।[৬] কিন্তু তাঁর 'অন লিবারেশন' (১৯৬৯) পুস্তিকায় তিনি যেন কিছুটা বেশি সচেতন এবং বিপ্লবের আশু সম্ভাবনায় বিশ্বাসী। মুক্তির প্রতিশ্রুতিময় এই বিপ্লবের আগমনী সঙ্গীত তিনি শুনেছেন ছাত্র-তরুণ ও হিপিদের প্রচলিত সংস্কৃতিবিরোধী স্লোগানের ও ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে। উৎসাহিত বোধ করেছেন এই ভেবে যে আজকের তরুণ-তরুণীরা সর্বাত্মকভাবে ঐতিহ্যকে অস্বীকার ও নস্যাৎ করতে চাইছে। তাদের মধ্যে নতুন সংবেদনশীলতা, নতুন ধরনের আবেগপ্রবণতার উন্মেষ ঘটেছে, যার ফলে তারা অপরাধবোধ থেকে মুক্ত হয়েছে। তারা পিতৃপুরুষদের সঙ্গে একাত্মীভূত হতে চায় না, তাদের পাপের অংশগ্রহণে রাজী নয়। ঘেট্টো, ভিয়েতনাম ইত্যাদি স্থানে অনুষ্ঠিত পাপাচারের সঙ্গে তারা কোনো সম্পর্ক না রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উত্তরপুরুষরা যদি পূর্বপুরুষদের এইভাবে অস্বীকার করতে পারে,

---

৫ ···Where the consumer gap is still wide, where the Capitalist culture has not yet reached into every house or hut, the system of stabilizing needs has its limits ; the glaring contrast between the privileged class and the exploited leads to a radicalization of the underprivileged···this is also the case of the labouring classes in the more backward capitalist countries. (Ibid. p 25)

৬ The chance was that the substratum of the outcasts and outsiders, the exploited and prosecuted of other races and other colours, the unemployed and unemployable might turn to radical action. (Mc. Intyre : Marcuse. Fontana, 1970. p 87)

তবেই, মার্কুস মনে করেন, মুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। এই সব বক্তব্য পেশ করার জন্য মার্কুস তরুণ-প্রবীণ সকলেরই ধন্যবাদ ও সমর্থন পেতে পারতেন যদি তিনি ফ্রয়েডীয় লিবিডোতত্ত্বের এবং ঈদিপাস কমপ্লেক্সের সাহায্যে বর্তমান পুরুষের মানসিকতা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত না হতেন।[৭] তিনি লিখেছেন যে প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রনায়করা সভ্যতার 'মর‍্যাল টাবু' ভঙ্গ করছেন, শান্তির জন্য যুদ্ধ ও হিংস্রতাকে প্রশ্রয় দিয়ে মানুষকে অমানুষ করছেন, এতে তাঁদের মনে অপরাধবোধ বা লজ্জাবোধ দেখা দিচ্ছে না। অজাচার ও নিষিদ্ধ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়াকে বিশেষভাবে দুর্নীতিমূলক বলে প্রচার করা হচ্ছে, (আবার নানাভাবে পণ্যের বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে শিল্পসাহিত্যে) নগ্নতা যৌনতা নিষিদ্ধসম্পর্ক স্থাপনকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা মনে করছেন যে এর ফলে তরুণ-তরুণীরা টাবু ভঙ্গ করবে এবং পাপবোধে পীড়িত হয়ে পিতৃপুরুষ ও সমাজের অভিভাবকদের কাছে নতি ও বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। অথবা যৌনবিধি ভঙ্গের মধ্যেই তাদের বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সমাজপিতারা এমন ভাব দেখাতে চান যাতে বিদ্রোহীদের ধারণা হয় যে তাঁরা অশেষ ক্ষমতাশালী হওয়া সত্ত্বেও সহিষ্ণু ও

৭ This would be the sensibility of men and women who do not have to be ashamed of themselves any more because they have overcome their sense of guilt, they have learnt not to identify themselves with the false fathers who have built and tolerated and forgotten the Auschwitzs and Vietnams of history...If and when men and women act and think free from this identification, they will have broken the chain which linked the fathers and the sons from generation to generation · ···These causes are economico-political but since they have shaped the very instincts and needs of men, no economic and political changes will bring this historical continuam to a stop unless they are carried through by men who physiologically and psychologically able to experience things, and each other, outside the context of violence and exploitation. (An Essay On Liberation : Marcuse. Pelican, 1972. p 32-33)

ক্ষমাশীল। ছাত্র-ছাত্রী তরুণ-তরুণীদের আচার-ব্যবহার-কার্যকলাপ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে সমাজপতি রাষ্ট্রনায়কদের এ কৌশল কার্যকর হচ্ছে না।

তাদের বিদ্রোহ কেবলমাত্র যৌনবিধিনিষেধ লঙ্ঘনেই পর্যবসিত থাকছে না। অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা আইন ভঙ্গ করছে, 'টাবু'র সীমানা অতিক্রম করছে। তাদের অপরাধবোধ পাপবোধ কমছে না, অবদমনও ঘটছে না। বরং পাপ-বোধকে তারা পাত্রান্তরিত করে সমাজপতি ও পিতৃপুরুষদের উপর আরোপ করছে। তারা বলছে, তারা এই সব ভণ্ড নেতাদের কারচুপি ধরে ফেলেছে। এই সব রাষ্ট্রনেতাদের তৈরি শঠতা ও হিংস্রতার জগতে তারা থাকবে না। তারা একেবারে নতুন করে পৃথিবী গড়তে চাইছে।[৮] 'ইডিপাল' (Oedipal), 'লিবিডিনাল' (Libidinal) ইত্যাদি ফ্রয়েডীয় শব্দের সাহায্যে অবদমন-উদ্গমন তত্ত্বকে শিল্পসাহিত্য ও সভ্যতাসংস্কৃতির বিশ্লেষণে প্রয়োগ করে, মার্কুস বিপ্লব ও মুক্তির পথের কোনো নতুন নির্দেশ দিতে পারেন নি। মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ করার নামে এরিক ফ্রমের মতোই তিনি মার্কসবাদকে বিকৃত করেছেন। এই নতুন বইটিতে তিনি আগের মতো ('ইরোজ এ্যাণ্ড সিভিলিজেশন'—১৯৫৫) যৌনতার অতিরিক্ত দমন-পীড়ন (Surplus suppression)-এর বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানান নি বটে, কিন্তু মৃত্যুরতিতত্ত্বকে আগের মতোই গুরুত্ব দিয়েছেন। রতির আনন্দকে মার্কুস মুক্তির আনন্দের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করেছেন। মুক্তি আর ব্যক্তিসুখকে সমার্থবাচক বলে মার্কসবাদীরা মনে করেন না। অপরদিকে মার্কস মুক্ত মানবসমাজকে ব্যক্তির সুপ্ত মানবিক গুণ বিকাশের পক্ষে অনুকূল ক্ষেত্র বিবেচনা করেছেন। মানুষ অজ্ঞতার দরুণ অল্পে তুষ্ট থাকতে পারে, স্থূল ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে পরমানন্দ অনুভব করতে পারে। মার্কুসের আনন্দবাদের সঙ্গে মার্কসের সুপ্তসম্ভাবনাবিকাশের কোনো সম্পর্ক নেই। মার্কসবাদী শোষণহীন মুক্ত সমাজ গড়তে চায় সত্তার উৎকর্ষের জন্য, আত্মিক উন্নয়নের জন্য, দুর্লভকে লাভ

---

৮ ...the violation of taboos transcends the sexual sphere and leads to refusal and rebellion, the sense of guilt is not alleviated and repressed but rather transferred : not we, but the fathers are guilty; they are not tolerant but false; ···they have created a world of hypocrisy and violence in which we donot wish to live...(Ibid. p 19)

করার জন্য ; কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভূত আনন্দলাভের জন্য নয়। আত্মপ্রকাশের আকুতি ও বেদনা সাম্যবাদী সমাজেও অব্যাহত থাকবে। মার্কসের ব্যক্তিমুক্তি ও মুক্তসমাজ সব মানুষের কাম্য হতে পারে না।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, মার্কসের ফ্যাসিবাদবিরোধিতা ও সমকালীন পুঁজিবাদ সম্পর্কিত তীক্ষ্ণ কঠোর সমালোচনা অনেক বুদ্ধিজীবীকে ও ছাত্র-তরুণকে পুঁজিবাদ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করেছে। তাছাড়া ব্যক্তিমন সম্পর্কে ও পুঁজিবাদী সমাজের সমালোচনায় তিনি এমন অনেক কথা বলেছেন, যা এতদিন মার্কসবাদী পণ্ডিতদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। মার্কুস যদি ফ্রয়েডীয় মেটা-সাইকলজির সাহায্য না নিয়ে বস্তুবাদনির্ভর মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিতেন, তবে বোধহয় পরিবর্তমান পৃথিবীর প্রযুক্তিবিপ্লবকেন্দ্রিক সমস্যাসমূহ সমাধানে সত্যিকারের সাহায্য করতে পারতেন। মার্কসবাদের বিকাশে যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন। র‍্যাডিক্যাল সমালোচনা অনভিজ্ঞ তরুণদের বিপথে পরিচালিত করতে পারে এবং দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের মার্কসবাদ-বিরোধিতাকে সাহায্য করতে পারে। বস্তুত মার্কুস ও ফ্রমের সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী শিবিরের তাত্ত্বিকদের হাতের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা চলে যে মার্কুস যে সংখ্যালঘুর একনায়কত্বের সুপারিশ করেছেন, বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা সেটাকে মার্কস-অনুমোদিত লেনিন-নির্দেশিত ব্যবস্থা বলে প্রচার করার সুযোগ পেয়েছেন। কিছুকালের জন্য সংখ্যাগুরু একনায়কত্বের বিধান (যতদিন না প্রতিবিপ্লবী শক্তি সশস্ত্র প্রতিরোধব্যবস্থা থেকে নিবৃত্ত হচ্ছে) মার্কসবাদে আছে, কিন্তু সংখ্যালঘু একনায়কত্বের বিধান নেই।

আলোচ্য পুস্তকটিতে শিল্পসাহিত্য, নবলব্ধ সংবেদনশীলতা এবং 'অভিন্নতা' সম্পর্কে আলোচনা আছে।

মুক্ত সমাজে মানুষ কি করবে? এর উত্তরে মার্কুস-উদ্ধৃত এক কৃষ্ণাঙ্গ তরুণীর উক্তি আমার ভালো লেগেছে।[৯]

---

৯ .. What are the people in a free society going to do? The answer which, I believe, strikes at the heart of the matter was given by a young black girl. She said for the first time in our life, we shall be free to think about what we are going to do... (Ibid. p 93)

আলোচনা কিছু কিছু জায়গায় মনোজ্ঞ, বামপন্থী রাজনীতিতে নবদীক্ষিত এবং সমাজতন্ত্র ও বিপ্লব সম্পর্কে আগ্রহী পাঠকদের ভালো লাগবে। মতপার্থক্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা সত্ত্বেও মার্কসবাদীদের ভাবনাচিন্তার কিছু খোরাকও বইটিতে মিলবে। বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে পড়লে ও নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলে লাভবান হবারই সম্ভাবনা।

এই লেখাটির কিছু কিছু জায়গায় 'মানবমন' (অকটোবর ১৯৭০)-এ প্রকাশিত 'মার্কস ফ্রয়েড ও বিপ্লব' শীর্ষক প্রবন্ধটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং ম্যাকইনটায়ারের 'মার্কস' (ফনটানা : মডার্ন মাস্টারস—১৯৭০) বইটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে। —লেখক

ওকনাশ ও সমাজতন্ত্র

দিলীপ বসু

'চলন্তিকা' 'একোলজি'র বাংলা করেছে "বাস্তব্যবিদ্যা"। গ্রীক শব্দ 'অইকস্'-এর মানে হল বাস্তু ; কিন্তু সংস্কৃতে আর-একটি একই অর্থে শব্দ রয়েছে 'ওক'। অতএব আমরা 'ওক' শব্দটিকেও ব্যবহার করতে পারি। সেই আমাদের বাস্তু 'পৃথিবী'র পরিবেশ মানুষ যে এমনভাবে দূষিত করে তুলছে যাতে পৃথিবী আর কিছুদিন পরে বাসের অযোগ্য হয়ে যাবে—এ বোধ একেবারে সাম্প্রতিক কালের, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরও পরে, মোটামুটি ষাটের দশকের গোড়া থেকে। অবশ্য কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক খানিকটা বিচ্ছিন্ন ভাবে ওকনাশের ব্যাপারে মানুষকে অবহিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের দূরদৃষ্টি নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষের, এমন কি রাজনৈতিক বা সামাজিক নেতাদের মধ্যেও পাওয়া যাবে না। অথচ আমাদের বাসভূমি পৃথিবী, তার জমি জল ও বায়ু—এক কথায় তার বায়োস্ফিয়ার বা আবহমণ্ডল—যে হারে আমরা দূষিত করে চলেছি, তাতে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিপদাপন্ন হয়ে পড়তে পারে।

আলোচ্য তিনটি পুস্তক * ছাড়াও অবশ্য বাজারে আরো বহু পুস্তক পাওয়া যায়—আমরা এই তিনটি বেছে নিয়েছি। প্রথমটি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের লেখা একটি ছোটো পুস্তিকা, দ্বিতীয়টি ৫৮টি দেশের ১৫২ জন সভ্য সংবলিত ইউনাইটেড নেশনসের সাধারণ সম্পাদকের কাছে লিখিত একটি বিরাট রিপোর্টের সারাংশ মাত্র, আর তৃতীয়টি আমেরিকার

---

* ECOLOGY : CAN WE SURVIVE UNDER CAPITALISM : GUS HALL. New World paper back New York.

* ONLY ONE EARTH : THE CARE AND MAINTENANCE OF A SMALL PLANET : BARBARA WARD and RENE DUBOS. pelican.

* THE CLOSING CIRCLE, NATURE MAN AND TECHNOLOGY : BARRY COMMONER. Bantam.

একজন বিখ্যাত অধ্যাপকের লেখা বই—যার সম্পর্কে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' বলছে যে যদি কোনো একটি মাত্র/বই আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের পড়বার সময় থাকে, তাহলে এইটি তাঁর পড়া উচিত।

প্রথমে আমরা ওকনাশের সমস্যাটা এক নজরে দেখে নি, তারপরে বিশেষ করে বই তিনটি নিয়ে খানিকটা আলোচনা করা যাবে।

পৃথিবী যেন ব্যোমযান

পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। আর জল-স্থল নিয়ে ৮০০০ মাইল ব্যাসযুক্ত যে পৃথিবী, তার চারধারে যেন একটি পাতলা বায়ুমণ্ডলের আবরণ পরানো আছে, যেটি মাত্র ২৫০/৩০০ মাইল পুরু। অর্থাৎ, পৃথিবীকে যদি আমরা একটি ৮০০০ মাইল ব্যাসের অতিকায় কমলালেবু ভাবি, তাহলে ঐ কমলালেবুর পুরু শাঁসের চারধারে যেন একটি পাতলা খোসা পরানো আছে: মাত্র ২৫০/৩০০ মাইলের এই খোসাটি হল আমাদের বায়ুমণ্ডল।

পৃথিবীকে ত্রিমাত্রিকরূপে না ভেবে যদি আমরা দ্বিমাত্রিকরূপে কল্পনা করি (যেভাবে সাধারণত আমরা দেখতে অভ্যস্ত), তাহলে ভূপৃষ্ঠে আমাদের মাথার উপরে যেন একটি বায়ুসমুদ্র রয়েছে, ২৫০/৩০০ মাইল গভীর যে বায়ুসমুদ্রের একেবারে তলদেশে আমরা বিচরণ করি।

এই জল-স্থল-বায়ুর (বা আকাশের) বাইরের সমস্ত জায়গাটাই, যাকে এক কথায় আমরা 'মহাকাশ' বলতে পারি—আমাদের জীবনধারণের প্রতিকূল। অবশ্য জলে-স্থলে-আকাশে আমাদের স্বচ্ছন্দ বিহার সম্ভব নয়, জলের নীচে আমরা বাস করতে পারি না, সমুদ্রতল থেকে তিন-চার মাইল উচ্চে আকাশে গেলেই আমাদের বাঁচার সীমানা এসে গেল (৬ মাইল উঁচু মাউণ্ট এভারেস্টের শীর্ষেও বিনা অকসিজেনে বাঁচা সম্ভব নয়), আর জমিতেও বেশি ঠাণ্ডা বা গরম হলে—যেমন মেরুদেশে বা মরুভূমিতে—সাধারণভাবে বাঁচা সম্ভব নয়।

কাজেই এতাবৎ সমগ্র পৃথিবীর বায়ুভাগ (বা আকাশ) ছেড়ে দিয়ে জল-স্থলের হিসাব ধরলেও, আমরা পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ স্থলভাগের মাত্র অর্ধেকে—মোট পৃথিবীর এক-অষ্টমাংশে বাস করি।

জল-স্থল-আকাশ নিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে আমরা ভাবতে পারি **যেন একটি ব্যোমযান**। এটা মোটেই কষ্টকল্পনা নয়, কারণ আজকের মানুষের হাতে-

গড়া ব্যোমযান যখন পৃথিবীর আবহমণ্ডল ছাড়িয়ে মহাকাশে যাত্রা করে, তখন সেই ব্যোমযানকে একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা করে, প্রয়োজন মতো তাতে বাস্তব্য-চক্র (ecological circuit) তৈরি করে দিতে হয়।

বাস্তব্য-চক্র

একটা সাধারণ উদাহরণ ধরা যাক। আমাদের বাঁচার জন্য একান্ত প্রয়োজন অকসিজেন যেটা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে রয়েছে শতকরা ২১ ভাগ। আমরা ৩৩০ কোটি মানুষ প্রতি ২৪ ঘণ্টায় যে পরিমাণ অকসিজেন প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে নিঃশ্বাসের সঙ্গে কারবন ডাই-অকসাইড্ রূপে ফেরত দি, তাতে অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দূষিত কারবন ডাই-অকসাইডে ভর্তি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। হচ্ছে না, কারণ আমাদের নিঃসৃত কারবন ডাই-অকসাইডকে উদ্ভিদরা গ্রহণ করে তাকে আবার অকসিজেন রূপে ফেরত দিচ্ছে।

তেমনি আমরা খাদ্যের সঙ্গে যে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে থাকি, তাকে মল-মূত্রের সঙ্গে নিষ্কাশন করে আবার জমিতে ফেরত দিয়ে, জমিকে উর্বর করে, আবার তাকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করি।

এই অকসিজেন-কারবন ডাই-অকসাইড চক্র অথবা নাইট্রোজেন চক্র না থাকলে পৃথিবী আমাদের বাসযোগ্য হত না। **এখন কিন্তু মানুষ তার কাজকর্মের দ্বারা এই ধরনের অনেক স্বয়ংসম্পুর্ণ চক্রকেই ভাঙতে চলেছে।**

কমরেড গাস হল তাঁর বইতে হিসাব কষে দেখিয়েছেন (পৃ ১৬) যে, কয়েকটি শিল্পে-অগ্রসর সাম্রাজ্যবাদী দেশ তাদের কারখানার চুল্লি ইত্যাদি জ্বালাতে গিয়ে যে-পরিমাণ অকসিজেন খরচ করে, সেই পরিমাণের অকসিজেন তারা তাদের নিজস্ব দেশের গাছপালা থেকে ফেরত পায় না (সালোক-সংশ্লেষের প্রক্রিয়াতে); তবে তারা বেঁচে আছে কারণ অন্যান্য অনুন্নত দেশে যেখানে চাষবাস বেশি, সেখান থেকে এই অকসিজেনের ঘাটতি পূরণ হয়। **এও এক ধরনের ঔপনিবেশিক শোষণ** বলা যেতে পারে। গাস হল লিখছেন : "It is another parasitic form of exploitation of neocolonial nations by the imperialist countries."

এর ফল অবশ্য খোদ আমেরিকাতেই মারাত্মক ভাবে দেখা দিয়েছে। লস এনজেলেসের বায়ু বিষাক্ত, পটোমাক্ নদীর জল বিষাক্ত; অবশ্য আমাদের

কলকাতার গঙ্গা বা ভাগীরথীর জল নদীর দুধারের ৫০ মাইল ব্যাপী ফ্যাক্টরির নির্গত দূষিত পদার্থে একেবারে পয়ঃপ্রণালীর রূপ ধারণ করেছে। লস এনজেলেস, চিকাগো, নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন না গিয়ে খোদ কলকাতার কথায় আসা যাক। শীতের ভারী বাতাসে সন্ধ্যাবেলা কয়লা ধোঁয়ার পরিমাণ যে ভাবে বাড়ছে, তাতে এখানকার আবহাওয়া একেবারে বিষাক্ত হয়ে যেতে পারে।

ধোঁয়া থেকে নানারকমের ফুসফুসের অসুখ, এমন কি ফুসফুসের ক্যানসার কি পরিমাণে বাড়ছে সেটা অবশ্য কলকাতাতে কেউ হয়তো হিসাব করে না, তবে আমেরিকাতে এ নিয়ে বেশ কিছু চিন্তা-ভাবনা দেখা দিয়েছে, আলোচ্য তিনটি পুস্তকেই এ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যাবে।

তারপর ধরা যাক, নাইট্রোজেন চক্র। আমেরিকাতে ডি. ডি. টি. ইত্যাদির বহুল ব্যবহার হওয়াতে জমির যে নিজস্ব ছোটো বাস্তব্য-চক্র থাকে, সেটা প্রায় সাবাড় হতে বসেছে। একটা অতি-সাধারণ উদাহরণ দেয়া যাক। কেঁচো, দেখতে ছোটো, কিন্তু তার মাটি ফুঁড়ে গমনাগমনে তলাকার ভালো উর্বর মাটি উপরে চলে আসে, আবার উপরের মাটি নীচে চলে যায়। যদি ডি. ডি. টি.-র বহুল ব্যবহারে কেঁচোর বংশনাশ হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে জমিরও উর্বরত্বের সমূহ ক্ষতি। এ সম্পর্কে প্রচুর টেকনিক্যাল আলোচনা প্রতিটি বইয়েতেই আছে, তবে তার উদ্ধৃতি স্থানাভাবে সম্ভব নয়, বোধহয় প্রয়োজনও নেই।

আসল প্রশ্নে আসা যাক। প্রফেসার ব্যারি কমনার বলছেন (The closing circle) :

> "Biologically human being *participate* in the environment system as subsidiary parts of the whole. Yet, human society is designed to *exploit* the environment as a whole, to produce wealth. The paradoxical role we play in the natural environment—at once participant and exploiter—distorts our perception of it."

(পৃ ১১, ইটালিকস মূল বইতে)

তাহলে আমাদের যে পরিবেশ, তাতেই নিশ্চয়ই যেমন আমাদের বেঁচে থাকতে হবে, তেমনি ঐ পরিবেশকেই প্রয়োজন মতো আমাদের বদলে নিতে হবে। মানুষের সঙ্গে তার পরিবেশের সম্পর্কটি ডায়ালিকটিকীয় (দ্বন্দ্বসমন্বয়ী)।

আজকে বিজ্ঞান পৃথিবীকে যাকে বলে ছোটো করে এনে আমাদের সমস্ত পরিবেশকে যেন এক জায়গায় জড়ো করেছে। কোনো দেশকেই আজ আর আলাদা, একক বলে ভাবা যায় না। ফলে এক দেশের-কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ সরাসরি প্রভাব অন্য দেশে পড়ছে। এ অবস্থায় সারা ভূগোলক জুড়ে প্ল্যানিং করা অপরিহার্য, যেটা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যক্তিগত মালিকানাতে সম্ভব নয়।

সত্য বটে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি দ্রুত হারে হচ্ছে। রোমের পতনের সময় সারা পৃথিবীর জনসংখ্যা যেখানে ছিল মাত্র ৪০ কোটি—পরের ১০০০ বছরে, ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ, সেটা দাঁড়াল প্রথম ১০০ কোটিতে। তার পরের ১০০ কোটি (মোট ২০০ কোটি) যোগ হল পরের ৩০০ বছরে, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। এর পরের ১০০ কোটি (মোট ৩০০ কোটি) যোগ হল পরের ৫০ বছরে, ১৯৫০ সালে। আর ১৯৮০ সালে, পরের ৩০ বছরে, আরো ১০০ কোটি যোগ হয়ে এই জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৪০০ কোটিতে। শতাব্দীর শেষে, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়াতে, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৬০০ কোটিরও বেশি। (Only One Earth, পৃ ৪১)

অতএব অনেকের ধারণা, ভূ-ভার হরণের জন্য মহাকুরুক্ষেত্রের প্রয়োজন আছে—তাপ-পারমাণবিক অস্ত্রের সাহায্যে, এ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহার করে, পৃথিবীকে মহাশ্মশানে পরিণত করো !

মোটেই নয়, বরঞ্চ এর উল্টো।

আমরা আজ জানি, সূর্যশক্তির প্রধান উৎস কোথায়—হাইড্রোজেন পরমাণুর হিলিয়ামে রূপান্তরণে সূর্যের এবং নক্ষত্রের যে প্রায় অফুরন্ত শক্তির পরিমাপ আমরা দেখতে পাই, সেই সূর্যশক্তিবলে বলীয়ান মানুষ তার নিজস্ব বাসভূমি পৃথিবীকে নন্দনকাননে পরিণত করতে পারে, গ্রহান্তরেও তার বিজয়রথ অব্যাহত গতিতে চলতে পারে। কেবলমাত্র প্রয়োজন—তার সামাজিক-আর্থনীতিক-রাজনৈতিক পরিবেশকে সুস্থ করা।

পৃথিবীতে ধনতন্ত্রের পরাজয়ের বাস্তবমুখী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বহুদিন আগে, সেই ১৯১৭-এর ৭ নভেম্বরে, মহান রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে।

ধনতান্ত্রিক জগতের পীঠস্থান খোদ আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড গাস হল তাই তাঁর পুস্তকের নামই দিয়েছেন : 'আমরা কি ধনতন্ত্রে বেঁচে থাকতে পারি ?' ধনতন্ত্রের উচ্চতম রূপে সাম্রাজ্য-বাদের জঘন্যতম রূপ আমরা ভিয়েতনামে দেখেছি। ভিয়েতনামের জনসাধারণকে

কেবল হত্যা করা হচ্ছে তাই নয়, তার ওকনাশও করা হচ্ছে। ২-২-৫-টি বলে একটা রাসায়নিক দ্রব্য আছে। পোকামাকড় মারবার জন্য আমেরিকাতে এর চল আছে। নেভাদাতে এই রাসায়নিক পদার্থ একবার হাওয়ায় উড়ে গিয়ে পড়েছিল ভেড়া ও ছাগলের মধ্যে, ফলে শতকরা ৬০ ভাগ ভেড়া ও ছাগল মরা বাচ্চার জন্ম দিয়েছিল। দক্ষিণ ভিয়েতনামে শতকরা ৪৫ ভাগ জমি এই ২-২-৫-টি দিয়ে লেপে দেওয়া হয়েছে, আর যে রাসায়নিক দ্রব্যটি ব্যবহার করা হয়েছে তার ঘনত্ব আমেরিকায় জমিতে ব্যবহার্য রাসায়নিক দ্রব্যটির থেকে ১৩ গুণ বেশি। এখন প্রমাণিত হয়েছে, এই সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য থেকে ক্যানসার হয়। আর সেটা চলে পুরুষানুক্রমে। 'Ecocide in Indo-china' বলে একটা পুরো বই লেখা হয়েছে যাতে এ সম্পর্কে আরো প্রচুর তথ্য পাওয়া যাবে।

সমাজতন্ত্র ও পরিবেশ

আগেই বলেছি, সমাজতন্ত্র ছাড়া যেমন সারা দেশ জুড়ে তেমনি সমগ্র ভূগোলক ব্যেপে পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়; আর তা না করতে পারলে বাস্তব্য-বিদ্যার সমস্যা নিয়ে অজস্র বই লেখা হতে পারে (বিশ্ব-পরিকল্পনার পক্ষে জনমত গঠনের জন্য তারও বিশেষ প্রয়োজন আছে), কিন্তু উৎপাদনব্যবস্থাতে ব্যক্তি-গত মালিকানার ব্যবস্থা থাকলে প্রতি পরিকল্পনাতেই মুনাফার প্রশ্নটাই প্রাধান্য পাবে। কমরেড গাস হল বলছেন:

> "সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রের মৌলিক ভুলকে শুধরে দেয়। মানুষকে তা নতুন পথে নিয়ে আসে। উৎপাদনের যন্ত্রসমূহ—ফ্যাক্টরি, খনি ও কারখানাগুলি—সাধারণ মানুষের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়। (সমাজতন্ত্রে) তারা **একমাত্র** মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই কাজ করে, ব্যক্তিগত মুনাফা সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়। এটাতে জরুরী অবশ্য করণীয় কাজ ঠিক করা হবে (priorities) এবং নতুন মূল্যবোধ নির্ধারিত হবে। এই হল তাহলে কাঠামো, যার চৌহদ্দিতে সকল প্রশ্ন নির্ধারণ করা হয়। যদি কোনো ব্যাপার ঘটালে সাধারণ লোকের ভালো না হয়, তাহলে সেটা সমাজতান্ত্রিক দেশে ঘটে না। পরিষ্কার পরিবেশ সাধারণের স্বার্থে প্রয়োজন। অতএব এটা সেখানে করা হবে।" (পৃ ৭৭, বঙ্গানুবাদ সমালোচকের)

কমরেড গাস হল তাঁর বইতে সোভিয়েত একাডেমিসিয়ান ইগর পেট্রিনভের

লেখা ('সোভিয়েট লাইফ', নভেম্বর ১৯৭০) থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এখানে তার অংশবিশেষ তুলে দিয়ে আলোচনা শেষ করি :

"যখন আবহমণ্ডলকে বাঁচিয়ে রাখার প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, আমাদের তখন স্থির বিশ্বাস যে, সহজাত বিবর্তনের ওপর আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। কারণ বিবর্তনের প্রতিটি বাঁকের মুখেই রয়েছে দুটি বিকল্প পথের সন্ধান, যার মধ্যে একটি নিয়ে যাবে মানব জাতির মৃত্যুর দিকে। ...বুদ্ধিমান প্রাণীর পক্ষে একমাত্র সম্ভাব্য ও যুক্তিসঙ্গত পথ হচ্ছে টেকনলজির পথ ধরা, যার অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে — লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার অবহিত হওয়া এবং নিশ্চিত কোন পথ অনুসরণ করলে লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে, তার জন্য কাজ করা। তার অর্থ, নতুন ধরনের শিল্প গড়ে তুলতে হবে, অনেক শিল্পের প্রক্রিয়াকে একত্র করে এমন সামূহিক শিল্প (composite enterprises) গড়ে তুলতে হবে যাতে চিমনি থাকবে না (অর্থাৎ ধোঁয়া ছাড়বে না) বা শিল্পগত দূষিত পদার্থ থাকবে না, যাতে সবটা বা প্রায় সবটা কাঁচা মালকে—শিল্পের প্রয়োজনে যা ব্যবহার করা হবে—মানুষের উপকারে লাগে অথবা ক্ষতি না হয় এমন বস্তুতে পরিণত করা যাবে। যত শীঘ্র এই ধরনের শিল্প সারা দুনিয়া জুড়ে গড়ে ওঠে, ততই আমাদের পৌত্র-বংশের পক্ষে মঙ্গল।" (বঙ্গানুবাদ সমালোচকের)

বলা বাহুল্য, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই ধরনের বহু শিল্প গড়ে উঠছে ও উঠবে। সেখানে যেমন রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশ তেমনি পার্থিব পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ।

নিপীড়িতের শিক্ষা

বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়

পাওলো ফ্রেইরের নাম এখন ব্রাজিলের উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে ছড়াতে ছড়াতে সমগ্র লাতিন আমেরিকায় পরিব্যাপ্ত। তাঁর Cultural Action for Freedom ও Pedagogy of the Oppressed* বই দুটি বেরোনোর পর থেকে তিনি এখন জগদ্বিখ্যাত হওয়ার পথে। গতবছর একবার ভারতবর্ষেও এসেছিলেন। মহীশূরের গ্রামে কাজ করতে গিয়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফিরে চলে যেতে হয়। দেশে ফেরা চলে না। কারণ, স্বদেশ ব্রাজিল থেকে নির্বাসিত ১৯৬৪ সাল থেকেই—ফৌজী অপশাসন সে দেশে কায়েম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। ব্রাজিলের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিপীড়িত কৃষকদের নাকি সশস্ত্র বিপ্লবে প্ররোচিত করেছিল তাঁর জনশিক্ষার আন্দোলন—তাই।

ব্রাজিল থেকে বিতাড়িত হওয়ার কয়েকবছর পর চিলির আলিয়েন্দে সরকার তাঁকে ডেকে নিয়ে যান, চিলির ভূমিসংস্কার কার্যক্রমে তাঁর জনশিক্ষার আন্দোলন কাজে লাগানোর জন্য। যথাসময়ে চিলি থেকেও সরে যেতে হয়, নিধনযজ্ঞ শুরু হওয়ার কিছুকাল আগেই। বর্তমানে সুইৎজারল্যাণ্ডের জিনিভ শহরে বাস করছেন। ওয়র্লড কাউন্সিল অফ চার্চেসের শিক্ষাপরামর্শদাতা হিসেবে অন্ন-সংস্থান হয়। শহরের উপান্তে একটি বিপুল ফ্ল্যাটবাড়ির সাত তলায় দুখানি ঘরে স্বামী-স্ত্রী থাকেন। চাপ দাড়ি—অনেকটা কার্ল মার্কসের মতন। বর্তমান লেখকের সৌভাগ্য হয়েছিল গত ডিসেম্বর মাসে তাঁর বাড়ির বৈঠকখানায় বসে ঘণ্টা দুয়েক আলাপ করার। বললেন লাতিন আমেরিকার সব কটি মার্কিন কুক্ষিগত দেশে তাঁর প্রবেশ নিষেধ, এমনকি আকাশপথে উড়ে যাওয়ারও অনুমতি নেই।

এত ভয় কিসের? বয়স্কশিক্ষা ও সাক্ষরতার অভিযানকে পাওলো ফ্রেইরে বিপ্লবী চেতনা মূর্ত করে তোলার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চান। বর্তমান শতাব্দীতে অনগ্রসর দেশগুলির শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার দৌলতে বয়স্কশিক্ষা

* PEDAGOGY OF THE OPPRESSED: PAULO FREIRE. Penguin Books, 1972.

ও সাক্ষরতার আন্দোলন কেবলমাত্র বিপ্লবী চেতনার অভ্যুত্থানের অঙ্গ হিসেবেই সফল হতে পারে। শুধু তাই নয়। অন্যপ্রকারের বয়স্কশিক্ষা ও সাক্ষরতার প্রয়াস আসলে শোষণব্যবস্থায় গরিব মানুষকে হজম করে ফেলার প্রয়াস। ওই জন্যেই সে চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। যেমন, আমাদের দেশেও দেখা যায় তথাকথিত উপযোগিতামূলক সাক্ষরতাও (functional Literacy) সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত বয়স্করা ২/৩ বছরের মধ্যেই বেমালুম ভুলে যান শতকরা পঞ্চাশভাগ ক্ষেত্রেই। অর্থাৎ সাক্ষরতার আলোকপ্রাপ্ত বয়স্কদের অর্ধেকই আবার নিরক্ষরতার অন্ধকারই বেছে নেন। এর কারণ, পাওলো ফ্রেইরের মতে, স্বাক্ষরতার আলো শোষিত মানুষের জীবনের সীমাবদ্ধতাকে আলোকিত করে নি, সে সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার চেতনায় উদ্দীপিত করে নি। বরং, তাকে শোষণব্যবস্থায় হজম করে ফেলার চেষ্টা করেছে। যেমন, গরিবের ছেলে লেখাপড়া শেখে 'বাবু' হওয়ার জন্যে। তাই, কর্মক্লান্ত প্রৌঢ় চাষী বাপ ক্ষুব্ধ হয়ে বলে গ্রামের ইস্কুলটা বন্ধ না করে দিলে তার ছেলেপিলেদের হাতে পরিবারের চাষবাস ভিটেমাটির সর্বনাশ হবে। আবার, একটু সম্পন্ন গৃহস্থ চাষীর ছেলে 'বাবু' বনে গেলে পৈতৃক জমিটা দিয়ে দেয় ভাগে, বা হালকিষেণকে—অর্থাৎ শোষণব্যবস্থা তাকে হজম করে ফেলে।

ব্যাপারটা বাবুদের ছেলেদের বেলাতেও সত্যি। অনগ্রসর দেশগুলিতে প্রথাসিদ্ধ শিক্ষা, সম্পত্তির মতনই, উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন আয়বৈষম্যকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পাকা করার হাতিয়ার। এই প্রথাসিদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থাকে পাওলো ফ্রেইরে বলেন, এক ধরনের ব্যাঙ্কব্যবস্থার মতো—নানাবিধ তথ্যের, ইনফরমেশনের ব্যাঙ্ক। ছাত্রের মগজে আমানত জমা করে দেওয়া—নানাবিধ তথ্যের আমানত—হল শিক্ষকের কাজ। সেই আমানত থেকে অতঃপর ছাত্র, শিক্ষকের মতোই, সুদ খাবে। এর ফলে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কও স্বৈরাচারী, শোষক-শোষিতের সম্পর্কের অনুরূপ। এই 'ব্যাঙ্কিং এডুকেশন' ব্যবস্থায় জ্ঞান হল কেবল আণ্ডিল আণ্ডিল তথ্যের সমষ্টি—যে তথ্য শোষণব্যবস্থাকে চালু রাখে, চেতনার মুক্তির, মানবিক অস্তিত্বের অমানুষিক পরিসীমা অতিক্রমণের পাঠ দেয় না। সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের অস্তিত্বের অমানুষিক পরিসীমার উপলব্ধি যদি জ্ঞানের উপজীব্য না হয়, তবে পশ্চিমীদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিদ্রোহ দানা বাঁধছে তা অবশ্যম্ভাবী। এই আমানতসৃষ্টিকারী

শিক্ষাব্যবস্থাই আমলাতান্ত্রিক মানসিকতার মূল উৎস—পরিবারে ও সমাজে নেতৃত্ব যেখানে আধিপত্যের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।

অন্যদিকে বিপ্লবী রাজনৈতিক দলও এই আমলাতান্ত্রিক মানসিকতার শিকার হয়ে পড়তে পারেন। কারণ, শোষণব্যবস্থার সর্বগ্রাসী আধিপত্যে শোষণ-মানসিকতা শোষিতের মধ্যেও বিরাজ করে। করে বলেই শোষণব্যবস্থা এতকাল চালু আছে। অতএব, শোষণব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন যাঁরা করবেন—নেতৃত্ব দেবেন—তাঁদের মানসিকতাতেও শোষকসত্তা উপস্থিত। বিশেষ করে যদি বিপ্লবী নেতৃত্ব জনসাধারণের মনকে পরিষ্কার শ্লেটের মতন ভেবে বসেন—যে শ্লেটের উপর সংগঠনেব খড়ি দিয়ে নেতারা তাঁদের চেতনার বাণীরূপ লিখে দেবেন। যেমন ধরুন, "Give Me Blood, I Shall Give You Freedom"। এতটা উৎকটও হতে পারে, আবার, গণআন্দোলনকে দলীয় স্বার্থ ও ক্ষমতাবৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের দ্বারা ইলেকপন্থী (Elitist) নেতৃত্বের ক্ষমতালিপ্সায় নিহিতও হতে পারে। এই ধরনের ইলেকপন্থী নেতৃত্ব বিপ্লবী সমাজচেতনাকে আমলাতন্ত্রের ফাঁসিকাঠে বলি দিতে পারে। নেতৃত্বের এই পদ্ধতিতেই প্রায় 'ব্যাঙ্কিং এডুকেশন'-এর অনুরূপ বিপ্লবের পরিপন্থী জনশিক্ষার উৎস নিহিত থাকতে পাবে। ফ্রেইরের মতে দক্ষিণপন্থী সংকীর্ণতা ও বামপন্থী সংকীর্ণতা উভয়ই প্রতিক্রিয়াপন্থারই নামান্তর মাত্র। কারণ, উভয়বিধ সংকীর্ণতার অনুগামীরাই "নিশ্চিতির কক্ষপথে নিজেদের আবদ্ধ করে ফেলে…'মনগড়া' সত্যের কারবারি হয়ে পড়েন।…উভয়ই সেই 'সত্য'র চতুর্দিকে ঘুরপাক খান, এবং তাঁদের 'সত্য'র বিষয়ে প্রশ্ন তুললে আক্রান্ত বোধ করেন। কারণ, তাঁদের মনে কোনো সংশয় নেই।"

ক্ষমতাশালীরা আক্রান্ত বোধ করলে শুরু হয় রিপ্রেশন, দমন। অতএব, বিপ্লবী নেতৃত্বকেও প্রথম থেকেই নিপীড়িতের শিক্ষার পাঠ নিতে হবে শোষিতের চেতনা থেকেই। নেতৃত্ব ও অনুগামীর সম্পর্ক থেকে শোষক-মানসিকতাকে এইভাবে প্রথম থেকেই অপসারিত করে চলতে হবে। শোষিতের সে চেতনা মূক, অস্ফুট হতে পারে; হতে পারে পরিবেশের মর্মান্তিক চাপে সে চেতনা নিমজ্জিত প্রকৃতিতে—যেমন চাষীর ক্ষেত্রে—বা, ফ্রেইরে যাকে বলেছেন "নিঃশব্দের সংস্কৃতি"তে (কালচার অফ সাইলেন্স)। পাওলো বলেন, হয়তো দেখা যাবে গরিবের সেই নিমজ্জিত চেতনায় আছে মাত্র ৪০/৫০টা কথা। সেই কথা কয়টিই

তার জীবনের অভিজ্ঞতার সমষ্টি। তখন শিক্ষকের দায় সেই ৪০/৫০টা কথার পাঠোদ্ধার করা—লিপির সূত্র সেই কথাগুলিতেই। বিপ্লবী নেতৃত্বেরও দায় একই। সেই কথাগুলির পাঠোদ্ধার করতে হবে গরিব মানুষের জীবনে সেই সব কথার অনুষঙ্গের অনুবর্তী হয়ে। তবেই জনমানসের চালচিত্রের প্রতিমাগুলি চেনা যাবে। সেই প্রতিমাবাই হবে জনশিক্ষাব অ আ ক খ। সে অ আ ক খ শিক্ষককে, বিপ্লবী নেতৃত্বকে, শিখতে হবে 'ছাত্র'রই সঙ্গে—নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে এক মাদুরে বসে, একই থালায় খেয়ে। The Educator Must Be Educated !

এই শিক্ষাপদ্ধতি আলাপচাবী (ডায়লজিস্টিক), আমানতস্থষ্টিকারী ('ব্যাঙ্কিং এডুকেশন') নয়। শিক্ষক ও ছাত্রেব, বিপ্লবী নেতৃত্ব ও অনুগামী শোষিতেব পারস্পরিক লেনদেন, আলাপচারণা, চেতনার বিনিময়ের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কেব মধ্যে দিয়ে উভয়েরই মানবিক অস্তিত্বের অমানুষিক পরিসীমা অতিক্রমণেব পাঠ গ্রহণ এই শিক্ষাপদ্ধতির মূলসূত্র। বিপ্লবী নেতৃত্বকেও আমলা-তান্ত্রিক বিপর্যয় থেকে বাঁচাতে হলে প্রথম থেকেই এই পদ্ধতির অনুবর্তী হতে হবে। আবার এই পথেই সার্থক বয়স্কশিক্ষা, স্বাক্ষরতাব আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব।

ফ্রেইরের 'বিদ্যালয়' হল এক ধবনের পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাতে 'শিক্ষক' ও 'ছাত্র' উভয়ই সমান অংশ নেবে। পবিবেশের সজ্ঞান উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে উভয়েরই চেতনা রূপ পাবে, ছবি আর কথার যুগপৎ মিলনে। যেমন ধরুন মদ্যনিবারণী উৎসাহে একজন 'শিক্ষক' ছবি দেখালেন শ্রমিকদের : একটি মাঝবয়সী লোক কাবখানাব কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে কিঞ্চিৎ মত্ত অবস্থায়, বাড়িতে তার জন্য অনেকগুলি অভুক্ত মুখ বসে আছে, আর রাস্তার কোণে কতিপয় কর্মহীন মাস্তান আড্ডা মারছে। শ্রমিকরা সব এক বাক্যে বলল ওই মত্ত লোকটিই সমাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী প্রাণী, ওই আড্ডাবাজ মাস্তানরা আগাছা, যদিও তাবা ওই সময়ে মত্ত নয়। 'শিক্ষক'টির মদ্যনিবারণী উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। কেননা তাঁর চেতনা আর শ্রমিকের নাটকীয় চেতনায় কোনো মিল নেই। যদি তিনি প্রকৃত শিক্ষক হন, মদ্য-নিবারণী উৎসাহে নিজেকে তাহলে শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন না। বরং, এইবার আরো ছবি দেখে ও দেখিয়ে তাদের মূক নাটকীয় চেতনায় কথার ফুল

ফোটার প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন। সেই কথাই তখন হবে একই সঙ্গে বিপ্লবী চেতনা ও সাক্ষরতার উৎসমুখ। 'শিক্ষক'-এর উৎসাহ মস্তিবারণ না হয়ে ভোটযুদ্ধাত্মক বা সশস্ত্র বিপ্লবাত্মক হলেও পরিস্থিতির বিশেষ হেরফের হচ্ছে না। পাওলো ফ্রেইরের তাই মত। এই মতের সপক্ষে তিনি মার্ক্স, লেনিন, মাও সে তুঙ ও চে গ্যেভারার নজির দেখিয়েছেন।

নজির তুলে বলেছেন, বিপ্লবীর মূল চরিত্রলক্ষণ হতে হবে ভালোবাসা। আর, মানসিকতার মূল লক্ষণ হতে হবে সংশয়, জিজ্ঞাসা। ভালোবাসা আর জিজ্ঞাসা সম্বল করে তাকে, 'শিক্ষক'কে, খুঁজতে হবে নিপীড়িত মানুষের পরিবেশে বিষয়ীগত ভাবনার বিবেকসম্মত দ্বান্দ্বিক রূপ ("dialectical thematic conscientization")। সেই রূপের আঙ্গিকে হবে সাক্ষরতার পাঠ বিপ্লবী চেতনার উদ্বোধনে। জনশিক্ষার এই হল সার্থক উপজীব্য।

ওকাম্পো : রবীন্দ্রনাথ

উজ্জ্বল মজুমদার

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো রবীন্দ্রনাথের জীবনে কতখানি স্থান নিয়ে আছেন তা রবীন্দ্রজীবনীপাঠকের অজানা নয়। ১৯২৪ সালে নভেম্বর-ডিসেম্বর দুই মাস রবীন্দ্রনাথ ওকাম্পোর আতিথ্যে ও যত্নে ছিলেন এবং সেই সান্নিধ্যের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ এবং ওকাম্পো কেউই ভোলেন নি। স্বামী-পরিত্যক্ত নিঃসন্তান অশীতিপর ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো এখনও রবীন্দ্রস্মৃতি নিয়ে মগ্ন হয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে থেকেই তাঁর রচনার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। এবং রবীন্দ্রনাথের বুয়েনাস আইরেস পৌঁছনোর ঘটনাটি ওকাম্পোর জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯২৪ সাল থেকে নানা সময়ে ও প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানা রচনা লিখেছেন তিনি, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেছেন, এবং ১৯৫৮ সালে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর দীর্ঘ রচনা স্প্যানিশ ভাষায় বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরই সম্পাদিত Sur পত্রিকার পক্ষ থেকে ১৯৬১ সালে : Tagore en las barroncas de San Isidro। ইংরেজিতে এই বইটির পুরো অনুবাদ হয় নি। বিচ্ছিন্নভাবে খানিক অংশ সাহিত্য আকাদেমি প্রকাশিত শতবার্ষিক সংগ্রহে বেরিয়েছিল, আর খানিকটা বেরিয়েছিল ১৯৫৯ সালে 'ইণ্ডিয়ান লিটারেচার' পত্রিকার এপ্রিল-সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। শঙ্খ-বাবুকে ধন্যবাদ তিনি এই বইটির* সম্পূর্ণ সটীক অনুবাদ প্রকাশ করেছেন 'সান ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ' এই নামে। বইটির চারটি ভাগ আছে। অনুবাদে সেই চারটি ভাগের নাম দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে : 'খোলা পথের ধারে', 'অলিন্দ', 'নিঃসঙ্গ পুরুষ' ও 'ভালোবাসা'। লক্ষণীয় যে 'ভালোবাসা' এই মূল বাঙলা শব্দটিই ওকাম্পো ব্যবহার করেছেন এই অধ্যায়ের শিরোনাম হিসাবে। সান ইসিদ্রোতে থাকবার সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে কটি বাঙলা শব্দ ওকাম্পোকে শিখিয়েছিলেন তার মধ্যে 'ভালোবাসা' শব্দটিই তাঁর স্মরণে আছে

* ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ : ভূমিকা-অনুবাদ-অনুষঙ্গ। শঙ্খ ঘোষ। পরিবেশক : দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড কোম্পানি, কলকাতা। আট টাকা

এবং ভারতবর্ষের উদ্দেশে ওই 'ভালোবাসা' শব্দটিই বারবার ব্যবহার করবেন বলে জানিয়েছিলেন তিনি সাহিত্য আকাদেমির শতবার্ষিক সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন প্রসঙ্গে।

'খোলা পথের ধারে' অংশে রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার নিবিড় পরিচয় ও রবীন্দ্রব্যক্তিত্বকে ঘিরে এক অপরিচয়ের স্বপ্নরহস্য গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর নাটক ভিক্টোরিয়ার মনে এক গভীর আধ্যাত্মিক পরিবর্তন এনেছে। প্রুস্তের শিলীভূত অনুভবের চাপ থেকে সরে এসে তিনি খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিয়েছেন প্রাণ ভরে রবীন্দ্র-কাব্য-নাটকের বিস্তীর্ণ স্বাস্থ্যকর প্রাঙ্গণে। সোয়ানের সংশয় আর ক্লেশ থেকে সরে এসেছেন তিনি রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জগতে সুখ দুঃখ অতিক্রান্ত আনন্দের উপলব্ধিতে— 'মিলনক্ষুধা'র ব্যাকুলতায়। রবীন্দ্রদর্শনের প্রতীক্ষা যেন পরমসুন্দরের প্রতীক্ষা হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনে। শঙ্খবাবুর অনুবাদে সেই অধীর প্রতীক্ষার চাঞ্চল্য চমৎকার ফুটেছে:

"গোলাপে গোলাপে ছেয়ে গেছে দেশ। জানলা-খোলা ঘরে আমার সময় কাটছে রবীন্দ্রনাথ প'ড়ে, তাঁর কথা ভেবে, তাঁকে ভেবে, তাঁকে চিঠি লিখে—যদিও সে চিঠি কখনোই ডাকে দেওয়া হবে না। সেই সেপ্টেম্বরে বাগানের সুরভিতে মিশে গিয়েছিল আমার উত্তেজনা। এই সব পড়া, ভাবনা, প্রতীক্ষা আর লেখা— তারই থেকে প্রস্তুত হলো La Nacron-এ প্রকাশিত রচনাটি। বস্তুত, এ যেন রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিই চেহারা নিল প্রবন্ধের। সে সব দিনে কখনো ভাবতেও পারি নি যে সান ইসিদ্রোর উপর একদিন আমারই অতিথি হবেন কবি। স্বপ্নের জগতের বাইরেও যে এমন সুখের ভাগ্য সম্ভব, তা কল্পনাই করা যেত না সেদিন। আর সে ভাগ্য যখন আমার আসবে, কে জানত তখন তাকে মনে হবে নিতান্তই যেন স্বাভাবিক, আর, একেবারেই ভিন্ন-সব কারণে শুরু হবে আমার যন্ত্রণা।"

বিদেশিনীর এই ব্যাকুল প্রতীক্ষার যন্ত্রণার কথা ভেবে মনে হয় যে মহৎ কবিরা একদিকে যেমন নিঃসঙ্গ পুরুষ তেমনি অন্যদিকে পৃথিবী জুড়ে তাঁদের গোপন সঙ্গী ছড়ানো। 'অলিন্দ' অংশেও আছে রবীন্দ্রনাথ পড়বার স্মৃতি, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংকট, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য, সান ইসিদ্রোতে রবীন্দ্রদর্শনের স্মরণীয় স্মৃতি (উদ্ধৃতি দিতে লোভ হয়, কিন্তু পাঠকদের

জন্য রেখে দিলুম), রবীন্দ্রনাথের সেবাশুশ্রূষায় ভিক্টোরিয়ার সতর্কতা, তাঁর সান্নিধ্যে একাধারে সংকোচ ও ব্যাকুলতার তীব্র আত্মদ্বন্দ্ব—সব মিলিয়ে এই অধ্যায়টি পাঠকের কাছে দারুণ কৌতূহল জাগাবে। 'নিঃসঙ্গ পুরুষ' অধ্যায়টিতেও রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের শিহরণ অনুভব করা যায়। তাছাড়া আছে রবীন্দ্র-দর্শনার্থীর ভিড, তাদের ঠেকাবার জন্য বারোস আর ভিক্টোরিয়ার আপ্রাণ অথচ ব্যর্থ চেষ্টা, ভারত সম্পর্কিত রোমাঁ রলাঁর জার্নালে দক্ষিণ-আমেরিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যকে অসম্পূর্ণ ও 'আত্মগত' প্রমাণ করার চেষ্টা (নতুনভাবে পরিবর্তিত দেশকে যে জানা যায় না দু-চারদিনের ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য তারই প্রমাণ), রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা প্রসঙ্গে রলাঁর মন্তব্যের প্রতিবাদ—এবং বেশ উত্তেজিত প্রতিবাদ, আর সেই প্রসঙ্গেই এসে গেছে আঁদ্রে জিদ আর পল ভালেরির সঙ্গে ববীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার।

'ভালোবাসা' অধ্যায়টি কিছু কৌতুককর ঘটনার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে, ভিক্টোবিয়া আর কবির মধ্যে পবিহাসদীপ্ত কিছু মুহূর্ত, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ও ধর্মচিন্তার সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার মানসিক সাদৃশ্য, কবিতারচনা ও সাহিত্য প্রসঙ্গ, পারীর গার্ দ্যু নর্ প্লাটফর্মে শেষ বিদায়, তারপর এলমহার্স্টের কাছে লেখা ববীন্দ্রনাথেব চিঠির কয়েক টুকরো, স্বকীয় উপলব্ধির উচ্চারণ আর শেষতঃ রবীন্দ্র-জগতে সত্যস্বরূপের নির্দেশ, আত্মসম্বিত ফিরে পাবার চিরকৃতার্থতা।

মানুষের জীবন আর সেই জীবনের সংস্পর্শের কথা বোধহয় এমনিভাবেই লিখতে হয়। লেখার মধ্যে ক্রম মানা হয নি সময়ের। কখনো আত্ম-অনুভব, কখনো স্মৃতি, কখনো সাহিত্যসৃষ্টি, কখনো চিঠিপত্র কখনো বা অন্যের লেখা ডায়েরি থেকে উদ্ধৃতি তুলে বিতর্কের মীমাংসাচেষ্টা আর শেষপর্যন্ত আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা—এইভাবে অতীত-বর্তমান মিশ্রণে এই স্মৃতির দলিল তৈরি হয়েছে অ্যান্টি-মেমোয়ার-এর ভঙ্গিতে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিদেশীর লেখা কিছু কিছু আন্তরিক সত্যোপলব্ধির রচনা পড়েছি, কিন্তু এমন বিস্তৃত ও গভীর আত্মোন্মোচন কোথাও পাই নি, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এমন আন্তরিক সন্ধান-চেষ্টাও আর কোথাও পাই নি। বাঙলা অনুবাদে এই আন্তরিকতা অক্ষুণ্ণ থেকেছে, বিষাদে বেদনায় সংকোচে স্মৃতির উত্তাপে মূল রচনার ঘনিষ্ঠতাটুকু শঙ্খবাবু অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কেবল 'ছলকে' আর 'চন্‌মনে' এই শব্দ দুটি কানে লেগেছে, বোধহয় যে ধরনের শব্দবিন্যাসে শঙ্খবাবু এই রচনায় একটি শাব্দিক

পরিমণ্ডল তৈরি করেছেন তাতে ওই শব্দদুটি একটু বেশি মৌখিক মনে হয়।- তেমনি কানে লেগেছে "তোমাকে উপেক্ষা দিলেও তুমি আমাকে আঘাত করো না" বাক্যটি। বোধহয় আমরা উপেক্ষা দিই না, উপেক্ষা করি।

ভূমিকায় 'বিদেশিনী' অংশটিতে বিদেশিনীর স্থূল ব্যাখ্যাকে চমৎকার ভাবে দূরে সরিয়ে দিয়ে 'বিদেশিনী'র তাৎপর্যটিকে ধরে দিয়েছেন অনুবাদক। 'সঙ্গ-নিঃসঙ্গ' অংশে বিজয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের মানসতার চমৎকার বিশ্লেষণ আছে এবং 'বিজয়ার অলিন্দ' অংশে দক্ষিণ আমেরিকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের কোন বিশেষ মুহূর্তে বিজয়ার কাছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরম-শেষের অন্বেষণের বাণী নিয়ে পৌঁছোন তারও সুন্দর বিশ্লেষণ আছে। এই পটভূমিটিকে অনুবাদক তুলে না ধরলে বইটির তাৎপর্যও কিছুটা অস্পষ্ট থেকে যেত। অনুষঙ্গে ভিক্টোরিয়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি এবং অন্যান্য যাঁরা কোথাও কিছু বলেছিলেন বা লিখেছিলেন সে-সবই অনুবাদক যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ করেছেন। 'সূত্রাবলি' অংশে বিস্তৃতভাবে বহু তথ্য যোগ করে বইটিকে সমৃদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন তিনি। অতিরিক্ত আকর্ষণ হল বইটির ছবি, পাণ্ডুলিপি-চিত্র এবং ভিক্টোরিয়ার চিঠির প্রতিলিপি। কেবল, নামপত্রে মূল বইটির নাম থাকা উচিত ছিল।

এই প্রসঙ্গে হঠাৎ কিছু উপকরণের উৎস চোখে পড়েছিল। সে কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। অবশ্য তাতে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত। কিন্তু গান্ধীপ্রসঙ্গ আছে। গান্ধীর সম্পর্কে আলোচ্য বইটিতেও তো অনেক প্রসঙ্গ রয়েছে। সেই সূত্রে এই দুটি বইও হয়তো কিছু কাজে লাগতে পারে। প্রথম বইটি হল জুলিয়ান হাকসলি সম্পাদিত অল্ডাস হাকসলি স্মৃতি-সংকলন (Aldous Huxley : A Memorial Volume : ed. by Julian Huxley. Chatto and windus, London. 1966)। এই বইটিতে অল্ডাস সম্পর্কে ভিক্টোরিয়ার চমৎকার স্মৃতিচিত্র আছে, প্যারিসে গান্ধীর বক্তৃতা শোনার প্রসঙ্গ আছে, গান্ধীর সম্মোহন-সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গও আছে। হাকসলির সঙ্গে প্রথম আলাপে গান্ধীপ্রসঙ্গ তুলতেই হাকসলির ঔদাসীন্য তাঁকে প্রচণ্ড আঘাত করেছিল। টি. ই. লরেন্স-প্রসঙ্গেও ('ভিক্টোরিয়া প্রসঙ্গে' : 'অনুষঙ্গ') অনেক কথা আছে হাকসলির সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার পত্রালাপে। (এই প্রসঙ্গে Letters of Aldous Huxley : ed. by Grover smith. Chatto and windus, London.

1969 দ্রষ্টব্য।) এই বই দুটির নাম উল্লেখ করছি এই কারণে যে 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' বইটিতে শঙ্খ ঘোষ ওকাম্পোর জীবন সম্পর্কে যে তথ্যগুলি দিয়েছেন তাতে ওকাম্পোর ব্যক্তিজীবন খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। "স্বামী পরিত্যক্ত নিঃসন্তান অশীতিপর" ওকাম্পোর সম্বন্ধে তিনি অনেকখানি কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং আরও তথ্য সন্ধান করে ওকাম্পোর একটি জীবনচিত্র তৈরি করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব এবং কর্তব্যও বটে।

রবীন্দ্রস্মৃতিনির্ভর বিদেশিনীর এই আত্মিক ইতিহাসচিত্র বাঙলায় অনুবাদ করে শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রানুরাগীদের সন্ধানী দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতর করলেন বলে তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

কবে কোন্ গান

শঙ্খ ঘোষ

কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শুনেছি তাঁর ছাত্রদের জানিয়েছিলেন কীভাবে রবীন্দ্রনাথ একটি গানের মধ্যে মিলিয়ে নিয়েছেন বিদেশিনী এক নারীর সুষমা। সকলেই সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারবেন যে "আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী" গানটির উল্লেখ করছেন অধ্যাপক, ভাবছেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর কথা। প্রথমে শুনে মনে হয় এ তো হতেই পারে, ভুবনভ্রমণের শেষে রবীন্দ্রনাথ সিন্ধুপারের এক নূতন দেশে তো পৌঁছেছিলেন ঠিকই, আর সেখানে এক বিদেশিনীর মধ্যে সত্যি তো তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন আশ্রয়। এ তো হতেই পারে যে দেখাশোনার সেই অভিঘাত থেকে উৎসারিত হল তাঁর এই স্মরণীয় রচনা।

কিন্তু যদি জানা থাকে যে এটি লেখা হয়েছিল ওকাম্পোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হবার প্রায় তিরিশ বছর আগে, তাহলে এ-রকম একটা কপোলকল্পনা হঠাৎ একেবারে অলীক হয়ে পড়ে। এই বিশেষ গানটিকে নিয়ে এ-ধরনের ভুল হবার অবশ্য কোনো কারণ ছিল না, কেননা অনেকেরই মনে পড়বে যে 'জীবনস্মৃতি'তেই গানটির সবিস্তার উল্লেখ আছে। তবে এমন কখনো ঘটতেও পারে যে সুলভ কোনো তথ্যের অভাবে কোনো-একটি রচনা বিষয়ে কিছু ভুল বা অস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়ে যায় কারো, ভুল প্রসঙ্গে জড়িত হয়ে যায় কোনো একটি গান বা কবিতা। যদি রবীন্দ্রনাথের গানগুলির নিশ্চিত রচনাকাল * জানা থাকত আমাদের, যদি জানা থাকত কোন পরিবেশে কীভাবে গড়ে উঠছিল তাঁর কোনো লেখা, তাহলে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো অভিজ্ঞ লেখককেও তাঁর 'বিজয়া'-কথায় অনিশ্চয় নিয়ে বলতে হত না "সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে···তিনি কার কথা ভেবে লিখেছিলেন? কে জানে?" কেউ কেউ নিশ্চয় জানে যে গানটি

---

* গীতবিতান: কালানুক্রমিক সূচী। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। বোলপুর-শান্তিনিকেতন। আট টাকা

লিখেছিলেন তিনি মাদ্রাজের সমুদ্রকূলবর্তী প্রকৃতিবিস্তার দেখে, ১৯৩০ সালে তাঁর বিদেশযাত্রার আগের মুহূর্তে।

কী করে জানা যায় এসব ? জানবার কোনো সহজ উপায় আছে কি ? গান শুনতে শুনতে কারো মনে যদি জেগে ওঠে এই প্রশ্ন, কোন হারানোর বেদনায় লিখতে হল তাঁকে "আমার ক্ষুদ্র হারাধনগুলি রবে না কি তব পা-য়", কখন তাঁর মনে হয়েছিল "এবার আমায় ডাকলে দূরে/সাগরপারের গোপন পুরে", কখন ছিল সেই নিবিড় ঘন আঁধার যখন মনকে তাঁর শমিত করতে হচ্ছিল এই বলে : "শোভন এই ভুবনে রাখিয়ো ভালোবাসা" ? "বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই" শুনে ঠাট্টা করেছিলেন কৃষ্ণনগরের ধ্রুপদী শ্রোতারা, "বাজাতে চাইলেই হয় না বাজাতে জানা চাই" বলেছিলেন তাঁরা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরও কেন মনে হচ্ছিল যে বাঁশরি বাজে না, কেন লিখেছিলেন ওই গান ? কোনো উপলক্ষ ছিল কি ? কোনো উপলক্ষ ছিল "আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না" "এ মণিহার আমায় নাহি সাজে" অথবা "আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল" ধরনের গানগুলির উৎসে ? রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছিলেন "শুধায়ো না কবে কোন্ গান / কাহারে করিয়াছিনু দান", যদিও সমস্ত উপলক্ষের কূল থেকে সত্যিকারের গানের তরী ভেসে যায় চিরায়তের দিকে, তবু কখনো কখনো জানতেও ইচ্ছে করে রচনাগুলির পটভূমি, রচনাগুলিতে যেন একটা ব্যক্তিগত ছোঁয়া লেগে যায় এই জানার ফলে।

কৌতূহলী শ্রোতা যে এর কোনো কোনো তথ্য নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত করে নিতে পারেন না তা নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মকথায় বা স্মৃতিকথায়, তাঁর ডায়েরি বা চিঠিপত্রে কখনো-বা বলেছেন কোনো গান-রচনার প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গ ; আমাদের সামনে আছে চারখণ্ড 'রবীন্দ্রজীবনী' ; আছে পুলিনবিহারী সেন-সংকলিত গ্রন্থপঞ্জী বা তথ্যপঞ্জী ; ইন্দিরা দেবী বা সরলা দেবী, রথীন্দ্রনাথ বা কালিদাস নাগ, কানাই সামন্ত বা শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন তাঁর অনেক গানের বিবরণ। কিন্তু এর মধ্য থেকে তথ্য-সংকলনের কাজটা বড় সহজ নয়, এও বলা যায় না যে সে-সংকলন থেকে সম্পূর্ণ কোনো ধারাবাহিকতা ধরা পড়বে। শান্তিদেব লিখেছেন যে "মধ্যজীবনে দেখি ছন্দপ্রধান গানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেশি ও আগের অনুপাতে ঢিমে লয়ের গানের সংখ্যা অনেক কম", বা ইন্দিরা দেবী আমাদের মনে করিয়ে দেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলতেন "আগেকার

গানগুলি ইমোশনাল এখনকারগুলি ইসথেটিক।" এসব শুনে যদি মনে হয় যে রবীন্দ্রসংগীত বিচারের একটা পদ্ধতিই যেন পাওয়া গেল সামনে, তাহলে প্রশ্ন উঠবে কোনগুলিকে বলব মধ্যজীবনের গান আর কোনগুলিই-বা তার আগের; ইমোশনাল আর ইসথেটিক-এর এই ভিন্নতাটাই-বা ধরা হচ্ছে ঠিক কোন সময় থেকে? কিংবা, রবীন্দ্রনাথ নিজেই যখন লেখেন "প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাংলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য" তখন আমাদের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় প্রথম বয়স আর পরিণত বয়সের হিসেবটা হবে কীভাবে। ওই কথাটির পরেই আছে একটি গানের উল্লেখ, যাকে তিনি বলেন "রূপ দেবার" গান তার উদাহরণ হিসেবে আনেন তিনি "কেন বাজাও কাঁকণ কনকন।" আর, যদি আমাদের জানা থাকে যে ওই গান লিখেছিলেন তিনি মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে, তাহলে বুঝতে পারি তাঁর মন্তব্যটিতে "পরিণত বয়স" কথাটার তাৎপর্য কোনখানে পৌঁছয়।

তাই আমাদের দরকার ছিল রবীন্দ্রনাথের গানগুলির একটি কালানুক্রমিক সূচীর। একটি-দুটি গানের কচিৎ কৌতুহল মেটানো নয়, আমরা অপেক্ষা করছিলাম এমন কোনো তালিকার যেখানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর গানের পারম্পর্য ধরা থাকবে, কবিতার মতো গানেরও একটা ইতিহাস আনতে পারবে যে তালিকা। ভাবতে ভালো লাগছে যে সেই প্রত্যাশা এখন পূর্ণ হবার পথে, 'গীতবিতান: কালানুক্রমিক সূচী'র প্রথম খণ্ড আজ ইচ্ছে করলেই আমরা হাতের সামনে পেতে পারি। রবীন্দ্রনাথের জীবনী যিনি লিখেছেন, 'রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী'র যিনি প্রণেতা, এখন যিনি ব্যাপৃত আছেন 'রবীন্দ্রদিনপঞ্জী'র প্রস্তুতিতে, সেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের হাত থেকেই এল এই বই। কোনো সন্দেহ নেই যে এখন থেকে এ-বই 'গীতবিতান'-এর সঙ্গীবই হিসেবে সব সময়ে কাজে লাগবে আমাদের।

২

'গীতবিতান' যখন প্রথম ছাপা হয়েছিল ১৩৩৮ সালে, তখন তার চেহারা ছিল আজকের 'গীতবিতান' থেকে একেবারেই ভিন্ন। প্রেম পূজা প্রকৃতির যে সহজ শ্রেণীকরণে অভ্যস্ত আমরা আজ, তার কোনো ইশারা ছিল না প্রথম সেই সংস্করণে। সেখানে গানগুলি ধরা ছিল যতদূর-সম্ভব গ্রন্থানুক্রমে। 'বাল্মীকি-

প্রতিভা'রও আগে লেখা যেসব গান গ্রহণযোগ্য বলে ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার আশ্রয় ছিল 'কৈশোরক' বিভাগে, আর তার পর থেকে গানগুলিকে পাই ভিন্ন ভিন্ন বইয়ের নামে, কালপরম্পরায়। এর ফলে, প্রতিটি গানের বিষয়ে আমাদের কৌতূহল তৃপ্ত হত না যদিও; তবু এক-একটি গুচ্ছ বিষয়ে সময়ের খানিকটা ধারণা পাওয়া যেত নিশ্চয়।

কিন্তু 'গীতবিতান'-এর সেই চেহারা আজ নেই। তাই প্রভাতকুমার-সংকলিত এই কালানুক্রমিক সূচী আজ দ্বিগুণ মূল্যবান। ১৩৭৬ সালে ৩২০টি গানের তালিকা তৈরি করেছিলেন ইনি একটা পরীক্ষা হিসেবে; সেইটিকে বলা হচ্ছে এ-বইয়ের প্রথম সংস্করণ। আর এই দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৮০) আমরা পাব প্রায় হাজারটি গানের বিবরণ; ১৩১৯ সালে ইয়োরোপযাত্রার আগে পর্যন্ত যেসব গান লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এ হল তারই এক বিবৃত সূচী।

যিনি জানতে চান কোন গান কোন বইতে ছাপা হয়েছিল প্রথম, কখন ছাপা হয়েছিল পত্রিকায়, রচনাই-বা কবে—এই তালিকা থেকে তিনি তার যথাসম্ভব নির্দেশ পাবেন। এই তালিকাগুলি থেকে জানা যাবে গানগুলির পাঠ কখনো পালটেছে কি না পরে, জানা যাবে এর সুর স্বরলিপি অথবা স্বরলিপিকারের খবর। এই সূচী থেকে গীতানুরাগীরা দেখতে পাবেন কীভাবে এক-একটি মাঘোৎসব উপলক্ষে এক-একগুচ্ছ গান বাঁধছেন কবি, অথবা অন্য কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠান কীভাবে তাঁর রচনার যোগ্য-ভূমিকা তৈরি করছে, কীভাবে—ইন্দিরা দেবীর ভাষায়—দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে এক ঝাঁক গান নিয়ে এলেন তিনি অথবা শিলাইদহ থেকে হয়তো আরেক ঝাঁক। এই সূচীর পাতা উলটে যে-কোনো সময়ে কেউ জেনে নিতে পারেন যে স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি লিখছিলেন "আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে", কলেজে ছাত্রসম্মিলনীর ঈস্টার উৎসবে তৈরি করছেন "তবু পারি নে সঁপিতে প্রাণ" অথবা কোনো শিশুর অন্নপ্রাশনে বলছেন "ওগো নবীন অতিথি।" এই সূচী থেকে অনায়াসে আমরা জেনে নিতে পারি এই তথ্য যে নবীনচন্দ্রকে তাঁর রানাঘাটের বাড়িতে বসে রবীন্দ্রনাথ শোনাচ্ছিলেন সদ্যরচিত "এসো এসো ফিরে এসো" অথবা রাজনারায়ণ বসুর মেয়ের বিয়েতে রবীন্দ্রসংগীত গাইছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ (তখনো নরেন্দ্রনাথ): "জগতের পুরোহিত তুমি" কিংবা এ-রকম আরো কয়েকটি গান।

একটি কবিতা থেকে আরেক কবিতায় পৌঁছতে রবীন্দ্রনাথ যে পথ অতিক্রম করে যান তার অনেকটা ইতিহাস এখন আমাদের জানা আছে। এইবার, এই সূচীর দিকে লক্ষ্য রেখে, আমাদের পক্ষে সহজ হতে পারবে গানগুলির মধ্য দিয়েও রবীন্দ্রনাথের সেই যাবার পথ চিনে নেওয়া। তাই, কেবল গীতানুরাগীদের নয়, এই সূচীসংকলন প্রয়োজন হবে রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা বুঝতে চান তাঁদেব সবারই।

৩

বইটির দ্বিতীয় খণ্ড এখনো ছাপা হয় নি. সংকলনের কাজ চলছে নিশ্চয়। প্রথম খণ্ডও, আশা করি, অল্পকালেব মধ্যেই নতুন কবে ছাপতে হবে আবার। সেইসব ভবিষ্যৎ প্রকাশনেব কথা ভেবে এখানে আমরা বইটির দু-চারটি দ্বিধাদুর্বলতাব কথাও বলতে চাই। পরিমার্জনার সময়ে প্রভাতকুমার এবং তাঁব তরুণ সহায়ক দুজন ভেবে দেখতে পাবেন একজন পাঠকেব এই অসুবিধেগুলি।

প্রথম প্রশ্নই এই যে গানগুলির ক্রম তৈবি হবে কীভাবে? রবীন্দ্রনাথেব বাইশ শো গানের প্রতিটি কোন কোন দিনে লেখা হয়েছিল, তার পুরো নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা শক্ত নিশ্চয়। ফলে সংকলয়িতা প্রধানত নির্ভর করছেন এর প্রকাশকালের উপব। 'গীতবিতান' প্রথম সংস্করণের চেয়ে এর মূল্য বেশি এই কারণে যে সেখানে গানগুলি ধরা ছিল বই-প্রকাশের সময় অনুযায়ী, আব এখানে প্রভাতকুমার ব্যবহার করছেন সাময়িকপত্রে মুদ্রণকাল। কিন্তু যদি এমন হয় যে কোনো কোনো গানের নিশ্চিত রচনাকাল জানা যাচ্ছে অন্য কোনো সূত্র থেকে, হয়তো-বা পাণ্ডুলিপি বা নির্ভরযোগ্য কোনো স্মৃতিচর্চা, তাহলে তারও কি বিন্যাস হবে প্রকাশকালের হিসেবে? আমরা জানি "হ্যাদে গো নন্দরানী আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও" গানটি আছে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে (১৮৮৪), সংকলয়িতা তাই একে গণ্য করছেন 'বয়স ২৩।১২৯১।১৮৮৪'ব তালিকাসূত্রে। কিন্তু 'জীবনস্মৃতি'তে তো কবি স্পষ্টই জানান যে গানটি তিনি লিখেছিলেন কারোয়ার থেকে ফিরবার পথে, "বড়ো একটি আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া সুর দিয়া গাহিতে গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম—হ্যাদে গো নন্দরানী"—আর সেই কারোয়ার থেকে ফিরবার "কিছুকাল পরে ১২৯০ সালের ২৪ অগ্রহায়ণে আমার বিবাহ হয়, তখন আমার বয়স বাইশ বৎসর।" এই স্পষ্ট তথ্যের পর যদি গানটিকে আমরা অন্তত ১২৯০-এর

সূচীতেও না দেখতে পাই, তাহলে এ-বইয়ের ব্যবহারযোগ্যতা কি কমে যাবে না খানিকটা ?

এইরকমই হয়তো আরো কয়েকটির উল্লেখ করা যায়। কালিদাস নাগের বিবৃত তথ্য অনুযায়ী "আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে" স্বদেশী যুগের গান, 'রাজা' নাটক রচিত হবার পাঁচ বছর আগেই ১৩১২-১৩ সালে এর রচনা, কিন্তু এ-বইতে সেটিকে দেখছি আমরা ১৩১৭-র তালিকায়। সীতাদেবী তাঁর 'পুণ্য-স্মৃতি'তে মনে করিয়ে দেন, 'প্রবাসী'তে ছাপা হবার সময়ে 'অচলায়তন'-এর পাণ্ডুলিপিতে যে-দুটি গান পুরো কেটে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তারই একটি হল "কবে তুমি আসবে বলে রইব না বসে।" অথচ, আমাদের সূচীর এই প্রথম খণ্ডে গানটিকে পাওয়া যাবে না, কেননা গানটি শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল ১৩১৯ সালের অনেক পরে। আমরা কি ভেবে নেব যে এসব তথ্য বর্জনযোগ্য এই জন্যে যে খবরগুলি পাচ্ছি আমরা কেবল স্মৃতিকথা থেকে ? ঠিক, স্মৃতিকথা দলিল মাত্র, প্রমাণ নয়—কিন্তু সেই দলিলই তো এ-সংকলনের অন্য অনেক তথ্যন্যাসে সাহায্য করেছে দেখতে পাই। তার নানা উদাহরণের একটি যেমন এই (পৃ ১৭১): "প্রথম গানদুইটির রচনাকাল রবীন্দ্ররচনাবলীতে "১৩১৬ শান্তিনিকেতন" বলিয়া উল্লেখিত।…কিন্তু সীতাদেবী বলিয়াছেন যে গান তিনটি শারদোৎসব অভিনয়কালে রচিত" আর সেই নজিরে "ওগো শেফালিবনের মনের কামনা" বা "আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি" সংগতভাবেই রাখা আছে এখানে ১৩১৮ সালের তালিকায়। আমরা ধরতে পারি না যে "শুধু যাওয়া আসা শুধু স্রোতে ভাসা" কেন এখনো থাকবে ১২৯৯ সালের অন্তর্গত, যখন রবীন্দ্রনাথের 'পকেটবুক'-এর নজিরে আজ জানা-ই আছে যে ওটি তার আগের বছরে লেখা। অথবা কেনই-বা সংকলয়িতা বলেন যে এ-বইয়ের ২০৫-৩০৩ সংখ্যক গানগুলির রচনাকাল নির্দেশ করা সম্ভব হয় নি। কোনোটিরই নয় ? কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুশোকে লেখা 'পুষ্পাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপিকাল ১২৯১, আর এখানে তো বলাও আছে যে সেই পাণ্ডুলিপির অন্যতম কয়েকটি গান হল "যে ফুল ঝরে সেই তো ঝরে" (২৬৯) "কেন এলি রে ভালোবাসিলি" (২৭০) বা "ওকে কেন কাঁদালি, ও যে কেঁদে চলে যায়" (২৮২)।

প্রশ্ন আছে আরো। কোনো গানের যদি ভিন্ন কোনো পাঠ তৈরি হয় কখনো, তাহলে সূচীতে তার উল্লেখ হবে কি একাধিকবার ?

না কি একবার বলেই তার অন্তর্গত বিবরণে পরবর্তী পাঠের নির্দেশ দেওয়া ভালো? দুরকম পদ্ধতিই চলতে পারে হয়তো, কিন্তু একইসঙ্গে দুরকম নয়। মনে হয় এবিষয়ে সংকলয়িতা মন স্থির করে নেন নি। তাই, যদিও এখানে "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা" ১২৮৭ সালের কার্তিকের তালিকায় গৃহীত হয়েছে 'ভারতী'র পাঠে আর ফাল্গুনে এর নাম পাব 'তত্ত্ব-বোধিনী'র পাঠসূত্রে; যদিও "তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে" একবার পাচ্ছি আমরা ১৩০১ এবং অন্যবার ১৩১৪ সালে; তবু "ঝরঝর বরিষে বারিধারা" গানটি আছে একবারই, আছে 'ছিন্নপত্রাবলী'র নির্দেশিত সেই দিনটিতে, যখন এর চারটিমাত্র লাইন লেখা হয়েছিল অনেকটাই ভিন্ন পাঠে: "ঝরঝর **বরষে** বারিধারা / ফিরে বায়ু হাহাস্বরে জনহীন অসীম প্রান্তরে / অধীরা পদ্মা তরঙ্গআকুলা / নিবিড় নীরদ গগনে—!" "ঝরঝর বরিষে বারিধারা"র প্রচলিত চেহারাটি প্রথম পাই 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে, তাই গৃহীত রীতি মানতে গেলে এর স্বতন্ত্র উল্লেখ বাঞ্ছনীয় ১৩০৩-এর সূচীতে। "বঙ্গজননী মন্দিরাঙ্গন মঙ্গলোজ্জ্বল আজ হে" লেখা হয়েছিল ১৩১১ সালে, পরে তৈরি হল এর "শান্তিমন্দির পুণ্য অঙ্গন হোক সুমঙ্গল আজ হে," ১৩৪৭ সালে লেখা হল "বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গণ করো মহোজ্জ্বল আজ হে": এই সবেরই খবর আছে একযোগে—যদিও এখানে নেই এই পাঠ-পাঠান্তরের সবচেয়ে পরিচিত রূপটি "মাতৃমন্দির পুণ্যঅঙ্গন করো মহোজ্জ্বল আজ হে" যেটি তৈরি হয়েছিল বসুবিজ্ঞানমন্দিরের উদ্‌বোধনে।

কবিতা হিসেবেই প্রথমে লেখা হয়েছিল যে গানগুলি, সেই বিষয়ে আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন। যেসব কবিতার রচনাকাল কবির যৌবন, নানা অনুষ্ঠানে যার সুরারোপ হয়েছিল অনেক বছর পেরিয়ে, সেসব গানের ক্রম হবে কোথায়? গণ্য হবে কোনটি—কথারচনার কাল না সুররচনার সময়? ভূমিকায় প্রভাতকুমার ঠিকই লিখেছেন যে "যে-গান যে-বয়সে রচিত হয়েছিল তখনই তা সার্থক রূপ পেয়েছিল," কিন্তু এক্ষেত্রে গানরচনার কাল বলতে কথারচনাই তো মূল্য পাবে বেশি? বস্তুত এ-ব্যাপারেও এই সংকলনে নির্দিষ্ট কোনো রীতি গ্রাহ্য করতে দেখি না। "তবু মনে রেখো" গানটি রাখা আছে ১২৯৪ সালের তালিকায়, যদিও এর সুরারোপ ১২৯৯ সালের চৈত্রে, "ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে" পাই ১৩০৪ সালে, যদিও তার ২৮ বছর পরে একে দেওয়া হল

গানের পোশাক ; এইরকমই এখানে আছে "নীল নবঘনে" বা "হৃদয় আমার নাচে রে", "হে নিরুপমা" বা "কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি"—অথচ, জানি না কেন, এই তালিকায় আমরা খুঁজে পাই না "নহ মাতা নহ কন্যা" "কেন নিবে গেল বাতি" "যাবই আমি যাবই" "ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে" বা "একদা প্রাতে কুঞ্জতলে অন্ধবালিকা"র মতো আরো অনেক গান।

সংগত কি এই তালিকায় অক্ষয় চৌধুরীদের রচনা ঢুকিয়ে দেওয়া ? রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে এই এক বিঘ্ন চলে আসছে আজ দীর্ঘকাল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর দ্বিজেন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী বা অক্ষয় চৌধুরী, কেদারনাথ চৌধুরী বা এমন-কী যদুভট্টের কোনো কোনো গান রবীন্দ্রসংগীত হিসেবে পরিচিত ছিল এক সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন গান নিয়ে কত রকমের বিতর্ক শুনেছি আমরা কত ভিন্ন সময়ে। কিন্তু তাঁর যেসব গান নিশ্চিতরূপেই অন্যের লেখা বলে প্রমাণ হয়ে গেছে আজ, তাও কি এই সূচীর অন্তর্গত হবার যোগ্য ? "মুখের হাসি চাপলে কী হয়" প্রসঙ্গে সংকলয়িতা স্পষ্ট জানাচ্ছেন "ইহা রবীন্দ্রনাথের রচনা নহে" (সাম্প্রতিক 'গীতবিতান'-এও নেই এ গান)—এরও পরে কি এর এই তালিকাভুক্ত হওয়া সংগত ? "রাঙাপদপদ্মযুগে" বা "এত রঙ্গ শিখেছ কোথা" বিষয়ে ইন্দিরা দেবী নিঃসংশয়ে লিখছেন "তাঁর (অক্ষয় চৌধুরীর) কতকগুলি গান সশরীরে রবিকাকার গীতিনাট্যে স্থান পেয়েছে, যেমন রাঙাপদপদ্মযুগে ও এত রঙ্গ শিখেছ কোথা !" এর পরেও কি এদের আমরা রবীন্দ্রসংগীতই ভাবব ? "ছেলেখেলা কোরো না" বা "দে লো সখী দে পরাইয়ে গলে" অথবা "আজ তোমায় ধরব চাঁদ"—এর কোনোটিই এই সূচীতে প্রত্যাশিত নয়। এ ছাড়াও অন্য অনেকগুলি গান বিষয়ে সংকলয়িতা অনুমান করেন যে সেগুলির রচয়িতা অক্ষয় চৌধুরী। সেই অনুমানের কোনো কারণও যখন তিনি বলেন না, তখন অনুমানচিহ্নিত এই রচনাগুলির একটি স্বতন্ত্র তালিকাই কি বাঞ্ছনীয় নয় ?

সূচীর একেবারে প্রথম গানটিতেই এই দ্বিধাজড়তা। "গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে" 'গীতবিতান'-এরই গান, শেষ বয়সের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ভেবেওছিলেন এটি তাঁর লেখা, কিন্তু ইন্দিরা দেবী স্পষ্ট জানাচ্ছেন যে এটি "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একেবারে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করেছেন।…কেউ কেউ ভুল করে ভাবেন এটি রবীন্দ্রনাথের।"

উল্টোপক্ষে, যে-গান নিয়ে আজ আর সন্দেহ করবার কারণ নেই কোনো,

বিস্তর বিতর্কক্রমে যে-গানটিকে এখন রবীন্দ্রনাথের বলে মনে করতে বাধা নেই আর, সেই "একসূত্রে বাঁধিয়াছি" রচনাটির প্রসঙ্গে এখনো এখানে বলা আছে "গানটি রবীন্দ্রনাথের রচনা কিনা তদ্‌বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।" "গানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা ইহা আমরা কবির নিজের মুখেই শুনিয়াছি" লিখেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিদেব একটি প্রবন্ধে বিস্তারিত দেখিয়েছেন ওই একই তথ্য এবং কালিদাস নাগ মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর স্বরলিপিতে এটিকে রবীন্দ্ররচিত বলে উল্লেখ করছেন। অন্তত, এই তথ্যাবলীর উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক ছিল।

কোনো দোষ ছিল না যদি প্রভাতকুমারের এই তালিকা শুকনো তালিকা-মাত্রই হত। কিন্তু আমাদের লোভ বেড়ে যায় যখন দেখি যে কোনো গানের সঙ্গে সংকলয়িতা তার রচনাপটেরও বর্ণনা করেন অনেকটা; যখন গানের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস অল্পস্বল্প জড়িয়ে যায়। "এ কী এ সুন্দর শোভা" বা "দিবানিশি করিয়া যতন", গানগুলির সঙ্গে এ-তথ্য কারো বাহুল্য মনে হতেও পারে যে "নরেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে গানটি শোনাতেন।" কিন্তু "জ্বল্‌ জ্বল্‌ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" কীভাবে লেখা হয়েছিল তার বিবরণ বা "জনগণ-মনঅধিনায়ক"-এর ইতিহাস অথবা মহর্ষির শ্রাদ্ধবাসর উপলক্ষে যে লেখা হয়েছিল "দুখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে"—এসব কথা নিশ্চয় বাহুল্য নয়। প্রভাতকুমার তা বলেনও এ-সংকলনে। কিন্তু তাহলে কেন পাই না এই বিবরণ যে "আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না" গানটি বাঁধা হয়েছিল তারকনাথ পালিতের বাড়িতে, কংগ্রেসী নেতাদের ইংরেজি ডিনারে গান গাইবার আমন্ত্রণে। ভালো হত না কি এই তথ্য এখানে থাকলে যে "ওলো সই ওলো সই" গানটি কবি তৈরি করেছিলেন মৃণালিনী দেবী আর অমলা দাশের সখিত্ব দেখে? নববিধান, আদি আর সাধারণ: ব্রাহ্মসমাজের এই তিন টুকরোর মিলিত উৎসব নিয়ে যে লিখেছিলেন তিনি "পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান", ভালো হত না কি গানটির সঙ্গে এই সংবাদের যোজনা? ভালো হত "বলি ও আমার গোলাপবালা" প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'র এই মন্তব্যস্মরণ যে আমেদাবাদে শাহিবাগ প্রাসাদের প্রকাণ্ড ছাদে "নিজের সুর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে "বলি ও আমার গোলাপবালা"

গানটি এখনো আমার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আসন রাখিয়াছে।" অথবা, "বড়ো বেদনার মতো বেজেছ প্রাণে" প্রসঙ্গে এটা বলা যায় যে কবির মনে হয়েছিল "সুরটা ঠিক হয়তো মজলিশি বৈঠকি নয়। এসব গান যেন একটু নিরালায় গাবার মতো।" নিশ্চয় উল্লেখ করার মতো এই তথ্য যে "হা কী দশা হল আমার" সুরটির মূল পাওয়া গিয়েছিল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে শোনা একটি ফারসি গান "হালমে রবে রবা" থেকে, কিংবা এই তথ্য যে সরলা দেবী মহীশূর থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন যে-সুর তারই আদলে তৈরি হল "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে" "এসো হে গৃহদেবতা" "এ কী লাবণ্যে" বা "চিরবন্ধু চিরনির্ভর"-এর মতো গান-গুলি। এই সংকলনের হিসেবে বলা আছে যে "এ শুধু অলস মায়া" কবিতাটির প্রথম গীতরূপ পাই 'কাব্যগীতি'তে (১৯২০); সেই সঙ্গে এখানে বললে ভালো ছিল শান্তিদেবের এই বিবরণ যে এটিকে "১৩২৬ সালেই প্রথম গানের দলে স্থান গ্রহণ করতে দেখি, তাই অনুমান করি ঐ সালের কিছু পূর্বে এটি গানে পরিণত হয়েছিল।"

সংকলয়িতা নিজেই ছেপেছেন এই বই, তাই মুদ্রণ নিয়ে অনুযোগ করার মানে নেই কোনো। তবু মনে করিয়ে দিই যে এ-ধরনের বইয়ের পক্ষে এখানে ছাপার ভুল একটু বিপজ্জনকভাবে বেশি। সংশোধনের একটি তালিকা অবশ্য যুক্ত আছে সঙ্গে, কিন্তু সে-তালিকার বাইরেও মুদ্রণপ্রেতের অবাধ সঞ্চার। আর, কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা ঠিক নিশ্চিতও হতে পারি না যে সে কি ছাপারই ভুল না অন্য কোনো স্খলন। "মধুর মধুর ধ্বনি বাজে" গানটির তারিখ তো ৫ নয়, ৬ আশ্বিন ১৩০২। 'ছিন্নপত্রাবলী'র নজিরে "তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে"র যে পাঠ এখানে দেওয়া আছে তার প্রথম লাইনটি হওয়া উচিত ছিল "ওগো তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।" "হা কী দশা হলো আমার" গানের 'হা'টিও এখানে স্খলিত। "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বরে গীত বলে উল্লেখিত হলেও তালিকার শিরোদেশে দেখা যাচ্ছে ১৮৮৭ সাল (পৃ ৬১)। "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা" (পৃ ৯) প্রসঙ্গে সংকলয়িতা মন্তব্য করছেন "ভগ্নহৃদয় পুস্তকাকারে প্রকাশকালে (১২৮৮ বৈশাখ) এই গানটির পরিবর্তে পাঁচ স্তবকে ৩০ পঙক্তির কবিতা রচিত হয়। পরে প্রথম ৮ পঙক্তি ব্রহ্মসংগীত রূপে ১২৮৭ সালের মাঘোৎসবে গীত হয়।" এখানে, 'পরে' কথাটির

কী অর্থ করব আমরা? ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের গীতিগ্রন্থগুলির বিবরণকালে 'হিতবাদী'র 'কাব্যগ্রন্থাবলী' (১৩১১) বা 'বাউল' (১৩১২) সংকলনটি কেন যে বর্জিত হল, তারও তাৎপর্য বোঝা শক্ত। আর, গোটা বইটির মধ্যে, কখনো সাধুভাষা কখনো চলিত ভাষার সমাহার দেখেও ঈষৎ বিষণ্ণ হয়ে পড়ি আমরা।

৪

ত্রুটির বিবরণ হয়তো একটু দীর্ঘ হল। এর থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে বইটির লঘুকরণই আমার উদ্দেশ্য। এটা আমাদের মনে রাখতেই হয় যে এ-ধরনের কাজের প্রথম কয়েক স্তরে কিছু পরিমাণে এসব বিভ্রম থাকাই সম্ভব। এ কোনো একলার কাজ নয়, যদিও একাই কাউকে দায়িত্ব নিয়ে শুরু করতে হয় একটা প্রাথমিক ভিত্তি। তার পরেই দরকার সমবেত পরামর্শের, সমবেত কর্মোদ্যমের। এরপর সেই উদ্যম যাঁরা করবেন একদিন, তাঁদের প্রতি পাঠকদের পক্ষ থেকে এই প্রশ্নগুলি সাজিয়ে রাখা হল মাত্র। কয়েকটি সংস্করণের মধ্য দিয়ে, কয়েকবার শোধনের মধ্য দিয়ে একদিন হয়তো এ-সংকলন প্রত্যাশিত পূর্ণতা পাবে সমস্ত অর্থে।

মৃত্তিকা শিকড় মঞ্চমায়া

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

"ভাগিস্ আল্‌পনা কেউ বেচবার জন্য আঁকেনা, তাই রক্ষা"

—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, 'থিয়েটার প্রসঙ্গে', পৃ ৪২

আমাদের জীবনেও সেই স্থপতির বিখ্যাত স্বপ্নটি এক-একবার ঝলক দিয়ে মিলিয়ে গিয়েছে : মঞ্চ ঘিরে একটি বাড়ি, কিংবা বলা যায় বাড়ি ঘিরে একটি মঞ্চ যেখানে অনেক আশার কথা খুব সহজে বলা যাবে।

আসল কথা একটুখানি মাটি চাই যার ভিত্তিতে স্বপ্নানুগ স্থাপত্য সম্ভব হতে পারে। গ্রীক শব্দ theatron বলতেও বোঝায় এমন একটি জায়গা যেখানে দৃশ্যমান একটি ব্যাপার তৈরি করা যায়।

আমাদের জাতীয় নাটমঞ্চ নির্মিতির বাসনা আজ অন্তত একশো বছর বয়স পার হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা ঈপ্সিত মৃত্তিকার সন্ধান পাই নি। শম্ভু মিত্রকে গভীর কৃতজ্ঞতা, তিনি ধ্রুবপদের মতো আমাদের শুনিয়েছেন, সমীপশিকড় ছুঁতে না পারলে সমস্ত শিল্পৈষণা অমূর্ত থিয়োরিচর্যায় পর্যবসিত হতে বাধ্য*। দেশাত্মবোধ ছাড়া আত্মবোধ নেই, তিনি জানেন এবং সেই সঙ্গে এটাও জানেন 'পেট্রিয়টিজম্' দেশাত্মবোধের প্রতিশব্দ নয় :

> "দেশজ কাঠামোর মধ্যে আত্মপ্রকাশের চেষ্টাটা যেন পেট্রিয়টিজম্-এর জন্য অভিনন্দিত না হয়। এর কারণ আরো অনেক গূঢ়, যাকে কড ওয়েল বলেছেন, জাতির অবচেতন স্তরে আবেদন পৌছানো।" পৃ ১৪২

নির্জ্ঞান এই গূঢ় সত্তার স্বরলিপি আয়ত্ত করতে গিয়ে তিনি জেনেছেন, আমরা আমাদের মানসের সমগ্রতা প্রকাশ করতে পারি আমাদের মাতৃভাষাতেই। এইভাবেই তিনি অনুধাবন করেছেন নাটকের সমস্যা আর সাহিত্যের সমস্যা নিকটঘটনা। তাঁর এ উপলব্ধি হয়তো আপাতদৃষ্টিতে এমন-কিছু মৌল নয়। কিন্তু ঈষৎ তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, এই সূত্রে তাঁর উচ্চারণগুলি আমাদের আজকের উদ্‌ভ্রান্ত স্বদেশে কীরকম দৃপ্ত। কেননা এক-যে-ছিল-এবং-আছে এই

* প্রসঙ্গ : নাট্য। শম্ভু মিত্র। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা। বারো টাকা

মজার দেশে এখনো যেমন অদীক্ষিত মানুষ অনায়াসে কবি ও সাহিত্যিক এ দুটি ধারণার দ্বিবর্গীকরণে আনন্দিত, বিদগ্ধ রসজ্ঞেরাও তেমনি সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব ও নাটকের সমাজতত্ত্বকে দুই আমূল স্বতন্ত্র প্রকৃতির সংঘটন বলে মনে করেন। একথা অবশ্য অস্বীকার করবার উপায় নেই সাহিত্যঅভিধার উপযুক্ত খুব অল্প কয়েকটি নাটকই আমাদের মঞ্চে উত্তীর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয় কি তৃতীয় পর্যায়ের সাহিত্যকৃতি যেমন সাধারণত সার্থক ফিল্মিত হয়, শিল্পমূল্যে দীন বেশ-কিছু রচনাও তেমনি মঞ্চমূল্যে অপ্রত্যাশিত গরিমা অর্জন করেছে। সে হিসেবে পরিণত আক্ষেপ নিয়ে এরকমও বলা যায়, আমাদের দেশে নাট্যযজ্ঞ যাঁরা দীপিত রেখেছেন তাঁদের কৃতিত্ব অসামান্য, যেহেতু তাঁদের হাতে প্রাথমিক জরুরী অরণি ছিল খুব কম। এসত্ত্বেও নবনাট্যআন্দোলন নিশ্চয় অন্তর্লীন মহিমায় কোনো মুভেল ভাগ-এর চেয়ে এতটুকু অকিঞ্চিৎকর নয়।

অমৃতলালের মতো মধ্যচিত্ত (mediocre) নাট্যকারকেও একদিন 'বাক্-যান্ত্রিক' শব্দটি অসীম শ্রদ্ধাভরে ব্যবহার করতে হয়েছিল। ঐ শব্দ তিনি প্রয়োগ করেছিলেন এমন একজন কবি প্রসঙ্গে যিনি নাট্যকার না হয়েও তৎ-কালীন নাট্যআন্দোলনকে আতিথেয় স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। কবিতা নামক শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে নাট্যশিল্পের এই যোগ প্রমাণিত হয় ইবসেনের বিবর্তনে, বেকেটের কবিস্বভাবে—মাক্স ফ্রীশ্ যেমন কবুল করেছেন—রবীন্দ্রনাথের আত্মনাট্যময় রৌদ্রাভিসারে, পেটার ভাইসের সাম্প্রতিক ব্যর্থতায়। এসব ক্ষেত্রে কোথায় কবিতা অকারণ আপেক্ষিক প্রাধান্য পেয়েছে, নাট্যরঙ্গই বা কোনখানে তাকে সপ্তরশ্মির প্রপঞ্চে আত্মসাৎ করে নিতে পেরেছে, নাট্যসমালোচকদের প্রায়শই সে-ব্যাপারে সত্যপ্রিয়তার দোহাই মেনে রায় দিতে দেখা যায়। কিন্তু এই একটা কথা এসব বিচারকেরা খুব জোর দিয়ে কখনোই বলেন না যে, যথার্থ নাটকের অভ্যন্তরে কবিতার শক্তিই কাজ করে। এই কথাটা শম্ভু মিত্র খুব ভালো ভাবে বলতে পেরেছেন। অভিনেতার পক্ষে কবিতার বোধ যে কতো অপরিহার্য বিষয়, সেটি তিনি এ গ্রন্থের নানা নিবন্ধে স্পষ্ট দেখিয়েছেন। যেহেতু তিনি একালের একজন অগ্রণী অভিনেতা, হাতে-কলমে শেখা তাঁর কারিগরির প্রজ্ঞাময় অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এসব কথা বলেছেন, তাই এই কথাগুলি শুধু কোনো তরুণ অভিনেতার কাছে নয়, প্রকরণজাগর কবির কাছেও মহার্ঘ দান। আজকের দেশজোড়া নানান অডিওভিস্যুয়াল বিভীষিকা বা

আবৃত্তিসভায়, অগণ্য নাট্যদলের অভিনয়ে ভাষা নামক সত্তাটিকে শোচনীয় অপমান করা হয়ে থাকে। তরুণ কবিরাও এখন সচরাচর ভাষা ও ছন্দকে একরকম বর্জন করে কবিতা রচনা করেন, কেননা ও দুটি ব্যাপার আয়ত্ত করতে গেলে 'প্রেমের পরিশ্রম' কিছু স্বীকার করতেই হয়। অথচ পারিতোষিকপরায়ণ কিছু প্রতিষ্ঠানের দয়ায় আজ অশিক্ষিতপটুত্ব অনায়াসেই সম্মানিত। শম্ভু মিত্র এসব স্বীকৃত কাণ্ডকারখানাকে মেনে নেন নি, কারো মন না রেখে একাধিক সত্যকথা বলেছেন। রূঢ়কথন মানেই সত্যভাষণ নয়, তিনিও জানেন। তাই তিনি অনেক সময়েই এমন-কিছু ঋতকথন করেছেন যেগুলি সংবেদনশীল শিক্ষার্থীর কাছে আদৃত হতে বাধ্য। কবিতা পাঠগম্য না আবৃত্তিধার্য, সংলাপের স্বরক্ষেপ কীরকম হওয়া উচিত, সংগীত কী করে নাট্যপরিস্থিতির আবহসীমা ছাড়িয়ে তার মজ্জায় অনুস্যূত হয়ে যায়, বিভাব ও অনুভাবের সম্পর্কই বা কী—এই সব জটিল ব্যাপারে তিনি তাঁর অমূল্য অভিজ্ঞতার অংশীদার করেছেন আমাদের, সেজন্য তাঁকে নন্দিত করি।

এই অভিনেতার দৃষ্টি নির্মোহ বলেই যুগসময়ের কেন্দ্রহীন দুর্দশা নিয়ে তাঁর ভাবনা। সৌখিন প্রগতিপনায় যেমন তাঁর আস্থা নেই, অসহ্য রক্ষণশীল রুচি প্রসঙ্গেও তেমনি প্রশ্ন উঠতে পারে, কোথায় এখন তাঁর বৈপ্লবিক মুদ্রা? এখানে তাঁর কিছু কীর্ণ উক্তি সাজিয়ে দেওয়া যায়:

১ "আমরা সবাই দিশেহারা অধঃপতনের পথে হু হু করে নেমে এসেছি। আমাদের চিন্তার বিন্যাস নেই, আবেগের ভদ্রতা নেই। কর্মহীন পরচর্চা আর নিঃসহায় দৈববিশ্বাসের আবর্তে আমরা তলিয়ে যাচ্ছি।" পৃ ১৩

২ "নাড়ীর মধ্যে এই সব অনুভব নিয়েই তো আমরা ভারতীয়। কিন্তু আমরা সেতুস্থাপন করতে পারছি না। আমাদের নিজেদেরই সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।" পৃ ৮৩

৩ "আধুনিক যুগের নাট্যকার, যিনি ঐ অভিনেতাগুলোর মতোই উৎসর্গীকৃত ও উন্মাদ, তাঁকে আজও ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না।" পৃ ১২

বিশেষত শেষ উক্তিটি তাঁরই এক সতীর্থ সমাজতাত্ত্বিকের এই মুহূর্তের ভাবনা-চিন্তার কাছাকাছি:

"...যাঁরা বিপ্লবী, বিপ্লবের লক্ষ্যে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, তাঁরা যে কেবল আজ দিশের সন্ধানে দিশেহারা তাই নয়, পথ ও মতের ব্যবধানে তাঁদের পথ ও মতের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ও মানবিক দূরত্ব ক্রমবর্ধমান।" (বিনয় ঘোষ, 'মেট্রোপলিটন মন * মধ্যবিত্ত * বিদ্রোহ', ১৯৭৩, পৃ ২১৮)

শম্ভু মিত্র ক্রমশই এই পথহীনতার মধ্যে অনর্পিত শিল্পবিবেকের কথা বলেছেন। সে-ধারণা আত্যন্তিক বিপ্লবীদের কাছে শিল্পসর্বস্ব মনে হতে পারে, কিন্তু যেহেতু এই নান্দনিক বোধসম্পন্ন মানুষটি সাম্প্রতিক অসহায় পরিবেশে এখনও কিছু সৃষ্টি করতে উন্মুখ, কোনোরকম তাত্ত্বিক গোঁড়ামি যাঁর সৃজনক্রিয়া ক্ষুণ্ণ করে নি, তাঁর অভিপ্রায় উৎসর্গময় এটা মানতেই হবে।

এ বইয়ের সবচেয়ে সুখপাঠ্য অংশ সম্ভবত তাঁর স্মৃতিচারণের। প্রসঙ্গত 'শিশিরকুমার' ও 'মহর্ষি' রচনা দুটিতে ভাষার জীবন্ত প্রসাদগুণ দেখতে পাওয়া যায়। শুধুমাত্র সুখপাঠ্যতা নয়, দৃষ্টিকোণের নিজস্বতা থাকার ফলে এই পর্যায়ের রচনা থেকে নবীন নটের পক্ষে শিক্ষণীয় অনেক-কিছুই মেলে। অথচ, অ্যাকাডেমিক ঢং তাঁর আদৌ মনঃপূত নয় বলেই নাট্যসংক্রান্ত কিছু লৌকিক মামুলি কৌতূহল তাঁর গ্রন্থের পরিসরভুক্ত হয় নি। যেমন ধরা যাক, একটি নাটকের মহড়া কতোদিন সময় নিলে ভালো? ব্রডওয়েতে পৌঁছবার আগে মার্কিনি নাটক মাসের-পর-মাস নির্মীয়মান থাকবার সুযোগ পায়, অথচ ভালো জর্মন নাটক মাত্র চার সপ্তাহ—ড্যুরেনমাটের এরকম একটি খেদ হঠাৎ এখানে মনে পড়ল। আমাদের দেশের মিশ্র বাস্তবতায় এক্ষেত্রে জীবিত একজন নাট্যকার (ধরা যাক, বাদল সরকার) যদি নাটকের সংলাপের বড়োরকম বদল করতে চান, 'বহুরূপী' কি রাজী হবেন? নাকি সেখানে সোফোক্লেস-রবীন্দ্রনাথের মতো চিরায়তিক নাট্যকারের নাটক 'দ্রুত নামানো' সম্ভব? এরকম বিষয়েও তাঁর কাছ থেকে আমরা শুনতে চাই।

আরেকটি কথা। বিশ্বশিল্পের সঙ্গে ভারতশিল্প এক হয়েও পৃথক, অবনীন্দ্রনাথের এই কথাটির অনুষঙ্গে এ বইয়ের পাঠকের প্রশ্ন জাগতে পারে, বিশ্বনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে ভারতীয় নাট্যনিরীক্ষার সাদৃশ্য ও বৈষম্য ঠিক কোথায়? বৈষম্যের কথাটা শম্ভু মিত্র অনেক সময় উচ্চারিত প্রস্বরে বলেছেন, সাদৃশ্যের দিকটাও কি আজকের শতকে উপেক্ষা করা চলে? বাঙালির মানসপরিধি ছাড়িয়ে যখনি তিনি ভারতীয়তার কথা বলেছেন তখন কি তাঁরো মনে হয় নি ওরকম সন্ধান মায়ামৃগয়ারই মতো? তা নাহলে কেন আজ আমাদেরই অন্যান্য কোনো-কোনো অন্তর্দেশে ব্রেশ্‌ট্‌ রবীন্দ্রনাথের চেয়েও গৃহীত নাট্যকার?

অথবা ব্রেশ্‌টের মতোই কোনো 'বিদেশী' নাট্যকার যখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জমিনে (ধরা যাক) কমবেশি সার্থকতা পাচ্ছেন তখন কি ঐ নমনীয়

গ্রাহকশক্তিও উদ্দিষ্ট ভারতীয়তার একটি শর্ত হতে পারে না ?

কিন্তু এই ধরনের অনুযোগও হয়তো অবান্তর, কেননা শম্ভু মিত্র ভারতীয়তা ও নাট্যকলা বিষয়ে কোনো সন্দর্ভ ফেঁদে বসেন নি। তাঁর বিষয় শিকড়ের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক। অবনীন্দ্রনাথ, বিনোদবিহারী, মনোরঞ্জন বারবার লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গে মৈত্রীযোগ অচ্ছেদ্য রাখবার উদ্দেশ্যে আলপনার প্রতীকী উপমা ব্যবহার করেছেন। ঐ আলপনা—যামিনী রায় নাকি বলতেন—পাযে-পায়ে মাড়িয়ে যাবার জন্যেই। অর্থাৎ তার ব্যবহার্যতা মূলত প্রাত্যহিক। গভীর ধ্রুপদাঙ্গ নাটকের ক্ষেত্রেও ব্যাপক দর্শকসাধারণের অধিকার আছে তাকে প্রায়-ব্যবহারিক ভঙ্গিতে যাচাই করা, তার জীবস্বভাবের কৌমতা চরিতার্থ করবার একটি ঘনিষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে তাকে দেখা। এখানেই নাটক ও অভিনয়ের প্রিয় প্রাসঙ্গিকতা। মাটির সুনিহিত ভিত্তিপটেই আঁকা তাঁর আলপনা। এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য যেমন বলেছেন ঐ আলপনা বিক্রয়ের জন্যে চিত্রিত নয়, তাঁর যোগ্যতম উত্তরসাধক শম্ভু মিত্রের কাছেও তেমনি নাটক সত্যকাম বিনোদনের পদ্ধতি, অবিবেকী বিকিকিনির সামগ্রী নয়।

পাক-বাঙলাদেশের চলচ্চিত্র

গুরুদাস ভট্টাচার্য

অবশেষে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ হয়ে গেল 'ইনডিপেনডেনস অফ ইণ্ডিয়া অ্যাকট ১৯৪৭'। দেশ ভাগ হল। ভাগাভাগি হল মাটি-ধন-সামর্থ্য-দারিদ্র্য, দায়দায়িত্ব ইত্যাদি। উদ্বাস্তু শিল্পীরা, সংস্কৃতিবানরা। বিচিত্র অবস্থা হল সংস্কৃতির, শিল্পের, সাহিত্য-চিত্র-গান-বাজনা-অভিনয়ের। দুই সীমান্তে তার দুই রূপ, আবার একরূপতাও। দীর্ঘ পঁচিশ বছরেও সে-দাগ মুছে ফেলা যায় নি। আবার, মুছেও গেছে অনেকগুলি, বা যাচ্ছে।

সংস্কৃতির এই দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি নবজাত দেশ পাকিস্তানেও, তার দুই অঙ্গে। ধর্মে যারা এক, ভাষায় তারা আলাদা। স্বাতন্ত্র্য আচারে-বিচারে, চিন্তায়-বুদ্ধিতে, সংস্কৃতিভাবনাতেও। কলকাতার উত্তরাধিকার ঢাকায়, বোম্বাইয়ের উত্তরাধিকারী লাহোর-করাচি।

শুধু ভৌগোলিক নয়, ঐতিহাসিক কারণেও এমনটি ঘটেছে। পলাশির যুদ্ধের এবং পরবর্তী অন্যান্য যুদ্ধের পর পরাজিত মুসলমান সমাজ, স্বাভাবিক কারণেই, নতুন শাসনব্যবস্থা থেকে দূরে রয়ে গেল; সুযোগ গ্রহণ করল হিন্দুরা। শুধু রাজনৈতিক নয়, ধর্মক্ষেত্রেও ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের বিরোধ একটি পুরনো ঐতিহাসিক তথ্য। তাছাড়াও, আরও দুটি কারণ ছিল। ইসলাম ধর্মশাস্ত্রমতে বিদেশী 'যাবনিক' ভাষায় শিক্ষাগ্রহণ ছিল নিষিদ্ধ। ইংরেজি তাই তখন গ্রহণ-অযোগ্য ছিল। দ্বিতীয়ত, প্যান-ইসলামিক ভাবনা ও মুজাহিদী খিলাফত ইত্যাদি আন্দোলন মুসলিম সমাজে স্বাতন্ত্র্যের চেতনা জাগিয়ে দিয়েছিল। এবং ব্রিটিশের অনুগ্রহ লাভ তাবৎ মুসলমানেরই মনপসন্দ্ ছিল—একথা কখনও সত্য নয়। এ-বোধ এই দৃষ্টিভঙ্গী এখনও সমাজের একাংশে আছে; অন্য অংশকে—হয়তো বড় অংশই—এসব পেরিয়ে আসতে হয়েছে, এখনও হচ্ছে। পরে, যখন মূল জীবন-প্রবাহের শামিল হতে চাইল মুসলমানরা, ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে একাংশের আঁতাত

* THE CINEMA IN PAKISTAN: ALAMGIR KABIR. Sandhani Publications, Dacca. Rs. 10.

গড়ে উঠল—ততদিনে হিন্দুরা অনেক এগিয়ে গেছে। এর ফল—না ভারতে, না পাকিস্তানে—কোথাও ভালো হয় নি। ভারতীয় সংস্কৃতি এখনও তার স্বরূপ খুঁজে বেড়াচ্ছে, পাক-সংস্কৃতিকে শুরু করতে হয়েছে একেবারে গোড়া থেকে। সেখানেও তার দুই অঙ্গে দুই রূপ।

দু-একটি বিধিবদ্ধ কলা-শিল্প বাদে ইসলাম ধর্ম শিল্পকলা বিষয়ে সাধারণত রক্ষণশীল। ['সাধারণত' বললাম এই জন্যে যে, রক্ষণশীলতার মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে অনেক শিল্পের বিকাশ হয়েছে ; এ বিষয়ে শিয়া-সুন্নীর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও আছে ; এবং অধুনা উদারতা ও আগ্রহ উজ্জীবিতও।] তাই যখন দেশত্যাগের অনিবার্য ফলস্বরূপ হিন্দু সংস্কৃতিবিদ ও শিল্পীরা দলে দলে ভারতে চলে এলেন, পাকিস্তানের পূবে ও পশ্চিমে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতা দেখা দিল। পূর্ব-পাকিস্তান (অধুনা বাঙলাদেশ) এই অবস্থা অচিরেই কাটিয়ে উঠল রক্ষণশীলতার বাঁধ ভেঙে দিয়ে ; তারা হিন্দুদেরও সঙ্গে নিল, যার ভিত্তিতে ছিল অপরিসীম বঙ্গভাষা-প্রীতি। বাহান্নর ভাষা-আন্দোলন এই সংস্কৃতি-আন্দোলনকে নতুন রক্ত দিল। উভয়ের মিলিত প্রয়াসে যে জনমুখী বঙ্গসংস্কৃতি ক্রমশ রূপান্বিত হয়ে উঠল, পার্শ্ববর্তী 'প্রগতিশীল' পশ্চিমবঙ্গে আজও তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

অন্যদিকে, পশ্চিম-পাকিস্তান (অধুনা, শুধুই পাকিস্তান) গোঁড়া রক্ষণশীল। সেখানে সমাজের শীর্ষে মুসলমান, অর্থনীতির চূড়াতেও ; কিন্তু প্রায়োগিক শিল্পের তত্ত্বাবধায়ক হিন্দু। শিক্ষায়তনে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ ; ভদ্রঘরের মেয়েদের প্রকাশ্যে যোগদান বিধিবহির্ভূত। অথচ পুরুষের পক্ষে অবাধ অধিকার 'তমাশবীনী'র—রক্ষিতা-গমন ও বিনোদিনী-পালন শরীফ-রইসদের ইজ্জতের ব্যাপার। নাচ-গান-অভিনয়ে তাই আজও এদের প্রাধান্য। পাশাপাশি 'নবযুগ'ও অবশ্য সমাগত।

অর্থাৎ পাকিস্তানের পশ্চিমে ও পূর্বে দুই পৃথক সংস্কৃতি। মাঝে-মধ্যে মিলমিশ ঘটলেও মূলত স্বতন্ত্র। ফলে, দুই দেশের চলচ্চিত্রেও দ্বিবিধ চিত্র, চলমান চিত্র। আজ বিয়োগ হলেও যোগ একদিন ছিল ; এবং যোগ-বিয়োগ ছিল বরাবরই।

দুই

পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে লাহোরের স্থান ছিল

তৃতীয়। চারটে স্টুডিও, মালিক হিন্দু। দাঙ্গায় একটা পুড়ে যায়, বাকি তিনটে পরিত্যক্ত। চলচ্চিত্র অচল। অবশেষে কয়েকজন এগিয়ে এলেন। কর্মচঞ্চল হয়ে উঠল পাঞ্চোলী স্টুডিও। সহযোগিতায় স্থানীয় শিল্পী ও কলা-কুশলীদের সঙ্গে সেদিন ছিলেন বোম্বাই ছেড়ে-আসা নূরজাহান, শামিম, স্বর্ণলতা, খুরশীদ, চার্লি, লোকমান, জিয়া সারহাদী প্রভৃতি। কয়েক বছরেই আরও জুটো স্টুডিও ; এবং করাচিতেও। তবু, আমদানীকৃত অথবা চোরাই চালান-করা বোম্বাই ছবির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ভার। রক্ষাকর্তারূপে এগিয়ে এলেন সরকার ; ধাপে-ধাপে আইন করে ভারতীয় ছবির প্রবেশ নিষেধ করে দিলেন। তবু, পাক-ছবিতে না-পাক বোম্বাই ছবির অনুকরণ আষ্টেপৃষ্ঠে, সেই এক ছাঁচ-প্যাটার্ন-ফর্মুলায় বাঁধা কল্পকাহিনী। ব্যতিক্রম যে হয় নি, তা নয়। অন্তত, তিনটে ছবি উল্লেখযোগ্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে : 'লাখোঁ মে এক', 'বদনাম,' 'নীলা পর্বত'। প্রথমটিতে আন্তঃ-সম্প্রদায় প্রেম-বিবাহের জরুরী প্রশ্ন তোলা হয়েছে ; দ্বিতীয়টিতে এক টাঙ্গাওয়ালার সততাকে কেন্দ্র করে অসৎ পরিপার্শ্বের ছবি তুলে ধরা হয়েছে ; তৃতীয়ে বিবৃত দত্তক-কন্যার প্রতি এক বৃদ্ধের আসক্তি।

১৯৪৮-এ কায়েদ-এ-আজম জিন্নাহ্ যখন গভর্নর জেনারেল রূপে প্রথম ঢাকায় গেলেন, তখন তাঁর সেই ঐতিহাসিক সফরকে চলমান ছবিতে ধরে রাখার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ঢাকা রেডিওর নাজির আহ্‌মেদ কলকাতা থেকে ক্যামেরা ভাড়া করে এনে কোনোরকমে ছবি তুললেন। প্রথম তথ্যচিত্র। বড় ডকুমেণ্টারি 'বার্থ অফ পাকিস্তান' ওঠে বিদেশী সহযোগিতায়। দেশী বিভাগটি ছিল তথ্য-মন্ত্রকের অধীনে। ১৯৫৮য় যখন সামাজিক আইন জারী হল, আলতাফ গওহর তখন এই মন্ত্রকের সেক্রেটারি। হিটলারের যেমন গোয়েবলস, জেনারেল আইয়ুবের তেমনি জনাব গওহর ; প্রভুর সেবায় বিকিয়ে দিলেন চলচ্চিত্রকে। শুধু তফাৎ এই, প্রেসিডেণ্ট আইয়ুবের 'মৌলিক গণতন্ত্র'কে চির-অমর করে রাখার জন্যে লেনি রিয়েফেন্‌স্‌তাহ্‌ল্‌-এর মতো কোনো আলোকচিত্রী তাঁর পাশে ছিলেন না। তবু, তথ্যচিত্রের সুদিন এল ; 'ডকুমেণ্টারি ফিল্মস পাকিস্তান'-এর প্রধান হলেন এইচ. সি. হাসুম ; করাচিতে সুন্দর ল্যাবরেটরি গড়ে উঠল ; কয়েকজন বিশেষ শিক্ষা নিয়ে এলেন কানাডার ন্যাশনাল ফিলম বোর্ডের কাছ থেকে ; দশ বছরে দেড়শোর মতো ছবি উঠে গেল। তার মধ্যে কয়েকটি সত্যিই সুন্দর, দেশ-বিদেশে পুরস্কৃতও : এস. এম.

আগার 'গান্ধার আর্ট' ও 'সিটি অফ ঢাকা', জনাব হাসুম প্রযোজিত 'পাকিস্তান স্টোরি' ও 'পাকিস্তান প্যানোরামা' এবং বজলে হোসেনের 'সারমন ইন ব্রিকস'। শেষ ছবিটি পূর্বাঞ্চলের, এবং মসজিদ ও মন্দিরের স্থাপত্যশিল্পের কবিতা-চিত্র।

তিন

পূর্বাঞ্চলের চলচ্চিত্রের ইতিহাস কিন্তু তাই বলে কবিতার মতো স্বললিত নয়। স্টুডিও-ল্যাবরেটরি-যন্ত্রপাতি-কলাকুশলী-শিল্পী, সবকিছুর অভাব। তার ওপর সরকারী ঔদাসীন্য ও অসহযোগিতা, ট্যাক্সের গুরুভার ও সেনসরের কড়াকড়ি। এমন কথাও ছড়িয়ে দেওয়া হল, যে, পূর্বাঞ্চলিক জলবায়ু ছবি তোলার অনুকূল নয়! উদ্দেশ্য পরিষ্কার : উর্দু ছবির বাজার অবাধ রাখা এবং বাঙালি সংস্কৃতিকে দাবিয়ে রাখা। সেদিন ঘরে-বাইরে অনেক বাধা-বিপদ-আঘাতের মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়েছে বাঙলা ছবিকে। তার সূত্রপাত ঢাকা নয়, কলকাতায়; এবং সেখানেও প্রতিঘাত-প্রতিরোধ।

১৯৪৫। নোয়াখালির ওবায়েদ উল হক কলকাতায় এলেন : পকেটে চোদ্দ হাজার টাকা, হাতে পঞ্চাশের মন্বন্তরের ওপর তৈরি চিত্রনাট্য, চোখে স্বপ্ন ছবি তোলার। কিন্তু এ-লাইনে তখনও হাতেখড়ি হয় নি, তার ওপর সম্প্রদায় ভিত্তিতে বিরোধিতা। তবু শুটিং আরম্ভ হল; জহর গাঙ্গুলি ও রেণুকা রায়ের সঙ্গে 'মুসলমান অভিনেতা' ফতেহ্ লোহানী; সংগীত আবদুল আহাদ। ছবি শেষ হতে থাকে; সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাও বাড়তে থাকে শহরে, আশেপাশে। উড়ো চিঠি আসে : মুসলমানের তৈরি ছবি দেখালে হাউস পুড়িয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর পরিচালক ওবায়েদ উল হক হলেন 'হিমাদ্রি চৌধুরী' এবং ভিলেনরূপী ফতেহ্ লোহানীর নাম হল 'কিরণ কুমার'। ছবির নাম 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া'। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৯৪৬-এ ছবি মুক্তি পেল। দুবছর পরে জনাব হক আবার কলকাতায় এলেন দ্বিতীয় ছবি করার জন্যে। গান্ধীজীর হত্যা। ছবি হল না। প্রথম ছবির পাওনা টাকাও পেলেন না। পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি লগ্নী করেছিলেন; তার মুনাফা লুটে নিল কলকাতার পরিবেশক।

অবিভক্ত বাঙলার সংস্কৃতিকেন্দ্র কলকাতা; বিভক্তির পর চলে গেল ভারতে। এই সংস্কৃতিতে পূর্ব-বাঙলারও অবদান ছিল; তাও হাতছাড়া হয়ে

গেল। মহা শূন্যতা। ছোট্ট জেলা শহর ঢাকা, নতুন রাজধানী। তারও নিজস্ব ঐতিহ্য আছে; তাকে আশ্রয় করেই আত্মনির্ভর হতে চাইল পূর্ব-পাকিস্তানের নয়া-সংস্কৃতি। অভিনয় মঞ্চ তার প্রধানতম মাধ্যম; ভাষা-আন্দোলন তার জীবন-পণ। বাঙলা চলচ্চিত্র (পরে টেলিভিশন) বাস্তব হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিল ১৯৫৩য়। ততদিন একাধিপত্য বোম্বের ও কলকাতার ছবির।

মরহুম আবদুল সাদেক ছিলেন সরকারী পরিসংখ্যান বিভাগের সঞ্চালক। একদা তিনি ডেকে পাঠালেন পরিবেশক-প্রদর্শক-সংস্কৃতিসেবীদের, প্রশ্ন রাখলেন : "ছবি তুলতে প্রস্তুত আছেন কেউ?" সভাসদজন অপ্রস্তুত, নিশ্চুপ, বিরোধীও কেউ কেউ। সাড়া দিলেন একজন : মঞ্চ-নট ও নাট্যকার আবদুল জব্বার খান। দুজন অংশীদার নিয়ে গড়লেন 'ইকবাল ফিল্মস'; কলকাতা থেকে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ক্যামেরা আনালেন; ক্যামেরাম্যান কিউ. এম. জামান কলকাতা ও বোম্বেতে সহকারীর কাজ করেছেন; সাউণ্ডের জন্যে সংগৃহীত হল ঘরে-ব্যবহৃত টেপ-রেকর্ডার; খান সাহেবেরই লেখা মঞ্চনাট্য 'ডাকাত' থেকে তৈরি হল চিত্রনাট্য, নতুন নাম 'মুখ ও মুখোশ'; যোহরত আরা, কাজী খালেক, ইমাম আহ্‌মেদ প্রভৃতি বিনা-পারিশ্রমিকের শিল্পী; আউটডোর শুটিং (এই সুবিধের জন্যেই গল্পটিকে বিশেষভাবে নির্বাচন করা হয়েছিল); মোট খরচ প্রায় চৌষট্টি হাজার টাকা। অনেক যত্ন, আন্তরিকতা, সহযোগিতা। তবু, ছবি মনের মতো হল না। পরিবেশকরা বিমুখ হলেন। শেষে, 'রূপমহল' চিত্রগৃহের কমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রাজী হলেন—ব্যবসায়িক কারণে নয়, তার চেয়েও বেশি। অভূতপূর্ব সাফল্য! তখন অন্যান্য শহরেও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল।

'মুখ ও মুখোশ' বাঙলা চলচ্চিত্রের মুখশ্রী—দিল সাহস, উৎসাহ, উত্তেজনা। ছবিটির মুক্তির দিন ছিল ১৯৫৬ তেসরা আগস্ট; ১৯৫৮য় ঢাকায় তৈরি হল স্টুডিও-ফ্লোর। সেও সাদেক সাহেবের প্রচেষ্টায়। জনাব জব্বার খান এবং তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের সহকারী সেক্রেটারি আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সহযোগিতায় তিনি একটি স্কীম তৈরি করলেন; ১৯৫৭য় তা পাশ হল প্রাদেশিক বিধানসভায় : 'ইস্ট পাকিস্তান ফিল্ম ডেভেলপমেণ্ট অ্যাক্‌ট'। ১৯৫৮য় দেখা দিল 'এফ. ডি. সি.'—এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্টুডিও। পরিচালক নাজির আহ্‌মেদ। তিনি নিয়ে এলেন কলকাতা-অভিজ্ঞ কলাকুশলীদের। পরপর ছবি হতেহ,

লোহানীর 'আসিয়া' ও 'আকাশ আর মাটি' এবং মহীউদ্দীনের 'মাটির পাহাড়'। 'আসিয়া' প্রভাবিত 'পথের পাঁচালী'র দ্বারা—সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সেই ফ্রেম ও কমপোজিশন ; 'আকাশ আর মাটি'তে কলকাতার শিল্পীদল। কলকাতার শিল্পী কারদারের বাঙলা-উর্দু মিশ্রিত, মসকো উৎসবে পুরস্কৃত 'জাগো হুয়া সবেরা'-তেও। পূর্ব-বাঙলার জেলেদের নিয়ে অপূর্ব ছবি রচনা করেন ব্রিটেনের ওয়ালটার লেসালী। ক্রেডিট-টাইটেলে কাহিনীকার হিসেবে উর্দু সাহিত্যিক ফয়েজ আহ্‌মদ ফয়েজের নাম দেওয়া হয়েছে ; যাঁরা দেখেছেন ও জানেন, তাঁরা বলেন, ছবিটির উৎস : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'।

একেবারে গোড়া থেকে, মাটি ঘেঁষে যাত্রা। তাই শুরুতেই বাঙলা চলচ্চিত্র হতে চেয়েছে মাটি ঘেঁষা, বাস্তব, পরিচ্ছন্ন। কিন্তু চলল না। তখন উর্দু ছবির আদল নেওয়া হল। ফ্লপ। বাঙালি আরম্ভ করল উর্দু ছবি। এহ্‌তেশামের 'চান্দা' (১৯৬২) পূবে-পশ্চিমে বক্স-অফিস পেল। এই দিকেই ঝোঁক বেড়ে গেল—৬৩তে তিনটে, ৬৪তে চারটে, ৬৬তে বারোটা ! ওদিকে, বাঙলা ছবির অবস্থা কাহিল। তবু, জব্বার খানের 'জোয়ার এল' এবং সুভাষ দত্তের 'সুতরাং' ভালো ব্যবসা করল। উর্দু ছবিও মার খেতে লাগল। এমন সময়ে সালাহ্‌-উদ্দীন 'রূপবান' তুলে নতুন ধারার সূত্রপাত করলেন। 'রূপবান' একটি প্রসিদ্ধ লোকযাত্রা : বাদশাহ্‌র হুকুমে বারো বছরের মেয়ে বিয়ে করে এক নবজাত শিশুকে ; বনে ওদের রেখে দিয়ে আসা হয় ; শিশু যৌবনে পা দিয়ে আসক্ত হয় অন্য নারীতে ; শেষ পর্যন্ত সতীত্বের জয় হয়। ঠিক 'ফোক সিনেমা' বা লোক-চলচ্চিত্র নয়, যাত্রারই চলচ্চিত্রিত রূপ। 'রূপবান' রেকর্ড করল। এই ধারাই তখন চলতে লাগল। অবশেষে, তাও একদিন ফুরিয়ে গেল। দেখা গেল : প্রদেশের দর্শক তিন শ্রেণীর—গ্রামের চাষী, শহরের শ্রমিক ও ধনী এবং শহুরে বুদ্ধিজীবী। এদের সবার জন্যে যদি নাও হয়, অন্তত প্রথম দুই শ্রেণীর আনুকূল্য লাভের উদ্দেশ্যে নতুন ফর্মুলা এল : "শহুরে বিষয়, গ্রামীণ আবেদন"—অর্থাৎ সেই সনাতন শরৎচন্দ্রীয় প্যাটার্ন ও ডিজাইন, যা কলকাতার স্টুডিওতেও অদ্যাবধি সুলভ-দ্রষ্টব্য। বাঙলা ছবির গতিরেখা পুনশ্চ উর্ধ্বমুখী হতে থাকে। 'বেহুলা' 'আনোয়ারা' ইত্যাদি ছবির মাধ্যমে প্রচলিত প্রবণতাকে যেমন স্বীকার করে নিয়েছিলেন জহীর রায়হান, তেমনি রঙীন ও সিনেমাস্কোপ ছবির ক্ষেত্রেও নতুন পথ দেখিয়েছিলেন। তবে, তাঁর মৌলিকত্ব প্রকাশিত 'কাঁচের দেয়াল'-এ,

যেখানে আলোক-সম্পাত, ক্যামেরার কারুকাজ, সম্পাদনা ও পরিচালনা, সকল ক্ষেত্রেই কনভেনশনের বিরোধিতা চমকে দেওয়ার মতো।

বাঙলা চলচ্চিত্র বাঙালির তাবৎ আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ শরিকও। তার প্রমাণ মরহুম রায়হানের 'জীবন থেকে নেয়া'। মুক্তিযুদ্ধের শামিল ছিলেন তিনি: 'স্টপ জেনোসাইড'; নতুন যুগের স্বপ্ন দেখেছেন: 'লেট দেয়ার বি লাইট'। আন্তর্জাতিক মানের আরও অনেক ছবির স্বপ্ন। পুরস্কারও পেয়েছেন। যেমন জীবিতকালে, তেমনি শহীদত্বের পরেও। তাঁর স্মরণে চলচ্চিত্র-প্রতিযোগিতা হয়। তিনি স্মরণীয় প্রতীক রূপে।

স্বাধীনতা-লাভের পর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ছবি ওঠে: 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী', 'ওঁরা এগারোজন', 'রক্তাক্ত বাঙলা' ইত্যাদি। পূর্ব-উল্লিখিত অন্যান্য ধারা-গুলিও আছে পাশাপাশি। কলকাতা থেকে গিয়ে রাজেন তরফদার তুলেছেন 'পালঙ্ক'। ঋত্বিক ঘটক করেছেন 'তিতাস একটি নদীর নাম'। আরও কয়েকজন উদ্যোগী হয়েছেন। বোম্বে থেকেও।

চার

পাকিস্তান এবং বাঙলাদেশ-চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যে-বৈচিত্র্য আছে, সে-বৈচিত্র্য তার চলচ্চিত্র-সমালোচনায় ছিল না। পেশাদার সমালোচকের বাঁধা-দেওয়া লেখনী। তবে, চলচ্চিত্র সংসদ-আন্দোলনের দৌলতে কয়েকজন ভালো ও উচ্চ মানসম্পন্ন সমালোচক আবির্ভূত হয়েছেন। এদের অন্যতম আলমগীর কবির: পদার্থবিদ্যা ও গণিতের ছাত্র, পেশায় সাংবাদিক, শিল্প ও নন্দনতত্ত্বে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, রবিবাসরীয় 'হলিডে' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক, চল-চ্চিত্রতাত্ত্বিক এবং সম্প্রতি পরিচালক। তাঁর লেখা 'দ্য সিনেমা ইন পাকিস্তান'—পাকিস্তান ও বাঙলাদেশের চলচ্চিত্র-বিষয়ে প্রথম (এবং হয়তো এখনও পর্যন্ত, একমাত্র) গ্রন্থ। এশীয় চলচ্চিত্রে আগ্রহী আন্তর্জাতিক পাঠকসমাজকে স্মরণে রেখে ইংরেজিতে লেখা। রচনাকাল ১৯৬৯।

নাতিবৃহৎ গ্রন্থটির দ্বাদশ অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে চলচ্চিত্রের শিল্পত্ব ও সামাজিকতা প্রসঙ্গে সাধারণ আলোচনা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভারত-পাক উপ-মহাদেশের চলচ্চিত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ১৮৯৬—১৯৪৬। বিভাজন-পরবর্তী ইতিহাসের চরিত্র বুঝতে এই পটভূমিকাটির প্রয়োজন; যদিও বাঙলা ছবির চারিত্র্য অনুধাবনের জন্যে কলকাতা স্টুডিওর পর্যবেক্ষণ বিশদ হওয়া দরকার

ছিল। তবে, বোম্বাই চলচ্চিত্রে মুসলমান শিল্পী ও কুশলীর ভিড় এবং কলকাতায় তার অভাব—এই আশ্চর্য বিষয়টির বিশ্লেষণের চেষ্টা প্রশংসনীয়।

সমভাবে প্রশংসনীয় বাঙালি মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা ও তার কার্যকারণ বিচার। তাঁর মতে, এগুলি হল : রাজনীতিক জ্ঞানের ঘাটতি, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে একাত্মবোধের অভাব, এবং কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় ভীত শিক্ষিত হিন্দুদের বিরোধিতা। এছাড়া, স্বসমাজের ট্যাবু এবং প্রয়োগশিল্পে বহুকালীন অনভ্যাস তো ছিলই। এরই জন্যে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এমন একটি 'আশ্রয়' যেখানে আত্মপ্রকাশ অবাধ হতে পারে। অর্থাৎ For a talented Bengali Moslem the antagonistic forces were far too many. এবং তাই The creation of Pakistan need not have had any religious justification whatsoever. For the Bengali Moslem "Pakistan" became a symbol of survival (পৃ ২৯-৩০)। লেখক ইতিহাসের অনেক উপাদান ব্যবহার করেন নি (যেমন, মুসলিম লীগের ভূমিকা), তবু তাঁর সমাজতাত্ত্বিক বিচার নতুন করে ভাবায় অনেক কিছু।

এই দ্বিতীয় এবং পরবর্তী তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের চলচ্চিত্রের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে দুই পর্যায়ে। আর্থার নাইট বা লুই জ্যাকব বা র‍্যাচেল লো যেমন লেখেন, ঠিক সেই জাতীয় পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়, বরং গতি ও প্রবণতার সমীক্ষা, গুণাগুণ বিচার ; মুখবন্ধে ওবায়েদ উল হক যাকে বলেছেন, এবং যথার্থই—a critical and analytical study of the trends and characteristics of the industry। এই রীতির যেমন একটি বিশেষ সুবিধা আছে, তেমনি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসেরও এক স্বতন্ত্র প্রয়োজন ও মূল্য আছে। এই অংশটিকে—বস্তুত এটিই মূল প্রতিপাদ্য—লেখক সংক্ষেপিত না করলেই পারতেন। তাঁর মন্তব্যগুলি তাহলে স্থিতিস্থাপক হতে পারত।

আসলে, ইতিবৃত্ত অপেক্ষা তার সমীক্ষাতেই লেখকের আগ্রহ অধিকতর। তার স্বাক্ষর পরবর্তী 'ভবিষ্যতের প্রতি অবলোকন' অধ্যায়েই পাওয়া যায়—যেখানে তিনি ভালো ছবির রূপরেখা, শিল্প ও ব্যবসায়ের সমন্বয়ীকরণের পদ্ধতি আঁকার চেষ্টা করেছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে পাকিস্তানী তথ্যচিত্রের ধারাবিবরণী (এখানে আয়ুবশাহী শাসনের বিরুদ্ধে অনীহা স্পষ্ট), এবং পঞ্চম অধ্যায় তারই ভূমিকা—তথ্যচিত্রের তত্ত্বকথা। তত্ত্বের প্রতি এই ঝোঁক শেষ অধ্যায়গুলিতে

প্রদর্শনীব্যবস্থা, প্রমোদকর, সেনসর-প্রথা ইত্যাদি প্রসঙ্গের আলোচনায়ও লক্ষণীয়। সে-তুলনায় দর্শক-মনস্তত্ত্বের ও চলচ্চিত্র-বোর্ডের আলোচনা দ্রুততর। বলা বাহুল্য, জনাব কবির বিস্তারিত চলচ্চিত্র-সাংবাদিকতা ও সমালোচনায়। কারণ, এই-ই তাঁর স্বভূমি।

হয়তো স্বদেশে—যেখানে ভালো সমালোচনা অঙ্গুলিমেয় এবং বোদ্ধা-দর্শক কোটিকে গুটিক বলে তিনি মনে করেন—তার জন্যে এসব কথা বলার দরকার ছিল ও আছে। বিশেষত, যখন এ-ধরনের বই এই প্রথম বেরোল। তবু মনে হয়, তথ্য ও তত্ত্বকে আলাদা করে নিয়ে দুটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখলেই ভালো হত। আবার এও মনে হয়, তাহলে হয়তো বই বেরোতই না আদৌ! তার চেয়ে যতটুকু পেয়েছি, সে-ই পরম পাওয়া।

পাঁচ

পাকিস্তানের তরুণ লেখক জিসান হোসেন 'দ্য সিনেমা ইন পাকিস্তান'-এর একটি বিস্তৃত সমালোচনা লিখেছিলেন। এটির বাঙলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় পূর্ব-পাকিস্তান (অধুনা বাঙলাদেশ) চলচ্চিত্র সংসদের মুখপত্র 'ধ্রুপদী'র দ্বিতীয় সংকলনে (১৯৭০-৭১)। অনুবাদক ইয়াসিন আমিন। সমালোচকের অনেক বক্তব্যে আমার সমর্থন আছে, কয়েকটিতে নেই। কিন্তু সেটা বড় কথা নয় এবং সেজন্যেও নয়। ওদেশের চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমার জ্ঞান তো পড়াশোনার এবং দূর থেকে অনুভবের মাধ্যমে। জনাব হোসেন তাকে দেখেছেন কাছ থেকে, অভ্যন্তরে বসে, হৃদয় দিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করেছেন। সুতরাং তাঁর অভিমত অধিকতর মূল্যবান, প্রণিধানযোগ্য, উদ্ধৃতিযোগ্য। সবটা তুলে দিতে পারলে খুশী হতাম ; তবু সংকলিত অংশেই লেখকের সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় আছে। বাঙলা-দেশ চলচ্চিত্র সংসদের কার্যনির্বাহক-সম্পাদক মহম্মদ খসরুর সৌজন্যে এই উদ্ধৃতি সম্ভব হল। জনাব হোসেন বলেছেন :

"কিছুদিন আগে অবধি পাকিস্তানের চলচ্চিত্রের ওপর কোন সিরিয়াস পুস্তক রচনার প্রচেষ্টাকে হাস্যকরভাবে অবজ্ঞা করা হোতো। সাপ্তাহিক 'হলিডে' পত্রিকায় আলমগীর কবিরের একটা লাইন দশেকের আলোচনা পড়েই পাঠক মনে করতেন, পাকিস্তানের চলচ্চিত্রের জন্যে এটাই যথেষ্ট। কিনতু এখন আলমগীর কবিরের 'দি সিনেমা ইন পাকিস্তান' প্রকাশিত হওয়ার পর এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এক্ষেত্রে এই পুস্তক পাকিস্তানের চলচ্চিত্রের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য

পদক্ষেপ এবং এ প্রচেষ্টাকে একটি 'Sociological Study, একটি সাংবাদিক তদন্ত এবং সমালোচকের নিধার' বলা যায়। সামগ্রিক দিক বিচার করলে এই পুস্তক সত্যিই পাকিস্তানের চলচ্চিত্রের গৌরবের বস্তু।

"লেখক বইয়ের ভূমিকায় এটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে এই .বই এশিয়ার চলচ্চিত্রে উৎসাহী আন্তর্জাতিক পাঠকদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে লিখিত। বইটির জন্য এটা যেমন ভালো, তেমনি আবার দুর্বলতাও বটে। পাকিস্তানের চলচ্চিত্রের বিষয়ে একজন অনভিজ্ঞ পাঠককে এই বই অবশ্যই যথেষ্ট সাহায্য করবে, যা এ বইএর অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সামাজিক জীবনে গণ-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চলচ্চিত্রের যে ভূমিকা, সেই দিক দিয়ে বিচার করলে বইটির দুর্বলতা প্রকাশ পায়। ১৯৪ পৃষ্ঠার এই বইতে এখানকার চলচ্চিত্রের ভবিষ্যতের মত জটিল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে মাত্র ৮ পৃষ্ঠায় এবং তাতেও গভীর চিন্তার ছাপ কম। চলচ্চিত্র ইনস্টিটিউট ও সিনেমার আন্দোলনের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। কিনতু তাতে জরাক্রান্ত পাকিস্তানী চলচ্চিত্রের সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে কি? চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার ওপর কোনই আলোকপাত করা হয় নি। এছাড়াও বর্তমান সমালোচক আরও খুশী হতেন যদি বইতে বিদেশের বিভিন্ন চলচ্চিত্র ইনস্টিটিউট-এর ভূমিকা ও তা থেকে পাকিস্তানের শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে একটা অধ্যায় থাকতো।

"বইটির একটি অন্যতম উল্লেখ্য অধ্যায় 'চলচ্চিত্র সমালোচনা ও চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা'। যে বিষয় এই দীর্ঘ অধ্যায়ভুক্ত, তা গভীর নিবেশ সহকারে সমালোচক ও পাঠককে চিন্তার আহ্বান জানায়। যাই হোক, অনেক জায়গায় এ অধ্যায়ের ভাষা সাংবাদিকতা বিষয়ক বলে মনে হয়েছে। এদিকে একটু সজাগ দৃষ্টি রাখলে লেখক ভালো করতেন। এখানকার চলচ্চিত্র-বন্ধ্যাত্বের জন্যই তথা-কথিত শিল্পানুরাগী সমালোচক সৃষ্টি হয়েছে, সে বিষয় এখানে আলোচিত হলে ভালো হতো। মহৎশিল্পের জন্যে চাই মহৎ সমালোচক।

" 'বিনোদন ও কর' অধ্যায় বাস্তবিকই তথ্যপূর্ণ। কিনতু বিশ্বের অন্যান্য উন্নতিশীল দেশসমূহের সঙ্গে পাকিস্তানের এ বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হতো। এছাড়া এই অধ্যায়ের বিশ্লেষণের গভীরতা নেই। বিশ্বে সর্বোচ্চ হারে প্রমোদকর গ্রহণ করা পাকিস্তানে হয় বলে লেখক

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং এটা কমানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু এর জন্য কোন্ বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, সে সম্পর্কে কিছুই নির্দেশ দেন নি। 'প্রদর্শন ও সেনসরশীপ' অধ্যায়ে কতকগুলি প্রয়োজনীয় ও বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এগুলির অচিরাৎ বাস্তবায়ন সবারই কাম্য।

"আশ্চর্যের বিষয়, বইতে চলচ্চিত্র প্রযোজনা বা চলচ্চিত্র অর্থনীতির ওপর কোন অধ্যায় নেই। একজন পাকিস্তানী প্রযোজকের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের প্রযোজকের তফাৎ কতটুকু ও বিশ্বের উন্নত দেশগুলির চলচ্চিত্র-অর্থবিনিয়োগব্যবস্থা থেকে পাকিস্তানের কী শিক্ষণীয়, সে সম্পর্কে লেখক আলোকপাত করলে ভালো হতো। এছাড়া, প্রযোজক-পরিচালক সম্পর্কের ওপর উন্নত-দেশসমূহের সঙ্গে পাকিস্তানের তুলনামূলক আলোচনাতেই গড়ে উঠতে পারতো বইএর আরও একটি প্রয়োজনীয় অধ্যায়।

"আলোচ্য পুস্তকের বিষয়বস্তু সুন্দরভাবে সাজানো হয় নি। অধ্যায়সমূহ যেন ইতস্ততভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে কোন গভীর চিন্তার ছাপ পাওয়া যায় না। অবশ্যই এটি একটি ত্রুটি। বইটিকে সুন্দরভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেত: ইতিহাস, সমস্যা ও প্রত্যাশা এবং বিষয়বস্তুগুলি বিক্ষিপ্ত না রেখে উপরোক্ত অধ্যায়ে যেটা যেখানে প্রয়োজন সাজালে লেখক ভালো করতেন।

"আলোচ্য বইটির প্রচ্ছদ খুবই বাজে, রাস্তার চার আনা দামের সিনেমা-পত্রিকার সঙ্গে তুলনীয়। মেকআপ ও মুদ্রণেও অপেশাদারী ছাপ বর্তমান। ঢাকাতে এখন নিশ্চয়ই এর চেয়ে ভালো ছাপা হচ্ছে।

"আমার বিশ্বাস, এই বইটির আগামী সংস্করণ যদি বের হয়, তবে শুধু আন্তর্জাতিক পাঠকদের উদ্দেশ্যে না হয়ে দেশীয় পাঠকদের কথা স্মরণ ক'রে যে-সমস্ত পরিবর্তনের প্রস্তাব উপরে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো সম্বন্ধে দৃষ্টিপাত করা হবে। জনাব আলমগীর কবির যদি তা করতে সমর্থ হন, তবে 'দি সিনেমা ইন পাকিস্তান' যেকোন পাঠাগারের অমূল্য 'রেফারেন্‌স্ মেটিরিয়াল' হিসেবে স্থান পাবে।"

স্মরণীয় উপন্যাস

অসীম রায়

শুধু ভাষার প্রখর সৌন্দর্যে জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস আকর্ষণীয় নয় কিংবা কবির খেলারূপেই (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকচর্চা বা গয়টের সংগ্রহশালা) তা চিহ্নিত হবে না জীবনানন্দের ভক্তবৃন্দের কাছে; আমরা ভালো উপন্যাস বলতে যা বুঝি যেমন প্রবল সমাজ ও আত্মজিজ্ঞাসা সমন্বিত এক কালের রূপক সে দাবি অনেকখানি মেটায় 'মাল্যবান'*।

দুটি নরনারীর মনের গহনে ডুব দিতে গিয়ে সমাজ কোথায়? এ গ্রন্থ কি একেবারে সেই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস নয় যেখানে অস্পষ্ট চেতন ক্রমবর্ধমান অবচেতনে চাপা পড়ে? এ সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তরের অবকাশ আছে এ উপন্যাস পাঠে। সমাজ সব সময় ঝাণ্ডা উঁচিয়ে আসে না; আসে, যেমন এসেছে, দুটি 'অভালোবাসিত' মানুষের অন্তর্লোক উদ্‌ঘাটনে, কিংবা ঠিক দুটি নয় কেবল একটি মানুষেরই অন্তর্লোক উদ্‌ঘাটনে। যে লোকটাকে তার স্ত্রী হাঁকিয়ে দেয় তার ঘর থেকে, আরশোলা ইঁদুর আর আলোবাতাসহীন অন্ধকারে নিঃসঙ্গ শয্যায় শীতের রাত যে কাটায় মাসের পর মাস, স্ত্রীর হুকুমে ওপরতলার স্নানঘরে যার প্রবেশ নিষেধ সেই বটমলি বিগল্যাণ্ড ব্রাদার্সের কেরানীবাবুটি গোলদিঘির চারপাশে চুরুটমুখে পায়চারি করতে করতে স্বপ্ন দেখে। এই ছকটা আমাদের খুব চেনা ছক—আমাদের নিম্নমধ্যবিত্ত মূল্যবোধের ছক। এই ছক থেকে প্যানপেনে ভালোবাসার উপন্যাস অনেক অনেক সৃষ্টি হয়ে মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে একটুকু ছোঁয়া লাগে একটুকু কথা শোনার পেছনে। এবং এই বেদনাবোধ খুব কোনো বড় জিনিস প্রতিষ্ঠায় সর্বদাই পরাঙ্মুখ। মাঝে মাঝে অবশ্য চেষ্টা চলে আধুনিকতার যান্ত্রিক অনুসরণে কমবয়সী মেয়েদের গায়ে হাত বোলানো ছলবলানিতে, স্মার্ট কথাবার্তায়; কিন্তু সেই নিম্নমধ্যবিত্ত মূল্যবোধের নেংটি ইঁদুর সবসময় নাচে; প্রায় সবসময় এই সৌখিন দুঃখবোধ যেন ঝপ করে কিছু টাকা কিংবা ফেরেপবাজ যশ হাতিয়ে নিয়ে এই অন্ধকার অস্তিত্ব ল্যাং মেরে ঠেলে ফেলে তর তর করে ওপরে উঠে যেতে চায়। জীবনানন্দের নায়ক মাল্যবানের স্বপ্ন কিন্তু এই মূল্যবোধ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। "একটা কথা ঠিক,

---

* মাল্যবান। জীবনানন্দ দাশ। নিউস্ক্রিপট, কলকাতা। দশ টাকা।

মাটির নীচে গেঁড় আর কন্দ খাওয়া শূয়োরের মতো (আপার গ্রেডের) অফিশ-গিরিই তার সব নয় ; এক জোড়া রেশমী স্টকিঙ, বার্ণিশকরা নিউকাট, তসরের কোট, পরিপাটি টেরি, সিগারেটকেস ও ফুটবল গ্রাউণ্ডের বেঞ্চি দিয়ে নিজেকে চোখঠার দিতে যে ভালবাসে না। এই সবের চেয়ে সে আলাদা।" আর এই আলাদা অস্তিত্বের বোঝা, এই প্রবল দ্বৈতসত্তার চাপ লোকটা বয়ে নিয়ে চলে তিতো না হয়ে, কোনো লোভের বশবর্তী না হয়ে, সে যে অন্য লোকজন থেকে বেশি জানে বোঝে একথাটা জানিয়ে না দিয়ে, মৃদুভাবে সকলের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে আপোষ করে কিন্তু নিজের কাছে প্রায় সম্পূর্ণ অপরাজিত থেকে।

আর পলা, নায়কের স্ত্রী, এক শীতল হিংস্রতার চমৎকার প্রতীক। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে গ্রীক নাটক থেকে আজ পর্যন্ত ঐশ্বর্যশালিনী হৃদয়হীনার রূপ আমরা বারে বারে দেখেছি, কিন্তু বাঙালি মেজাজের ম্যাট্রিক্সে তা ক্বচিৎ স্বীকৃতি পেয়েছে। সুন্দরী পলা (উৎপলা) স্বামী সম্পর্কে কোনোরকম বোধশক্তির অভাবে মাল্যবানের চমৎকার বৈপরীত্যে উপস্থিত। এ বৈপরীত্যে ঘটনা ও সংলাপের প্রবল তীক্ষ্ণতা লক্ষণীয়।

দুশো পাতা ধরে জীবনানন্দ অপ্রেমের গরল মন্থন করে যে সুধা তুলেছেন তার স্বাদ অনাস্বাদিত। স্বপ্নের সিকোয়েন্সে এই তীব্র স্বামী-স্ত্রীর নাটক ফেনশীর্ষে উঠে আমাদের মনে আছড়ে পড়ে। স্বপ্ন-বাস্তবের, চেতন-অবচেতনের এমন গল্পাংশে সামগ্রিকভাবে গাঁথা রূপ ইয়োরোপীয় উপন্যাস, যেমন টমাস মানের, স্মরণে আনে (প্রথম যৌবনের প্রেয়সী লোটের আবির্ভাব বৃদ্ধ গয়টের ফিটন গাড়িতে)। সমস্ত অপ্রেম, হৃদয়হীনতা, শীতলতা, দাঁতের বাড়ি, অপমান (সংলাপে স্বামী বারে বারেই কুমরো, বলির কুমড়ো, শালগ্রাম—"আ, গেল যা! বসলে! রাত দুপুরে ন্যাকড়া করতে এল গায়েন। হাত পা পেটে সেঁধিয়ে কম্বল জড়িয়ে এ কোন ঢঙের বলির কুমরো সেজে বসেছে দেখ। ওমা!—ওমা! —ওমা! বেরোও! বেরোও বলছি।") এ সমস্ত অপমান, এমনকি মেজো শালা ও তার পরিবারের সুবিধার্থে প্রায় সাত মাস মেসে নিঃসঙ্গ জীবন, সমস্ত ছাপিয়ে এক তীব্র ভালোবাসার সাধ, রঙে রসে ভরপুর এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্বের সঙ্গে যে জীবনানন্দ মালাবদল করেছেন তা চলে এল। প্রায় অসম্ভব সম্ভব হতে হতে স্বপ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে খাবার ঘরে এঁটো হাতে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত স্বামীর অস্তিত্বে, অপরূপ গরল-অমৃতের অবিভাজ্য মাখামাখি বর্ণনায়।

এই বোধের গভীরতার জন্যে আমরা বারে বারে এ গ্রন্থকে স্বাগত জানাই। এ গভীরতা আমাদের বর্তমান খ্যাতিমান বাঙলা ঔপন্যাসিকদের কাজের দিকে তাকানো বিরক্ত বিষণ্ণ অবসাদগ্রস্ত চোখ ফেরায় অন্যদিকে ; উপন্যাস সম্পর্কে নতুন প্রত্যাশা জাগায় পাঠকের মনে। যে পাঠক সাম্প্রতিক কালের নানা দ্বন্দ্বে উদ্বেল, পিকাসোর ছবি দেখে যে আনন্দ পায়, গাঙ্গুবাই হাঙ্গলে যার কান তৃপ্ত, যে দেশী-বিদেশী উচ্চমান ফিল্মে উৎসাহী, যে আধুনিক বাঙলা কবিতা বলতে বোঝে না কুমুদরঞ্জন মল্লিক বা কালিদাস রায়ের কবিতা, রাজনীতির বিচারে আমাদের দেশের দলমত নির্বিশেষে দুর্যোগের ঘনায়মান রাত্রিতে যে অভিভূত, যার কাছে আধুনিকতাচর্চা একটা পোজ নয় কোনো নবীন চটক নয় বস্তুত আমাদের আত্মানুষ্কানেরই এক বিশেষ রূপ—তার কাছে বাঙলা উপন্যাস সম্পর্কে প্রত্যাশাবোধের অভাব প্রবল পীড়াদায়ক। সেই অভাববোধের পরিপ্রেক্ষিতে চালু খ্যাতিমান ঔপন্যাসিকরা নিঃশেষিত। এ ক্ষেত্রে বোধহয় কবিদের প্রয়োজন আছে, চারপাশের ভাঙচুরকে ধরে একটাই মালা গাঁথবার প্রয়াসে।

এ প্রসঙ্গে সচরাচর একটা ভুল হওয়া স্বাভাবিক। আধুনিকতার বহিরঙ্গ যখন প্রকট, যখন উপন্যাসের নর ও নারী নর ও নারী না হয়ে বয়স্ক বালক বালিকা—তখন আবার মিড-ভিক্টোরীয়ো শালীনতাবোধের ভূত ঘাড়ে চাপে। আমাদের কিছু শ্রদ্ধেয় লেখকের এ ধরনের ভুল (যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে) লক্ষণীয়। জীবনানন্দের আধুনিকতা এদিক থেকে স্বাগত, তিনি অন্তত একজন যন্ত্রণাজর্জর নর সৃষ্টি করেছেন। উৎপলা বোধহয় কিছুটা অস্পষ্ট তার চমৎকার বৈপরীত্য সত্ত্বেও।

ভাষা প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, টিপিকাল কাব্যিক ভাষা থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা লক্ষণীয়। ভাষার টানে ভাষার আদিখ্যেতা যে নেই তা নয়, কিন্তু সমস্তটা বিচার করলে এ ঘাটতি পুরে যায়। "মাঝে মাঝে মনটা ঝুমুর দিয়ে ওঠে।" যেখানে স্মৃতিচারণ, অবিভক্ত পূর্ববাঙলার কুয়াশাবৃত ধানক্ষেত পাখি গাছপালা, সেখানে ভাষার জোর যতখানি তার থেকে অনেক বেশি যখন লেখক নিরক্ত নিরেস বর্তমানের কথা বলেন। প্রায় দুশো পাতা ধরে লোকটা "দুদণ্ড শান্তি"র জন্যে যায় পলার কাছে—যে একেবারে বনলতা সেনের উল্টো চরিত্র। "এই সব, আরো অনেক সব বলতে চাইল মাল্যবান ; কিন্তু বলাটা তার না হল সাহিত্যের ভাষা না হল নিজেদের মুখের ভাষা ; মানুষের জল রক্ত অশ্রু ঘামের

মধুসুধার ভাষা তো এরকম নয়। এবারে সে না সাজিয়ে গুছিয়ে একেবারে রক্ত ঘাম সুধা স্বাভাবিক প্রাণের ভাষায় কথা বলবে। কিছুক্ষণ দেঁতো কথা ছেঁদো কথার পর সত্যিই যখন বারোয়ারী বাজার বাসরঘরের কথা মুখে এল তার, নাক ডাকার শব্দ শুনে মাল্যবান টের পেল উৎপলাকে নিয়ে তার চলবে না কিছুতেই, তবুও চালাতে হবে মৃত্যু পর্যন্তই। বাংলাদেশের শতকরা নব্বই জন স্বামী-স্ত্রীর জীবনেই এই নিষ্ফলতা, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই স্বামী-স্ত্রীরাই সেটা ঠিক মাল্যবানের মতো উপলব্ধি করতে পারে না; যে সব স্ত্রী-স্বামীরা সেটা করে, একটা ভাঙা গেলাসের কাচগুলোকে জড়ো করে জোড়াতাড়া দিয়ে প্রত্যেকবারই জল খেতে হয় তাদের : নারী-পুরুষের সম্বন্ধ স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার বিয়ে জিনিসটা শ্রেষ্ঠ কারিগরের কাচের গেলাসের মতোই সহজ ও কঠিন; ভাঙবেই ; জল খেতে হবেই ; একটার বেশি গেলাস কাউকে দেওয়া হবে না ; সে যদি তা জোর করে বা চুরি করে নেয় সেটা অসামাজিকতা হল। দর্শনী বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামিয়ে বিয়ে রদ, বিয়ে খণ্ডন ক'রে আবার বিয়ে, যদৃচ্ছা বিয়ে করবার কথা পেড়ে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু টাকাওয়ালা জাতিগুলোর টাকাওয়ালা মানুষদের সম্পর্কে এ-সব সমাধানের কিছু কিছু মানে থাকলেও বেশি কোনো মানে নেই, মাল্যবানদের মতো গরীবজাতির গরীবদের পক্ষে কোনো মানেই নেই কেবলি বিয়ে-খণ্ডন ও যদৃচ্ছা বিয়ের। গরীব জাতিদের সমাজগুলো মজস্থালি সরকারের মতো হেসে পেট ফাটিয়েই ম'রে যাবে কেবলি বিয়ে খসিয়ে নতুন বিয়ে-সম্পর্কের ভেতর মানুষকে ঢুকে পড়তে দেখলে, কিংবা বিবাহ সম্পর্ক তুলে দিয়ে মেয়েমানুষের স্বাধীন সেয়ানা মেলামেশায় রাষ্ট্রকে হিতার্থী বিজ্ঞানধর্মী পরিচালক হিসেবে ঘুরে বেড়াতে দেখলে, সেয়ানা স্বাধীন মেলামেশার অন্ত খুঁজে পাবে কি বিজ্ঞান—আকাশের তারা পাতালের বালি যদিও গুণে ঠিক করেছে বিজ্ঞান।"

এ ঠিক ভাষা ভাষা খেলা নয়। আমাদের আত্মানুসন্ধানের ডকুমেণ্ট অর্থাৎ উপন্যাসেরই ভাষা। ভাষা এবং বিষয়ে অনেক সাম্প্রতিক খ্যাতিমান লেখকের এই আত্মানুসন্ধানের বড়ই অভাব। পাঠককে ভজানো বা বিনোদনই যখন একমাত্র লক্ষ্য তখন না পড়লেও তা চলতে পারে; বম্বে ফিল্মই ভালো। জীবনানন্দের উপন্যাস পড়তে পড়তে এরকম ভাবনা একেবারেই মাথায় আসে না। তিনি যদি তাঁর কবিতা না লিখেও এই একখানি উপন্যাসই আমাদের উপহার দিতেন তাহলেও এ উপন্যাসের স্মরণীয়তা সামান্য চিড় খেত না।

অমিলের মধ্যে মিল

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখে শুনে মনে হয় বাঙলা উপন্যাস যেন আজও তিন কেতার : এক—বেস্ট সেলার, দুই—হৃদয়বান রচনা, তিন—প্রকৃত উপন্যাস। একের দুই বা তিন হতে বাধা নেই, তিনের বাধা নেই দুই বা এক হতে—কিন্তু কেন জানি না 'ছকু' পাঠক ও 'ছকু' লেখকদের সহযোগে, ঐ মিলন এখানে বিরল। বটতলার বই আর বাজারমাৎ কেতাবের মধ্যে অবশ্যই তফাৎ আছে। তাদের মধ্যে যতখানি আছে, ঠিক ততখানিই তফাৎ আছে বাজারমাৎ কেতাব আর প্রকৃত উপন্যাসের মধ্যে। সব দেশেরই খবর এ-ই, বাঙলাবাজারও তার ব্যতিক্রম নয়। ঐসব উপন্যাসের নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, ইচ্ছাও নয়। বরঞ্চ মনে করি, একান্ত গড-শ্রেণীর পাঠকের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টায় বেস্ট সেলার্স-লিখিয়েরা যে জোরাল সহজাত-আবেদনকে পুঁজি করে আসরে নামেন, তার সামাজিক মূল্য অস্বীকার করা চলে না। বিমল মিত্র বা শঙ্কর সমাজ-প্রগতির পক্ষে নন, মোটা দাগের বিচারে এ কথা বলা যাবে না। কিন্তু এটাই সব কথা নয়। আমাদের অপেক্ষায় থাকতে হয় সেই সব উপন্যাসের পথ চেয়ে, যেখানে ঔপন্যাসিক মাত্র দরদী আখ্যার জন্যই আকুল নন, হয়তো আদপেই নন; যেখানে উপন্যাস আপাতের আয়না নয়, গভীরের প্রতিভূ। সেখানে ঔপন্যাসিক সত্যিই জীবনের টীকাভাষ্য রচনা করেন—ধারাবিবরণী নয়। খুবই লম্বা দাবি। কাজেই এও স্বাভাবিক, এরকম দাবি মাফিক উপন্যাস বছরে আধ ডজন বেরোয় না।

গতবছর এবং এ বছর, দুখানি উপন্যাস * আমার হাতে এসেছে, বলতে পারি, সেগুলি ঔপন্যাসিকের উপন্যাস। শিল্পকর্মের পরিচয় রয়েছে তাদের স্বসম্ভূত।

* বাবুঘাটের কুমারী মাছ। লোকনাথ ভট্টাচার্য। মডেল পাবলিশিং, কলকাতা। ন-টাকা
* যযাতি। দেবেশ রায়। প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা। সাত টাকা

তারা কোনো অদৃশ্য মুদ্রাযন্ত্রের বিদ্যুদ্‌গতির সঙ্গে ক্লান্তিকর প্রতিযোগিতার চিহ্নে জর্জর রচনা নয়। এমন উপন্যাস আমার অভিজ্ঞতার বাইরেও দু-একটি হয়তো থাকতে পারে—কিন্তু আমি যাদের পেয়েছি, পড়েছি তাদের কথাই বলছি।

দুই

লোকনাথ ভট্টাচার্যের চতুর্থ উপন্যাস 'বাবুঘাটের কুমারী মাছ'। এই লেখকের 'ভোর' এবং 'যত দ্বার তত অরণ্য' এই দুখানি উপন্যাসের সঙ্গে আমার পরিচয় গাঢ়। ভিন্ন পত্রিকায় এই বই দুটি নিয়ে আলোচনা করার আনন্দ আমি একদা ভোগ করেছি। লোকনাথ আমার প্রিয়লেখক তখন থেকেই। অস্তিত্বের দুরবগাহ রহস্যকে অনুধাবনের ব্যগ্রতায় উপন্যাস দুটি ছিল বিশিষ্ট। অনন্বিত ব্যক্তির যন্ত্রণার বা উদ্বেগের মুখোমুখি হবার সততা এ লেখকের ছিল। মনে আছে ব্যক্তির একান্ত স্বাধিকারকে মর্যাদাদানের প্রয়াসে দুটি উপন্যাসেরই বিষয়, বিন্যাস, উপসংহার এবং তাৎপর্যে এমন এক উচ্চ মননের দীপ্তি নজরে পড়েছিল, যা চলতি বাজারী সাহিত্যে একেবারেই দুর্লভ। 'বাবুঘাটের কুমারী মাছ' লেখকের আপাতত সাম্প্রতিকতম উপন্যাস—তাঁর সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ সৃষ্টি! এ উপন্যাসের আছে অভিভূত করে ফেলার প্রচণ্ড ক্ষমতা—এক অন্যতর উপলব্ধির জগতে নিয়ে যাবার। উপন্যাসও যে কবিতার মতো মান্ত্র ক্ষমতায় বিশিষ্ট হতে পারে, এই আলোচ্য উপন্যাস তার প্রমাণ। কবিতার সঙ্গে উপমাটি হঠাৎ দিয়ে ফেলি নি। 'বাবুঘাটের কুমারী মাছ'-এর ভাষায় আছে কবিতার মতোই অব্যর্থতা, সংকেতবহ হবার শক্তি। প্রথম পরিচ্ছেদটি পড়তে পড়তেই সেই কবিতার গোপন টান, চোরা বানের মতো আপনাকে আকর্ষণ করবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আপনার চেনা বাস্তবতার টুকরো টুকরো চরভূমি থেকে, তুলবে আপনাকে এমন একটা জায়গায়, যেখানে মনে হবে খবরের কাগজে দেখা, বেতারে শোনা, এই ছাঁচে ঢালাই করা বাস্তবতা নেই। অস্বস্তি হবে আপনার। কিন্তু ধীরে ধীরে আপনার মনে গাঢ় হয়ে উঠবে আর-এক ভয়াবহ বাস্তব প্রতীতি, যা আপনি আমি রাম শ্যাম যদু (তারিণী) সবাই বহন করে চলেছি। সে বাস্তবের দায়ভাগ আমাদের—তার মীমাংসাও আমাদেরই করণীয়। অথচ সে ভাষার গূঢ় শক্তি সঞ্চিত হয়েছে কথ্য ভাষার আলাপনী রীতির প্রাণবান স্রোত থেকে। ভাষার এই গতিবেগ, এই তেজ ও ধার যেন অভিজ্ঞতার দানে গড়ে ওঠা এক অপরূপ সামগ্রী।

তখনই মনে না হয়ে পারে না 'বাবুঘাটের কুমারী মাছ' আন্তর্জাতিক মানের যন্ত্রণাদিগ্ধ উপন্যাস। যে-সব মানুষ ঐ অপরূপ বন্দীশালায় আবদ্ধ হয়ে আছে সে-সব মানুষ ও বন্দীশালার চেহারার অবাস্তবতা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়—অন্যচোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সভ্যতার একটা বিশেষ প্যাটার্ন, ব্যক্তির একটা ভয়াল সংকট। যে-সভ্যতা মানুষকে দিয়েছে বহুবিধ উপকরণের বাহুল্য, দিয়েছে উদর এবং শিশ্নের অবারিত উপাদান, অথচ যা কেড়ে নিয়েছে ব্যক্তির বা মানুষের স্বাধীন চরিতার্থতার সকল আবেগ, এ উপন্যাসের বন্দীশিবির তারই রূপক। এত প্রাচুর্য—affluence, এত উপকরণ, যা হয়তো status symbol-এরই রূপক-প্রতিবিম্ব, যার সঙ্গে আগেকার মানুষের মতো প্রাণীণ সম্পর্ক অনেকদিন হল হারিয়ে গেছে—তারই মাঝখানে একদল মানহারা মানুষ এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। নাম অথবা পোশাক দুইই তো ব্যক্তিত্ব-জ্ঞাপক। প্রারম্ভেই স্বনাম নিয়ে কথকের যে বিভ্রম, তা আসলে ক্ষীণাবশেষ বিস্মৃত ব্যক্তিত্বের চকিত স্ফুলিঙ্গ। নামের মতোই পোশাক ব্যক্তিরই নির্বাচন, ব্যক্তিরই রচনা। নগ্নতার মতো নিরভিজ্ঞান আর কিছু নেই। এখানে আরোপিত নগ্নতা যেন সেই ব্যক্তিত্ব-বিলোপী ব্যবস্থার ফল। যে-নগ্নতায় ব্যক্তির স্ব-ইচ্ছার ছন্দিত লাবণ্যময় প্রকাশ—এ তা নয়। যা আবেগ ও বাসনার উত্তাপে হতে পারত একান্তই ব্যক্তিগত, তা এই বিকৃত ব্যবস্থায় যান্ত্রিক, নিষ্প্রাণ, কৃত্রিম। এ উপন্যাসের নায়ক সেই বিকৃত ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাবে—পাবে কি ? কী ভাবে পাবে ?

'বাবুঘাটের কুমারী মাছ'-এর মানুষগুলি অতীতের কথা কালেভদ্রে ভাবে, ভবিষ্যতের কথা ভাবেই না। আশুপ্রাপ্য বর্তমানের সুলভ পর্দায় তারা তাদের সব চিন্তাকে ঢাকা দিতে চায়। এ সামূহিক রোগলক্ষণকে আধুনিক ভাষায় কী বলে—'ভবিষ্যতে অবিশ্বাস' বা বর্তমানের সঙ্গে অতিমিতালি এ যুগের ভাষায়—present-time orientation। যা-ই বলা হোক না কেন, এই নিরাশ্বাস বিবর্ণ স্থূল পৌনঃপুনিকতায় এরা আজ পরিণত হয়েছে একটি চমৎকার অহৃদয় অস্তিত্বে। অতীত এবং ভবিষ্যৎ, মূলের প্রশ্রয়, এবং ফুলের আশ্বাস এই দুইই হারিয়ে গেছে বলে এ উপন্যাসে প্রথম বা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ বলে কোনো কথা নেই। প্রথম পরিচ্ছেদটি প্রকৃত পক্ষে শেষ পরিচ্ছেদও হতে পারে। তারিখ এখানে নিরর্থক। ঘটনার বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যেই তারিখ স্মরণধৃত হতে পারে। ঘটনা যেখানে প্রত্যাশিত পুনরাবৃত্তিতে বর্ণহীন, তারিখেরা সেখানে

স্মৃতির বৃন্ত থেকে কখন যে ঝরে যায়! "কিন্তু শেষে একদিন তারিখের চেতনা হারিয়ে ফেললাম, বার করলাম পরিচ্ছেদ আরম্ভের এক অভিনব পন্থা, এবং সেটাও আপনি কোনো কোনো জায়গায় দেখবেন—এই যেমন কোনো পরিচ্ছেদ আরম্ভ হচ্ছে 'ক' দিয়ে, কোনটা বা চ-৪ দিয়ে, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

কোন জায়গায় পৌঁছেছে মানুষ? যেখানে তার আর ইউক্যালিপটাসের নাম তেমন করে মনে পড়ে না, পৃথিবীর সুন্দর সুন্দর শ্লোকগুলি ভুল হয়ে যায়, যেখানে প্রতিবেশীকে 'ভাই' বলে ফেললে চমকে জিভ কাটতে হয়। সেখানে প্রাচীন শিল্পের জগৎ শুধু আজকের বেনামা জীবনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এরই চূড়ান্ত নিরর্থকতাকে আরো প্রকট করে তোলে। "কাপড়টা কেড়ে নিলে মানুষের নামও থাকে না, হয়তো বয়সও থাকে না, সব কেমন যেন একাকার হয়ে যায় জানেন।" এ উপন্যাসের কাহিনী-পাত্রে যে টেনশন তাও এক তাৎপর্যে চঞ্চল। বুড়ি অথবা চন্দ্রিমা-কল্পনা (এ উপন্যাসে পরিচ্ছেদ কথাটির মতোই, 'চরিত্র' কথাটিও অচল) সেই টেনশনকে মূর্ত করেছে। যে জগতে দিনের কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই, রাতকে তীক্ষ্ণ করে তোলা বুঝি সেই জগতেরই বাধ্য-বাধকতা। বুড়ি এক সময়ে গল্পের কথকের সামনে হয়ে ওঠে দশমহাবিদ্যার অন্যতমা এক ধ্বংসাত্মিকা শক্তির স্বপ্নপ্রতীক। তখনই লেখককে চিনতে পারি। এই রূপক এবং রূপকার্য দুইই তখন স্পষ্ট হয়। একটা প্রচণ্ড ধ্বংস ছাড়া মুক্তি নেই—এই অদম্য ইঙ্গিত, যা এতক্ষণ আসি আসি করেও আসছিল না, এবারে উদ্ভাসিত হয়। এ উপন্যাসের কাহিনীগত পরিসমাপ্তি বলতে কিছু আশা করা যায় না। চন্দ্রিমা আপন হাতে আপন শিশুকে হত্যা করল। এইখানেই উপন্যাসের শেষ। এই সভ্যতার কোনো উত্তরাধিকারী না থাকাই ভালো, জারজের হাতে ভবিষ্যতের ভার দেয় কে? এই কৃত্রিম ভবিষ্যতের মোহপাশ ছিঁড়ে ফেলা খুবই কষ্টদায়ক—প্রায় আত্মজহননের মতোই। অথচ ছিঁড়তে পারলেই বোঝা যায় আঘাতটা ঠিক জায়গায় হানা গেছে। এই জারজহত্যার পরমুহূর্তেই বন্দীশিবিরে নেমে এল সমস্ত orgy-র অবসান। সে অবসানকে বিলম্বিত করার, দ্বিখণ্ডিত করার চেষ্টা যে তখনো চলবে সে-ইঙ্গিত শেষ অনুচ্ছেদে রয়েছে। তবু রাস্তা বোধ করি আর অজ্ঞাত থাকল না।

ভোগ্যপণ্যের অভাব নেই, অভাব হয় শেষটা মনোভাবের, যৌনতাণ্ডব দিনের শেষে রিরংসারও তৃপ্তি ঘটায় না—তা যেন আর-এক শাস্তি, মনুষ্যত্বকে

ধ্বংস করার আর-এক প্রকরণ। অশ্লীলতা যে বিষয়ে, বা বর্ণনায় বাস করে না, তা যে লেখকের এ্যাটিট্যুডের দান তা প্রমাণ করার মতো বই বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে আছে। কিন্তু লেখকের এ্যাটিটু, তাৎপর্যে বৈষয়িক অশ্লীলতাও যে একটা গুরুত্ব-গভীর বা serious ব্যাপ . হয়ে উঠতে পারে—সে নিদর্শন বিরল। 'বাবুঘাটের কুমারী মাছ' সেই বিরলদের অন্যতম। আর এই সমস্ত এলোমেলো নৈতিকতার মধ্যে এই বন্দীশিবিরের প্রাত্যহিক গ্লানিজর্জরতাকে ছাপিয়ে এক দূরাগত কিন্তু ক্ষীণ, মিতবাক কিন্তু স্পষ্ট আর্তি ভেসে আসে, জীবনের স্বরূপের জন্য আকাংক্ষা—"দিন না কেন সেই হতভাগ্য হতে আমায়, একবার দিন, বেঁচে যাই, সানন্দে জায়গা বদল করি। কারণ তখন যে-কুঁড়েটার চালায় দাঁড়িয়ে আছি সেটা যে আমার, হাড় কাঁপুনে হাওয়ায় যে শতছিন্ন বস্ত্রার হাত ধরে আছি সে যে কতদিন কত রাত্রের সমান সুখে দুঃখে আনন্দে ঘনীভূত আমারই স্ত্রী, যে নৌকার আশায় তাকিয়ে আছি তা যে নিয়ে যাবে আমায় সেই মাটির পারে যেখানে নতুন স্বপ্নে নতুন উদ্যমে আবার আছড়ে পড়তে চাইব, অর্জন করতে চাইব নিজেরই সত্তার অর্থ।" —এই স্বপ্নের সোনালি ফ্রেমটি ক্ষীণ রেখায় ঐ দুঃস্বপ্নের জগতটিকে অলীক বলে জানিয়ে দেয়। স্বপ্নটাই ইঙ্গিত দেয় জীবনের।

তিন

দেবেশ রায়ের 'যযাতি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস। আমরা যারা দেবেশ রায়ের গল্পের রসগ্রাহী, যারা দেবেশ রায়ের গল্পে একালের মানুষের অভিজ্ঞান খুঁজে ফেরার নানা বৃত্তান্ত পড়েছি, তারা অনেকদিন থেকেই এ আশা করছিলাম যে এবার বোধহয় একটু বড় আকারে তিনি কিছু বলবেন। আমাদের প্রতীক্ষা মিটতে দেরি হলেও প্রাপ্তির গুরুত্বে বিলম্বের খেদ ঘুচে যায়। দেবেশ রায়ের হাতে ঔপন্যাসিকের কলম আছে—আমাদের কাছে এটা একটা আনন্দের বার্তা। উনিশ শো তিয়াত্তরের এটি একটি অন্যতম প্রকাশনা।

'যযাতি' ত্রিবৃত্ত উপন্যাস। গিরিজামোহন, রেণু এবং খোকা—এই তিনটি জীবনবৃত্তের সম্পর্ক ও ছেদবিন্দুকে এই উপন্যাসে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এবং এই সম্পর্কের রূপ ও রূপকে ফুটে ওঠে এদেশেরই মধ্যবিত্ত জীবনের তিন অঙ্কের নাটক। রূপকার্থটি আরো অগ্রসর হয়ে যায়—তীব্র রেখায় জানিয়ে দিয়ে যায় জনক-জনিত-ব্যবধানের কালগত স্বরূপ। তিনজনের আত্মকথার ভিতর দিয়ে

কথাবস্তু, কথাপ্রসঙ্গ ব্যক্ত হয়েছে। এ আঙ্গিকরীতির মধ্যে যে অনিবার্যতা থাকে, তা এ উপন্যাসে হাজির। অস্তিত্ব-সংক্রান্ত একটা টেনশন থেকেই এক আত্মবিশ্লেষণের তাগিদ। সেই আত্মবিশ্লেষণ, অপরার্থে যা আত্মবিমোচন—তা আবার এক হিসাবে বাঙালি মধ্যবিত্তের আত্মকথাও বটে। গিরিজামোহন তাৎপর্য পেয়েছে এক আধিপত্য-প্রিয় মধ্যবিত্ত হিসাবে। যার নিজের মুক্তির অভিপ্রায় নেই, কিন্তু অপরকে অধিগত রাখার বাসনাটি ষোল আনা। বোধহয়, তার ইচ্ছার সীমিত বৈষয়িকতাই প্রবল হয়েছে রেণুর প্রতি তার ব্যবহারে ও মনোভাবে। রেণুর স্বাধীন ইচ্ছাকে গিরিজামোহন কোনোদিন স্বীকৃতি দিতে পারে নি। ব্যক্তিগত মালিকানার জন্য লালায়িত গিরিজামোহনের কাছে অন্য পাঁচটা জিনিসের মতো স্ত্রীও একটা অধিকরণীয় সামগ্রী। স্বভাবতই ছেলে খোকার কাছ থেকেও গিরিজামোহন আশা করেছিল, "এক পক্ষ থেকে আনুগত্য আর দাসত্ব, অপর পক্ষ থেকে আদেশ ও প্রভুত্ব।" গিরিজামোহন জীবনের দ্বান্দ্বিক বিকাশের সূত্র জানে নি। ছোটবেলায় খোকা গরুকে বলত রোগু, গাছকে বলত ছাগ। গিরিজামোহন নিশ্চিন্ত ছিল, আর সব উল্টে ফেললেও 'বাবা'কে উল্টে দেওয়া যাবে না। শেষ অবধি গিরিজামোহনের পক্ষে অকল্পনীয় সেই ভবিতব্যই দেখা দিল তারই কর্মসূত্র ধরে। 'গিরিজামোহন' অধ্যায়ের মূলকথা মালিকানালোভী মধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠা-রহস্যের উদ্‌ঘাটন। সন্তান পিতৃ-কীর্তি সম্বন্ধে কোন সচেতনতায় চঞ্চল হয়ে উঠল, তার বিবরণও পাওয়া যাবে এই সুলিখিত অধ্যায়ে। গিরিজামোহন-রেণু-সম্পর্কটাও যে ব্যক্তিগত মালিকানা-কাঙাল মধ্যবিত্তের সম্পত্তি-সম্পর্কের বাইরে নয়—গিরিজামোহন ও রেণুর চিন্তায় তা স্পষ্ট।

'গিরিজামোহন' অধ্যায়টি উপন্যাসের সবচেয়ে সুলিখিত অংশ, 'রেণু' অধ্যায়টি সবচেয়ে সুন্দর অংশ। ঔপন্যাসিক একই গল্পরীতিতে গিরিজামোহনের লুব্ধ, অভিমানী, আধিপত্য-প্রিয় ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন; আবার রেণুর নিজস্ব নারী-স্বরূপটিও ফুটে উঠল লেখকের চরিত্রজ্ঞানেরই আলোয়। 'গিরিজামোহন' ও 'রেণু' অধ্যায়ের যে কোনো বাক্য এমন কি বাক্যাংশেও ধরা পড়ে একের পুরুষ পারুষ্য, অন্যের কন্যা-জায়া-জননীর মিলিত জটিলতা। "আমি যাকে চেয়েছিলাম সে খোকা, আর সব ধর্ষণের ফল", অথবা "সংসার বলতে আমার মনে এখনো গোবর-লেপা উঠোন আসে। মেঘ দেখলে খনার বচন মনে আসে। গন্ধ বলতে তরি-তরকারির সঙ্গে লেগে থাকা মাটির গন্ধ। বাইরে বাইরে আমি যতই এই

সংসারের হই না কেন, ভেতরে ভেতরে আমার নিজের কাছে, আমি বাপের বাড়িরই রয়ে গেছি"—এসব কথায় মুহূর্তে মুহূর্তে রেণুর জীবনের প্যাটার্ন, তার নিজের আজন্মের জটিলতা মূর্ত হয়। এবং রেণুই ফুটিয়ে দিল তার দাম্পত্য অসঙ্গতির ভিতর দিয়ে আমাদের ভূমিব্যবস্থার জটিলতা, আমাদের অসম আর্থ-নীতিক বিকাশের জের। ব্যক্তি ও বাস্তবতার যোগবিয়োগের আশ্চর্য পরিচয় রেণু।

অথচ জনক-জননী-জনিত সম্পর্কের জটিলতা গিরিজামোহন-রেণুর ভিতর দিয়েই তীব্রতা পায়। খোকা ঐ অসঙ্গতির যুগধৃত অসামঞ্জস্যেরই সন্তান। এই অসঙ্গতির মধ্যে জাত, বর্ধিত বলেই অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে হয়ে পড়ল নিরুৎসুক। "ভেতরে ভেতরে স্মৃতি। আমার এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গে স্মৃতি। আমার এই অস্তিত্বে স্মৃতি। স্মৃতিকে আমি সইতে পারি না। স্মৃতিকে আমি সইতে পারি না। স্মৃতিকে আমার বড় ভয়।" অস্তিত্বসঞ্জাত এক উদ্বেগ ও যন্ত্রণাই খোকার উত্তরাধিকার। এখানে দাঁড়িয়েই সে নিজের রক্ত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার অলৌকিক সাধনায় মাতে। অথচ এ সাধনাই বড় কঠিন।

খোকাকে নিয়েই যেমন খোকার পরীক্ষা, খোকাকে নিয়েই লেখকেরও পরীক্ষা। যে খোকার চোখের সামনে গিরিজামোহনের শিল্পপতিত্বে, সবরকম পতিত্বের বিস্তৃত ইতিহাস বিশ্লেষিত হয়ে পড়ে রয়েছে, সে অতঃপর কী করবে? কী করবে বাঙালি মধ্যবিত্ত তার আজকের সংকটে, তার আজকের বিশৃঙ্খতার ধূসরে সে কেমন নতুন ইতিকথা লিখবে। সুতরাং দেবেশও সিদ্ধান্ত করেন—ভাঙন ছাড়া মুক্তি নেই। "তোমার সেই মৃত্যুতে বোধহয় আমাদের দুজনেরই তর্পণ।" এভাবে সার্বিক ধ্বংস ছাড়া উজ্জীবনের আশা নেই। খোকার শেষ উক্তি সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নিয়তিকেই অঙ্গীকার করল।

চার

এবং এইখানেই আমাদের আলোচ্য বইদুটির মিল। দুই ভিন্নধর্মী লেখকের বক্তব্যে, ভঙ্গিতে, ভাষায় পৃথক স্বাদ। লোকনাথের ভাষা কবির ভাষা হয়েই ঔপন্যাসিকের ভাষা; দেবেশের ভাষা জাত-ঔপন্যাসিকের ভাষা। লোকনাথ রূপকে প্রতীকে ব্যঞ্জনাময়, দেবেশ সটান কাহিনীকে তুলে নিয়েছেন তেন চরিত্রপাত্রের মুখ থেকে। লোকনাথ একটু বেশি বলেছেন, দেবেশ আরেকটু বেশি বললেও বুঝি পারতেন। কিন্তু দুজনেই আধুনিক বিপন্ন মানুষের সব যন্ত্রণা উদ্বেগ, সব অসহায়তাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। রূপকে ও রূপকার্থে

দুজনেই এক কথা বলেছেন—আমাদের মুক্তি শেষ পর্যন্ত আমাদের ধ্বংস করার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করছে। আমার আপত্তিও এইখানেই। যেভাবে তাঁরা দুজনেই একথা বললেন তা উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত বস্তুগত সম্পর্কাধার পায় নি। অথচ যদি সংকুচিত স্বরে কথা বলেন আপনারা, তাহলে ক্লান্তপ্রাণ আমরা এই সংকটে তা বুঝব কেমন করে?

দেবেশ রায়ের ভাষাব পৃথক উল্লেখ না করলে এ আলোচনা অসমাপ্ত থাকে। এটা কোনো বলার কথা নয় যে, দেবেশের ভাষায় এ্যাভারেজ হবার অথচ রঙদার হবার ব্যাকুলতা নেই, এও কোনো বলবার মতো ব্যাপারই নয় যে, বহু প্রসব-ক্লান্তার নিস্তেজ মন্থরতাও তাকে স্পর্শ করে নি—বলবার কথা এইটাই যে এ ভাষায় যথার্থ ঔপন্যাসিকের দীপ্তি রয়েছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা জানি, ঔপন্যাসিকের ভাষা আসলে তাঁর অভিজ্ঞতাই। ঔপন্যাসিককে তাঁর বিষয় কতখানি ভাবিয়েছে আকুল করেছে, বিষয় তাঁকে কতখানি নিয়ে গেছে বাস্তবের গভীরে—তাঁর ভাষাই সে কথা বলে দেবে। 'যযাতি'র ভাষায় লেখকের চিন্তা ভাবনা অভিজ্ঞতার মিলন ঘটেছে :

> "যৌবরাজ্য বলতেই দীর্ঘশ্বাসের ছোঁয়া লাগে। এ বোধহয় ভারতবর্ষের গণনাতীত প্রাচীনতার সঙ্গেই জড়িত। দুই মহাকাব্যেই যৌবরাজ্যে অভিশাপ। রাজপথ থেকে বনপথ—দুই মহাকাব্যেই। দুই মহাকাব্যের নায়কই যুবাপুরুষ। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, অর্জুন, যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন—সকলেই বয়সে তরুণ, সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। অভিশপ্ত যৌবনই মহাকাব্যের ধ্রুব বাক্য। যৌবনের মহাপ্রস্থানই মহাকাব্যের পরিণতি।"

এ ভাষা ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতায় স্পষ্টবাক্, কল্পনায় সমৃদ্ধ, ভাবনায় গাঢ়, বিষয়-জ্ঞানে সুদৃঢ়। অথচ এ মননের ভাষাই বা নয় কেন? জিজ্ঞাসায় বিশিষ্ট আর-এক ঔপন্যাসিককেও আমরা পেলাম তাহলে?

ভাঙা-আয়নায় দেশ ও কাল : কয়েকটি নমুনা

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

ষাটের দশকের শুরু থেকেই বাঙলা কথাসাহিত্য বিষয়ের অভাবে ভুগছিল। হয়তো আরও আগে থেকেই। গরীবের ছেলে, বড়লোকের মেয়ে (বা তার উল্টো) এদের করুণ-মধুর প্রেম—এ ছিল এক ধরনের ছক, আর না-হলে অভাবের সংসার ও তার মধ্যে প্রেমের ফুল ফোটার গল্প। পাঠক আস্তে আস্তে বিরক্ত হয়ে পড়ত। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ জীবনের গণ্ডীর বাইরের যে-কোনো গল্পই তাই সাদর অভ্যর্থনা পেত। অবধূত তাঁর তন্ত্রসাধনা দিয়ে কিছুদিন বাজার মাৎ করতে পেরেছিলেন। হাইকোর্ট ও চৌরঙ্গীপাড়ার কেচ্ছা দিয়েও শংকর কিছুটা জায়গা করে নিতে পারলেন। কিন্তু সে-পুঁজিও অল্প দিনেই ফুরিয়ে গেল। আবার মধ্যবিত্তের সংসার, দারিদ্র্যের কাহিনী ও কাহিনীর দারিদ্র্য। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির ভাঙন, রাজনীতির জড়তা, একদলীয় কংগ্রেস শাসনের বঞ্চনা ও অত্যাচার, বামপন্থী আন্দোলনের বিভেদ ও দুর্বলতা—বাঙলা কথাসাহিত্যে শুধু এর পরিবর্তনহীন একঘেয়েমিই প্রতিফলিত। ৬২-র পরে কিছুটা আবিল দেশ-প্রেম, আবার মধ্যবিত্ত সংসার। শেষ পর্যন্ত একঘেয়েমি কাটাতে যৌনতা।

৬৭ ও ৬৯-এ যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের একচেটিয়া শাসনের অবসান, সি.পি.আই. (এম. এল.)-এর জন্ম, শরিকী সংঘর্ষ ও রাজনৈতিক হত্যা—পর পর এই ঘটনাগুলি বাঙালি লেখকদের যেন একটা সুযোগ দিল*। এই প্রথম রাজনীতি ব্যাপারটি রাস্তায় নেমে এল, কলকাতা ও মফঃস্বল শহর-গুলিতে তো বটেই, দূর দূর গ্রামের কুঁড়েঘরেও ঢুকে পড়ল। রাজনৈতিক পালা-বদল, ক্ষমতাদখল, হিংসার জবাব আমরা হিংসা দিয়েই দেবো, খুনকা বদলা খুন হ্যায়—কথাগুলি গণ-অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে গেল। শুধু কথা হিসেবে নয়, দেখা-

---

* রাগ ভৈরব। বিমল মিত্র। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা। পাঁচ টাকা
* ফেরা। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। অনন্য প্রকাশন, কলকাতা। সাত টাকা
* কেন্দ্রবিন্দু। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা। চার টাকা
* নিশীথফেরী। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা। পাঁচ টাকা
* মানুষ। সমরেশ বসু। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা। চার টাকা

শোনার নাগালের মধ্যে। বাণিজ্যিক লেখকরাও মধ্যবিত্ত সংসারের কাঠামোতেই এই নতুন রাজনৈতিক বিষয়বস্তুকে ধরবার চেষ্টা করলেন। এই পটভূমিকায় লেখা চারটি কাহিনী ও একই সময়ে (কিন্তু একটু আগের পটভূমিকায়) লেখা একটি কাহিনী নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

'রাগ ভৈরব', 'ফেরা', 'কেন্দ্রবিন্দু', 'নিশীথফেরী' ও 'মানুষ'—এর কোনটি উপন্যাস আর কোনটি বড় গল্প, এ-বিচারে গিয়ে কোনো লাভ নেই। উপন্যাস বলতে যদি বোঝায় আধুনিক যুগের মহাকাব্য, যার শাখাপ্রশাখা হবে বহু বিস্তৃত, যার দর্পণে ধরা পড়বে পুরো সমাজের চেহারা তার স্থিতি ও গতি—যেমন দেখি শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক'-এ—তাহলে এর কোনোটাকেই উপন্যাস বলা যায় না। তবু, সব কটি কাহিনীরই উপজীব্য পশ্চিমবঙ্গ ও তার রাজনীতি—তাই একসঙ্গে আলোচনা করার সুবিধা। পাঁচটি কাহিনীতেই এক বা একাধিক রাজনৈতিক খুনের প্রসঙ্গ আছে, হয় তা ইতিমধ্যেই ঘটেছে বা তার প্রস্তুতি হচ্ছে। 'রাগ ভৈরব'-এ খুন হন এক বৃদ্ধ, তাঁর মেয়ে খুনের রাজনীতির সমর্থক, কিন্তু তিনি পুলিশকে এক খুনীর খবর দিতে গিয়ে মারা পড়েন। 'ফেরা' ও 'কেন্দ্রবিন্দু'তে খুন হয় নানা পার্টির লোক। 'নিশীথফেরী' এ-ব্যাপারে কিছুটা অস্পষ্ট, শুধু বলা হয় জনৈক 'অসাধু সিদ্ধার্থ' খুন হবে। 'মানুষ'-এ একাধিক পার্টিকর্মীর মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী এক আঞ্চলিক নেতার বিচার বসে।

বাঙালি সমাজের কোন চেহারা ও তার কী পরিবর্তন এই কাহিনীগুলিতে পাওয়া যায়? সমরেশ বসুর কাহিনীটি আলাদা করে আলোচনা করা হবে। আগে, প্রথম চারটি কাহিনী দেখা যাক।

৬৭-র আগের পরিস্থিতিকে বিমল মিত্র বর্ণনা করেছেন এইভাবে: "কোথায় যেন আকাশের কোন্ কোণে এক টুকরো কালো মেঘ ছিল, কেউ দেখতে পায় নি আগে। বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্ত হয়েই সবাই ঘরকন্না করছিল। সকালবেলা সবাই অফিসকাছারি গেছে। দুপুরে অফিসের কাজের নামে ক্যানটিনে গিয়ে পলিটিকস আলোচনা করেছে। কাজের কাজ যদি কিছু করে থাকে তো সেটা হচ্ছে ইউনিয়ন। ইউনিয়নের জন্যে দল ভাঙ্গাভাঙ্গি, মিছিল, শ্লোগান। আর মাসে দুটো তিনটে করে শহীদ মিনারে মিটিং। লীডারদের গরম-গরম লেকচার শুনে সবাই গা-গরম করেছে। এছাড়া যাদের অফিস-কাছারি-স্কুল কিছু নেই, তারা সিনেমা দেখেছে, থিয়েটার দেখেছে বা কালচারাল কাজের নামে

দল বেঁধে মেয়েমানুষ নিয়ে থিয়েটার করেছে। এই তো ছিল বাঙালী জীবনের ধরা-বাঁধা রুটিন।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিমল মিত্রের বক্তব্য কাকচক্ষু জলের মতোই পরিষ্কার। বাঙালি মানে কলকাতা শহরের বাঙালি, হয় মধ্যবিত্ত কেরানী, নয় সামাজিক আগাছা। ফলে, "লম্বা জুলফি, মাথায় রুক্ষ চুল, গায়ে হলদে সার্ট, পরনে টাইট প্যান্ট" ছেলেদের সঙ্গে চীনের চেয়ারম্যানের অনুসারী ছেলেদের এক করতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয় না। বিমলবাবু কিছুই গোপন করেন নি। তিনি মূলত স্থিতাবস্থার পক্ষে। কত অনায়াসে তিনি লিখতে পারেন: "আদি যুগ থেকে এক ধারায় জীবন বয়ে আসছিল। ছেলেরা লেখাপড়া শিখে চাকরি পেয়েছে, আর মেয়েরা বিয়ে করে ঘরের বউ হয়েছে, ছেলে-মেয়ে বিইয়েছে। তারপর যার সাধ্যে কুলিয়েছে সে কলকাতায় কিংবা কলকাতার আশেপাশে এক টুকরো জমি কিনে তার ওপর কোঠা বানিয়েছে। বিয়ে-শ্রাদ্ধ-অন্নপ্রাশনে লোক খাইয়ে সামাজিকতা করেছে। এই-ই ছিল বাংলাদেশের বাঙালীদের দুশো বছরের রুটিন-বাঁধা ইতিকথা। এই ইতিকথাই বাঙালী জীবনের আসল ইতিহাস।" বোঝা যায়, স্থিতাবস্থার শক্তি নিজের ইতিহাস ভুলতে চাইছে, তার অতীতকে দুশো বছরের বেশি পেছোতে রাজি নয় (এ-নিয়ে প্রমথ চৌধুরীর মোক্ষম মন্তব্যটি মনে পড়ে যায়)। তাছাড়া এই সময়কালেও বাঙালি ছেলে-মেয়েরা যেন স্বদেশী করে নি, পুলিশ তাদের মারে নি। বিমল মিত্র এ-সবই এক কথায় উড়িয়ে দেন, তখন নাকি শত্রু ছিল ব্রিটিশ, এখন আর শত্রু নেই। নতুন পরিস্থিতির চেহারা তাঁর চোখে এই রকম: "ট্রামে উঠে কেউ ভাড়া দেবে না। টিকিট চাইলেই গোলমাল পাকাবে। ভদ্রলোকের ছেলেরা মুখখিস্তি করবে অশিক্ষিত লোকদের মতন। ফরসা চকচকে জুতো দেখলে মাড়িয়ে দেবে। কেউ ভালো গাড়িতে চড়লে রাস্তা ছেড়ে দেবে না। অথচ তার জন্যে যদি কেউ চাপা পড়ে তো ড্রাইভারকে মেরে গাড়ি পুড়িয়ে দেবে।" গাড়ি চাপা পড়ার এই ব্যাখ্যা বোধহয় পুলিশের পক্ষেও হজম করা শক্ত হবে। 'রাগ ভৈরব'-এ যে এত প্রবীণ বাড়িওয়ালার ভীড়—এটাও কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। মধ্যবিত্তের কাছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরমার্থই হল নিজের একটি বাড়ি। বিমল মিত্র এই ছোটো সম্পত্তির পক্ষ নিয়েই লিখছেন।

"বাঙালী-জীবনের ইতিহাসের গতিপথ···এতদিন পরে এমন করে মোড়" ঘুরল কেন? বিমল মিত্রের বিশ্লেষণ: "আমরা আমাদের চরিত্রই হারিয়ে ফেলেছি।" এটাই নাকি একমাত্র সমস্যা। চরিত্র হারিয়ে গেল কেন? বিমল

মিত্র কিছুই অস্বীকার করেন না। ইটের দাম বেড়েছে, সিমেণ্ট পাওয়া যায় না —এগুলো তো তাঁর কাছেও সমস্যা। ফলে বিক্ষুব্ধ হয়ে তিনিও বলেন, "অনেক দিন মানুষ মুখ বুঁজে সব সহ্য করে গেছে। তেইশ-চব্বিশ বছর ধরে শুধু আশার বাণী আর আশ্বাস। আশ্বাসে মন ভরেছে কিন্তু পেট ভরে নি।" কেন্দ্রে মন্ত্রী নামক নতুন মহারাজ তৈরি হয়েছে, বছরে যাদের মাইনে সাড়ে চার লক্ষ টাকা —এই বাবদে স্বতন্ত্র পার্টির এম.পি. প্রাক্তন আই.সি.এস. ("বাজে লোক নন ডাণ্ডেকর") দণ্ডেকারের হিসেবটাও এ-কাহিনীতে দুবার দেওয়া হয়েছে (এক-বার ডাণ্ডেকার, আরেকবার ডান্‌ডেকার এই দুই বানানে)। "লম্বা জুলফি, টাইট প্যাণ্ট" পরা ছেলেরাও "ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে। তাদের কেউ ইনজিনিয়ারিং পাশ, কেউ কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে বি. এস-সি ফার্স্ট ক্লাশ, কেউ পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম. এ, এরা সব লেখাপড়া জানা ছেলে। বাড়িতেও বাপ-মায়ের কাছে এদের স্থান নেই, গভর্নমেণ্টের চোখেও এরা ক্রিমিন্যাল।" এ-রকম একটি ছেলে বলে, "অথচ পার্টিগুলো দেখ, তারা কী করে মিনিস্ট্রি পাবে তাই নিয়ে রিসার্চ চালাচ্ছে, আমাদের বেকারদের চাকরি দেবার কোনও আন্দো-লন করছে না। শুধু যারা চাকরি পেয়েছে তাদের মাইনে কিসে বাড়ানো যায়, সেই নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছে।" অর্থাৎ, বেকারি ও সুবিধাবাদের জন্যেই চরিত্র হারিয়ে গেছে।

এ-সব বুঝেও রায়পুরের বৃদ্ধ কিন্তু পুলিশের কাছে এই ছেলেটিকে খুনী বলে ধরিয়ে দিতে যান, কারণ "এ দেশ ধর্মের দেশ···ত্যাগের দেশ। এ দেশে পাপী-তাপীদের ধ্বংস করতে যুগে যুগে অবতার জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনি আমি তো নিমিত্ত মাত্র। আমরা কেবল কর্তব্য করে যাবো। কর্ম করে যাবো। কর্মফলের ওপর আমাদের কোনও অধিকার নেই। সততা সত্যবাদিতা এই সবের ওপর ভিত্তি করেই আমাদের দেশ গড়ে উঠেছে। ···আপনার ওপর যে কর্তব্য ন্যস্ত আছে, তাই-ই করে যান। দেখবেন তাতে আপনার ভালো হবে, তাতে সকলের ভালো হবে, তাতে এই হতভাগ্য দেশেরও ভালো হবে—।" ডাঙ্গে ও কোসম্বী 'গীতা'র যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার সত্যতার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ এইখানেই পাওয়া যাবে!

রাজনীতি করে বেকার ছেলেরা—বিমল মিত্র (এবং বরেন্ গঙ্গোপাধ্যায়)-এর কাছে এ-কথা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। অন্যদিকে, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কৃষিবিপ্লবী ছেলেদের সম্পর্কে একটা গভীর ভয়-মেশানো শ্রদ্ধা

রাখেন। এরা যে অন্য বামপন্থী দলের মতো চাকরির জন্যে, মাগগি ভাতার জন্যে আন্দোলন করছে না—এতে যেন তাঁদের শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। বিমল মিত্রের গল্পে গণেশ মারা পড়ে বোমা বানাতে গিয়ে, এ-ছাড়া কোনো কৃষিবিপ্লবীর অন্যরকমে মৃত্যু হয় না। সুনীল ও শীর্ষেন্দুর গল্পে এরা মরে পুলিশের হাতে এবং অন্যদলের হাতে, যেমন অন্যদলের আদর্শনিষ্ঠ ভালো লোক মরেন এদের হাতে। মান্তু নামক কৃষিবিপ্লবী ছেলেটি খুন হলে রেবা ভাবে, "চারদিকে বোমার শব্দ, খুন আর উত্তেজনা। হয়তো এই রকম ভাবেই সব দেশে বিপ্লব হয়। প্রথমটা বোঝা যায় না—অনেকেই সন্দেহ করে। তারপর হঠাৎ একদিন দারুণ ভাবে ··। তা হোক্, না হয় বিপ্লব হয়ে গেলো, তারপর এলো সেই স্বপ্নের নতুন সমাজ, সেখানে কেউ মনে রাখবে মান্তুকে? সে এই আদর্শের জন্য প্রাণ দিয়েছিল, এই জন্য শ্রদ্ধা পাবে? বিনয় বাদল দিনেশ (sic) কিংবা ক্ষুদিরাম এদের যেমন লোকে শ্রদ্ধা করে। কোথাও এদের ছবি থাকে। সে-রকম মান্তুরও—।" বিমল মিত্র যাদের সঙ্গে এই নতুন যুগের ছেলেদের তফাৎ করেন, সুনীল তাদের সঙ্গেই মান্তুকে মিলিয়ে দেখতে চান। এ-রকম মনে করার কোনো কারণ নেই যে সুনীল মান্তুকে বা তার রাজনীতিকে সমর্থন করেন। মান্তু খুনী, অন্য পার্টির (প্রসঙ্গে বোঝা যায়, সি.পি.এম.) একজন আদর্শবান বয়স্ক ব্যক্তিকে সে ও তার বন্ধুরা 'শোধনবাদী' বলে খুন করেছে—তার বাবা স্বচক্ষে এই দৃশ্য দেখেছেন।

অসমর্থন ও শ্রদ্ধার এই মিশেলের প্রতিনিধিত্ব করেন মান্তুর বাবা। মজার কথা, বিমল মিত্র ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতামতের মুখপাত্র মধ্যবিত্ত ঘরের দুই অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ। মান্তুর বাবা বলেন, "আমি জানি, যদি কেউ খুন টুন করে, তবে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত, আদালতের বিচারে যা শাস্তি হয়, তাই মেনে নেওয়া উচিত।" কিন্তু তিনি বিমল মিত্রের বৃদ্ধের মতো থানায় যেতে পারেন না, কারণ এ-ক্ষেত্রে খুনী তাঁর নিজের ছেলে। সুনীল তাঁর কাহিনীকে এই জায়গায় এনে দাঁড় করান, কারণ পরিস্থিতির বিচারে তিনিও মান্তুর বাবার মতোই অসহায়।

শীর্ষেন্দুর রাজনীতি-করা নায়কও একই রকমে বিভ্রান্ত। বিমল মিত্রের মতোই তিনি ৬৭-র ঠিক আগের পরিস্থিতি বর্ণনা করেন এইভাবে: "পরিষ্কার টের পাচ্ছিলাম, দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া পাল্টে যাচ্ছে। দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতাসীন দল চাল মাৎ হয়ে বসে আছে। নতুন কিছু করার নেই। পুরোনো

আদ্যিকালের কাঠামো রয়ে গেছে সমাজের চেহারায়। সেই ঘুণ-ধরা কাঠামোর ওপর মাটি চাপিয়ে প্রতিমা গড়ার চেষ্টা, বার বার ভেঙে যাচ্ছে মূর্তি। কারিগর বুঝতে পারছে না কী করতে হবে।" ৬৭-র নির্বাচনে কংগ্রেস হেরে যাওয়ার পর কলকাতার চেহারাও বর্ণনা করেন বিমল মিত্রের ধরনে: "কলকাতায় সেই সন্ধ্যাবেলা বাসে-ট্রামে টিকিট কাটে নি কেউ, কণ্ডাক্টর পয়সা চায় নি। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে আমি সারা শহর দেখলাম। কিন্তু কেমন যেন নিস্পৃহতা এসে গেছে আমার। আমি আর সে রকম আনন্দ পাই না।" দেখা যাচ্ছে, বিমল মিত্র ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়—দুজনের কাছেই সামাজিক উচ্ছৃংখলতা ও দুর্নীতির টিপিক্যাল দৃষ্টান্ত ট্রামে (বাসে নয় কেন ?) ভাড়া না-দেওয়া। আর যদিও শীর্ষেন্দু একটু আগেই বলেছেন, "দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া পাল্টে যাচ্ছে", কিন্তু তারপরেই বলে বসেন, "মানুষ পাল্টাল না, কেবল রাজনীতি পাল্টে গেল—এ কেমন কথা ?" এবং নকশালবাড়িতে কৃষক-অভ্যুত্থানের খবর পেয়ে তাঁর নায়ক চমকে ওঠে: "উত্তর বাংলার মাটিতে আমি মিশে আছি। সেই স্নিগ্ধ মাটি থেকে এই অগ্ন্যুৎপাত !" (যেন উত্তরবঙ্গে তেভাগা আন্দোলন হয় নি !)

শহরের ঘটনা সম্পর্কেও তাঁর প্রতিক্রিয়া: "রাশি রাশি ছেলে ধরা পড়ছে। তবু খুন কমছে না। অবাক হয়ে দেখি বাংলাদেশের নরম মাটি থেকে এ কারা জন্মাল ! তিনটে চারটে ছেলে গিয়ে স্কুল জ্বালায়, পুলিশ ব্যারাক আক্রমণ করে, সশস্ত্র এস-আইকে খুন করে।"—সুনীলের মতোই শীর্ষেন্দুর সমর্থন নেই, শ্রদ্ধা আছে। ভয়ও আছে।

বিমল মিত্র ও সুনীল-শীর্ষেন্দু এক নন। বিমল মিত্র ৬৭-র আগেকার পরিস্থিতিতে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করলেও, পরিবর্তনে তাঁর আপত্তি আছে। মাস্তর বাবা কিন্তু ভাবেন, "দেশের এই অসহ্য অবস্থা কেউ চায় না। কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক চায় না অন্তত। সবাই চায় পরিবর্তন।" "রাজনৈতিক ব্যর্থতার রোগে ভুগে খিটখিটে হয়ে" যাওয়া শীর্ষেন্দুর নায়কও একটু চড়া সুরে বলে, "ভালো হোক মন্দ হোক, তবু একটা কিছু হয়ে যাক। একটা চূড়ান্ত কিছু হওয়া বড় দরকার। একটা বড় ঝাঁকুনি, ওলটপালট বড় দরকার।" মাস্তর বাবা ছেলের আনা বইপত্র পড়েন, "যুক্তি দিয়ে কোনোটাই অস্বীকার করতে পারেন না।" কিন্তু "তারপর দিনের পর দিন যে-সব ঘটনা শুরু হলো বাবা একেবারে বিভ্রান্ত, বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। প্রত্যেক দিন বীভৎস খুন জখম,

নারকীয় ঘটনা।" এর পর সুনীল নানা ধরনের, নানা পেশার লোকের খুন-হওয়ার ফিরিস্তি দেন। শীর্ষেন্দুর নায়ক আগের কথাগুলির ঠিক পরের অনুচ্ছেদেই বলে, "কথাটা স্বস্তির মুখে পড়ল। বাংলা দেশে রাজনৈতিক ঝড় এসে গেল হঠাৎ। (যদিও সে আগেই টের পাচ্ছিল, "দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া পাল্টে যাচ্ছে।") বারবার বিধানসভা ভেঙে যায়। সেই ঝড়ের মধ্যে বৃক্ষ-পতনের মতো লাশ পড়তে শুরু করলো। সশব্দে। প্রথমটায় খুব চমকে গেলাম। কিন্তু খুনের সেই সবে শুরু। খুনের পর দেয়ালে লেখা হয় অমুক খতম তমুক খতম।" মাস্তুর বাবা ব্যাকুল ভাবে ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন, "এ সব কি শুরু হলোরে, মাস্তু আমাকে বুঝিয়ে দে।" শীর্ষেন্দুর নায়ক আবার পুঁথিপত্র খুলে বসে। "মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করি। কিছু মেলে, কিছু মেলে না। বরাবর এই এক ব্যাপার দেখে আসছি। পুঁথিপত্রে যা লেখা আছে তার কিছু মেলে, কিছু মেলে না।"

বোঝা যায়, আলাদা ধরনের গল্প লিখলেও সুনীল ও শীর্ষেন্দুর মনোজগৎ একই। শুধু তাই নয়, কৃষিবিপ্লবী ছেলেদুটির চরিত্রও একইভাবে চিত্রিত—শীর্ষেন্দুর মণি ও সুনীলের মাস্তু একে অপরের কার্বন-কপি। স্কুলের পরীক্ষায় দুজনেই ভালো ফল দেখিয়েছে, এঞ্জিনিয়ারিং বা বি. এ. পরীক্ষাতেও, পরীক্ষা দিলে ফার্স্ট ক্লাস পেত; কিছুরই অভাব ছিল না, তবু তারা বিপ্লবে নেমেছে (বিমল মিত্রের বেকারতত্ত্ব. অর্থাৎ বেকার তাই বিপ্লবী, নয়)। বিমল মিত্র যাদের "টাইট প্যাণ্ট লম্বা জুলফি"র সঙ্গে এক করেন, সুনীল-শীর্ষেন্দু সেখানে তফাৎ করেন। মাস্তু বা মণি সেদিক দিয়েও আদর্শ ছেলে। শীর্ষেন্দুর মতে, এদের বিরোধী দলের ছেলেরাই বরং রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে মেয়েদের শিস্ দেয়। সারা পশ্চিম-বঙ্গের কৃষিবিপ্লব ও তার অনুগামী ছেলেদের কী সরল ফর্মুলা: শহুরে মধ্য-বিত্ত ঘরের হীরের টুকরো ছেলে, কিন্তু খুনী। সমাজবাদী বাস্তবতার ইতিবাচক নায়ক ও অন্যান্য ছকবাঁধা চরিত্র সম্পর্কে লুকাচ বলেছিলেন, They are not typical, but topical. সুনীল-শীর্ষেন্দুর ছেলেরা topical, typical নয়।

"আমাদের সবচেয়ে বড়ো লড়াইটা ছিল মানুষের চরিত্রের জন্য—সে লড়াই আমরা লড়ি নি। মানুষকে ধর্মের চেয়ে বেশি কিছু দেওয়ার নেই। ধর্ম আর চরিত্র পেলে মানুষ আপনি দাঁড়ায়"—কথাগুলো বিমল মিত্রের মনে হতে পারে, আসলে কিন্তু শীর্ষেন্দুর নায়কই যথোচিত গাম্ভীর্য সহকারে এই জ্ঞান দেয়। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যদিও শীর্ষেন্দুর নায়ক একজন ব্যর্থ রাজনৈতিক কর্মী, তার

ভাষা চেতনা চিন্তাভঙ্গি—সবই শীর্ষেন্দুর। বিমল মিত্র যে-অর্থে স্থিতাবস্থার সমর্থক, সুনীল-শীর্ষেন্দু তা নন। কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল ও তার বিরোধী বামপন্থী দল—দুয়ের বিরুদ্ধেই পশ্চিমবঙ্গের মধ্য ও নিম্নবিত্ত মানুষের (সর্বহারা নয়, মধ্যশ্রেণীর) যে অবিশ্বাস, সুনীল ও শীর্ষেন্দু তাকেই প্রতিফলিত করেন। এই শ্রেণীর মানুষ রাজনীতি বলতে বোঝে একটি আদর্শ সচ্চরিত্র সমাজ-ব্যবস্থাকে নির্ঝঞ্ঝাটে বাস্তবে এনে হাজির করা। এরা চায়, শান্তিপূর্ণভাবে হঠাৎ একদিন সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক, কিন্তু বিপ্লবের চূড়ান্ত মুহূর্তেও যেন ট্রাম-বাস বন্ধ না হয়। অথচ বীরপূজার মনোভাব খুবই প্রবল। বিপ্লবের জন্য শ্রমিক বা কৃষক শ্রেণীর সংগঠিত অভ্যুত্থান এদের পরিপ্রেক্ষিতে নেই, আছে কিছু আদর্শনিষ্ঠ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের আত্মত্যাগ ও তরুণের উদ্দীপনা। "মানুষও বেড়েছে, তাই দামও বেড়েছে"—বিমল মিত্র এ-কথা বললেও, সুনীল বা শীর্ষেন্দু বলতে পারেন না। তাঁরা চান, মণি বা মাস্তুর মতো "হাজার হাজার ছেলে মহাপুরুষ হয়ে" যাক, "ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করে মানুষের মুক্তির জন্য কাজে নেমে" পড়ুক। বীরপূজারীর রামরাজ্যবিলাস—মধ্যশ্রেণীগুলির এই উদ্‌বাস্তব শ্রেণীচেতনাহীন বিপ্লবভাবনাই সুনীল-শীর্ষেন্দুর গল্পে প্রতিফলিত।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনীটি অবশ্য নেহাতই ঠুনকো। তিনি কোনো কমিটমেন্টেই যেতে রাজি নন। একটি রিভলভার পৌঁছে দেওয়ার গল্প—নেহাতই উত্তেজনাহীন, সাসপেন্স রাখার ব্যর্থ চেষ্টা। আসল গল্প সেই চাকরি-চলে-যাওয়া বেকার, তার বিষয়বুদ্ধিসচেতন বাবা, কর্মরতা দিদি ও পরিবারের অন্যদের কথা। আর আছে তার কেরানীজীবনের বন্ধু নন্দু (যে তার অফিসের ফিরিঙ্গি টাইপিস্টকে বিয়ে করে বাড়ি থেকে আলাদা হতে চায়) বা তার বোন—যার সঙ্গে মূল কাহিনীর কোনো সম্পর্ক নেই।

রিভলবার ও আসন্ন খুন উপন্যাসের পশ্চাৎপট মাত্র, মূল বিষয় নয়।

প্রকাশ একটি রিভলভার পৌঁছে দেবে পুলিশের হাত থেকে ফেরারী এক ভদ্রলোকের কাছে, দুজনে দুজনকে চিনবে নামের আদ্যক্ষর দিয়ে, এস. এস.—এই হল 'কোড'। তার ওপর ফেরারী ভদ্রলোক ডানদিকে সিঁথে কেটে চুল আঁচড়াবেন, চিনতে অসুবিধা হবে না। (বরেন গঙ্গোপাধ্যায় কোন গুপ্তচর-রোমাঞ্চ কাহিনীর ভক্ত জানতে ইচ্ছা হয়।)

কেন রিভলবার? "ও ধরনের বস্তুকে যে-সব কাজে লাগানো হয়, সে

কাজেই লাগানো হবে।

"—মানে খুন!

"—হ্যাঁ, খুন। একজন অসাধু সিদ্ধার্থের জন্যই এ-সব আয়োজন করা হচ্ছে। অসাধু এবং সিদ্ধার্থ কথা দুটো চিবিয়ে চিবিয়ে ব্যঙ্গচ্ছলেই বললেন বিনোদ মাস্টার। মাথার মধ্যে যেন লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝিঁ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ছড়িয়ে পড়ল। প্রকাশ হাঁ করে শ্বাস টানবার চেষ্টা করল। তাই বলে খুন! যদি ফাঁস হয়ে যায় সব!"

আগাগোড়াই প্রকাশ এই ধরনের অ্যান্টি-হিরো, 'পথের দাবি'র অপূর্বর সাম্প্রতিক সংস্করণ। রিভলবার নিয়ে যাওয়ার সময় তার চলাফেরা আচার-আচরণ কথাবার্তা সব কিছুই শুধু নার্ভাস নয়, ভয়ার্ত। রিভলবারের প্রসঙ্গে সে বলে, "রবিদার কথায় যা বুঝেছিলাম তাতে কিন্তু অন্য রকম ধরে নিয়েছিলাম আমি।

"—কি ভেবেছিলে?

"—আমার মনে হয়েছিল, ওটা আসলে আত্মরক্ষার জন্য।

"—এ-ও এক ধরনের আত্মরক্ষা।"

শেষ পর্যন্ত রিভলবারটি যথাস্থানে পৌঁছয়। যে এস.এস. সেটি নেন, তাঁরও বয়স সাতাশের মতো, "যেন নিজের প্রতিবিম্ব দেখছে প্রকাশ।...যেন প্রকাশেরই প্রতিবিম্ব বলে লোকটার সিঁথি প্রকাশের ঠিক উল্টো দিকে হয়ে আছে।" বিপদ এড়িয়ে প্রকাশ ফিরে আসে, ভোরবেলায় ট্রেনে বসে দুঃস্বপ্ন দেখে—সে নিজেই খুন হয়েছে, সাতাশ বছরের একজন যুবক। কাগজে তার খবর বেরিয়েছে।

চারটি কাহিনীর ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, চরিত্রগুলি সবই ছকবাঁধা—সেই মাঝারি ধরনের চাকুরে বা অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ বাবা, বেকার ছেলে, পার্টিনেতারা সুবিধাবাদী বা বাক্‌সর্বস্ব, যে দু-একজন ভালো লোক রাজনীতি করেন তাঁরা নেহাতই এর ব্যতিক্রম, আর কৃষিবিপ্লবীরা শহরের বা মফঃস্বল শহরের মধ্যবিত্ত ঘরের হীরের টুকরো ছেলে, কিন্তু খুনী। রাজনীতি না-করা মাঝবয়সী লোকেরা সকলেই সুবিধাবাদী, সুনীলের গল্পে অন্তত যেন পেটের দায়ে সি.পি.এম. সমর্থক কিন্তু ভীতু, সান্তু "কখনও প্রচণ্ড বিপ্লবী কখনও জনসঙ্ঘ।" বরেনের গল্পে বোতলবাবু এঁর দর্শন ব্যাখ্যা করেন এই ভাবে: "যখন যেমন তখন তেমন। যাস্ট খাটো, খাও। চালিয়ে যাও, ফুর্তি করো, সিনেমা ছ্যাখো, শিষ মারো; শেষে বাঁশ পোঁদে ঢুকিয়ে বাপরে বাপ ডাক ছেড়ো না।" শীর্ষেন্দু ও সুনীলের

গল্পের কৃষিবিপ্লবী ছেলেদের মতন, বরেন ও শীর্ষেন্দুর গল্পের দুই বাবাও একই লোকের রকমফের—স্বার্থসন্ধানী ও সাবধানী। লাশ পড়ে থাকলে, যেমন বিমল মিত্রের গল্পে তেমনি 'কেন্দ্রবিন্দু'তেও, কেউ দরজা খুলে বেরোয় না। (বাচ্চা মেয়েরা অবশ্য সর্বদাই খুব মিষ্টি স্বভাবের।)

টিপিক্যাল নয়, টপিক্যাল। টিপিক্যাল চরিত্রের মধ্যে গড়পড়তা ও উৎ-কেন্দ্রিক ভাব মিশে থাকে, সব ব্যাপারে সাধারণ হলেও দু-একটি বিষয়ে সে অসাধারণ হয়, তবেই সে 'একজন লোক' না-হয়ে একটি 'চরিত্র' হয়ে উঠতে পারে। বাস্তবতার ঐতিহ্য এই ধরনের চরিত্রই তৈরি করে। কিন্তু আলোচ্য চারটি কাহিনীতে এমন একটি চরিত্রও নেই। কোনো লেখকই ব্যাপক জন-সমাজের (civil society) মধ্যে রেখে তাঁর পাত্র-পাত্রীদের বোঝার বা দেখাবার চেষ্টা করেন না, বাণিজ্যসফল কাহিনীর চিরকালের গণ্ডীর মধ্যেই নতুন অবস্থাকে ধরবার চেষ্টা করেন। ফলে লেখার মধ্যে না আসে ব্যাপ্তি, না আছে গভীরতা। না আছে জীবনবোধ, না আছে সমাজদর্শন। চারটি কাহিনীতেই তাই একই ধরনের লোকজন ঘুরে বেড়ায়—নামগুলোই যা আলাদা। রাজ-নৈতিক আখ্যানকে দ্বিপ্রাহরিক অবসর বিনোদনকারী কাহিনীর ছাঁচে ঢাললে তার অনিবার্য সাহিত্যিক ফল এই-ই হয়। গল্পাংশ দুর্বল, অগোছাল, চরিত্রগুলি এক মাত্রার অর্থাৎ পরিবর্তনহীন, উপন্যাস ও ছোটোগল্পের ভেদরেখা মুছে যায়, পড়ে থাকে রক্তহীন বিকলাঙ্গ হঠাৎ থেমে যাওয়া কিছু কথা। শীর্ষেন্দু তাঁর উপন্যাস শেষ করেন এই ভাবে : "দুলু, আমরা উদ্ভিদের হাতে পৃথিবীকে ছেড়ে দেব না। ......কীটপতঙ্গের হাতেও না। (শীর্ষেন্দু কি সার্ত্রের 'আলতোনা'র কথা ভাবছিলেন ?)...দুলু, আমাকে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। আমি ছাড়া আর কে করবে।" গভীর আত্মবিশ্বাস সন্দেহ নেই, কিন্তু বিপ্লবের জন্য নিজেকে অপরিহার্য ভাবাটা কি কোনো বিপ্লবীর লক্ষণ, না এ আসলে প্লাতোর সূত্র ধরেই আসে ? The punishment that the wise and good men of a country who decline to take interest in the affairs of their country must suffer—is to be gladly ruled by the rest, viz., fools and knaves. কথাগুলি বিমল মিত্রের উপন্যাসে তিনবার উদ্ধৃত হয়েছে। নিজেকে ছাড়া আর সকলকে মূর্খ ও বদমাস ভাবাটা, দেখা যাচ্ছে বিমল মিত্র ও শীর্ষেন্দু—দুজনেরই খুব পছন্দ।

বিমল মিত্র তাঁর গল্প বলেন খুবই সহজ ভঙ্গিতে, প্রায় কথকঠাকুরের

কায়দায়। "তা প্রভা একদিন এল এই বারো নম্বর নস্করবাগান লেনে।"—প্রথম "তা" শব্দটি তার সেরা নমুনা। কবিতার ক্ষেত্রে যতই 'আভাঁ-গার্দ' হন, গল্প বলার সময় সুনীল কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নেই, তাঁর ভাষা রীতি অবিকল বিমল- মিত্রের মতো : ছোটো ছোটো সরল বাক্য, বহু ব্যবহারে রঙচটা কিছু উপমা ও রূপক, মেয়েলি কথা ও ব্যবহারের খুঁটিনাটি। বাড়তি ভঙ্গিটুকু চলচ্চিত্রের : "এই দৃশ্যটিতে এবার শব্দ ও সংলাপ যোজনা করা যাক্।" শীর্ষেন্দু 'আমি'র আঙ্গিকে লেখেন, নায়কের ছোটোবেলা থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত কাহিনীর বিস্তার—কিন্তু ভাষারীতি কৃত্রিম, অতি-অলংকৃত। রাজনৈতিক জগৎ সম্পর্কে শীর্ষেন্দুর বোধহয় কোনো অভিজ্ঞতাই নেই, এ জগতের কথাবার্তার যে বিশেষ ভঙ্গি ও বিশেষ শব্দ আছে তাও তাঁর জানা নেই। ঝড়ে গাছ পড়ার মতো লাশ পড়ছে সশব্দে—এ-রকম চমকপ্রদ উপমা আছে, কিন্তু 'জার্গন' নেই। 'বন্ধু' আছে, 'কমরেড' নেই। পার্টি-অফিসে আড্ডা আছে, ব্রাঞ্চ-মিটিং নেই, এমনকি আড্ডার বিষয় সম্পর্কেও কোনো ইঙ্গিত নেই। বরেন গঙ্গোপাধ্যায় কোনো ইতিবাচক বক্তব্যও রাখতে পারেন না, সাসপেন্সও তাঁর আয়ত্তের বাইরে। কেরানী জীবনের কিছু অপশব্দ, চায়ের দোকানের অশ্লীলতা-ঘেঁষা ইয়ার্কি—এ-ই তাঁর একমাত্র পুঁজি।[১] ভয়, মৃত্যুভয়—চারটি রাজনৈতিক কাহিনীর এই একটিই উপজীব্য। শীর্ষেন্দু ও বরেনের কাহিনীতে তো এটি প্রায় ধুয়ার মতো ঘুরে ঘুরে আসে।

গত দশ বছরে সমরেশ বসু তিন ধরনের কাহিনী লিখেছেন—বাংলা চলচ্চিত্রের ফর্মুলা মাফিক ভালোবাসার গল্প, যৌনতাকেন্দ্রিক গল্প এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার গল্প। দ্বিতীয় ধরনের গল্পেও অবশ্য রাজনৈতিক প্রসঙ্গ থাকেই। অভিজ্ঞতার পরিধি, গদ্যরীতির উৎকর্ষ, বর্ণনাভঙ্গির গুণ, চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা—বলা বাহুল্য সব ব্যাপারেই সমরেশ বসু আগের চারজনের চেয়ে অনেক

১ এর আরও ক্লাসিক উদাহরণ অবশ্য গৌরকিশোর ঘোষ ('গড়িয়াহাট ব্রিজের উপর থেকে দুজনে') ও সন্তোষকুমার ঘোষ ('সময়, আমার সময়')। প্রথমজনের নায়ক এক পার্টিকর্মীর বিয়েতে গিয়ে তাকে "বন্দুকের নল থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসা"র একটি যৌনাত্মক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা দেয়, দ্বিতীয় জন তাঁর বেশ্যাসক্ত ফেরারী নায়ককে মহাভারতের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য 'শোধনবাদী' অভিযোগে অভিযুক্ত অবস্থায় দেখান। ইয়ার্কি, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের মতো "প্রতিভাশালী মহাত্মার ইয়ার্কি" (বঙ্কিমচন্দ্র) নয়। বরং বলা যায়, শিং ভেঙে বাছুরের দলে ভেড়ার চেষ্টা।

দক্ষ। ৬৭-পরবর্তী রাজনীতি তাঁর অনেক উপন্যাসের পরিধি ছুঁয়ে থাকে, কিন্তু কেন্দ্রবিন্দু হয় না। দু-চারটে ছোটোগল্পে বরং মূল বিষয় (থীম) হয় (যেমন, 'শহীদের মা')। অন্তত্র, প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী দলগুলি সম্পর্কে কিছুটা বিরাগ ও অবিশ্বাস ('বিশ্বাস'), কৃষিবিপ্লবী ছেলেদের সম্পর্কে (যেহেতু বেকার) সহানুভূতি ('মানুষই শক্তির উৎস') —আবছা ভাবে এই রকম মতই প্রকাশ পায়।

কমিউনিস্ট আন্দোলন নিয়ে সমরেশ বসু আগেও অনেক গল্প লিখেছেন, কিন্তু সে প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার ঘটনা নিয়ে। ৬৯ সালে লেখা হয়েছিল 'মানুষ' (তখনও খুনোখুনি ও শরিকী সংঘর্ষ সর্বব্যাপক হয় নি), কিন্তু তার ঘটনাকালও ১৯৫১। তারপর সমরেশ আরও পিছিয়েছেন। প্রকাশমান 'যুগ যুগ জীয়ে'তে আসছে ৪২-এর ঘটনাবলী—এখনও তাতে যৌনতা ও রাজনীতি সমান মাপে ভাগ করা।

কিন্তু ৬৭-পরবর্তী ওলটপালট নিয়ে সমরেশ কোনো বড়োগল্প বা উপন্যাস লেখেন নি। তিনি যেন এই বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে রাজি নন। 'মানুষ' পড়লে বোঝা যায়, সমরেশ কত টিপিক্যাল চরিত্র তৈরি করতে পারেন। সুনীল-শীর্ষেন্দুর মতো ব্যক্তিপূজারীর রামরাজ্যবিলাস তাঁর নেই, তাঁর চরিত্র দাঁত ঘষে বলতে পারে : "পার্টি আপনাকে তাড়াবে, আজ না হোক কাল, নিশ্চয়ই তাড়াবে, সে যোগ্যতা পার্টি একদিন অর্জন করবেই, আপনাদের দখলেই চিরদিন থাকবে না, থাকতে পারে না। শ্রেণী হিসেবে পরগাছা তো বটেই, তাও আবার নেতৃত্বে আছেন। কেন জানেন ? সেই কথাটা মনে করুন, "নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে ?" যে-শ্রেণীর নেতৃত্বের কথা বলা হয়, পার্টি এখনও সেই শ্রেণীর নেতৃত্বের নাগালের বাইরে, তাই বুকনির মধ্যে খাসা চাল দেখাচ্ছেন।" সৎ সমালোচনা। সুনীলের কাহিনীতে বাবা যেমন "মহৎ আদর্শের বিকৃতিতে…মুষড়ে" পড়েন, ফতোয়া দেন, "শত্রুকে হত্যা করেও যে দুঃখিত হয় না, কোনো মহৎ আদর্শের অধিকার নেই তার", অথবা শীর্ষেন্দুর নায়ক যেমন আত্মসমালোচনা করে, "সারা জীবন মিছিল-মিটিং করা ছাড়া লোক-শিক্ষার জন্য আমরা তো আর তেমন কিছু করি নি। সত্যিকারের কর্মঠলোকের ন্যায্য দাবি উপেক্ষিত হয় না" (লোকের কাছ থেকে শিক্ষা নেবো না, লোক-শিক্ষা দেবো আমি—এই আত্মম্ভরিতা তো মধ্যবিত্ত চরিত্রের প্রথম দোষ)—সে-রকম কোনো ভাববিলাস 'মানুষ'-এ নেই। একটা বাড়তি চরিত্র পাওয়া যাবে না (যেমন বরেনের উপন্যাসে ভূরি ভূরি), সাসপেন্স বজায় রাখার দক্ষতাও

নিপুণ, কাহিনী শেস হয় অপ্রত্যাশিত ভাবে—ভবেশ কাঁদতে থাকে, তার হীনতা-ভাব স্বীকার করে। যদিও সে একাধিক মৃত্যুর জন্য সরাসরি দায়ী, তবু শ্রমিক কমরেডরা তাকে ক্ষমা করে, সে এতদিনে মানুষ হয়েছে—তার জন্য। 'শহীদের মা'তেও সমরেশ অত্যন্ত ছোটো পরিসরে এই ক্ষমতা দেখিয়েছেন : নিপুণ মিতব্যয়ী বর্ণনা, সংহত ক্রোধ, অসহায়ত্ব নয়, বাস্তব কাঠিন্য।

সমরেশের একটা দাঁড়ানোর জায়গা আছে—উদার মানবিকতা। তাঁর সঙ্গে মতে না-মিলতে পারে, ব্যাপারটা খানিক জোলো বা কৃত্রিমও মনে হতে পারে, কিন্তু এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে 'মানুষ' কাহিনীটি পূর্ণতা পায়, চরিত্রগুলোকে তিনটি মাত্রায় দেখা যায়। আলোচ্য লেখকদের মধ্যে একমাত্র সমরেশ বসুই জানেন, গার্হস্থ্য উপন্যাসের চলতি ছকের মধ্যে রাজনীতির প্রসঙ্গটুকু ঢুকিয়ে দিলেই রাজনৈতিক কাহিনী হয় না। এর জন্য একটি আলাদা পরিপ্রেক্ষিত লাগে, চরিত্রগুলিকে তাদের রোজকার সাংসারিক জীবন থেকে খানিকটা সরিয়ে দেখতে হয়। এবং লেখককে অবশ্যই একটি দিক বেছে নিতে হয়, 'নাইভ' কায়দায় ঘটনার বর্ণনাই যথেষ্ট নয়, তার মূল্যায়ন ও বিচার করতে হয়। সুনীল তাঁর কাহিনীর নাম দিয়েছেন 'কেন্দ্রবিন্দু', কিন্তু তার কোথাও বৃত্তের পূর্ণতা নেই, কাঠামোটি বরং অধিবৃত্তের মতো। শীর্ষেন্দুর নায়ক প্রৌঢ় অবস্থায় তার অতীতের সমস্ত আশাভঙ্গের পট খুলে চলে, পেছনের সব কিছুকেই মনে হয় ব্যর্থ তাৎপর্য-হীন। 'বিল্ডুংসরোমান'-এ জীবনের বিভিন্ন পর্বকে সেই সেই বয়সের দৃষ্টিতে দেখানো হয়,চরিত্রের বড়-হওয়ার ধারাটি এতে ফুটে ওঠে। শীর্ষেন্দু এরই প্যারডি করেন। ক্রিটিক্যাল বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ না-থাকলে কাঠামোও নড়বড়ে হয়ে যায়। তুলনায় 'মানুষ'-এর আখ্যান কত কঠিন, আঁটোসাঁটো।

তবু সমরেশ হাল আমলের বাস্তবতাকে ধরবার কোনো চেষ্টাই করেন না। কেন? দস্তয়েভস্কির 'ইডিয়ট' সমরেশের প্রিয় উপন্যাস, তিনি এর একটি রূপান্তরও করেছেন ('অপরিচিত')। এই রকম একটি চরিত্রকে দিয়ে ক্ষমতাশালী আমলাতন্ত্রের উচ্চবিত্ত জগৎকে তিনি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ('অশ্লীল')। কিন্তু একে ভাঙতে হবে না রাখতে হবে—এ ব্যাপারে তিনি নিরপেক্ষ, কাহিনীকে অন্যদিকে মোচড় দিতেই যেন ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অর্থাৎ ক্রিটিক্যাল বাস্তবতার লেখক এখন 'নাইভ' হবার চেষ্টা করছেন (সম্পূর্ণ 'নাইভ' ভঙ্গিতে বাস্তবতার পুরো চেহারাকে বর্ণনা করাও অবশ্য সুনীল-শীর্ষেন্দু-বরেনের সাধ্যাতীত)। সন্দেহ হয়, এর জন্যই 'ইডিয়ট'-টাইপের ব্যবহার। সমরেশ বসু

হয়তো সিনক্লেয়র লিউইস হতে পারতেন, কিন্তু তিনি মডেল করেছেন আলবের্তো মোরাভিয়াও নয়, হ্যারল্ড রবিন্সকে। অন্য চারজন সব ব্যাপারেই নিঃস্ব, রূপদর্শী ও বরুণ সেনগুপ্তের 'রাজনৈতিক' ভাষ্যই তাঁদের একমাত্র অবলম্বন।

গত ছ-বছরে বাঙালি সমাজে এত ওলটপালট হৈহট্টগোল ভাঙচুর রক্তারক্তি হয়ে গেল, অর্থনৈতিক নৈরাজ্য চরমে উঠেছে, বামপন্থার রমরমা চুপসে গিয়ে জাতীয়তাবাদের উগ্র উত্থান সম্ভব হল—বাংলা কথাসাহিত্যে এই বাস্তবতার যথাযথ প্রতিফলন নেই কেন? শুধু বাণিজ্যিক লেখায় নয়, তথাকথিত প্রতিষ্ঠানবিরোধী লেখাতেও এর খণ্ডাংশের পেন্সিল-স্কেচ ছাড়া আর কিছুই মেলে না। প্রতিষ্ঠানবিরোধী লেখকদের (সদর্থেই বলছি) বেশির ভাগই লিখতে জানেন না, পারেনও না। যে দু-চারজন পারেন তাঁরা এতদিন অন্তর এত অল্প লেখেন (তা-ও ছোটোগল্প) যে তাঁদের কাছ থেকে এই সামগ্রিক উত্থান-পতনের মহাকাব্য আশা করা যাচ্ছে না। হয়তো পরে লেখা হবে; এখন, এত অল্প দূরত্বে, ঘটনার স্মৃতি যখন দগদগে, তখন এ-নিয়ে লেখারও হয়তো কিছু সমস্যা সংকট আছে। কিন্তু যাঁরা স্মৃতিবিস্মৃতির পরোয়া না-করে শুধুই লিখে চলেন, সেই সব লেখক—বিমল মিত্র, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়—এত ছোটো, মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্য উপন্যাসের গণ্ডীর মধ্যে এই বাস্তবতাকে দেখাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন কেন?

শুধু ক্ষমতার অভাব বা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি না-থাকার দরুণই এই করুণ অবস্থা—এ-কথা মনে করলে ভুল হবে। এর একটি অনতিগূঢ় কারণ আছে।

প্রায় একশো বছর আগে (৩০ চৈত্র, ১২৮৭) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন, "যতদিন সাহিত্যব্যবসায় প্রথম হইতেই ইহা (সরকারী চাকরি) অপেক্ষা অধিক লাভ না-দেখাইতে পারে, ততদিন শিক্ষিত লোক সাহিত্যব্যবসায়ে সর্বপ্রযত্নে পরিশ্রম করিতে চাহিবে না···সাহিত্য জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে ও জন্মিবে, কিন্তু যতদিন সাহিত্য ব্যবসায় না হইবে, profession না হইবে, ততদিন সাহিত্যের বদ্ধমূলতা হওয়া অসম্ভব।" হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভেবেছিলেন, শুধু বিচক্ষণ ক্রেতা ও পাঠক এবং গ্রন্থাগার বাড়লেই সাহিত্য একটি পেশা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু পাঠক ও লেখকের মধ্যে এক বা একাধিক পত্রিকাগোষ্ঠী যে ফড়ে বা মিডলম্যানের ভূমিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, ফরমাশ জারি করবে—এটা বোধহয় তিনি হিসেবে আনেন নি। লেখক, সমালোচক এবং পত্রিকা

সম্পাদক (ও স্বত্বাধিকারী) হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র বলতে পারতেন, "আমি বহুদিন অনেক চেষ্টাচরিত্র করিয়া দেশের রুচি একটু ফিরাইয়া আনিতেছি।" শুধু লেখক হিসেবেই রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীকে বলতে পেরেছিলেন, "আজ যে এমন সহজে মনকে সাহিত্যের রসে, আনন্দে সিক্ত করতে পারছ, সেজন্য একটু আধটু ধন্যবাদ দিও কন্সে, আমারও কিছু পাওনা আছে।" পত্রপত্রিকাকে তাঁরা অচেতন মাধ্যম বলেই মনে করতেন, সে যে এমন জীবন্ত ও নির্দয় মধ্যস্থ হতে পারে—এ তাঁদের অভিজ্ঞতায় ছিল না।

কিন্তু ৬২ সালের পর থেকে একটি দৈনিক ও তার সঙ্গে যুক্ত একটি চল্লিশ (বর্তমানে ষাট) পয়সার সাপ্তাহিক যেভাবে একচেটিয়া ফড়ের ভূমিকা নিয়ে বসেছে, তাতে লেখক আর ও-সব কোনো কথাই বলতে পারেন না। ৬২ সালে 'শিল্পীর স্বাধীনতা' বলতে বোঝানো হয়েছিল কমিউনিজম-বিরোধিতা, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব প্রতিষ্ঠিত লেখক সেই স্বাধীনতার জয়গান করেছিলেন। তার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, এখন সগর্বে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, এই এই লেখকরা আমাদের কাগজ ছাড়া আর কোথাও উপন্যাস লিখছেন না। বেচারা লেখক ! যে-সব গল্পকে অনায়াসে উপন্যাস বলে চালানো যেত, অন্য জায়গায় সেগুলো বড়োগল্প বলে ছাপাতে হয় বা ছদ্মনামের সুযোগ নিতে হয়। ৬২ থেকে ৭৩—এগারো বছরে এই দাস্য সম্পর্কটা ভালোই তৈরি করা গেছে।

সাহিত্য যাঁর পেশা, বা বেশিসংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছনোই যাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য, তিনি যে সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকার মনমতো লিখবেন এ তো স্বতঃসিদ্ধ। অন্তত, জানত তার মতামতের বিরোধিতা করবেন না, বিরোধের সম্ভাবনা কম—এমন 'নিরপেক্ষ' বিষয় নিয়ে লিখবেন, বড়জোর একটু ঈশপীয় ভাষার আশ্রয় নেবেন। বেশি কথা বলে লাভ নেই, প্রার্থিত লেখাও পছন্দ না-হলে, বা বিজ্ঞাপন ছাপার ফলে জায়গায় না-কুলোলে, ছাপা হবে না। একচেটিয়া ফড়ের পছন্দের নিরিখ দুটি—ব্যবসায়ে লাভ ও স্থিতাবস্থাপন্থী রাজনীতি। প্রথমটির জন্য দ্বিতীয়টি দরকার মতো একটু কম গুরুত্ব পেতে পারে, কিন্তু যে-রাজনীতি সুদূর ভবিষ্যতেও স্বাধীন পত্রিকাব্যবসার (অর্থাৎ প্রচুর বিজ্ঞাপন পাওয়ার) ক্ষতি করতে পারে—তার কোনো স্থান হতে পারে না।

বাণিজ্যিক লেখক সাধারণ পাঠকের মুখ চেয়ে লেখেন, পাঠক হালকা সেন্টিমেণ্টাল গল্প পছন্দ করে, কোনো জটিলতা বা কচকচি চায় না—এটাও ভুল কথা। সাধারণ পাঠক শেষ পর্যন্ত তা-ই চায়, যা তাকে দিয়ে চাওয়ানো হয়। এককালে

যারা সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরোধী ছিল, তারাই এখন 'নব্যরীতি' ও 'ভিন্নস্বাদ'-এর বিজ্ঞাপনদাতা ; সাহিত্যের শ্লীলতা ও সুনীতি রক্ষায় যারা প্রচণ্ড আগ্রহী ছিল, তারাই এখন যে-কোনো আকারে যৌনতার ঘোর সমর্থক। অস্কার ওয়াইল্ডের অভিযোক্তারাই এখন অস্কার ওয়াইল্ড থেকে উদ্ধৃতি দেয়। ভালো-মন্দ বিচার করতে শেখার দরকার নেই, আজ এই নতুন লেখকের নতুন ধরনের লেখা ছাখো, কাল আরেক নতুন (এবং তরুণ) লেখকের আরেক নতুন ধরনের লেখা দেখাব—এই তো হালের বুর্জোয়া শিল্পদর্শন। পশ্চিম ইয়োরোপে যেমন, ভারতেও তাই।

'যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের যুগে শিল্পকর্ম' প্রবন্ধে ভাল্তের বেনিয়ামিন চলচ্চিত্র-শিল্পীর যে-অনন্বয়ের কথা বলেছিলেন—দর্শকের সঙ্গে সরাসরি যোগ হারিয়ে ক্যামেরার মধ্যস্থতা স্বীকার করা—সে-অনন্বয় এখন বাঙালি লেখকদেরও গ্রাস করেছে। লেখক ও পাঠকের পক্ষে যেখানে ফড়ে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রধানত একটি ত্রিশ পয়সার দৈনিক ও ষাট পয়সার সাপ্তাহিক (অন্য বাণিজ্যিক কাগজ-গুলির সঙ্গে ঘুঁটে পর্যন্ত এক উনুনে পুড়তে রাজি হয় না), যাতে বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ ও রাশিফল, সর্পচিকিৎসার নতুন কৌশল ও ওঝার অলৌকিক কৃতিত্ব—দুই-ই সমান গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়, সেখানে কথাসাহিত্যের এই বট্‌লনেক ভাঙতে অন্তত কয়েকজন শক্তিশালী ঔপন্যাসিক (ছোটোগল্পকার নন) দরকার, যাঁরা এই গার্হস্থ্য ঔপন্যাসের ছক ভেঙে সমসাময়িক বাস্তবতাকে ক্রিটিক্যাল দৃষ্টিতে হাজির করতে পারবেন।

সে-রকম কোনো লক্ষণ এখনও চোখে পড়ছে না। ফলে, নিকট ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব আশাবাদী হবার কোনো কারণ নেই।

কথাসাহিত্যের নতুন সংজ্ঞা

দেবেশ রায়

আমাদের এই সাহিত্যের সমালোচনায় এমন ঘটনাও ঘটে যে ১৩৫৫ বাঙলা সনে, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে, 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকায় কমলকুমার মজুমদারের দ্বিতীয় গল্প 'জল' বেরলে ঐ পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৫৮ বাঙলা সনে, ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে, 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় 'বাংলা গদ্যে চিত্র' নামে ঐ গল্পের একটি আলোচনা করেন। (ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, পৌষ-চৈত্র ১৩৭৪ সনে 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়)

মাত্র একটি ছোটগল্পকে আলোচনার প্রধান বিষয় হিসেবে বেছে নিয়ে সেদিন চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙলা সমালোচনার নতুন একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন, তাই নয়, তাঁর প্রধান অবদান, কমলকুমার মজুমদারের প্রথম গল্প 'লালজুতো' (১৩৪৪) প্রকাশিত হওয়ার ছত্রিশ বৎসর পর আজ এ কথা নিশ্চিত বলা যায়, স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ লেখক ও এই পর্বের বাঙলা কথাসাহিত্যের সবচেয়ে প্রভাববিস্তারী গদ্যভঙ্গিকে সেই ১৯৫১ সনেই তিনি চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন।

পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসর ধরে মাত্র এগারটি গল্প * লিখে রেখেছেন, 'সুবর্ণরেখা' প্রকাশিত এই 'গল্পসংগ্রহ'র বাইরে মাত্র গুটিকয় নভেলেট পত্রিকার পাতায় ছড়িয়ে থাকে—'গোলাপসুন্দরী,' 'সুহাসিনীর পমেটম,' 'কঙ্কাল এলইজি' 'পিঞ্জরে বসিয়া সুখ,' 'শ্যামনৌকা'—বোধহয় এতেই তালিকা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যায়, খুব নির্দিষ্ট লেখক-পাঠক সমাজে নিজের সম্পর্কে নানা উপকথার জন্ম দিয়েছেন, কিন্তু পাঠক তৈরি করেছেন আরো কম, প্রায় করেন-ই নি, চর্চিত সাহিত্যপ্রকরণে একের পর এক পাঠককে দূরে ঠেলে দিয়েছেন, তাঁর মৌলিকতা অপ্রমাণ করতে সেই আদিকাল থেকেই তাঁর বাক্যগঠনে ফরাসী প্রকরণের প্রমাণ খুঁজে যাওয়া হয়, তাঁর সম্পূর্ণ স্বকীয়তায় অনভ্যস্ত ও তাঁর সাহিত্যের

---

* গল্পসংগ্রহ। কমলকুমার মজুমদার। সুবর্ণরেখা, কলকাতা। দশ টাকা

অস্বিষ্টের বৈপরীত্যে বিব্রত পুঁথিঘেঁষা মার্কসবাদী সমালোচকগণ তাঁর সম্পর্কে বিচ্ছিন্নতাবাদের নীরব অভিযোগ রেখে যেতে চান আর পুঁথিঘেঁষা পণ্ডিত-সমালোচকগণ তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত থেকেও পণ্ডিত ও সমালোচক থেকে যেতে পারেন, পরীক্ষামূলক লেখকের এক আকারহীন সংজ্ঞায় তাঁকে ব্যাখ্যা করার প্রাতিষ্ঠানিক চেষ্টা কখনোসখনো হয়েছে—এত পারিবেশিক বৈপরীত্য ও চারিত্রিক স্ববিরোধিতা নিয়েও কমলকুমার মজুমদার বাংলা কথাসাহিত্যের এমন দুর্দম প্রাণদ শক্তি যে তাঁর যে কোনো রচনাসম্পর্কিত আলোচনা কথা-সাহিত্যের ফর্ম ও ভাষা, লেখকের সংযোজনসমস্যা (কমিউনিকেশন), কথা-সাহিত্যের বিষয় ইত্যাদি বিষয়ক কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে।

বাংলা কথাসাহিত্যে এই একজন লেখক যাঁর কোনো লেখার বিচার সাহিত্যের মূল প্রশ্নের সঙ্গে অন্বিত না করে করাই সম্ভব নয়, কারণ তাঁর ফর্মটাই এমন, যেখানে একটি কমাচিহ্ন বা একটি সংযোজক অব্যয় ('বা') ব্যবহারের পেছনেও তাঁর লেখক হিসেবে সম্পূর্ণ উপস্থিতি কাজ করছে। লেখকব্যক্তিত্বের এমন সমগ্ররচনাময় সর্বব্যাপী উপস্থিতি বাংলা কথাসাহিত্যে তো নেই-ই, কোনো বিদেশী তুলনাও মনে আসে না।

নিজের লেখকব্যক্তিত্বের সন্ধানেও কমলকুমার মজুমদারকে এই বিশিষ্ট ভাষারীতি গ্রহণ করতে হয়েছে। তাঁর গল্পসংগ্রহের এগারটি গল্পের প্রকাশকালের হিসেব দাঁড়ায় ৫১ সাল পর্যন্ত চারটি, ৫৭ থেকে ৬০-এর ভেতর পাঁচটি, ৬৭ থেকে ৭২-এর ভেতর দুটি। তাঁর লেখার খবরাখবর যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন ৬৫ সাল পর্যন্ত সময়েই তিনি সবচেয়ে সক্রিয়। সময়ের এই হিসেব থেকে এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাধীনতা-উত্তর পর্বের ঠিক মধ্যবিন্দুটিতে তিনি সবচেয়ে সক্রিয় থেকেছেন। আর এই সময়ের ভেতর জাতীয় আন্দোলনের চারিত্র আমরা একে একে হারিয়েছি, তৈরি হয়েছে আমাদের স্বাধীনতাপরবর্তী সেই সমাজ যার পক্ষে সমস্ত অভ্যস্ত পূজাবিধিই লুপ্ত, নতুন পূজাবিধি অনুপস্থিত, নিজেদের গড়া পিঞ্জরে এক পাখিসম অস্তিত্বের বন্ধন। এই পর্ব জুড়ে বাংলা সৃজনশীল গদ্য দ্রুত বর্ধমান পাঠকের দ্রুত পরিবর্তমান রুচির তাগিদে খবরের কাগজের পাতায় পাতায় অতি-ব্যবহারে অতি-ব্যবহারে শিথিলগঠন। এই পর্ব জুড়ে বাংলা উপন্যাসের দ্রুতবর্ধমান পাঠকের তাগিদে সৃজনশীল গদ্য ধর্মীয়-রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক রোমান্সের পাতায় পাতায় অতি-ব্যবহারে অতি-ব্যবহারে জুলজুলে, ভারবহনক্ষমতাশূন্য, ল্যাদলেদে। এই পর্ব জুড়ে দ্রুতবর্ধমান পাঠকের

কাছে সিনেমা পত্রিকার চাহিদা বেড়ে ওঠে। আর এই সব মিলিয়ে ভাবনা, চিন্তা, প্রসঙ্গ, অনুষঙ্গ, আবেগের মূর্তি দেয়ার জন্য একদিকে সংবাদ-সাময়িক-পত্রে আর-একদিকে গল্প-উপন্যাসে যে সৃজনশীল গদ্যভাষার জন্ম সম্ভব ছিল—সরকারী বেসরকারী বৈষয়িক কাজকর্মে বা শিক্ষাদীক্ষায় বাঙলাভাষার মাধ্যম অস্বীকৃত থাকায় তা সম্ভব হল না ও তার পরিবর্তে বাঙলা গদ্য হয়ে উঠল দৈনন্দিন কাজ-কর্মের প্রয়োজনের বাইরে, চিন্তা ভাবনা আবেগের প্রয়োজনের বাইরে, নেহাতই কতকগুলি অপেক্ষাকৃত ইতর প্রয়োজন মেটাবার মাধ্যম মাত্র। এই অবস্থায় একজন ভাষাশিল্পী তাঁর শিল্পের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে নিজের জন্য এমন একটা প্রকরণ বেছে নিতে পারেন, যে প্রকরণের সঙ্গে ঐ ভিড়ের ভাষা বা ভাষার ভিড়ের একটা শারীরিক বিচ্ছিন্নতা থেকে যায়। কমলকুমার মজুমদার সেই কাজটি করেছেন।

প্রকরণ নির্বাচনের এমন পদ্ধতিকে কি বিচ্ছিন্নতাবাদিতা বলা যাবে না? এতে কি সাহিত্যকে মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় না? এটা কি কলাকৈবল্যের বা ফর্মকৈবল্যের ব্যাপার হয়ে যায় না? কোনো কোনো শুদ্ধশিল্পরসিক এই বিচ্ছিন্নতার জন্যই যেমন কমলকুমার মজুমদারকে স্বীকার করেন ও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের চাইতে তাঁর সাহিত্যচর্চাপদ্ধতিকে নিয়ে নানা কথাকাহিনী রটান, তেমনি কোনো কোনো গোঁড়া মার্কসবাদী সমালোচকও তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ফর্মকৈবল্যের লেখক মনে করেন। আসলে, এই দুই সম্প্রদায়ের সমালোচকই হেগেলীয় অপরিবর্তনীয় ধারণাতত্ত্বের (কেটিগরি) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মার্কসবাদ কোনো ধারণার সর্বকালীন সত্যে বিশ্বাস করে না। ধারণার সর্ব-কালীনতা হেগেলীয় ও তৎপূর্ব দর্শনের ভিত্তি। ভাষায় বিচ্ছিন্নতার সাধনা কখনো কখনো, ভাষাসাহিত্যের ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে, নতুন বৈপ্লবিক উপাদানের জন্ম দেয়, জন্ম দিতে পারে।

কমলকুমার মজুমদারের ভাষা বাঙলা গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেই নতুন বৈপ্লবিক উপাদানের জন্ম দিয়েছে। ১৯৫১ সনে চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় যাকে বলেছিলেন বাঙলা গদ্যে চিত্ররচনা, সেই উপাদানই ১৯৫৭ সনের পর নতুন পরি-প্রেক্ষিতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ও আরো নতুন উপকরণের সমন্বয়ে বাঙলা গদ্যের এমন এক নতুন প্রয়োগ হয়ে উঠেছে, যার দ্বারা বাঙলা গল্প-উপন্যাস তার চৌহদ্দির ভেতর নতুন বিষয়কে টেনে আনতে পারে। বাইরের বিচারে কখনো কখনো মনে হতে পারে যে, এই নতুন বিষয়গুলি হয়তো এতোদিন অনুভূতিপ্রধান কবিতার

ভাষায় কখনো কখনো মূর্তি পেত, কমলকুমার মজুমদার সেগুলিকে গদ্যে আনলেন।

"কঠিন জ্যামিতিক চিহ্নের মধ্যে এত বেদনা অটুট হয়ে থাকে কে জেনেছিল।" (মতিলাল পাদরী)

"চন্দ্র সূর্য তারকা নেই ; শুধু প্রসিদ্ধ রক্তের জোয়ারের উত্তাল অলৌকিক শব্দ।" (ঐ)

"কোথাকার একটা পাশবিক জঙ্গল চলতে চলতে এসে তাঁর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। ক্লান্তি তাঁর নেই, আজকের পৃথিবী সেটুকু অপহরণ করেছে, দূরের পাপিয়ার ডাক তাঁকে ফেরাতে পারে নি যেখানে সৃষ্টির শেষ মাধুর্য ছিল।" (ঐ)

"জ্যোতি পুত্রমাত্র, যার মধ্যে স্বপ্নের রঙ আর ক্ষয়িষ্ণুতা দুই দুমড়াবে, সে এতাবৎ সন্তানমাত্র—খাদ্যই। আপনকারি উষ্ণতা দিয়ে যে সমস্ত সমতা এনেছে, আজ হঠাৎ সে একাই বড় নিঃসঙ্গ। তার অন্তরে অর্গলহীন দরজা ঝোড়ো হাওয়ায় আছাড় খায় !" (তাহাদের কথা)

" 'চাকু মারা' কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে একটি নশ্বর চীৎকার দুস্তর অন্ধকার যেন বা অতিক্রম করে এল। গীতের মধ্যে অবশ্য চকমিলান যে-সরলতা ছিল, যে-মায়া বর্তমান, তাই করতার সিং গাইতে চেষ্টা করছিল।" (ফৌজ-ই-বন্দুক)

"যূথীর পালাবার কোনো পথই ছিল না। ভয়ে, বিশেষত যন্ত্রণায় এবং কিয়ৎ-পরিমাণে লজ্জায় তার আনন পিঙ্গল, চক্ষুদ্বয় জলে কালো, মুখখানি পার্শ্ববর্তী শূন্যতায় আটকে জমে আড়ষ্ট এমত মনে হয়, আর যে, সে বিবিধ সুকৌশল ভঙ্গী সহকারে তা খুলে আনবার প্রাণান্ত চেষ্টা করে এবং ঠিক এই সময় ডান-হাতের আঙুলটি চেপে ধরবার উচিতবুদ্ধি তার হয়েছিল, এতে করে গায়ের জামাটি, খুব আশ্চর্য যে, মাত্র একপাশেই খুলে পড়েছিল। এবং যন্ত্রণায় আর একবার সে চীৎকার করেছিল ! এই হৃদয়বিদারক শব্দে পরিচ্ছন্ন, শুভ্র, লক্ষ্মী-শ্রীযুক্ত বাড়িখানি বিড়ালের চোখের মত বড় হয়ে গিয়েছিল এবং তন্নিমিত্ত এ গৃহস্থিত চিনিপাতা জীবন মুহূর্তকালের জন্য পাশার অক্ষের মত নিষ্পেষিত শব্দ করে উঠে।" (নিম অন্নপূর্ণা)

এগারটি গল্পের কতকগুলি থেকে খানিকটা এলোমেলো বেছে নেয়া এই উদ্ধৃতিগুলির কখনো কাব্যানুষঙ্গিক পদবিন্যাস সত্ত্বেও আসলে এই অংশগুলি ও এর সমতুল বিভিন্ন গল্পের বিভিন্ন অংশ গল্পের প্রসঙ্গের সূত্রে আহৃত প্রসঙ্গান্তরের

সুযোগ নেয়, প্রি-র‍্যাফায়েলটীয় সূক্ষ্মতায় সেই প্রসঙ্গান্তর প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে ও গল্পের মূল বিষয়টি প্রায়শই অন্তরিত প্রসঙ্গের অন্বয়ে তির্যক তাৎপর্য পেয়ে যেতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটে আমাদের অনুভূতির সম্প্রসারণ।

কমলকুমার মজুমদারের ভাষা-প্রকরণ এই ভাবে আমাদের অনুভূতির সম্প্রসারণ ঘটানোর ফলে বাঙলা গল্পের বিস্তারক্ষমতা বহুগুণে বেড়েছে—ঠিক তখনই, যখন জনমাধ্যমের ক্রমবর্ধমান চাহিদায় বাঙলা গল্পের বিস্তারক্ষমতা হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। প্রক্রিয়াটি এই মতো : ব্যক্তিমানুষের আশাআকাংক্ষা হতাশা ও সামাজিক মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়াসের **বৃহত্তর** পরিপ্রেক্ষিত থেকে বাঙলা গল্পসাহিত্য সমাজপরিবেশহীন ব্যক্তিত্বহীন চরিত্রের নেহাৎ **ক্ষুদ্রতর** পরিবেশে সংকীর্ণ হয়েছে। এই ক্ষুদ্রতর পরিবেশ থেকে কমলকুমার মজুমদার নিজস্ব প্রকরণের সাহায্যে নিজেকে **বিচ্ছিন্ন** করেছেন। এই বিচ্ছিন্নতাই তাঁকে **বিশিষ্ট** করেছে। এই বিশিষ্টতা তাঁকে জীবনের নানা মূলপ্রশ্নের সঙ্গে **অন্বিত** করেছে। ফলে এই অন্বয় তাঁকে সাম্প্রতিক বাঙলা গল্পসাহিত্যের সংকীর্ণতা থেকে জীবনের **বৃহত্তর** পরিধিতে মুক্তি দিয়েছে।

তাই কমলকুমার মজুমদারের ভাষা-প্রকরণের বিশিষ্টতার সাধনা সাহিত্যকে বিশিষ্ট মণ্ডল থেকে বের করে এনে বৃহত্তর বিষয়ের ভেতর মুক্তি দেয়। তাঁর ভাষার বিশিষ্টতা আসলে তাঁর বিষয়ের সর্বজনীনতাকে ধারণ করে।

আর, একজন ভাষাশিল্পীর পক্ষে এটা নিয়ত লড়াইয়ের ব্যাপার। ব্যাপক চাহিদার জনমাধ্যম বিষয়কে তার মূল থেকে ছিঁড়ে আনে, পরিপ্রেক্ষিতহীন ব্যক্তিগত করে তোলে, সমাজবাস্তবতার পরিচায়ক ঘটনা হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত কেচ্ছা, সমাজঅভিজ্ঞতার স্থান নেয় ব্যক্তিগত নানা রকমারি অভিজ্ঞতার নানা রসালো বিবরণ, সামাজিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত নানা যোগাযোগ, অথচ এতো সব বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত ভোগের জন্য তৈরি হয় সর্বজনবোধ্য ভাষা ও রীতি—ভাষা হয়ে ওঠে খবরের কাগুজি সর্বজনীন। কমলকুমার তাঁর বিশিষ্ট ভাষারীতিতে বিষয় হিসাবে বেছে নেন 'পূর্ণাঙ্গ ক্রিশ্চান' হওয়ার জন্য একজন আদিবাসী পাদরীর প্রয়াস, এক জোয়ানের হঠাৎ উত্তাল কামনাবাসনা, ক্ষুধা, জমি—ইত্যাদি সরল ও সনাতন প্রসঙ্গ। বিষয়ের দিক থেকে কমলকুমার মজুমদার অজটিল। প্রথম দিকের চারটি গল্পে অনুভূতি বা বাসনার কিছু কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছিল ('লাল জুতো,' 'জল', 'তেইশ', 'মল্লিকাবাহার')। কখনো যৌনসমস্যা আবার কখনো অনুভূতির সমস্যা তাঁর গল্পের বিষয় হয়ে

উঠেছিল। কিন্তু সেই তখনো, সেই ৫১ সালের আগের চারটি গল্পেও, সমাজের অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষজন তাঁদের জীবনযাত্রার সরলতা নিয়ে উপস্থিত ('জল,'-'তেইশ')। ৫৭ সালের পরবর্তী গল্পগুলিতে তো তিনি যেন কাহিনীর ও চরিত্রের ও চরিত্রগুলির ভেতরের সম্বন্ধের সরলতাকেই তাঁর লেখার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু এ সরলতা আসলে জটিলতা পরিহার করে অর্জিত নয়, জটিলতার ভেতর দিয়ে আয়ত্ত করা। তাই গল্পগুলির কোনো কোনোটিতে সূত্রাকারে অতীত ইতিহাস উল্লেখিত থাকে। 'তাহাদের কথা' ও 'রুক্মিনীকুমার' গল্পদুইটির কাঠামোর মূলটি প্রোথিত আছে বিদেশী পণ্যবর্জন আর সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের স্বদেশী পর্বে। 'তাহাদের কথা'র শিকল আর 'রুক্মিনীকুমার'-এর পিস্তল সেই মূল ইতিহাসের সঙ্গে গ্রথিত হওয়ায় নতুনতর তাৎপর্য পায়। কিন্তু লেখক হিসেবে কমলকুমার এই মূলের ইঙ্গিতমাত্র দেন বা উল্লেখমাত্র করেন, বিশেষ যত্ন নেন যাতে এগুলো ভিত্তি করে কোনো বিবরণ ঘটে না ওঠে। যেন সম্পূর্ণ আখ্যানটি তিনি মূলকাণ্ডশাখাপ্রশাখাপত্রপল্লবসমন্বিত গড়ে তুলেছিলেন, প্রায় ক্লাসিক সম্পূর্ণতায়, কোনো অঙ্গ বাদ না দিয়ে—তারপর সেই সম্পূর্ণ আখ্যানের একটিমাত্র অঙ্গকে রেখে বাকি অঙ্গগুলিকে মুছে দিতে থাকেন, মুছে দিতে থাকেন, প্রায় সব অঙ্গই অস্পষ্ট হয়ে যায়, কোনো কোনো অঙ্গ সম্পূর্ণ উপে যায়, কোনো কোনো অঙ্গ খুব অংশবিশেষে অস্পষ্ট থেকে যায়—বাকি অংশ নিঃশেষ আর মুছে দেয়ার দাগটা থেকেই যায়। স্ট্রিম অভ কনসাসনেসে বা ড্রামাটিক মনোলগে এই পদ্ধতির ব্যাখ্যা মেলে না কারণ এই পদ্ধতিতে প্রবাহ বা নাটক নেই। এই পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক চিত্রকলার সেই বিশেষ প্রকরণের মিল আছে, যে-প্রকরণে সরলরেখার ঋজুতা ও দার্ঢ্যলাভের ও বক্ররেখার লালিত্য পরিহারের উদ্দেশ্যে শিল্পী ত্রিভুজের জটিলতায় অবয়বসংস্থানের সৌষাম্য ভেঙে দেন। তাঁর বিশিষ্ট প্রকরণে কমলকুমার মজুমদারের পক্ষে সম্ভব হয়েছে ললিত বক্রতাহীন ঋজু জীবনের প্রথম ও প্রধান প্রশ্নগুলিকে গল্পে সরলভাবে উপস্থাপন করা।

ললিত বক্রতাহীন ঋজু জীবনের প্রথম ও প্রধান প্রশ্নগুলি খুঁজে বের করতে কমলকুমার মজুমদার তাই আদিবাসী বা অন্ত্যজ জীবনে স্বক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। 'অন্তর্জলী যাত্রা' 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক,' 'শ্যামনৌকা' প্রভৃতি উপন্যাস ও নভেলেটের চরিত্র ডোম, অচ্ছুৎ ও নিম্নশ্রেণীর বালক। কাহিনীস্থান শ্মশান, সাঁওতাল পরগণার নদী। এই গল্পসংগ্রহের চারটি গল্পের প্রধান চরিত্র অন্ত্যজ-শ্রেণীর মানুষ, গ্রামের জলঅচল হিন্দুমুসলমান চাষা বা আদিবাসী ('জল',

'তেইশ', 'মতিলাল পাদরী', 'কয়েদখানা')। 'নিম অন্নপূর্ণা' তথাকথিত আদিবাসী বা অন্ত্যজ সমাজের চরিত্র নিয়ে লেখা নয়, কিন্তু শহরজীবনের অন্তেবাসী চরিত্রই গল্পের আশ্রয়—যেমন 'তাহাদের কথা'তেও। বর্তমান আলোচনায় তাঁর উপন্যাসবিশ্লেষণ কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক। উপন্যাসগুলির সঙ্গে এই গল্পগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে সাধারণত অন্তেবাসীর জীবনই কমলকুমার মজুমদারের স্বক্ষেত্র। সেই অন্তেবাসী জীবনের দুই কোটি। এক কোটিতে অচ্ছুৎ হিন্দুমুসলমান চাষা আর আদিবাসী মানুষ—কমলকুমার মজুমদারের সাহিত্যে তার ভূখণ্ড বাঙলাদেশের দক্ষিণতর পশ্চিমভাগে মল্লভূমির পশ্চিমপ্রান্ত জুড়ে আরণ্যক পাহাড়ী আদিবাসী বা দক্ষিণতর পূর্বভাগে নদীনালায় প্লাবিত ভূমিহীন কৃষকঅধ্যুষিত অঞ্চল। আর-এক কোটিতে সমাজের উচ্চতম শ্রেণীর অলস বিলাসময়তা, সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ জড়ীভূত। সেটাও মূল সমাজের অংশ নয়। এই দুই অন্তেবাসী জীবনের একটিতে মানব-সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ, অজটিল—সমস্যাটা দেহের, শরীরের, পেটের ক্ষুধা। অপরটিতে ক্ষুধা কোনো সমস্যা নয়, অক্ষুধাই সমস্যা, সেখানে এই অক্ষুধার্ত মানুষের মানব-সম্বন্ধের সম্পূর্ণ বিপর্যয়ই সমস্যা। 'গোলাপসুন্দরী' বা 'সুহাসিনীর পমেটম' প্রভৃতি নভেলেটে কমলকুমার সেই বিপর্যয়কে বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন। সেখানে কাহিনীর তাত্ত্বিক আশ্রয় হিসেবে এমন এক সৌন্দর্যসন্ধানের প্রসঙ্গ বারবার ফিরে ফিরে আসে যে অসীম রায় মহাশয়ের মতো ক্লাসিকশিক্ষায় সমৃদ্ধ ঔপন্যাসিক-সমালোচকেরও মনে হতে পারে যে যখনই কমলকুমার মজুমদার বিমূর্ত সৌন্দর্যপ্রসঙ্গে যান, তখনই তাঁর এই প্রকরণ অকেজো। বা বাস্তববিমুখ। আসলে বোধহয় সেখানেও কমলকুমার মজুমদার বাস্তবতাতেই সন্নিবদ্ধ।

আলোচ্য গল্পসংগ্রহে এই উচ্চকোটির জীবন বা তথাকথিত শুদ্ধ সৌন্দর্যসন্ধান নিয়ে কোনো গল্প নেই। 'রুক্মিনীকুমার' বা 'লুপ্ত পূজাবিধি' গল্পদুইটিকে খুবই আপাতবিচারে তেমন মনে হতে পারে। কিন্তু রুক্মিনীকুমার তো সশস্ত্র স্বদেশী আন্দোলনের ফেরারী। নারীদেহ বা সৌন্দর্যের প্রতি তার টান তার কৃত্রিম কৃচ্ছ্রসাধনায় বা ব্রহ্মচর্যে খুঁজতে হয়, যেমন 'লুপ্ত পূজাবিধি'তে পুতুলের সাহায্যে শিশুমৃত্যুর প্রদর্শনীটিই প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গ।

গল্পগুলির উপসংহারের মন্তব্য থেকে বাস্তবতাসম্পর্কিত মনোভাবে কমলকুমার মজুমদারের ভেতর একটা বৈপরীত্যের আভাস মিলতে পারে, যা কখনো বা স্ববিরোধিতাও মনে হয়। 'তেইশ'-এ জমি থেকে উৎখাত কৃষক প্রতিশোধের,

সংঘবদ্ধ প্রতিশোধের, চেষ্টায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে অবশেষে নিজেকে অন্ধ করে ভিক্ষুক হয়। আবার 'কয়েদখানা'য় পুরুষানুক্রমিক দখলি জমিতে নতুন জমিদার কর বসাতে চাইলে, সংঘবদ্ধ কৃষকরা তাঁকে হত্যা করে। 'জল'-এ জলময়তার ভেতর ফজলের "আমি দেশত্যাগী হব"-র প্রায় উদ্দেশ্যহীনতা। আবার 'মতিলাল পাদরী'তে শিশুপুত্রটিকে বনে ফেলে দিতে গিয়ে ফেলে দিতে না পেরে পাদরী সত্য-ক্রিশ্চানের পদবী পায়। 'তাহাদের কথা'তে শিবনাথকে বাঁধার শিকলটি যেন অভিপ্রেত হয়ে ওঠে, "লৌহের শৈত্য আপনকার গালে অনুভব করত বলেছিল, 'খুব ঠাণ্ডা রে, খুব ঠাণ্ডা'," আবার 'ফৌজ-ই-বন্দুক'-এ "আই ল্যভ ইউ-কথায় দিক সকল, যুদ্ধক্ষেত্র এই প্রথম মুখরিত হয়ে উঠেছিল।"

বাস্তবতার অনড় পিঞ্জরতুল্য অপরিবর্তনীয়তা আর মানুষের নিয়তির অপ্রতিরোধ্যতা আর স্বাধীনতা কখনো এই লেখককে তিক্ত ক্ষুব্ধ বিরক্ত করে তোলে, আর লেখক নিরুপায় অস্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণকেও শ্রেয় মনে করেন—আধুনিক দার্শনিক পরিভাষায় এর নাম অস্তিবাদ, বাঙলাদেশের লোকায়ত নানা ধারণা আর ব্যাখ্যানে এমন অস্তিবাদ অন্তত হাজার বছরের পুরনো।

আবার কখনো, এই লেখকের কাছে, বাস্তবতা যেন একটা কাদার তাল, প্রকৃতির মতো স্বাভাবিক শক্তিতে আদিবাসী মানুষ বা চিরকালীন কৃষক সংঘবদ্ধ প্রয়াসে বা ব্যক্তিগত ইচ্ছায় তাকে বদলে দিতে পারে, নিজের ঈপ্সিত আকার দিতে পারুক না পারুক অন্তত অনীপ্সিত মূর্তিটিকে ভেঙে দিতে পারে খান খান, সেখানে মানুষই মানুষের নিয়তি ও নিয়ন্ত্রা।

বাস্তবতার প্রতি লেখক বিশ্বস্ত কি না সে বিচার না করে, বাস্তবতা সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য কী, এই বিষয়টিই যদি প্রধান বিবেচ্য হয়ে ওঠে, তাহলে কমল-কুমার মজুমদারের এই দুই ধরনের সিদ্ধান্তকে তাঁর স্ববিরোধিতা মনে হতে পারে। কিন্তু বস্তুত এই সিদ্ধান্তের কোনোটিই দার্শনিক প্রতীতি থেকে আসে নি, এসেছে যে-বাস্তবতার মূর্তিটি লেখক তৈরি করে তোলেন তার প্রতি লেখকের তাৎক্ষণিক মেজাজ থেকে বা বাস্তবতার যে-মূর্তিটি লেখক তৈরি করে তোলেন, তার নিজস্ব যুক্তিপরম্পরায়। শিল্পকর্মের নিজস্ব একটা যুক্তি থাকে, যার ফলে কখনো কখনো কোনো কোনো সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে। তা থেকে লেখকের দার্শনিকপ্রস্থান নির্ণয় করা যায় না।

'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পটির উপসংহারে বোঝা যায় এই দুই মনোভাবের ভেতর লেখক কতোটা দোমনা। এই দোমনাভাব যে-কোনো বাস্তবতাবাধ্য লেখকেরই

স্বভাবসংগত। চরম দারিদ্র্যের যে-পরিপ্রেক্ষিতে, গল্পের শুরুতে, পোষা পাখির চানা উপোসী বালিকাকে ভাগ বা চুরি করে খেতে হয় ও গল্পের শেষে বুড়োকে খুন করা হয়—দারিদ্র্য আর অনশনের সেই পরিপ্রেক্ষিতই হত্যাকাণ্ডের নীতিহীনতা অনেকখানি অবান্তর করে দেয়। গল্পের শেষটুকু গরম ভাতের ধোঁয়া গন্ধে প্রায় মানবিক হয়ে ওঠে যেন, হত্যাকাণ্ড সত্ত্বেও প্রায় মানবিক হয়ে উঠতে চায় যেন, পারেও—দারিদ্র্য এতো সরল অমানবিক হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে গল্পটাতে যে, যে-কোনো মূল্যেই মানুষের বেঁচে থাকাটা সমর্থনযোগ্য, আর-একজন উপবাসী ভিক্ষুককে মেরেও। বেঁচে থাকার অধিকারের মৌলিক বোধ সক্রিয়। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা বেঁচে যাবার সুযোগ পেয়ে যায়, বেঁচে যেতে পারে, সেই মুহূর্তে লেখক হিসেবে কমলকুমার মজুমদারের সমস্ত সমর্থন টেনে নেয় সেই নিহত ভিখারী। আর গল্পের শেষ ছটি বাক্যের মাত্র তিনটিতেই ("ওমা তোমার পাছার কাছে রক্ত" "কি অসভ্যতা কর এদের সামনে, জান না কিসের রক্ত,—নোংরা" "বুড়োর জন্য মন খারাপ করছে···খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না") গল্পটিতে লেখকের সহানুভূতির পাত্রান্তর ঘটে। তখন যেন যূথীদের বেঁচে থাকাটাও অপরাধ।

অনুভূতির ও অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ, ভাষার বহন ও ধারণক্ষমতাবৃদ্ধি, বিষয়ের পরিধিপ্রসার—তাঁর রচনামাধ্যমে এই কাজগুলি বা এর কোনো একটিও করে ওঠা একজন কথাশিল্পীর সার্থকতার অনস্বীকার্য চিহ্ন। কমলকুমার মজুমদারের সাহিত্যিক জীবন দীর্ঘ, রচনাসংখ্যা অতি অল্প, কিন্তু তিনি এই তিনটি কাজই করতে পেরেছেন। কথাসাহিত্যের সমস্ত শর্ত পূরণ করেও খুব কম লেখকের পক্ষেই এই তিনটি কাজ করে ওঠা সম্ভব হয়। যাঁরা পারেন তাঁরা সেই সাহিত্যের নির্মাণকর্তাদের ভেতর গণ্য হন। কমলকুমার মজুমদার সোয়া শ বছরের বাঙলা কথাসাহিত্যের প্রধান নির্মাণকর্তাদের একজন।

কিন্তু পাঠক ও সমালোচকের সমর্থন তিনি পান না। সে অসমর্থনের পক্ষেও নাকি যুক্তি আছে। আর প্রধানতম বাধা নাকি তাঁর ভাষা। এই যুক্তির ভেতর ভাষাউদ্ধারের অক্ষমতার যে-পরোক্ষ স্বীকৃতি থেকে যায় তার জন্য আমাদের আত্মসম্মানবোধ পীড়িত হয় না। নিজেদের অশিক্ষার দায় আমরা লেখকের ওপর চাপাই। বর্তমান বাঙলা গল্পসাহিত্যের পাঠক ও সমালোচক যে কমলকুমার মজুমদারকে সমর্থন করতে পারেন না তার কারণ কমলকুমারের

প্রকরণ নয়, ভাষা নয়, বিষয় নয়। তার কারণ কমলকুমার মজুমদার সাহিত্যের ক্লাসিকধর্মে বিশ্বাসী আর সম্প্রতিকালে সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা আমরা হারিয়েছি, ক্লাসিকসের পঠনঅভ্যাস থেকে আমরা বঞ্চিত। তাই চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যান আমাদের ক্লান্ত করে, ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমাদের বিরক্ত করে, বাক্যে অভ্যস্ত স্থান থেকে একটি বিশেষণকে চ্যুত করলে ভাষার সংযোগ আমরা হারিয়ে ফেলি, ক্রিয়াপদটিকে অভ্যস্ত জায়গায় না পেলেই ভাষা দুর্বোধ্য ঠেকে, বাক্‌প্রতিমার বিমূর্ততা আমাদের পক্ষে বাধা হয়ে ওঠে, উপমাহীন অলঙ্কারহীন ভাষার বৈরাগ্য আমাদের অস্বস্তি দেয়। আর পাঠক হিসেবে আমাদের অক্ষমতার দায় নির্দ্বিধায় আমরা লেখকের ওপর চাপাই। এমন-কি, ছাপার হরফে যুক্তি সাজিয়ে আমরা বলি—আধুনিক গল্প লেখা হবে আজকের ভাষায়, আর, আজকের ভাষা মানে আজকের ভাষা, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের ভাষা নয়। এতো বই বেরয়, এতো বই বিক্রি হয়, এতো সরকারী বেসরকারী লাইব্রেরি—এতো সভ্য, পত্রিকাগুলির এতো গ্রাহক ··এতো পাঠক সত্ত্বেও যদি কোনো লেখক পাঠকের কাছে পৌঁছতে না পারেন, যদি কোনো লেখকের সঙ্গে পাঠকের সংযোগ স্থাপিত না নয়, তাহলে দোষ নিশ্চয়ই লেখকের, তাঁর ভাষার, প্রকরণের, বিষয়ের—এতো সুন্দর গ্রহণযোগ্য যুক্তি থাকতে কে আর চায় নিজেকে কোনো বিশেষ লেখকের জন্য তৈরি করতে, শিক্ষিত করে তুলতে।

এ নিয়ে আক্ষেপের কিছু নেই। একটি বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় এমনটি ঘটতেই পারে। আক্ষেপ আরো থাকত না যদি দেখা যেত, এই সম্পূর্ণ অচেতন পরিবেশের ভেতরও কমলকুমার মজুমদার তাঁর সৃষ্টিক্রিয়ায় অব্যাহত থাকতে পারছেন। সন্দেহ হয়, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করেও সৃষ্টিক্রিয়া অব্যাহত রাখা—এই দুই বিপরীত কাজ কমলকুমার মজুমদারের সাহিত্যিক স্বভাবে ঠিক আসে না। সন্দেহ হয়, তাঁর রচনা যদি পাঠক ও সমালোচকের প্রশ্রয় পেত, তাহলে সেই প্রশ্রয় তাঁকে নতুনতর সৃষ্টিতে উৎসাহিত করত। তা ঘটে ওঠে না, আর তাতে বাঙলা কথাসাহিত্যই দরিদ্র হয়ে যায়—এটাই এই ঐতিহাসিক পর্বের আক্ষেপহীন সিদ্ধান্ত।

ভবিষ্যতের অনির্দেশও খুব একটা সান্ত্বনা জোটাতে পারে না, কারণ এক-বিংশ শতাব্দী আর মাত্র বছর পঁচিশের ল্যাঠা।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ইতিহাস ও শিক্ষা

নরহরি কবিরাজ

এই বইখানিতে* পরিবেশন করা হয়েছে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এটি কমিণ্টার্নের কাজের প্রাত্যহিক বিবরণ নয়। এতে আছে কমিণ্টার্নের কাজের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা।

এই বইয়ের মালমশলা সংগ্রহ করা হয়েছে মস্কোয় রক্ষিত কমিণ্টার্নের নথিশালা থেকে। ৫৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই বইখানি লিখেছেন সমষ্টিগতভাবে কতিপয় সোভিয়েত ঐতিহাসিক। তাঁদের সাহায্য করেছেন কমিণ্টার্নের কাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একদল বিশ্ববরেণ্য কমিউনিস্ট নেতা। এঁদের মধ্যে আছেন ওয়ালটার উলব্রিখট, ডলোবাস ইবারুরি, জ্যাক ডুক্লো, রজনী পাম দত্ত, খালেদ বাগদাশ, বোরিস পনোমারিয়ভ প্রভৃতি।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে কমিণ্টার্নের স্থান সঠিকভাবে নির্দেশ করাই বইখানির উদ্দেশ্য। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল বিকাশের ধারাটি কমিণ্টার্ন কিভাবে সমৃদ্ধ করেছে ; বিশ্ব-বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াটিকে কমিণ্টার্ন সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে কিভাবে বলশালী করে তুলেছে এবং ঐতিহাসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মনীতি ও কর্মকৌশল নির্ধারণে কমিণ্টার্ন যে-ভূমিকা গ্রহণ করেছে—তার বিশদ বিবরণ এই বইখানিতে পাওয়া যাবে।

মিউজিয়ামে সংরক্ষণের জন্যে প্রাচীন ইতিহাসের টুকরো সংগ্রহ করা এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়। এর লক্ষ্য : আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যটি আমাদের যুগের কমিউনিস্ট কর্মীদের সামনে তুলে ধরা—যা তাদের যোগাবে সাহস ও আত্মবিশ্বাস, তাদের শেখাবে বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে কাজ করার কৌশল, তাদের দীক্ষিত করবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায়।

কমিণ্টার্ন এমন এক আন্তর্জাতিক সংগঠন যার লক্ষ্য ছিল দুনিয়ার শ্রমিক-

* OUTLINE HISTORY OF THE COMMUNIST INTERNATIONAL, Progress Publishers, Moscow.

শ্রেণীর অগ্রগামী অংশটিকে একটি বৈপ্লবিক আন্দোলনে, একটি বৈপ্লবিক পার্টিতে সংগঠিত করা। প্রথম সম্মেলনে (মার্চ, ১৯১৯) গৃহীত ইশতেহারে বলা হয়েছিল কমিণ্টার্ন "একটি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট পার্টি," প্রত্যেক দেশে তার শাখা (Section) রয়েছে। এই আন্তর্জাতিক চরিত্রটি কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূলগত বৈশিষ্ট্য। কমিণ্টার্ন যে শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিল তা হল : দুনিয়ার শ্রমিক এক হও। কমিণ্টার্ন এই কথা ঘোষণা করে যে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সামনে শত্রু এক : বিশ্ব-বুর্জোয়ারা ; তার লক্ষ্য এক : শোষকের উচ্ছেদ সাধন ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ; উপায় এক : শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম ; শক্তির উৎস এক : সংগঠন ; মতাদর্শ এক : মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ; এবং সংগ্রামের আবশ্যিক শর্ত এক : আন্তর্জাতিক সংহতি। (পৃ ৭-৮)

মার্কস ও এঙ্গেলস ছিলেন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম আন্তর্জাতিক (১৮৬৪-৭২)-এর নেতৃত্বেই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের হাতেখড়ি।

শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকাটি প্রথম পরীক্ষিত হয় মার্কস ও এঙ্গেলসের জীবনকালে—পারী কমিউন (১৮৭১)-এর ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে। আন্তর্জাতিক বা জাতীয় ক্ষেত্রে তখন শ্রেণীসম্পর্ক এমন ছিল না যে পারী কমিউন জয়ী হতে পারে। পরাজয় সত্ত্বেও পারী কমিউন আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সামনে একটি নতুন আদর্শ স্থাপন করল। শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ক্ষমতা লাভ করা সম্ভব—এই উপলব্ধি দুনিয়াব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করে তুলল।

পারী কমিউনের এই উজ্জ্বল দৃষ্টিভঙ্গি রুশ বিপ্লবের আদর্শগত ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ১৯১৭ সালে নভেম্বর মাসে রুশ দেশে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব সাফল্য লাভ করল। পৃথিবীতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হল। এটিই হল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

রুশ বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য তুলনাহীন। এর পূর্বে অনেক দূরপ্রসারী বিপ্লব পৃথিবীতে ঘটেছে। কিন্তু সেই বিপ্লবগুলির মধ্যে দিয়ে এক ধরনের শ্রেণীশোষণের বদলে আর-এক ধরনের শ্রেণীশোষণের পত্তন হয়েছে। বিশ্ব-ইতিহাসে এই প্রথম বিপ্লব যার ফলে শ্রেণীর দ্বারা শ্রেণীর শোষণের অবসান ঘটেছে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ লুপ্ত হয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে তদানীন্তন কালের আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট

আন্দোলনের কয়েকজন প্রথম সারির নেতা—যেমন, কাউট্স্কি এবং তাঁদের অনুগামীরা—রুশবিপ্লবের এই ঐতিহাসিক তাৎপর্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না। তাঁরা বরং এই বিপ্লবের পরাজয় অবধারিত বলে মনে করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা রুশ বিপ্লব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ধনতন্ত্রের জয়গান আরম্ভ করলেন।

তাঁরা উপনিবেশবাদেরও জয়গান শুরু করলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন—উপনিবেশবাদ সর্বৈব অন্যায়, একথা বলা চলে না।

এই অবস্থায়, মার্কসবাদের পবিত্রতা রক্ষার অভিযানে অগ্রসর হলেন লেনিন। লেনিন ঘোষণা করলেন এই নেতারা মার্কসবাদকে সংশোধন করে তার নামে যা পরিবেশন করছে তা আসলে মার্কসবাদের বিপরীত। এরা বুর্জোয়া-শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

অথচ রুশ বিপ্লবের সাফল্যের পরে ধনতন্ত্রের পৃথিবীজোড়া দেউলে ফাটল ধরেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রেণীবিন্যাস বদলে যাবার ফলে আন্তর্জাতিক শ্রেণীসংগ্রাম শক্তিশালী হতে চলেছে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির পক্ষে বাস্তব ভিত্তি তৈরি হয়েছে।

এই মুহূর্তে লেনিন অনুভব করলেন—আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে শক্তিশালী ও জঙ্গী করে গড়ে তুলতে গেলে প্রয়োজন এক মজবুত বিপ্লবী আন্তর্জাতিক সংগঠন। লেনিনের নেতৃত্বে কমিণ্টার্নের মধ্যে দিয়ে হল এই নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। ১৯১৯ সালের ২ মার্চ মস্কোতে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের মধ্যে দিয়ে কমিণ্টার্নের কাজের সূচনা হল।

কমিণ্টার্নের সামনে সর্বপ্রধান কাজ হিসাবে দেখা দিল বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি সাধারণ লাইন রচনা করা। বিশ্ব-বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াটির সঠিক বিশ্লেষণ হাজির করে কমিণ্টার্ন বলল—এই প্রক্রিয়াটিতে তিনটি প্রধান শক্তি রয়েছে (১) সোভিয়েত রাশিয়া, যেখানে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত (২) ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত বৈপ্লবিক সংগ্রাম এবং (৩) পরাধীন ও অর্ধস্বাধীন দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম (পৃ ১২৬)। এই তিনটি শক্তিকে সমপর্যায়ভুক্ত বলে কমিণ্টার্ন কখনও মনে করে নি। এদের মধ্যে গুরুত্বের দিক থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের স্থানটি ছিল সবার ওপরে। কমিণ্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসের থিসিসে বলা হল : বিশ্ব-রাজনীতিতে সোভিয়েত আজ "প্রধান আকর্ষণের বস্তু।" তৃতীয় কংগ্রেসে (জুন-জুলাই,

১৯২১) ঘোষণা করা হল : সোভিয়েত রাশিয়া হল বিশ্ব-বিপ্লবের সবচেয়ে অগ্রগণ্য এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ।

সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-বিপ্লবের অন্যান্য স্রোতধারাগুলিকে কমিণ্টার্ন যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হল।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ার ব্যাপারে কমিণ্টার্নের দান অপরিসীম। জার্মানি, ফ্রান্স ও ইতালিতে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মনীতি ও কর্মকৌশল প্রণয়নে কমিণ্টার্ন প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। একান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে, বিশেষ করে দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতাদের বিপুল বাধা অতিক্রম করে, এই সব দেশে শ্রমিকশ্রেণীকে পথ দেখানো ছিল একটি অতি দুরূহ কাজ। কমিণ্টার্ন এই সব দেশে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিল। "শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট" (Workers' United Front)-এর ধারণাটি কমিণ্টার্ন সযত্নে লালন-পালন করেছিল। এই সব দেশে কমিণ্টার্ন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে উত্তরণের এক অন্তর্বর্তীকালীন ধাপ হিসাবে "শ্রমিক ও কৃষকের সরকার" গঠনের আওয়াজ তুলেছিল (পৃ ১৬১-৬৭)। এই সব দেশে প্রথম দিকে কমিণ্টার্নকে 'অতি-বামপন্থী' চিন্তার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়েছিল। অতি-বামপন্থীরা এক্ষুনি আক্রমণের (theory of offensive) নামে গণসংযোগ, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন প্রভৃতিকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করেছিল। এই ভ্রান্ত চিন্তাধারার বিরুদ্ধে কমিণ্টার্ন অবিরাম সংগ্রাম পরিচালনা করে। কমিণ্টার্ন আওয়াজ তুলেছিল : জনগণের মধ্যে কাজে আত্মনিয়োগ করো (Go to the masses)। সংস্কারবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত শ্রমিক জনগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের বিশেষ গুরুত্বের প্রতি কমিণ্টার্ন এই সব দেশের কমিউনিস্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

কমিণ্টার্নের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে জার্মানি, ফ্রান্স ও ইতালিতে কয়েকটি ছোট গ্রুপ থেকে কমিউনিস্ট পার্টি ক্রমে ক্রমে গণ-পার্টিতে পরিণত হয়।

পরাধীন দেশের বৈপ্লবিক মুক্তি-সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রেও কমিণ্টার্নের বিরাট অবদান রয়েছে। কমিণ্টার্ন পরাধীন দেশের মুক্তি-সংগ্রামকে বিশ্ব-বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বিবেচনা করত। কমিণ্টার্ন মনে করত জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম একটি স্বাধীন বৈপ্লবিক শক্তি, যার শক্তিবৃদ্ধিতে বিশ্ব-বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া বলশালী হবে।

লেনিনের ঔপনিবেশিক থিসিস—যা ছিল দ্বিতীয় কংগ্রেসের (১৯২০) সামনে

অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়—তার ভিত্তিতে কমিণ্টার্ন জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের সামনে সম্পূর্ণ এক নতুন পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরে। অর্থনৈতিক বিকাশে অনগ্রসর এই দেশগুলির বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করে লেনিন বলেন—এই সব দেশে অবিলম্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা ওঠে না, প্রথমে এই সব দেশকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। তবে এই সব দেশের গণতান্ত্রিক বিপ্লব হবে নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব। লেনিনের থিসিসে বলা হয়: নভেম্বর বিপ্লবের পরবর্তীকালে এই সব দেশের মুক্তি-সংগ্রামের পক্ষে ধনতন্ত্রের পথ গ্রহণ আর অনিবার্য নয়। সোভিয়েত রাশিয়ার দৃষ্টান্ত এই সব দেশের শ্রমজীবী জনগণকে একটি সক্রিয় শক্তিতে পরিণত করবে। শ্রমিক ও কৃষককে কেন্দ্রস্থলে রেখে এই সব দেশে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটবে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের বৈষয়িক ও নৈতিক সাহায্য লাভ করে এই সব দেশ ধনতন্ত্রের অভিশপ্ত পথ পরিত্যাগ করে অ-ধনতান্ত্রিক পথটি গ্রহণ করতে পারবে।

এই লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কমিণ্টার্ন জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের বিচার উপস্থিত করেছে। কমিণ্টার্ন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়: মূলগতভাবে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের সমস্যা হল শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর সমস্যা, যেহেতু এই সব দেশের জনসংখ্যার বিপুল অংশই কৃষক। সারা বিশ্বে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষক যুক্তভাবে যে সংগ্রাম পরিচালনা করছে, জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। (পৃ ৮৫-৮৯)

কমিণ্টার্নের প্রতিটি অধিবেশনে তখনকার দিনে চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে যে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম চলছিল, তার প্রতি শুধু সমর্থন জ্ঞাপন করা হয় নি, তার সঙ্গে কমিউনিস্টরা কি ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা চলেছে। এই সব দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে অপরিণত অবস্থার দরুণ বারে বারে ধৈর্যহীনতা থেকে উদ্ভুত অতি-বিপ্লবীপনা দেখা গেলে কমিণ্টার্ন যথাসময়ে বার বার হস্তক্ষেপ করেছে এবং সংকীর্ণতাবাদ থেকে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। চীন, ইন্দোনেশিয়া এবং ভারতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মর্মবস্তু ছিল তাকে সমর্থন করতে স্থানীয় কমিউনিস্টদের কমিণ্টার্ন সময়োচিত উপদেশ দিয়েছে। আবার বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করার বিপদ সম্পর্কেও কমিণ্টার্ন এই সব দেশের কমিউনিস্টদের সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিয়েছে। কমিণ্টার্ন বলেছে—বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বৈত চরিত্র মনে রেখেই এই সব দেশের

কমিউনিস্টদের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মনোভাব স্থির করতে হবে ; বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মিশে যাওয়া নয়, নিজের শ্রেণীদৃষ্টিতে অবিচল থেকে, কমিউনিস্ট পার্টিকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে হবে।

১৯২৮ সালে কমিণ্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে ঔপনিবেশিক দেশের বিপ্লবের সমস্যা নিয়ে আর-এক দফা বিশদ আলোচনা চলে। ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত ঔপনিবেশিক দলিলটি জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের বিশেষ সাহায্য করেছিল। নতুন অবস্থায় জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের বিভিন্ন সমস্যাগুলিকে কিভাবে সমাধান করতে হবে তার নির্দেশ এই থিসিসে ছিল। (পৃ ২৮৩-৮৭)

এই থিসিস সাধারণভাবে লেনিনের নির্দেশ অনুসরণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে নিযুক্ত দেশগুলিতে অন্তর্বর্তীকালীন স্তরের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটবে। থিসিসে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ ও জাতীয় বুর্জোয়াদের সম-শিবিরভুক্ত করার বিপদ সম্পর্কেও সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়। তবে, এই দলিলে কয়েকটি বড় রকমের ভুল-ত্রুটি স্থান পেয়েছিল। বিশেষ করে, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী সম্পর্কে এই দলিলে একটি সংকীর্ণতাবাদী দৃষ্টি প্রকাশ পায়। এখানে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রবণতাটি ছোটো করে দেখা হয়। ধরে নেওয়া হয়: সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাতীয় বুর্জোয়ারা একটি শক্তি (force) নয়। আরও বলা হয় যে কমিউনিস্টরা "জাতীয় সংস্কারবাদ"-এর সঙ্গে কোনো ফ্রন্টে সামিল হবে না।

এছাড়া, এই বইয়ে রয়েছে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমিণ্টার্নের গৌরবময় ভূমিকার কথা। ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে কমিণ্টার্ন ছিল সবচেয়ে অগ্রগামী সৈনিক। ১৯২১ সালে যখন ইতালিতে ফ্যাসিবাদের জন্ম হয় ঠিক সেই মুহূর্তে লেনিন ফ্যাসিবাদের চরম প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। কমিণ্টার্নের চতুর্থ কংগ্রেস (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯২২) ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কমিণ্টার্ন ফ্যাসিবাদের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ফ্রান্সে 'পপ্যুলার ফ্রন্ট' গঠনে ও স্পেনের গৃহযুদ্ধে (১৯৩৪) দৃঢ়তা ও নমনীয়তা একসঙ্গে অবলম্বন করে কমিণ্টার্ন ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট গঠনের নির্দেশ দেয়।

কমিণ্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসে (জুলাই-আগস্ট, ১৯৩৫) জর্জি ডিমিট্রভ তাঁর বিখ্যাত রিপোর্টে ফ্যাসিবাদবিরোধী যুক্তফ্রন্ট গড়ার কর্মকৌশল তুলে ধরেন।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, সাধারণ গণতান্ত্রিক কাজগুলির ওপর অগ্রাধিকার অর্পণ করে, ব্যাপক গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। বিপুল বীরত্ব ও আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্টরা প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। কমিণ্টার্নের বিশিষ্ট নেতারা (জার্মানিতে থেইলমান, ইতালিতে গ্রাম্‌সি) আত্মাহুতি দিয়ে এই সংগ্রামকে জয়যুক্ত করেন।

এই কঠোর জটিল সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে কমিণ্টার্ন যে কোনো ভুল করে নি, এমন নয়। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী পার্টিগুলির ভূমিকা মূল্যায়নে প্রথম দিকে কমিণ্টার্নের দলিলগুলিতে একটি সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতারা যেভাবে ফ্যাসিবাদের সঙ্গে আপোষ করছিল তাতে তাদের কাজের তীব্র নিন্দা করা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী দলগুলি ও ফ্যাসিস্ট চক্রগুলিকে এক পর্যায়ভুক্ত মনে করে কমিণ্টার্ন অবশ্যই ভুল করেছিল। দক্ষিণপন্থী সমাজ-তন্ত্রী দলে যে বামপন্থী অংশ ছিল তাকে কমিণ্টার্ন আক্রমণের কেন্দ্রস্থল হিসাবে বেছে নেওয়ায় যথেষ্ট ক্ষতি হয়। এর ফলে কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রী দলের বামপন্থী অংশের মধ্যে মিলনের সূত্রটি ব্যাহত হয় ও ফ্যাসিবিরোধী ব্যাপক যুক্ত-ফ্রণ্ট গঠনে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

এক কথায়, কমিউনিস্ট আন্দোলন কমিণ্টার্নের নেতৃত্বে এক লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত হয়েছিল। এই লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম। এর লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রকে কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয় মুক্তি ও বিশ্ব-শান্তির সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে এই সংগ্রামের সারথি হিসাবে কাজ করেছে কমিণ্টার্ন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর্বে, যখন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দেশে দেশে সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন অনুভব করা গেল যে একটি কেন্দ্র থেকে বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলন পরিচালনা করা আর সম্ভব নয়। অনুভূত হল: নতুন অবস্থায় প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে নিজ নিজ দেশের অবস্থা অনুযায়ী নিজেদের অধিকতর উদ্যম ও স্বাধীনতা ন্যায্য প্রয়োজন, তাই ১৯৪৩ সালে কমিণ্টার্ন ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। কমিণ্টার্ন ভেঙে দেওয়ার অর্থ সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ থেকে এক চুল সরে আসা বোঝায়

না। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে নতুন অবস্থায় সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শটি বিশ্ব-কমিউনিস্ট মহাসম্মেলনের মাধ্যমে গড়ে তোলাই হবে প্রকৃষ্ট পথ।

এই মূল্যবান বইখানিতে কমিণ্টার্নের ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডটি গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করা হয়েছে। যাঁরা কমিণ্টার্নের ইতিহাসের ইতিবাচক দিকটিকে উপেক্ষা করে এই মহান আন্দোলনের ভুল-ত্রুটির দিকটিকে বড় করে তুলে ধরে বলতে চান—এই আন্দোলনের ইতিহাস ভুল-ভ্রান্তির ইতিহাস, তাদের তীব্র কষাঘাত করে বলা হয়েছে: "শ্রমিক আন্দোলনের ভিতরে, এমন কি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের মধ্যেও এমন লোক রয়েছে, যারা কমিণ্টার্নের মহান কার্যাবলীকে উপেক্ষা করতে চায়, যারা এর ভুল-ভ্রান্তি এবং ভ্রান্ত সিদ্ধান্তগুলির ওপর জোর দিতে চায়।...শুধু তাই নয়, কমিণ্টার্নের ভ্রান্তি বা ভ্রান্ত সিদ্ধান্তগুলিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা ব্যবহার করে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল নীতির ওপর, বিশেষ করে আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতির ওপর, আঘাত হানার অজুহাত হিসাবে।...কোনো মার্কসবাদী-লেনিনবাদী, কোনো আন্তর্জাতিকতাবাদী কমিণ্টার্নের ইতিহাসের এই বিকৃতি বরদাস্ত করতে পারে না।" (পৃ ১৭-১৮)

এই মন্তব্যটি আমাদের দেশের মার্কসবাদীদের বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। কেননা, শুধু পশ্চিম ইয়োরোপেই নয়, আমাদের দেশেও একদল সংশোধনবাদী লেখক আছেন যাঁরা কমিণ্টার্নের ইতিহাসকে মসীলিপ্ত করতে চান। তাঁরা বলতে চান: কমিণ্টার্নের স্তালিনীয় নেতৃত্ব ফ্যাসিবাদের "প্রকৃত চরিত্রটি মূলেই ধরতে পারেন নি," অথচ ঠিক সেই সময়েই ট্রটস্কি ও মানবেন্দ্রনাথ রায় নাকি ফ্যাসিবাদের চরিত্র সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করতে পেরেছিলেন!

কমিণ্টার্নের ইতিহাসকে বিকৃত করে এই সংশোধনবাদী ভাষ্য যাঁরা পরিবেশন করছেন, তাঁরা আশা করি এই বইটির বক্তব্য ভালো করে অনুধাবন করার চেষ্টা করবেন এবং তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা প্রচার থেকে বিরত থাকবেন। সেই হিসাবে এই বইখানি শুধু মার্কসবাদী মাত্রকেই সৃজনশীল মার্কসবাদের দীক্ষায় দীক্ষিত করবে না, সংশোধনবাদের বিপদ সম্পর্কেও সচেতন করে তুলতে সাহায্য করবে।

রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সোভিয়েত দেশ নেহরু-পুরস্কারে অলঙ্কৃত এই গ্রন্থের* সমাদর যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই—আর প্রকৃতই এ-রচনা সমাদরের যোগ্য। বহু পরিশ্রমে ও একান্ত নিষ্ঠা সহকারে শ্রীযুক্ত চিন্মোহন সেহানবীশ একে প্রণয়ন করেছেন। 'পরিচয়' পাঠকবৃন্দের কাছে তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত, পঁয়ত্রিশ বৎসরাধিক কাল ধরে সর্ববিধ প্রগতিমূলক সংস্কৃতি-প্রয়াসে তিনি লিপ্ত আছেন। কায়মনোবাক্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত থেকেছেন। কখনও খ্যাতিলিপ্সায় প্রলুব্ধ তিনি হন নি, কিন্তু এই গ্রন্থের সাফল্য ও সমাদরে তিনি আজ লেখকখ্যাতিমণ্ডিত হলেন।

যখন 'কালান্তর' সাপ্তাহিকে ধারাবাহিকভাবে চিন্মোহনবাবুর রচনাটি প্রকাশ হচ্ছিল, তখনই জানা গিয়েছিল যে এদেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টার বহু অনালোকিত ক্ষেত্র তাঁর গবেষণার ফলে সুবিদিত হতে পারবে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তিনি সরেজমিনে অনুসন্ধান চালাতে পেরেছেন। একাধিকবার সোভিয়েত দেশে গিয়ে বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের এবং অবনী মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কিম্বা 'দায়ুদ আলী' দত্ত-র পরিবারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করে তথ্যসংগ্রহ করেছেন। জার্মানিতে গিয়েছেন, চেকোস্লোভাকিয়ায় গিয়েছেন, কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের গ্রন্থালয়ে কাজ করেছেন, দুষ্প্রাপ্য দলিল অধ্যয়ন করেছেন। স্বদেশে জাতীয় গ্রন্থাগার বা দিল্লীর রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানায় এবং অন্যত্র বহু সংগ্রহালয়ে গবেষণা করেছেন, মুদ্রিত গ্রন্থের সহায়তা ছাড়াও অগণিত প্রাক্তন বিপ্লবী ও বিপ্লব-বিষয়ে লেখকের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সংবাদ সঞ্চয় করেছেন। রচনাটির ছত্রে ছত্রে এই অনলস পরিশ্রমের সাক্ষ্য রয়েছে। দুঃখের বিষয় শুধু এই যে পাদটীকার পরিবর্তে রচনার মধ্যেই প্রমাণের পরিচয় দেওয়ায় জিজ্ঞাসু পাঠকের কিছুটা মুশকিল ঘটেছে। গ্রন্থশেষে সংগৃহীত তথ্যের উৎসগুলিকে তালিকাবদ্ধ না করায় পাঠকের ক্ষতি এবং গ্রন্থের মূল্যহ্রাস ঘটেছে। বহু গুণসন্নিপাতে অবশ্য গ্রন্থের এ-দোষ নিমজ্জিত হয়েছে বলা অন্যায় হবে না।

---

* রুশবিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী। চিন্মোহন সেহানবীশ। মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা। আঠেরো টাকা

অনেক অজানা অথচ মহত্বপূর্ণ সংবাদ এই রচনার সম্পদ। ১৮৭১ সালের আগস্ট মাসে কলকাতা থেকে প্রথম ইণ্টারন্যাশনালের জেনেরাল কাউন্সিলে আবেদন গিয়েছিল আন্তর্জাতিকের সদস্যপদ চেয়ে; স্বয়ং কার্ল মার্কসের উপস্থিতিতে এ-নিয়ে বিবেচনা হয়, কিন্তু কে বা কারা সেই পত্রের রচয়িতা তা এখনও জানা সম্ভব হয় নি। শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা, সিংজী রাওজী রানা এবং শ্রীমতী কামা-র বিচিত্র বিপ্লবী জীবন সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য চিন্মোহনবাবু উদ্‌ঘাটন করেছেন—ফ্রান্সে থেকে, অথচ ভারতের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক স্থাপন করে, তাঁরা যে-ভূমিকায় নেমেছিলেন তা প্রকৃতই নমস্য। সম্প্রতি প্রয়াত প্রখ্যাত জননেতা ইন্দুলাল যাজ্ঞিক কৃষ্ণবর্মা বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তা একেবারে দুষ্প্রাপ্য। ১৯৩৬ সালে বোম্বাইয়ে বহুদিন রোগভোগের পর শ্রীমতী কামা-র মৃত্যু হয় পার্শী হাসপাতালে "সকলের অজ্ঞাতে, সম্পূর্ণ অকৃতজ্ঞ এক পরিবেশে।" আয়র্লণ্ড, পোলাণ্ড, মিশর, তুরস্ক, মরক্কো ও অন্য নানা দেশের মুক্তিসংগ্রামীদের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁর দিবারাত্রির স্বপ্ন ও সাধনা ছিল ভারতবর্ষের মুক্তি। ১৯০৭ সালে দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের স্টুটগার্ট সম্মেলনে তিনি দেখেন যে সৌখিন 'শ্রমিক'নেতারা পরাধীন দেশগুলির মুক্তি-ব্যাপারে অনীহাগ্রস্ত, শুধু লেনিন এবং তাঁর পার্টি একান্ত আগ্রহশীল। সোভিয়েত বিপ্লব পরে তাঁকে আকৃষ্ট করে; চিন্মোহনবাবুর "অনুমান"—একেবারে তর্কাতীত সিদ্ধান্ত না হলেও সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সুদৃঢ় অনুমান—"শেষ জীবনে তাঁর রূপান্তর হয়েছিল কম্যুনিস্ট বিপ্লবীতে।" দেশের স্মৃতিতে এই মহীয়সী অক্ষয় হয়ে থাকবেন, এই তো স্বাভাবিক। তাঁর একটি দুর্লভ চিত্রও এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রবাসে ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে বহু সংবাদ এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। জার্মানিতে 'বার্লিন কমিটি' গঠন, পরে স্টকহলমে স্থান পরিবর্তন, এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় জার্মান শাসকবৃন্দের অভিপ্রায় সম্বন্ধে হতাশ্বাস হয়ে সদ্যোজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতি তার আকর্ষণের বৃত্তান্ত এতে আছে। ১৯১৯-২১ সালে ভারতবর্ষ ছেড়ে ধর্মাবেগে এবং পরাধীনতার শৃংখল-বর্জন-আকাংক্ষায় নবপ্রতিষ্ঠিত সোভিয়েতভূমিতে 'মুহাজরিন' নামে পরিচিত বহু মুসলমানের উপস্থিতি এবং তাদের অন্তত কিয়দংশের সমাজবিপ্লবকে গ্রহণ করার কাহিনী একেবারে অবিদিত না হলেও এ-গ্রন্থে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সোভিয়েত লালফৌজে কিছু ভারতীয় যোদ্ধা (এমন-কি বৈমানিকও) যে সেই

আদিযুগে ছিলেন তা একটু চমকপ্রদ সংবাদ সন্দেহ নেই। ১৯২০ সালে তাশখন্দে নাকি পুরো এক দল ভারতীয় যোদ্ধা ছিলেন লালফৌজে।

দুটি গোটা পরিচ্ছেদে বিপ্লবী অবনী মুখোপাধ্যায় এবং বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী নাইডুর সহোদর, সমসাময়িক বিপ্লবীমহলে 'চ্যাটো' নামে খ্যাত) সম্বন্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, নানা উৎস থেকে যাচাই করার পর লেখক তাকে সাজিয়েছেন। এর দরকার ছিল। বিশেষত এজন্য যে ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বহুমানভাজন কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ বিভিন্ন রচনায় অবনী মুখোপাধ্যায়ের বিপ্লবী খ্যাতিকে বেশ কটুভাবেই নস্যাৎ করতে চেয়েছেন।

মুজফ্ফর সাহেবের বৃত্তান্ত যদি যথার্থ হয় তো ঠগ বাছতে গিয়ে এদেশের বিপ্লবীদের গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। অবশ্য 'সত্য' যদি তাই হয় তো তাকে মানতেই হবে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে 'সত্য' অতটা কঠোর (এবং নোংরা) যে নয় তার প্রমাণও যথেষ্ট রয়েছে।

চিন্মোহনবাবু এই সাক্ষ্যসাবুদই বহু পরিশ্রমে জড়ো করেছেন। কিন্তু তাঁর বইটি পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে যে মুজফ্ফর সাহেবের মতো ব্যক্তির সঙ্গে ঠিক অতটা কোমর বেঁধে না লড়লেও চলত—মাঝে মাঝে মনে হয়েছে প্রকারান্তরে তিনিও কটুকাটব্যের প্রত্যুত্তর প্রায় সমান তালে দিচ্ছেন। অবশ্য অকারণে অবনী মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকে মসীলিপ্ত হতে দেখে রুষ্ট হওয়ার অবকাশ আছে; মুজফ্ফর সাহেবের মনোবিকারে প্রচণ্ড তিক্ততাবোধও স্বাভাবিক; কিন্তু চিন্মোহনবাবুকে সবিনয়ে বলব এ-আলোচনাটা অন্তত গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করার সময় আর-একটু নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব তাঁরও দেখানো উচিত ছিল। বিপ্লব-প্রয়াসে লিপ্ত সমসাময়িকেরা সর্বদেশেই পরস্পর সম্বন্ধে প্রায়ই দারুণ সন্দিগ্ধমনা—গোয়েন্দা-অধ্যুষিত আমাদের পরাধীন দেশে সেই সন্দিগ্ধতার বাতিক ক্রমশ কোনো কোনো ক্ষেত্রে মারাত্মক হয়ে দাঁড়ানোও কিছু আশ্চর্য ঘটনা নয়। এটা মনে থাকলে চিন্মোহনবাবুর আলোচনা (যা স্পষ্ট ও তথ্যভিত্তিক) আরও মূল্যবান ও যথোচিত গাম্ভীর্যমণ্ডিত হত।

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে একটা গোটা বই যদি পরে গ্রন্থকার লেখেন তো মন্দ হয় না। জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকে ডক্টর ক্র্যুগর এ-বিষয়ে বহুদিন কাজ করে চলেছেন, চিন্মোহনবাবুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। যদি 'বার্লিন কমিটি'র যুগ থেকে হিটলারের আমলে সুভাষচন্দ্র বসুর বার্লিন-

বাস অধ্যায় পর্যন্ত একটা সযত্নসংগৃহীত সংবাদের ভিত্তিতে রচিত চিন্তাশীল গ্রন্থ পাওয়া যায় তো আনন্দের কথা। সম্ভব হলে চিন্মোহনবাবু এ-কাজটি করতে পারবেন আশা করছি।

অনেক ছড়ানো অথচ দামী খবর এ-বইয়ের পাতায় পাতায়। সাভারকরের ১৯১০ সালে বন্দী অবস্থায় জাহাজ থেকে সমুদ্রে লাফিয়ে ইংরেজের জিম্মা থেকে ফরাসীদেশে আশ্রয় নেবার চেষ্টাকে যখন সর্ববিধ আন্তর্জাতিক বিধি লঙ্ঘন করে ব্যর্থ করল ইংরেজের শক্তি আর ফ্রান্সের কর্তব্যচ্যুতি, তখন ইয়োরোপের দেশে দেশে সমাজতন্ত্রীদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়। ঐ বৎসরই মদনলাল ধিংড়া যখন লণ্ডনে স্যর উইলিয়ম কর্জন ওয়াইলি-কে গুলি করে মেরে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন, তখন জার্মান ও ফরাসী সমাজবাদীদের কণ্ঠে বিক্ষোভ শোনা যায়; রুশ দেশের লেনিন তা নিয়ে মন্তব্য করেন। আলিপুর বোমা মামলা চলার সময় জেলের মধ্যে রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে গুলি করে মারার পর ফরাসী সমাজবাদী দৈনিক 'ল্যুমানিতে' পত্রিকায় যশস্বী নেতা জোরেস্ (Jaurés) লেখেন যে অমন ঘটনা ইয়োরোপের বৈপ্লবিক ইতিহাসে কখনও ঘটে নি। হেমচন্দ্র কানুনগো, মানবেন্দ্রনাথ রায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি স্মরণীয় বিপ্লবীর রচনা তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করে, বিভিন্ন তথ্যের সাক্ষ্য বিচার করে, ব্যক্তিগত ভিত্তিতে সংবাদ সংগ্রহের জোরে এবং অন্যান্য বিশ্লেষণী পদ্ধতি ব্যবহার করে চিন্মোহনবাবু এই বিপুল অর্থবহ, চিত্তাকর্ষক রচনাটি উপহার দিয়ে বাঙালি পাঠক সাধারণকে কৃতজ্ঞ করেছেন। এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়, মোটামুটি পরিচয় দেওয়াও অল্প পরিসরে অসাধ্য।

অবশ্য চোখে ঠেকে এমন জিনিসও কিছু এখানে রয়েছে। ১১২-১৩ পৃষ্ঠায় শ্রীমতী অ্যাগনেস স্মেডলির একটি প্রতিকৃতি ছাপানো হয়েছে, যেটা বিশদ বিবরণ বিনা অবিশ্বাস্য। কারণ পরণে শাড়ি (যা খুবই সম্ভব), এবং আকৃতিতে ভারতীয় (এটা নিছক ছাপাখানার কল্যাণে কি না বলা শক্ত তবে মুখাবয়ব দেখে শ্বেতাঙ্গিনী মনে হয় না) ঐ রমণীকে শ্রীমতী স্মেডলি বলে মানতে কষ্ট হয়। অনেকগুলি দুর্লভ প্রতিকৃতি প্রকাশের দরুন অবশ্য এ-ধরনের ভুলের মাশুল সুদে আসলে শোধ হয়ে গিয়েছে বলা খুব বাড়াবাড়ি হবে না।

এর চেয়ে কষ্টকর মনে হয়েছে 'পরিশিষ্ট' অংশের বাহুল্য। ২৫৩ থেকে ৩৭৮ পৃষ্ঠা হল এই অংশের আয়তন, আর মূল গ্রন্থটির বিস্তার ২৪৯ পৃষ্ঠায় শেষ হয়েছে। বুঝতে পারা যায় যে ক্রমশ প্রকাশিত ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলিকে একত্র

করার ব্যাপারে কিছুটা তাড়াহুড়ো ঘটেছে—যা অবশ্যই ক্ষমার্হ। কিন্তু বাস্তবিকই বিরক্তি লাগে যখন দেখি যে বাঙলা বইয়ে ৩৩২-৩৭৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'অবনীনাথ প্রসঙ্গে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়' আখ্যা দিয়ে এক প্রকাণ্ড ইংরিজি বিবৃতি বইয়ের এতখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। সুনীতিবাবু শ্রদ্ধাভাজন বিদ্বান বলে বন্দিত; ঘরোয়া ভঙ্গীতে তাঁর শৈশবের পরিচিত অবনী মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর পরিবার সম্বন্ধে বহু কথা তিনি বলেছেন; কোনো পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হলে অশোভন হত না, বরঞ্চ আকর্ষণীয়ই মনে করা যেত; কিন্তু এমন একটি গ্রন্থে (বিদেশী ভাষায়) এর সমাবেশ অদ্ভুত এবং অহেতুক ঠেকেছে। বিশেষত যখন এমন কোনো অসামান্য সংবাদ সেখানে নেই যা সংক্ষেপে গ্রন্থের অন্তর্গত হতে না পারত। চিন্মোহনবাবু ভুল বুঝবেন না, কিন্তু বলতে চাই যে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের উপর এই অতিরিক্ত আস্থা দেখিয়ে তিনি তাঁর গবেষক-চরিত্রকেই এখানে একটু ক্ষুণ্ণ করে ফেলেছেন। সুনীতিবাবুর সুদীর্ঘ বিবৃতি সুখপাঠ্য নয় বলছি না, কিন্তু নানা দিক থেকে বিচার করলে এর মূল্য অত্যন্ত সীমিত—একে ঢুকিয়ে আজকের গ্রন্থমূল্যবৃদ্ধির দিনে বৃহৎ গ্রন্থকে বৃহত্তর করার কোনো হেতু খুঁজে পাই না।

লেখক অত্যন্ত বিবেকবান বলেই বলতে সাহস পাচ্ছি যে আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে খটকা লেগেছে। ১২নং পরিশিষ্টে আছে যে নলিনী গুপ্ত (যাঁকে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ আতিশয্য করে "বিপ্লবী হিসাবে ভূঁইফোঁড়" বলেছেন) শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্রের কাছে নাকি প্রস্তাব করেছিলেন যে তিনি কিছু টাকা (রাশিয়া থেকে আনা) ঢেলে দেবেন যাতে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকাটিকে "ঢেলে কম্যুনিস্ট রূপে সাজানো" যায়! সুকুমারবাবু অবশ্য স্মৃতির উপর নির্ভর করে একথা জানিয়েছেন এবং গ্রন্থকার তা লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন ওঠে—'সঞ্জীবনী'র কর্ণধার, সর্বজনমান্য কৃষ্ণকুমার মিত্র (যাঁকে আমি বহু সুবাদে দেখার সুযোগ পেয়েছি) এমন ধরনের মানুষ ছিলেন যে তাঁর পত্রিকা বিষয়ে এমন অর্বাচীন উদ্ধত প্রস্তাব খুব স্বাভাবিক নয় এবং সুকুমারবাবুর পক্ষে এ-প্রস্তাবের উদ্ভট অগ্রাহ্য চরিত্র সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ কোনো উষ্মা কিম্বা অনুরূপ চেতনার প্রকাশ না পাওয়াও বেশ অস্বাভাবিক। স্মৃতিচারণে এ-ধরনের স্খলন অসম্ভব নয়, কিন্তু এমন প্রায়-'গালগল্প' জাতীয় কথা কেন এই প্রকৃত তথ্যগৌরব-মণ্ডিত গ্রন্থের অঙ্গহানি করছে?

অধ্যাপক অরুণকুমার বসু-কৃত 'Indian Revolutionaries Abroad,

1905-22' গ্রন্থটি চিন্মোহনবাবু ব্যবহার করতে পারেন নি বলে একটু ক্ষতি হয়েছে। ডক্টর চন্দ্র চক্রবর্তীর উল্লেখও পেলাম না। Somerset Maugham-এর 'Ashenden' গল্পগুচ্ছের মধ্যে ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবীর কার্যকলাপের কথাও আলোচিত হয় নি। তেজা সিং 'স্বতন্ত্র' মাত্র একবার উল্লিখিত, তালিকাতে নাম ছাড়া এই সম্প্রতি-প্রয়াত কমিউনিস্টের কথা কিছু নেই, যদিও একদা তিনি বৃহৎ ভূমিকায় নেমেছিলেন, 'সোভিয়েট ল্যাণ্ড' পত্রিকায় দেখি যে মৌলানা ওবেদুল্লাহ্ সিন্ধী যে 'Constitution of the Federated Republics of India' প্রণয়ন করেছিলেন (১৯২৪-২৬), তাতে তেজা সিংহেরও সহযোগিতা ছিল। ওবেদুল্লাহ্ সিন্ধী সম্বন্ধে অবশ্য বহু চিত্তাকর্ষক তথ্য এ বইয়ে রয়েছে, যদিও আমার মনে হয় 'রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্র' ব্যাপারে 'শেখ উল্-হিন্দ' মৌলানা মহ্মুদ উল্-হাসান-এর ভূমিকাকে অগোচরে একটু লঘু করে দেখানো হয়েছে। মুসলিম ধর্মাবেগ বহুলাংশে ওবেদুল্লাহ্-র চিন্তাকে পুষ্ট করেছিল, সমাজবাদ এবং সোভিয়েতশাসন সম্পর্কে অনুরাগ পোষণের সঙ্গে সঙ্গে মার্কসবাদী বিপ্লবকে তিনি আখ্যা দেন "The atheistic counterpart of theistic **Jehad**". এর সঙ্গে তুলনীয় দার্শনিক-কবি মহম্মদ ইকবাল-কৃত মার্কস-বর্ণনা: "an unenlightened Moses, an uncrucified Christ,...whose writing has almost the inspiration of a Scripture without the illuminating fire of the divine revela tion". চিন্মোহনবাবু অবশ্য সোভিয়েত বিপ্লবের অব্যবহিত পরে (এবং কিছু কাল ধরে) কমিউনিস্টদের মধ্যে যে নানা ধারা ও ঝোঁক ছিল তার গভীর বিশ্লেষণের চেষ্টায় নামেন নি। তবে তাঁর বইটি এত ভালো যে কেবলই আরও প্রত্যাশা পাঠকের মনে জাগে।

মাঝে মাঝে মনে হয়েছে যে একটু আভাস থেকে প্রায় একটা সিদ্ধান্তে হাজির হওয়ার লোভ লেখক সংবরণ করতে পারেন নি। গ্রন্থারম্ভেই দেখি যে কল্পনাশ্রয়ী (Utopian) সমাজবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা রবার্ট ওয়েনের "সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধাশীল" বলে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে বর্ণনা করা হয়েছে। দুই মহাপুরুষের মধ্যে যতদূর জানা যায় একবারই আলোচনা হয় যার পরিসমাপ্তি মতানৈক্যে। চিন্মোহনবাবু যে-চিঠি উদ্ধৃত করেছেন সেটি ওয়েনের পুত্রকে লেখা—এতে রামমোহন পরম সৌজন্য সহকারে লিখছেন যে আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাসী হলেও ওয়েন গভীরতম অর্থে

প্রকৃত খ্রীষ্টধর্মেরই "অনুগামী"। মনে পড়ে যাচ্ছে বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর সভায় বহুদিন পূর্বে কার যেন বক্তৃতা, যে, গৌতম বুদ্ধ এমনই অনবদ্য এক মহাপুরুষ যে তাঁকে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বলে কিছুতেই মানা চলে না। এবম্বিধ যুক্তি অবশ্য অন্তঃসার-শূন্য এবং সেজন্যই চিন্মোহনবাবু যে-পত্রের জোরে রামমোহনকে সমাজবাদের প্রায়-অনুরাগী বলার মতো ইঙ্গিত করেছেন, তা অগ্রাহ্য।

গবেষণার বই যখন, তখন গরু হারালে সেখানে সেই গরুকে খুঁজে পাওয়া যাবে, এমন ধরনের কথা হয়তো বলে ফেলছি। কিন্তু কেমন যেন খটকা লাগল যে রামমোহন এবং 'ইয়ং বেঙ্গল' ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে, নীলবিদ্রোহ অল্প কথায় হলেও আলোচিত, ১৮৭০-৯০ সালের কিছু কিছু মূল্যবান সংবাদ দেখছি,অথচ কি-জানি-কেন হ্রস্বকণ্ঠেও উচ্চারিত নয় 'কংগ্রেসের জনক' বলে খ্যাত অ্যালান অক্‌টেভিয়ন হিউম সাহেবের যে-আবিষ্কার শ্রীযুক্ত রজনীপাম দত্ত-র কল্যাণে আমরা জেনেছি ওয়েডারবর্ন-কৃত হিউম-জীবনী থেকে—তার কথা। ১৮৮২ সালে সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে হিউম লেখেন যে বহুকাল ধরে দেশ জুড়ে অসংখ্য গোয়েন্দার রিপোর্ট অনুধাবন করে তাঁর মনে "লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না যে প্রকৃতই দেশে একটা নিদারুণ হিংসাত্মক বিপ্লবের ("a most violent revolution") আশঙ্কা তখন ছিল।'' সারা দেশ থেকে সংগ্রহ করা ত্রিশ হাজারেরও বেশি 'রিপোর্টার'-এর খবর যাচাই করে তাঁর স্থির ধারণা হয় যে "সর্বনিম্ন শ্রেণীর মানুষ'' "অনাহারে মৃত্যু'' প্রতিহত করার জন্য "পরস্পরে মিলে কিছু করতে চাইছিল'', এবং "হিংসাত্মক কায়দাতেই তা করতে চাইছিল।'' হিউম আরও বলেন যে ছোটো ছোটো বহু দল মিলে বিরাট দল গড়ার চেষ্টা চলছিল ("পাতার উপর যেমন জল জড় হয়''), আর "শিক্ষিত শ্রেণীগুলি'' থেকে কিছু ব্যক্তি তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আন্দোলনকে "নেতৃত্ব এবং দৃঢ়তা'' দিতে চাইছিল, "একটা জাতীয় বিদ্রোহ" ("a national revolt") রূপে তাকে চালাবার অভিপ্রায় রাখছিল। ১৮৭০-৮০ সালের যে-ঘটনাবলীর উল্লেখ এখানে পাওয়া যাচ্ছে, তা নিয়ে অনুসন্ধান আজও হয়েছে কি? অধুনা তো বহু সাম্প্রতিক বিষয়ে পর্যন্ত দিল্লীর মহাফেজখানার আলমারি উন্মুক্ত, সুতরাং একশো বছর আগেকার খবর নিয়ে গবেষণায় কোনো বাধা নেই। ভরসা করি চিন্মোহনবাবুর মতো নিষ্ঠাবান বিদ্বান এ-ধরনের কাজে এগিয়ে আসবেন। আলোচ্য বইটি নানাদিক থেকে এতই আশাপ্রদ যে এই আকাংক্ষা প্রকাশ করে আলোচনা শেষ করছি এবং আবার চিন্মোহনবাবুকে আন্তরিক অভিনন্দন ও অভিবাদন জানাচ্ছি।

"সামরিক উর্দি গায়ে কৃষক-সন্তান..."

তরুণ সান্যাল

ভারতীয় ইতিহাসের নানা কালপর্যায়কে বাহন করে উপন্যাস রচনার ঝোঁক দেখা দিয়েছে ভারতের বিভিন্ন ভাষাতেই। বিশেষভাবে আঞ্চলিকতার কোনো কোনো সমস্যাকে মুখ্য করে তুলে ধরে, সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্ণ জাতীয়তার প্রকাশও এসব রচনায় দেখা যায়। ইতিহাস হাতড়ে কোনো কোনো আঞ্চলিক বীর চরিত্রকে সামনে এনে ইতিহাসের মূল দ্বন্দ্বগুলিকে বিকৃতভাবে চিত্রিত করে, জনগণের ভূমিকাকে মুখ্য করে তুলে না ধরে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতবিহীনভাবে উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে কোনো কোনো লেখক ভারতের ঐক্যকে ও ঐক্যসাধনাকে দুর্বল করার প্রয়াস চালায়। এই আপাত-রমণীয় উপাখ্যানগুলি ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার সেবক হয়ে ওঠে। আমাদের রাজ্যেও এর ব্যতিক্রম নেই। বিশেষ ভাবে উনিশ শতকের বাবুয়ানা চিত্রণ করতে গিয়ে এ রাজ্যে একাধিক লেখক উনিশ শতকের ঐতিহাসিক গতিভঙ্গি সম্পর্কে পাঠককে বিভ্রান্ত করেছেন। এমন-কি মধ্যযুগীয় বিষয়কে সামনে তুলে ধরেও, সে যুগের ঐতিহাসিক পৃষ্ঠপট বিহীনভাবে কোথাও যৌনকাতরতা, কোথাও সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি চিত্রণ করে নগদগণ্ডা পাওয়ায় খুশী লেখকরা পাঠকের মনে ভাবাদর্শগতভাবে আক্রমণ চালায়। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। 'কণিষ্ক'র বইগুলি অবশ্যই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক ঘটনার বিজ্ঞানসম্মত চিত্রই দিয়ে থাকে।

ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্যুত হয়ে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের নামে অনেক রকম রচনা আমাদের চোখে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে আবার পৃথিবীর দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের হাতে গরম সংবাদ প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকের উত্তমপুরুষবর্ণিত কায়দায় বিকৃতভাবে প্রচার করা হচ্ছে। একদিকে চলেছে ভারতের ঐক্যবিনাশী শক্তিগুলির আক্রমণ, অন্যদিকে ঘটছে পৃথিবীর নানা দেশে মুক্তিসংগ্রামের উপরে কালিমালেপন— ঐতিহাসিক পৃষ্ঠপট আর বিপ্লবী সংগ্রাম উভয়কেই বিকৃত করা ঘটছে।

এমন পরিবেশে শ্রীগোলাম কুদ্দুসের 'লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে' উপন্যাসটি*

---

* লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে। গোলাম কুদ্দুস। মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা। পনের টাকা

আমাদের সামনে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। বইখানি এক অর্থে ইতিহাসাশ্রিত। অন্যদিকে ভারতীয় জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের অপ্রকাশিত দলিলের মতো। এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে যে একদল জাতীয় মুক্তি-সাধক প্রাণ হাতে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গুরুদায়িত্ব পালন করছিলেন, সেই অসমসাহসী বীরদের নিয়ে বইখানি লেখা। এবং সচেতন লেখক শ্রীগোলাম কুদ্দুস জাতীয় বিপ্লবে জনগণের ইতিহাসকার হয়ে ওঠার ভূমিকা আশ্চর্য দক্ষতায় ও সহানুভূতিতে বর্ণনা করেছেন। বিষয় বাছাইয়ের ভিতর দিয়েও তিনি আশ্চর্য সাহস দেখিয়েছেন। বহু লোকের বহু মথিত সড়ক ছেড়ে, অনালোকিত ইতিহাস-প্রদেশে তিনি পদক্ষেপ করেছেন। তাঁর এই দক্ষ পদক্ষেপ পাঠকদের কাছে শিক্ষাপ্রদও হয়েছে।

আধুনিক যুদ্ধসংগঠন এবং মধ্যযুগের যুদ্ধসংগঠনের মধ্যে গুণগত ব্যবধান আছে। জনগণ যে ইতিহাসনির্মাতা, এ বোধটাই অদৃশ্য হয়ে থাকে যেন সামন্ততান্ত্রিক নিরঙ্কুশতন্ত্রে। যুদ্ধ নামক ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যায় কোনো প্রান্তরে বা দুর্গ দখলে, পেশাদার বনাম পেশাদারে চলে লড়াই। সমাজের ছন্নছাড়ার দল নিয়ে গড়ে ওঠে বাহিনী, আর ভাগ্য-অন্বেষণকারীরা থাকে নায়ক। সাধারণ নাগরিকরা থাকে দূরে দূরে। মধ্যযুগীয় যুদ্ধে সাধারণ মানুষের কোনো প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকে না। অবশ্য জার্মান চাষীদের লড়াইয়ের মতো ব্যাপার আসলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ নয়, শোষিতের বিদ্রোহ। কিন্তু যুদ্ধের রূপ বদল হয়ে গেছে ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে। বিপ্লব, বিপ্লবের বিজয়গুলিকে রক্ষার জন্য ইয়োরোপীয় রাজাদের বিরুদ্ধে প্রথম দিকে লড়াই, শেষ পর্যন্ত গোটা ইয়োরোপ জুড়ে নেপোলিয়নীয় যুদ্ধ, এমন-কি ইয়োরোপ ছাড়িয়ে মিশর পর্যন্ত বাহিনী প্রেরণ—সব কিছু মিলে বাহিনী হয়ে উঠেছে ব্যাপক বাহিনী, mass army. আর এ যুগে ইতিহাস হয়ে উঠল গণঅভিজ্ঞতা। গিওর্গি লুকাচ বলছেন "ইতিহাস এই **সর্বপ্রথম** হয়ে উঠল গণঅভিজ্ঞতা।" ১৭৮৯ সাল থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত ইয়োরোপের প্রতিটি নেশন এমনি ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে চলছিল। বিগত কয়েক শতাব্দীতে এমনটির ছিটেফোঁটাও ঘটে নি। এই অতিদ্রুত উত্থানপতন-পরম্পরা জনগণকে গুণগতভাবে বিশেষ চরিত্র দিচ্ছিল। আর এমন সব ঘটনা তো স্থাবর জীবনে দীর্ঘকাল সমাজ-জাড্যতার সঙ্গে পরিচিত মানুষের কাছে অতি সরল স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হয় নি! "যদি এইসব ঘটনার মতো অভিজ্ঞতা

দুনিয়াজোড়া নানা দেশে নানা ওঠাপড়ার জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে যায়, তাতে ইতিহাস বলে যে একটা কিছু আছে এমন একটা বোধ দারুণভাবে মদত পায়; দ্বিতীয়ত, ধারণা হয় ইতিহাস হল অবাধ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অনুসারী; আর, ইতিহাস প্রতিটি ব্যক্তির জীবনের উপরে যে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে এ বোধটাও জন্মায়।"

সে যাই হোক, ফরাসী বিপ্লবের পর নিরঙ্কুশতন্ত্রকেও ফরাসী বিপ্লবী বাহিনী, পরবর্তীকালে নেপোলিয়নের বাহিনীর সম্মুখীন হতে জন্ম দিতে হয়েছিল বিপুল বাহিনীর—mass army-র। আর এই ব্যাপক বাহিনী গড়ার কাজে প্রচারেরও খুবই জরুরি দরকার ছিল। এ প্রচার তাহলে আংশিক হলেও যুদ্ধবিগ্রহের কারণগুলির বিষয় কিছুটা খবর তো জনগণের কাছে পৌঁছে দিত! যুদ্ধের সামাজিক অন্তঃসারের কিছু কিছু কথা প্রচার করতে গিয়েও যুদ্ধকে গোটা নেশন ও নেশন-বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত করেই বলতে হল। কিছু কিছু সামাজিক সংস্কার নিরঙ্কুশ সামন্ততন্ত্র জনগণকে উপহার দিতে বাধ্যও হল।

বলা বাহুল্য এসব যুদ্ধের ফলে জনগণের সঙ্গে ব্যাপক বাহিনীর একধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চিরাচরিত ভূস্বামী, চাষী, মজুর, পুঁজিপতির ব্যবধান আপতকালীন ব্যবস্থায় বাহিনী সংগঠনের মধ্যে অনেকখানি ভেঙে যেতে থাকে। এমন-কি, যুদ্ধের কালে সৈন্যবাহিনীর দেশান্তরে গমন সৈনিকের মনের দিগন্তের প্রসারও ঘটায় অনেকখানি। এ সবের ফলে মানুষ অনেকখানি নিজেদের অস্তিত্ব মূল্যায়ন করতে পারে, বুঝতে শেখে ইতিহাস কেমনভাবে দৈনন্দিন জীবনকে স্পর্শ করে। মানুষ ক্রমাগত ইতিহাস-বিষয়ে সচেতন হয়, ক্রিয়াশীল হয়। "Thus in this mass experience of history the national element is linked on the one hand with problems of social transformation, and on the other, more and more people became aware of the connection between national and world history."

প্রসঙ্গত এত সত্ত্বেও একটা ব্যাপার বলা দরকার—তা হল তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধের ব্যাপার। এমনধারা যুদ্ধে জনগণের প্রত্যক্ষ ভূমিকা গৌণ হয়ে যায়। অনেকটা মধ্যযুগের নিরঙ্কুশতন্ত্রের যুদ্ধের কায়দা এসে যায়। আমাদের এই আলোচনায় প্রচলিত লড়াইয়ের কায়দা ও ব্যাপকবাহিনীই অন্তর্ভুক্ত।

নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের কালের কথা, পুঁজিবাদী প্রথম ব্যাপকবাহিনী গঠনের যুগে, ব্যক্তিমানুষ ও শ্রেণীর ইতিহাস-অভিজ্ঞতা, স্বাভাবিকভাবেই সমাজতন্ত্র

বিকাশের যুগে ভিন্নতর হতে বাধ্য। বিশেষভাবে কোনো নেশন যদি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আধিপত্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং সামাজিকভাবে নানা অত্যাচার ও অবিচারের বাহন হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্পষ্ট ভূমিকাকে প্রতিনিয়ত দেখার অভিজ্ঞতা তার থাকে। এদেশে যে mass army বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ গড়ে তুলেছিল, তাকে নিয়ে তাদের ভাবনার অন্ত ছিল না। একদিকে নিরঙ্কুশতন্ত্রের মতোই তারা ভাবত ভারতীয় বাহিনী দেশের মানুষ থেকে দূরে থাকুক, বিশেষভাবে যুদ্ধের থিয়েটার যখন ভারতের বাইরে। অন্যদিকে চাষীর ছেলের কাঁধে বন্দুক তুলে দিয়ে, দেশের মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্কচ্যুত করা অসম্ভব ছিল। যেমন প্রথম মহাযুদ্ধের শিক্ষা থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে কথঞ্চিৎ ভারী শিল্প গড়ে তোলার কথা চিন্তা করেছিল, তেমনি ভারতীয় বাহিনীতে পদস্থ হিসেবে ভারতবাসীকে নেবার কথাও তাকে ভাবতে হয়েছে। বস্তুত উপনিবেশে শোষণের স্টিমরোলার চালিয়ে, উপনিবেশের জনগণ থেকে সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেও এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পক্ষে জনগণকে আনবার জন্য জনগণের সামনে প্রচার করে—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বাধ্য হয়ে যুদ্ধকে ব্যাপক জন-অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত করেছিল, মানুষকে ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞান রাখা যায় নি। এর ফলে একদিকে জনগণ যেমন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে আরো সচেতন হয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে এই সচেতনতায় ভীতও হয়ে ওঠে উপনিবেশের সেইসব শ্রেণী যারা স্বাধীনতা বলতে নিজেদের হাতে শাসন করার অধিকার পাওয়া বলেই মনে করত। ফলে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার ক্ষেত্রে এইসব শ্রেণী কিছুটা এগোয় বটে, কিন্তু ব্যাপক গণঅভিজ্ঞতাকে ভোঁতা করে দিতেও তারা তৈরি থাকে!

আবার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিশেষভাবে চাষী মধ্যবিত্ত প্রভৃতি শ্রেণী থেকে আগত অফিসারদের কাছে তিনটি ছবি ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে—সাম্রাজ্যবাদী চাপ, বিশ্বব্যাপী ইতিহাসের গতিভঙ্গী, জনগণের ইতিহাসবোধের সঙ্গে শরিকানা বা সোভিয়েত লালফৌজের তথা সমাজতন্ত্রের ভূমিকা বিষয়ে জ্ঞান। এসব বাহিনীর মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় নিজেদের গোপন সংগঠন এবং এই গোপন সংগঠনকে রূপ দেবার জন্য ব্যাপক জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক রচনার প্রয়াস। এই সম্পর্ক তারা সংগঠিত রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও গড়ে তুলতে প্রয়াসী হতে পারে। কিন্তু সংগঠিত রাজনৈতিক দল যদি জনগণের বিপ্লবী ভূমিকা বিষয়ে সংশয়াচ্ছন্ন ও ভীত থাকে এবং বৃটিশ ল অ্যাণ্ড অর্ডারের অনুসারক হিসাবে তারা ভবিষ্যৎ

শাসকের স্থলাভিষিক্ত হতে চায়, তাহলে ইতিহাস রচনার কাজে ঔপনিবেশিক-দেশের জনগণ ও বাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী অংশের সঙ্গে সংগঠিত দলের মধ্যেকার দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় ঐ সংগঠিত দলই, যদি জনগণ ও বাহিনীর ঐ অংশ নিজ অভ্যুত্থানের ফলে ঐ দ্বন্দ্বের নিরসন করতে না পারে। এবং ঐ দল দেশের বৈপ্লবিক রূপান্তরের বদলে রাষ্ট্রক্ষমতার অধীশ্বর হয়ে ঔপনিবেশিক প্রশাসনব্যবস্থা হাতে নিয়ে সমাজ-আর্থনীতিক ব্যবস্থা তাদের স্বার্থে বদল ঘটাতে প্রয়াসী হয়। আর এখানেই থাকে সাম্রাজ্যবাদীদের নতুন কায়দায় ফিরে আসার দিক। জনগণকে এজন্য আবার তৈরি হতে হয়। নতুনভাবে জাতীয় স্বাধীনতার লড়াই নতুন স্তরে উন্নীত হয়।

এত কথা ভাবার কোনোই দরকার হত না, যদি না শ্রীগোলাম কুদ্দুসের 'লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে' বইখানি পড়তাম। শ্রীকুদ্দুস ইতিহাসসচেতন লেখক। ভারতীয় ইতিহাসের একটি বিশেষ যুগ নিয়ে তাঁর এই বইখানি লেখা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে রূপ দেবার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি গড়ে উঠেছিল, তার ছবি তিনি এই বইখানিতে তুলে ধরেছেন।

এই ঐতিহাসিক তথ্যের উপরে লেখা উপন্যাসটির নায়কের নাম অর্জুন। জাঠ পরিবারে সে জন্মেছে। প্রপিতামহ ১৮৫৭-র ব্যাপক বিপ্লবে শহীদ হয়েছিলেন। বৃদ্ধ পিতামহ ও জননীর তত্ত্বাবধানে গ্রামে অর্জুনের বাল্যকাল কাটে। সে গ্রামে দেখতে শিখল সমবয়সী সঙ্গী বালকদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে গ্রামীণ সুদখোর, ভূস্বামী নির্যাতনকারীদের। শিখল, বর্ণদ্বেষের জগতে মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বাধাবিপত্তিগুলি। আর লবণ-আইন-ভঙ্গ আন্দোলনে প্রথম ইংরেজের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ প্রকাশ পেল। কিন্তু বাবাও যায় সৈন্য-বাহিনীতে, চতুর্দিকে দোর্দণ্ড দণ্ডধরদের যেখানে উৎপাত, সেদেশে নিরস্ত্রভাবে অস্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়ানো আদৌ সঠিক কিনা, এমন প্রশ্ন তার মাথায় আসে। অচ্ছুত গ্রামের দারিদ্র্য, এমন-কি সে গ্রামে পানীয় জলের অভাব থেকে, নীলগাব মুসলিম পরিবারের উপরে সুদখোরদের দৌরাত্ম্য, গ্রামীণ গুরুমশায়েরও ধনী সন্তানের প্রতি স্নেহাধিক্য সব কিছুই তাকে বিরক্ত করে তোলে। শেষ পর্যন্ত বাবা তাকে নিয়ে গেলেন সৈন্যব্যারাকে থেকে ব্যারাকবয় হিসাবে লেখাপড়া শেখবার জন্য। সেখানেও তার নানা অভিজ্ঞতা। ইংরেজ ব্রাউন সাহেবের দাপটে ভারতীয় সৈন্যরা তটস্থ। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদের জ্বালা নিরাময়ের পথ খোলা বেশ্যা-

পাড়ায়, বাইজীদের নৃত্যে এমন-কি তাদের উপর বলাৎকারে। এসবের ব্রাউন সাহেবরা ঘোর সমর্থক। তারাই এ ব্যবস্থা চালু রাখে। আবার ব্রাউন সাহেবের কাছে যুবতী মেয়েকে ভেট পাঠিয়ে পদস্থ মহারাজ সিং উচ্চপদ, অর্থ ও জমির উপরে আধিপত্য চায়। এই ব্যারাকেই তার সঙ্গে পরিচয় হয় গণেশলালের। শিক্ষক সে। তার সামনে গণেশলাল খুলে ধরে ভারতের দারিদ্র্যের ছবি, বৃটিশদের নিপীড়নের চিত্র। আর খুলে ধরে ভারতবর্ষের মানচিত্র। যে-ভারতবর্ষের মেয়েরাও স্বাধীনতার জন্য কাতার দিয়ে জেলখানায় চলেছে। গণেশলাল এসব কথা সৈন্যদেরও বলে। একদিন গণেশলাল ধরা পড়ে। মিলিটারি কোর্টের বিচারে গণেশলালের ফাঁসি হয়ে যায়। এরপর অর্জুন ব্যারাকের বাইরে সাধারণ স্কুলে পড়তে গেল। তার মনের মধ্যে একসময় ছিল, হিমালয় থেকে একদিন বাহিনী গড়ে সে ভারতের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে দেশ স্বাধীন করবার জন্য, সে-স্বপ্ন তার বদলাতে থাকে, যখন এই স্কুলে বসেই জানতে পারে গোটা ভারতে দেশে দেশে স্বাধীনতার সংগ্রাম কেমন করে শক্তিশালী হচ্ছে। বেনারসে হস্টেলে থেকে পড়তে পড়তে তার জানা হয়ে যায় তথাকথিত অর্থবান পরিবারের ছেলেদের চরিত্র। অর্জুন ভালোবাসল কাশ্মিরী মেয়ে দুলারীকে। আর এমনিভাবে কলেজের সময় কাটতে না কাটতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণদামামা। অর্জুন ট্রেনিং নিয়ে কমিশনড্‌ অফিসার হল। এক সময় দুলারীকে দুলারীর নিজস্ব দাবি হিসাবে গোপনে বিবাহও করল। এসে গেল ৪২-এর আন্দোলন, দুলারী জেলখানায় চলে যায়। তখন বোঝা গেল দুলারীর এই গোপনীয়তার কারণ। স্বামী যার মিলিটারি অফিসার, তাকে তো স্বক্ষেত্রেই বিপ্লবের কাজ করতে হবে সমরসংগঠনে। সাধারণ নাগরিকের দায়িত্ব ভিন্নতর। আজ অর্জুন তার সমমতাবলম্বীদের সঙ্গে সংগঠন গড়ে তুলেছে বাহিনীর মধ্যে। সারা ভারতের বহু অফিসার তাদের সহযোগী। আবার অন্যদিকে নীচুতলার সৈন্যদের নিয়ে অতি-গরম এক গোষ্ঠীসংগঠন গড়তে প্রস্তুতি চালায়, তারা মনে করে অফিসাররা ইংরেজের সহযোগী। অর্জুন একসঙ্গে মিলেমিশে সংগঠন চালাতে চায়। অর্জুন তার অংশের নায়ক হিসাবে বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীতে নানা যোগাযোগ ব্যবস্থা রচনা করে। এমন-কি যুদ্ধশেষে অভ্যুত্থানের ব্যাপারও সংগঠিত করে। কংগ্রেস ও সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে যোগাযোগও করে। কিন্তু সব জায়গাতেই প্রতিদান মিলল হতাশা। নৌ-বিদ্রোহের সেনানীদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেন কংগ্রেসনেতারা। দুলারীও মারা গেল দুর্ঘটনায়। সাম্রাজ্যবাদীরা হিন্দু-

মুসলমানে দাঙ্গা লাগিয়ে দিল। কমিউনিস্টরা স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত লড়াইয়ের ডাক দিয়েছিল—কিন্তু জাতীয় বৃহৎ দলগুলির সে দিকে তো চোখ ছিল না অর্জুন শেষ দিকে ধরা পড়ার মুখে সৈন্যবাহিনী থেকে পালিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে, নিজের তাবৎ ভূমিকা ব্যাখ্যা করে, উপদেশ চায়। প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারি তাকে আত্মসমর্পণ করতে বলে। ধরা দেয় অর্জুন। আর বাহিনীর মধ্যেই সে আবার তার অন্তরঙ্গ মুখগুলিকে দেখতে পায়। এক সময় তাদের সাহায্যে আবার পালিয়ে যায়।

খুব ছোটো করে বলতে গেলে ৪৪০ পৃষ্ঠার বইখানির এই চুম্বক-সংক্ষেপ।

আমাদের বক্তব্যের সূত্রপাতে যেমন বলেছিলাম, ইতিহাসকে সক্রিয়ভাবে রূপদানের ব্যাপার এই বইখানির ছত্রে ছত্রে রয়েছে। আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমরা সৈন্য-বাহিনীর ক্ষেত্রে আই. এন. এ. ও সুভাষচন্দ্র বসুর ভূমিকা, যুদ্ধের ঠিক পরেই নৌ-বিদ্রোহের ভূমিকার কথা বলি, কিন্তু কখনো আমাদের ইতিহাসে সৈন্য বাহিনীর মধ্যে যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের আরেক দল সৈনিক ভূমিকা পালন করছিলেন, তা আমাদের জানা থাকে না। মার্কসও ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতাসংগ্রামের সৈনিকদের বলেছিলেন, "সামরিক উর্দি পরা চাষী"। ইতিহাস রচনায় মনস্ক আমাদের দেশের মানুষের ছবি এই বইখানিতে মিলবে।

"লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে' অবশ্যই ইতিহাস-আশ্রিত, এবং অত্যন্ত ঘটনা ও তথ্যবহুল রচনা। কিন্তু বইখানি একখানি সার্থক উপন্যাসও। বইখানিতে তিনটি তল রয়েছে। প্রথম তলে সামাজিক গতিভঙ্গীর অলক্ষ্য প্রবাহ, এবং সমাজ নিজেই যেন চরিত্র হয়ে উঠে এসেছে। দ্বিতীয় তলে রয়েছে ব্যক্তিচরিত্র গুলির ভূমিকা, তাদের আচরণ ও বক্তব্য তাদের অন্তরলোক ও ক্রিয়ার সম্পর্ক রচনা করে। তৃতীয় তলে আছে অর্জুনের নিজস্ব মানসলোক, যে-মানসলোক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে চতুষ্পার্শ, ইতিহাস এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে গড়ে উঠছে, ঐশ্বর্যবান হচ্ছে। এক কথায়, নায়ক চরিত্র সামাজিক ও ঐতিহাসিক অন্তঃসারকে অঙ্গীকৃত করে গড়ে উঠছে। এই বিকাশকেই বলা হয় সোশালিস্ট —যা ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ইতিহাসের প্রবাহকে সমাজতন্ত্রাভিমুখী করে। আর রচনারীতি হল রিয়ালিস্ট। বিশেষ পরিবেশে যা স্বভাবীকরণ বা ন্যাচা-রালিজম নয়, ঘটনার শিকার নয় চরিত্রায়ণ, বরং ঘটনাকেও নিয়ন্ত্রণ করার মতো দায়বদ্ধ থাকে চরিত্র ও লেখক। যা চরিত্রটি ইতিহাসের গতিপথে হওয়া উচিত—

অর্থাৎ ইতিহাসের আপাতঅন্ধ স্রোতে অজ্ঞান ব্যক্তি নয়, বরং সচেতনভাবে সক্রিয়। আমাদের বাঙলা সাহিত্যে সোশালিস্ট রিয়ালিজমের প্রকাশ রয়েছে এই গ্রন্থটিতে। আমাদের দেশের জীবনধর্মী সাহিত্যে বইখানি একটি বিশিষ্ট সংযোজন। শ্রীগোলাম কুদ্দুস আমাদের দেশের ইতিহাসের অনালোকিত একটি বিশেষ অঞ্চলে আলোকপাত করেছেন বলে, তিনি যে-কোনো স্বদেশী ইতিহাস-জিজ্ঞাসুর কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস লিখতে যে ঢের বছর পেছিয়ে গিয়ে কল্পনার ফানুস ওড়াতে হবে এমন নয়, ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসের ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন অর্থাৎ ইতিহাসের মূল অন্তঃসারকে আবিষ্কার ও তার প্রকাশ, শ্রীকুদ্দুস তার সার্থক রূপ দিতে পেরেছেন। এ-বিচারে সাম্প্রতিক জীবন নিয়ে উপন্যাস বা ইতিহাসের উপকরণ নিয়ে লেখা উপন্যাসে মূলত কোনো বিরোধ থাকে না, শ্রীকুদ্দুসের উপন্যাসের সময়কাল এই শতাব্দীরই কয়েকটি বছর, অথচ ঐ বছরগুলির এযুগের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অবদান বিস্ময়কর। বলা যেতে পারে লেখকের প্রয়াস অত্যন্ত অভিনব, ইতিহাস বিষয়ে যা সামান্য কয়েক বছর অতীতের ব্যাপার, অথচ যা ভীষণভাবে বর্তমানেও সক্রিয়—সমসূত্রে তিনি অতীত, বর্তমান ও সম্ভাবনাকে ধরেছেন।

কবি গোলাম কুদ্দুস উপন্যাসকার হিসাবেও খ্যাত। এই বইখানি তাঁর খ্যাতিকে বহুবিস্তৃত করবে।

ভ্রম সংশোধন

'ওকনাশ ও সমাজতন্ত্র' প্রবন্ধটির (পৃ ৬৩৫) প্রথম পংক্তিতে ছাপা হয়েছে : 'অহিকস্', হবে : 'আইকস্'।

বাঙলা নাটকের উৎস সন্ধানে

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

নাটকের আবির্ভাব কোনো দেশেই অকস্মাৎ ঘটে না। বাঙলা নাটকের ক্ষেত্রেও এই কথা সমানভাবেই প্রযোজ্য। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস খুললে দেখা যাবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেছেন যে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাঙলা ভাষায় কোনো যথার্থ নাটক ছিল না। অথচ বাঙলা সাহিত্যের বয়স উনিশ শতকেই প্রায় এক হাজার বছর হয়ে গেছে। সুতরাং এটা আশ্চর্যের বিষয় যে একটা জাতি এক হাজার বছর ধরে বেঁচে ছিল, তারা শিল্পসাহিত্যের যথাযথ চর্চাও করেছে, কিন্তু নাটক রচনা করে নি। হয়তো এই দীর্ঘ সময়ে লিখিত নাটকের কোনো উদাহরণ আমরা খুঁজে পাব না। কিন্তু এক হাজার বছর ধরে বাঙালি কোনো নাটক অভিনয় করে নি একথা ভাবাও সঙ্গত নয়।

নাটককে বলা হয় জীবনের দর্পণ। তাই জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নাটকের আঙ্গিকের বিবর্তন ঘটেছে, অভিনয়কলারও পরিবর্তন ঘটেছে। একেবারে প্রাচীন যুগের নাটকের নিদর্শন খুঁজতে গেলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা পাল্টাতে হবে। পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত আধুনিক পঞ্চাঙ্ক নাটক প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া না গেলে নাটকের খোঁজ একেবারেই পাওয়া গেল না একথা বলা যুক্তিহীন। মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক দেশেই নাটকসৃষ্টির সূচনাপর্বে ধর্ম এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গ্রীক নাটকের ক্ষেত্রে অন্তত একথা সর্বাংশে সত্য। পূর্ণাঙ্গ নাটক নয়—ব্যক্তিগত অভিনয়, ভাঁড়, বাজিকর এবং পেশাদার চিত্তবিনোদনকারীরাই প্রাচীন এবং মধ্যযুগে অভিনয়ের ধারাটিকে বহন করে নিয়ে এসেছে। পরে ক্রমশ এতে একাধিক চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে, সংলাপের গঠন পাল্টায় এবং অভিনয়শিল্পও একটি সাহিত্যিক কাঠামোর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে।

ড. সুরেশচন্দ্র মৈত্র তাঁর এই দীর্ঘকায়, চমকপ্রদ অথচ বিতর্কমূলক গ্রন্থে*

---

* বাংলা নাটকের বিবর্তন। ড. সুরেশচন্দ্র মৈত্র। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা। পঁচিশ টাকা

গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে এই ঐতিহাসিক সত্যটি স্মরণে রাখতেই হবে। তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে শাস্ত্রীয় সংস্কৃত নাটকের মধ্যে বাঙলা নাটকের উৎসভূমির সন্ধান করে লাভ নেই। লৌকিক আশ্রয়ে পুষ্ট এবং ধর্মপ্রভাবিত দেশজ নাট্যধারাই বাঙলা নাটকের যথার্থ পূর্বপুরুষ। কয়েকটি বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের রচয়িতা হিসেবে বাঙালি নাট্যকারদের নাম আমরা অনেক আগে থাকতেই পাই। কিন্তু তুর্কি আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই সংস্কৃত নাট্যচর্চার গতি সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। অবশ্য এর পূর্বেই তৎকালীন হিন্দুরাজাদের বিলাসী জীবনযাত্রার প্রভাবে সংস্কৃত নাটক কৃত্রিম এবং আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। জনজীবনের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ বহুপূর্বেই হয়ে পড়েছিল বিচ্ছিন্ন। তুর্কি আক্রমণের ফলে রাজসভার আনুকূল্য লোপ পেল এবং সংস্কৃত নাটকের অস্তিত্ব রক্ষা করাই কঠিন হয়ে উঠল। স্বভাবতই এই অবস্থা লক্ষ্য করে ড. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতো রঙ্গমঞ্চের বিশিষ্ট ইতিহাসরচয়িতাকে মন্তব্য করতে হয়েছে, "তাই দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় ছয় শত বৎসর পর্যন্ত ভারতীয় নাট্যকলার ইতিহাস একরকম অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" এই ছয়শত বৎসর সংস্কৃত নাটকের তেমন কোনো বিকাশ দেখা যায় নি একথা হয়তো ঠিক। কিন্তু, বাঙলা নাটকের ইতিহাসও কি অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল?

এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করাই ড. সুরেশচন্দ্র মৈত্রের আলোচ্য গ্রন্থের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। বস্তুত এই কারণেই গ্রন্থটিকে গতানুগতিক বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসও বলা চলে না। লেখক নিজেই ভূমিকায় তাঁর উদ্দেশ্যটিকে ব্যক্ত করে বলেছেন, "বাংলা নাট্যসাহিত্যের জন্ম-ইতিবৃত্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে কেউ কেউ দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। পণ্ডিতদের সেই ক্ষোভ অপনোদনে আমি অগ্রসর হয়েছি।" ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতকে আলোকিত করার ক্ষেত্রে লেখক সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এতদিন আমাদের ধারণা ছিল যে হয় প্রচলিত যাত্রাপালা থেকে অথবা ইংরেজি নাটকের আদর্শে ও অনুকরণে আমাদের নাটকের জন্ম। আবার বাঙলা নাটক কবে থেকে যথার্থ নাটক হয়ে উঠেছে এ বিষয়েও নানা বিতর্ক আছে। যে নাটক অভিনয়যোগ্য এবং যা মঞ্চাভিনয়ে সাফল্য অর্জন করেছে অনেকে তাকেই সার্থক নাটক বলতে চেয়েছেন। তাই আমরা এতকাল প্রথম মঞ্চসফল বাঙলা নাটক কোনটি এই বিতর্কে মগ্ন ছিলাম। নবীন বসুর 'বিদ্যাসুন্দর', বেলগাছিয়া রাজবাড়িতে মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা

এবং ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটারে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' অভিনয়—এদের মধ্যে কোনটি প্রথম সার্থক বাঙলা নাটক প্রয়োজনা? এতদিন পর্যন্ত বাঙলা নাটকের ইতিহাসের বেশ কিছু পৃষ্ঠা এই সমস্ত সমস্যার সমাধানেই ব্যয় করা হয়েছে।

কিন্তু ড. মৈত্রের পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি দেখিয়েছেন যে বাঙলা সাহিত্যের বয়স আর বাঙলা নাটকের বয়স প্রায় একই। বাঙলা সাহিত্যের আদিতম গ্রন্থ 'চর্যাপদ'-এর ১৭ সংখ্যক পদে বুদ্ধনাটক অভিনয়ের কথা বলা হয়েছে। আবার ১০ সংখ্যক পদে 'নটপেটিকা'র উল্লেখ আছে। নটপেটিকা শব্দটির অর্থ হল অভিনেতার পোশাকপরিচ্ছদ রাখার বাক্স। সমাজের উঁচুতলার মানুষ যখন সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রমোদবহুল সংস্কৃত নাটকের রস আস্বাদনে ব্যস্ত তখন সাধারণ মানুষ যে মাতৃভাষায় রচিত নাটক সাগ্রহে উপভোগ করত এই সাক্ষ্যগুলি তারই প্রমাণ। 'চর্যাপদ'-এ সমাজের অন্ত্যজ সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য ছিল বেশি। তাই নিঃসন্দেহে এই সমস্ত নাটক তাঁদের সমাজজীবনের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। জয়দেবের বিখ্যাত 'গীতগোবিন্দ' যে 'নাটগীতি'র আঙ্গিকে লেখা একথা অনেক সমালোচকই বলেছেন। অপরদিকে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ধ্রুপদী নাট্যশাস্ত্রের অনুশাসন না মেনে লোকসাহিত্যের আঙ্গিক অনুসরণ করছে। ড. সুকুমার সেনের ভাষায়, "এটি একটি পাঞ্চালিকা নাট্য অর্থাৎ পুতুল নাচের গ্রন্থ।" পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিশ্বাস করেন, "ইহা ঝুমুর গানের পুঁথি। পালাগুলি ঝুমুরের পালা হিসাবে সাজানো।" সযত্নে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে ড. মৈত্র প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে চর্যার নাটক, জয়দেবের নাটগীত, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর পালাগান থেকেই মধ্যযুগের বাঙলাদেশ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির ভক্তিনাটক ও নাটগীতির সূচনা। 'চর্যাপদ' থেকে বাঙলা নাটক যে পথ ধরে যাত্রা শুরু করেছিল, গ্রন্থকারের মতে সেটিই বাঙলা নাটকের স্বাভাবিক যাত্রাপথ। হাজার বছরের অভিজ্ঞতা, প্রভাব ও সংস্কার আত্মসাৎ করে এই নাট্যধারাই উনবিংশ শতাব্দীতে নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। নতুন সৃষ্টির আলোকে আমাদের চোখ ঝলসে গিয়েছিল বলেই সম্ভবত আমরা বাঙলা নাটকের উৎসভূমির সন্ধান পাই নি।

স্বভাবতই ড. মৈত্রের এই সমস্ত মতামত রীতিমতো বিতর্কমূলক। তিনি নিজেও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ। তিনি চান যে তাঁর মতামত সম্পর্কে তীব্র বিতর্কের সূত্রপাত ঘটুক। তাই সূচনাতেই তিনি কয়েকটি বিচলিত হবার মতো

সিদ্ধান্ত উপস্থিত করেছেন। তারপর যুক্তিতর্কের সাহায্যে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি গোড়া থেকেই সচেতন। "সমালোচকদের এইটিই বদ্ধমূল ধারণা যে বাংলা নাটক যতখানি ইউরোপীয় আদর্শ অনুসরণ করেছে, ততখানিই সত্যিকার নাটক হয়েছে। ধারণাগুলি যতই দৃঢ়বদ্ধ হোক, এগুলির মূল ধরে নাড়া না দিয়ে উপায় নেই।" প্রচলিত নাট্যইতিহাসগুলির গতানুগতিক সিদ্ধান্তসমূহের মূল ধরে নাড়া দিতে গিয়ে তিনি কোথাও অসহিষ্ণুতা বা সংকীর্ণ গোঁড়ামি দেখান নি। বাঙলা নাটকের ঐতিহ্য আবিষ্কার প্রসঙ্গে প্রতিবেশী প্রাদেশিক ভাষাগুলির নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা এককথায় অনন্যসাধারণ। মধ্যযুগের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার ধর্মাশ্রয়ী ভক্তিনাটকগুলি কিভাবে ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছিল বিচক্ষণতার সঙ্গে লেখক সেই অজানাকাহিনী বিবৃত করেছেন।

বুদ্ধনাটক থেকে 'ডাকঘর'—অর্থাৎ 'চর্যাপদ' থেকে রবীন্দ্রনাথ—অর্থাৎ দশম শতাব্দী থেকে ১৯১২ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় গ্রন্থকারের ৭১০ পৃষ্ঠা গ্রন্থের পটভূমি। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি 'শারদোৎসব' ও 'ডাকঘর'-এ এসে তাঁর পথপরিক্রমা সম্পূর্ণ করেছেন। আদিযুগের বাঙালি নাট্যকারেরা নাটক রচনার সময় কখনও দেশজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কথা বিস্মৃত হন নি। সমাজের অল্পবিস্তর প্রতিফলন তাঁদের প্রত্যেকটি রচনাতেই ঘটেছে। আধুনিক শিল্পপ্রকরণ নিশ্চয়ই তাঁদের আয়ত্ত ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি যাঁরা নাটকের আধুনিকতম আঙ্গিক আয়ত্ত করেছিলেন তাঁদের সাফল্যের পরিমাপও লেখক একই দৃষ্টিতে করেছেন। তাই অনেক প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হন নি, আবার অনেক অবহেলিত নাট্যকারকে তিনি যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন।

লেখক বোধহয় সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাটকের মূল্যায়নে। তাঁর শেষজীবনের প্রতিষ্ঠিত নাটকগুলি গ্রন্থকারের আলোচ্যসূচীর অন্তর্গত নয়। তিনি 'ডাকঘর'-এ এসে থেমে গেছেন। কারণ এখানে থামাই তাঁর প্রয়োজন ছিল। কবিতা এবং গদ্যের মতো রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাঙলা নাটকের মুক্তি। কেবল বিষয়বস্তু, সংলাপ বা আঙ্গিকের ক্ষেত্রেই নয়, রবীন্দ্রনাথ বাঙলাদেশের প্রচলিত মঞ্চরীতির বিরুদ্ধেও সুস্পষ্ট প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। "বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে

আনিয়া দেওয়াই দুঃসাধ্য।"…"আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐজন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই" ('অন্তর ও বাহির'। 'পথের সঞ্চয়')। যথার্থ রসজ্ঞ নাট্যরসিকের দৃষ্টি নিয়ে ড. মৈত্র লক্ষ্য করেছেন যে সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি মোটেই প্রথাসর্বস্ব পাশ্চাত্য নাটকের আঙ্গিক মেনে চলে নি। বরং প্রাচীন যাত্রাকারদের আদর্শে তিনি পালাগান রচনাতেই উৎসাহী ছিলেন বেশি। মনে রাখতে হবে 'রক্তকরবী'র মতো নাটককেও রবীন্দ্রনাথ 'পালা' বলে অভিহিত করেছিলেন। নাটকের সঙ্গে গান ও নাচকে মিলিয়ে দেওয়া প্রাচীন বাঙলা নাট্যসাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। অথচ পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী নাটককে হতে হবে সংলাপ-নির্ভর। গ্রন্থকারের মতে রবীন্দ্রনাথের নাটকেই সর্বপ্রথম সংলাপ নৃত্য ও গীতের যথাযথ সমন্বয় ঘটেছে। আর, 'শারদোৎসব'-এই এর সার্থক সূচনা : "সর্ববিধ অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও শারদোৎসব নাটকের একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। এই গ্রন্থ বাংলানাট্যসাহিত্যে একটা নতুন পর্যায় সৃষ্টি করল—প্রবীণ নাট্যরীতিকে নবীনভাবে উপস্থাপিত করে। জয়দেব থেকে গোবিন্দ অধিকারী ও গোপাল উড়িয়া পর্যন্ত বাংলা নাটকের যে ইতিহাস, শারদোৎসব তাকে স্বীকার করেছে, অস্বীকারও করেছে। তার যা ক্লেদ, যা গ্লানি, তাকে ধিক্কৃত করেছে, যা শ্লাঘনীয়, যা বরণীয় তাকে বরণ এবং আত্মসাত করেছে।" আর 'ডাকঘর'-এ "বাংলা মঞ্চের কৃত্রিমতা পরিত্যক্ত হল, দৃশ্যপট বিদায় নিল।" এছাড়া রবীন্দ্রনাথের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল, "মঞ্চজগৎ আর বিশ্বজগতের মধ্যে যে আড়াআড়ি চলছিল তার অবসান ঘটানো। ডাকঘরে তাই বিশ্বচরাচর আর প্রেক্ষাপট মাত্র নয়, একটি চরিত্র। ছোট মঞ্চকে বড়ো মঞ্চ আত্মস্থ করেছে।" লেখকের এই সমস্ত সিদ্ধান্তই নতুন এবং কিছুটা বিচলিত হবার মতো। বিশেষকরে 'ডাকঘর' এবং 'শারদোৎসব' সম্পর্কে তাঁর মতামত রীতিমতো চমকপ্রদ। মতভেদের সম্ভাবনাও হয়তো অনেকক্ষেত্রে রয়েছে। তথাপি একথা খুব নিশ্চিত হয়েই বলা যায় যে এর আগে কোনো নাট্যসমালোচকই বাঙলা নাটককে এরকম ঐতিহ্যনির্ভর সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করেন নি।

কবিতা কল্পনালতা

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমানে বাঙলা কবিতার ওপর যাঁরা আলোচনা করেন তাঁদের মধ্যে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মূল্যায়নের সঙ্গে, মতামতের সঙ্গে, দ্বিমত আমরা পোষণ করতে পারি ; হয়তো বাঙলা কেতাবী আলোচনার ভাষার মন্থরতা ও পণ্ডিতিপনা তাঁর প্রবন্ধের রসাস্বাদনে কোনো কোনো সময়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তথাপি বিষয়ের প্রতি ভালোবাসায় ও চিন্তার স্বাবলম্বনে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধাবলী হয়ে ওঠে চিন্তোদ্দীপক ও কৌতূহলসঞ্চারী। এলিয়ট যে আলোচনার ক্ষেত্রে উপভোগ ও অনুধাবনের ওপর জোর দেন, সরোজবাবুর লেখায় এই দ্বিবিধ দিকই সম্যকভাবে উপস্থিত থাকে। তাঁর আলোচনায় কবিতাই হয়ে ওঠে উপভোগ্য, আবার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে বিশেষ কবিতার গঠন স্পষ্ট ধরা পড়ে, অনেক সাধারণ কবিতাই অসাধারণ রূপে আবিষ্কৃত হয়*। যেমন 'দেবতার গ্রাস' বা 'দুই বিঘা জমি'র আলোচনায় সরোজবাবুর বিশ্লেষণী শক্তি যথার্থ কৃতিত্ব দেখিয়েছে ও বহু-আবৃত্তিধন্য কিন্তু আলোচকদের উপেক্ষার পাত্র এই কবিতা দুটি যে কবিতা হিসাবেই গুরুত্বপূর্ণ, তা তাঁর 'দীর্ঘ কবিতা ও চিত্রকল্পের সংলগ্নতা' পাঠ করার পর আবিষ্কার করতে হয়।[১]

এটা ঠিকই যে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ কবিতার বিশ্লেষণে, ক্লোজরিডিং-এই সম্যক নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, এবং প্রত্যক্ষভাবে কোনো পদ্ধতিগত প্রশ্ন তাঁর 'কবিতা কল্পনালতা' প্রবন্ধ সংকলনটিতে তোলেন নি। কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে, পরোক্ষে একটি পদ্ধতিগত জিজ্ঞাসা তাঁর আলোচনায় উপস্থিত থাকে, আর থাকে বলেই ক্লোজ রিডিং-এ যে ত্রুটি মাঝে মাঝেই দেখা যায়, অরণ্য হারিয়ে গিয়ে বৃক্ষ বড় হয়ে ওঠা, তা তাঁর লেখায় কমই থাকে। কবিতাকে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রকল্পের দিক থেকে বিচার করেন, তাঁর আলোচনা মূলত চিত্রকল্প নির্ভর আর বিচ্ছিন্নভাবে চিত্রকল্পের চর্চা সরোজবাবু করেন না, সমগ্র কবিতার পট ও আরও

---

*কবিতা কল্পনালতা। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। এসেম পাবলিকেশনস, কলকাতা। ন-টাকা

১ যেমন 'মেঘ ও রৌদ্র' যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ গল্প, এটা সরোজবাবুর 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' প্রকাশের পরই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

বৃহত্তর পট তিনি সর্বদাই মনে রাখার চেষ্টা করেন। 'দুঃসময়' কবিতার বিচারে বা রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্পের বিবর্তনের আলোচনায় সেই কারণেই সরোজবাবু অব্যর্থ হতে পেরেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থটি সে-বিচারে কবির তৎকালীন অভিজ্ঞতার "শুদ্ধ দান" বা "নিঃসন্দেহে পরাধীন স্বদেশের বিক্ষুব্ধ জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কবির তৎকালীন ব্যক্তিজীবন এই কল্পনায় অনেকখানি প্রাণশক্তির সঞ্চার করেছে। রাজা, প্রভু, রুদ্র, ঝড় এই সময়ের উপযুক্ত রূপকল্পনা।" অথবা "...পরিশেষ-এর কবিতাগুলির রচনাকালকে পরীক্ষা করা দরকার। ... একালের জাতীয় তাৎপর্য এবং বিশ্বজীবন উভয়ই তখন সংকটকালের সম্মুখীন"—রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প-আলোচনায় সরোজবাবুর এই সব মন্তব্যই দেখায়, তিনি বৃহত্তর পটসংলগ্ন করেই চিত্রকল্পের আলোচনা করতে চান। চিত্রকল্পগুলিকে ধরেন তিনি কবিতার সমগ্র স্ট্রাকচারে। বিষ্ণু দে-র 'এলসিনোরে' ও 'জল দাও' কবিতায় তাঁর এই পদ্ধতি আরও স্পষ্ট—"পঞ্চম দশকের শেষে 'জল দাও' কবিতাটি লিখিত। সময়ের এই বিশিষ্ট পটভূমি কবিতাটিতে ব্যবহৃত।" আর গাঠনিক আলোচনার মূল কথাই হল, শিল্প বা কবিতার বিভিন্ন উপাদানের বিচ্ছিন্ন বিচার নয়, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের টেক্সচারটি স্পষ্ট করে তোলা। সরোজ-বাবু সমগ্র কবিতাটির স্ট্রাকচারের সূত্রে চিত্রকল্পে অবশ্য আসেন না, চিত্রকল্পের সূত্রে সমগ্র স্ট্রাকচারে চলে যান। বলেন, "দীর্ঘ কবিতায় চিত্রকল্পের সংলগ্নতার দ্বৈত ভূমিকা এই। একদিকে তারা সুসার্থক চিত্রকল্প, কাব্যবিষয়ের ছোট ছোট রূপাধার। আর একদিকে তারা ভাবগত গতির ও পরিণতির নিয়ামক এক অন্যতর ব্যাখ্যাতা। এই দ্বৈতকে না বুঝলে কাব্যোপলব্ধি সম্পূর্ণ হয় না।" এই বোধে স্থির থাকেন বলেই, জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন'-এর কেন্দ্রীয় দুর্বলতার প্রতি সরোজবাবু যথার্থ অঙ্গুলিসঙ্কেত করতে পেরেছেন।

অবশ্য সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে সচেতন যে গদ্যের গঠনসূত্র কবিতাতে শেষ কথা নয়। ব্যাকরণসম্মত অন্বয় ছাড়াও কবিতায় বাক্যের অন্য একটি প্রায়-সমান গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাকচার আছে, যা ধ্বনিনির্ভর। এই সচেতনতা থেকেই সরোজবাবু শব্দ সম্পর্কে মনোযোগী হয়ে ওঠেন—দীর্ঘ স্বরধ্বনি জীবনানন্দের কবিতায় কেমন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে সে কথা বলেন। বলেন, "আমি ধ্বনিকল্প বলতে নির্দিষ্ট করছি সেই সব শব্দগুচ্ছকে যারা শব্দের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে চায় আর-এক ধ্বনিকে। এ পাশ্চাত্ত্য অলঙ্কার শাস্ত্রের অনোম্যাটোপিয়া নয়।

তা থেকে স্বতন্ত্র এক কবিকৃতি। যেমন "মধ্যাহ্ন বাতাস প্রলাপ বকিতেছিল।" এখানে বাতাসের যথেচ্ছ মর্মর প্রলাপের ধ্বনির সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। একেই বলা যাক্ শ্রাব্যকল্প। এই শ্রাব্যকল্পেরও দুই রূপ: শব্দরূপ আর আর্থরূপ। শাব্দ-আধার যে কখনো কখনো অর্থসাযুজ্যে নিজেই পরোক্ষ এই ধ্বনিকল্প হতে পারে তার নিদর্শন রবীন্দ্রনাথে অপ্রচুর নয়। 'দুঃসময়' কবিতার "এ যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে," এই চরণটির চারটি এ-ধ্বনি ও দুটি আ-ধ্বনি এক তরঙ্গ-কম্পন সৃষ্টি করেছে—যা চিত্রকল্পের সার্থকতার সঙ্গে যুক্ত করেছে ধ্বনিকল্প।" এই উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট যে সরোজবাবু ধ্বনিকল্পকে মর্যাদা দিলেও, অর্থসাযুজ্যকে কখনোই অবহেলা করেন না। কবিতার ধ্বনি যে শেষ পর্যন্ত চিত্রকল্পকেই ধ্বনী করে তোলে, এ কথা তিনি মানেন। অর্থাৎ তিনি নিরঙ্কুশ মালার্মেপন্থী নন। শব্দের গঠনে ধ্বনিকেই একমাত্র মানেন না—চিন্তা বা ভাবের বাহক হিসাবেও দেখেন। তবে দুঃখের বিষয়, 'কবিতায় শ্রাব্যকল্প ও তার অনুষঙ্গ' প্রবন্ধটি উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্যটির প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নি। তাঁর উদ্ধৃতি-সমূহকে ঠিক ঐ আলোকে বিশ্লেষণ না করে, নিতান্ত মন্তব্যসর্বস্ব আলোচনায় গেছেন তিনি। ল-এর ব্যবহারে কেমন সমীরণের প্রলাপ বকার চিত্রকল্পটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কিংবা যুক্তবর্ণের ব্যবহারে বায়ুর সরসীর বাহুপাশে আবদ্ধ হওয়ার আকস্মিকতা কেমন ফুটে ওঠে, বা এই উদ্ধৃতির তৃতীয় ছত্রে যুক্তবর্ণ কমিয়ে দিয়ে 'সুদীর্ঘ'র দীর্ঘ ঈকারে, 'নিঃশ্বাস'-এর বিসর্গে কিভাবে লুটিয়ে পড়া আভাসিত হয়, সরোজবাবু আর সেসব আলোচনায় গেলেন না। স/শ-এর ব্যবহারে বা ল-এর ধ্বনিকল্পে কেমন নিশ্বসিয়া কেঁদে ওঠা বা উৎসধারার ক্রন্দন বাজছে, সে কথাও তিনি জানান না। সব থেকে বড় কথা, শ্রাব্যকল্পই কেমন চিত্রকল্পকে আরও সার্থক করে তোলে, তার বিশদ বিশ্লেষণে আদৌ তিনি উৎসাহী হলেন না।[২] ফলে এই প্রতিশ্রুতিময় আলোচনাটি ঈপ্সিত সার্থকতায় গেল না।

অবশ্য সরোজবাবুর চিত্রকল্পের মূল্যবান আলোচনাগুলি সম্পর্কেও কয়েকটি জিজ্ঞাসা জাগে। বিশেষত চিত্রকল্প ও প্রতীকের সম্পর্ক নিয়ে। কোলরিজ বলেছিলেন, "a symbol partakes of the reality which it renders intelligible." বিশেষ-সামান্য, সর্বজনীন-সাধারণ, চিরন্তন-সাময়িকতার মধ্যের সম্পর্কেই প্রতীক দাঁড়ায়। এই সম্পর্কটাই মূল কথা। একটির মধ্য দিয়েই

---

২ সরোজবাবু চিত্রকল্প ও বাক্‌প্রতিমা দুটি শব্দই ব্যবহার করেন। সেকি একই অর্থে? তাঁর কাছে কোনটিই বা গ্রহণীয়?

আর-একটি বিচ্ছুরিত হয়। দ্বিতীয়টিতে প্রথমটি বোধগম্য হয়ে ওঠে। চিত্রকল্পে উপমা-রূপক ইত্যাদি একই সঙ্গে পাশাপাশি থাকে, কিন্তু প্রতীকে একটি উপস্থিত, আর-একটি পশ্চাতে। কোলরিজের ভাষায়, একটিই আর-একটির অংশ ভোগ করে, প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণু দে-র কবিতায় প্রতীকের ব্যবহার আছে—যেমন রবীন্দ্রনাথে তরী বা বিষ্ণু দে-তে নদী। সরোজবাবুও প্রতীকের কথা মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ বলেছেন। কিন্তু কেমন করে তারা স্বাধীন হয়ে উঠছে, উভয় কবির কাব্যচর্চার ইতিহাসের পটে সে আলোচনায় সরোজবাবু যান নি। সেই কারণে, তাঁর প্রতীক সম্পর্কে মন্তব্যাবলী শিথিল ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

শুধু তাই নয়, সরোজবাবুর চিত্রকল্পের আলোচনা বিশেষ কবিতার বিশ্লেষণেই মূলত নিয়োজিত। এ বিষয়ে খানিকটা অ্যাকাডেমিক পদ্ধতিকে তিনি অনুসরণ করেছেন। এর ফল হয়েছে দুটো। যখনই তিনি চিত্রকল্প-নির্ভর শব্দসচেতন আলোচনা ছেড়ে অন্যভূমিতে নেমেছেন, তখনই না-অর্থহীন না-তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য লিখেছেন। যেমন তিনি লেখেন, "গভীরের আহ্বানে গভীরের জাগরণ না হলে শ্রেষ্ঠ কবিকর্মের জন্ম সম্ভব নয়।" এই বাক্যটি ব্যাকরণগতভাবে ঠিক, কিন্তু এমনিতে কোনো অর্থবহ নয়। কিংবা 'কবিতার ভাষা' প্রবন্ধটির প্রথমাংশ। প্রথমেই রয়েছে, "যে অপরিহরণীয় ভবিতব্য একান্তভাবে মানুষেরই, য়োরোপে শিল্পবিপ্লবের পরে ব্যক্তি তাকে অনাবৃত তীব্রতায় অনুভব করেছে আপন প্রাতিস্বিক জগতে। নৈঃসঙ্গ্যই সেই অমোচনীয় নিয়তি।" এই বাক্যদুটি শব্দ-সচেতন, কবিতার গঠন-সচেতন কোনো লেখকের কাছ থেকে আশা করা যায় না। বাক্যদুটির যে অর্থ তা নিতান্তই বিতর্কমূলক—এই ভাবে তাকে লেখা যায় না। শিল্পবিপ্লবের পর নৈঃসঙ্গ্যবোধ অপরিহরণীয় ও অমোচনীয় একথা ইতিহাসসচেতন ব্যক্তি স্বীকার করবেন না। ব্যক্তি, ইতিহাস ও প্রকৃতির সমন্বয়ে অন্য ইতিহাসও আছে। কোনো জায়গায় সরোজবাবু বলছেন কবিতার ভাষা মানে ভাবের ভাষা, আবার অন্যত্র বলেন, কবিতার ভাষা কবিতার আত্মার ভাষা—দুটো কি এক? আসলে সরোজবাবু তাঁর মূল পদ্ধতি থেকে যখনই সরে গেছেন তখনই এই অনির্দিষ্ট বাক্যাবলী এসেছে। কিন্তু এরপরই যখন 'বিম্ববতী' কবিতার গাঠনিক-সিদ্ধির আলোচনা শুরু করেছেন, তখনই তাঁর আলোচনা আলোকসম্পাতী হয়ে উঠেছে। এর থেকেই দ্বিতীয় বিপদ এসেছে—সরোজবাবুর পদ্ধতিগত সংকট ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে। বিশেষ কবিতার আলোচনায় তাঁর

স্বাবলম্বী চিন্তা ও পদ্ধতির কার্যকারিতা প্রমাণ করে, তিনি আর এগোতে পারছেন না। ফলে পথ খোঁজার অস্থিরতা তাঁর কোনো কোনো লেখায় বিদ্যমান—যেমন 'অনাবৃত সীমান্ত'। এ প্রবন্ধে চমৎকার তিনি বলেন, "ব্যক্তিজীবনের সঙ্কট, এবং স্বদেশের নানা অসঙ্গতির মাঝে এই নীরবকেই কবি (রবীন্দ্রনাথ) জেনেছিলেন গভীরতার বাস্তবতা বলে।" বা নিঃশব্দের আলোচনার শেষে যথার্থ মন্তব্য করেন, "এ আসলে শব্দকেই পুনরুদ্ধার। শব্দকে খণ্ড করে অথবা বিসর্জন দিয়ে মানুষের অন্তর্বর্তী এই অন্তহীনতাকে মূর্ত করা যাবে না।" এই বোধেই সরোজবাবু নিঃশব্দের ফ্যাশনেবল আলোচনার চোরাবালিকে এড়িয়ে যান। কিন্তু তাঁর পদ্ধতিগত সমস্যার কোনো সমাধান হয় না। চিত্রকল্প, শব্দ-নির্ভর আলোচনার, কবিতার গঠনের বিশ্লেষণের নৈপুণ্য একটি কবির সামগ্রিক বিচারে কোথায় পূর্ণতা পাবে, সরোজবাবু এ বিষয়ে এখনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি বলেই অনাবৃত সীমান্তর অবিষ্কারে বার হন—শুরু করেন সেণ্ট জন থেকে। যদি তাঁর একটি বিশেষ কবিতার স্ট্রাকচারের আলোচনাকে আরও বৃহত্তর স্ট্রাকচারে প্রত্যক্ষত অন্বিত করতে পারেন, তবেই তাঁর পদ্ধতিগত সংকটের একটা সমাধান পাওয়া যায়। কবির কাব্যগ্রন্থ, সমগ্র কাব্যজীবনের স্ট্রাকচার, তারপর কবির শ্রেণীর স্ট্রাকচার, তার ওপর দেশের বৃহত্তর স্ট্রাকচারে একে একে আলোচনাকে বিন্যস্ত করতে পারলেই রবীন্দ্রনাথের মতো মহত্তম কবির কবিতার চিত্রকল্পের আলোচনা অর্থময় হয়ে ওঠে। বিষ্ণু দে বা জীবনানন্দ দাশও তবেই স্পষ্ট হতে পারেন। সরোজবাবুও যে এ ব্যাপারে একেবারে অচেতন, তা নয়। চিত্রকল্পের আলোচনাতেই, আমরা দেখেছি, সাধারণভাবে যে পটভূমিকা বলা হয়, সে বিষয়ে তিনি মনোযোগের স্বাক্ষর রেখেছেন। এ ছাড়া, তাঁর 'তৃতীয় পাণ্ডবের প্রবেশ ও প্রস্থান' প্রবন্ধটি এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মধ্যবিত্তশ্রেণীর ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে অর্জুন আধুনিক বাঙলা কবিতায় কেমন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তা চমৎকারভাবে এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে। এই পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর চিত্রকল্প-নির্ভর আলোচনাপদ্ধতি মেলাতে পারলে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলা কবিতার ওপর আলোচনার যে অপরিসীম তাৎপর্যপূর্ণ ধারার পত্তন করেছেন তা পূর্ণতা পাবে। আশা করি, আমাদের এ আশা তিনি পূর্ণ করবেন। এখনও পর্যন্ত একই প্রবন্ধে দুটি পদ্ধতিই তিনি অনুসরণ করেছেন, কিন্তু পৃথকভাবে, একই স্ট্রাকচারের অঙ্গ হিসাবে নয়।

জীবন অবাধ জীবন অগাধ

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

চমকে গিয়েছিলাম প্রথম বিজ্ঞাপনে। দ্বিতীয়বারেও ঘোর কাটে নি। 'হাংরাস'* মানে কি?

মানুষের মনের ভেতরে মন কাজ করে। দেওয়া-নেওয়া চলে মনে মনে, কাজে অকাজে। তারই ফাঁকে ফাঁকে শব্দের জন্ম হয়। ভাষা গড়ে ওঠে। মানুষের বুকে বুকে ঘুরতে ঘুরতে ভাবনাগুলো ছড়িয়ে পড়ে মুখে মুখে। ছড়াতে গিয়ে পুরনো শব্দ ভেঙে যায়। নতুন কথার জন্ম হয়। হাঙ্গারস্ট্রাইক কতো অনায়াসে হাংরাস হয়ে ওঠে, বিশ সালের আন্দোলনে মাহাতোদের নেতা সরডিহা-র সেই পাকাচুল চাষীর মুখে। আর একথা কে না জানে, মানুষের বুকে মুখে ভাঙা গড়া এবং জন্ম যাদের সেইসব সামান্য শব্দ মুকুটে মণির মতো কবিতার অসামান্য অঙ্গ হয়ে ওঠে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে, কি আশ্চর্য বিস্ময়ে।

মনের ভেতরে ভয় ছিল। কারণ কবিরা অনেকেই ততোদিনে হাঁটতে হাঁটতে হাজির উপন্যাসের মেলায়। আসর বসার পর দেখা গেল কেউ এনেছেন জনপ্রিয় কোনো লেখকের কোনও কোনও গল্পের পুনরাবৃত্তি, কেউ স্মৃতিকথার মিষ্টি মোলায়েম স্পর্শ। একমাত্র ব্যতিক্রম সম্ভবত শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তিনি যখন সমস্ত রাত কলকাতায় কলকাতায় দয়িতাকে হারিয়ে খুঁজে হারিয়ে খুঁজে ক্লান্তিতে ঘরে ফিরে—তবে কি সে সারাক্ষণ ঘরের ভেতরেই, তাকে রেখে আমিই কি তবে পথে পথে তাকে এতোক্ষণ···এইসব বলেন, তখন বুকের ভেতর মোচড় খাওয়া ব্যথা আনন্দ সংশয় এইসব অনুভূতি একাকার মহৎ হয়ে ওঠে। যদিও শক্তি যথারীতি চমক-ধমকের লোভ এড়াতে পারেন না অলিতে গলিতে।

ভয় পার করে এতো চেনা অথচ এতোই অচেনা প্রতিবেশীদের খুব কাছে নিয়ে তাদের দুঃখসুখ হাসিবেদনার ঠিক মাঝখানে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিতে মোটেই সময় লাগে না সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। এবং সমস্ত ব্যাপারটা তিনি ঘটান

---

* হাংরাস। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা। দশ টাকা

কি অসম্ভব অনায়াসে, স্নিগ্ধতায়। এবং তা-ও এমন এক ভুবনভোলানো দেশভাঙা দেশগড়া মন্ত্রের মোহ ও মোহমুক্তির প্রেক্ষাপটে—যেখানে অনেক রক্তের দাগ, অনেক রক্তের স্বাদ। এমন লিপ্ত এবং নির্লিপ্ত গলায়, এমন চিকন আপত্তির ইঙ্গিতে এবং একটুও তিক্ততা না এনেও কেমন করে লেখা যায় সেসব কথা: একমাত্র সুভাষই বোধহয় পারেন।

একজন আম্মা ছিলেন। সত্যিকারের বেঁচে থাকা মানুষের বিবেকের মতো তিনি। নিজের মধ্যবিত্ত সন্তানদের কাজে ও কথায় অনাত্মীয়তা দেখে তিনি যখন জ্বলে ওঠেন, পুড়ে যান, দুঃখে প্রায় ফেটে পড়ে যখন বলেন, "এতোক্ষণ ভেবে-ছিলাম তোরা স্বদেশি করিস, অন্ততঃ তোরা এসে আমার পাশে দাঁড়াবি," তখন তিনি এমনই জীবিত যে চোখের সামনে তাঁকে দেখতেই হবে। এবং তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বুকের ভেতর অনেক পাপের গ্লানি ভার হয়ে উঠবেই।

অরবিন্দ সেই আম্মার দৌহিত্র। আসলে তিনি মায়েরই মতো। অরবিন্দ কমিউনিস্ট। পার্টির কাগজে কাজ করত। তারই মাঝখানে অরবিন্দ ইণ্টারভিউ নিচ্ছে বাদশার। আব্দুল রোডের ধারে মণ্ডলপাড়ার মুসলমান বসতির ছেলে বাদশা, ছোটখাট শ্রমিকনেতা। অরবিন্দর কথা এবং বাদশার কথার মধ্যে দিয়ে কাহিনী স্তর থেকে স্তরে চলে যায়। সব কটি স্তর পার না হয়ে 'হাংরাস' কিছুতেই বন্ধ করা যায় না।

বাদশার কথা তার ঘর ছাড়িয়ে গ্রাম, তা ছড়িয়ে সমাজ—গ্রামশহরের গরীব মানুষের সমাজ—তা ছাড়িয়ে কারখানা এবং তারপর শ্রমিকশ্রেণী ও তার লড়াইয়ে পৌঁছে যায় কথার ছলেই। যেন আপনা থেকেই। তার মধ্যে দিয়ে একটা মানুষের গড়ে ওঠা, অনেক মানুষের বেড়ে ওঠা এবং না-ওঠা, সমগ্র সমাজের যাত্রা ছবি হয়ে ভাসতে থাকে চোখের ওপর। সে ছবিতে হাসিও থাকে, কান্নাও। জিতে যাওয়া থাকে, পরাজয়ও। সবই থাকে। যেমন থাকে জীবনে।

অরবিন্দর কথার মতো বাদশার কথা তেমন গতিতে ছোটে না যদিও, সে আমাদের একটানে নিয়ে যায় দুবেলা চোখে পড়া এবং প্রায় একবারও না দেখা পশ্চিম বাঙলার মুসলমান সমাজের বুকের মাঝখানে। সে-সমাজের মাঝের মহল এবং নীচের মহলের একেবারে অন্দরে, অন্তরে। পড়তে পড়তে বিস্ময় সীমানা ছাড়িয়ে যায়, সুভাষ এতো জানলেন কি করে! তাঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান,লোকাচার, প্রাত্যহিক জীবনের নানা ডিটেইল এমন করে আয়ত্ত করা এবং তার চেয়ে বড়ো

কথা অচর্চিত এইসব ব্যাপার ও শব্দগুলিতে এমন অনায়াস গতি দেওয়া, প্রায় অবিশ্বাস্য। 'হাংরাস'-এ পীর, মুরীদ, মুরিদান, দোয়াতাবিজ, ওরস দাওৎ, শরীয়তের খেলাপ কিংবা বোরোবত্রিশের কথা পড়তে পড়তে ওপার বাঙলার সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্-র বিখ্যাত উপন্যাস 'লাল সালু'র কথা মনে পড়ে যায় বারবার। যদিও তার বিষয় ভিন্ন, বলার কথাও অন্য। ধর্ম, মসজিদ, পীর, মুরিদান এবং মহব্বতই তার প্রধান, প্রায় একমাত্র, উপজীব্য।…এমন কথা কারো কারো মনে হতেও পারে—কোথাও কোথাও এসব একটু কম হলেও 'হাংরাস'-এর রসহানি ঘটত না। তবু সন্দেহ থেকেই যায় এই বিস্তারটুকু বাদ দিয়ে মণ্ডলপাড়ার ছবিটি চরিত্রগুলি এবং তাদের নিতান্ত নিজস্ব পরিবেশটুকু গড়ে তোলা যেত কি, যায় কি!

বাদশা অনেক খোলামেলা প্রাণের সাদামাটা স্বভাবের মানুষ। গ্রামের সর্বহারা পরিবারের ছেলে, মজুরদের মাঝখানে পৌঁছে অবশেষে একটা লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছে। এখন সে বেগে ধেয়ে যেতে চায় সামনে। তার সংশয় কম। দ্বন্দ্বে ভোগে না সে। ভাবে যত, করে তার চেয়ে বেশি। তার স্বভাবে ঝড়ের একটা ইশারা আছে।

অরবিন্দ অন্য মানুষ। তার ইনট্রোভার্ট স্বভাবে সংশয়ের শেষ নেই। জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। নিয়তই দ্বন্দ্বের কোলাহল। কোলাহল বলা ভুল হল। 'হাংরাস'-এ কোথাও কোলাহল নেই। এমন-কি যখন পথে মিছিল হয়, জেলের ভেতরে গুলি চলে—তখনও নেই। সুভাষ মুখোপাধ্যায় পরম যত্নে কণ্ঠস্বর নিম্নগ্রামে রেখেছেন শেষ অবধি। অনেক নাটকীয় ঘটনা ঘটে। কিন্তু কোথাও তারা নাটক হয়ে যেতে পারে না। বরং কখনও-বা কবিতা হয়ে যায়, সুভাষেরই কবিতার মতো। সহজ স্বরটা যাতে কেঁপে কেঁপে না ওঠে, বিদ্রোহে বা মৃত্যুতেও, সে বিষয়ে অসম্ভব সচেতন তিনি। এবং সার্থকও। অনেক কঠিন কথা গভীর কথা তিনি এমন সহজে সরলভাবে বলেন যে মনে হয় তারা যেন আপনা থেকেই হয়ে উঠল, কারো গড়ে তোলার অপেক্ষা না রেখেই।

সহবন্দী বরুণবাবুর সঙ্গে সাহিত্যের ব্যাপারে অরবিন্দর মেলে না। তিনি মার্কসবাদকে মাথায় করে রাখলেও সাহিত্যের ত্রিসীমানায় তাকে ঢুকতে দিতে রাজী নন। আবার তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গেও সহমত নয় সে। তাঁরা বলেন, সাহিত্য তো প্রচারের মাধ্যম মাত্র। এই বিতর্কে, বেশ বোঝা যায়, অরবিন্দর ভেতরে ভেতরে কোথাও একটা কিছু ছিঁড়ে যাচ্ছে। লেখক সে বিষয়ে নীরব।

তিনি শুধু একটি বাক্যে তাকে প্রকাশ করেন : "অ্যাও নয় অও নয়, তা হলে কি ?"

অনশনব্রতী খায় না। খাবেও না কিছুতেই। অথচ ফোর্স ফিডিং-এর পর "পেটের মধ্যে গরম দুধ যাওয়ার সেই পরম আরামের অনুভূতি"র কথা অরবিন্দ ভুলতে পারে না কিছুতেই। এমনটি ঘটার কথা নয়। ঘটা উচিত নয়। তবু যে ঘটে ! এবং এইসব ব্যাপার সে বোঝে বলেই বলে : "আমি মধ্যবিত্ত। আমাকে নিয়েও ভয়।" এই কথা মনে হতেই সন্ন্যাসী কমিউনিস্টের মতো আত্মশুদ্ধির আগুনে ঝাঁপ দেয় না সে। পার্টিতে হয় 'কৌপিন আঁটা' নয় 'কাছা-খোলা' যে দুটি দল আছে তার কোনোটিতেই সে নেই। বরং বন্ধু জুটিয়েআড্ডা বসিয়ে দেয়। সেখানে চলে নিষিদ্ধ আলোচনা—খাওয়াদাওয়ার গল্প। "যারা মনে করে খাওয়ার কথা মনে করাটাই পাপ তারা মন থেকে সেই পাপ বার ক'রে দিয়ে বোঝা অনেকটা হালকা করতে পারছে।" আড্ডাধারীরা অনেক গবেষণা করে আড্ডার নাম দেয় 'কারখানা'। 'খামার' নামটা বাতিল, কারণ ওতে মার আছে।

অথচ পার্টির লাইন অনুসারে রবি ঠাকুরকে ধরাশায়ী করার জন্যে অনেকদিন ধরে চোখা চোখা বাণ শানিয়ে রাখে অরবিন্দ। তারপর ভাষণ দিতে উঠে সব যায় উলটে। উগ্রপন্থী বন্ধুরা বিদ্রূপ করে : "আপনি, কমরেড, তা হলে শোষক জমিদারদের পক্ষে ?" অরবিন্দ কি কষ্ট পায় ? হয়তো পায়। রাগ করে ? অরবিন্দ প্রায় কখনোই রাগ করে না। যদিও মনে মনে, অভিমান পুষতে পুষতে, নিঃসঙ্গ নির্জনে দাদু এবং আরো অনেকের সঙ্গে কলহ করতে করতে নিজের কাছে ঘোষণা করে, সারা বিশ্বের ওপর রেগে গেছে সে, রেগে আছে। এবং পরক্ষণেই মনে পড়তেই যোগ করে, "একমাত্র কমরেড স্টালিন ছাড়া।" আসলে সে রাগ করে না কখনোই।

"পুরনো কথা আজ লিখতে গিয়ে অনেক গম্ভীর জিনিসকে আমি হালকা করে ফেলছি।" একেবারে আউটসাইডার অথবা অতিরিক্ত লিপ্ত কেউ অরবিন্দর এই উক্তিকে হালকাভাবে না-ও নিতে পারেন। কিন্তু একটা কথা মানতেই হবে, 'হাংরাস'-এর এ মলাট থেকে ও মলাট কোথাও ক্রোধ নেই। বিদ্বেষ তো নেই-ই। অথচ রাগ হতেই পারত। হওয়ার অনেক কারণই ছিল।

মানুষজন, মোড়লটোড়লদের কাছে কতো মান পান বলে গাল্পগল্প করে বেড়ানো বাদশার বাপজান যখন ছেলের সামনে হেনস্তা হন, যখন ছেলেও বোঝে

বাপও বোঝে, শুধু ব্যথার গ্লানিটুকু আড়াল করার জন্তেই যেন বোঝার ব্যাপার-টুকু ঢেকে রাখে দুজনেই—তখন তলস্তয়, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের চেনা চরিত্রগুলি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। চোখ জ্বালা করে। তবু রাগ হয় না।

বিপ্লব হল না। বোঝাই যাচ্ছে হওয়ার কথাও ছিল না। অনেক প্রাণ তবু গেল এ বোঝার দায় বয়ে। তখনও যাচ্ছে। জেলের মধ্যে, বন্ধ ঘরে, পথে এবং সিঁড়িতে গরম শীষের গুলি বুকে নিয়ে মরছে "মিষ্টি মায়াবী মুখের" কনক এবং কনকের মতো আরো অনেকে। ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কোথাও একটা ফাঁকি ছিল। কোথায়? কোথাও একটা ভুল ছিল। কার ভুল? কার হুকুমে বন্ধ ঘরে এমন নির্মম গুলি ছোটে? কার মূঢ় নির্দেশে কনকরা বুক পেতে দেয় সেই গুলির সামনে?

রাগ হতেই পারত। তবু রাগ নেই কোথাও। বরং সংযত-সহানুভূতিতে, 'হালকা' কথার ছলে, অনেক তিক্ততাকে মানুষের প্রাণের স্পর্শ দিয়ে ঢেকে রেখেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ইতিহাসের কোনো পর্যায়কে বিচার করার চেষ্টাও করেন নি তিনি। কিছু ঘটনা, খুবই বড় ঘটনা, ঘটে যাওয়ার আগে পরে এবং মাঝখানে একটি মানুষ, দুটি মানুষ, কিছু মানুষের মনে আর মননে যা ঘটে যায় তাই নিয়েই তাঁর ভাবনা। ইতিহাসের কোনো গতি, বৃহৎ সব ব্যক্তিত্বের বিচ্যুতি অথবা পার্টির কোনো ত্রুটি 'হাংরাস'-এ বড় কথা নয়। দু-হাতের দশ আঙুলে জেলের লোহার জাল আঁকড়ে ধরে ফোর্স ফিডিং-এর আগে ডাক্তারের সঙ্গে, এবং নিজের সঙ্গেও, লড়াই করতে করতে অনশনব্রতী বিপ্লবীর চোখে পড়ে যায় "ন নম্বর ওয়ার্ডের মাথায় সেই চারাগাছটা প্রাণপণে কার্নিশ আঁকড়ে রয়েছে।" সেই চারাগাছের মতো জীবনই সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে আলোড়িত করে, তাঁর কলমকে নাড়ায় চালায়। 'হাংরাস'-এও তাই ঘটেছে।

এবং সেই জীবন থেকে উঠে আসা মানুষগুলোই 'হাংরাস'-এর সম্পদ। অল্প কথায় সাধারণ সেই মানুষগুলির অসাধারণ ছবি এঁকেছেন তিনি। 'হাংরাস' শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও, চোখ বুজলেই চোখে পড়ে—জেলের মধ্যে, অল্প অন্ধকারের বিকেলে, ছেলের ফটো ধরে কথা বলছেন সুবিমলবাবু। মণ্ডলপাড়ার টুনিবুড়ি কেবলই মনে করিয়ে দেয় ইন্দির ঠাকরুণকে। মাঠে জঙ্গলে ঝোপঝাড়ে ঘুরতে ঘুরতে, টুনিবুড়ির দশপাশে ছুটোছুটি করতে করতে, কোঁচড় ভরে কুল কুড়োতে কুড়োতে বাদশা আর তার দিদি সময়ের প্রাচীর পার হয়ে যেন অপু আর দুর্গা হয়ে যায়। আবদুল পকেটমার কিংবা ফালতু হরির বানানো গল্পও

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় (এই আবদুলই কি জেল থেকে বেরিয়ে কবিতার বই ছাপার জন্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে টাকা দেবে বলেছিল ?)। আর দেশবন্ধুর মিছরি ছোঁড়ার দৃশ্যটি ! পা ছড়িয়ে দোতলার জানলায় বসে আছেন তিনি। মাঝে মাঝে মিছরির টুকরো ছুঁড়ে দিচ্ছেন মাঠে। কয়েদীরা হুটোপুটি কাড়া-কাড়ি করে কুড়োচ্ছে। বৃদ্ধ কয়েদী শেখ বাঙালের গম্ভীর মন্তব্য : "বাবু বায়োস্কোপ দেখতে বড়ো ভালোবাসতেন।" ভাবা যায় না !

হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো মূল কাহিনীর ধারায় প্রেমের কথাও এসেছে। এ প্রেম যেন পূর্বরাগের পূর্বাভাসই। প্রতিমাদের কাহিনীতে নামের প্রতীকী ব্যাপারটা ছাড়া অন্য কিছু তেমন রক্তমাংস পায় নি। বরং সোনারেনকে নিয়ে হাড়কলে যা ঘটে যায় তাতে অনেক নাটকীয়তা আছে। এবং অসম্ভব সম্ভাবনা নিয়ে উমা শুধু অরবিন্দর পেটে, এবং বুকেও, খোঁচা মেরে দূরে চলে গেছে। অথচ যেতেও তো পারে নি। হাঙ্গেরি থেকে পাঠানো তার পাইপ অরবিন্দ যত্নেই রেখেছে তো !

এইসব ব্যাপারের গা ঘেঁষে সুখের সঙ্গে দুঃখের কি সহবাস ! বাদশার বুড়ো বুবু কিরে কেটে টেনে টেনে বের করছে মা-র শেষ কড়িটিও : "বল, ছেলের মাথায় হাত রেখে বল নেই—।" বয়সে বেঁকে যাওয়া শাশুড়ীর চীৎকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিদ্বেষে জ্বলে মরছে বউ। পয়সাটা ঠকাস করে মাটিতে ফেলে দিয়ে রাগে হাঁপাচ্ছে। উঠোন থেকে তা কুড়িয়ে নিয়ে খুশিতে নাচতে নাচতে যে চলে যাচ্ছে সে তো তার পেটের ছেলেই। কি যে প্রাণান্ত এ জ্বালা, কতো যে প্রাণে ভরা !

এই প্রাণ, এই জীবন, এই জ্বালা আর এই মানুষই 'হাংরাস'-এর আসল কথা। যে বিপ্লব হয় নি তা নিয়ে কোনো পরিতাপ নেই। কমরেড প্রসাদের চলে যাওয়া এবং কমরেড তোড়করের মঞ্চে আসার মধ্যে দিয়ে পার্টি যেখানে পৌঁছেছে তা নিয়ে কিছু কথা হয়তো বলার আছে। ইশারায় ইঙ্গিতে কিছু ব্যঙ্গও হয়তো করার আছে (কমরেড চৌধুরী, যাঁকে সবাই শুধু চৌধুরী বলে, জিতেনবাবু ও হরেনবাবুকে তো জেতেনবাবু ও হারেনবাবু-ই বলেন)। কিন্তু কোনও রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই। এবং সম্ভবত কোনও বিষাদও নেই। বরং যে বিপ্লব হয় নি, হওয়ার নয় তখনও, তার সৈনিকদলের ভেতর থেকে একটা মানুষ, নির্ভেজাল আস্তো একটা মানুষের জন্ম কিংবা হয়তো পুনর্জন্মের আভাস যেন পাওয়া যায়। এবং তা-ও অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে। চিকন ইঙ্গিতে।

হাঙ্গারস্ট্রাইক ভাঙার পর আচ্ছন্ন ভাবের মধ্যে অরবিন্দ যেন "পার্টিকে একটা চিঠি" লেখে। তার আরম্ভটা হল—

"প্রিয় কমরেড, আজ আমার জন্মদিন।...

"চিঠিতে আমি চাইছি পার্টির সদস্যপদ। আমি জানাচ্ছি যে, অগ্নিপরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হয়েছি। আট বছর ধ'রে সদস্য থাকলেও আমি চাইছি সেটা খারিজ ক'রে দিয়ে আমাকে নতুন ক'রে সদস্যপদ দেওয়া হোক।"

এ যেন জীবনের প্রান্ত পেরিয়ে উধাও তত্ত্বের হাত ছাড়িয়ে জীবনের নিয়মেই আবার ফিরে আসা প্রাণের প্রাঙ্গণে। যে প্রাঙ্গণে হয়তো একদিন এমন ভাবনার ফুল ফুটবে, যেতে যেতে এমন এক পথের সঙ্গে দেখা হবে, যেখানে তত্ত্বের বাক্য এবং প্রাণের গান এক এবং একাকার। সেই কারণেই হয়তো অনশনব্রতী অরবিন্দ মোটা মোটা বই পড়ে আর পণ্ডিতদের সাক্ষ্য মেনে জীবনের বাস্তবতা এবং দ্বান্দ্বিকতা বোঝার চেয়ে অন্ত্যজদের পাড়া থেকে ধুলো পায়ে হেঁটে আসা এক তরুণের কাছে জীবনের গান শুনতে বেশি আগ্রহী, যে-জীবনে হাসি-কান্না-প্রেম-দ্বেষ-সুখ-দুঃখ-জয়-পরাজয়-আশা-বিষাদ এবং সমস্ত কিছুই আছে এবং সত্যের মতোই উজ্জ্বল-ম্লান-উজ্জ্বল হয়েই আছে। এই জীবন এবং এই সত্যের ছোঁয়াছুঁয়ি থাকে না বলেই তো যে-বিপ্লব হয় না, হওয়ার নয়, সেই বিপ্লবের বন্ধ্যা মন্ত্র জপ করতে করতে অরবিন্দর ছোটমামা আম্মার কাছ থেকে সরে যেতে যেতে বিলেত চলে যায়। আর ফেরে না। আসলে আমরা তো চাই এমন এক বিপ্লব যা আম্মাকে যেমন গোর্কির মা করে তুলবে, ছোটমামাকেও করে তুলবে পাভেল। এবং প্রাণ দেওয়া নেওয়া খেলা নয়, বিপ্লব হয়ে উঠবে মানুষের প্রাণবন্যার অনন্ত উৎসবের উৎস, সৃষ্টির উদার আকাশ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'হাংরাস'—নামেই যার মাটির সোঁদা গন্ধ, কারখানা থেকে বেরিয়ে আসা মানুষের শরীরের ঘাম আর কালির স্পর্শ—আসলে হয়তো সেই বিপ্লবের পক্ষে প্রয়োজনীয় মানুষগুলোকে বোঝার, খোঁজার, এক আশ্চর্য আন্দোলনেরই পূর্বাভাস।

হীরেন্দ্রনাথের ভারতবোধ

প্রদ্যোৎ গুহ

প্রায় এক দশক আগে 'অল্পে সুখ নেই' নামে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের যে প্রবন্ধ সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল, এক হিসেবে বলা যেতে পারে 'মার্কসবাদ ও মুক্তমতি' * তারই জের ; সময়ের দিক থেকে তো বটেই, বক্তব্যের দিক থেকেও বটে। 'অল্পে সুখ নেই' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে, পরবর্তী প্রায় আর-এক দশকের চিন্তার ফসল সমাহৃত হয়েছে 'মার্কসবাদ ও মুক্তমতি'তে। জের বলছি শুধু সে-কারণেই নয়। 'অল্পে সুখ নেই' সংকলনের অন্তর্গত 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ' শীর্ষক রচনায় মার্কসবাদ ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সাঙ্গীকরণের যে প্রশ্নটি অত্যন্ত জোরালোভাবে উত্থাপন করেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ, 'মার্কসবাদ ও মুক্তমতি'তে নাম-প্রবন্ধ ছাড়াও একাধিক প্রবন্ধে তারই জের টেনেছেন তিনি। তবে এই সব প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্যকে আরও একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হলেও, নানা সময়ে লেখা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধে তাঁর এই প্রস্তাব, যাকে প্রায় একটা নতুন তত্ত্বই বলা যায়, পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। এ-জন্যে প্রয়োজন ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার এবং হীরেন্দ্রনাথ ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে যেরূপ পাণ্ডিত্যের অধিকারী তাতে এ-কাজ তিনি অনায়াসেই করতে পারেন। আশা করব, তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত সুপরিণত মননের সেই ফসল আমাদের সকল সংশয়ের অবসান ঘটাবে।

আপাতত অবশ্য ভয়ে ভয়ে একটা কথা না বলে পারছি না, মার্কসবাদের ভারতীয়করণের প্রস্তাবটা হীরেন্দ্রনাথ যেভাবে উত্থাপন করেন তাতে এই সমালোচকের মনে নানা সংশয় দেখা দেয়। কথায় আছে চুন খেয়ে মুখ তাতলে দই দেখে ভয় হয়। মার্কসবাদের চীনাকরণের যে-পরিণাম আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি তাতে এ ধরনের কথা শুনলেই গায়ে জ্বর আসে। কিন্তু সংশয় শুধু সে-কারণেই নয়। মার্কসবাদের ভারতীয়করণের প্রকরণ হিসেবে ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তার সাঙ্গীকরণের যে-প্রস্তাব তিনি করেন তাতে মন সায় দিতে

* মার্কসবাদ ও মুক্তমতি। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বাক-সাহিত্য, কলকাতা। আট টাকা

অনিচ্ছুক হয়। ধর্ম সম্পর্কে এ-সমালোচকের অনীহা মজ্জাগত। কিন্তু এটা কোনো ব্যক্তিগত রুচি-অভিরুচির প্রশ্ন নয়। আসল কথা হল ইতালি কি পোল্যাণ্ডের মতো ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী দেশে জনজীবন যেভাবে ধর্ম এবং ধর্মসংস্কার সঙ্গে বাঁধা, ভারতে তা নয়। ওসব দেশে কিংবা মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে ধর্ম যেভাবে জনজীবনকে প্রভাবিত করে, এদেশে তা করে না।* অতএব ওসব দেশে ধর্মসংস্থা ও কমিউনিস্ট আন্দোলন বা রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নটা যেভাবে দেখা দিয়েছে, আমাদের দেশে তা দেখা দেয় নি, কোনোদিন দেবে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। সুতরাং, ওসব দেশ এ-ব্যাপারে যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে, মার্কসবাদ ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সাঙ্গীকরণের জন্য আমাদেরও সে-পথ ধরে চলতে হবে এ-প্রস্তাব সহসা মেনে নেওয়া অনেকের পক্ষেই কঠিন হয়ে পড়বে।

তবে, একথা অবশ্য স্বীকার্য, মার্কসবাদের সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের সাঙ্গীকরণের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ভারতবর্ষে মার্কসবাদ একটা চূড়ান্ত নিয়ামক শক্তি হিসেবে দেখা দিতে পারবে কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসার উপরই তা বহুল পরিমাণে নির্ভর করবে। বিতর্ক তা নিয়ে নয়—ভারতীয় ঐতিহ্য বলতে আমরা কি বুঝি এবং তার কতটুকু এবং কোন অংশ গ্রহণযোগ্য—যত বিতর্ক তা নিয়েই। আর এ-বিতর্ক নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল ধরে চলবে এবং চলা উচিত। ভারতের মতো বিশাল দেশের হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য সংক্রান্ত প্রশ্ন এক নিমেষে সমাধান হয়ে যাবে এমন অর্বাচীন আশা নিশ্চয়ই কেউ পোষণ করে না।

'মার্কসবাদ ও মুক্তমতি'তে হীরেন্দ্রনাথ যে-বক্তব্য উপস্থিত করেন তারই আরও একটু বিশদ অনুসৃতি 'ভারতবর্ষ ও মানবিকতা' প্রবন্ধটি। স্বভাবতই এ-প্রবন্ধের অনেক প্রতিপাদ্যের সঙ্গেও অনেকেই হয়তো দ্বিমত হবেন। বিশেষ করে মানবহিতবাদ (humanitarianism) এবং মানবিকতাবাদকে (humanism) তিনি যেভাবে একাকার করে ফেলেন তাতে কজন সায় দিতে পারবেন জানি না। হীরেন্দ্রনাথ নিজেই যে এ-ব্যাপারে সংশয়মুক্ত তা নন। তিনি লেখেনও, "আর কেউ কেউ শাসাবেন যে পরোপচিকীর্ষা মানবিকতার সঙ্গে সমার্থক নয়, পরদুঃখে বিগলিতহৃদয় মহানুভবতার সঙ্গে মানবিকতার প্রভূত প্রভেদ আছে। সংজ্ঞার বিচার করতে গেলে অবশ্যই সে-প্রভেদ আছে" (পৃ ২৬)। আবার তারপরে ঐ একই বাক্যে প্রায় এক নিঃশ্বাসেই লেখেন, "কিন্তু দুর্গতের আর্তি দূর করার কামনার সঙ্গে মানবিকতা সম্পর্কশূন্য নয়। কাকতালীয় ন্যায়ের

উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন , কিন্তু মানবিকতা ও মানবদুঃখে বিচলিতির মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ না থাকলেও নিকট সম্পর্ক আছে।" এবং শেষ পর্যন্ত যেভাবে যুক্তি ও তথ্য হাজির করেন তাতে দুয়ের মধ্যে আর কোনো পার্থক্য থাকে না। চণ্ডীদাসের "সবার উপরে মানুষ সত্য"পংক্তিটির পরবর্তীকালের মনের মাধুরী মেশানো যে-ব্যাখ্যা তিনি উপস্থিত করেন, তা-ও বৈজ্ঞানিক বিচারে টিকবে কিনা সন্দেহ। তবে তাঁর সঙ্গে সব বিষয়ে একমত যদি না-ও হই তাহলেও এটা স্বীকার করতেই হবে, তাঁর অনেক যুক্তি সহসা উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়, ধীরস্থিরভাবেই তার বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

এই পর্যায়ের তৃতীয় রচনা 'ধর্ম, শুভবুদ্ধি ও মার্কসবাদী সংগ্রাম'-এর সঙ্গে, বলতে স্বস্তি পাই, অনেক বিষয়েই একমত হতে পারি। বলতে কি এই রচনাটি সংকলনের অন্তর্ভুক্ত না হলে হীরেন্দ্রনাথের প্রতি অবিচারের সুযোগ থেকে যেত।

এই সংকলনে রচনার সংখ্যা উনিশটি। লেখকের ভাষায় "বহু বিষয়ের উত্থাপন প্রবন্ধগুলিতে ঘটেছে।" এর মধ্যে দুটি হল অত্যন্ত সুলিখিত এবং তথ্যবহুল ভ্রমণকাহিনী—'মোঙ্গোলিয়ার জনগণরাজ্যে' এবং 'দেশে দেশে বান্ধব'। দুটি—'দুর্গংপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি' এবং 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা'—১৯৬৮ সালের চেকোস্লোভাক সংকট সম্পর্কে।

চেকোস্লোভাক সংকটের সময় পশ্চিমবাঙলার কিছু বুদ্ধিজীবী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে সংবাদপত্রে যে-বিবৃতি দিয়েছিলেন এই প্রবন্ধদুটিতে হীরেন্দ্রনাথ তীব্র আবেগবিদ্ধ অথচ ব্যক্তিগত বিদ্বেষহীন সংযত ভাষায় তার সমালোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন : "বাংলাদেশে কয়েকজন ইতিহাসের অধ্যাপক বিক্ষুব্ধ বিবৃতি দিয়েছেন—তাদের স্মরণ করতে হবে বিপ্লবের মূল্য দিতে হয় প্রচণ্ড, বিপ্লবকে টিকিয়ে রাখার জন্যও মূল্য কম দিতে হয় না, এবং বারবার বিপ্লব কিভাবে বিপন্ন হয়েছে বিপথে গেছে তা জেনে আজ চেকোস্লোভাকিয়ার কিয়ৎসংখ্যক বিদগ্ধ জনের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে সমগ্র সোশালিস্ট ব্যবস্থাকে নিদারুণ সঙ্কটে ফেলে দেওয়ার ঝুঁকি নিতে বলা অনুচিত, অন্যায়, প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রতি অপরাধ" (পৃ ১৪৪)। দুটি প্রবন্ধই হয়তো কিছু পরিমাণে কালচিহ্নিত, তবু সংকলনে এ-দুটির অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন ছিল। কেননা, চেকোস্লোভাক সংকট এমন একটি ঘটনা যার শিক্ষা বিস্মৃত হওয়া কোনোমতেই চলে না। এবং এই ঘটনার সুগভীর বিশ্লেষণের প্রয়োজন এখনও অবসিত হয় নি।

'জওয়াহরলালজী নেহরু' ও 'গান্ধীজী' শীর্ষক রচনা দুটিতে হীরেন্দ্রনাথ দুই

শীর্ষস্থানীয় জাতীয় নেতার চারিত্র্য এবং ভূমিকার সশ্রদ্ধ অথচ অবিমুগ্ধ মূল্যায়ন করেছেন। বিশেষ করে 'জওয়াহরলালজী নেহরু' রচনাটি প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চারিত্র্যবিচারের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। নেহরুজীর সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কিংবা হয়তো সে-কারণেই, নেহরুজীর ব্যক্তিত্বের দুর্বলতার দিকটাও তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় নি। তিনি লেখেন, "ভারতবর্ষের স্বাধীনতাসংগ্রামে জওয়াহরলালের ভূমিকা ইতিহাসে কীর্তিত হতে থাকবে। স্বাধীন ভারতের কর্ণধাররূপে দেশ গঠন ও বিশ্বশান্তি স্থাপনে তাঁর প্রয়াসের বিবরণও ইতিহাস সহজে বিস্মৃত হবে না। কিন্তু নিছক রাজনীতির বিচারে শুধু স্তুতিই তাঁর প্রাপ্য নয়। বহু কঠিন ও কঠোর সমস্যা অপূর্ণ রেখে তিনি চলে গেছেন। অতি-মানবিক শক্তির অধিকারী হয়েও অতি-মানবিক পদ্ধতিতে সেই শক্তি ব্যবহারে তিনি অপারগ ছিলেন। হয়তো এ-জন্যই তিনি কখনও বিপ্লবী ভূমিকায় নামতে পারেন নি, দেশের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোনো উপায় অবলম্বনেও স্বীকৃত হতে পারেন নি। সংসারে রুচি ও প্রগতির মধ্যে প্রকৃত সামঞ্জস্য যতদিন না ঘটে, ততদিনই হয়তো তাঁর মতো ব্যক্তির জীবনে ও কীর্তিতে কিছু পরিমাণে ব্যর্থতা না থেকে পারে না।" (পৃ ১৩৬)

'যে-মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা' ভিয়েতনামীদের অসমসাহসিক লড়াইয়ের প্রাণবন্ত বিবরণ। 'জয় হোক' এবং 'বাংলাদেশ : তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়' রচনা দুটিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশের অভ্যুদয়কে স্বাগত জানিয়েছেন লেখক।

কী যুক্তি বিস্তারে কী তথ্য সমাবেশে এই সংকলনের সবচেয়ে উল্লেখ্য প্রবন্ধ সম্ভবত 'মার্কস-এর কালজয়ী শিক্ষা' এবং 'সোভিয়েট বিপ্লব ও আমরা'।

নানা সময়ে লেখা নানা বিচ্ছিন্ন রচনাকে একত্রে গ্রথিত করার একটা বিপদ আছে—তাতে অনেক সময়ই পুনরুক্তি দোষ ঘটে। এ-সংকলনও সেই ত্রুটিমুক্ত নয়। তাছাড়া একদশক একটা দীর্ঘসময়—এর মধ্যে মানুষের চিন্তা-ভাবনার কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারে। তার ফলে আগেকার রচনার সঙ্গে পরেকার রচনার চিন্তাধারার কিছু অসংগতিও দেখা দিতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর একটা উপযোগিতাও আছে—একজন মানুষকে তার বিকাশের ধারায় পাওয়া যায় এর মধ্য দিয়ে। সেটা উপরি পাওনা।

হীরেন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ-সংকলনের উনিশটি রচনার মধ্যে কোন-কোনটির সঙ্গে একমত হতে পারলাম আর কোন-কোনটির সঙ্গে একমত হতে পারলাম

না—এটা বড় কথা নয়। দোষ গুণতে গেলে গুণ খুঁজে পাওয়া ভার হয়। সবচেয়ে বড় কথা এই সংকলনে পাই ব্যক্তিমানুষ হীরেন্দ্রনাথকে, "ভারতবর্ষের ভূমিতে একান্তভাবে প্রোথিত যার সত্তা" এবং জানতে পারি "তার পক্ষে মার্কসবাদ কেমন করে 'সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দ'-এর ভিত্তিস্থল হতে পারে, 'সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু' মন্ত্রের সার্থকতম অস্ত্ররূপে উপলব্ধ হতে পারে।" এই পাওনা কি কম ?

'মার্কসবাদ ও মুক্তমতি'র অধিকাংশ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু রাজনীতি, কিন্তু প্রত্যেকটি রচনাই সাহিত্য হিসাবে পাঠ্য। হীরেন্দ্রনাথ বাগ্মীশ্রেষ্ঠ, সুপণ্ডিত অধ্যাপক, প্রবীণ রাষ্ট্রনেতা ; কিন্তু আমার মনে হয় সাহিত্যই তাঁর স্বস্থান।

একটি বয়স্ক পরিপ্রেক্ষিত : অরুণ মিত্রের কবিতা

শিবশম্ভু পাল

কবিতা বিচারের ক্ষেত্রে, শ্রীযুক্ত অরুণ মিত্র তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র * ছোট্ট ভূমিকায় জানিয়েছেন, "একটা বয়স্ক পরিপ্রেক্ষিত" তৈরি হলে কবিরা উপকৃত হতে পারেন। আমি তাঁর উক্তি হুবহু উদ্ধৃত করলুম না এখানে; কারণ সে কথাগুলোর আশু উপলক্ষ ছিল 'ভারবি' প্রকাশন সংস্থার একটি বিশেষ গ্রন্থমালার পরিকল্পনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানেটা, যেমন বুঝেছি, এই রকমই দাঁড়ায়। এখনও আন্তরিকতা, ভাবাবেগ, শ্রুতিরোচক মিঠি শব্দের সমাহার—এ সবই আলাদা আলাদা ভাবে কবিতা বলে বিবেচিত হয়ে থাকে; এবং বামপন্থী বাগ্মিতাকে প্রগতিশীলতার নামে কবিতা বলে চালিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ কোনো কোনো মহলে বেশ সমর্থিত দেখতে পাই। বলা বাহুল্য, এগুলোর কোনোটাই 'বয়স্ক পরিপ্রেক্ষিত' রচনার অনুকূল নয়। অরুণবাবু অবশ্য কথাটির অর্থ বিশদ করেন নি, কিন্তু স্বীকার্য—বিভিন্ন ধরনের কবিতাপাঠের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা পাঠকের চোখ আর কানকে শিক্ষিত করে, তার গ্রহণক্ষমতাকে করে তোলে নির্বাচনপ্রখর। পেশাদার সমালোচকদের-মুখে-ঝাল-খাওয়া ডিগ্রিগন্ধী ভালো-মন্দবোধ নয়, বলা যেতে পারে ফলিত ও স্বোপার্জিত রুচিজ্ঞানই কবিতাকে ঠুনকো, রঙ-করা পদ্যের ভিড় থেকে আলাদা করে নিতে পারে। তখনই স্বীকার করা সম্ভব—আন্তরিকতা, ভাবাবেগ অথবা সমকালীনতা কবিতার প্রাথমিক উপচার হিসেবে কার্যকর হলেও এর পরিণাম নির্ভর করছে সেই দুর্মূল্য ক্ষমতার ওপর যাতে শব্দগুলো দৃশ্য হয়ে ওঠে, স্পর্শসহ, পাঠকের অত্যন্ত সাধের জিনিস। অরুণ মিত্র এই রকমই একজন বলীয়ান ও বিশিষ্ট কবি। সেই চৌত্রিশ বছর বয়সে, ১৯৪৩ সালে, প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'প্রান্তরেখা'; আর আজ ১৯৭৪, পঁয়ষট্টির শান্ত প্রবীণতায় আস্তে আস্তে পা রাখলেন; এবং কবিতা এখনও তাঁর প্রাজ্ঞ অনুধ্যানের বিষয়।

চলতি শতাব্দীর চতুর্থ দশকের এই গুরুত্বপূর্ণ বাঙালি কবিকে প্রায়শই তাঁর

---

* অরুণ মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ভারবি, কলকাতা। ছ-টাকা

সমসাময়িক প্রখ্যাতদের সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত দেখি না; অথচ অরুণ মিত্র এঁদেরই সমান এবং ক্ষেত্রবিশেষে অধিকতর প্রাতিস্বিক ঐশ্বর্যে ধনী হলেও একটু যেন আড়ালে। হয়তো সেই আড়াল তাঁর নিজেরই রচনা, বলতে ইচ্ছে করে, তাঁর নাতিপ্রজতারই প্রতিফল। এ পর্যন্ত মাত্র চারখানি কাব্যগ্রন্থ—১৯৪৩ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত দীর্ঘ সাতাশ বছরে—'প্রান্তরেখা', 'উৎসের দিকে' (১৯৫৪), 'ঘনিষ্ঠ তাপ' (১৯৬৩) এবং 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' (১৯৭০) প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পরিমাণের দিক থেকে যাই হোক, এই সব কবিতা অরুণবাবুর অভিজাত শিল্পবোধের স্পর্শে অনশ্বর। কবিতা কী সে বিষয়ে কোনো পণ্ডিতি অনুশাসন নয়, কোনো অবিমৃশ্য নাবালক সরলীকরণ নয়, স্বয়ং কবিতাই তার যোগ্য উত্তর,বিশেষত তা যদি অরুণ মিত্রের মতো একজন পরাক্রান্ত কবির কলম থেকে আসে। তিনি কবিতাপাঠক এবং কবি উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত জরুরী শব্দশিল্পী। প্রথমোক্তের স্বার্থ যদি কবিতার সংজ্ঞান্বেষণ, শেষোক্তের তাহলে কাব্যনির্মিতির অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা। সুতরাং সতর্ক হতে হবে আমাদের। পড়বার সময় সমানভাবে কাজে লাগাতে হবে হৃদয় আর মস্তিষ্ক; এবং কখনো চিন্তা কখনোবা উপলব্ধি এইসব কবিতার সন্নিধানে আগে অথবা পরে, অথবা এক সঙ্গেই, আমাদের ভেতর উদ্বেল হয়ে উঠতে পারে। এবং এই সতর্কতাই, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অভিজ্ঞতাময় ধারালো চৈতন্য, হয়তো অরুণ মিত্রের অভিষ্ট "বয়স্ক পরিপ্রেক্ষিত"। অন্যথায়, তাঁর 'উৎসের দিকে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায় একবার যেমন বলেছিলেন, "ওপর-ওপর চোখ বুলিয়ে পড়লে সে কবিতা কোন সাড়াই জাগায় না।" (পরিচয়, এপ্রিল ১৯৫৭)। বস্তুত শ্রীযুক্ত মিত্রের স্বাতন্ত্র্যের মূলেও রয়েছে একই প্রবীণ বিবেচনা, বৈদগ্ধ্য আর শিল্পদৃষ্টির চমৎকার শুভযোগ।

অবশ্য গোড়ার দিকে, 'প্রান্তরেখা'র যুগে, এই স্বাতন্ত্র্য তেমনভাবে হয়তো চোখে পড়বে না। ধ্বনিপ্রধানের দ্রুতলয়ে বাঁধা 'লাল ইসতাহার' অথবা প্রাচীরপত্র-ঘেঁষা 'কসাকের ডাক : ১৯৪২'-এর মতো চড়াসুরের ঘোষিত কবিতা চল্লিশের নবোত্থিত সাম্যবাদী তথা ফাসিস্তবিরোধী জনসঙ্ঘে বিপুল উদ্দীপনা যোগাত সত্যিই; এখনও সেসব কবিতা আমাদের—যারা শেষ যৌবনের একটু আগে বা পরে কিছুটা অন্তত শারীরিক অর্থেই স্তিমিত—স্মৃতিগ্রস্ত করে, পেছিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় সেইসব গণনাট্যপাগল বেপরোয়া কৈশোরে; কিন্তু সত্যি বলতে কি এই ধরনের তেজালো, উত্তপ্ত, মতবাদে অঙ্গীকারবদ্ধ কবিতা

সেদিন আরও অনেকেরই হাতে সুন্দর খেলেছিল। অনেকেরই রচনায় পাওয়া যেত কমবেশি একই ধরনের বাগ্‌ভঙ্গি, তির্যকতা, নাগরিক সপ্রতিভতা এবং ইতিবাচক বিশ্বাসের রক্তাক্ত আঁচড়। "পিছনে ছড়ানো ভঙ্গুর ভিড় জমাট বাঁধে, / মিছিল মিলেছে জনস্রোতে ; / ঘনিষ্ঠ মন দ্রুত মুহূর্তে অনাবৃত, / কাটলে কাটলে ছায়ারা ডোবে। / আবিষ্কারের চমক লেগেছে সবে— / নাবিকের চোখে দ্বীপের সীমানা ভাসে, / পায়ের তলায় দ্রুততম চল যেন / বহুদিনকার উধাও গতি।"—অরুণবাবুর এই পংক্তিগুলো 'ভূমিকা' কবিতা থেকে তুলে নিয়েছি ; কিন্তু এর সঙ্গে তাঁর সমকালীন কিছু কিছু কবিতার মেজাজের সাজাত্য খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। একই কাব্যাদর্শ ও জীবনবোধের পরিধির মধ্যে সতীর্থের মতো তাঁরা মিলেমিশে ছিলেন—এই সাযুজ্যই তাঁদের রচনারীতির মধ্যে বিম্বিত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে কে কাকে প্রভাবিত করেছিলেন সে প্রশ্ন তোলা ঠিক হবে না।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও ওই প্রাথমিক পর্বেই অরুণ মিত্রের 'ইতিবৃত্ত' বা 'রূপান্তর'-এর মতো কবিতা আমাদের নজরে ঠিকই লেগে থাকে। "আশ্বিনের ঝড় / সঙ্গীন মুহূর্তে আসে, / নিশ্চিন্তে তাড়ায় সব সূক্ষ্মরেণু স্নায়ুতে কর্কশ। / উড়িয়ে দিলাম ঝড়ে আমাদের বিজয় পতাকা।" (ইতিবৃত্ত)। লাইনগুলির কিছুটা স্পষ্ট, কিছুটা আবছা বৈপ্লবিকতা বুঝিয়ে দিচ্ছিল একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অরুণবাবু এগোতে চলেছেন। ঘোষণাকে পালটে দিতে চাইছেন শিল্পিত স্থৈর্যে, ভাষণকে মন্ত্রসমান সান্দ্রতায়। এবং ইতিমধ্যে একটু একটু করে, ছন্দকে ভেঙে গড়ে, সনেটের আঁটসাঁট শৃংখলায় স্বয়ংশাসিত হয়ে, শব্দের স্বভাবকে মজ্জায় মজ্জায় চিনে সেই অভীপ্সাকে একটা পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল অথচ লাবণ্যময় চেহারা দিতে পারলেন তিনি সেইসব কবিতায় যেগুলো 'প্রান্তরেখা'র এগারো বছর পর 'উৎসের দিকে' গ্রন্থে জায়গা পেয়েছে। এখানে শব্দগুলো ছবি হয়ে গেল, ছবি হল প্রতীক এবং প্রতীকের মধ্যে সংহত হল বলা আর না-বলার শক্ত আর সূক্ষ্ম কায়দা। এর সপক্ষে যে-কোনো একটা কবিতা, আপাতত 'সঞ্জীবন' কবিতাটিই, ব্যবহার করা যেতে পারে। "অপরিচিত জ্যোৎস্নায় পাহারা-বদল হল ; / চলন্ত লৌহ শিরস্ত্রাণ শ্রেণী যেন করাতের দাঁত / আমাদের কারাগারের কপাট কেটে / আমাদের বনেদী শিকলের জোড় ফেড়ে / বুড়ো বটের অগুন্তি শিকড় দ্বিখণ্ড করে / আমাদের দাঁড় করিয়ে দিল শড়কে ময়দানে। / …চামড়া ছিঁড়েছে, ছিঁড়ুক / …হাড় পর্যন্ত আঁচড় লেগেছে, লাগুক— / আমরা বাঁচলাম।" এখানেই, দৃশ্যত, থেমে গেলেন কবি। দৃশ্যত ; কিন্তু কবিতা

মসৃণভাবে গতিশীল হয়ে উঠল, এগিয়ে গেল আমাদের অনুভবের ভেতর দিয়ে এক গর্জমান সম্পূর্ণতায়। "আমরা বাঁচলাম"—শব্দ দুটি মিশে গেল সমবেত আত্মদানের জোরালো আর যুগান্তিক সংকল্পে।

আরও অনেকেরই মতো অরুণ মিত্রের বিষয় দেশকাল আর মানুষ—দুঃখী, সন্দিগ্ধ, বিক্ষুব্ধ ও প্রত্যাশামুখর মানুষ। এরাই মেপে দিয়েছে তাঁর আকাংক্ষার পরিসীমা, সত্তার অণুপুঞ্জ এবং এমনি করেই ব্যক্তিগত নিভৃতিকে সরিয়ে সম্ভব করেছে ব্যাপক আত্মসম্প্রসারণ; কোনোখানে আমরা কবিকে একা, বিবিক্ত, নিজের মুখোমুখি দেখতে পাই না। "আমি তোমাদের ডাকছি / তোমরা সূর্যাস্ত পার হয়ে এস / তোমাদের দ্যুতির আঘাতে আমি যেন চূর্ণ হই / তারপর বিকীর্ণ হই তোমাদের মতো।" (কয়েকটি কথা। উৎসের দিকে)। এমনি করে বারবার তাঁর দরাজ আমন্ত্রণে ইতিহাসনিয়ন্তা মানবসম্প্রদায় দখল করেছে তাঁর অন্তর্বিশ্ব। এই একই কবিতার কিছু শব্দ ধার করে বলতে হয়—তিনি জ্বলতে চান পৃথিবীর রঙে, সকলের চোখে। সন্দেহ নেই, এই চাওয়ার মধ্যে বেশ বড় ধরনের উদারতা আছে, রাবীন্দ্রিক পরিভাষায় যাকে বলা চলে শ্রেয়বোধ তারই রকমফের এটা। কিন্তু উদ্দেশ্য অথবা অভীপ্সা—তা সে যতই মহান হোক না কেন, তাকে বিশেষভাবে প্রকাশ করার মধ্যেই রয়েছে মৌলিক নিজস্বতা, অন্য কথায়, কবির ব্যক্তিত্ব—অরুণ মিত্রের কবিতাগুলি যাতে চরিত্রময় হতে পেরেছে।

এবং সেই ব্যক্তিত্বের সংগঠনে রয়েছে অরুণবাবুর অসামান্য চিত্রধর্মিতা; সংযত, ঘন প্রতীকী বাক্‌রীতি—বলা ভালো, চূড়ান্ত শিহরণসম্ভব শব্দের লক্ষ্যভেদী ব্যবহার। যে-কোনো কবিতা—'উৎসের দিকে' থেকে শুরু করে যে-কোনো গ্রন্থের যে-কোনো কবিতা—চিত্রে আর আভাসে, প্রতীকে আর অনুরণনে, একই রকম স্পন্দমান মনে হয়। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র পৃষ্ঠাগুলো এলোমেলো উল্টে যাওয়া যাক, শেষ থেকে গোড়ার দিকে, কিম্বা, মাঝখান থেকে যে-কোনো এক জায়গায় থামা যাক, ধরা যাক 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' গ্রন্থেরই একটি কবিতা, নাম 'জন্মভূমিতে'। মাত্র বাইশ লাইনের একটা গদ্যাকার কবিতা; পড়তে আরম্ভ করি: "প্রপাত আমি দেখিনি। আচমকা জল আর পাথরে কেউ কেউ গম্ভীর আশ্বাস শুনতে পেয়ে আমাকে এসে বলেছে।..." এগিয়ে যাই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে: "নিশ্চয়তার আর এক নাম জন্মভূমি। আমার জন্মভূমি আমাকে হঠাৎ দিশেহারা করে না।"...আর-একবার পড়ি, তাড়াতাড়ি অরুণ মিত্রের কবিতা শেষ করা সম্ভব নয়, থামতে হবে, হবেই, গোড়াতেই বলেছিলুম, তাঁর

কবিতা পাঠকের হৃদয় আর মস্তিষ্ক—দুই-ই সক্রিয় রাখে, তাই থামতে হবে প্রতিটি শব্দে, শব্দের অক্ষরে আর আড়ালে, অর্থে আর অনুষঙ্গে। আর সেজন্যেই "যখন শস্য ছিল তখন শস্য দিয়ে এক একটা মস্ত চিহ্ন ফেলেছে। শস্য লোপাট হওয়ার পর সেই চিহ্নগুলোকে আরও পরিস্ফুট করেছে।"—পড়ার পর ভাবতে হয় 'শস্য' বলতে গিয়ে অরুণবাবু আসলে কী বলতে চেয়েছেন? সুখ, সমৃদ্ধি, সার্থকতা? নাকি কোনো উজ্জ্বল অতীত যা অপসৃত হবার পর পড়ে থাকে গভীরভাবে বিক্ষত একটা স্মৃতি বা স্মৃতির তাড়না? 'চিহ্ন' শব্দটি কি এদিকেই আঙুল দেখায় না? হয়তো। আবার শস্যকে সাদামাটা শস্য হিসেবে ধরলেও হাহাকারের দ্যোতনাটুকু কিন্তু থেকেই যায়। অরুণ মিত্র এভাবেই শব্দগুলোকে বাচ্য এবং নিহিত—উভয়ার্থেই মন্ত্রিত করার ক্ষমতা ধরেন।

আর এমনি করেই উপভোগ করতে হবে তাঁর কবিতা। সব ক্ষেত্রেই আমরা কৃতকাম হব বলা যায় না। কোনো কোনো শব্দ প্রতীক দুরধিগম্য ঠেকতে পারে; হয়তো সেসব জায়গায় কবির কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতা বা অভিপ্রায় সূক্ষ্মতর সাংকেতিকতার আড়ালে চাপা পড়ে গেছে। বিশেষত গদ্য ছাঁচের কিছু কবিতার থৈ পেতে বেশ বেগ পেতে হয় আমাদের, কিন্তু এইসব ঝুঁকি নিয়ে, ব্যর্থতার কিছুকিঞ্চিৎ সম্ভাবনা স্বীকার করেও, 'শীতের সকাল,' 'ভারসাম্যে', 'এলাহাবাদ ইস্টিশনের' ইত্যাদি কবিতাগুলো পড়বার আগ্রহ আমাদের একটুও শিথিল হয় না। কারণ অরুণ মিত্র যা বলেন তার ভঙ্গীটুকুর মধ্যেই একটা গভীর আমন্ত্রণের ঘনিষ্ঠ তাপ রয়ে গেছে। যেন তাঁর যেটুকু সাধ্য আর কৃত্য তিনি করেছেন, অতঃপর বাকিটুকু শেষ করতে এগিয়ে আসুন পাঠকেরা। কেননা গানের মতো কবিতাও তো প্রকৃত প্রস্তাবে কবি আর বোদ্ধার যৌথ রচনা।

কম লেখেন তিনি; লেখার মধ্যে শব্দের ভিড়ও তাঁর কম; আটপৌরে, নিরীহ তাঁর ভাষা; কিন্তু এটা একেবারেই ওপর-ওপর সত্য। এই সম্বল নিয়েই তিনি কবিতায় এনে দিলেন অসামান্য ঋজুতা, ব্যাপ্ত করলেন স্তোত্রের মতো গভীরতা যা আমাদের চৈতন্যকে জাগায়, নিক্ষিপ্ত করে অবিচার আর ব্যভিচার অধ্যুষিত রূঢ় পৃথিবীতে, আর সমস্ত রক্ত জড়ো করে তীব্রতম অথচ শব্দহীন আর্তনাদে আমাদের উচ্চকিত করে তাঁরই ভাষায়: "এ জ্বালা কখন জুড়োবে? কখন?"

'রবিকরোজ্জ্বল নিজদেশে'

অরুণ সেন

বিষ্ণু দে-র সাম্প্রতিকতম নতুন গ্রন্থটির* সঙ্গে বাঙলাদেশের নানা অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে। প্রকাশিত হয়েছে ঢাকার মাওলা ব্রাদার্স থেকে, তিনি এই গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন "বাংলাদেশের নবলব্ধ বন্ধুদের" প্রতি এবং এই গ্রন্থের বেশ কয়েকটি কবিতাই, বিশেষত এ সংকলনের সবচেয়ে দীর্ঘ 'অসম্পূর্ণ কবিতা—বাংলায় বাংলায়' নামক কবিতাটি, রচিত হয়েছে বাঙলাদেশের জন্মকালীন সংকট যন্ত্রণা ও সংগ্রামকে কেন্দ্র করে। তাই এই সংকলনের অনেক কবিতাতেই তিনি যখন নৈরাশ্যের মধ্যে "রাবীন্দ্রিক আত্মস্থ সঙ্গীতে নির্ভীক ছবিতে" উপমার সন্ধান করেন, বারবার রাবীন্দ্রিক সূর্যোদয়ের কথা বলেন এবং অন্যদিকে কোনো গদ্যরচনায় বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় আমাদের পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরো তীব্রভাবে ঐকান্তিকভাবে শুদ্ধ সত্য, ব্যক্তিগত ও জাতীয় মানসে উভয়তই" ('পূর্ববঙ্গের বাংলা,' 'সাহিত্যপত্র')—তখনই আমরা যেন বুঝে নিতে পারি 'রবিকরোজ্জ্বল নিজদেশে'-র প্রকৃত ব্যঞ্জনা।

অবশ্য সমানভাবেই এই গ্রন্থের পটভূমি এবং বিষয় এপারের বাঙলা, পশ্চিমবঙ্গের বাঙলা। বিষ্ণু দে-র কবিতায় সমকালীন সমাজের ছায়াপাত তো থাকবেই, কিন্তু এখানে রচনাকালের—অর্থাৎ ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সালের—রাজনৈতিক ঘটনার যে প্রতিফলন ঘটেছে, তার স্পষ্টতা ও তীব্রতা প্রণিধানযোগ্য। এই তিনটি বছর পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ও তৎসংলগ্ন জীবনে যে ঘটনার সমারোহ ও উত্থানপতন ঘটে গেল, তা শুধু বিষ্ণু দে-কে কেন, যে-কোনো শিল্পীকেই আলোড়িত করবে প্রত্যাশার উল্লাস এবং স্বপ্নভঙ্গের বেদনার অভিজ্ঞতার মধ্যে। আমাদের সমাজ ও রাজনীতির জীবনে যে গৌরবময় সম্ভাবনা ও বিপুল ব্যর্থতার ট্র্যাজেডি ঘটে গেল, তার সংবেদনময় সাক্ষী হয়ে আছে এই সংকলনের বহু কবিতা। বড়ই মর্মান্তিক এই মোহভঙ্গ।

তাই ১৯৬৯-এর ১২ই ফেব্রুয়ারি—ঐক্যবদ্ধ সেই দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্টের জয়-

* রবিকরোজ্জ্বল নিজদেশে। বিষ্ণু দে। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। ছ-টাকা

যাত্রার সূচনাতে—যে কবিতাটি তিনি লেখেন, তা দিয়েই প্রায় এ গ্রন্থের শুরু :

"আশাভঙ্গ ক্ষান্ত কি? প্রাণের বিস্তার
ছড়ায় দুই হাতে লাখো কণ্ঠে তার।...
গৌরী উন্মুখ, কোথায় আসে বর!
সকলে উদগ্রীব, লগ্ন সমাহৃত।" (এ বড় রঙ্গ তো)

তারপর ঠিক এক বছর পরেই ১৯৭০-এর ১২ই ফেব্রুয়ারি, যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভেঙে যাওয়ার প্রায় পূর্বমুহূর্তে, তিনি লেখেন :

"তাহলে কি ক্ষমতা মাত্রেই মারীর বীজাণু? বিদ্যাবুদ্ধি হৃদয়বত্তার
নীলে নীলে জলে কেন চড়া পড়ে ঠিক যে মুহূর্তে হও গদীতে চড়াও
অথবা গদীর স্বপ্নে, মাঠে মাঠে বিচ্ছিন্নমস্তার
সমাজসম্বন্ধহীন অঙ্গহীন হানাহানি আপিসে কোঠায় জঙ্গলে?
(অক্ষমেই হবে সমতটে)

এক বছরের ব্যবধানে একই দিনে দুটি কবিতার সম্পূর্ণ ভিন্ন সুর আমাদের ভ্রান্ত রাজনীতির পরিহাসকে যতখানি অঙ্গুলিনির্দেশ করে, তা অনেক ব্যাখ্যান-পরিসংখ্যানও করবে না। এই ভ্রান্তির বোধ, নৈরাশ্য এবং বিষাদ তাই এ গ্রন্থের অনেকটা স্থান জুড়ে আছে—কখনও প্রত্যক্ষ সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রসঙ্গে, কখনওবা পরোক্ষ কোনো প্রাকৃতিক প্রতিমায়। এর থেকে পরিত্রাণের সন্ধানও তিনি করেন প্রকৃতিতেই। তাই দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে সেই তিক্ত শরিকী সংঘর্ষের দিনে তিনি প্রাণপণে "ক্ষীণ সুর বহুদূর নক্ষত্রসঙ্গীত" শোনেন, প্রাকৃতিক পরম সংগীতের মধ্যে সর্ববিধ আধি সমাহিত হয়ে যাবে এই স্বপ্ন দেখেন ('তবুও রাত্রিতে শোনা যায়'), জিজ্ঞাসা করেন, "কেন ভাবো স্বপ্ন শুধু বাবু পলায়ন?" সদলবলে ঘুরে ফেরেন বিস্তৃত নিসর্গে :

"প্রত্যহের গ্লানিহীন
জীবনের স্বপ্নে আর স্বপ্নের পরেও
বাস্তবে ও ঘুমে যে দেশে চৈতন্যে ঝরে
মেঘ, রৌদ্র, জল, অবিরল গানের ত্রিধায়
ধারাস্নান সংহত গম্ভীর—
স্নায়ুর এবং বুদ্ধির অর্থাৎ চৈতন্যের সর্বাঙ্গে গভীর
মুক্তিস্নান।" (দক্ষ স্মৃতির বাগান)

স্মরণীয় যে, এই কবিতাগুলি লেখা হচ্ছে যখন তখন আমাদের রাজনৈতিক ও

সমাজনৈতিক প্রতিমাগুলি প্রায় ধূলিসাৎ, সেই সর্বব্যাপী তিক্ত পরিবেশে কবিও খুব অল্পই লিখেছেন, মাঝে-সাঝে দু-একটা মাত্র। কখনও অবচেতন ও চেতনের সেতু যে শিল্পী তার অখণ্ড চৈতন্যকে, কখনও চৈতন্যের অতল মায়ায় গড়ে-তোলা শিল্পের আভঙ্গ মূর্তিকে, কখনওবা শিশুর জাগরণের শুদ্ধতায় শরীর ও চৈতন্যের অঙ্গাঙ্গি দীর্ঘ মুক্তিস্নানকে ('চৈতন্যের উত্তরণে', 'আভঙ্গ মূর্তি', 'দীর্ঘ মুক্তিস্নান চলে') তিনি প্রতীক করে তুলেছেন। এ যেন কবির ধ্যান—চতুষ্পার্শ্বে যখন অবান্তরতা অক্ষমতা ও অন্ধতার প্রতিযোগিতা, তখন তিনি মানুষের সৃষ্টিময় ক্ষমতাকে অবিস্মরণীয় করে রাখতে চান। হতাশা যত প্রসারিত হয়েছে, তাঁর এই আত্মস্থ ধ্যান ততই হয়ে উঠেছে একাগ্র।

ঠিক এরকমই আত্মরক্ষা চলে লেনিনের নামোচ্চারণে—কারণ বামপন্থী আন্দোলনের এই পরিণতির সঙ্গে লেনিনবাদী সচেতনতার সম্বন্ধ সন্ধানে তিনি নারাজ। বরং বিপরীতটাই তাঁর মতে সত্য।

> "ভ্রান্তির ট্রাফিকজামে অপঘাতে শান্তি চায় প্রাণপণে
> তোমার সংলাপে,
> ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন।" (তোমার সংলাপে)

এর কয়েকমাস বাদেই, ভ্রান্তির ট্রাফিকজাম যখন আরো অসংশোধনীয় ও দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে, তখন তিনি পরপর শুধু লিখে চলেন লেনিন-বিষয়ে বেশ কয়েকটি কবিতা। এই ভ্রান্তি চূড়ান্ত নয়, এই নৈরাশ্য সাময়িক—এই বোধকে তিনি অক্ষত রাখেন লেনিনের স্মরণে, মায়াকভস্কি যেমন বলেছিলেন: আমি লেনিনেরই সাহায্যে শুদ্ধ করি নিজেকে। লেনিনের শতবার্ষিক জন্মদিনের প্রাক্কালে এই বরাভয় তাঁর কাছে পৌঁছয়।

> "পরদেশী পরবাসী কত ছিল লেনিন, তোমার দেশে?"
> (আপন দেশে লেনিন)

> "কেন বা সবাই চিন্তা করি না যে লেনিনের প্রাজ্ঞ প্রতিভাসে।"
> (লেনিন পুরাণ নয়)

> "শুনেছি যে লেনিনেরই সাধ ছিল একদিন সকলেই হয়ে যাবে
> শতায়ু লেনিন।" (মনে হয় প্রত্যেকে লেনিন)

> "বোলো তাকে বোলো / ব্যাপ্ত আজ বিশ্বে ভুলভ্রান্তিতেও
> এমনকি দুর্গতির দুর্মর অভ্যাসে দুর্বল বাংলায়।"
> (সেই কবে কোন্ এক ইস্টিশনে)

কি যন্ত্রণাময় সন্ধানের মধ্য দিয়ে কবিকে এই প্রজ্ঞা অর্জন করতে হয়েছে, যন্ত্রণার তন্ত্রী বেঁধে করে যেতে হয়েছে মন্ত্রমুগ্ধ গান—তার রক্তাক্ত সাক্ষ্য অনেক কবিতাতেই আছে। নেতির মধ্য দিয়ে পেতে হয়েছে অস্তির আভাস, ট্র্যাজেডির মধ্যে অনিবার্য বৈপ্লবিক উল্লাস।

"আত্মস্থের নৈরাশ্যের আশার উৎসে নাস্তিক্যে আস্তিক্য মেনে,
রূপনারাণের কূলে প্রাত্যহিক জেগে উঠে
প্রাণময় স্বপ্নে।" (কেবা যাত্রী কে পাটনী)

ফলে যে উপমাটি বারবার এ সময়ে এসেছে তা ঈশ্বর পাটনীর—চৈতন্যের উত্তরণে পাটনী—যারা শিল্পী বীর বৈজ্ঞানিক এ তো তাদেরই কর্মসাধনা। আজ সমবেত কর্মসাধনা যদি অসম্ভব হয়, তবু পরম ধৈর্যভরে চলবে সেই একাকীত্বের দীর্ঘ অভিযান—"হতবুদ্ধি একা একা চলি বহু লোক।"

"একা একা চলো, চলি চলো,
বহু লোক। দেখি মানবিক বাক্‌রুদ্ধ মহাবন।
এই বানপ্রস্থ শেষ হবে কবে কোথা,
কার আদি, কোন্ অন্তে
কার মনে কোন্ বনে?" (কার মনে কোন্ বনে)

তাই খুব অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে দান্তের ইনফেরনো এবং মহাভারতের মহাপ্রস্থানের নিঃসঙ্গ অভিযানের উপমা মিলেমিশে যাওয়া। একাধিকবার এসেছে ঐ অনুষঙ্গ।

"ছায়ামূর্তি এরা কারা ওরা কারা?
দৈনিক বিষাদে কোথা উত্তরণ?
পথের নঙ্গীকে পাবে কোন্ ধর্মের কুকুর
জানো কি কোথায়?" (সাধারণ্যে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বেশে)

•

"নরক প্রকাশ্য হোক, ইনফেরনো তখন
অঘমর্ষী উত্তরণ পুরগাতোরিও-তে,
যেন হিমপদে চলে কুন্তীর নন্দন,
কুকুর পথের সঙ্গী শতপদক্ষতে
ক্ষান্তিহীন অভিযানে ধর্মের অহমে
পায়ে পায়ে বিড়ম্বিত, তবু কোনো মতে
ক্ষুরধার প্রগতি যে দুর্গম নিয়মে।" (অসম্পূর্ণ কবিতা)

বিষ্ণু দে-র স্থায়ী পাঠক মাত্রই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, শুধু এ কাব্যগ্রন্থেই নয়, কিছুকাল আগে থেকেই সামাজিক ও রাজনৈতিক নৈরাশ্যের জালে এমন-কি তাঁর মতো মৌলিক আশাবাদী কবির পক্ষেও খুব দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে নিজের বিশ্বাসকে ধরে রাখা। আগের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থেই তাই ফিরে ফিরে এসেছে ক্লান্তি বিদায় ও বার্ধক্যের কথা। এখানে তো সে সুর থাকবেই, এ গ্রন্থের পট-ভূমি আরো তার সপক্ষে। -কিন্তু এখনও, এমন-কি এখনও, তিনি তাঁর কষ্টার্জিত আশাবাদকে বাঁচিয়ে রাখার প্রায় নিঃসঙ্গ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর পেছনে কোনো আপ্তবাক্য নেই, আছে তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য এবং সমাজ জীবন ও শিল্প থেকে পাওয়া কয়েকটি অনাহত প্রতিমা। এরই জোরে তাঁর কবিতায় বারবার পরম আশ্বাসের মতো ফিরে ফিরে আসে কোনো প্রাকৃতিক চিত্র, রবীন্দ্র-নাথের গানের একটি কলি, লেনিনের জীবনের নানা চকিত গল্প।

অবশ্য তিনিও জানেন, আমরাও চোখের সামনে দেখি, ব্যক্তিগত এবং সমাজ ও রাজনীতিগত জীবনে উপমা বা প্রতিমা বা প্রতীক সমূহ কিভাবে ভেঙে পড়ছে এবং আমরা হয়ে পড়ছি নিরাবলম্ব। তাই ১৯৭০-এর সেই ছিন্নমস্তা রাজনীতির আতঙ্কের দিনগুলিতে তিনি লিখলেন :

> "উপমাও যেন মৃত আজ। জলে, স্থলে, বাতাসেও চায় ছিন্নমস্তা,
> এক নয়, শত শত।" (পরবাসীও যে নয়)

পরাজয় বা দুর্দশায় কবির প্রকৃত গ্লানি নয়, ব্যথা বা শোক তো সময় সময় ক্রান্তিরই দ্যোতক। কিন্তু আমাদের হতবুদ্ধি-অস্তিত্বে আজ নেই কার্যকারণের স্বচ্ছ বোধ, নেই নরকের স্পষ্টতা—আমরা ছিন্নমস্তা, আমাদের রাজনীতির মতোই, কারণ "মানুষই উদভ্রান্ত তার শরীরে মানস নেই, সদাপলাতক মনে ভয়।" আমরা তাই হতবুদ্ধি, উদভ্রান্ত, বেঘোর। এই আশাহীন তুচ্ছ গ্লানির পটভূমি ও কবির সচেতনতা মনে রাখলে বিস্ময়কর লাগে কি করে তিনি এখনও "তুচ্ছ তিক্ততার পরপারে, বর্জনে গ্রহণে উদগ্রীব, আনম্র", এখনও তাঁর আশা "বীজকম্প্র, ইতিময়"।

কবি যখন এইভাবে উপমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রবল সংগ্রাম করে চলেছেন, তখন সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্ঘটনায় তার সমর্থন একেবারেই পান নি। সেখানে আমাদের সব প্রতীকের মৃত্যু ঘটেছে, তাঁকে নিরুপায়ভাবে আশ্রয় নিতে হয়েছে তিক্ততা-জয়ী অক্ষয় প্রকৃতির মধ্যে কিংবা দুঃখ-উত্তীর্ণ স্বপ্নে, "স্বপ্নকম্প্র রাত্রির শান্তিতে"। ঠিক এ-সময়ই পূর্ববঙ্গের ঘটনা—সেখানকার অত্যাচার ও মানুষের প্রতিবাদ ও সংগ্রাম যেন মৃত-উপমার জীবন ফিরিয়ে দিল।

এ সময়কার অভিজ্ঞতা তাঁকে কি প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল, তার সাক্ষী হিসেবে রইল ১৯৭১-এ লিখিত অনেক কবিতা, যেগুলো পরে গ্রথিত হয়েছে 'অসম্পূর্ণ কবিতা—বাংলায় বাংলায়' নামক দীর্ঘকাব্যে। বিষ্ণু দে-র পাশ্চাত্য সিমফনির আদলে রচিত কোনো কোনো দীর্ঘ কবিতার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা এই দীর্ঘ কাব্যটির স্বাতন্ত্র্য সহজেই বুঝতে পারবেন। বরং তুলনা করা যায় এর সঙ্গে ভারতীয় রাগসংগীতের গঠনপ্রণালীর। পূর্ববঙ্গে অত্যাচার, আমাদের এই বঙ্গের ক্লেদাক্ত পরিস্থিতি, পূর্ববঙ্গের তারুণ্যের রক্তক্ষয়ী লড়াই : এই সব নিয়ে একেকটি অনুষঙ্গ যে ভিন্ন ভিন্ন সাংগীতিক স্বর এ সময়ে তুলেছে, তারই বিশিষ্ট সংযোগে ও সমাবেশে তিনি একেকটি সাংগীতিক প্যারা-গ্রাফ রচনা করেছেন একেক কবিতায় ; এবং একেকটি রাগের স্বরূপে যেমন থাকে একেকটি অখণ্ড অভিজ্ঞতা, তেমনি সেই অখণ্ড অভিজ্ঞতা ও ভাবের আবেশেই রচিত প্যারাগ্রাফগুলি মিলিয়ে গড়ে উঠেছে এই দীর্ঘ কবিতাটি। সমস্ত কবিতাটির ঐক্যের সূত্র ঐ স্বরগুলি এবং তাদেরই নির্দিষ্ট বিন্যাসে, কিন্তু স্বাধীন খেয়ালী ভাবতাড়িত কালমুহূর্তে, রাগের বিস্তারের একেকটি পর্যায়ে এর একেকটি অংশ রচিত।

অবশ্য বিষয় তাঁর দুই বাঙলা—পূর্ববঙ্গের বাঙলা ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙলা। তাই সাম্রাজ্যবাদীর স্পষ্ট অত্যাচার এবং মুক্তিসংগ্রামীর বীরত্বই তাঁর কবিতায় শুধু প্রকাশ পায় নি, সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে এই বাঙলার ধূসর অস্পষ্ট ক্লান্তিকর বিষাদ। একদিকে অত্যাচার ও লড়াইয়ের প্রতীক তাঁকে উদ্দীপিত করেছে, বহুকাল আগের সেই উচ্ছ্বসিত বিশ্বাস যেন ফিরে এসেছে—অন্যদিকে এই বাঙলার অগাধ বিষাদ তাঁকে বিদ্রূপপ্রবণ ও তির্যক করে তুলেছে।

কবিতাটি শুরুই হয়েছে এই তির্যক ভঙ্গিতে, কিন্তু অচিরেই শোনা যায় কবির সেই সমাচ্ছন্ন প্রেরণার কণ্ঠস্বর, যার বশে তিনি চান স্বচ্ছ বোধ, হতে চান আস্তিক্যের প্রশ্নে প্রশ্নে স্পন্দমান। কিন্তু ক্লান্তিকে বিষাদকে কি এড়ানো যায় ? তবে এ তো আদি মৌলিক বিষাদ নয়, নিতান্তই "ক্লান্তি-খাত লেক্"। তারপর একে একে ঘুরে ফিরে আসে কবির নানা প্রতিক্রিয়া—বিরামহীন অন্বেষণ, কবির নিঃসঙ্গ একক যাত্রা, কবির আশাবাদী কাঠিন্যে বিশ্বাস। কিন্তু যে শব্দ-গুলি এযুগের কবিতায় এবং এই দীর্ঘ কাব্যের প্রথমাংশে আবৃত্ত হতে দেখা যায়, তা হচ্ছে : 'হতবুদ্ধি', 'বাক্-দগ্ধ-রুদ্ধ জঙ্গ মহাবন', 'দুঃস্বপ্নের বন', 'উদভ্রান্তি', 'বহু বিপর্যয়', 'শয়তানির লুব্ধ টোপ', 'বৃদ্ধ জানে' এই ধরনের অসংখ্য শব্দাবলী।

এই পটভূমিতেই পূর্ববঙ্গের ঘটনা, বাঙলাদেশের জন্ম তাঁকে অসামান্য প্রেরণা দেয়। এই দীর্ঘকাব্যের একাদশ অংশে তাই সম্পূর্ণ নতুন সুর আসে। প্রথমে সাবধানী সূচনা—"আশা ছিল, তবে শংকাও ছিল বটে"—কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী অকথ্য অত্যাচার ও মানুষের সীমাহীন দুঃখকষ্টের সংবাদ ক্রমশই তাঁকে অস্থির করে তোলে, মানবতার বিচলিত কণ্ঠস্বরে শোনা যায় প্রতিবাদ এবং নিশ্চিত আশ্বাসের কথা। ক্রমশ বীরত্বের হারানো ছবি যেন ফিরে আসে রূপকথার সেই সূচিকাভরণ রাজপুত্রের উপমায়, লোরকা বা সাঙ্কো-ভানৎসেত্তির প্রতীকে, যা তিনি হারিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতায়। বর কি তবে এসেছে?

"রক্তে তার আগুন-গলা মুক্তি
শক্তি তাকে পেতেই হবে হাতে,
লক্ষ মুখে লক্ষ হাতে জয়ী।"

এই অভিজ্ঞতা তাঁর পীড়িত দুঃস্বপ্নগ্রস্ত স্নায়ুকে অর্থহীন বার্ধক্য ও ক্লান্তির বোধ থেকে যেন তুলে নিয়ে আসে আবার তাঁর স্বধর্মে—আমরাও আবার শুনি সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর :

"কি বলব আব? বাঁচাই যে গান বলা,
বাঁচাই কবিতা, প্রতিদিন তুমি শোনো
মানসে মানসে অনন্ত পথ চলা
বৃথা কত দিন ক বছর তুমি গোণো।"

বাঙলাদেশেব সাম্প্রতিক ঘটনাবলীব বিষয়ে মাত্রা-হারানো অ-রাজনৈতিক আশাবাদের সঙ্গে কিন্তু এর কোনো সম্পর্ক নেই, যদিও এই ঘটনার যথোচিত রাজনৈতিক ও মানবনৈতিক তাৎপর্যের বোধের সূত্রেই তিনি পান আশ্বাসের নতুন জমি, নব্য পুরাণের উপকরণ। এ যুগের মহৎ এক বীরত্বের ও আশার কবিতা নিশ্চয় এটা, কিন্তু অসম্পূর্ণ কবিতা, সব দিক থেকেই অসম্পূর্ণ, এর মাত্রায় লক্ষ্যে সম্ভাবনায়—তাই লড়াইটাও অসম্পূর্ণ, অনেক কঠিন দুস্তর পথ তো আমাদের উভয় বাঙলারই সামনে। সেই পথে বিষ্ণু দে-র কবিতা আমাদের সব সময়ের সঙ্গী।

গ্রামশ্চির লেনিনবাদ

মোহিত সেন

আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত গ্রামশ্চির জীবন ও রচনাবলী* দুই-ই খুব স্বল্পজ্ঞাত। এটা খুবই আপসোসের কথা, কারণ যেকোনো মানদণ্ডের বিচারে এই দুই-ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; কমিউনিস্টরা যে কি, এবং—বাস্তবতাকে জানার আর সেটাকে বদলে দেবার জন্যে, তাদের ক্রিয়াকলাপকে প্রয়োগক্ষেত্রের বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করার জন্যে তাদের যন্ত্রণাময় আর জয়যুক্ত সংগ্রামে—কমিউনিস্টদের যে কি হওয়া উচিত, সেটাকে সুস্পষ্ট করে তোলার ব্যাপারে এই দুয়েরই বিরাট দান আছে।

কিন্তু এই আপসোসের আরো একটা দিক আছে এবং এই আলোচনায় সেটার দিকেই আমাদের মনোযোগ বেশি নিবদ্ধ হবে। আর সেটা হল, যাকে বলে, অতি-'বাম'পন্থীদের গ্রামশ্চিকে নিজেদের-কাজে লাগানোর এবং তাঁকে লেনিনের পালটা হিসেবে খাড়া করার প্রয়াস। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কোনো রকম সাংগঠনিক সম্পর্ককে এড়িয়ে যাবার একটা যুক্তি গ্রামশ্চির মধ্যে খুঁজে বের করার প্রয়াসও কিছুসংখ্যক ক্ষমতাবান, কিন্তু হয়তো বেশ একটু পরিশ্রান্ত, বুদ্ধিজীবীর পক্ষ থেকে রয়েছে। এটা আরো খারাপ এই জন্যে যে, আলোচ্য এই নির্বাচিত সংকলনটি পড়লেই এই কথাটা সন্দেহাতীত রূপে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে লেনিনই গ্রামশ্চির বুনিয়াদ—যেটার মধ্যে ফলপ্রসূভাবেই স্বতঃস্ফূর্ততাকে আর স্বেচ্ছা-সক্রিয়তাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। সেটা, এমন-কি, আরো বেশি খারাপ এই জন্যে যে, গ্রামশ্চি শুধু যে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে-ছিলেন, তাই নয় ; কমিণ্টার্ন-এর নির্দেশ মতো আংশিকভাবে হলেও, তিনি এর জেনারেল সেক্রেটারিও হয়েছিলেন।

"ইচ্ছার আশাবাদ আর বুদ্ধির নৈরাশ্যবাদ"—রোমাঁ রলাঁর এই উক্তিটি

---

* SELECTIONS FROM THE PRISON NOTEBOOKS OF ANTONIO GRAMSCI. Edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowel Smith. Lawrence & Wishart, London.

ছিল গ্রামশ্চির খুব প্রিয়। এইটেই তাঁকে ইতিহাসের সবচেয়ে চমৎকার বৈপ্লবিক সংস্থাটির—মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির—একজন সক্রিয় নেতা করে তুলেছিল।

গ্রামশ্চির বীরত্বের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন না করে এই নির্বাচন-সংকলনটির কতকগুলি বিষয়ের আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর জীবন—যন্ত্রণা-ভোগের মধ্যে দিয়ে শেখার আর জানার জীবন; সেই জ্ঞান অর্জনের জন্যে যন্ত্রণা-ভোগের জীবন; এবং, জ্ঞান মাত্রই যে যন্ত্রণা, এই কথাটির উপলব্ধিতে ভরা জীবন। এরকম একজন মানুষ যে আমাদের আন্দোলনের—কমিউনিস্ট আন্দোলনেরই—মানুষ, সেটা জেনে আর স্মরণ করে আমরা অত্যন্ত গর্ব অনুভব করি। কোনো কিছুই তাঁকে দমন করতে পারে নি, শেষ পর্যন্ত কারু কাছেই তিনি পরাজিত হন নি—এমন-কি, মৃত্যুর কাছেও নয়। দারিদ্র্য, ভগ্নস্বাস্থ্য, অনবরত ঘুরে বেড়ানো, জীবনের শেষ এগারোটি বছর ফ্যাসিস্ট বন্দীশিবিরে অন্তরীণ থাকা আর এই সব কিছুর মধ্যেই আগাগোড়া একটি মাত্র ভাবনা: শ্রমিকশ্রেণী-শক্তির বিজয়ের মধ্যে দিয়ে মানবজাতির মুক্তি। এ যেন মানবজাতির নাগালের বাইরে বলে মনে হয়; কিন্তু তবু, একজন মানুষ, একজন কমিউনিস্ট, এই সমস্ত সার্থকতাই অর্জন করেছিলেন। এক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই সব সময়ে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এমন একজন ব্যক্তিকে পাচ্ছি যিনি একটি উদাহরণ হিসেবে ততোটা মানবজাতির প্রতিনিধিস্থানীয় নন যতোটা তার ভিন্নমুখী যাত্রার নির্দেশক-বিন্দু।

গ্রামশ্চির মানসলোকের সুবিপুল পরিধি দেখে বিস্ময় প্রকাশ আর প্রশংসা না করেও থাকা যায় না। এখানে যদিও শুধু বন্দী অবস্থায় লেখা তাঁর নোটবই-গুলি থেকে একটা নির্বাচিত সংকলনের আলোচনার মধ্যেই আমাদের সীমাবদ্ধ থাকতে হচ্ছে, তবু, যেসব বিষয়ে আলোচনা বা প্রায় স্বগতোক্তির মতো মন্তব্য করা হয়েছে, তা সত্যিই সুবিপুল: 'বিসর্জিমেন্টো' বা নবজাগৃতি, 'ফোর্ড-বাদ', বুদ্ধিজীবীদের গড়ে-বেড়ে-ওঠা, 'সুপারস্ট্রাকচার'-এর বিশ্লেষণ, দর্শনের আর সাধারণ বুদ্ধির অর্থ, যুক্তফ্রণ্টের সারার্থ, বস্তুবাদ-ভাববাদ বিভাগ, কমিউনিস্ট পার্টির কাঠামো ও বিকাশ-বৃদ্ধি, মাকিয়াভেলির ঐতিহাসিক দান, গান্ধী সম্বন্ধে পরোক্ষ উল্লেখ, জ্যাকোবিনদের বিচার-বিশ্লেষণ—এক অন্তহীন তালিকা। এবং আগাগোড়া বাস্তবতার এই আপাত অন্তহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে এক নির্বাচনপটু, সমন্বয়ী আর বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনকারী মনের ক্রিয়া। গ্রামশ্চি যেসব মন্তব্য

করেছেন, সেগুলির কতকগুলি আরো আগেই লেনিন করতে পারতেন, কিন্তু তবু এসব মত ও মন্তব্য তাঁরই। এক্ষেত্রে এটা শুধুই, কিংবা প্রধানত, লেনিনের সমীপবর্তী হবার পথে ফ্যাসিবাদ কর্তৃক বাধা সৃষ্টিরই ব্যাপার নয়; এটা অনুরূপ মানসিকতার, এক যথার্থ ডায়ালেকটিক্যাল মনের ব্যাপার। এ সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছেন তা সর্বোপরি তাঁর নিজের সম্পর্কেই প্রযোজ্য—"অন্য কারু কাছ থেকে পাওয়া কোনো সাহায্য বা সংকেত বিনাই সত্যকে আবিষ্কার করাটা হল সৃষ্টি করা—এমন-কি, সেটা যদি কোনো পুরাতন সত্য হয়, তবু।" আমি মোটেই মনের সমতার কথা বলতে চাইছি না—স্পষ্টতই লেনিনের মানসলোক ছিল গুণগতভাবে ঢের উচ্চতর স্তরের—দুজনের মনের সাদৃশ্যের উপরেই জোর দিতে চাইছি। একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রতিভাধরের মতো ভাবতে পারাটাকে শিখে নিতে পারেন।

এবার ট্রটস্কির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়টাকে ধরা যাক। স্তালিন এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্য কখনও কখনও যেভাবে ট্রটস্কির সঙ্গে বিতর্ক চালিয়েছিলেন, তার সঙ্গে গ্রামশ্চির মত-পার্থক্য ছিল—এই যুক্তি খাড়া করে এরকম একটা বিশ্রী সন্দেহ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়ে থাকে যে ট্রটস্কির প্রতি গ্রামশ্চির সহানুভূতি ছিল। এর চেয়ে অসত্য আর কিছু হতে পারে না। এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যাচ্ছে যা কাজে লাগতে পারে।

"১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সূত্রায়িত 'জাকোবিন' স্লোগানটির [চিরস্থায়ী বিপ্লব] কথা বলতে গেলে, এর জটিল গতি-পরিণতিটুকু অনুশীলনযোগ্য। পারভুস-ব্রনস্টাইন (ট্রটস্কি) গ্রুপ এই স্লোগানটিকে আবার নতুন করে গ্রহণ করে একে সুসংবদ্ধ আর বিকশিত করে তুলে এক মনীষা-দীপ্ত রূপ দিলেও, ১৯০৫ সালে এবং তার পরবর্তীকালে সেটা নিষ্ক্রিয় আর ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়। সেটা তখন বিজ্ঞানীর আলমারিতে তুলে রাখা একটা বিমূর্ত জিনিসে পরিণত। যে-[বলশেভিক] প্রবণতা এর এই আক্ষরিক রূপের বিরোধিতা করেছিল এবং সত্যিই 'ইচ্ছাকৃতভাবে' সেটাকে কাজে লাগায় নি, সেই প্রবণতাটাই বাস্তবিক পক্ষে সেটাকে স্থান-কালের উপযোগী করে নিয়ে এমন একটি ভিন্ন রূপে প্রয়োগ করেছিল যেটা বাস্তব, মূর্ত ও জীবন্ত ইতিহাসানুগ; যে-সমাজের রূপান্তর ঘটাতে হবে, সেই বিশেষ সমাজের প্রতিটি রন্ধ্র থেকে উৎসারিত একটা-কিছু হিসেবে; শহরে গ্রুপটির আধিপত্য সহ, দুটি সামাজিক গ্রুপের [অর্থাৎ,

প্রলেতারিয়েত ও কৃষকদের] জোট হিসেবে। একটি ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত এক রাজনৈতিক বিষয়বস্তু ছাড়াই জ্যাকোবিন মেজাজের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে—কেতাবী ও বুদ্ধিজীবী-মার্কা কোনো ছাপ থেকে নয়—নূতন ঐতিহাসিক সম্পর্কগুলি থেকে আহরিত জ্যাকোবিন মেজাজ আর বিষয়বস্তু।"

আরেক জায়গায় যেখানে গ্রামশ্চি—লেনিনের সবচেয়ে প্রজননশক্তিসম্পন্ন ধ্যান-ধারণাগুলির অন্যতম—বিপ্লবের নানা পথের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বক্তব্যকে বিশদ করে তুলেছেন (সবচেয়ে লক্ষণীয়ভাবে কমিণ্টার্ন-এর তৃতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে), সেখানে তিনি ট্রটস্কির মতান্ধতা আর হঠকারিতার উল্লেখ করেছেন এবং সেই সঙ্গে ট্রটস্কির সঙ্গে লেনিনের ব্যক্তি হিসেবে বৈপরীত্যগুলিও উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করেছেন।

"ব্রনস্টাইন আপাতদৃষ্টিতে 'পশ্চিমী' হলেও আসলে ছিলেন বিশ্ব নাগরিক বা কসমোপলিটান—অর্থাৎ, উপর-উপর ভাসা-ভাসা ভাবে জাতীয় মনোভাবাপন্ন এবং অগভীরভাবেই পশ্চিমী বা ইয়োরোপীয়। পক্ষান্তরে, ইলিচ ছিলেন অত্যন্ত গভীরভাবে জাতীয় মনোভাবাপন্ন এবং প্রগাঢ়ভাবেই ইয়োরোপীয়।...

"আমার মনে হয়, ইলিচ বুঝেছিলেন যে ১৯১৭ সালে পূর্বাঞ্চলে যেটা প্রয়োগ করে জয়যুক্ত হওয়া গিয়েছিল, সেই কৌশল প্রয়োগের যুদ্ধ থেকে অবস্থানগত যুদ্ধে পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন এবং এইটেই পশ্চিমের পক্ষে একমাত্র সম্ভাব্য রূপ। আমার মনে হয়, এই হল 'যুক্তফ্রণ্ট' সূত্রটির অর্থ।

"কিন্তু ইলিচ তাঁর সূত্রটিকে বিশদ করে তোলার সময় পান নি—যদিও এ কথাটা মনে রাখা উচিত যে তিনি এটাকে শুধু তত্ত্বগতভাবেই বিশদ করে তুলতে পারতেন, যেক্ষেত্রে মূলগত কর্তব্যটি ছিল জাতিগত, অর্থাৎ, এর জন্যে প্রয়োজন ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের এক নিরীক্ষামূলক পরিদর্শন এবং পরিখা আর নগরদুর্গের মৌল উপাদানগুলির সনাক্তকরণ—যেগুলির প্রতিনিধিত্ব করছে পৌরসমাজ ইত্যাদির উপাদানসমূহ। রাশিয়ায় রাষ্ট্রই ছিল সব, পৌরসমাজ ছিল আদিম আর সান্দ্র অবস্থায়; পশ্চিমে রাষ্ট্র আর পৌরসমাজের মধ্যে একটা যথোচিত সম্পর্ক ছিল এবং রাষ্ট্র যখনই কেঁপে উঠত, পৌরসমাজের একটা শক্ত কাঠামো তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পেত। রাষ্ট্র ছিল শুধু একটা বাইরের পরিখা যার পিছনে খাড়া থাকত নগরদুর্গ আর শক্ত মাটির দুর্গপ্রাচীরের এক শক্তিশালী ব্যবস্থা: বলা বাহুল্য, একটা রাষ্ট্র থেকে পরবর্তী আরেকটা রাষ্ট্রের মাঝখানে তা ছিল

অল্প-বিস্তর বহুসংখ্যক—কিন্তু ঠিক এই জন্যেই প্রয়োজন হত স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি দেশের এক সঠিক নিরীক্ষামূলক পরিদর্শন।…

"এটাকেই যুদ্ধোত্তরকালে উপস্থাপিত রাজনৈতিক তত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ, এবং সঠিকভাবে সমাধান করার পক্ষে সবচেয়ে কঠিন, প্রশ্ন বলে আমার মনে হয়। ব্রনস্টাইন কর্তৃক উপস্থাপিত প্রশ্নগুলির সঙ্গে এটি সম্পর্কিত—যাঁকে এমন একটি কালপর্বে সম্মুখ আক্রমণের রাজনৈতিক তত্ত্ববিদ হিসেবে কোনো-না-কোনো ভাবে গণ্য করা যেতে পারে, যে-কালে সেটার একমাত্র পরিণতি পরাজয়ে।"

আরও একটি মন্তব্য—এবং এটিও আরেকবার জাতীয় ও আন্তর্জাতিকের ডায়ালেকটিকস সম্বন্ধে এক সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে:

"বাস্তব ক্ষেত্রে, যেকোনো জাতির অভ্যন্তরীণ সম্পর্কগুলি হল এমন একটি সংযোগের ফল যেটা 'মৌলিক' এবং (এক অর্থে) অনন্যসাধারণ: কেউ যদি ওই সম্পর্কগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই সেগুলিকে তাদের মৌলিক আর অনন্যসাধারণ রূপেই উপলব্ধি ও আত্মস্থ করতে হবে। বিকাশের ধারাটি নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিকতার দিকে, কিন্তু তার যাত্রাস্থলটি 'জাতীয়'—এবং এই যাত্রাস্থানটি থেকেই শুরু করা চাই। তবু, পরিপ্রেক্ষিতটি আন্তর্জাতিক এবং তা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ফলে, জাতীয় শক্তিগুলির সমন্বয়কে সঠিকভাবে অনুশীলন করা দরকার—আন্তজাতিক শ্রেণীকে যে-শক্তিগুলির নেতৃত্ব দিতে হবে আর বিকাশ ঘটাতে হবে আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত আর নির্দেশাবলী অনুযায়ী। নেতৃত্বদানকারী শ্রেণীটি বাস্তবিক পক্ষে সেই স্থানে অধিষ্ঠিত হবে শুধু যদি সেটি এই সমন্বয়কে অভ্রান্তভাবে ব্যাখ্যা করে।· আমার মতে, এই বক্তব্যটিই সংখ্যাগরিষ্ঠ আন্দোলনের ব্যাখ্যাতা হিসেবে লেভ দাভিদোভিচ [ট্রটস্কি] আর ভিসারিয়নভিচ [স্তালিন]-এর মধ্যে মতপার্থক্যের ভিত্তি। জাতীয়তাবাদের অভিযোগ অবান্তর হয়ে দাঁড়ায় যদি ত প্রশ্নটির মর্মকেন্দ্র সম্পর্কিত হয়।·· চরিত্রের দিক থেকে আন্তর্জাতিক একটি শ্রেণীর —যতোটা সে সংকীর্ণভাবে জাতীয় (বুদ্ধিজীবীকুল) এবং বাস্তবিকপক্ষে প্রায় ক্ষেত্রেই তার চেয়েও কম জাতীয় সামাজিক স্তরগুলিকে পরিচালিত করে, ততোটাই—নিজেকে এক অর্থে 'জাতীয়করণ' করতে হয়। ওই-আরো-কম জাতীয় স্তরগুলি হল নিজস্ব নির্দিষ্ট স্বার্থ ['পার্টিকুলারিস্টিক'] আর আঞ্চলিক স্বার্থ ['মিউনিসিপ্যালিস্টিক'] রক্ষায় মনোভাবাপন্ন (কৃষককুল) সামাজিক স্তর।··

"অ-জাতীয় ধারণাগুলি (অর্থাৎ আলাদাভাবে প্রত্যেকটি দেশ সম্বন্ধে যেগুলির উল্লেখ করা যায় না) যে ভ্রান্ত, সেটা তাদের অসম্ভাব্যতা থেকেই দেখা যাচ্ছে : দুটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে সেগুলি নিষ্ক্রিয়তা আর জড়তার দিকে চালিত করেছে : (১) প্রথম পর্যায়ে, কেউই মনে করে নি যে তাদেরই শুরু করতে হবে…সবাই মিলে একই সঙ্গে কাজে নামতে হবে বলে তারা অপেক্ষা করে ছিল।… (২) দ্বিতীয় পর্যায়টি বোধহয় আরো খারাপ কারণ যেটার অপেক্ষায় থাকা হয়েছে সেটা 'নেপোলিয়নবাদ'-এর এক কাল-সঙ্গতিহীন আর স্বাভাবিকতাবিরোধী রূপ। …পুরাতন কার্যব্যবস্থার এই আধুনিক রূপের তত্ত্বগত দুর্বলতাকে চিরস্থায়ী বিপ্লবের সাধারণ তত্ত্বের মুখোশ পরিয়ে আড়াল করা হয়েছে।"

সব শেষে আরেকটি উল্লেখ। উন্নত পুঁজিতন্ত্র যেসব নূতন শ্রমশিল্পপদ্ধতি—বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে—প্রয়োগ করতে শুরু করেছে, গ্রামশ্চি সেগুলির এক অত্যন্ত লক্ষণীয় বিশ্লেষণ করেছেন : টেলার কর্তৃক শ্রমিকদের কাজকর্মের জাতীয়করণ এবং ফোর্ডের 'কনভেয়ারবেল্ট টেকনিক'। এই বিশ্লেষণটুকু করতে বসে গ্রামশ্চি প্রসঙ্গক্রমে, কিন্তু অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে, রাষ্ট্রীয় একচেটে পুঁজিতন্ত্রের ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, তিনি সুনির্দিষ্ট আর বাস্তব একটি সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গেই, আন্দোলনের সমস্যাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সর্বজনীন বিষয়গুলির অবতারণা করেছেন এবং এই প্রসঙ্গেই তিনি আরেকবার ট্রটস্কির সমালোচনা করেছেন।

"শ্রমশিল্পবাদের ইতিহাস সব সময়েই হয়ে রয়েছে মানুষের ভিতরকার 'পশুত্ব'র উপাদানটির বিরুদ্ধে এক অব্যাহত সংগ্রাম (যেটা আজ আরো বেশি লক্ষণীয় আর প্রবল রূপ নিচ্ছে)।…

"[নূতন শ্রমশিল্পপদ্ধতিগুলি] সহজাত কাম-প্রবৃত্তিগুলির (নার্ভতন্ত্রের স্তরে) কঠোর নিয়ন্ত্রণ দাবি করে এবং সেই সঙ্গে (পারিবারিক ব্যবস্থার কোনো একটি বিশেষ রূপের চেয়ে) ব্যাপক অর্থে 'পরিবার'কে শক্তিশালী করে তোলা আর কামজ সম্পর্কগুলির নিয়ন্ত্রণ আর স্থায়িত্ব দাবি করে।

"এই কথাটির উপরে জোর দেওয়া উচিত যে, কাম-বাসনার ক্ষেত্রে যে-মতাদর্শগত উপাদানটি ব্যক্তিকে সবচেয়ে বেশি কলুষিত করে আর সবচেয়ে বেশি করে পিছনের দিকে টানে, তা হল যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আর স্বাধীন ইচ্ছায় বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত ধারণাটি। এই ধারণাটি সেই শ্রেণীগুলির মধ্যেই লক্ষণীয় যেগুলি উৎপাদনশীল কাজের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা নয়। এরাই শ্রমিকশ্রেণী-

গুলির মধ্যে ওই ধারণাটি ছড়িয়ে দেয়। যে-রাষ্ট্রে আর শ্রমিক জনগণ ঊর্ধ্বতন কোনো শ্রেণীর জবরদস্তি চাপের অধীনস্থ নয় এবং যেখানে উৎপাদনের আর কাজের নূতন পদ্ধতিগুলিকে আয়ত্ত করতে হবে পরস্পরকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজি করানোর দ্বারা এবং প্রতিটি ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তাবিত ও গৃহীত প্রত্যয়গুলির দ্বারা, সেই রাষ্ট্রে এই জিনিসটি বিশেষভাবে গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়।··

"লেভ দাভিদোভিচ [ট্রটস্কি] যে-প্রবণতাটির প্রতিনিধি, সেটি এই সমস্যাবলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই তথ্যটিকে পুরোপুরি প্রকাশ করা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, এর সারমর্মটুকু হল—জাতীয় জীবনে শ্রমশিল্প আর শ্রমশিল্পসংক্রান্ত পদ্ধতিগুলির উপরে, বাইরে থেকে জবরদস্তি চাপ সৃষ্টির দ্বারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে শৃংখলা আর সুব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোকে ত্বরান্বিত করে তোলার উপরে, এবং কাজের প্রয়োজনীয়তাগুলির ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি-প্রথাকে গ্রহণ করার উপরে সর্বাধিক প্রাধান্য আরোপের এক 'অতি'-দৃঢ় সংকল্প (এবং সেই জন্যেই সেটা 'জাতীয়'কৃত নয়)। এই প্রবণতাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত সমস্যাকে যে রকম সাধারণভাবে ধারণা করে নেওয়া হয়েছিল, তাতে, স্বভাবতই বোনাপার্টিজম-এর একটি রূপে পরিণতি লাভই ছিল তার ভবিতব্য। সেই জন্যেই, সেটার মূলোৎপাটন ঘটানোর অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পূর্বজ্ঞানগুলি ছিল সঠিক, কিন্তু প্রয়োগ ক্ষেত্রে সেগুলির মীমাংসা হয়ে দাঁড়ায় নিতান্তই ভ্রান্ত এবং তত্ত্ব আর প্রয়োগের মধ্যে এই ভারসাম্যের অভাবের মধ্যেই এক অন্তর্নিহিত বিপদ থেকে গিয়েছিল—কিছুকাল আগে, ১৯২১ সালে, যেটা প্রকট হয়ে উঠেছিল, সেই একই বিপদ। উৎপাদন আর কাজের ক্ষেত্রে শৃংখলা আনার জন্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপ সৃষ্টির নীতি সঠিক, কিন্তু সেটা যে রূপ নিয়েছিল তা ভ্রান্ত। ফৌজী মডেলটি অত্যন্ত ক্ষতিকর এক সংস্কার হয়ে দাঁড়ায় এবং শ্রমের সামরিকীকরণ হয় ব্যর্থ।"

ট্রটস্কি আর গ্রামশ্চির মধ্যে চিন্তার মিল আছে—এই ধারণাটিকে দূর করতে উপরের এই উদ্ধৃতিগুলি সাহায্য করবে এবং গ্রামশ্চির ডায়ালেকটিক্যাল চিন্তা-প্রণালীর কিছু নিদর্শন জোগাবে।

গ্রামশ্চির রচনাবলী থেকে নির্বাচিত এই সংকলনটিতে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এতো বেশি যে এরকম একটি প্রবন্ধে সবগুলি নিয়ে ভাসাভাসা ভাবেও আলোচনা করা অসম্ভব। আমাদের সমকালীন চিন্তা-ভাবনার বিষয়গুলির মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক 'পৌরসমাজ-রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব-আধিপত্য' বিষয়টি, কিন্তু এটা

নিয়ে আলোচনা করার আগে, অন্য কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করতে চাই— 'অর্গ্যানিক' ও 'ট্র্যাডিশনাল' বুদ্ধিজীবীরা ; দর্শন ও সাধারণ বুদ্ধি ; নয়া 'প্রিন্স' বা পার্টি।

'অর্গ্যানিক' ও 'ট্র্যাডিশনাল' বুদ্ধিজীবীদের প্রসঙ্গে গ্রামশ্চি বলছেন : "বুদ্ধিগত বা ইন্টেলেকচুয়াল ক্রিয়াকলাপ (এবং, ফলত, যেসব ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ ওই ক্রিয়াকলাপের ব্যক্তিরূপ, তারা) সামাজিক সম্পর্কগুলির সাধারণ যৌগিক ব্যবস্থার অন্তর্গত। সেই সম্পর্ক-প্রণালীর পরস্পর-সংশ্লিষ্ট সমাবেশের মধ্যেই বরং [বুদ্ধিজীবী আর অ-বুদ্ধিজীবী বা 'নন-ইন্টেলেকচুয়াল'দের] পার্থক্য বিচারের মানদণ্ডটি সন্ধান কবা চাই। তা না করে, ইন্টেলেকচুয়াল ক্রিয়াকলাপের স্বকীয় অন্তর্নিহিত প্রকৃতির মধ্যে সেটাকে খোঁজাই, আমার মনে হয়, সবচেয়ে ব্যাপক প্রণালীগত ভ্রান্তি।··· সুতরাং সব মানুষকেই বুদ্ধিজীবী বলা যেতে পারে, কিন্তু সমাজে সব মানুষেরই যে ইন্টেলেকচুয়াল ক্রিয়া রয়েছে, তা নয়।···

"অর্থনৈতিক উৎপাদনের জগতে একটি অপরিহার্য ক্রিয়ার মৌলিক জমির উপরে অস্তিত্ব লাভ করে যেসব সামাজিক গ্রুপ, সেগুলির প্রত্যেকটি নিজেকে নিয়েই একযোগে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত এক বা একাধিক ইন্টেলেকচুয়াল স্তর সৃষ্টি করে ; সেই স্তরগুলিই তাকে সমসত্তা দেয় এবং শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়— সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতেও—তার নিজস্ব ক্রিয়া সম্বন্ধে একটা সচেতনতা দান করে।···

"পূর্ববর্তী অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে, এবং এই কাঠামোর বিকাশেরই একটি অভিব্যক্তি হিসেবে, ইতিহাসে আবির্ভূত প্রত্যেকটি 'অপরিহার্য' সামাজিক গ্রুপ আগে থেকেই বর্তমান বুদ্ধিজীবীদের নানা বর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (অন্তত বর্তমান কাল পর্যন্ত সমগ্র ইতিহাসে)। ওই 'অপরিহার্য' সামাজিক গ্রুপগুলির প্রত্যেকটি বাস্তবিক পক্ষে রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপগুলিতে এমন-কি সবচেয়ে জটিল আর আমূল সব পরিবর্তনের দ্বারাও অব্যাহত এক ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার প্রতিনিধিত্ব করছে বলে মনে হয়ে এসেছে।···

"প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে বিকাশমান যেকোনো গ্রুপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রবৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল : 'ট্র্যাডিশনাল' বুদ্ধিজীবীদের "মতাদর্শের দিক থেকে" আত্তীকরণ আর জয় করার জন্যে তার সংগ্রাম ; কিন্তু সেই বিশেষ গ্রুপটি যুগপৎ তার নিজস্ব 'অর্গ্যানিক' বুদ্ধিজীবীদের বিপদবৃদ্ধির কাজে যতো বেশি পরিমাণে সফল হবে, ততোই ওই আত্তীকরণের আর জয় করে নেবার

কাজটি দ্রুততর আর অধিকতর ফলপ্রদ হবে।...

"কতকগুলি সামাজিক গ্রুপের কাছে রাজনৈতিক পার্টি হল—শুধু উৎপাদন সংক্রান্ত কারুকৌশলের ক্ষেত্রেই নয়—সরাসরি রাজনৈতিক ও দার্শনিক ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের 'অর্গ্যানিক' বুদ্ধিজীবীদের বর্গকে বিশদ করে তোলার নিজস্ব স্বতন্ত্র পথ ছাড়া আর-কিছু নয়। এইসব বুদ্ধিজীবী এভাবেই গড়ে ওঠে এবং সেই বিশেষ সামাজিক গ্রুপের গঠন, বিকাশ ও জীবনের সাধারণ চরিত্র আর অবস্থাগুলির অধীনে বাস্তবিক পক্ষে তারা অন্য কোনোভাবে গড়ে-বেড়ে-উঠতে পারে না।"

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির ইণ্টেলেকচুয়াল কাজকর্মের, এবং যারা এই পার্টির ব্যাপারে বৈপ্লবিক মনোভাব অবলম্বনের প্রয়াসী সেই ইণ্টেলেকচুয়ালদের দৃষ্টিভঙ্গীর, নির্দেশিকা হিসেবে এই বিশ্লেষণটুকু মহা মূল্যবান। শ্রমিকশ্রেণীর বুদ্ধি-জীবীদের গড়ে-বেড়ে-তোলা; যে-সংগ্রামের পরিণামে 'ট্র্যাডিশনাল' বুদ্ধিজীবী-দের মতাদর্শগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সংগ্রামে জয়ী হওয়া; এবং, ওই শ্রেণীর ইণ্টেলেকচুয়াল বিকাশের মূলগত উপায় হিসেবে পার্টির বিকাশসাধন;—ইণ্টে-লেকচুয়াল ফ্রণ্টের কর্তব্য আর কাজের সম্পর্কগুলিকে এর আগে এতো ঘন-সংবদ্ধ নিটোলভাবে খুব কম ক্ষেত্রেই প্রকাশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, দর্শন ও সাধারণ বুদ্ধি। গ্রামশি লিখছেন: "কোনো নূতন কৃষ্টি সৃষ্টি করার অর্থ শুধুই নিজস্ব 'মৌলিক' কতকগুলি আবিষ্কার নয়। নূতন এক কৃষ্টি সৃষ্টি করা বলতে, ইতিপূর্বেই আবিষ্কৃত সত্যগুলির সম্যকভাবে আলোচিত রূপে পরিব্যাপন বা 'ডিফিউশন'; যাকে বলে, তাদের সমাজীকরণ বা 'সোশ্যালাইজেশন'; এমন-কি, তাদের একান্ত মূলগত ক্রিয়াগুলির একটি বুনিয়াদ—সমন্বয় সাধনের আর ইণ্টেলেকচুয়াল ও নৈতিক শৃংখলার একটি উপাদান—করে তোলাও বোঝায়, এবং তা সবচেয়ে বিশেষ ভাবেই বোঝায়। জনগণের পক্ষে বাস্তব বর্তমান জগৎ সম্বন্ধে সঙ্গতিপূর্ণভাবে এবং একই রকম সুসঙ্গত ধরনে চিন্তা করার কাজে পরিচালিত হওয়াটা এমন একটি 'দার্শনিক' ঘটনা—যেটা কোনো দার্শনিক 'প্রতিভা' কর্তৃক কোনো-এক সত্য আবিষ্কারের চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও 'মৌলিক'—যে-সত্যটি ইণ্টেলেকচুয়ালদের কয়েকটি ছোট ছোট গ্রুপের সম্পত্তি হিসেবে সংরক্ষিত।...

"অনুশীলনের [মার্কসবাদ] দর্শনের অবস্থানটি হল ক্যাথলিক মনোভাবের অ্যাণ্টি-থিসিস। অনুশীলনের দর্শন 'সরলমনা'দের তাদের সাধারণ বুদ্ধির আদিম

দর্শনের মধ্যেই রেখে দিতে চায় না, বরং তাদের জীবন সম্বন্ধে এক উচ্চতর ধারণার দিকে চালিত করতে চায়। সেটা যখন ইন্টেলেকচুয়াল আর সরল-মনাদের মধ্যে সংযোগের প্রয়োজনীয়তার উপরে জোর দেয়, তখন তা করে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপকে সীমাবদ্ধ রাখার জন্যে আর জনগণের নিম্নতর স্তরটিতে ঐক্য রক্ষার জন্যে নয়; সুনির্দিষ্টভাবেই এমন একটা ইন্টেলেকচুয়াল-নৈতিক জোট সৃষ্টি করার জন্যেই সেটা করে, যে-জোটটি—শুধু ছোট ছোট বুদ্ধিজীবী গ্রুপগুলিরই নয়—সমগ্র জনগণের ইন্টেলেকচুয়াল প্রগতিকে রাজনীতিগতভাবে সম্ভব করে তুলতে পারে।…

"সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাধারণ বুদ্ধিকে যে উচ্চস্থানে বসানো হয়েছিল, সেটা স্বাভাবিক; কারণ, তখন বাইবেল আর অ্যারিস্টটল যে-কর্তৃত্বের নীতির প্রতিনিধিত্ব করতেন, তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া জেগেছিল। এটা আবিষ্কৃত হয়েছিল যে 'সাধারণ বুদ্ধি'র মধ্যে বাস্তবিকই কিছুটা পরিমাণে 'এক্সপেরিমেণ্টালিজম' এবং বাস্তব অবস্থার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ রয়েছে—যদিও সেটা প্রায়োগিক আর সীমাবদ্ধ।…বাস্তবিক পক্ষে অবস্থার বদল ঘটেছে এবং আজকের 'সাধারণ বুদ্ধি'র ঢের বেশি সীমাবদ্ধ এক স্বকীয় গুণ রয়েছে।…

"সাধারণ বুদ্ধির দর্শন হল 'অ-দার্শনিকদের দর্শন', অথবা, ভিন্ন ভাষায় বলতে গেলে, সম্যক রূপে আলোচনা-বিশ্লেষণ না করেই এমন কতকগুলি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ কর্তৃক আত্মস্থ করে নেওয়া বিশ্ব সম্বন্ধে ধারণা, যে-পরিবেশেই সাধারণ মানুষের নৈতিক স্বতন্ত্রতার বিকাশ ঘটে।"

গ্রামশ্চি তৃতীয় দশকের শেষ আর চতুর্থ দশকের গোড়ার দিকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিকাশের পর্যায়টির কিছু অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনা করেছেন। এটা এমন একটা পর্যায় যেটাকে আজও পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে ওঠা গেছে বলা যায় না। একটা কারণ হল এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে চেতনার অভাব এবং এর অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতা।

"অনুশীলনের দর্শনের সর্বাধুনিক বিকাশগুলির ক্ষেত্রে তত্ত্ব আর প্রয়োগের ঐক্যের ধারণাটি সম্বন্ধে বিস্তারিত অনুসন্ধান চালানো আর সেটাকে আরো পরি-মার্জিত করে তোলার কাজটি এখনও পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে রয়ে গেছে। যান্ত্রিক-ভাবে চিন্তা করার কিছু কিছু অবশেষ এখনও রয়ে গেছে, কারণ লোকে তত্ত্বকে প্রয়োগের একটা 'পরিপূরক' বা একটা 'সহায়ক' হিসেবে কিংবা তত্ত্বের পরিচারিকা হিসেবে দেখে।…ব্যাপকতম অর্থে নিজেকে সংগঠিত না করে কোনো জনগোষ্ঠী

নিজেকে 'বিশিষ্ট' করে তুলতে পারে না, নিজস্ব অধিকারের ভিত্তিতে স্বাধীন হয়ে উঠতে পারে না; এবং, বুদ্ধিজীবীরা ছাড়া—অর্থাৎ সংগঠক আর নেতারা ছাড়া—ভিন্ন ভাষায় বলতে গেলে, আইডিয়াগুলির ধারণাগত ও দার্শনিক বিশদীকরণের কাজে 'বিশেষজ্ঞ' একদল লোকের অস্তিত্বের দ্বারা মূর্তরূপে বিশেষীকৃত তত্ত্ব-প্রয়োগ সম্পর্ক-বন্ধনের তত্ত্বগত দিক ছাড়া—কোনো সংগঠক থাকতে পারে না। কিন্তু এই বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টি-প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ,কঠিন; নানা বিরোধিতা অগ্রগতি আর পশ্চাদ্‌গমন, ছত্রখান হয়ে পড়া আর আবার নূতনভাবে দলবদ্ধ হওয়া ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ—যে-প্রক্রিয়াটির মধ্যে দিয়ে জনগণের বিশ্বস্ততার এক কঠিন বিরক্তিকর পরীক্ষা চলে।

"উন্নয়নের প্রক্রিয়াটি জনগণ আর ইন্টেলেকচুয়ালদের মধ্যে এক ডায়ালেকটিকের সঙ্গে বাঁধা। ইন্টেলেকচুয়াল স্তরটি—গুণগত আর পরিমাণগত—উভয় ভাবেই বিকশিত হয়, কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল স্তরের কোনো নূতন প্রস্থের আর জটিলতার দিকে প্রত্যেকটি সম্মুখভাগে উল্লম্ফন সাধারণ অ-বুদ্ধিজীবী জনগণের দিক থেকে একটি অনুরূপ গতির সঙ্গে বাঁধা—যে-জনগণ সংস্কৃতির উচ্চতর স্তরে নিজেদের উন্নীত করে আর সেই সঙ্গেই আরো বেশি বা কম গুরুত্বপূর্ণ অতি-বিশিষ্ট সব ব্যক্তি আর গ্রুপ তৈরি করে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বুদ্ধিজীবীদের স্তরের দিকে নিজেদের প্রভাবের বৃত্তটির সম্প্রসারণ ঘটায়। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটিতে বারবার এমন সব মুহূর্তের পুনরাবির্ভাব ঘটে যখন জনগণ আর ইন্টেলেকচুয়ালদের মধ্যে (অন্তত তাদের একাংশের কিংবা কোনো একটি গ্রুপের মধ্যে) সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এবং এর থেকেই এই ধারণাটি জন্মায় যে তত্ত্ব হল 'সহায়ক', 'পরিপূরক' মাত্র এবং প্রয়োগের অধীনস্থ। দুটি উপাদানকে শুধু চিহ্নিত করেই নয়, পৃথক ও বিভক্ত করার পরে (যে-কাজটি নিছক যান্ত্রিক ও প্রথানুগ) তত্ত্ব-প্রয়োগ সম্বন্ধের ব্যবহারিক উপাদানটির উপরে জোর দেওয়ার অর্থ এই যে, সেই ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত আদিম এক ঐতিহাসিক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সেই পর্যায়টি তখনও অর্থনৈতিক-যৌথসংস্থা-মূলক।"

গ্রামশ্চির এই মন্তব্য এবং তার সঙ্গে তত্ত্ব ও প্রয়োগের বা তত্ত্ব-প্রয়োগের, অথবা বৈপ্লবিক প্রয়োগের কিংবা অনুশীলনের নিয়ত ঐক্যের উপরে পুরোপুরি সঠিক গুরুত্ব আরোপ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চরিত্র ও কার্যকরতার মূলে; মাওয়ের 'প্রয়োগ প্রসঙ্গে'র বন্ধ্যাত্ব দেখাতে তা সাহায্য করে এবং মাওবাদের

আজকের বিতৃষ্ণাজনক সংকীর্ণমনস্কতার দার্শনিক ভিত্তিকে প্রকাশ করে।

ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বিষয়ীগত হস্তক্ষেপের উপাদানের লেনিনবাদী নীতির প্রতি প্রগাঢ় আনুগত্য নিয়ে (লেনিন একজায়গায় বলেছেন, বিষয়ীগত উপাদানই বিষয়গত উপাদান সৃষ্টি করে—এবং এটি হল পরিবর্তন ও জ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধ প্রসঙ্গে মার্কসের বিখ্যাত উক্তিরই সম্প্রসারণ) গ্রামশ্চি বহু কমিউনিস্টের "কমিউনিজমের অবশ্যম্ভাবী জয়ের" মনোভাবকে ঐতিহাসিকভাবে উপস্থাপিত করেছেন এবং সমালোচনাও করেছেন।

"নিমিত্তবাদী, নিয়তিবাদী ও যান্ত্রিক উপাদানটি কিভাবে অনেকটা (বিহ্বল করে রাখার গুণের দিক দিয়ে) ধর্ম বা মাদকদ্রব্যের মতো অনুশীলনের দর্শন থেকে উদ্ভূত একটা প্রত্যক্ষ মতাদর্শগত 'সুবাস' হয়ে উঠেছে, তা প্রণিধানযোগ্য। কতকগুলি সামাজিক বর্গের 'নিম্নতর পদস্থ সেনাপতিসুলভ' চরিত্র একে প্রয়োজনীয় করে তুলেছে এবং ঐতিহাসিকভাবে এর যাথার্থ্য প্রমাণ করেছে।

"সংগ্রামে আপনার হাতে যখন উদ্যোগটা থাকে না এবং সংগ্রামটা যখন ঘটনাক্রমে পর পর কতকগুলি পরাজয়ের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় তখন যান্ত্রিক নিমিত্তবাদ হয়ে ওঠে নৈতিক প্রতিরোধের, সংহতির এবং ধীরস্থির ও অবিচল অধ্যবসায়ের প্রচণ্ড শক্তি।…কিন্তু জনসাধারণের অর্থনৈতিক কাজকর্মের জন্য যখন সেই 'নিম্নতর সেনাপতি' নিয়ামক ও দায়ী হয়ে ওঠে, তখন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যান্ত্রিকতাটা হয়ে দাঁড়ায় আশু বিপদ ; তখন চিন্তার ধরনের মধ্যে একটা সংশোধন ঘটতেই হয় কারণ অস্তিত্বের সামাজিক ধরনের মধ্যেই একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে।…

"বস্তুত, নিয়তিবাদ যে দুর্বল অবস্থায় প্রকৃত ও সক্রিয় ইচ্ছারই পরিহিত পোশাক ছাড়া আর কিছু নয়, সেটা জোর দিয়ে বলা দরকার। সেই জন্যই সব সময়ে যান্ত্রিক নিমিত্তবাদের অসারতা দেখানো অত্যাবশ্যক ; কারণ একে যদিও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে জনসাধারণের অতি-সরল দর্শন বলে এবং সেই হেতু, শুধুই সেই হেতু, তা শক্তির একটা সহজাত উপাদান হতে পারে, তবু বুদ্ধিজীবীদের তরফ থেকে যখন তাকে সুচিন্তিত ও সুসংলগ্ন দর্শন হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তখন তা হয়ে দাঁড়ায় নিষ্ক্রিয়তার একটি কারণ, নির্বোধ 'স্বয়ংভরতা'র একটি কারণ।"

তৃতীয়ত, আধুনিক 'প্রিন্স' বা পার্টি। "আধুনিক 'প্রিন্স', অতিকথার যুবরাজ, প্রকৃত মানুষ হতে পারে না ; মূর্ত ব্যক্তি হতে পারে না। তা শুধু একটা

'অর্গ্যানিজম' বা অবয়ব হতে পারে, হতে পারে সমাজের এক জটিল উপাদান—যার মধ্যে ইতিমধ্যেই স্বীকৃত ও কর্মক্ষেত্রে কিছুটা স্বপ্রতিষ্ঠ যৌথ ইচ্ছা মূর্ত রূপ গ্রহণ করতে শুরু করে।' এই অবয়বকে ইতিহাস ইতিমধ্যেই প্রথম কোষটি দিয়েছে—সেটি হল রাজনৈতিক পার্টি—যার মধ্যে একত্র হয় যৌথ ইচ্ছার জীবাণুগুলি; যা হয়ে উঠতে চায় বিশ্বজনীন ও সার্বিক।...

"মানুষের বিবেকে এই 'প্রিন্স' গ্রহণ করে দেবতার স্থান অথবা পরম অনুজ্ঞার স্থান এবং হয়ে ওঠে আধুনিক ঐহিকতার ভিত্তি, জীবনের সকল দিকের সকল প্রথাগত সম্পর্কের পরিপূর্ণ ঐহিকীকরণের ভিত্তি।"

পার্টির প্রকৃত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পার্টির অর্থ সম্পর্কে নিচের এই চমৎকার উপলব্ধিটি রয়েছে :

"একটা পার্টির ইতিহাস লেখার অর্থ প্রাবন্ধিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি দেশের সাধারণ ইতিহাস লেখা ছাড়া অন্য কিছু নয়, যাতে তার একটা বিশেষ দিককে বড় করে দেখানো যায়। একটি দেশের ইতিহাস নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার বিশেষ কাজকর্ম যতখানি পরিমাণে অল্পবিস্তর নিয়ামক হয়েছে, একটি পার্টি বেশি বা কম তাৎপর্য ও ওজন পাবে ততটা পরিমাণেই।...

"ছোটখাট আভ্যন্তরিক বিষয় নিয়ে দলমণ্ডুক উত্তেজিত হয়ে উঠবে, তার কাছে তার একটা গূঢ় তাৎপর্য থাকবে এবং তাকে তা পূর্ণ করবে অতীন্দ্রিয় উৎসাহে। ঐতিহাসিক সামগ্রিক ছবিটিতে প্রতিটি জিনিসকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়েও সর্বোপরি জোর দিয়ে দেখাবে কতকগুলি ঘটনা সংঘটনে আর কতকগুলি ঘটনা ঘটতে না-দেবার ক্ষেত্রে পার্টির প্রকৃত কার্যকরতাকে, তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক নিয়ামক শক্তিকে।"

পার্টি গঠনে ও তার বিকাশে যে-দ্বান্দ্বিক উপাদানগুলি পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে সে-সম্পর্কে গ্রামশ্চির বোধ অত্যন্ত ব্যবহারিক। বিশেষ করে নেতৃত্বের কার্যধারা সম্পর্কে কিছু অত্যন্ত মহৎ উক্তি আছে, যা লেখকের নিজস্ব ব্যক্তিগত ভাগ্যের আলোকে বেশ একটু বিষণ্ণ শোনায়।

"একটি পার্টির টিকে থাকার জন্য, তিনটি মূল উপাদানকে (তিনটি উপাদান-গ্রুপকে) এক জায়গায় গিয়ে মিলিত হতে হয় :

"১/ সাধারণ, গড়পড়তা মানুষকে নিয়ে গঠিত একটি ব্যাপক উপাদান, যাদের অংশগ্রহণ কোনোরূপ সৃষ্টিশীল চেতনা বা সাংগঠনিক যোগ্যতার চেয়ে বরং নিয়মপালন ও আনুগত্যের রূপ গ্রহণ করে। এদের ছাড়া পার্টির অস্তিত্ব থাকবে

না, একথা সত্য ; কিন্তু একথাও সত্য যে শুধু তাদের নিয়েই সে টিকে থাকতে পারবে না।...

"২ / প্রধান সংহতিবিধায়ক উপাদান, যা জাতীয়ভাবে কেন্দ্রীভূত হয় এবং এমন বহু বিচিত্র শক্তিকে কার্যকর ও শক্তিশালী করে তোলে, নিজেরা একা থাকলে যাদের মূল্য অতি সামান্য কিংবা কানাকড়িও নয়। এই উপাদানটির বিরাট সংহতিবিধায়ক ক্ষমতা আছে, কেন্দ্রীভূত করার ও নিয়মশৃংখলার ক্ষমতা আছে ; এ ছাড়াও আছে—এবং এটাই হয়তো অন্যগুলির ভিত্তি—নব নব উদ্ভাবনের ক্ষমতা (বুঝে রাখা দরকার, সে-উদ্ভাবন একটা নির্দিষ্ট দিকে, কতকগুলি বল-রেখা বা 'লাইন অফ ফোর্স' অনুযায়ী, নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত, এমন-কি পূর্ব-স্বীকৃত সূত্র অনুযায়ী)। একথাও সত্য যে শুধু এই উপাদানটি একা পার্টি গঠন করতে পারে না ; তবে, প্রথম উপাদানটির চেয়ে বেশি পারে। সেনাবাহিনী ছাড়াই জেনারেল—এরকম একটা কথা অনেক সময় বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জেনারেল গঠন করার চেয়ে সেনাবাহিনী গঠন করা অনেক সহজ।

"৩ / একটি মধ্যবর্তী উপাদান, যা প্রথম উপাদানটিকে দ্বিতীয়টির সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ করে এবং তাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে—শুধু শারীরিকভাবেই নয়, নৈতিকভাবেও।...

"এইসব কথা বিবেচনা করে বলা সম্ভব—কখন একটা পার্টিকে সাধারণ উপায়ে ধ্বংস করতে পারা যাবে না। দ্বিতীয় উপাদানটির অস্তিত্ব অবশ্যই থাকতে হবে (না থাকলে আলোচনা অর্থহীন) ; তার আত্মপ্রকাশ বিষয়গত বৈষয়িক অবস্থার অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত, এমন-কি, যদি তা তখনও টুকরো টুকরো, অস্থিতিশীল অবস্থায় থাকে। যখন স্বাভাবিক উপায়ে একটা পার্টিকে ধ্বংস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন এমন একটি মুহূর্ত আসে যেখানে অন্য দুটি উপাদান গঠিত না হয়ে পারে না—অর্থাৎ প্রথম উপাদানটি তার পূর্বানুবৃত্তি রূপে ও নিজেকে প্রকাশ করার উপায় রূপে আবশ্যিকভাবেই আবার তৃতীয় উপাদানটিকে গঠন করে।

"এটা ঘটার জন্য এই দৃঢ় প্রত্যয় গড়ে তুলতে হবে যে অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা-গুলির একটি বিশেষ সমাধান আবশ্যক। এই প্রত্যয় ছাড়া দ্বিতীয় উপাদানটি তৈরি হবে না। সংখ্যাগতভাবে দুর্বল বলে এই উপাদানটিকে অতি সহজেই ধ্বংস করা যায়, কিন্তু ধ্বংস হয়ে গেলেও তা এমন একটা আলোড়ন রেখে যাবে যা থেকে সে আবার নতুন করে তৈরি হতে পারে। আর প্রথম ও তৃতীয় উপাদানটি

ছাড়া আর কোথায় এই আলোড়ন এত ভালোভাবে তৈরি হতে পারে এবং টিকে থাকতে পারে ? স্পষ্টতই এই দুটি উপাদান দ্বিতীয়টির চরিত্রের সবচেয়ে কাছাকাছি। এই আলোড়ন সৃষ্টির দিকে দ্বিতীয় উপাদানটির কাজকর্ম তাই মৌলিক। যে-মানদণ্ড দিয়ে দ্বিতীয় উপাদানটিকে বিচার করা যায় তার সন্ধান করতে হবে : ১. প্রকৃতপক্ষে তা কি করে, তার মধ্যে ; ২. নিজের বিনাশের চরম পরিণতির জন্য তা কি ব্যবস্থা করে, তার মধ্যে। এই দুটি ঘটনার মধ্যে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা বলা কঠিন। সংগ্রামে পরাজয়ের কথা যেহেতু সর্বদাই ধরে রাখতে হয়, সেই জন্য নিজের উত্তরাধিকারী তৈরি করাটা জয়লাভের জন্য করণীয় কাজের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।"

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা সম্পর্কে গ্রামশ্চি লিখেছেন : "একমাত্র গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মধ্যেই 'অর্গ্যানিসিটি' বা অবয়বগত সামগ্রিক এক সাংগঠনিক ব্যবস্থার সন্ধান মেলে—যেটা হল, বলতে গেলে, আন্দোলনের মধ্যেই 'কেন্দ্রিকতা' —অর্থাৎ, প্রকৃত আন্দোলনের সঙ্গে সংগঠনকে অনবরত খাপ খাইয়ে নেওয়া, উপর থেকে আসা নির্দেশগুলির সঙ্গে তলা থেকে ঠেলে ওঠা আকস্মিক বেগগুলির সাযুজ্য সাধন, সাধারণ কর্মীদের ভিতর থেকে নেতৃত্ব-যন্ত্রের নিটোল কাঠামোর ভিতরে উৎক্ষিপ্ত উপাদানগুলির অবিরাম সন্নিবেশ ঘটানো। ওই নেতৃত্ব-যন্ত্রই নিরবচ্ছিন্নতাকে আর অভিজ্ঞতার নিয়মিত পুঞ্জীভবনকে সুনিশ্চিত করে তোলে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা যে 'অর্গ্যানিক' বা অবয়বগত ব্যাপার, তার কারণ : এক দিকে তা আন্দোলনকে হিসাবের মধ্যে ধরে—যে-আন্দোলন হল এমন একটা অর্গ্যানিক ধরন যার মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিক বাস্তবতা নিজেকে প্রকাশ করে এবং আমলাতন্ত্রের মধ্যে যান্ত্রিকভাবে ঘনীভূত হয় না ; এবং, সেই সঙ্গেই, যেটা আপেক্ষিকভাবে সুস্থিত আর চিরস্থায়ী কিংবা অন্তত যেটার গতিমুখ সম্বন্ধে সহজেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, সেটাকে বিবেচনার মধ্যে ধরে।...যেসব পার্টি সামাজিকভাবে 'নিম্নতর সেনাপতি'দের শ্রেণীগুলির প্রতিনিধিত্ব করে, সেই পার্টিগুলিতে যেটাকে সুনিশ্চিত করে তোলার জন্যে সুস্থিরতার উপাদানগুলি প্রয়োজন, সেটা হল এই যে, সুবিধাভোগী গ্রুপগুলি নয়, প্রগতিশীল উপাদান-গুলিই কর্তৃত্ব করবে—যে-উপাদানগুলি—পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত ও জোটবদ্ধ হলেও অসমসত্ত্ব আর দোদুল্যমান অন্যান্য শক্তির চেয়ে—অঙ্গাঙ্গিভাবে প্রগতিশীল।...

"গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা হল...রূপের আপাত বৈচিত্র্যের মধ্যে যেগুলি

অনুরূপ এবং পক্ষান্তরে আপাত একরূপতার মধ্যে যেগুলি পৃথক, এমন-কি বিরোধী, সেগুলির বিশ্লেষণমূলক অনুসন্ধান—যাতে, যেগুলি অনুরূপ সেগুলিকে সংগঠিত ও পরস্পর-গ্রথিত করা যায় ; কিন্তু সেটা এমনভাবে করা হবে যাতে সাংগঠনিক ও পরস্পর-সংযোগসাধনের উপাদানটি বাস্তবসাধ্য পরীক্ষামূলক ও 'আরোহী' প্রয়োজন হিসেবেই দৃষ্ট হয়—'বিশুদ্ধ' ইন্টেলেক-চুয়ালদের (অর্থাৎ, বিশুদ্ধ গর্দভদের) বৈশিষ্ট্যসূচক জাতীয়তাবাদী, অবরোহী, বিমূর্ত প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে নয়।"

সবশেষে, পৌরসমাজ বা 'সিভিল সোসাইটি' এবং কর্তৃত্ব-আধিপত্য বা 'হেজিমনি' সম্পর্কে ধারণা। এই শব্দ দুটি, কিংবা ধারণা দুটি, মার্কসবাদ-লেনিন-বাদের ক্ষেত্রে নূতন নয়। ১৮৫০ সালের পরবর্তী রচনাবলীতে (অন্তত ইংরেজি ভাষায় যেগুলো পাওয়া যায়) আর দেখা না গেলেও, হেগেলীয় পরিভাষা হিসেবে পৌরসমাজ কথাটি মার্কস তাঁর প্রথম যুগের রচনায় ব্যবহার করেছেন। লেনিনের রচনায় এর ব্যবহার দেখা যায় না, অন্তত এমনভাবে দেখা যায় না যা কিছুটা মনোযোগ আকর্ষণ করে। 'হেজিমনি' অবশ্য একটি অতি অপূর্ব লেনিন-ব্যবহৃত শব্দ। তাঁর বহু চিরায়ত গ্রন্থে, এমন-কি, তার চেয়েও বেশি করে তাঁর নভেম্বর বিপ্লব গড়ে তোলা ও সমাজতন্ত্র নির্মাণের সূচনার মতো চিরায়ত কাজকর্মে এই বিরাট ব্যক্তিটি এই শব্দের বিকাশ সাধন করেছেন ও তাকে ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রামশ্চি এই দুটি শব্দই নিয়েছেন এবং তা নির্দিষ্ট ও আরো সম্প্রসারিত অর্থে মণ্ডিত করেছেন। শব্দ দুটি শুধু যে একটা অতিরিক্ত অর্থ লাভ করেছে তাই নয়, উপরন্তু আমাদের কাজকর্মের একটা অতিরিক্ত নির্দেশিকাও তা থেকে পাওয়া যায়। এর মধ্যে সার্বজনিকতাও কিছুটা পরিমাণে রয়েছে, কেননা শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতার জন্য লড়াই করছে শুধু এমন দেশের পক্ষেই নয়, যেদেশে তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সে-দেশের পক্ষেও এ ধারণা দুটি প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে। এই ধারণা দুটিকে বিশদ করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামশ্চি সুপারস্ট্রাকচার সম্পর্কিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের বিকাশ সাধন করেছেন এবং একদিক থেকে তাকে নিখুঁত করে তুলেছেন। আর এরই মাধ্যমে তিনি পরিপূরণ করেছেন সেটাই, যেটাকে তিনি স্পষ্টভাবেই নিজের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন—সেটা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ সাধন। তাঁর সমস্ত রচনাবলীর মধ্য দিয়ে প্রত্যয়ের এই আন্তরিকতাটিই ফুটে উঠেছে যে শ্রমিকশ্রেণীই হচ্ছে সেই অনন্য ঐতিহাসিক শক্তি যে সচেতন অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে ইতিহাসগতভাবে

স্বীকৃত রীতিনীতির বাস্তবিক জনককে সৃষ্টি করে। এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে এই প্রধান ঘটনাটিই নজর এড়িয়ে যায় ভারতের কিছু কিছু গ্রামশ্চি-ভক্তের, শ্রমজীবী কৃষক বলে যাকে তাঁরা অভিহিত করেন—উচ্চ আদর্শের কাল্পনিক রঙে রাঙানো তারই এক ভাবমূর্তির প্রতিই তাঁদের প্রায় অন্ধভক্তি।

"পৌরসমাজ অর্থাৎ সচরাচর 'পরিবার' (Private) হিসাবে অভিহিত অঙ্গের সমাবেশ, এবং 'রাজনৈতিক' সমাজ"—এই দুটি সুপারস্ট্রাকচারাল উপাদানের মধ্যে গ্রামশ্চি পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। "একদিকে সারা সমাজের উপর প্রভাব-বিস্তারকারী প্রধান গোষ্ঠীর 'প্রতিপত্তি'-মূলক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে, এবং অন্যদিকে 'প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব' বা রাষ্ট্র ও 'আইনানুগ' সরকারের মাধ্যমে শাসনের সঙ্গে এই দুটি স্তর সঙ্গতিপূর্ণ। আলোচ্য ক্রিয়াকলাপ নির্দিষ্টভাবে সাংগঠনিক এবং সংযোগ সাধক।"

তিনি আরো বলছেন, "একটি সামাজিক গোষ্ঠী বিরোধী গোষ্ঠীগুলির উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করে, এগুলিকে সে 'উচ্ছেদ করতে' কিংবা এমন-কি দরকার হলে অস্ত্রবলে নিজের তাঁবে আনতে চায়। সে ঘনিষ্ঠ ও মিত্র গোষ্ঠীগুলিকে পরিচালনা করে। সরকারী ক্ষমতা লাভ করার আগে থেকেই একটা সামাজিক গোষ্ঠী তার 'নেতৃ-ক্ষমতা' প্রয়োগ করতে পারে এবং সেটা তাকে অবশ্যই করতে হয় (এটা সরকারী ক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে অবশ্য অন্যতম প্রধান শর্ত); পরবর্তীকালে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সে যখন প্রধান হয়ে ওঠে, আর সে-ক্ষমতা যদি সে দৃঢ়ভাবে নিজের করায়ত্ত রাখে, তাহলেও তাকে অবশ্যই একইসঙ্গে 'নেতৃত্ব' দিয়ে যেতে হবে।"

ফরাসী বিপ্লবে জ্যাকোবিন-এর ভূমিকা এবং মাৎসিনি ও গারিবল্ডির অ্যাকশন পার্টির দুর্বলতার ক্ষেত্রে তা যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছিল, হেজিমনি বিস্তারকামী কার্যকলাপের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে গ্রামশ্চি তার উল্লেখ করেছেন: "জ্যাকোবিনবাদ ও অ্যাকশন পার্টি সম্পর্কে আলোচনায় যে-বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করতে হবে তা হচ্ছে: আমৃত্যু লড়াইয়ের দ্বারা জ্যাকোবিনরা 'প্রধান' দল হিসাবে কাজ করার অধিকার পেয়েছিল; তারা আক্ষরিক অর্থেই ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণীর "ঘাড়ে চেপে বসে" মূলগতভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী বুর্জোয়া গোষ্ঠী আপনা থেকেই যেখানে যেতে চেয়েছে তার চেয়েও প্রাগ্রসর অবস্থানে তাদের নিয়ে গিয়েছিল এবং এমন-কি সমস্ত ঐতিহাসিক পূর্বানুমানের চেয়েও তাদের প্রাগ্রসর অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিল—বুর্জোয়াশ্রেণীর পেছনে গুঁতো দিতে

দিতে তাদের সামনে ঠেলে নিয়ে চলছিল যে একদল অত্যন্ত উৎসাহী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক···সেই বিভিন্ন ধরনের পশ্চাদ্‌গতি ও প্রথম নেপোলিয়ঁ-র কার্যকলাপের সমর্থন এ থেকেই প্যাওয়া যায়।

'হেজিমনি'র অপরিহার্য অনুসিদ্ধান্ত অর্থাৎ মৈত্রীজোটকে তিনি অত্যন্ত দক্ষভাবে এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন: "হেজিমনির ক্ষেত্রে সন্দেহাতীতভাবে এটা আগে থেকেই ধরে নেওয়া হয় যে, যে গোষ্ঠীগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করা হবে তাদের প্রবণতা ও স্বার্থকে বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে এবং আপস-রফার ক্ষেত্রে কিছু সমতাবিধান করতে হবে—অন্যভাবে বলতে গেলে, পরিচালক গোষ্ঠীকে যৌথ অর্থনৈতিক সংস্থার ('ইকোনমিক কর্পোরেট') ধরনে কিছু কিছু ছাড়তে হবে। কিন্তু এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, এই ধরনের রেয়াত ও এই ধরনের আপসরফা মূল বিষয়কে স্পর্শ করতে পারে না; আধিপত্য যেহেতু নৈতিক-রাজনৈতিক, সেহেতু তাকে অবশ্যই অর্থনৈতিকও হতে হবে—অর্থনৈতিক কাজকর্মের নিয়ামক অংশের উপর পরিচালক গোষ্ঠী যে নিয়ামক কাজকর্ম চালায়, অবশ্যই তার ভিত্তি হবে সেটাই।"

ইতালি ও অন্যান্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশে সুনির্দিষ্ট বৈপ্লবিক কর্তব্য বিষয়ে গ্রামশ্চি 'সিভিল সোসাইটি' বা 'পৌরসমাজ' সম্পর্কিত ধারণাটির গুরুত্বের কথা উপস্থাপিত করেছেন। এরই একটা অংশের উল্লেখ রয়েছে এই আলোচনার প্রথম দিকে, যেখানে গ্রামশ্চি-কৃত ট্রটস্কির সমালোচনার কথা বলা হয়েছে:

"পৌরসমাজের কাঠামো খুবই জটিল এবং এটা এমন এক ধরনের যা অব্যবহিত অর্থ নৈতিক উপাদানের (সংকট, মন্দা ইত্যাদি) সর্বনাশা আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম। পৌরসমাজের সুপারস্ট্রাকচারগুলি আধুনিক যুদ্ধের পরিখাখননব্যবস্থার মতো।·· কোনো সংকট আক্রমণকারী শক্তিগুলিকে স্থান ও কালের দিক থেকে বিদ্যুৎগতিতে সংগঠিত হতে দেয় না; যুদ্ধ করার ক্ষমতা দেয় তার চেয়েও কম। অনুরূপভাবে, প্রতিরোধকারীরাও হতোদ্যম হয় না, বিপর্যয়ের মধ্যেও তাদের অবস্থান তারা পরিত্যাগ করে না, হারায় না নিজের শক্তি ও ভবিষ্যতের প্রতি তাদের বিশ্বাস।"

হেজিমনি বিস্তারের ক্ষমতার বিকাশ যার যথোপযুক্তভাবে ঘটে নি, অপেক্ষাকৃত নবীন সেই শ্রমিকশ্রেণীর কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী ত্রুটির কথা তিনি বলেছেন গভীর ও ভবিষ্যদ্বক্তাসুলভ অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে: "স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রিক জীবনে উন্নীত হওয়ার আগে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক বিকাশের দীর্ঘ কালপর্বের মধ্যে দিয়ে যায় নি

(মধ্যযুগীয় সমাজে ও সুবিধাভোগী জমিদার বা শাসনব্যবস্থার আইনানুগ নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের অধীনে যেভাবে সম্ভব হয়েছিল) এমন কতকগুলি সামাজিক গোষ্ঠীর পক্ষে একটি 'স্টেটোলেটরি' বা অত্যন্ত কেন্দ্রীকৃত ও সর্বশক্তিমান এক জাতীয় শাসনব্যবস্থার কাল দরকার আর সেটা সুবিধাজনকও। এই 'স্টেটোলেটরি' 'রাষ্ট্রিক জীবন'এর স্বাভাবিক রূপ ব্যতীত অন্যকিছু নয় কিংবা এটাকে সেই স্বশাসিত রাষ্ট্রজীবনের ও 'পৌরসমাজ' সৃষ্টির সূচনা বলা যেতে পারে—যেটাকে স্বাধীন রাষ্ট্রজীবনে উন্নীত হওয়ার আগে ইতিহাসগত-ভাবেই সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। যা হোক, এ-ধরনের 'স্টেটোলেটরি' কিছুতেই একেবারে বাদ দেওয়া যাবে না, বিশেষ করে সেটা কখনোই একটা তত্ত্বগত মতান্ধতা হয়ে উঠবে না বা সেটাকে একটা 'স্থায়ী' অবস্থা বলে চিন্তা করা ঠিক হবে না। নির্দিষ্টভাবে এর বিকাশ সাধন ও রাষ্ট্রজীবনের সেই রূপ সৃষ্টির জন্য এর সমালোচনা করতে হবে, যাতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর উদ্যোগ একটি "রাষ্ট্র' চারিত্র্য পরিগ্রহ করে।"

মতাদর্শের ক্ষেত্রে সংগ্রামের কর্তব্যকর্মকে গ্রামশ্চি নতুন স্তরে উন্নীত করেছেন : "গৃহীত আচরণবিধিতে দুটি কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে : নিজস্ব স্বাধীন ইন্টেলেকচুয়াল গোষ্ঠী গঠন করার উদ্দেশ্যে সর্বাপেক্ষা সুসংস্কৃত রূপের আধুনিক মতাদর্শের সঙ্গে লড়াই চালানো, এবং যে-লোকসমাজের সংস্কৃতি মধ্য-যুগীয়, তাদের শিক্ষিত করা। নতুন দর্শনের চরিত্রের দিক থেকে মুখ্য হচ্ছে দ্বিতীয় কর্তব্যকর্মটি। এটা শুধু পরিমাণগত দিক থেকেই নয়, গুণগত দিক থেকেও তার সমস্ত শক্তিকে আত্মসাৎ করেছে। 'শিক্ষামূলক' কারণে নতুন দর্শনটি এমন এক ধরনের সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত যেটা সাধারণ মানুষের মানের (যা খুবই নীচু) চেয়ে কিছু উচ্চতর কিন্তু শিক্ষিত শ্রেণীগুলির মতাদর্শের সঙ্গে লড়াইয়ের পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত নয়। তবু এই নতুন দর্শন কিন্তু নির্দিষ্টভাবে জন্মলাভ করেছিল যুগের সর্বোচ্চ সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি চিরায়ত জার্মান দর্শনকে অতিক্রম করার জন্যে এবং বিশ্ববোধ সম্পন্ন সেই নতুন সামাজিক গ্রুপের জন্যে নির্ধারিত এক ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপকে সৃষ্টি করার জন্য।...

"মতাদর্শের ক্ষেত্রে সহায়ক ও গলগ্রহ-স্বরূপদের পরাজয়ের গুরুত্ব অবশ্য নগণ্য। এক্ষেত্রে প্রবলতম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া দরকার।...

"একটি নতুন বিজ্ঞান যখন তার বিরোধী প্রবণতার সমর্থকদের বিরুদ্ধে লড়াই

করতে সক্ষম হয় এবং প্রতিপক্ষের উত্থাপিত প্রধান সমস্যা সমূহকে যখন সে নিজের উপায়ে সমাধান করে কিংবা তর্কাতীতভাবে এটা দেখিয়ে দেয় যে সেগুলি ঝুটা সমস্যামাত্র, তখনই সে তার কার্যকরতা ও প্রাণবত্তার প্রমাণ দেয়।"

'প্রিজন নোটবুক'-এ পৌরসমাজ ও হেজিমনি সম্পর্কে ধারণা বিষয়ে নির্বাচিত অংশগুলি পড়লে এই দৃঢ় প্রত্যয়ই জন্মায় যে, যাঁরা এই ধারণাগুলিকে বিপ্লব ও রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের পালটা হিসেবে খাড়া করতে চান, তাঁরা গ্রামশ্চিকে বোঝেন নি এবং তাঁর ক্ষতিই করেছেন। এই নির্বাচিত সংকলনে এমন কিছু নেই যা প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব এবং তত্ত্বগত ও প্রশাসনিক এই উভয় অর্থেই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃভূমিকার জন্য মৌল প্রয়োজন রাষ্ট্রশক্তি লাভের সংগ্রামকে হেয় করার সংশোধনবাদী ভাবধারার পক্ষে সমর্থন সূচক। এই মহান ও সৃষ্টিশীল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ব্যক্তিটি এই ধারণাগুলিতে নতুন অর্থ ও মাত্রা সংযোজন করেছেন মাত্র। এটা আরো উল্লেখযোগ্য যখন এটা মনে হয় যে, এগুলি লিখিত হয়েছে ফ্যাসিস্ত কারাগারের শ্বাসরোধী আবহাওয়ায় এবং অবিশ্বাস্য শারীরিক অসুস্থতার অবস্থায়।

গ্রামশ্চির এই রচনার কতকগুলি বিষয় অবশ্য বর্তমান সমালোচকের কাছে ভ্রমাত্মক বলে বোধ হয়েছে। এঙ্গেলসকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে গিয়ে এমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও মার্কসের বিকৃতিসাধন করে থাকতে পারেন এবং এঙ্গেলসের এমন মতামতও থেকে থাকতে পারে যা ঠিক একেবারে মার্কসের মতামতের মতো ছিল না। দ্বিবিভাজনের এই ইঙ্গিতটির কোনো প্রমাণ দেওয়া হয় নি। আর, এই দ্বিবিভাজনের চেষ্টাই হচ্ছে সংশোধনবাদের মতাদর্শগত আক্রমণের অন্যতম প্রিয় লক্ষ্য।

অপরটি আরো গুরুতর এবং তা বস্তুর সম্পর্কে ধারণা ও 'বস্তুবাদ' শব্দটি সম্পর্কে। প্লেখানভ ও বুখারিনের স্থূল বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্র বিরোধিতার দিক থেকে গ্রামশ্চি অভ্রান্ত। এই দুইজনের তত্ত্বগত ও দার্শনিক অবদানের উচ্চ প্রশংসা করেও এঁদের মধ্যে ডায়ালেকটিকস-এর অভাব সম্পর্কে লেনিন যে সমালোচনাপ্রবণ ছিলেন, এক্ষেত্রে সেটা আমাদের মনে পড়ে যায়। সে-কারণেই লেনিন মার্কসবাদের বস্তুবাদী 'বিজয়গুলি' সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা বা বস্তুবাদ ও ভাববাদ এই দুটি প্রধান দার্শনিক প্রবণতার বিভাজনরেখাকে মুছে দেওয়া পর্যন্ত কখনোই এগোন নি। অবশ্য মার্কসবাদী শিবিরে থেকে সেই লক্ষ্যের দিকে এগোবার প্রবণতাটুকুও যাদের মধ্যে দেখা গেছে, তাদের তিনি

তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন। তাঁর 'মেটেরিয়ালিজম অ্যাণ্ড এম্পিরিওক্রিটিসিজম' এবং 'অন দি সিগনিফিকান্স অব মিলিট্যাণ্ট মেটেরিয়ালিজম' বই দুটি মার্কস-বাদ-লেনিনবাদের ক্লাসিক। মনে হয় এই রচনা দুটি লেখকের কাছে পরিচিত ছিল না, নইলে এই অংশটি তাঁর রচনায় থাকত না : "আধিবিদ্যক বস্তুবাদে 'বিষয়গত উপাদান' এর ধারণাটি সেই জিনিসটিকেই বোঝায় মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেও যার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু যখন একথা কেউ জোর দিয়ে বলে যে, মানুষ না থাকলেও বাস্তবতার অস্তিত্ব থাকবে, তখন সে হয় রূপকাশ্রিত ভাষায় কথা বলে, নবতো এক ধরনের অতীন্দ্রিয়বাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ে। একমাত্র মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেই বাস্তবতাকে আমরা জানি আর মানুষ যেহেতু গড়ে উঠছে ইতিহাসগতভাবে, সেহেতু জ্ঞান ও বাস্তবতাও গড়ে উঠছে এবং 'বিষয়মুখীনতা' ইত্যাদিও তাই।"

"বস্তুগত অর্থে সর্বদাই 'মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বস্তুগত', যা 'ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ীগত'র সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। অন্যভাবে বলতে গেলে, বস্তুগত উপাদানের অর্থ 'সর্বজনীন বিষয়ীগত উপাদান'। একটি একক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার মধ্যে **ইতিহাসগতভাবে** ঐক্যবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর কাছে জ্ঞান যতটা বাস্তব, মানুষ ততটাই বস্তুগতভাবে জানতে পারে।"

"অতএব বস্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, আলোচ্য বিষয় হল সেটা কিভাবে সামাজিকভাবে ও ঐতিহাসিকভাবে উৎপাদনের জন্য সংগঠিত হয়ে ওঠে, আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকেও তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে মূলগতভাবে একটি ঐতিহাসিক বর্গ, একটি মানবসম্পর্ক হয়ে উঠতে হবে।"

এই উদ্ধৃতিগুলিতে এমন অনেক কিছু রয়েছে যে-সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না, কিন্তু এর মধ্যে এমন সব উক্তি ও ধারণাও রয়ে গিয়েছে যেগুলি বৃদ্ধিশীল ও গতিশীল হওয়া সত্ত্বেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পরিচিত সীমাকে অতিক্রম করে যায়। এটা অবশ্য মনে রাখা দরকার যে আলোচ্য গ্রন্থখানি লেখকের একটা প্রাথমিক খসড়া মাত্র, আর সেটা দ্বিতীয়বার পড়ে দেখার সুযোগ তিনি পান নি। তা সত্ত্বেও, আমাদের এই বিক্ষুব্ধ অথচ মহিমা-দীপ্ত কালের অন্যতম সর্বাপেক্ষা প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও প্রেরণাময় যোদ্ধার রচনায়, ত্রুটি হিসাবে বিবেচিত বিষয়গুলি যদি কেউ আলোচনার জন্য তুলে ধরতে বাধ্য হয়, তাহলে, সেটাকে তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধার প্রকাশ বলে ধরে নেওয়া উচিত হবে না।

সৈয়দ মুজতবা আলী

অন্নদাশঙ্কর রায়

পাটনা কলেজের ছাত্র আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই শান্তিনিকেতনে আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে। বিশ্বভারতীর ছাত্র সৈয়দ মুজতবা আলী তখন আমার গাইড হয়ে আশ্রম ঘুরে দেখান। গেস্ট হাউসের একখানা ঘরে ছিল তাঁর দফতর। ম্যানেজার গাঙ্গুলী মহাশয়কে তিনি সাহায্য করতেন। সে-সময় তাঁর সঙ্গে আমার আলাপের আর কোনো সূত্র ছিল না। তিনি জানতেন না যে আমি একদিন 'পথে প্রবাসে' লিখে বাঙলার সাহিত্যিকদের সঙ্গে এক-সারিতে বসব। আমিও কি জানতুম যে তিনিও একদিন 'দেশে বিদেশে' লিখে বাঙলা সাহিত্যের দরবারে শিরোপা পাবেন। মাথায় একমাথা ঝাঁকড়া চুল, বোধহয় রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে। তবে তাঁর মতো সুবিন্যস্ত নয়। গৌরবর্ণ সুপুরুষ। সুরসিকও বটে। তাঁর সাহচর্য পেয়ে আমি তো মুগ্ধ। লক্ষ্য করি যে তাঁর মতো জনপ্রিয় আর কেউ নয়। "সৈয়দদা" বলতে ছেলেরা অজ্ঞান।

তাঁকে আমার বরাবর মনে ছিল। কিন্তু জানা ছিল না যে তিনিও ইয়োরোপে গেছেন ও জার্মানির বন্ নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছেন। জানলে হয়তো সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। দেশে ফিরে আমি যখন রাজশাহীর নওগাঁ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট তখন একদিন পড়ি সৈয়দ মুজতবা আলী পি এইচ ডি পেয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। হঠাৎ আমার মাথায় খেলে যায়, নবপ্রতিষ্ঠিত গাঁজামহল কেন্দ্রীয় হাইস্কুলের হেডমাস্টার পদে যদি তাঁর মতো একজন মুসলমানকে পেতুম। কিন্তু ডকটরেট পাওয়া বিদ্বান কেনই বা অত কম বেতনে গুরুমশাইগিরি করতে রাজী হবেন। তাও তেপান্তরের মাঠের মাঝখানে। শহর থেকে দূরে। আমিও তাঁকে লিখি নি, তিনিও আমার বিজ্ঞাপনের উত্তরে চিঠি লেখেন নি। মনের কথা মনেই মিলিয়ে যায়।

জানতুম না কোথায় তিনি গেলেন, কোন পদ পেলেন। অবশেষে ১৯৩৮ সালের শেষ সপ্তাহে বরোদায় তাঁর সঙ্গে দেখা। সেখানকার সর সুবা অর্থাৎ কমিশনার ছিলেন সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়। সেই যিনি রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' অনুবাদ করে সেকালে নাম করেছিলেন। 'মডার্ন রিভিউ'তে অন্যান্য অনুবাদও তাঁর পড়েছিলুম। ওঁর মতো সাহিত্যরসিক আমি খুব কম দেখেছি। নৈশভোজনে আলী সাহেবকেও তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আলীর তখন আরেক চেহারা। রাবীন্দ্রিক নয়। খোশগল্পে অদ্বিতীয়। কিন্তু সেসব শুনে তখন তো আমার মনে হয় নি যে তিনি লেখালেখির চর্চা করেন। সেখানে পড়াতেন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব।

ওই মজলিশী মানুষটিকে আকবর বাদশাহের মজলিশে বীরবলের জায়গায় মানাত। কিংবা ফরাসী মহিলাদের সালোঁতে। তিনি যে বছর আট-নয় বাদে লেখার কলম তুলে নিয়ে সাহিত্যের আসর মাত করবেন একথা আমার মনে উদয় হয় নি। এমন অনায়াসে তিনি তাঁর আসন করে নিলেন যে দেখে মনে হল ওটা তাঁর জন্যে আগে থেকে সংরক্ষিত ছিল। প্রমথ চৌধুরীর প্রস্থান ও মুজতবা আলীর প্রবেশ প্রায় সমসাময়িক ব্যাপার। তিনি আমাদের দোসরা বীরবল। বীরবলের দোসর। তবে প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিত্বের ছিল আর-একটা দিক। যেখানে তিনি সীরিয়াস। আলী সাহেবেরও হয়তো সেটা ছিল, কিন্তু সাহিত্যে প্রমাণ হয় নি। অপর পক্ষে আলী সাহেবের মতো জনপ্রিয়তা প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের স্বপ্ন। যে গুণে তিনি শান্তিনিকেতনে সর্বজনপ্রিয় ছিলেন সেই গুণে রম্য রচনার ক্ষেত্রে সর্বজনপ্রিয়।

স্বাধীনতার পরে ভারত সরকার তাঁকে একটার পর একটা চাকরি দেন। তিনি একটার পর একটা চাকরি ছেড়ে দিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। ততদিনে আমিও অকালে অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনবাসী। তাঁর সঙ্গে আলাপ জমে ওঠে। ঘনিষ্ঠতা হয়। শুনি তিনি আর সরকারী চাকরি করবেন না। বিশ্বভারতী যদি তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে কাজ দেন তা হলে তাঁরা সেইখানেই নীড় বাঁধবেন। নয়তো তাঁদের দুজনকে দুই দেশে জীবন যাপন করতে হবে। তিনি নিজে কখনো পাকিস্তানে যাবেন না। সেখানকার কর্তাদের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয় নি। তা ছাড়া তিনি মনে প্রাণে সেকুলার। আর তাঁর পাঠকমহলও তো ভারতীয়। ভারত থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কিন্তু তাঁর স্ত্রী কি পাকিস্তানের সরকারী চাকরি ছেড়ে বিশ্বভারতীতে কাজ করতে রাজী হবেন।

হ্যাঁ, হবেন। আমরা চেষ্টা করি। চেষ্টা বিফল হয়। বিশ্বভারতী একজনের বেতন দুভাগ করে দুজনকে দিতে পারতেন, কিন্তু তাতে তাঁদের মর্যাদা থাকত না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের রীডার পদের জন্যেও আমি তাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁর নাম প্রস্তাব করি। আবার ব্যর্থ হই। তাতেও তাঁর সমস্যার সমাধান হত না। তাঁর স্ত্রীরও তো কলকাতায় একটি চাকরির দরকার হত। নয়তো দুজনে মিলে নীড় বাঁধা হত কী করে। আলী সাহেব পরবর্তী-কালে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপকপদ পেলেন, কিন্তু সমস্যা যেমনকে তেমন। বললেন, "দেখলেন তো। যতদিন আমি বেকার ছিলুম ততদিন জনপ্রিয় ছিলুম। এখন আমার বন্ধুরাও আমার সঙ্গে মেশেন না। এত বড়ো একটা চাকরি পেয়েছি এটা কারো সইছে না।"

চাকরির মেয়াদ ফুরোলে আলী সাহেব বোলপুরে গিয়ে এক নির্জন গৃহে অজ্ঞাতবাস করেন। পরে কলকাতা চলে আসেন। বাঙলাদেশের স্বাধীনতার পর যখন মনঃস্থির করেন যে ঢাকায় গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে নীড় বাঁধবেন তখন দেখা গেল বিধাতারও সইছে না। তাঁর জীবনের মেয়াদ ফুরোল।

শেষের কয়েক বছর তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল না। একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন তিনি হিটলার সম্বন্ধে প্রচুর মালমশলা সংগ্রহ করেছেন, বৃহৎ গ্রন্থ লিখবেন। পরে শোনা গেল তিনি আবার জার্মানি গেছেন, হিটলার প্রসঙ্গে অনুসন্ধান করবেন। ফল হয়তো তিনি আরো কিছুকাল বেঁচে থাকলে জীবনীর বা ইতিহাসের আকারে মিলত। হিটলারের উপর ছোট একখানি বই লিখে তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর অন্যান্য রচনার মতো আমি নিবিষ্টচিত্তে পড়েছিলুম। কিন্তু সীরিয়াস নয়। কিছুতেই তিনি তাঁর হালকা মেজাজকে অতিক্রম করতে পারলেন না। রম্য রচনাই তাঁর প্রকৃতিগত। রম্য রচনায় তিনি অদ্বিতীয়। যা কিছু লিখেছেন সবটাই রম্য রচনার কলমে লেখা। লেখার চেয়ে বলাটাই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। লেখার মধ্যেও বলার ভাবটাই এসেছে। পাঠকরা যেন তাঁর শ্রোতা। মজলিশী শ্রোতা।

বুদ্ধদেব বসু

দেবমিত্র বসু

আমাদের শিল্পসাহিত্যের জগতে বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যু একটি শোকাবহ ঘটনা। আমাদের অনেকেরই শিল্পসাহিত্যগত জীবনের কৈশোরক লগ্নে যে-সব ব্যক্তি থাকতেন আমাদের তর্ক আলোচনা বা অন্য নানাবিধ কর্মের বিষয় বা অনুপ্রেরণা হিসাবে, সম্প্রতি একে একে তাঁদের অন্তর্ধান আমাদের যেন কিছু পরিমাণে নিঃসঙ্গ করে দেয়, যদিও তাঁদের অনেকের সঙ্গেই আমাদের হয়তো চাক্ষুষ পরিচয়ও ছিল না। বুদ্ধদেব বসুও নিঃসন্দেহে এরকমই একজন প্রভাবশালী লেখক, যাঁকে কেন্দ্র করে আমাদের বহু সন্ধ্যার বহু চিন্তা, বহু গল্পের সূত্রপাত হয়েছে। তাঁকে সর্বাংশে অস্বীকার করা যে-কোনো সাহিত্যকর্মীর পক্ষেই অসম্ভব। তিনি সম্পূর্ণ অনালোচিত থেকেছেন, এমন সময় একাদিক্রমে নিশ্চয়ই খুব বেশি নয়। সে-আলোচনা সব সময় যে অনুকূল ছিল তা নয়, বস্তুত অনেক সময়ই ছিল প্রতিকূল—শিল্পসাহিত্যগত ও শিল্পসাহিত্যাতিরিক্ত আদর্শের পার্থক্যের কারণেই—কিন্তু সব মিলিয়ে যে তিনি আমাদের এতখানি মনোযোগ আকর্ষণ করে নিয়েছিলেন, এবং তার পেছনে যে অনেক শ্রদ্ধাযোগ্য কারণও আছে, তা আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না।

ঢাকার অভিজ্ঞতার কথা, কলকাতার প্রথম যুগের অভিজ্ঞতার কথা ইত্যাদি অনেকেই বলেছেন এবং তিনি নিজেও লিখেছেন এ-বিষয়ে। সে-সব স্বাদু বিবরণী আমরা যে শুধু লোভীর মতো উপভোগ করি তাই নয়, বুদ্ধদেব বসু এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবদের তৎকালীন নানা ঘটনা, এমন-কি ব্যক্তিগত নানা প্রসঙ্গ, এখন প্রায় আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অবশ্য আমাদের কাছে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঠেকে 'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশের সময়, অন্তত প্রথম যুগে, তাঁর প্রায়-কর্ণধারের ভূমিকা। তিরিশের দশকে প্রকাশিত

'কবিতা' পত্রিকার প্রথম দিককার সংখ্যাগুলো খুব সম্প্রতি ঘাঁটতে গিয়ে কোনো একজন পাঠক প্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল বুদ্ধদেব বসুর চমৎকার সাক্ষ্য পেয়ে। আধুনিক বাঙলা কবিতার দর্শন ও ব্যাকরণ বোঝাতে গিয়ে প্রতিটি সংখ্যায় তিনি প্রায় লড়াই চালিয়ে গেছেন। বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কেও লিখেছেন পাতার পর পাতা। পরবর্তী-কালেও আধুনিক বাঙলা কাব্যের কর্মী ও সংগঠক হিসাবে তাঁর নিষ্ঠা সকলেই দেখেছেন।

মাঝখানে অবশ্য অনেক জল গড়িয়ে গেছে। ক্রমশ এটা আর অস্পষ্ট থাকে নি যে কবিতার তত্ত্ব, এমন-কি তথ্য বিষয়েও, বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের সকলের কাছে তর্কাতীত নয়। তিনি শিল্পের শুদ্ধতা, রাজনীতি-নিরপেক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে যে মতামত প্রকাশে ও তৎসংক্রান্ত কার্যকলাপে ব্যাপৃত থাকতেন—তার সঙ্গে আমাদের অনৈক্য, এমন-কি বিরোধিতা, ক্রমেই অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু তখনও, মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত স্তরে বিরোধটা চলে যাওয়ার ঝুঁকি সত্ত্বেও, আমরা এটা অনুভব না করে পারি নি যে পার্থক্যটা আসলে মৌলিক আদর্শগত এবং শিল্পসাহিত্যসংক্রান্তই শুধু নয়, জীবনদৃষ্টিভঙ্গির আরো গভীরে। এবং তারই ফলে আমরা দেখেছি, বিশুদ্ধ শিল্প ও রাজনীতি-নিরপেক্ষতার তত্ত্বে বিশ্বাসী বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে মার্কিন ও পশ্চিম জার্মান সরকারের স্থানীয় তথ্যদপ্তরের অশুভ বেদনাময় সম্পর্ক গড়ে ওঠে, 'কবিতাভবন' ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের মাধ্যমে বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতি জগতে এক বিশেষ প্রবণতা জোট বাঁধে। দেখেছি 'ডাঃ জিভাগো'কে কেন্দ্র করে তিনি সোভিয়েতবিরোধী প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং প্রবাসী অমিয় চক্রবর্তী তার অসামান্য প্রতিবাদ করেন।

অমিয় চক্রবর্তীর চিঠিটি অবশ্য 'কবিতা' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় এবং আমরা বুঝতে পারি তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস মতো এক ধরনের আচরণবিধি বুদ্ধদেব বসু শেষাবধি অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। আর, সেটা মেনে নেবার পরই বুদ্ধদেব বসুর নানাবিধ বিচ্ছিন্ন সাহিত্যনৈপুণ্যের আবেদনে সাড়া দেওয়া আমাদের পক্ষে মোটেই কষ্টকর হয় নি, এমন-কি সুখকরই বোধ হয়েছে। পরন্তু সাহিত্যের ওপরের স্তরের নানা অভিজ্ঞতা বিষয়ে তাঁর সরস বুদ্ধিদীপ্ত রুচিশীল গল্পরচনাও আমাদের উপভোগ্য লাগে, বারবার পড়ি তাঁর প্রথম যুগের কবিতার হালকা ভঙ্গি, তাঁর সঙ্গে মানসিক সাযুজ্য অনুভব করি; যদিও ঠিক সেই সময়ই হয়তো তর্কে

রত্ত হব তাঁর উপন্যাসের প্রায়-কৈশোরক আবহ বা তাঁর কবিতার অসম বিকাশহীন পরিবর্তনের বিষয়ে। তবে, গত এক দশকের সাহিত্যসাধনায়, বিশেষত কয়েকটি কাব্যনাট্য ও মহাভারত-বিষয়ক রচনায়, তিনি যে প্রাপ্ত-বয়স্ক মনন ও পরিণত সৃজনশীলতার পরিচয় দিচ্ছিলেন—তা-ও তো অস্বীকার করার কারণ দেখি না। বুদ্ধদেব বসু আমাদের যে এইভাবে গ্রহণে বর্জনে উদ্ব্যস্ত করে রাখেন, সেজন্যই তাঁকে অস্বীকার করা দূরের কথা, তাঁর প্রতি আকর্ষণ অনুভব না করে পারি না আমরা।

রাজনৈতিক স্তরে দুবার অন্তত বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আমাদের একাত্মতা সম্পূর্ণ হয়েছিল। একবার, যখন তিনি ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের কার্যকরী সমিতির সভ্য হিসেবে 'সভ্যতা ও ফ্যাশিজম্' নামক পুস্তিকাটি লিখেছিলেন এবং সংঘেরই উদ্যোগে প্রকাশ করিয়েছিলেন। আর-একবার, তিনি যখন বাঙলা-বিহার সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন, এমন-কি সভা-সমিতি করে বেরিয়েছিলেন। (ইংরিজি ভাষার স্থান ইত্যাদি প্রশ্নে কিছু মতপার্থক্য অবশ্য আমাদের ছিল।) এই দুটি মৌলিক ব্যাপারে আমাদের ঐক্য নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য করার মতো বিষয় নয়।

তাই, সব রকম আপত্তি-অনুপপত্তি সত্ত্বেও, বুদ্ধদেব বসু বাঙলা সাহিত্য জগতে একটি প্রতিষ্ঠান এ-কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি। তাঁর সাহিত্যকৃতিত্ব বাঙলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই গৌরবের বস্তু বলে গ্রহণ করবেন।

সলঝেনিৎসিন প্রসঙ্গে সম্প্রতি পশ্চিম বাঙলায় সোভিয়েত ও কমিউনিস্ট বিরোধী জিগির তোলার চেষ্টা হয়েছিল। আমরা লক্ষ্য করেছি, বুদ্ধদেব বসু অন্তত প্রকাশ্যে সেই কোরাসে গলা মেলান নি। অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি কি তাঁর মনে পড়েছিল?

মহাভারত-বিষয়ক রচনা শেষ করার জন্য তিনি আরো দশ বছর বাঁচতে চেয়েছিলেন। দুঃখ আমাদেরও, বুদ্ধদেব বসুর সে-ইচ্ছা পূর্ণ হল না। আঠেরোই মার্চ তাঁর জীবনাবসান হল।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় : পদাতিকের প্রস্থান

কৃষ্ণ ধর

আমাদের পবিত্রদা চলে গেলেন। বাঙলা সাহিত্যের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় গত ১১ ভাদ্র আশি বছর পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর চির চলমান জীবনের পূর্ণচ্ছেদ পড়ল ২৪ চৈত্র রবিবার (৭ এপ্রিল ১৯৭৪)।

বলা যায় তাঁর মৃত্যু একটি যুগের অবসান। 'সবুজপত্র,' 'কল্লোল' 'কালিকলম' থেকে যার শুরু, সত্তরের দশকে এসে তার সমাপ্তি। সাহিত্যের চিরসাথী ছিলেন তিনি। নিজে যা লিখেছেন অন্যদের দিয়ে লিখিয়েছেন তার শতগুণ। সমকালীন ও কনিষ্ঠদের এগিয়ে দিয়েছেন তিনি। পদাতিক সহযাত্রীর মতো তিনি সমানে চলেছেন, সবাইকে টেনে নিয়েছেন কাছে। চলা মানেই জীবন, জীবনই সাহিত্যের উৎস এবং তার একমাত্র উপকরণ মানবতা। পবিত্র নাম তাঁর সার্থক। মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়িয়েও সেই পবিত্র অন্তরের স্পর্শ দিয়ে গেছেন তিনি। বাঙলা সাহিত্যে উজ্জ্বলতম হৃদয়বত্তার অধিকারী তিনি ছিলেন পবিত্রতমও। তিনি শিল্পী-সাহিত্যিকদের চির সখা।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরুতে সান্নিধ্য পেয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরীর। 'সবুজপত্র'র আড্ডাতেই তিনি নতুন যুগের সাহিত্যপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন। পরবর্তী যুগে আসেন 'কল্লোল'গোষ্ঠীতে। সাহিত্যিক উদারতা ছিল তাঁর চরিত্রে। তাই সবার সঙ্গেই ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠতা। পবিত্রদার নিজের ভাষায় "শরৎচন্দ্র, ভারতী (শেষ পর্যায়), সবুজপত্র, কল্লোল, শনিবারের চিঠি, প্রগতিবাদী সাহিত্যিকদল—বাঙলা সাহিত্যের বাজারে এঁদের প্রত্যেকের আসা-যাওয়া, কেনা-বেচার মধ্যে কিছু কিছু দালালি করার অবকাশ আমার হয়েছিল।"

এই ভাবেই তিনি বলতেন নিজের বিষয়ে, নিরহঙ্কার নম্র উচ্চারণে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে শৈলজানন্দের জবানীতে পবিত্রদার

পরিচয় পাই : "পূর্ববঙ্গে বর্ষার সময় পথ-ঘাট খেত-মাঠ উঠান-আঙিনা সব ডুবে যায়, এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে হলে নৌকো লাগে। পবিত্র হচ্ছে সেই নৌকো। নানারকম ব্যবধানে সাহিত্যিকরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন এক সাহিত্যিকের ঘর থেকে আরেক সাহিত্যিকের ঘরে একমাত্র এই একজনই অবাধে যাওয়া-আসা করতে পারে। এই একজনই সকল বন্দরের সদাগর।"

অসম্ভব সব কর্ম তিনি করেছেন সাহিত্যের জন্য। আমরা স্মরণ করতে পারি জেলখানার পাঁচিল ডিঙিয়ে নজরুল ইসলামের কাছে রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' নাটকটি তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন। নজরুলের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন পবিত্রদা। সেদিনের অখ্যাত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রসকলি' 'কল্লোল'-এ ছাপিয়ে তিনি পত্র দেন "এতদিন চুপ করিয়া ছিলেন কেন?"

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর লেখায় পাই পবিত্রদার এক অনন্য চিত্র "লেশমাত্র অভিমান নেই, অহংকার নেই। নিষ্ঠুর দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে তবু সব সময়ে পাবে নির্বারিত হাসি। ওর বয়স নেই। ভগবান ওকে বয়স দেননি। দিন যায়, মানুষ বড় হয়, কিন্তু পবিত্র যে-পবিত্র সেই পবিত্র। নট নড়ন চড়ন।"

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পবিত্রদা একই ছিলেন। পরিপূর্ণ হৃদয়ের ঐশ্বর্য বিলিয়েই তাঁর প্রস্থান।

অনুবাদকর্মে তিনি বাঙলা সাহিত্যে অন্যতম পথিকৃৎ। সেযুগে বিদেশী ভাষা থেকে অনুবাদের এত বিস্তৃতি ছিল না। তরুণ বয়সে তিনি আকৃষ্ট হন গোর্কির প্রতি। গোর্কির 'থ্রি অভ্ দেম' বইটি পড়েই এই মহান লেখককে তিনি প্রথম আবিষ্কার করেন। তার আগে হামসুনের 'বুভুক্ষা' ও মেটারলিঙ্কের 'নীলপাখি' অনুবাদ করেছিলেন তিনি। কিন্তু গোর্কির রচনায় তিনি পেলেন অন্য এক জগতের সন্ধান। জীবনের সার্থকতা ও মানুষের ওপর গভীর বিশ্বাসই সে-সাহিত্যের প্রাণ। ভিক্তর য়ুগোর 'লে মিজারেবল'ও তিনি সংক্ষিপ্ত আকারে ছোটদের জন্য ভাষান্তরিত করেছিলেন। তাঁর অনূদিত গোর্কির গল্প 'মানুষের জন্ম' নাম দিয়ে মস্কো থেকে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ভান্দা ভাসিলিয়েভস্কার প্রতিবোধের গল্প 'রামধনু' পবিত্রদার অনুবাদে বাঙালি পাঠকদের কাছে পরিবেষণ করেন ন্যাশনাল বুক এজেন্সি। চীনের মহান লেখক লু সুনের লেখার প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হন গভীর মানবিকতাবোধ থেকেই। 'আ কিউ' অনুবাদ করেন তিনি।

প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলন তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছে। সুস্থ, জীবনবাদী সাহিত্যের সপক্ষে তিনি ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে একালের প্রগতিবাদী সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা সব সময় পেয়েছেন অবারিত উৎসাহ ও প্রেরণা।

নতুন যুগকে উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করবার ঈর্ষণীয় ক্ষমতা ছিল বলেই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বয়সে বুড়ো হলেও মনের দিক দিয়ে ছিলেন তাজা। আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে তিনি তাই তরুণদের মতোই বলতে পেরেছিলেন, "দুনিয়া-ময় উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিশৃঙ্খলায় আমি ভয় পাই না। জীবনে নতুন জোয়ার এলে তার সঙ্গে কাদামাটির প্রবেশ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু জোয়ার আসাটাই মুখ্য। কাদামাটির প্রবেশ পরবর্তী উর্বরতারই প্রতিশ্রুতি।" বলেছিলেন আরও "মহাকালের কটাহে মানবেতিহাস পাক হচ্ছে। আমি তার প্রত্যক্ষ দর্শক ও কিছুটা অংশীদারও। আমার যুগের মানুষের মত এমন থ্রিলিং বাঁচা কোন যুগের মানুষের ভাগ্যে ঘটেছে !"

কোনো অবস্থাতেই তিনি জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারান নি। তিনি জানতেন, অপরাজিত মানুষ পৃথিবীকে একদিন অশ্রুহীন করে সাজাবে। তাই পবিত্রদার জীবনাবসানে অশ্রুর অঞ্জলি নয়, সংকল্প ও বিশ্বাস দিয়েই তাঁর শ্রেষ্ঠ স্মৃতিতর্পণ।

গোপাল হালদারের সংবর্ধনা

১১ই ফেব্রুয়ারি শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের জন্মদিন।

গোপালদা 'পরিচয়'-এর দীর্ঘদিনের সম্পাদক, আজও এই পত্রিকার উপদেশক-মণ্ডলীর সভ্য। 'পরিচয়'-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিছক কথায় ব্যক্ত হবার নয়। আমরা তাঁর শতায়ু কামনা করি।

গোপালদা বিশেষভাবে 'পরিচয়'-এর, কিন্তু এ কথাও আমরা জানি বাঙলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুরাগী দেশবাসী মাত্রেরই তিনি আপন জন। তাঁর ৭৩ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে (জন্ম ১৯০২) যথাযোগ্য উৎসবানুষ্ঠান করার কথা তাই আমাদের মতো আরো অনেকেরই মনে হয়েছে।

গত পয়লা ফেব্রুয়ারি 'পরিচয়' সম্পাদকের আহ্বানে এ-বিষয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য গোপাল হালদার মহাশয়ের অনুরাগীরা 'পরিচয়' কার্যালয়ে সমবেত হন। জনাকীর্ণ ঐ সভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রাক্তন কৃষকনেতা ড. সুনীল সেন সভাপতিত্ব করেন।

সমগ্রতাসন্ধানী ও ঐক্যের প্রতিমূর্তি গোপালদার জন্মোৎসব যথাযোগ্যভাবে পালনের জন্য দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচায সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতি করে 'গোপাল হালদার জন্মোৎসব উদ্‌যাপন কমিটি' গঠনের প্রস্তাব করেন। তারপর, দল-মত-বয়স ও প্রতিষ্ঠা নির্বিশেষে শিল্পী-সাহিত্যিক সাংবাদিক-গণসংগঠন এবং শিক্ষাবিদ-দেশনেতা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে যে-কমিটি গঠিত হয়, তার সদস্য হলেন :

অতুল বসু। অনিলকুমার কাঞ্জিলাল। অনিলকুমার সিংহ। অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। অমল দাশগুপ্ত। অমলেন্দু চক্রবর্তী। ড. অমলেন্দু বসু। অমিতাভ দাশগুপ্ত। অমিয় মুখোপাধ্যায় (পশ্চিমবঙ্গ শাখা, সারা-ভারত শান্তি ও সংহতি সংসদ)। অরুণ মিত্র। ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। অসীম রায়। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য। কল্যাণ দত্ত (পশ্চিমবঙ্গ শাখা, ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক মৈত্রী সমিতি)। কমল সমাজদার (সম্পাদক, 'আন্তর্জাতিক')। কমলা মুখোপাধ্যায়

(সম্পাদক, 'চলার পথে')। কানাই পাকড়াশী। কৃষ্ণ ধর। গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপরিষদ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি)। গৌতম চট্টোপাধ্যায়। চিত্ত ঘোষ। চিত্তরঞ্জন ঘোষ। চিন্তামণি কর। চিন্মোহন সেহানবীশ। জ্যোতি দাশগুপ্ত (সম্পাদক, 'কালান্তর')। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। তরুণ সান্যাল (সম্পাদক, 'পরিচয়')। ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়। দক্ষিণারঞ্জন বসু। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংঘ)। দিলীপ বসু (মনীষা গ্রন্থালয়)। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। দেবেশ রায়। ধনঞ্জয় দাশ। ধরণী গোস্বামী। ড. ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (পাবলভ ইনস্টিট্যুট)। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। নরহরি কবিরাজ (লেনিন স্কুল অব মার্কসিস্ট স্টাডিজ)। নরেন্দ্রনাথ মিত্র। নিরঞ্জন সেনগুপ্ত। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ড. নীহাররঞ্জন রায়। ড. পঞ্চানন সাহা (পশ্চিমবঙ্গ শাখা, ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মানি মৈত্রী সমিতি)। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। পার্থ সেনগুপ্ত (পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি)। প্রদ্যোৎ গুহ (সম্পাদক, 'রুষ-ভারতী')। প্রফুল্ল রায়। প্রমথ ভৌমিক। প্রসূন বসু। প্রেমেন্দ্র মিত্র। বিজন ভট্টাচার্য। বিনয় ঘোষ। বিনয় রায়। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। বিভূতি গুহ। বিমল কর। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (পশ্চিমবঙ্গ শাখা, সারা-ভারত কৃষকসভা)। বিষ্ণু দে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বীরেন্দ্র নিয়োগী। বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। মহম্মদ ইলিয়াস (পশ্চিমবঙ্গ শাখা, সারা-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস)। মৃণাল সেন। রণধীর দাশগুপ্ত। রবীন্দ্র মজুমদার। ড. রমা চৌধুরী (উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)। রাধারমণ মিত্র। রাম বসু। শঙ্খ ঘোষ। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। শম্ভু মিত্র। শিবশঙ্কর মিত্র। শিবশম্ভু পাল। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সতীন্দ্রনাথ মৈত্র। সত্যজিৎ রায়। ড. সত্যেন্দ্রনাথ সেন (উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। সিদ্ধেশ্বর সেন। সুকুমার মিত্র। ড. সুকুমার সেন। সুচিত্রা মিত্র। সুনীল ঘোষ। ড. সুনীল সেন। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়। সুশীল জানা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সুশোভন সরকার। সোমনাথ লাহিড়ী। সৌরি ঘটক। হিরণকুমার সান্যাল। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

গোলাম কুদ্দুস, মণীন্দ্র রায় ও দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কমিটির আহ্বায়ক হন। 'পরিচয়' কার্যালয়ে কমিটির আপিশ হয়।

২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যে ৬টায় 'স্টুডেন্টস হল'-এ কমিটির উদ্যোগে গোপাল

হালদার মহাশয়ের জন্মোৎসব উদযাপিত হয়। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উৎসবসভায় সভাপতিত্ব করেন।

হল-এ আক্ষরিক অর্থেই তিলধারণের জায়গা থাকে না। মানুষের ভীড় উপচে পড়ে সামনের বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটে। অশীতিপর বৃদ্ধ থেকে নবীন কিশোর পর্যন্ত নানা মুখের মেলা। অগ্নিযুগের বিপ্লবী অনেকে এসেছিলেন, এসেছিলেন ভারতের শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের কয়েকজন পথিকৃৎ। তাছাড়া, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতের অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্বরা তো ছিলেনই। সভার চেহারা দেখে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র তো অভিভূত হয়ে বলেই ফেললেন: স্টুডেন্টস হল-এ অনেক সভা করেছি। কিন্তু এ রকম জনাকীর্ণ সভা কখনো দেখি নি।

উৎসব কমিটির পক্ষে মণীন্দ্র রায় গোপাল হালদারকে মাল্যভূষিত করেন। সোভিয়েত দূতাবাসের পক্ষে মীরকাসিমভ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যপরিষদের পক্ষে অজয় দাশগুপ্ত, বি পি. টি. ইউ. সির পক্ষে মহম্মদ ইলিয়াস, ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক মৈত্রী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন গণসংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশন-সংস্থার পক্ষে গোপালদাকে মালা বা পুষ্পস্তবক উপহার দেওয়া হয়। বিভিন্ন ব্যক্তিও পুষ্পার্ঘ দেন। ফুলে মালায় ডায়াসটা ভরে যায়।

কমিটির পক্ষে আচার্য সুনীতিকুমার গোপালদাকে একটি কাশ্মীরী শাল ও গোলাম কুদ্দুস একটি কলম উপহার দেন। সোভিয়েত জনগণের হয়ে উপহার দেন মীরকাসিমভ। নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি দেন এক সেট বিদ্যাসাগর রচনাবলী। তরুণতর লেখকরা দেন তাঁদের বই।

গোপাল হালদারের সহধর্মিণী ড. অরুণা হালদার এই উপলক্ষে পাটনা থেকে কলকাতা এসেছেন, দর্শকদের আসনে প্রথম সারিতে বসেছিলেন। কমিটির পক্ষে দিলীপ বসু তাঁকে একটি পুষ্পস্তবক উপহার দেন।

পর পর বক্তৃতা করেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরকাসিমভ, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হিরণকুমার সান্যাল, সোমনাথ লাহিড়ী, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, রাধারমণ মিত্র, মৃণাল সেন, বিজন ভট্টাচার্য, অজয় দাশগুপ্ত, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আবদুর রেজ্জাক খাঁ, ড. ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, ধরণী গোস্বামী, কমলা মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। আচার্য সুনীতিকুমারের অনুপস্থিতিতে সভার কাজ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

পরিচালনা করেন। বক্তাদের বক্তৃতায় গোপালদার জীবন ও কর্ম প্রসঙ্গে এসে যায় সেই ত্রিশের দশক থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সারস্বত সাধনার কত না গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। কিন্তু সবার ওপর থাকে ঘরোয়া, প্রায়-পারিবারিক, এক সুর। শ্রদ্ধার, ভালোবাসার সুর।

সভায় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিষ্ণু দে-র শুভকামনাজ্ঞাপক চিঠি পাঠ করা হয়।

উৎসব কমিটি ড. অরুণা হালদার সংকলিত গোপাল হালদারের গ্রন্থপঞ্জী মুদ্রিত আকারে বিতরণ করে। সন্দেহ নেই, এই গ্রন্থপঞ্জী গবেষক ও পাঠক-সাধারণের পক্ষে খুবই সহায়ক হবে।

'পরিচয়' গোপাল হালদারের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৭২ সালে যে-সম্পাদকীয় লিখেছিল তা পুনর্মুদ্রিত করে উৎসবসভায় গোপালদার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ হিসেবে বিতরণ করে।

সব শেষের বক্তা ছিলেন গোপালদা স্বয়ং। গলায় মালা, জোড় হাত, নম্র কণ্ঠে—কিছুটা বা আবেগকম্পিত স্বরে—তিনি বলেন :

প্রতিবেদনের মর্ম

বাহাত্তুর বৎসর ছাড়িয়েও যে আমি আপনাদের আনন্দ-কৌতুকের কারণ হতে পেরেছি, তা আমি বলে নয়; এ বাহাত্তুর বৎসরটার জন্য। বাহাত্তুরটা তাই আমার পক্ষে সুবিধার কাল না হোক, আমার পক্ষে সৌভাগ্যের বৎসর—আপনাদেরকে কৌতুক ও আনন্দ দান করতে পেরেছে। আর, সেরূপই আশা করি, পূজনীয় অগ্রজেরা আমার এসব কথাকে সস্নেহ ক্ষমার চক্ষে দেখবেন, আর প্রীতিভাজন অনুজেরা 'বাহাত্তুরের প্রলাপ' বলে তা উড়িয়ে দিতে পারবেন।

স্বভাবতই বয়সটা মনে করিয়ে দিয়েছে কিছু না কিছু কথা। একটা গল্পই বেশি মনে পড়ে—বোধহয় আনাতোল ফ্রাঁসের লেখায় পড়েছি। বোগদাদের বাদশাহ না ইসপাহানের শাহানশাহ দিগ্বিজয়ী হয়েছেন। ডাকালেন তাঁর কবিকে—"এবার লেখো আমাকে নিয়ে নতুন শাহনামা।" কবি কুর্নিশ করে বললেন—"যে আদেশ। তবে···" শাহনশাহ বললেন—"পুরস্কার? এক-এক শ্লোকে এক-এক আশ্‌রাফি। ত্রিশ বৎসরের কথা—ত্রিশ হাজার শ্লোক হওয়া চাই।" কবি আবার কুর্নিশ করে বললেন—"শাহানশাহের মেহেরবানী। কিন্তু কত দিন সময় দিলেন?" শাহানশাহ বললেন—"কত সময় চাও?" কবি কুর্নিশ

করে বললেন, "খোদাবন্দ! ত্রিশ বৎসর,—বৎসরে এক হাজার শ্লোক।" শাহানশাহ বললেন—"তাই হবে। কিন্তু তখন সম্পূর্ণ না হলে কোতল হতে হবে।" কবি বললেন—"শাহানশাহের মর্জি।" বৎসর গেল, একে-একে। ত্রিশ বৎসর পরে কবি এসে বললেন—"কিতাব সম্পূর্ণ। হুজুর শুনুন—ত্রিশ হাজার শ্লোকে আপনার কথা।" শাহানশাহ তখন বৃদ্ধ, বয়সে জীর্ণ। বললেন, "ত্রিশ হাজার শুনতে পারব না। অত সময় নেই। তিন হাজার শ্লোকে কমিয়ে নিয়ে আসো।" এবার সময় দেওয়া হল, আরও তিন বৎসর। তিন বৎসর পরে আবার কবি কেতাব নিয়ে উপস্থিত। শাহানশাহ তখন গুরুতর পীড়িত। বললেন—"না, অত শুনতে পারব না। তিন শ শ্লোকে কমিয়ে আনো।" কবি আবার সময় পেল—তিন মাস। তিন মাস পরে কবি যখন কেতাব নিয়ে এলেন, শাহানশাহ তখন মুমূর্ষু—শ্বাস উঠেছে। বললেন—"অত শুনতে পারব না। তিন কথায় বলো তো শুনতে চাই।" কবি বললেন—"তাই হবে।" তারপর বললেন ফারসি জবানে: "He was born, he died ; and in between he suffered." জন্মেছে, মরেছে, মাঝখানে করেছে ছটফট। এই হল সকল মানুষের জীবন-কথা।

আমিও ভাবছিলাম—জন্মেছি, মরবও, কিন্তু বাহাত্তুর বৎসর যা suffer করেছি, তা কী। বন্ধুবর সোমনাথবাবু তার আভাস দিয়েছেন (আমাকে প্রথম দেখেছিলেন—"এক হাত ছিল টাইপরাইটারে, আরেক হাতে মায়ের এক শাড়ি নিয়ে বসে নাকের জল মুছছেন।") সত্যই, চিরটা কাল আমি বেঁচেছি যেমন, তেমনি হেঁচেছি। বাহাত্তুর বৎসরের অন্তত দু-বাহাত্তুর মাস statistically আমার পক্ষে এই কথাই সত্য। আমার তাই একটা equation, যে যাই বলুন, এই—"আমি বাঁচি = আমি হাঁচি।"

বোধহয় তা ঠিক সম্পূর্ণ নয়—এই আপনার কৌতুক-আনন্দ দেখে মনে হয়—না, আমি হাসিও চেয়েছি। Poetry of the Earth is never dead, এই তো পৃথিবীর হাসিও উবে যায় নি। এদেশে একালে অবশ্য মানুষে বিশ্বাস না হারানো একটা দুঃসাধ্য সাধনা। তবু মানুষে বিশ্বাস রাখাও কিছু না কিছু সম্ভব। নিরবচ্ছিন্ন হাসিও যদি সত্যই তেমনি অসম্ভব হয়, আপনাদের সাহচর্যে গল্পে আড্ডায় হাসিও আমার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য হয় নি। আমার জীবনের সমীকরণটাও তাহলে "বাঁচি = হাঁচি" নয়, বরং সত্য এই—"বাঁচি = হাঁচি + হাসি"। একটা plus আছে।

আজও আপনাদের হাসির সানন্দ খোরাক জোগাতে পেরেছি—এই কি কম সৌভাগ্য ?

কাজ দিয়ে যাদের জীবনের পরিমাপ আমি তো তেমন মানুষ হতে পারি নি—তবে কাজে একটু আকর্ষণ ছিল। ভালো কথা দিয়ে জীবনকে ভালো করে তুলতে পারা, fine writing next to fine working—কীটসের মতো কবিরও একটা চিঠিতে পড়েছি তাঁরও কাছে ছিল এত বাঞ্ছনীয়—আমি তো তেমন ভালো কথাও লিখতে পারি নি, তবে সেরূপ 'fine writing', ভালো কথা, ভালো লাগত। বাহাত্তর বৎসরে কী করেছি যখন ভেবে কিছু পাই না, তখন আপনাদের সাহচর্য পেয়ে মনে হয়—কেন ? আপনাদের হাসি-গল্পে তো যোগ দিতে পেরেছি, এই তো আসল কথা।

আমার জন্মক্ষণ সম্বন্ধে একটা কথা আছে। সত্য কথা। আপনাদের জানাই। বিক্রমপুরে যে গ্রামে আমি জন্মেছিলাম, তখনকার দিনে সেই শিক্ষিতলোকের গ্রামেও একটা ঘড়ি পাওয়া যায় নি। আমার জন্মক্ষণ ঠিক করা হয়েছিল, সে অঞ্চলের কোড়াল নামে পাখি নাকি প্রহরে প্রহরে ডাকে, তার ডাক থেকে হিসাব করে। ঠিকুজী কোষ্ঠী তৈরি হলে পণ্ডিত মহাশয়রা পরিবারের কর্তা আমার জ্যেঠামশায়কে বললেন—"এ শিশু বেঁচে আছে কি ?" "নইলে ঠিকুজী কেন ?" শুনে পণ্ডিত মশায়রা বললেন—"তা হলে ক্ষণজন্মা—কারণ, সে ক্ষণজীবী হবার কথা।" যাক, তা সত্ত্বেও আমি তো ৭২ বৎসরও পার হলাম। "বেঁচেছি" বলতেই হবে, যাই বলুন পণ্ডিতেরা। আর There is a joy in mere living. আপনাদের হাসি-আনন্দের সহযোগী হতে পেরেছি ; আপনাদের ভালোবাসাতেই বিশেষ করে, বাঁচবার আনন্দও বুঝতে পেরেছি। আর, আপনারাও সকলে—উপস্থিত-অনুপস্থিত সুহৃদরা সকলে—আমার ভালোবাসা গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন !

প্রণাম সকলকে !

পরিচয়

বর্ষ ৪৩ । সংখ্যা ৮-৯ । ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮০ । মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৪

সূচীপত্র

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ক্রোড়পত্র

প্রবন্ধ

উপন্যাস

গল্প

কবিতাগুচ্ছ

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

১৯৫৬ সালে সংবাদপত্র রেজিসট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের
৮ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১ প্রকাশের স্থান—৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

২ প্রকাশের সময়-ব্যবধান—মাসিক

৩ মুদ্রক—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ভারতীয়; ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭

৪ প্রকাশক— ঐ ঐ ঐ

৫ সম্পাদক—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয়; ৬১২/১, ব্লক-ও নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩

তরুণ সান্যাল, ভারতীয়; ৩১/২, হরিতকী বাগান লেন, কলকাতা-৬

৬ পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর যে-সকল অংশীদার মূলধনের একশতাংশের অধিকারী, তাঁদের নাম ও ঠিকানা :

১। গোপাল হালদার, ফ্ল্যাট-১৯, ব্লক এইচ, সি. আই. টি. বিল্ডিংস, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪ ॥ ২। সুনীলকুমার বসু, ১৭/এল, মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৪। হিরণকুমার সান্যাল, ১২৪, রাজা সুবোধ-চন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা-৪৭ ॥ ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭ ॥ ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭ ॥ ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭ ॥ ৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ৫/বি, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১৩, ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ১০। শীতাংশু মৈত্র, ১।১।১, নীলমণি দত্ত লেন, কলকাতা-১২ ॥ ১১। বিনয় ঘোষ, ৪৭।৩, যাদবপুর সেনট্রাল রোড, কলকাতা-৩২ ॥ ১২। সত্যজিৎ রায়, ফ্ল্যাট-৮, ১।১, বিশপ লেফ্রয় রোড, কলকাতা-২০ ॥ ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায় (মৃত), ৪৬।৭এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯ ॥ ১৪। হরিদাস নন্দী, ২৯/এ, কবির রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২/বি, সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-২৯ ॥ ১৬। শান্তিময় রায়, 'কুসুমিকা', ৫২, গরফা মেন রোড, কলকাতা-৩২ ॥ ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, পূর্বপল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম ॥ ১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (মৃত), ৯।১, কর্নফিল্ড রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ১৯। নিবেদিতা দাশ, ৫৩/বি, গরচা রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (মৃত), ৩/সি, পঞ্চাননতলা

রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ২১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলকাতা-২০ ॥ ২২। শান্তা বসু, ১৩।১এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৪ ॥ ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬২, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ২৪। ধীরেন রায়, ১০।৬, নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া ॥ ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ ॥ ২৬। দ্বিজেন্দ্র নন্দী, ১৩/ডি, ফিরোজ শাহ্‌ রোড, নয়াদিল্লী ॥ ২৭। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৫০, রামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬ ॥ ২৮। সুনীল সেন, ২৪, রসা রোড সাউথ (থার্ড লেন), কলকাতা-৩৩ ॥ ২৯। দিলীপ বসু, ২০০/এল, শ্যামা-প্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ৩০। সুনীল মুন্সী, ১।৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯ ॥ ৩১। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ২, পাম প্লেস, কলকাতা-১৯ ॥ ৩২। হিমাদ্রিশেখর বসু, ৯/এ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৩৩। শিপ্রা সরকার, ২৩৯।এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৪০ ॥ ৩৪। অচিন্ত্যেশ ঘোষ, হিন্দুস্থান জেনারেল ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড, ডি. বি. সি. রোড, জলপাইগুড়ি ॥ ৩৫। চিন্মোহন সেহানবীশ, ১৯, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ৩৬। রণজিৎ মুখার্জি, পি২৬, গ্রেহামস লেন, কলকাতা-৪০ ॥ ৩৭। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় দূতাবাস, ঢাকা, বাঙলাদেশ ॥ ৩৮। অমল দাশগুপ্ত, ৮৬, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৫ ॥ ৩৯। প্রদ্যোৎ গুহ, ১/এ, মহীশূর রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ৪০। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭ ॥ ৪১। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৫/বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯ ॥ ৪২। দীপেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬১২।১, ব্লক-ও, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩ ॥ ৪৩। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥ ৪৪। নির্মাল্য বাগচি, ফ্ল্যাট-বি সি ৩, পিকনিক পার্ক, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৬ ॥ ৪৫। তরুণ সান্যাল, ৩১।২, হরিতকী বাগান লেন, কলকাতা-৬ ॥ ৪৬। বিদ্যা মুন্সী, ১।৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯ ॥ ৪৭। বেদুইন চক্রবর্তী, ফ্ল্যাট-২, ১০, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ ॥ ৪৮। অমিয় দাশগুপ্ত, ২, যদুনাথ সেন লেন, কলকাতা-৬ ॥ ৪৯। অজয় দাশগুপ্ত, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥ ৫০। সুরেন ধরচৌধুরী (মৃত), ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥

আমি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য। (স্বাঃ) অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

১০, ৬. ৭৪

বর্ষ ৪৩ । সংখ্যা ৮-৯ । ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮০ । মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৪

বিজ্ঞানের সংকট

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পদার্থ-বিজ্ঞানের একটি নতুন যুগ আরম্ভ হয়েছে। এ যুগের বিশেষত্ব কি, তা আলোচনা করবার আগে, বিজ্ঞানের ক্রমিক পরিণতির বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক।

নিউটন থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়, এ বললে অত্যুক্তি হবে না। তার আগেও আমরা বস্তুজগতের বিষয়ে অনেক জিনিস খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে জানতাম। যে জ্ঞান আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে কাজে আসে, শিল্পে বাণিজ্যে যে জ্ঞান মানুষের সুবিধা ও সম্পদবৃদ্ধির জন্য কার্যকরী হতে পারে, এমন অনেক জ্ঞান প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জানা ছিল। কিন্তু তখন শুদ্ধ-বিজ্ঞানের নিদর্শন-স্বরূপ ছিল একমাত্র গণিতশাস্ত্র। বিশেষ করে জ্যামিতি-ছিল বৈজ্ঞানিকদের প্রিয় বিদ্যা। এর অনুশীলনে গ্রীক ও তাঁদের পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা যে নিয়ম ও সত্যানুসন্ধানের যে রীতি অনুসরণ করেছিলেন, পরের যুগের বৈজ্ঞানিকেরা, জড় জগতের অন্যান্য বিষয়গুলিকে নিজেদের আয়ত্তে আনবার চেষ্টায়, সেই রীতি ও নিয়মসমূহই বরণ করেছিলেন। ইউক্লিড তাই এখনও পর্যন্ত সকল দেশেই পূজা ও সম্মান পাচ্ছেন। গণিতশাস্ত্রের নিয়ম কানুন যে জড়-পদার্থের গতিবিধিতে লাগানো যেতে পারে, তা নিউটনই প্রথম দেখালেন। চোখের সামনে যে বিভিন্ন জড় পদার্থের সমাবেশ দেখছি, তাদের পরস্পরের ব্যবধান এবং তাদের গতির পরিমাণ ও লক্ষ্য জানা থাকলে ভবিষ্যতে আবার তাদের কি রকম অবস্থায় ও কোথায় পাওয়া যাবে, তা আগে থেকে নির্দেশ করা যায় কি-না, এইটেই হল গতিবিজ্ঞানের অনুসন্ধান।

এই গণনা করতে নিউটনই আমাদের শেখালেন। তাঁর পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা তাঁকে অনুসরণ করে দেখালেন যে, আকাশের গ্রহ তারকা থেকে আরম্ভ

করে আমাদের পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছোট-বড় সব জিনিসের সম্বন্ধেই এই নিয়ম খাটে এবং গণনার ফলাফল ও ভবিষ্যদ্বাণী সত্য সত্যই প্রত্যক্ষভাবে মেলে। আকাশের কোন্‌খানে দু'বৎসর বাদে কোন্ গ্রহের উদয় হবে, তা আজকে আঁক কষে বলা যায়। আবার কামানের গোলা ছুঁড়লে শত্রুব্যূহের মধ্যে ঠিক কোথায় গিয়ে পড়বে, তাও গণিতশাস্ত্র ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। এই সফলতায় উৎফুল্ল হয়ে পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা জড়-পদার্থের অন্যান্য গুণাগুণের অনুশীলন আরম্ভ করলেন। উত্তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ এসব কিছুই বাদ গেল না। নিউটনের পদানুসরণে পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা এই সকল প্রসঙ্গের অনুসন্ধানে প্রায় একই রকম রীতির অনুবর্তন করেছেন এবং অনেকাংশে কৃতকার্য হয়েছেন।

এদিকে আবার প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন জড়পদার্থের গঠন ও উদ্ভব সম্বন্ধে গবেষণা চলছিল। এই বৈচিত্র্যময় জগতের আদি উপাদান নিরূপণ করবার জন্য অতি আদিম কাল থেকেই মানবমন ব্যগ্র ছিল। বহু দিনের অনুসন্ধানের ফলে আজ রসায়নশাস্ত্র বলতে সক্ষম হয়েছে যে, বিরানব্বইটি আদি ধাতুর বিভিন্ন সংমিশ্রণেই আমাদের নিকট প্রতীয়মান সর্বপ্রকার যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি। কাঠ পাথর থেকে আরম্ভ করে প্রাণিদেহের উপাদানসমূহ সবই ওই আদি বস্তুগুলির সংমিশ্রণে জাত। প্রমাণ-স্বরূপ রাসায়নিক তাঁর পরীক্ষাগারে রোজ রোজ নতুন নতুন জিনিস তৈরী করে দেখাচ্ছেন।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে-সব জিনিস জন্মায়—কি খনির মধ্যে, কি জীবদেহে—মানবচক্ষের অন্তরালে প্রকৃতি যে-সমস্ত জিনিষ তৈরী করে, তাদের উৎপত্তি আগে রহস্যময় বলে মনে হত। আজ সেগুলির বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, সকলেরই মূলে কেবল সেই কয়টি আদি ধাতুই আছে, এবং অনেক স্থলেই মৌলিক বস্তুর পুনঃ সংমিশ্রণে সেই সব জিনিস নিজের পরীক্ষাগারে তৈরী করতে মানুষ সক্ষম হয়েছে। এই বিশ্লেষণ ও সংমিশ্রণের নিয়ম খুঁজতে গিয়ে, বৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদে উপনীত হয়েছেন। আজকের বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্ত এই যে, দৃশ্যতঃ কঠিন তরল বা বায়বীয় সকল পদার্থই আদিতে কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি; পদার্থের কাঠিন্য, তারল্য ও বায়ু-স্বভাব মূলতঃ পরমাণুদের গতি ও পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলাফল। এই সিদ্ধান্তে নিঃসংশয়ভাবে উপনীত হবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের দেখতে হল, যে-নিয়মে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুদের গতিবিধি চলছে, সেই নিয়ম ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মশরীর পরমাণুদের পক্ষেও খাটে কি-না। রাসায়নিক বিরানব্বইটি আদিবস্তু আবিষ্কার করেছেন, সে কথা আমি

আগেই বলেছি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, টমসন, রাদারফোর্ড ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এই বিরানব্বইটি আদিবস্তুও আবার দুইটি মৌলিক উপাদানে গঠিত। তার একটি ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা অর্থাৎ প্রোটন, আর একটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা অর্থাৎ ইলেকট্রন। প্রত্যেক রকম পরমাণুরই মূল উপকরণ এই দুইটি। যে বিশ্লেষণে রাসায়নিক দেখিয়েছিলেন যে, বিভিন্ন রকম জড়পদার্থের মূলে বিরানব্বইটি আদি ধাতু বর্তমান, প্রায় সেই রকম বিশ্লেষণ করেই আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়েছেন যে, আদিবস্তুর পরমাণুর মূলে ঐ দুটি বিদ্যুতাণুর কল্পনা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই এই সিদ্ধান্ত নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের প্রতীয়মান জগতে ঐ দুই প্রকারের বিদ্যুৎকণার পরস্পর সংযোজনে ও সংমিশ্রণে যতরকম বিভিন্নধর্মী পদার্থের উদ্ভব হয়েছে, সেই যোজন-মিশ্রণের নিয়ম আবিষ্করণই আজকের পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রধান কাজ। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাদারফোর্ড প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে অনুমান করলেন যে, সৌরজগৎ যেমন সূর্যকে ভারকেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষায় বিভিন্নভাবে ভ্রাম্যমান গ্রহরাশির সমাবেশে গঠিত, প্রত্যেক পরমাণুর গঠনরীতিও তদ্রূপ। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যস্থানে বা নাভিতে একটি বিদ্যুৎকণার সমষ্টি বিদ্যমান, যার গঠনের মধ্যে ধনাত্মক কণার সংখ্যাই বেশী। এরি চতুর্দিকে বিভিন্ন কক্ষায় ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা বা ইলেকট্রন ঘুরছে। কেন্দ্রের ধনাত্মক বিদ্যুতের যে পরিমাণ, বহিঃকক্ষায় ঋণাত্মক বিদ্যুৎসমষ্টির পরিমাণও তাই। সমগ্র অণুটি তাই আমাদের স্থূল পরীক্ষায় বিদ্যুৎহীন বলেই প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক কণার বিদ্যুতের পরিমাণ একই, কাজেই আগে যে বিরানব্বইটি আদিবস্তুর কথা বলেছি, তাদের পরমাণু-গঠনের তারতম্য বহিঃকক্ষার ইলেকট্রন-সংখ্যার উপর নির্ভর করছে। সবাপেক্ষা গুরু ধাতুর অণুর মধ্যে বিরানব্বইটি ইলেকট্রন বিরাজমান। রাদারফোর্ড-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে অনেক কারণ দেখিয়েছেন, এবং এই গঠন-প্রণালীর ফলে যে আদিবস্তুর অনেক ধর্মেরই উদ্ভব হয়েছে তার বহু সন্তোষ-জনক প্রমাণ আমরা পেয়েছি। বিদ্যুৎ ও জড়পদার্থের নিবিড় সম্বন্ধ আজকাল আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু কি নিয়মে ইলেকট্রন ধনাত্মক বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের চারিদিকে ঘোরে, সে বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা আজও সম্পূর্ণরূপে ঘোচেনি।

উত্তাপ ও আলোকের বিষয় অনুশীলন করে বৈজ্ঞানিকেরা আবার কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যা আমাদের এস্থলে জানা দরকার। বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানচক্ষুতে যখন দৃশ্যতঃ ঘন-কঠিন বস্তুও মূলে কয়েকটি গতিশীল অণুর সমষ্টি বলে প্রতীয়মান হল, তখন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করলেন যে, এই চিরচঞ্চল অণুরাশির ঘাত-প্রতিঘাত ও তাদের গতিই সমস্ত উত্তাপ ও অন্যান্য বাহ্যাবস্থার কারণস্বরূপ ধরতে হবে। আগুনের মধ্যে একটি ধাতু-যষ্টির একপ্রান্ত রাখলে আগুনের বাইরে অন্য দিকও যে ক্রমে ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, এর কারণ, তাঁদের মতে, অনেকটা এই: অগ্নিকুণ্ডের জ্বলন্ত ক্ষিপ্রতর অণুর সংঘাতে পূর্বেকার অপেক্ষাকৃত শীতল ধাতুদণ্ডের অগ্রভাগস্থিত অণুগুলির গতি আরও চঞ্চল হয়ে উঠে; সেই চাঞ্চল্যের বেগ ক্রমশঃ ঘাত-প্রতিঘাতে বাহিরের দিকে সংক্রামিত হয়। উত্তাপের পরিমাণ বস্তু-অণুদের চাঞ্চল্যের পরিমাণ নির্দেশ করে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা উত্তাপভেদে বস্তুর যে অবস্থাভেদ হয়, তা শুধু অণুদের গতির তারতম্য দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়মসমূহ এই ক্ষেত্রে খাটানো যায় কি-না, সে বিষয়েরও আলোচন শুরু হল এবং তাতে তাঁরা কতকটা কৃতকার্যও হলেন। এখানে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, নিউটনের গতিবিজ্ঞান যে রকম করে নক্ষত্রের বিষয়ে লাগানো গিয়েছিল, ঠিক সেইভাবে সে নিয়মগুলিকে ইন্দ্রিয়াতীত পরমাণুদের বিষয়ে লাগানো একরূপ অসম্ভব। আমরা দেখেছি যে, গ্রহ ও জড়বস্তুর অবস্থানের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গেলে গণনার জন্য সেই বস্তুগুলির উপস্থিত সন্নিবেশ ও গতিবিধি জানা দরকার। কিন্তু অণু সম্বন্ধে এই জ্ঞান অসম্ভব। তবুও, তা সত্ত্বেও গতিবিজ্ঞান যে নির্দিষ্ট কিছু বলতে পারে বলে আমরা মনে করে থাকি, সেই বিশ্বাসের ভিত্তি মুখ্যতঃ এই—বহু কোটি সূক্ষ্ম অণুর সমষ্টি নিয়ে স্থূল জড়-পদার্থ। জড়পদার্থের গুণাগুণ বিবেচনা করতে গেলে, প্রত্যেক সূক্ষ্ম অণুটির অব-স্থানের সঠিক খবর জানা বিশেষ প্রয়োজন নয়, সাধারণ কয়েকটির আচরণ আমরা গতি-বিজ্ঞানের নিয়ম থেকেই বলতে পারি, অনেক সময় উত্তাপ-বিজ্ঞানের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। যেমন একটি দেশে—যেখানে কোটি কোটি লোকের বাস—প্রত্যেক লোকের জীবনের গতিবিধি সূক্ষ্মভাবে না জেনেও দেশের আর্থিক হিতাহিত ও জন্ম-মৃত্যুর গড়পড়তা হারের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত করা যায় যেটা সাধারণতঃ নির্ভর করে সে দেশের জল-বায়ুর ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরে। এই জ্ঞান যেমন অনেক সময়েই অনেক বিষয়ে আমাদের কাজে লাগে

এবং সে সকল বিষয়ে আমরা যেমন একটা হিসাব-নিকাশ খাড়া করতে পারি, অণুসমষ্টির গতি-বিধির নিয়মের গণনাও অনেকটা সেই রকম।

নিউটনের গতি-বিজ্ঞানের নিয়ম, জ্যামিতি অথবা অঙ্কশাস্ত্রের নিয়ম-কানুনের মতো অমোঘ, এই বিশ্বাসের ফলেই বৈজ্ঞানিকেরা গ্রহ ও স্থূলজড়ের বিষয়ে সেই নিয়ম খাটিয়েছিলেন। গণনার সহিত ঘটনার সামঞ্জস্য থেকে বৈজ্ঞানিকদের মনে প্রথমে ধারণা জন্মেছিল যে, প্রত্যেক আদর্শ বৈজ্ঞানিক নিয়মই ওই রকম অনতিক্রমণীয় ও অটল হবে। কিন্তু উত্তাপ-বিজ্ঞানের নিয়মের বিষয়ে সে নিশ্চয়তা যে খাটে না, তা আগেকার কয়েকটা কথা থেকেই বোঝা যাবে। পরমাণু অতিক্রম করে আজ যখন বৈজ্ঞানিকেরা ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটনের সমষ্টি হিসাবে সমস্ত জড় জগৎকে দেখতে চাচ্ছেন, তখন এটা বোঝা শক্ত হবে না যে, আজ তাঁরা বিদ্যুতের আদি-ধর্ম থেকে যে-সব জাগতিক নিয়মে, গণিতের সূত্র অনুসারে, উপনীত হচ্ছেন, সেগুলিকে আর জ্যামিতিক নিয়মের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসানো সম্ভব নয়। ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে দরকারী কতকগুলি নিয়মরূপেই সেগুলিকে দেখতে হবে। জ্যামিতিক নিয়ম ও পদার্থ-বিজ্ঞানের অনেকগুলি নিয়মের মধ্যে তফাতের কথা পরে আরো বলার ইচ্ছা রইল।

ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন কিংবা গতিশীল সূক্ষ্মশরীর পরমাণুদের রঙ্গস্থল আকাশ-ক্ষেত্র। প্রথমে পরমাণুবাদীদের ধারণা ছিল যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়গোলকের আয়তন ও আকৃতি যেমন আমরা ভাবতে পারি, অতিক্ষুদ্র ও ইন্দ্রিয়াতীত পরমাণুদের কিংবা আরও ছোট প্রোটন বা ইলেক্‌ট্রনের আয়তন ও আকৃতিও আমরা সেইরূপে কল্পনা করতে সক্ষম। অণুতে অণুতে কিংবা প্রত্যেক পরমাণুর ভিতরকার বিভিন্ন বৈদ্যুতিক অংশের ব্যবধান এই সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খণ্ডগুলির আকৃতির এবং আয়তনের অনুপাতে অনেক অধিক। জগৎ বিচ্ছিন্ন কণাসমষ্টি। তাদের মধ্যে ব্যবধান ও দূরত্ব এত বেশি যে, জগতের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই পদার্থরিক্ত আকাশক্ষেত্রের কথা মনে পড়ে। অথচ আলোকের ধর্ম অনুশীলন করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন যে আলোককে এই আকাশপথে বহমান তরঙ্গবিশেষ বলে ভাবলে এই শাস্ত্রের অনেক সমস্যার সদুত্তর মিলে যায়। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই এই ধারণা তাঁদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে আছে ঈথর নামে একটা বিচ্ছেদহীন, অখণ্ড পদার্থ। পরমাণু বা বিদ্যুৎকণা সেই ঈথর-সমুদ্রে ভাসমান। আলোকরশ্মি এই ঈথর-সমুদ্রের তরঙ্গ-বিশেষ। এই সমুদ্রে ছোট-বড় নানা রকমের ঢেউ

উঠতে পারে, এবং সকল ঢেউ রিক্ত আকাশক্ষেত্রে সমান ক্ষিপ্রগতিতে ধাবমান। আলোর বর্ণভেদের কারণ ঢেউয়ের দৈর্ঘ্যের তারতম্য। যে-সকল ঢেউয়ের স্পন্দন আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে আলোকজ্ঞান উৎপাদন করে, তাদের চেয়েও অনেক বড় ও অনেক ছোট ঢেউ আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন। ঈথরে তরঙ্গ উত্তোলন করবার রহস্যের অনেকটা আজকাল মানুষের আয়ত্তে এসেছে। আজ আকাশপথে যে বেতারে নিমেষের মধ্যে একস্থান থেকে সহস্র সহস্র যোজন দূরে মানুষের খবরাখবর যাচ্ছে, সেই কাযে বার্তাবহ ঈথরের ঢেউ। এগুলি আলোকের ঢেউয়ের চেয়ে অনেক বড়। পক্ষান্তরে যে রঞ্জনরশ্মি আজকাল রোগ নিদানের জন্য প্রায়ই ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলিও ওই ঈথরের তরঙ্গমাত্র, তবে সেগুলি আলোর ঢেউয়ের তুলনায় অনেক ছোট।

এক পরমাণু ও অপর পরমাণুর মধ্যে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকা ও পৃথিবীর মধ্যে অপারমেয় ব্যবধান থাকলেও ঈথর সকলকে সংশ্লিষ্ট ও সংযুক্ত করে রেখেছে। ঈথর-তরঙ্গেই আমাদের কাছে চন্দ্র তারা নীহারিকা হতে আলো আসছে। এই পথেই আমরা সূর্যের কাছ থেকে উত্তাপ ও আলো পাচ্ছি। পৃথিবী যে আজ জীবনের বিচিত্র লীলায় ছন্দিত, যে-শক্তির বিকাশ ও অপচয় আজ আমরা মানুষের নানা ক্রিয়াকলাপে দেখছি, সে-সমস্তেরই মূলে হচ্ছে ঈথর-পথে আনীত সূর্যের কিরণরাজি। আলোক-তরঙ্গে আনীত শক্তিকে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জড় পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধরে রাখছে এবং কল্পনাতীত অতীত থেকেই এই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সঞ্চিত আছে। ঈথর তরঙ্গের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে ভিন্ন ভিন্ন ও প্রোটন-ইলেকট্রনের পরস্পর আকর্ষণ-বিকর্ষণেই যে জগতের বিভিন্ন স্থূল বিভিন্নধর্মী জড়ের বিকাশ হয়েছে ও তার লীলা-খেলা চলছে, এইটা আজকের পদার্থ-বিজ্ঞানের মূল কথা। আজ বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক এই ঘাত-প্রতিঘাতের ও আকর্ষণ-বিকর্ষণের মূল সূত্রগুলির অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

পূর্বে সংক্ষেপে বিজ্ঞানের যে ক্রমোন্নতির ও বিকাশের কথা বলেছি, তা নিউটন থেকে আরম্ভ করে এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত মানব-প্রতিভার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই নিউটনের অনুসরণ করে গণিতকারেরা গতি-বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সত্যগুলিতে উপনীত হয়েছিলেন, এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের সমস্যাগুলিকেও প্রায় সবই ওই গতি-বিজ্ঞানের সাহায্যে নিরাকরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলে তাঁদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি নিউটনের গতি-বিজ্ঞানের অনুরূপ কিংবা অনুযায়ী হওয়া উচিত। তখন

নিউটনের নিয়মের যে ব্যতিক্রম হতে পারে, তা তাঁরা ভাবতেই পারতেন না। তাঁরা মনে করতেন যে, জ্যোতিষশাস্ত্রের সমস্যার যে দু-একটির উত্তর তখনো মেলেনি, তার জন্য তাঁদের গণনার অক্ষমতাই দায়ী—নিয়মগুলি কিন্তু সর্বকাল ও সর্ববিষয়েই প্রযোজ্য। উনবিংশ শতাব্দীতে সেইজন্যেই তাঁরা পদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়মকানুনগুলিকে জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ বা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের মতো ধ্রুব মনে করতেন এবং ভাবতেন, নিয়মমাত্রেই ওই একই পর্যায়ের অন্তর্গত। ক্রমশঃ যখন পরমাণুবাদ ও ইলেকট্রনবাদের উদ্ভব হল, যখন উত্তাপ-বিজ্ঞানের নিয়মসমূহ আগেকার নিয়মকানুন থেকে একটু ভিন্ন পর্যায়ের বলে তাঁরা দেখতে পেলেন তখন ওই নিয়মগুলি যথার্থ কি, সে বিষয়ে চিন্তা করতে শুরু করলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, বিশেষ করে, এই সব কথাগুলি আলোচনা করবার দরকার হল। আলোক-বিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে বৈজ্ঞানিকেরা তখন উভয়সংকটে এসে পড়লেন। অন্যক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলে যে-সব নিয়মের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসন্দেহ ছিলেন, আলোকশাস্ত্রে সেগুলিকে লাগাতে গিয়ে তাঁরা যে-সব সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন. সেগুলি পরীক্ষার ভুল বলে সাব্যস্ত হল। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, নিউটনের গতিবিজ্ঞান অনুসারে আলোক তরঙ্গের সহিত পরমাণুদের ঘাত-প্রতিঘাতের ফল, অঙ্ক কষে তাঁরা যা ঠিক করেছিলেন, পরীক্ষায় তার বিপরীত দেখা গেল। ফলে ১৯০০ সালে প্লাঙ্ক তাঁর বিখ্যাত Quantum Theory বা শক্তিকণাবাদের অবতারণা করলেন। মোটামুটি বলতে গেলে ব্যাপারটি এই :

যদিও আলোক-বিজ্ঞানের আগেকার পরীক্ষাগুলি আলোকের তরঙ্গবাদের পক্ষে অনুকূল ছিল, প্লাঙ্ক দেখালেন, যখন আলোকের সহিত পরমাণুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যার ফলে পরমাণু আলোক-তরঙ্গ থেকে শক্তি গ্রহণ করতে পারে, কিংবা যার ফলে আলোক সৃষ্টিকালে পরমাণুর কার্যশক্তি ঈথরে অর্পিত হয়, তখন আর তরঙ্গবাদের দ্বারা আসল ঘটনাগুলির কারণ নির্দেশ করা যায় না। আলোকপথে বহমান শক্তির প্রবাহকে কেবল তরঙ্গবাদের দ্বারাই সমগ্র ও নিঃসংশয়ভাবে বোঝা গেলেও, পরমাণু ও আলোকরশ্মির মধ্যে যখন শক্তির আদান-প্রদান ঘটে, তখনকার সমস্যার সদুত্তর আর তরঙ্গবাদে পাওয়া যায় না। সেই সময়ে বরং আলোক শক্তিকণার সমষ্টি এই ভাবের একটি কল্পনার দরকার হয়।

যেমন রসায়নশাস্ত্রে বিভিন্ন বস্তুর সংযোগ ও বিশ্লেষণের কথা আলোচনা করতে গিয়ে, জড়ের পরমাণুবাদের কল্পনা আমাদের করতে হয়েছিল, আলোকের

উৎপত্তি ও আলোকরশ্মি থেকে জড়পদার্থের শক্তি আকর্ষণের ধর্ম বিচার করতে গিয়ে তেমনি আলোক-কণাবাদে উপস্থিত হতে হল। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোক ভিন্ন ভিন্ন আলোককণার সমষ্টি, এইটিই Quantum Theory-র মূল কথা। আলোকের স্পন্দন-সংখ্যার উপরেই প্রত্যেক বর্ণের আলোককণার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে; এবং জড়ের পরমাণু কিংবা ইলেকট্রন যখন আলোক থেকে শক্তি আহরণ করে তখন আলোক থেকে এই একটি আলোককণার তিরোধান ঘটে। পক্ষান্তরে, জড়পদার্থ থেকে স্বতন্ত্রভাবে শক্তি অর্জন করে এক একটি আলোককণা উদ্ভূত হয়। এই ভাবের কল্পনা নিউটনের গতি-বিজ্ঞানের একেবারে পরিপন্থী। নিলস্ বর্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা গত কয়েক বৎসর চেষ্টা করছেন, কি করে এই আলোককণাবাদের সহিত পূর্বযুগের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সমন্বয় সাধিত হবে।

আলোক-বিজ্ঞানের উভয়সংকটের কথা মুখ্যতঃ এই: আলোকের প্রবাহের বিচার করতে গিয়ে যে-সব প্রশ্ন ওঠে, সেগুলির সমাধান তরঙ্গবাদেই মিলে; এখানে কণাবাদ অচল। পক্ষান্তরে, আলোকের উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, কণাবাদই এ-ক্ষেত্রে সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর সুচারুরূপে দিতে সমর্থ। তরঙ্গবাদ এখানে মোটেই চলে না। গত চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে আবার বিদ্যুৎকণার বিষয়ে কতকগুলি নতুন তথ্য আমরা জানতে পেরেছি; তার ফলে পদার্থবিজ্ঞানের অবস্থা আরও সংকটজনক হয়ে উঠেছে। ইলেকট্রনকে যদিচ আমরা স্বল্পায়তন কণারূপে কল্পনা করে আসছিলাম, তবু টমসন-গারমার প্রমুখ কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, সময়-বিশেষে ইলেকট্রনের স্রোতকে তরঙ্গ-ধর্মী বলে মনে হয়। আলোকতরঙ্গ যেমন সময়-বিশেষে বিচ্ছুরিত হয়ে বর্ণচ্ছত্রের সৃষ্টি করে, ইলেকট্রনের স্রোত অনেক সময়ে সেইরূপভাবে জড়-পদার্থের উপর পড়ে প্রতিফলিত হয়।

এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে পদার্থ বিজ্ঞানে একটা বিপ্লব হয়ে গিয়েছে। জড়কণা ও আলোকতরঙ্গকে আর আগেকার মতো কল্পনা করা চলবে না। যাকে এতদিন অত্যল্পায়তন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিদ্যুৎকণা বলে ভেবে আসা যাচ্ছিল, এখন বোঝা যাচ্ছে, তার মধ্যে বিস্তৃত তরঙ্গের প্রকৃতিও কিয়ৎপরিমাণে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে, আলোকতরঙ্গকে ঢেউসমষ্টি বলে কল্পনা করলে ভুল হবে, কারণ অনেক সময়ে সেটি ঠিক জড়ের মতো কণাসমষ্টিরূপেই

ফলোৎপাদন করে।

এই বিপ্লবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলিও তাদের উচ্চাসন অটল রাখতে পারছে না। নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম যে পরমাণুর রাজ্যে অচল তার প্রচুর প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। কাজেই আজ বৈজ্ঞানিক-মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছে যে, যত স্বতঃসিদ্ধ ও অনুমানের উপর বিজ্ঞানের এত বড় ইমারত খাড়া করা হয়েছে, তার ভিত্তিগুলো ভালো করে পরীক্ষিত হওয়া উচিত। নিয়মগুলির কতটা বা বৈজ্ঞানিক সত্য, কতটা বা আমাদেরই মনের বৈজ্ঞানিক কাঠামো তৈরী করার ন্যায়সঙ্গত প্রয়াস, সে-বিষয়েও অনুসন্ধান চলছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবধান ও সময়-নির্দেশ সম্বন্ধেও গবেষণা হচ্ছে। ব্যবধান, গতি ও সময়ের পরিমাণ, এই মাপজোখের উপরেই গতি-বিজ্ঞান ও পদার্থ-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত; আমরা যখন সেগুলিকে মাপজোখ করি তখন কি কি প্রচ্ছন্ন জিনিসকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই, তারও অনুসন্ধান চলছে। বলতে গেলে এটা হল বিজ্ঞানের আত্মপরীক্ষার যুগ। সাফল্যের উন্মাদনায় নিত্য নতুন আবিষ্কারের লালসায় উনবিংশ শতাব্দীতে যে-সমস্ত জিনিসকে বিশেষ বিচার না করেই ধরে নেওয়া হয়েছিল এখন বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করছেন সেগুলির সঙ্গে ভালো করে বোঝাপড়া করতে।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বিজ্ঞান-বিষয়ে প্রথম বাঙলা প্রবন্ধ 'বিজ্ঞানের সঙ্কট' 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩৩৮/অগস্ট ১৯৩১) সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত 'পরিচয়'-এর বিশেষ সংখ্যায় (পৌষ ১৩৭০/জানুয়ারি ১৯৬৪) প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়। লেখক সমবায় সমিতি প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথের 'বিজ্ঞানের সংকট ও অন্যান্য প্রবন্ধ' গ্রন্থে (শ্রাবণ ১৩৭১) প্রবন্ধটি ঈষৎ পরিমার্জিত আকারে প্রকাশিত হয়। এখানে গ্রন্থের পাঠই অনুসরণ করা হল —সম্পাদক

পরমজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ

অন্নদাশঙ্কর রায়

দেখতে দেখতে আমাদের 'বারোজনা'র তিনজনা চলে গেলেন। সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, প্রফুল্লকুমার গুহ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু। চল্লিশ বছর আগে ঢাকায় এঁদের সঙ্গে আমার আলাপ ও মাসে একবার একসঙ্গে বসা। বিভিন্ন বিষয়ে কীর্তিমান এঁরা। কোন গুণে যে আমাকে এঁদের মজলিশে নিলেন জানিনে। আর-একজন আই.সি.এস. আর্থার হিউজকেও নিয়েছিলেন। আর-সবাই ছিলেন শিক্ষাজগতের লোক। তাঁদের মধ্যে জনা দুই মুসলমান। অন্যভাবে ভাগ করলে সাহিত্যিক ছিলুম আমরা দুজন। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি। হয়তো সাহিত্যকে সেইভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হল।

কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথও ছিলেন সাহিত্যরসিক। এই সেদিনও তো তাঁর জন্মদিনে তাঁকে টেলিফোনে শতায়ুকামনা জানাতেই তাঁর বাংলা তর্জমার কথা ওঠে। রুশ লেখক বেবলের গল্প তিনি মূল রাশিয়ান থেকে নয়, ফরাসী ভাষান্তর থেকে অনুবাদ করেছিলেন। তার আগে জার্মান লেখক হাইনরিখ বো'লের গল্প মূল জার্মান থেকে। সেটি আমার নজর এড়িয়ে যায়। তা শুনে বলেন, "আছে আমার কাছে। পড়তে দেব।" একদিন আসব, দেখা করব, লেখা পড়ব বলে বিদায় নিই ও দিই। জানতুম না যে সেই হবে শেষ বিদায়।

জন্মদিনের মাস কয়েক আগে তাঁর বাড়িতে গিয়ে বিলম্বিত বিজয়া জানাই। সে সময় লক্ষ্য করি তাঁর হাতের কাছে একখানা মোটা গোছের ফরাসী পুঁথি। আমার কৌতূহল দেখে বলেন, "আচ্ছা, তোমার কি মনে আছে ১৯৩৯ সালে ফরাসীরা সেই যে জনাকয়েক কমিউনিস্টকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিচার করে তাদের কী হল।"

আমি তো তাঁর মতো শ্রুতিধর নই। কিছুই মনে ছিল না। বলি, "কিছুদিন

বাদে নাৎসীরা এসে পড়ল। সরকার দক্ষিণে সরে গেল। অমন এক বিভ্রাটের সময় কে কার বিচার করবে। ওরাও হয়তো পালিয়েছে বা নাৎসীদের হাতে মারা গেছে।"

তিনি বইখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দেন। বলেন, "এই খবরটা জানবার জন্যে প্যারিসে আমার বন্ধুদের চিঠি লিখেছিলুম। তার উত্তরে হাজির হয়েছে এই ইতিহাস। চোখে ভালো দেখতে পাইনে, খুঁজে বলো তো কোথায় লিখেছে ওদের কথা। কী লিখেছে?" আমি ফরাসী বুঝিনে। অত বড় গ্রন্থের কোন পাতায় কার উল্লেখ আছে কী করে জানব। ইনডেক্স পড়ি। কমিউনিস্টদের পাত্তা পাইনে।

ওখানা ছিল মূল ফরাসী নয়, ইংরেজীর থেকে অনুবাদ। বলি, "এ বই নিশ্চয় ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আছে। সেখানে অনুসন্ধান করলে হয়।"

অসাধারণ স্মৃতিশক্তি আর সেইসঙ্গে অসীম কৌতূহল। কৌতূহল হয়তো এক্ষেত্রে একজন মানবিকবাদীর মানবনিয়তি জিজ্ঞাসা। ওই কজন কমিউনিস্টও তো মানুষ। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মানবিকবাদ তাঁর অন্তরকে করেছিল সর্বপ্রকার মানবিক ব্যাপারে অন্বেষণরত। জীবনকে তিনি খণ্ড খণ্ড করে দেখতেন না। শান্তিনিকেতনেও দেখেছি তাঁকে ফরাসী বিপ্লবের ও তার পূর্ববর্তী কালের মূল ফরাসী ইতিহাসে নিমগ্ন থাকতে। আসলে কী ঘটেছিল সেটা তাঁকে জানতেই হবে। কেন জানতে হবে? কী দরকার? কী আসে যায়? তিনি তো পদার্থবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ। নিজস্ব বিষয় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন না কেন? এর উত্তর, তিনি ছিলেন আমাদের রেনেসাঁসের অন্যতম নায়ক। পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের নায়কদের মতো তিনিও সত্যের অন্বেষণ করতেন দিগ্‌বিদিকে। এটা আমার, ওটা পরের, এ গণনা তাঁর নয়। সবকিছুই তাঁর আপনার।

তাঁর মধ্যে আমি কোনোরকম গোঁড়ামি লক্ষ্য করি নি। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি কী ভাবতেন জানিনে। কোনোদিন সে প্রসঙ্গ ওঠে নি। মন্দিরে যেতে বা উপাসনায় বসতেও দেখি নি। শান্তিনিকেতন থেকে তাঁর বিদায়কালে যে সভা হয় তাতে এক অধ্যাপকের একটি উক্তি তাঁর মর্মে লাগে। সে সময় আবেগে অভিভূত হয়ে তিনি বলেন, "এই যে আমার হৃদয়—যাতে একদিন ভগবানের চরণস্পর্শ ঘটবে—একে কি আমি অপবিত্র করে রাখতে পারি!" ভগবানের সেই উল্লেখ পরে তিনি আমার প্রবন্ধ থেকে বাদ দিতে নির্দেশ দেন ডক্টর খাস্তগীরকে। বৈজ্ঞানিক হয়ে তিনি ভগবান মানেন এটা বোধহয় তাঁর

বৈজ্ঞানিক বন্ধু ও শিষ্যদের মনঃপূত ছিল না। তিনি যে অমন কথা বলেছিলেন সেটা নাকি তিনি অস্বীকার করেছিলেন। আমি এতে বিস্মিত হই, কিন্তু তাঁর নির্দেশ মান্য করি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে তিনি বাঙলায় ভাষণ দেন। অপূর্ব সেই ভাষণ। বাঁধাবুলি শুনতে অভ্যস্ত আমরা একজন মহান মনীষীর জ্বলন্ত বিশ্বাসের আগুন পোহাই। মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায় এই ভেবে যে, বিশ্বভারতীতে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব পরিবর্তন তিনি আনতে চেয়েছিলেন সেসব দেখে যেতে পারলেন না। আমিও উচ্চতর শিক্ষায় বাঙলা প্রবর্তনে তাঁর মতো উৎসাহী ছিলুম না। তবে জানতুম তাঁর প্রত্যয়ে তিনি হিমালয়ের মতো অটল। তাঁর উপযুক্ত স্মৃতিসৌধ হবে উচ্চতর শিক্ষায় বাঙলা প্রবর্তন। তবে যারা ইংরেজী চায় তাদের জন্যে একটু ঠাঁই রাখতে হবে।

ওদিকে যেটা তাঁর নিজের কাজ, অর্থাৎ বিজ্ঞানের পরীক্ষানিরীক্ষা, তার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর নামে ইতিমধ্যেই একটি চেয়ার স্থাপন করেছে। সেদিন সেখানকার উপাচার্য ডকটর আবদুল মতিন চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হল। তিনি বললেন যে সত্যেন্দ্রনাথের নামে বোস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তিনি বিশেষ চেষ্টা করছেন। সেটা কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একক প্রতিষ্ঠান হবে না। হবে কলকাতা ও ঢাকা উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ্ম প্রতিষ্ঠান। তা যদি হয় তবে একটা কাজের মতো কাজ হবে। রাজনৈতিক কারণে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে তারা হাতে হাত মেলাবে। এক হাতে যা হত না দুই হাতে তা হবে। সত্যেন্দ্রনাথের জন্মদিনে তাঁর ঢাকার শিষ্যরাও তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান। এতে তিনি সব চেয়ে খুশী হন। টেলিফোনে আমাকে বলেন, "জানো, ঢাকা থেকেও ওরা এসেছিল আজ আমাকে দেখতে। ওরাও আমার ছাত্র।" হাঁ, ওরাও তাঁকে মনে রেখেছে। মনে রাখবে।

কথায় কথায় একজন ডাক্তার বললেন আমাকে, কারো নাম উল্লেখ না করে, "ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্র—।" আমি জানতে চাই, "কে?" তিনি উত্তর দেন, "সত্যেন্দ্রনাথ বসু।" কখনো সেকথা ভাবি নি। এখন ভেবে দেখছি কাকে আমরা হারিয়েছি।

অবারিত দ্বার—বৈজ্ঞানিক অবদান

"অবারিত দ্বার" কথা দুটি পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়েছে। যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁদের এই কথার অর্থ বোঝানো নিষ্প্রয়োজন। তাঁর ঘরে ঢুকতে অনুমতির প্রয়োজন হত না। ২২নং ঈশ্বর মিল লেনের বাইরের ঘরটিতে তিনি থাকতেন—দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেলেই হত। বিজ্ঞান কলেজে যখন তিনি খয়রা অধ্যাপক ছিলেন তখনও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। "অবারিত দ্বার" শব্দদ্বয় প্রথম কবে লিখিত হয় বলা কঠিন। ১৩৭০-এর চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী'র উক্ত শিরোনামাধারী মন্তব্য থেকে হয়তো কিছু বোঝা যাবে। তাঁর সপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'শ্রদ্ধাঞ্জলি'তে কবি বিষ্ণু দে লিখিত একটি কবিতায় আছে "মাহাত্ম্যের কেল্লা নেই, অবারিত দ্বার।"

অল্প কিছুদিন আগে কলিকাতায় তাঁর অশীতিতম বর্ষপূর্তি ও বসু-সংখ্যায়নের অর্ধশতাব্দী পালিত হয়। তারপর একমাসও গেল কি গেল না, মাত্র কয়েক-দিনের অসুস্থতায় তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। বয়স আশি বৎসর হলেও তাঁর স্মৃতি ও মননশক্তি অমলিন ছিল, কথাবার্তায় মধ্যে মধ্যে চিরপরিচিত হাস্যরসের অভাব ঘটে নি। বৃদ্ধলোকের প্রায় অবধারিত যে সব শারীরিক অবনতি ঘটে থাকে শুধু সেটুকুমাত্রই তাঁর শরীরে ঘটেছিল—কোনো ব্যাধিও তাঁর ছিল না। হয়তো প্রয়োজন ছিল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি এবং আরও একটু বিশ্রাম। তাঁর বন্ধু, ছাত্র ও ছাত্রপ্রতিমেরা একথা জানতেন এবং সেইমতো আচরণ করতেন। ২রা ফেব্রুয়ারিও তাঁর আত্মীয়েরা তাঁকে কিছু পড়ে শুনিয়েছেন। অধ্যাপক নিজেও কাগজের উপর কয়েকটি সংখ্যা লিখেছেন (২৩-এ ফেব্রুয়ারির 'দেশ' পত্রিকায় এই লেখাগুলির একটি ছবি আছে)। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ভোরবেলা

সূর্য উদয় হওয়ার আগেই কিন্তু তিনি চলে গেলেন। তাঁর ছাত্রপ্রতিমেরা তাঁর অশীতিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নানা স্থান থেকে এসেছিলেন—বম্বে থেকে, ক্যানাডা থেকে। তাঁরা কি জানতেন এই সাক্ষাৎই শেষ সাক্ষাৎ হবে? জানুয়ারির মাঝামাঝি বিদায়ের দিনে অধ্যাপক বোস এদের কিছুতেই ছাড়তে চাইছিলেন না। আরও কয়েকটি বৎসর কি তিনি আমাদের মধ্যে থাকতে পারতেন না?

পঞ্চদশকের মাঝামাঝি কলিকাতায় তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা ও মিশ্র গণিতে যে সব ছাত্রেরা উৎসাহী ছিল তারা বিশেষ করে তাকিয়ে থাকত চারজন অধ্যাপকের দিকে। এই চারজন হলেন ডক্টর শীতেশচন্দ্র কর (দীর্ঘদিন ইনি বঙ্গবাসী কলেজে ও বিজ্ঞান কলেজে পড়িয়েছেন), ডক্টর মেঘনাদ সাহা, ডক্টর নিখিলরঞ্জন সেন ও অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় শীতেশ কর ও সবার হিতাকাংক্ষী শ্রদ্ধেয় মেঘনাদ সাহা তো ষষ্ঠ দশকেই বিদায় নিয়েছেন। পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেনও তাঁর আত্মীয়, বন্ধু ও ছাত্রদের ছেড়ে চলে গেছেন ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে—অসুস্থ হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত তিনি ছাত্রদের সাহায্য করেছেন। এই তিনজনের অনুপস্থিতিতে এদের ছাত্রপ্রতিমদের আড়াল করে রেখেছিলেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তাই পরিণত বয়সে হলেও অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মহাপ্রয়াণ এই ছাত্রগোষ্ঠীর (তারাও যদিও আজ প্রবীণ) বিরাট ক্ষতি।

বাংলা ভাষায় সাধারণবোধ্য বৈজ্ঞানিক রচনা দেখলে অধ্যাপক বোস অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। তাই তাঁর সঙ্গে একদা-যুক্ত 'পরিচয়' পত্রিকায় তাঁরই বৈজ্ঞানিক অবদানের আলোচনা করে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি।

অবদানগুলির আলোচনা করতে গেলেই প্রথমে মনে পড়ে আইনস্টাইন প্রশংসিত ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মৌলিক প্রবন্ধটির কথা। কিন্তু গত দু-মাস বহু পত্রপত্রিকায় এটি নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং এটির সম্যক আলোচনা না করে কিছু মন্তব্য করলেই হবে। "অবারিত দ্বার" কথাটিও এই সূত্রে এসে পড়বে। বস্তুত "অবারিত দ্বার" অধ্যাপকের বৈজ্ঞানিক অবদানের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত। এই প্রবন্ধের শিরোনামার এটিই কারণ।

প্রথমেই একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। একবার কণাতত্ত্বের (Quantum Mechanics-এর) দিকপাল বিশ্ববিশ্রুত পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক পি. এ. এম. ডিরাক সস্ত্রীক কলিকাতায় আসেন। একদিন অধ্যাপক বোস ডিরাকদম্পতি ও নিজের কয়েকটি ছাত্রপ্রতিম সহ একটি মোটরে যাত্রা করবেন। অধ্যাপক বোস ডিরাকদম্পতিকে মোটরের পিছনের আসনে বসিয়ে নিজে চালকের

পাশে সামনের আসনে বসলেন এবং ছাত্রদের সব কটিকে একে একে নিজের কাছে টেনে নিতে লাগলেন। তাঁর কাণ্ড দেখে স্বল্পভাষী ডিরাকও না বলে পারলেন না, "What are you doing?" সেই চিরপরিচিত ভঙ্গীতে ঘাড়টি হেলিয়ে অধ্যাপক ডিরাকের দিকে চেয়ে অধ্যাপক বোস সহাস্যে বললেন, "We believe in Bose-Statistics।" অধ্যাপক ডিরাক তখনই তাঁর পত্নীকে এই পরিহাসের অর্থ বোঝাবার জন্য বললেন, "In Bose-statistics things Crowd together।" কী তাৎপর্যপূর্ণ পরিহাস আর কী সংক্ষিপ্ত সরল ব্যাখ্যা। ঐ দিনের ঐ হাস্যোক্তি ছাড়া অধ্যাপক বোসের মুখে 'Bose-Statistics' কথাটি কখনও শুনি নি। সেদিন ঐ পরিহাসের মধ্যে believe কথাটি ব্যবহার করে যেন তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন এই তাঁর জীবন-দর্শন। তাই তাঁর ঘরে এত ভিড়। তাই তাঁর দ্বার অবারিত।

এইবার ব্যাপারটার বৈজ্ঞানিক দিক আভাসে বলা যায়। জগতের মূলউপাদান মৌলিক কণা (elementary particle)। নানা গোষ্ঠীর মৌলিক কণা আছে যেমন ইলেকট্রন, প্রোটন, মেসন ইত্যাদি। গোষ্ঠীর মধ্যে কিন্তু এরা সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিহীন। অর্থাৎ দুটি ইলেকট্রন যদি একটি এই ঘরে ও আরও-একটি পাশের ঘরে থাকে তাহলে ১নং ইলেকট্রনটি এই ঘরে এবং ২নংটি পাশের ঘরে আছে বলা সম্পূর্ণ অর্থহীন—কে ১নং আর কে ২নং তা বোঝার কোনোও উপায় নেই। এই মৌলিক কণাগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—যারা একত্র বহুসংখ্যক থাকতে পারে এবং যারা সর্বদাই একা থাকে। এদের প্রথম শ্রেণীর নাম অধ্যাপক বোসের নামানুসারে। এদের বলে 'বোসন'। অন্য শ্রেণীর নাম 'ফার্মিঅন'। স্বাতন্ত্র্যবিহীনতার ধারণা পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর দান। 'বোসন'-এর ধারণাও তাঁরই দান, যদিও এই নামকরণ অনেক পরে হয়েছে। 'ফার্মিঅন' পরে এই চিন্তাধারা অবলম্বন করেই হয়। এরপর আর কি বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে যে এই দান কত গুরুত্বপূর্ণ ও কতখানি সম্মান তিনি দেশবাসীর জন্য এনেছেন?

যদিও কারো কারো মনে এই ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে যে 'বোসন'ই অধ্যাপক বোসের একমাত্র উল্লেখযোগ্য দান, কিন্তু বহুলোকই জানেন যে এ কথা ঠিক নয়। অধ্যাপক বোস নানা বিষয়ে নানা সময় গবেষণা করেছেন। বস্থ-সংখ্যায়ন সম্বন্ধে কিন্তু ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে দুখানি প্রবন্ধের পর আর কিছুই ছাপান নি। নিকটতম ছাত্র ও ছাত্রপ্রতিমদের কিন্তু এর গভীরতর দিকটির প্রতি দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছেন। তাঁর ভাবটা ছিল "এবার তোরা কর—আমি আর কেন!" ছাত্রেরা অবশ্যই চেষ্টা করে চলছে—তবে অধ্যাপক বোস ঠিক যা চাইছিলেন তা করতে পারে নি। কী করছে তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার স্থান এটা নয়, কিন্তু তবু এই সূত্রে একটা ছোট ঘটনা বলা যায়। বসু-সংখ্যায়নের অর্ধশতাব্দী উপলক্ষে যে সব বক্তা নিজ নিজ চিন্তা ও গবেষণার বিষয়ে বক্তৃতা দেন তাঁদের মধ্যে এক অধিবেশনে অন্যতম বক্তা ছিলেন একটি তরুণ পদার্থবিজ্ঞানী ডক্টর পার্থসারথি ঘোষ। ইনি অধ্যাপক বোসের উক্ত প্রবন্ধ দুখানির পূর্ণ আলোচনা করার চেষ্টা করেন। তাঁর বক্তৃতার পর বহু প্রশ্ন ও আলোচনা ভিড় করে আসে। অধিবেশনের সভাপতি সাধারণত এসব ক্ষেত্রে মন্তব্যকারীদের অনুরোধ করেন মন্তব্য সংক্ষেপ করতে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা করা হয় নি। ব্যবস্থা হল ঐ অধিবেশনে আর অন্য কোনোও বক্তৃতা হবে না—মন্তব্যগুলিই বিশেষভাবে আলোচিত হোক। যদিও অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু চিরদিন তাঁর ছাত্রদের বলেছেন ১৯২৪-এ লেখা তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ভালো করে অনুধাবন করতে, কিন্তু উক্ত অধিবেশনের আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে তাঁর প্রথম প্রবন্ধটি সম্বন্ধেও খুব কম কথা ভাববার নেই।

অধ্যাপক বোসের অন্যান্য গবেষণার কথা বলতে গেলেও আবার "অবারিত দ্বার" বাক্যদ্বয় এসে উপস্থিত হয়। "অবারিত দ্বার"ই অনেক সময় তাঁর অনেক বৈজ্ঞানিক চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। অধ্যাপক বোসের দ্বার অবারিত পেয়ে নানা বিজ্ঞানী তাঁর কাছে নিজেদের প্রশ্ন ও চিন্তা নিয়ে এসেছেন। তাঁদের বিষয়টি সম্যক অনুধাবন করতে গিয়ে অধ্যাপক বোস অনেক সময়ই দেখতে পেয়েছেন যে সেই বিষয়বস্তুতে কিছু ফাঁক বা অসম্পূর্ণতা আছে। সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিনের জন্য সেই বিষয়টি নিয়ে তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেছেন। গবেষণাটি অবশ্য সব সময় মুদ্রিত করেন নি। অধ্যাপক বোসের অন্যান্য গবেষণার কথা একে একে বলা যায়।

বলা বাহুল্য 'বসু-সংখ্যায়ন' পদার্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত, সংখ্যায়নের (Statistics-এর) অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু সংখ্যায়নেও অধ্যাপক বোসের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা আছে। এই বিষয়ে তাঁর যে দুটি প্রবন্ধ মুদ্রিত আছে প্রয়াত অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ তার প্রভূত প্রশংসা করতেন। অধুনাও ঐ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের মুখে গবেষণাটির প্রশংসা শোনা যায়।

আয়নমণ্ডলের (Ionosphere-এর) নাম সাধারণের খুব অবিদিত নয়।

এখানে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়। বিষয়টির মূল ধরে নাড়া দিয়ে এ বিষয় নিয়েও অধ্যাপক বোস গবেষণা করেছেন।

যে গবেষণাগুলি এতক্ষণ আভাসে বর্ণিত হল সেগুলি অধ্যাপকের ঢাকায় থাকাকালীন কাজ। এগুলি ছাড়াও ঢাকায় থাকতে তিনি লরেন্‌জ গ্রুপ (Lorentz group) ও কণাতমতত্ত্বে (quantum theory-তে) গবেষণা করেন। এইবার ১৯৪৫-এ কলিকাতায় আসার পর তিনি কী করেন এই সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

কলিকাতায় এসেই অধ্যাপক বোস সাক্ষাৎ পান পরলোকগত অধ্যাপক বিধুভূষণ রায়ের শোকার্ত ছাত্রবৃন্দের। অধ্যাপক রায় তাঁর বিচক্ষণতায় ও অমায়িক ব্যবহারে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন আর ছাত্রদের মূল্যবান গবেষণায় উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁর ছাত্রেরা আজও তাঁকে স্মরণ করে। অধ্যাপক বোস এই শোকার্ত ছাত্রদের নিজের স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় দেন এবং তখন বিধুবাবুর ছাত্রেরা যে সব গবেষণা করছিল সেগুলি নিজের চিন্তার আলোকে আলোকিত করেন। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক বোসের একটি দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একটি যন্ত্র নির্মাণ করেন। ছাত্রেরা এই যন্ত্রটির নাম দিয়েছে—বিশ্লেষী বর্ণালীদীপ্তিমাপক (scanning spectrophotometer)। সমস্ত ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

এমন কয়েকটি বস্তু আছে যাদের উপর এক্স-রশ্মি বা অন্য কোনো রশ্মি ফেললে তাদের কিছু পরিবর্তন ঘটে। অনেক সময় তারা শ্বেতবর্ণ থেকে কোনো রঙীনবর্ণ ধারণ করে—তবে এই বর্ণ পরিবর্তনটা বড় কথা নয়, তাদের অভ্যন্তরে যে পরিবর্তন ঘটে সেটাই বড় কথা। এইবার বস্তুটিকে গরম করলে তা থেকে নানা বর্ণের রশ্মি ও তাপ বিকীরিত হতে থাকে। এই রশ্মিগুলির মোট তীব্রতা (intensity) মাত্র আগে মাপা যেত। অধ্যাপক বোস এমন একটি যন্ত্র নির্মাণ করলেন যাতে রশ্মিগুলির বিভিন্ন বর্ণালীর তীব্রতাও সহজেই মাপা গেল। ফলে এই বিষয়টির গভীরতর অধ্যয়ন সম্ভব হল। এই যন্ত্র তৈরির সময় একদিন দেখি তিনি যন্ত্রটি টেবিলের উপর রেখে নিজে আসন পিঁড়ি হয়ে টেবিলের উপর উঠে বসেছেন। এই যন্ত্রের নানা রূপ আজ বিশ্বে পরিচিত। অধ্যাপক বোসের এক ছাত্র পরে খড়্গপুরস্থ ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিষ্ঠানে (Indian Institute of Technology-তে) অধ্যাপনা করতে করতে যখন কয়েক মাসের জন্য লণ্ডনে যান তখন তাঁর কাছে শুনে অনেকেই অবাক হয়েছেন

যে এই বোসই 'বসু-সংখ্যায়ন' আবিষ্কর্তা। তাপপ্রভা (thermo-lumenescence) অধ্যয়নে এই যন্ত্রটি একটা নূতন পথ দেখিয়েছে।

অধ্যাপক বোস জৈব রসায়নে (organic chemistry-তে) বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। রসায়নেব বহু পত্রিকা বিজ্ঞান কলেজে তাঁর ঘবে এখনও রাখা রয়েছে। ঔষধেব কথা অনেক সময়ই তিনি চিন্তা করেছেন। একবাব একজন গবেষককে তিনি ঢাকা থেকে কলিকাতায় কিছু রাসায়নিক পদার্থ পাঠিয়ে দেন। কলিকাতায় এই গবেষকটির ঐ পদার্থ পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এই গবেষক বর্তমানে একজন বিখ্যাত লোক।

একবার উক্ত গবেষক একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থের রাসায়নিক পদ্ধতিতে যে বিশ্লেষণ করেছিলেন তা সঠিক কিনা এই বিষয়ে অধ্যাপক বোসের সঙ্গে আলোচনা করেন। অধ্যাপক বোস ঐ গবেষককে বলেন যে পদার্থটিব একটি স্ফটিক (crystal) যদি গবেষক অধ্যাপককে তৈরি করে দিতে পারেন তাহলে অধ্যাপক বোস এ বিষয় কিছু করাতে পারেন। ঐ গবেষক দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে স্ফটিকটি তৈরি করে দেন। অধ্যাপক বোস তখন ঐ স্ফটিকটি একস-রশ্মিব গবেষকদের দেন এবং তাঁদের দ্বারা পদার্থটির গঠন বিশ্লেষণ করান। যে সময়ে অধ্যাপক বোস দুই ধরনের বিশেষজ্ঞদের এইভাবে একত্রিত করেছিলেন সে সময় এই ধরনের একত্রীকরণ বিরল ছিল। অধ্যাপকের সমগ্রদৃষ্টি ও তাঁব গভীর জ্ঞানেব বহু পরিচয় নিয়তই পাওয়া গেছে। এটিও তাবই একটা ক্ষুদ্র উদাহরণ।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্বে (unified field theory-তে) অতি মূল্যবান একটি গবেষণা করেন। সমস্ত বিষয়টাব ইতিহাস এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। অধ্যাপক বোসের বিশেষ বন্ধু পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেনের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগে একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব আলোচিত হয়। একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্বের উদ্দেশ্য মাধ্যাকর্ষণ ও বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্রকে একসূত্রে গ্রথিত করা। এটি আইনস্টাইনের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। নানা ভাবে নানা গণিতজ্ঞ এটি চেষ্টা করেছেন। যাঁরা যাঁরা নূতন ধরনের একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রস্তাব করেছেন অধ্যাপক সীতেশ কর তাঁদের মধ্যে একজন। অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেনের নেতৃত্বে যে একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব আলোচিত হয় সেটি ১৯৪৫-এ আইনস্টাইন উদ্ভাবন করেন। ইতিপূর্বের বহু একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব বাতিল হয়েছে, কিন্তু আইনস্টাইনের

১৯৪৫ সালের তত্ত্বটি আজও নানা গবেষককে চিন্তিত করছে। এটি বাতিল হয় নি তো বটেই পরন্তু এটা বহু গভীর সত্যের আভাস বহন করছে বলে মনে হয়। শ্রডিংগার (Schroedinger) ১৯৪৭ সালে অনুরূপ তত্ত্ব প্রস্তাব করেন। ফলে অনেকের এই তত্ত্বের প্রতি গভীর আস্থা আছে। অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেনের আলোচনাচক্র বসত তেতলায়—অধ্যাপক বোস বসতেন নিচের তলায়—ছাত্রেরা তাই অনেক সময় এঁদের 'উপরের মাস্টার মশায়' ও 'নিচের মাস্টার মশায়' বলত। 'নিচের মাস্টার মশায়' কিন্তু নিচের ঘর থেকে সব সংবাদ পেতেন। সে সময় তিনি এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহীকে খুব সুন্দর ভাবে একীকৃততত্ত্বের বহু মূল চিন্তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এর পর ঐ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ হয় এবং ১৯৫১ নাগাদ দুটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধদুটির একটি শ্রডিংগারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও শ্রডিংগার ঐ প্রবন্ধটির সমালোচনা করে ***Nature*** পত্রিকায় ছাপান। চুম্বকের দুই রকম আধান (Charge) বৈদ্যুতিক আধানের মতো স্বতন্ত্র থাকতে পারে কি না এই গভীর প্রশ্নকে ছুঁয়ে গেছে ঐ আলোচনা। অন্য প্রবন্ধটি কিন্তু অন্য একটা প্রশ্ন নিয়ে। প্রশ্নটির অতি অল্প অংশই কিন্তু তখন সমাধান হওয়া সম্ভব হয়েছিল। এই সমাধান না করতে পারার কারণ এই যে আইনস্টাইন এবং শ্রডিংগার উভয়ের তত্ত্বেই প্রথমে ৬৪টি সমীকরণ সমাধান করা প্রয়োজন। এটি অত্যন্ত দুরূহ কাজ। এটিকে পাশ কাটিয়ে যে কোনো প্রশ্ন যতটা করা যায় তা-ই এযাবৎ করা হয়েছিল। ১৯৫২-র প্রথমেই কলিকাতায় যখন বিজ্ঞান কংগ্রেস চলছিল তখন একদিন অধ্যাপক বোসের ঘরে সাধারণ আপেক্ষিকতাতত্ত্ব (general theory of relativity) এবং একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব নিয়ে একটা ঘরোয়া আলোচনা হয়। এই আলোচনায় গুজরাটের একজন বিশিষ্ট গবেষকও উপস্থিত ছিলেন। এরই কিছুদিন পর থেকে অধ্যাপক বোস ঐ ৬৪টি সমীকরণের সমাধানের চেষ্টা করতে থাকেন। ঐ সমীকরণগুলির সম্বন্ধে শ্রডিংগার বলেছেন যে চেষ্টা না করলে বোঝা যাবে না এগুলি কত দুরূহ। মাত্র কয়েকমাসের মধ্যেই অধ্যাপক বোস সমীকরণগুলির সুন্দর একটি সমাধান দেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ***Annals of Mathematics*** পত্রিকায় এটি মুদ্রিত হয়। ***Annals of Mathematics*** পত্রিকাটিকে গণিতের পত্রিকানিচয়ের রাজা বললেই হয়। এর দ্বারে পৌঁছবার সুযোগ বড়ই দুষ্কর। অধ্যাপকের গবেষণা থেকে সূত্র পেয়ে শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ ঐ বিষয়ে সমাধানগুলিকে বিশেষ ক্ষেত্রে একটা সহজ সূত্রে ফেলেন এবং এই থেকে ১৯৫১-র অংশত সমাধিত প্রশ্নটি নিয়ে আবার

চেষ্টা আরম্ভ করা সম্ভব হয়। ডক্টর রমাতোষ সরকার, ডক্টর জে. আর. রাও ও ডক্টর আর. এন. তেওয়ারি কয়েক বৎসর পরিশ্রম করে আইনস্টাইন ও শ্রডিংগার-তত্ত্বের ঐ বিশেষ প্রশ্নের পূর্ণ সমাধান পান। এ বিষয়ের শেষ প্রবন্ধটি এখন মুদ্রিত হয় হয়—অন্যান্যগুলি অবশ্য দীর্ঘদিন আগেই মুদ্রিত হয়েছে। অধ্যাপক বোস এ ছাড়াও আরও চারটি প্রবন্ধ একীকৃততত্ত্ব সম্বন্ধে লিখেছেন। কিন্তু শুধু ঐ প্রথমটিব কথা ভাবলেই অবাক হতে হয় না কি? কত জনের জন্য রুদ্ধ দ্বার তিনি খুলে দিলেন। কিন্তু তারপর? ঐ পাঁচখানি প্রবন্ধ ছাপাবার পর? তারপর তিনি ঐ বিষয়ে যে কিছু করেছেন সে কথা পর্যন্ত কাউকে বলতেন না। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সময় একটি সভায় একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব আলোচনাব সময় অধ্যাপক বোস বলেন যে দশ বৎসর আগে যা কাজ তিনি করেছেন তা আর তাঁর মনে নেই এবং পরের কর্মীদের কাজের কৃতিত্ব তাঁদেরই। তাঁর গবেষণার উপব নির্ভর করেই যে সব কিছু একথা তিনি আভাসে মাত্রও বললেন না।

এই হল অধ্যাপক বোসের গবেষণার আংশিক তালিকা। সম্পূর্ণ তালিকা প্রবন্ধ দীর্ঘ করবে। তা ছাড়া তাঁর বহু গবেষণা তিনি মুদ্রিত করেন নি। ম্যাজিক স্কোয়ার নিতে খাতার পর খাতা তাঁকে কষতে দেখেছি। একটি জ্যামিতিক প্রশ্নের সমাধান করতে দেখেছি ঈশ্বর মিল লেনের বাড়ির খাটটিতে বসে। কোথায় গেল সেগুলো?

কিন্তু গবেষণাগুলির সম্পূর্ণ তালিকার চেয়ে বলা বেশি প্রয়োজন গবেষণা বিষয়ে তাঁর মনোভাব কী ছিল। বয়সের সঙ্গে গবেষক হওয়ার যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁকে কোনো নিয়ম মেনে চলতে দেখি নি। তরুণ এক যুবক কয়েক বৎসর আগে তাঁর কাছে মৌলিক কণা সম্বন্ধে গবেষণা শেষ করেছেন। আবাব অকৃতদার এবং অধ্যাপক বোসের চেয়ে একটু অল্প বয়স্ক এক বৃদ্ধও তাঁর কাছে গবেষক ছিলেন। ইনি সারা জীবন গবেষণা ছাড়া প্রায় কিছুই করেন নি। গবেষণার প্রতি সত্যকারের অনুরাগ কার আছে আর কার নেই বুঝতে অধ্যাপক বোসের বিলম্ব হত না। ১৯৪৫-এ কলিকাতায় বিজ্ঞান কলেজে এসে তিনি দেখা পেয়েছিলেন কয়েকটি ছাত্রের যারা স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করে গবেষণা করছে। সেদিন গবেষণার কোনো মূল্যই ছিল না সমাজের কাছে। এই ছাত্রদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না। এরা কিন্তু সকলে তাঁর নিজের ছাত্র নয়।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে, গবেষণার ক্ষেত্রে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বোস বহু পথিক চিহ্নিত চিরাচরিত পথে বিচরণ করেন নি। মুগ্ধ মনে তিনি ছিলেন কোনো এক বিপথের পথিক। তাই বহু বিজ্ঞানী ও সাধারণ লোক তাঁকে বুঝতে ভুল করেছে। তাঁর বহু প্রাপ্য সম্মান তিনি পান নি বা বিলম্বে পেয়েছেন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে তিনি F. R. S. ছিলেন না। ৫ই ফেব্রুয়ারির ***Statesman***-এ পড়ি: he was content with somewhat wayward exploration of his brilliant mind। এই উক্তি ঐ ভুল বোঝার একটি নিদর্শন। তাঁর বেছে নেওয়া বিপথটিকেই তিনি যে ঠিক পথ মনে করেছেন! আসলে বিজ্ঞানের বর্তমান পথটিই বোধহয় ঠিক পথ নয়।

অধ্যাপক বোসের বিপথ-যাত্রা সংক্রমিত হয়েছে তাঁর স্নেহধন্য ছাত্র ও ছাত্রপ্রতিমদের মধ্যে। তারা যে ঠিক তাঁরই বিপথটি গ্রহণ করেছে তা নয়, তারা নিজ নিজ বিপথ বেছে নিয়েছে।

অধ্যাপক বোসের বন্ধুবাৎসল্য, তাঁর সঙ্গীতানুরাগ, তাঁর সাহিত্যপ্রীতি এই প্রবন্ধে আলোচ্য নয়; তবু মনে হয় তিনি যদি রুদ্রবীণা নির্মাণে সাহায্য করে থাকেন তাহলে সেটাও কি একরকম বিজ্ঞান নয়! তিনি বহুজনের অতি প্রিয়, অতি শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন।

তাঁকে প্রণাম করছি

গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু : শ্রদ্ধাঞ্জলি

দিলীপ বসু

ইংরাজিতে যাকে legendary figure (বা কিংবদন্তীর নায়ক) বলে, অতি অল্প লোকই তাঁদের জীবদ্দশায় সেরকম স্থান অধিকার করেন। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে কিংবদন্তীর নায়ক বলা যায় কি না, জানি না। তবে তাঁর সম্পর্কে অনেকখানি সত্য আর কিছুটা কল্পনা জড়িয়ে বহু গল্প যে প্রচলিত আছে, তার কারণ নিশ্চয়ই হচ্ছে—তিনি ছিলেন সেই রকমের মনীষী, যিনি শুধু একাধারে বড় বৈজ্ঞানিকই ছিলেন না, জীবনের বহু বিচিত্র ক্ষেত্রে অনায়াস আর স্বচ্ছন্দ বিচরণ করার যাঁর ছিল অবাধ ক্ষমতা। অনুজ যারাই তাঁর সম্পর্কে আসতে পেরেছে, তারাই তাঁর অকৃপণ স্নেহধারাতে আপ্লুত হয়ে ধন্য হয়েছে ; অনেক সময়েই অযাচিত অপ্রত্যাশিত সাহায্যে হয়েছে বিস্মিত ও মুগ্ধ।

এরকম স্নেহপ্রবণ মানুষ তো দুর্লভ। তাঁর বিশাল মনের গভীর তলদেশের হদিশ তো পাওয়া যায় না। কোনোদিন বিকালের ম্লান আলোকে দেখেছি, আদুর গায়ে উপুর হয়ে শুয়ে পাতার পর পাতা জুড়ে অঙ্ক কষছেন, তখন কথা বললে ঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না—মন কোনো কারণে বিষাদে মগ্ন থাকলে গলার স্বর নামবে যেন তোড়ীর মন্দ্র ধৈবতে। আবার তাঁকেই দেখেছি পাড়ার ছোট ছেলেদের সযত্নে অঙ্ক করিয়ে দিচ্ছেন বা ইতিহাস পড়াচ্ছেন। প্রসঙ্গত, শোভাবাজার ও গোয়াবাগান এথলেটিক ক্লাব এবং যাত্রিক সংঘের ছেলেরা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ভাবে তাঁর শ্মশানযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করেছিল। এর একটা কারণ বোধহয় এই যে, তাদের কাছে তিনি ছিলেন সমস্ত (গোয়াবাগান থেকে শোভাবাজার অবধি) পাড়ার দাদু, যে দাদু সময়ে অসময়ে অঙ্ক কষে দিয়ে সাহিত্য ও ইতিহাস পড়িয়ে এবং আরো নানাভাবে তাদের অকৃপণ সাহায্য করত। পশ্চিম বাঙলা গভর্নমেন্টের অবশ্যই রাষ্ট্রীয় মর্যাদা সহকারে

তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শবাধার বহনের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল যেমন করেছিল বুর্জোয়া ফরাসি গভর্নমেন্ট কমিউনিস্ট বৈজ্ঞানিক জোলিও কুরীর মৃত্যুতে।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতামত সুস্পষ্ট ছিল না, মার্কসবাদ তিনি নিশ্চয়ই গ্রহণ করেন নি, কিন্তু জনগণের একেবারে একান্ত নিজের মানুষ ছিলেন বলে তাঁকে শান্তি আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে বহু প্রগতিশীল আন্দোলনের পুরোভাগে আমরা পেয়েছি। আর তাই প্রগতিশীল 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে একেবারে জন্মলগ্ন থেকেই তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

বড় বৈজ্ঞানিকের জীবনে তিনটি স্তর পাওয়া যায়: প্রথম জীবনে তিনি সাধনাতে মগ্ন, দ্বিতীয় জীবনে সৃষ্টি করছেন, তৃতীয়তে তিনি যা সংগ্রহ ও সৃষ্টি করেছেন তা বিতরণ করছেন জনারণ্যে। অল্পবিস্তর সব বৈজ্ঞানিকই নিশ্চয়ই প্রথমটি, বেশ কিছু দ্বিতীয়টি অবধি যেতে পারেন ; কিন্তু অতি অল্প বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যেই তৃতীয় স্তর অবধি যাবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক প্রতিভাতে এই তিনটি স্তরকে বেশ পরিষ্কার পর পর না সাজিয়ে দেখলে তাঁকে সম্যক বোঝা যাবে না, খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গীতে মনে হবে তিনি কেবলমাত্র বড় বৈজ্ঞানিক ও 'অন্যমনস্ক প্রফেসার' (absent minded professor বলতে ইংরাজিতে ঠিক যা বুঝি) এবং এতোই আড্ডা-প্রিয় ও আপনভোলা যে নিজের আসল কাজটি প্রথম যৌবনে আইনস্টাইনের সঙ্গে করলেও পরে আর কিছু করেন নি।

আমরা ইচ্ছা করেই এই প্রশ্ন তুলছি কারণ এরকম একটা ধারণা, প্রায় অপবাদ, তাঁর সম্পর্কে চালু আছে।

সাধনা ও সৃষ্টি

১৯১৫ সালে একুশ বছর বয়সে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে আজীবন বন্ধু মেঘনাদ সাহার সঙ্গে গণিতে এম. এ. (তখনও এম. এস-সি. নামটি চালু হয় নি) পাশ করলেন। উচ্চ চাকুরী ও বিত্তের লোভ ত্যাগ করে বিজ্ঞানের মাধ্যমে দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন তিনি ও মেঘনাদ সাহা। পারমাণবিক জগতে তখন চলেছে কোয়ানটামবাদের নতুন তত্ত্ব ও হিসাব, আর ওদিকে আইনস্টাইন প্রথমে ১৯০৫-এ তাঁর বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব, পরে ১৯১৫-তে তাঁর সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রতিপাদ্যে এবং কাল বা সময়কে চতুর্থ মাত্রা (fourth dimension) ঘোষণা করে পদার্থ-জগতে বৈপ্লবিক

আলোড়নের সৃষ্টি করছেন। সদ্য এম. এ. পাশ করা দুই তরুণ যুবক সত্যেন বোস (এইভাবেই নিজেকে বলতে উনি ভালোবাসতেন) ও মেঘনাদ সাহা কলকাতায় অবস্থানকারী জার্মান প্রফেসার ব্রুলের কাছে জার্মান শিখে পদার্থ-জগতের এই নতুন জ্ঞানকে আহরণ করলেন।

বিদেশে আরো শিক্ষালাভ করার জন্য মেঘনাদ সাহা স্কলারশিপ পেলেন। কিন্তু স্বয়ং স্যার আশুতোষের চেষ্টা সত্ত্বেও সত্যেন বোসের কপালে তেমন কিছু জুটল না—অজুহাত, তাঁর তখন বিবাহ হয়ে গেছে। যাই হোক, ১৯২১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হলে সেখানে পদার্থ-বিভাগে সাধারণ লেকচারারের পদে অধ্যাপনা করতে সত্যেন বোসের ডাক পড়ল। এর পরেই অবশ্য ঐ ঢাকাপর্বেই ১৯২৪-এ 'বোস-সংখ্যায়ন' ইত্যাদি—যার কথা এই সংখ্যাতেই অধ্যাপক গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ভালো করেই বলেছেন। এর পরেও অবশ্য একনাগাড়ে ১৯৪৫-৪৭ অবধি ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা-কালে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকাতে তাঁর অনেকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ বেরিয়েছে, যার পুরো তালিকা প্রণয়ন করার কাজটা হয়তো এখনও বাকি রয়েছে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের এদিকটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার স্থান নিশ্চয়ই এখানে নয়। আমরা বিশেষ করে তাঁর জীবনের শেষ ২৭ বছরের, স্বাধীনতা-উত্তর যুগের, কথা আলোচনা করব।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপন

জনমানসে বিজ্ঞানশিক্ষা প্রচার ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে তোলার জন্য আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের ছিল নিরলস প্রচেষ্টা। তিনি জাত-শিক্ষক ছিলেন। তাঁর অনেকগুলি হাতে-গড়া ছাত্র আজকে বৈজ্ঞানিক জগতে বিশিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত।

চল্লিশ দশকের শুরুতেই ঢাকায় তিনি 'বিজ্ঞান-পরিচয়' নামে বাঙলা পত্রিকা প্রকাশ করলেন। আনন্দের কথা, মৃত্যুর মাত্র একমাস পূর্বে ১লা জানুয়ারিতে বিজ্ঞান পরিষদের উৎসবে আজকের বাঙলাদেশের ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্যের উপস্থিতিতে সে-কথা তিনি সানন্দে ও সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন।

১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের প্রায় একক চেষ্টাতে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার যাত্রা শুরু হল। আপার সার্কুলার রোডে (পরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড) বিজ্ঞান কলেজের

প্রায় উল্টো দিকে একতলার একটি সামান্য ছোট ঘরে এর কাজ শুরু হয়েছিল। আজ অবশ্য রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটের নিজস্ব একতলা বাড়িতে হলঘরও আছে, আশা আছে আগামী দিনে দ্বিতলে স্থায়ী বিজ্ঞান-প্রদর্শনী করা সম্ভব হবে।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা ছাড়া বিজ্ঞানের প্রচার জনসাধারণ্যে সম্ভব নয়—একথা যেমন বুঝেছিলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ, তেমনি তাঁর আগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, আর তারও আগে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ইংরাজিতে বিজ্ঞান সম্পর্কে সহজ-বোধ্য জনপ্রিয় প্রচুর বই আছে, চালু কথাটাই হচ্ছে 'Popular Science'। সত্যেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বাঙলা ভাষাতে সহজবোধ্য সুখপাঠ্য বিজ্ঞানের বই লেখা হোক। তাছাড়া, উচ্চশিক্ষার জন্যও বাঙলা তথা মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষা দিতে হবে—বলা যেতে পারে এটা ছিল আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পঁচিশ বছরের প্রায় একমাত্র 'প্যাসন'।

এখন অবশ্য এটা খানিকটা চালু হয়েছে, বাঙলাতে কিছু কিছু বই লেখা হলেও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরাজির মোহ আমরা এখনও ছাডতে পারি নি। অথচ আজ থেকে প্রায় ৩৭ বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের জন্যে লিখলেন 'বিশ্বপরিচয়' —উৎসর্গ করলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে, খানিকটা কুণ্ঠাভরে। কিন্তু বইয়ের ভূমিকায় বৈজ্ঞানিক মানস সৃষ্টি ও জ্ঞানবৃদ্ধির কাজে জনপ্রিয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক বই লেখার কথা তিনি স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ভূমিকাতে লিখছেন সত্যেন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে :

> "এই বইখানি তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করছি। বলা বাহুল্য এর মধ্যে এমন বিজ্ঞানসম্পদ নেই যা বিনা সংকোচে তোমার হাতে দেবার যোগ্য। তা ছাড়া, অনধিকার-প্রবেশে ভুলের আশঙ্কা করে লজ্জা বোধ করছি, হয়তো তোমার সম্মান রক্ষা করাই হল না।…
>
> "শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই। সেই দায়িত্ব নিয়েই আমি এ কাজ শুরু করেছি। কিন্তু এর জবাবদিহি একা কেবল সাহিত্যের কাছেই নয়, বিজ্ঞানের কাছেও বটে। তথ্যের যাথার্থ্যে এবং সেটাকে প্রকাশ করবার যাথাযথ্যে বিজ্ঞান অল্পমাত্রও স্খলন ক্ষমা করে না। অল্পসাধ্যসত্ত্বেও যথাসম্ভব সতর্ক হয়েছি। বস্তুত, আমি কর্তব্যবোধে লিখেছি, কিন্তু কর্তব্য কেবল

ছাত্রের প্রতি নয়, আমার নিজের প্রতিও। এই লেখার ভিতর দিয়ে আমার নিজেকেও শিক্ষা দিয়ে চলতে হয়েছে। এই ছাত্র-মনোভাবের সাধনা হয়তো ছাত্রদের শিক্ষাসাধনার পক্ষে উপযোগী হতেও পারে।

"আমার কৈফিয়তটা তোমার কাছে একটু বড়ো করেই বলতে হচ্ছে, তা হলেই এই লেখাটি সম্বন্ধে আমার মনস্তত্ত্ব তোমার কাছে স্পষ্ট হতে পারবে।...

"আজ বয়সের শেষ পর্বে মন অভিভূত নব্য প্রাকৃততত্ত্বে—বৈজ্ঞানিক মায়াবাদে।"...

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে আমরা অঙ্গীকার করব যে, অচিরে—অন্তত আমাদেরই জীবদ্দশায়—সর্বস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা চালু করতে পারব। অনেকে পরিভাষায় স্বল্পতার দোহাই দেন। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের মত ছিল—ভাষার প্রধান কাজ যেখানে অর্থের বাহন, যেন একটা নিশানা মাত্র, সেখানে আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত শব্দগুলিকে ব্যবহার করায় কোনো দোষ বা আপত্তি নেই। সর্বাপেক্ষা সোজা উদাহরণ—'অকসিজেন'। মূল শব্দটি গ্রীক—অকসি অর্থাৎ এসিড, জেন মানে তৈরি হচ্ছে—অর্থাৎ যে গ্যাস থেকে এসিড তৈরি হচ্ছে। এটাই ছিল গ্রীকদের ধারণা, অকসিজেন গ্যাস সম্পর্কে। অতএব তাকে আক্ষরিক অর্থে 'অম্ল-জান' করে নতুন পরিভাষার সৃষ্টি করলে জটিলতা বাড়বে। আবার 'এ্যাটম' গ্রীক শব্দটির অর্থ হল 'অবিভাজ্য', গ্রীকরা তাই মনে করত। কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রায় দু-হাজার বছর ধরে 'এ্যাটম' অর্থে 'পরমাণু' কথাটি চালু, অতএব ধারণার বা বোঝার সুবিধার্থে এ্যাটমের বিকল্পে পরমাণু শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

আজকে দেশে একদিকে যেমন শিল্পায়ন হচ্ছে এবং বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির বহুল ব্যবহার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখা যাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি অন্ধ কুসংস্কারও বোধহয় বাড়ছে। তাকে ঠেকাতে হলে দরকার বিজ্ঞানশিক্ষাদান, বৈজ্ঞানিক মনোভাব সৃষ্টি। দুটোই মাতৃভাষা ছাড়া হতে পারে না—আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় এটা যে বোঝাবার দরকার হয়, সেটাই দুঃখের বিষয়।

আমরা তাঁর মহান জীবনের সেই বিরাট প্যাসনকে (grande passion) পালন করব—এটাই হবে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততি জন্মদিনে

বিষ্ণু দে

যাঁকে চেনা মনের একটি জয়, মানবিক বড় অভিজ্ঞতা।
আশ্চর্য সে-মন, সর্বদিকে ব্যাপ্তি, শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে
সংগীতে ; অথচ নিত্য জীবনসম্ভোগে, এমন কি জর্দা-পানে,
ধূমপানেও—কিংবা ধূমপান ছেড়ে ! বয়স্কের মামুলি বিজ্ঞতা,
এ-জগতে প্রজ্ঞার যা বেশ, সেই যথোচিত ভারিক্কি মাহাত্ম্য,
সিদ্ধিপ্রাপ্ত বৃদ্ধ আত্মপ্রীতি নেই ; নেই কিছু বর্জনের নীতি।
সকল বিষয় আর সর্বজীবে নির্বিশেষ সন্ন্যস্ত সম্প্রীতি,
প্রবল বাঙালি এই বিশ্বমানবের বক্ষে কেউ নয় ব্রাত্য।

জিজ্ঞাসার অন্ত নেই—দুর্গম শূন্যের তত্ত্বের তথ্য দৈনন্দিনে
সন্ধিৎসা প্রখর সদা, জানি না এ-অতিমস্তিষ্কের জটিলতা
কোথায় পেয়েছে তার আত্মভোলা নির্বিকার প্রসাদ সাত্ত্বিক।
অথচ হৃদয়বত্তা দুর্লভ নির্বোধে মূর্খে, সস্তা বেচে কিনে
যাদের প্রত্যহ যায়, তাই বিশ্বে কূট ঘৃণা, লুব্ধ দুঃশীলতা।

এ-জাতক শৈশবেই প্রতিভায় মহাপ্রাজ্ঞ, শতজন্মদিনে
জরা কেশাগ্রেই ক্ষান্ত ; সপ্ততি শিশুর শতবর্ষ স্বাভাবিক॥

১০ ডিসেম্বর ১৯৬৩
সেই অন্ধকার চাই / ১৩৭৩

ব্যক্তিত্বের বিখণ্ডন

ম্যাকসিম গোর্কি

[শেষাংশ]

নারীদের সম্পর্কে মনোভাবে যে-আকস্মিক পরিবর্তন হয়েছে, তা রুশ সমাজের নীতিবোধের ক্ষেত্রে অধঃপতনের পরিচায়ক।

রুশদের মধ্যে স্মৃতিশক্তির ক্ষণস্থায়িত্ব একটা পুরনো ব্যাপার, সেই ক্ষণস্থায়িত্ব ধরে নিয়েও, আশা করি তাঁদের একথা স্মরণ করিয়ে দেবার দরকার নেই রুশ নারীরা তাদের দেশের, কী ঐতিহাসিক সেবা করেছেন, রুশ সমাজজীবনে তাঁদের বিরাট অবদান এবং তাঁদের নির্ভীক কীর্তির কথাও স্মরণ করিয়ে দেবার দরকার নেই। মারফা বোরেৎস্কায়া ও মোরোজোভা[১] থেকে শুরু করে 'রাসকোলনিক' অরণ্যপ্রান্তের ও বিপ্লবী দলগুলির নারী পর্যন্ত আমরা আমাদের সামনে এমন সব ব্যক্তিদের দেখতে পাই যাঁরা তাঁদের মহিমায় মহিয়সী।

রাজসিক সারল্য, ভানের প্রতি ঘৃণা, নিজের সম্পর্কে প্রশান্ত গর্ব, দুর্লভ মন, সীমাহীন ভালোবাসায় পূর্ণ সুগভীর হৃদয় এবং নিজের স্বপ্ন চরিতার্থ করার জন্য আত্মোৎসর্গ করার শান্ত প্রস্তুতি—এই জ্ঞানী ভাসিলিসার চরিত্রগুণ, শব্দ ও রূপ-কল্পের পুরনো মহৎ শিল্পীরা, আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, সাম্প্রতিক রুশ ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা যেসব গুণকে এত চমৎকার ভাবে, সযত্নে চিত্রিত করেছেন।

কোনো দুর্লভ অবকাশে, কষ্টকর পথচলার মাঝে তিনি হয়তো অনুযোগ-ভরে জিজ্ঞাসা করেছেন :

১. মারফা বোরেৎস্কায়া—১৫শ শতাব্দীতে নভগোরোদের শাসকদের অন্যতমা।
এফ. মোরোজোভা (মৃত্যু ১৬৭২) 'রাসকোলনিক' আন্দোলনের বিশিষ্টা নেত্রী। পৌভ্রা একটি মঠে বন্দী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

"এই অত্যাচার কতক্ষণ চলবে, আর্চপ্রিস্ট ?"

"তোমার মৃত্যু পর্যন্ত" এই উত্তর শুনে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন "তবে তাই হোক ; কষ্ট করে আরেকটু এগিয়ে যাই।"[১]

আর আজ এই ধরনের নারী, বস্তুত আমাদের দেশের স্থ-প্রতিভা, হঠাৎ জীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে ছায়ামূর্তির মতো। তার স্থান গ্রহণ করেছে "ডবকা ছুঁড়িরা"[২] যাদের উপরে আরোপ করা হয়েছে একান্ত যৌনজীবন ও নানান ধরনের যৌনবিকারের উদগ্র কামনা। এই সব মেয়েরা নিজেদের নগ্ন মূর্তি প্রদর্শন করতে বাধ্য হয় এবং তাদের শ্লীলতাহানি অনিবার্য।

বলাৎকার এক ধরনের অবসরবিনোদন হয়ে উঠেছে: আমরা পড়ি ক একজন মেয়েকে বলাৎকার করেছে আর খ করেছে তিনজনকে ; গ যদি তার বয়োবৃদ্ধা জ্যেঠি-খুড়িকে ধর্ষণ করে থাকে তবে ঘ করেছে তার নিজের মেয়েকে। আমাদের লেখকদের মধ্যে যে ফিলিস্টাইনিজম এত দ্রুতগতিতে এসেছে, তারই প্রভাবে তারা সব বয়সের ও সব ধরনের রক্তের সম্বন্ধের মেয়েদেরই শ্লীলতাহানি চিত্রিত করছে। অভিনবত্ব অর্জনের জন্য আমাদের সাহিত্যিকদের এখন দৃষ্টি ফেরাতে হবে বানমাছ, কাক আর ব্যাঙের দিকে। অনুসরণ করতে হবে এমন এক সাহিত্যিকগোষ্ঠীর যারা লোকের রুচির কাছে নতিস্বীকার করে প্রবৃত্ত হয়েছে মার্জার-জীবন-অধ্যয়নে।

আমাদের সাহিত্যসেবীদের মনকে যা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে সেই পর্নো-গ্রাফির এই বন্যা এত দ্রুত ফুলে-ফেঁপে উঠেছে এবং এত বিকট রূপ ধারণ করেছে যে সৎ ও বিবেকবান সকলেই তাতে হতবাক হয়ে গেছেন—তাঁদের সকলেই ধূলিচুম্বন করেন নি! এবং আজও পর্যন্ত মনে হয় তাঁরা তাঁদের শক্তিকে এমন-ভাবে সমাহৃত করতে অক্ষম যাতে রাশিয়ার নারীজাতির প্রতি—কুমারী, স্ত্রী ও জননীদের প্রতি—এত অধ্যবসায় সহকারে নিক্ষিপ্ত পঙ্কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যায়।

---

১. রাশিয়ায় প্রথম ·দিককার 'রাসকোলনিক' নেতাদের অন্যতম আর্চপ্রিস্ট আভভাকুমকে (১৬২১-১৬৮২) উদ্দেশ করে তাঁর স্ত্রীর উক্তি। তিনি স্বামীর দুঃখকষ্টের শরিক হয়েছিলেন, জার সরকারের হুকুমে ১৬৮২তে আভভাকুমকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। এঁর 'আত্মজীবনী' ১৭শ শতকের রুশজীবনের এক মূল্যবান দলিল।

২. আমি বলে রাখতে চাই, এ প্রবন্ধে আমি যদি কিছু অশালীন ভাষা ব্যবহার করে থাকি, তবে তা সেই রকমই ভাষা, ইদানীং পত্রপত্রিকায় যা ব্যবহৃত হচ্ছে।—লেখকের মন্তব্য।

সৎ ব্যক্তিরা যদি এই ঘৃণ্য ব্যাপারটির উৎস পরিষ্কারভাবে দেখতে না পান তাহলে এক্ষেত্রে তাঁরা শ্রীবেরদিয়ায়েভের কাছ থেকে আলোক পেতে পারেন। ইনি ওয়েইনিঙ্গারের বইটি রুশ ভাষায় তর্জমা হবার আগেই পড়েছেন। পশ্চিমে তৈরি সৌষ্ঠবপূর্ণ মাজ্জিত পোশাক, ইওরোপীয় ফিলিস্টাইনের হাতে সর্বদাই কিছুটা নোংরা পোশাক গায়ে চাপিয়ে রাশিয়ার অমার্জিত সন্তানের বৈশিষ্ট্যসূচক আচরণ নিয়ে এবং সমস্ত ধার করা কথা ও ধ্যান-ধারণাকে নোংরা করার অন্তর্নিহিত গুণ নিয়ে "সাংস্কৃতিক মূল্যমানের" উৎসাহী রক্ষক শ্রীবেরদিয়ায়েভ সাধারণ ভাবে নারী সম্পর্কে কিছু সহনীয় চিন্তা ব্যক্ত করার কাজে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। তাঁর একটি প্রবন্ধে তিনি এমন একটা স্বর গ্রহণ করেছেন যা সেই সময়কার কথা মনে পড়ায়, যখন আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রজগৎ "বব্ড্" ও "নিহিলিস্ট" মেয়েদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিযুক্ত ছিল; তিনি লিখেছেন এই দেখাতে যে "নারীর আত্মিক সংগঠন পুরুষের চেয়ে নিচে", এই প্রবন্ধটি প্রবন্ধকারের বক্তব্য প্রমাণ করার চেষ্টা করে এমনভাবে যা অস্ট্রেলীয় আদিম মানবগোষ্ঠীর পক্ষে মানায় এবং তাদের বিধিবিধান থেকে, 'দোমোস্ত্রয়' (১৬শ শতাব্দীর রুশ পরিবার সংক্রান্ত বিধান—অনুবাদক) ও অনুরূপ উৎস থেকে ধার করা যুক্তি উপস্থিত করে।

যেটা তাৎপর্যপূর্ণ তা বেরদিয়ায়েভের প্রবন্ধ নয়, বরং নারী যে পুরুষের মতো আত্মিক মূল্যমানের অধিকারিণী এবং সামাজিকভাবে তার সমান, নারীর প্রতি এই প্রতিষ্ঠিত মনোভাবকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করতে যে-উদ্দেশ্য তাঁকে ও তাঁর মতো ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করছে, সেই উদ্দেশ্যটিই তাৎপর্যপূর্ণ।

আজও ফরাসিরা এই সমস্যায় বিব্রত; জার্মানরা কিভাবে তা ফয়সালা করবে মনঃস্থির করতে পারে নি, আর ব্রিটিশরা নারীকে নিজেদের পাশে একটা স্থান ছেড়ে দিলেও প্রয়োজনের চাপে অনিচ্ছুকভাবে নতিস্বীকার করে ব্যাপারটা করেছে নিঃশব্দে। একথা মনে করার কারণ আছে যে কিছুকাল তারা নারীর কৃতিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবে। ১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝি আমাদের সাহিত্য এই সমস্যাটিকে তুলে ধরেছিল এবং সমাধান করেছিল—আর আমাদের দেশকে যে বিরাট সেবা আমাদের সাহিত্য করেছে এটা তার অন্যতম। এই সমস্যা অন্য কোনোভাবে সমাধান করা যেত না: সাংস্কৃতিক শক্তির অভাব, যেসব সামাজিক গোষ্ঠী তাকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করত তাদের মধ্যে 'রাজনোচিনেত্স্' বুদ্ধি-জীবীর নিঃসঙ্গতাবোধ; জীবনে একটা স্থান করে নেবার সংগ্রামের গোড়ার

দিনগুলিতে বুদ্ধিজীবীর চারপাশের অবস্থার যোগফল—এ সবই তার মধ্যে সামাজিক ছকের মধ্যে নারীর অধিকারসংগত স্থানের সমস্যাটি সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগিয়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এবং নারীর মধ্যে তারই সমতুল্য একটা শক্তিকে স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল। আজ মনে হয় সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে শত্রুকে সে পর্যুদস্ত করেছে, যার ফলে সে এখন তার এত-কালের মিত্রদের—নারী ও জনসাধারণকে—পরিণত করতে পারে তার প্রজায়, তার দাক্ষিণ্য-নির্ভর ক্রীতদাসে। এরকম জিনিস চিরকালই করা হয়েছে, কিন্তু কখনোই এত বর্বরভাবে, এত উপেক্ষাভরে নয়।

নারীবিদ্বেষ ফিলিস্টাইনপনারই অঙ্গাঙ্গী জিনিস; যে-নারী একদা সংগ্রামে ছিল মিত্র, সে এখন ফিলিস্টাইনকে তার অলীক বিজয়ের ফল ভোগ করায় বাধা দিচ্ছে, কারণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নারী তার আত্মার মধ্যে পুরুষের কাছে—তার সহযোদ্ধা ও মিত্রের কাছে—এমন কতকগুলি দাবি তৈরি করে নিয়েছে, পুরুষ যাকে মাত্রাতিরিক্ত বলে মনে করেছে।

ফিলিস্টাইনরা নারীর প্রতি নতুন মনোভাবে খুশী এবং তাকে তারা উৎসাহ দেয়, কারণ ফিলিস্টাইনের ক্ষীণ-দুর্বল দেহের নিস্তেজ ভোগলালসাকে তা উত্তেজিত করে: প্রাক্তন শত্রুকে রক্ষিতা করাটা নিশ্চয়ই মজার।

এই ভাবে নিরক্ত প্রাণীগুলির অসংযত পানদুষ্ট মনের মধ্যে লম্পট কামনা উপচে ওঠে, কল্পনাশক্তিকে বিষাক্ত করে যৌনসংযমহীনতার দৃশ্য দিয়ে। দুষ্ট ফিলিস্টাইন আত্মা-নিঃসৃত কুৎসিত মল দ্বারা ইচ্ছুকভাবে অথবা অনিচ্ছুকভাবে সংক্রমিত হয়ে লেখকরা এই সব জিনিস দিয়ে কাগজ ভরান, বিষজর্জর করেন নিজেদেরও এবং তাদের চারপাশের লোকেদেরও।

এ. ভেসেলোভস্কির[১] মতে, ককেশাসের কাবারদা অঞ্চলে অতি সম্প্রতি-কাল পর্যন্তও 'গেগুয়াকো' নামে ভ্রাম্যমাণ চারণকবিরা ছিলেন। এঁদের একজন তাঁর লক্ষ্য ও ক্ষমতা বর্ণনা করছেন এই ভাষায়:

"একটি মাত্র কথা দিয়ে একজন ভীরুকে আমি করে তুলি সাহসী পুরুষ ও জনগণের রক্ষক; চোরকে আমি পরিণত করতে পারি সৎ লোকে; আমার সামনে কোনো প্রতারক হেঁটে বেড়াবার সাহস পাবে না। যা কিছু অসৎ অথবা মন্দ আমি তার শত্রু।"

১. ভেসেলোভস্কি, আলেকজান্দর (১৮৩৮-১৯০৬)—সাহিত্য সম্পর্কে রুশ বুর্জোয়া ঐতিহাসিক, সাহিত্য অধ্যয়নে তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক তুলনামূলক পদ্ধতির সপক্ষে।

আমাদের লেখকরা অবশ্য কাবারদার "অজ্ঞ" কবির চেয়ে নিজেদের অনেক উঁচুদরের বলে মনে করেন।

শুধু তাঁরা যদি তাঁর আত্ম-মূল্যায়নের মহত্ত্বে উন্নীত হতে পারতেন; কবিতার পবিত্র গুণের ক্ষমতায় তাঁর সরল অথচ মহৎ বিশ্বাসটুকু শুধু যদি তাঁরা বুঝতে পারতেন!

এখন দেখা যাক আমাদের বুদ্ধিজীবিসমাজ আরেকটি পুরনো মিত্র কৃষককে কিভাবে দেখে, এবং আমাদের এখনকার সাহিত্যও কিভাবে তাকে গণ্য করে।

মুঝিককে জাগ্রত করাবার পিছনে গেছে পঞ্চাশ বছরের প্রয়াস। এখন যখন সে জাগ্রত হয়েছে তখন তার আত্মিক গঠনটা কী?

বলা হবে: খুব কম সময় কেটেছে; আমাদের এযাবৎ জানা নায়কের মধ্যেকার পরিবর্তন লক্ষ্য করবার সুযোগ এখনও হয় নি। সেই যুক্তি ধোপে টিকবে না। পুরনো সাহিত্য যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পুরোপুরি সক্ষম ছিল; নতুন সাহিত্যেরও মুঝিককে খুঁটিয়ে বিচার করার মতো যথেষ্ট সময় হয়েছিল, এবং বস্তুত এ বিষয়ে তার কিছু বক্তব্যও ছিল।

প্রশ্নটির সুনির্দিষ্ট কোনো উত্তর আসে নি, যদিও কিছু তরুণ লেখকের দেওয়া ইঙ্গিত **ইতিমধ্যেই** দেখায় যে দেশের পক্ষে স্বস্তিদায়ক কোনো কিছু, মুঝিকের পক্ষে প্রশংসনীয় কোনো কিছু, তাঁরা দেখেনও না অনুভবও করেন না।

এখনকার সাময়িক পত্র ও সাংস্কৃতিক পঞ্জীতে মুঝিক যেভাবেই চিত্রিত হোক না কেন, সে সেই রেশেতনিকোভ[১] বর্ণিত একই মুঝিক—অজ্ঞ ও পাশব একটি জীব। তার অন্তঃকরণে যদি নতুন কোনো বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে থাকে, তবে সেটা দাঁড়ায় পাইকারি খুনজখম, অগ্নিসংযোগ ও দস্যুবৃত্তির একটা প্রবণতা। আগের চাইতে সে বেশি মদ্যপান করে, এবং "গুণ" সম্পর্কে মনোভাব চেখভের 'গ্রীষ্মকালীন কুটিরে' গল্পের মুঝিকদের তৈরি ছক অনুসরণ করে। মিঃ মুইঝেল একই নামের একটি গল্পে সেই ছকটিরই সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন, এবং মুঝিক সম্বন্ধে এই ভদ্রলোকের জবানবন্দী বিরাটাকার।

রুশ সাহিত্যের পুরনো নায়কের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির সাধারণ সুরটি সেই আশির দশকের সাহিত্য থেকে আমাদের পরিচিত বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্যকে

১. রেশেতনিকোভ, এফ. এম. (১৮৪১—১৮৭১)—রুশ গণতন্ত্রী লেখক। তাঁর রচনায় উরাল অঞ্চলের কৃষক, শ্রমিক ও রেলপথ মজুরদের জীবন বর্ণিত হয়েছে।

প্রতিফলিত করে, যখন এই একই ধরনের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা হত ; অনেকটা এই রকম : "আমাদের দেশের জন্যই আমরা কাজ করে এসেছি, কিন্তু আমাদের পুরস্কার কী ? মসীকৃষ্ণ অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয় !"

এরূপ দীর্ঘশ্বাস ছাড়া প্রচুর গালিগালাজপূর্ণ ভাষাও চলত। সুদূর ১৮৯২ সালে এক দল নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মীর মধ্যে ভোলগা অঞ্চলের তথাকথিত কলেরা-জনিত বিপর্যয় সম্পর্কে বলা একটি বাক্য আমাকে স্তম্ভিত করেছিল মনে পড়ে।

একজন প্রাক্তন নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মী বিষণ্ণভাবে বলেছিলেন, "আমাদের মুঝিকের এখনও চাবুক আর বেয়নেট দরকার।" এই ব্যক্তি অন্য সমস্ত ব্যাপারে অতি সজ্জন।

তাঁর কোনো বন্ধুর গলায় কোনো প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় নি।

আজ "সংস্কৃতিবান" সমাজের তরফ থেকে অনুরূপ নীরবতায় জনগণকে অভিহিত করা হচ্ছে "মাথামোটা", "উজ্জীবিত পশু" প্রভৃতি বলে।[১] অধ্যাপক পি. এন. মিলিউকভ পৃথিবীতে মহত্তম চিন্তার পতাকাকে—যে-পতাকা জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে এবং করে, তাকে—বলেছেন "লাল ন্যাতা" এবং তাঁর মতাদর্শগত বিরুদ্ধবাদীদের অভিহিত করেছেন "গাধা" বলে।

"গাধা, বাচ্চা মাদী ঘোড়া, পশু, মাথামোটা…" সাবাশ, সংস্কৃতি ; সাবাশ, "রুশ সমাজের সংস্কৃতিবান নেতৃবৃন্দ !"

"সাংস্কৃতিক মূল্যমানের" রক্ষকদের পাঁচমিশেলী বাহিনীর আর কোনো যোদ্ধা নেই যাঁরা কবি ইয়াকোভ পোলোনস্কির মতো সুন্দর ও ঐকান্তিকভাবে "শত্রুর লেখনীর জন্য স্বাধীনতার উদ্দেশে" স্বাস্থ্যপানের প্রস্তাব করতে পারেন।

রুশ সংস্কৃতিবান ব্যক্তির টাইপের ক্ষেত্রে এটা কি অধঃপতন নয় ?

আমাদের তরুণ লেখকদের লেখনী-নিঃসৃত সতর্ক ভাষায় রচিত স্কেচগুলিতে শ্রমিক এখনও মুঝিকের চেয়ে নিকৃষ্ট : সে আরো বোকা এবং ধৃষ্ট, সেই সঙ্গে সে সমাজতন্ত্রের কথা বলে, তার পক্ষে এবং পৃথিবীর পক্ষে যার সর্বনাশা চরিত্র সে নিজেই অবশ্য বুঝতে পারে না।

আমফিতেয়াত্রভ যাকে বলেছেন "রুশ সাহিত্যের ভিয়েনা যুগ" সেই

১. প্রথমে 'মাথামোটা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল শুধু জনগণের মধ্যে মানসিক গঠনের অভাব বোঝাবার জন্য, কিন্তু তার পর থেকে বিভিন্ন অত্যুৎসাহী ব্যক্তি শব্দটির অর্থ এমনভাবে প্রসারিত করেছেন যাতে তার মধ্যে তাদের সমস্ত গুণাগুণই পড়ে। —লেখক

সময়কার লেখকরা মতাদর্শগত বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে একটা ক্ষতিকর শিক্ষা হিসেবে সমাজতন্ত্রের ফিলিস্টাইন তত্ত্ব ভালোভাবেই আত্মস্থ করেছেন—সেই শিক্ষা যাকিছু একান্ত উদর-সংক্রান্ত তাকেই সমর্থন করে, আত্মার আশা-আকাংক্ষাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে। সেই জন্যই এজাতীয় লেখকরা মনে করেন যে সমাজতন্ত্রের দিকে ঝোঁক এক ধরনের প্রগতিশীল মূর্খতা।

এ ব্যাপারটা সহজেই বোঝা যায় যে ফিলিস্টাইনের কাছে প্রলেতারীয় সর্বদা ও সর্বত্রই অপছন্দের জিনিস, এত ট্র্যাজিক যে ফিলিস্টাইন কমেডিতে খাপ খায় না, এবং এত বড় যে আজকের লেখকের পক্ষে সুবিধাজনক ভাবে নায়ক হতে পারে না।

মুঝিক সাহিত্যে তার জীবন ও ভবিষ্যতকে নষ্ট করেছে; অধিকন্তু মনে হয় আমাদের সাহিত্যের শ্রদ্ধাও হারিয়েছে নিম্নলিখিত কারণে: সে যখন দেখল যে তার ঊর্ধ্বতনরা উত্তেজিতভাবে নিজেদের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা দাবি করল—এবং সে যদি এই সব ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিদের প্রতি তার সমর্থন জানায় তাহলে কর্তৃপক্ষকে এইসব দাবির কাছে নতিস্বীকার করতে হবে, তার সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করতে হবে জঙ্গী ফিলিস্টাইনদের সেবায়, সেটা করতে হবে এই প্রত্যাশায় যে তার হাত এবং নিজেদের ধূর্ততার সাহায্যে শেষোক্তরা যখন তাদের সমৃদ্ধির ঘাঁটি গড়ে তুলবে, তখন তারা তাকে যথাযথভাবে ধন্যবাদ দেবে, তখন, এহেন মহৎ হৃদয় ভদ্রলোকদের কাছ থেকে তার পুরস্কারের জন্য ধৈর্য-সহকারে অপেক্ষা করার পরিবর্তে এই অ-পরিমার্জিত অকৃতজ্ঞটি ভয়ঙ্কর এক-গুঁয়েমির সঙ্গে দাবি করল যে "সমস্ত জমি" তার হাতে তুলে দেওয়া হোক এবং শ্রমিকদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে সে সমাজতন্ত্রের কথা পর্যন্ত বলতে শুরু করল। সেই জন্যই তাকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং সদয় অন্তঃকরণের খ্যাতি-বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা তাকে কিছুকালের জন্য উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন।

বুদ্ধিজীবী ও জনগণের মধ্যে এই ফাটল অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। সালতিকোভশ্চেদ্রিভ একদা বলেছিলেন "মুঝিককে বাদ দিয়ে এগোতে পারবে না," এবং দেশকে রক্ষা ও আরো বিকশিত করতে সাহায্য করার জন্য আমাদের "সংস্কৃতিবান সমাজকে" তার আহত মনোভাবকে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং তার উন্মত্ত ও বিদ্বিষ্ট এই অভিযোগ বন্ধ করতে হবে যে তার কামনা-বাসনার প্রতি জনগণের কোনো-মর্যাদার মনোভাব নেই। প্রকৃতপক্ষে, বিপ্লবে নাড়া-খাওয়া ও বিধ্বস্ত রাষ্ট্রের প্রতিটি ফাটল আর গর্তকে বুদ্ধিজীবীরা তাড়া-

হুড়ো করে ভরাট করে ফেলছেন। নিজেদের সময় হবার আগে শ্রান্ত-ক্লান্ত ও নিরাশাগ্রস্ত হয়ে তাঁরা এখন শুধু সুখপ্রদ বিশ্রামের সন্ধানী; তাঁদের কাজকর্মে দেশের প্রতি কোনো ভালোবাসা প্রকাশ পায় না এবং তাঁদের কথায় রয়েছে বিশ্বাসের অভাব।

রাশিয়ার পক্ষে একান্ত বিশিষ্ট আরেকটি ব্যাপারও প্রণিধানযোগ্য: "গভীরতাহীন", "নিস্তেজ", "তুচ্ছ" ও "অবাঞ্ছিত" ব্যক্তিদের অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি। এই ঘটনাটি স্বপ্রকাশ, স্বপ্রকাশ তার কারণও। এই ব্যাপারটি সামাজিকভাবে বিপজ্জনক, কারণ এরা হল ইচ্ছাহীন, আশা বা বাসনাহীন লোক—এমন একটা বস্তুপিণ্ড যাকে আমাদের শত্রুরা দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারে। সাহিত্য যখন এই কথাটি উল্লেখ করেছিল যে আমাদের সুসংস্কৃত সমাজেই টাইপটার দেখা পাওয়া যাবে, তখন সে-উক্তির মধ্যে উত্তেজনাজনক কিছু ছিল না, কারণ সংস্কৃতির জন্ম তো জনগণের কর্মশক্তির মধ্যেই; জনগণই যখন "তুচ্ছ" ও "অবাঞ্ছিত" নর-নারীর জন্ম দেয় তখন শঙ্কার হেতু থাকে বৈকি, কারণ এ ধরনের ঘটনা দেখায় যে, সেই সংস্কৃতিকে যে-জমি লালিত করছে সে-জমি নিঃশেষ হয়ে আসছে, ভাষান্তরে, জনগণের সাংস্কৃতিক শক্তিতে ভাঁটা পড়ছে। এই ব্যাপারটি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে এবং তার মোকাবিলা করতে হবে, আর সাহিত্যের কাজ হল, হয় এ-ধরনের লোককে উৎখাত করা, না হয় তাদের মেরুদণ্ড সোজা করিয়ে সক্রিয়তার জীবনে ফিরিয়ে আনা।

গণ্ডগোলটা এই যে "ষাঁড় চেনে তার মালিককে, আর গাধা চেনে তার প্রভুর জাবনার পাত্র।" আমাদের সাহিত্যসেবীরা ফিলিস্টাইনদের চাকরিতে ঢুকেছেন জোট বেঁধে, তার ফলে তাঁদের নিজেদের আত্মার পচন অনুভব করার প্রত্যাশা তাঁরা করবেন, এবং ইতিমধ্যেই তা অনুভব করছেনও; ফিলিস্টাইন-দের লালিত অভিসন্ধি বিকৃত ও সংকীর্ণ, ব্যক্তির সৃষ্টিশীল শক্তিতে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করার মতো উচ্চ ধ্যানধারণা সৃষ্টিতে তারা অক্ষম।

বিশাল এক গাছ যেমন জলা জমিতে বেড়ে উঠতে পারে না, তা লালন করে শুধু রুগ্ন বার্চ গাছ আর হীন ফার গাছকে; তেমনি এই ক্ষয়িষ্ণু পরিপার্শ্ব এমন ধরনের ক্ষমতাবান প্রতিভার আবির্ভাব ও প্রস্ফুটনকে বাতিল করে যা জীবনের মামুলি গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠে তার দেশ ও পৃথিবীর প্রপঞ্চ-বৈচিত্র্যের উপরে শ্যেন-দৃষ্টি নিয়ে তাকাবে, যে-প্রতিভা একাধারে আলোকোদ্ভাসিত করবে ভবিষ্যতের পথকে, এবং আমাদের এই ক্ষুদ্র মানুষদের যা ডানা যোগায় সেই

মহৎ উদ্দেশ্যকে।

ফিলিস্টাইনিজম হল একটা লতানো গাছ, তা সীমাহীনভাবে বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম, যা কিছু তার পথে এসে দাঁড়ায় তাকে সে চেষ্টা করে গ্রাস করতে এবং শ্বাসরোধ করে মারতে। কত মহৎ কবিকে তা নষ্ট করেছে তা একবার চিন্তা করুন!

ফিলিস্টাইনিজম হল পৃথিবীর সর্বনাশা বিষ; কীট-শূক যেমন ফলকে নষ্ট করে, তেমনি তা ব্যক্তিত্বকে গ্রাস করে নেয় ভিতর থেকে। তা আগাছা ভরা মাঠের মতো, সে-আগাছার অশুভ ও অন্তহীন মর্মরধ্বনি সৌন্দর্যের বলিষ্ঠ উচ্চ-রোলকে এবং জীবনের প্রফুল্ল সত্যকে ডুবিয়ে দেয়। এ এক অতল বদ্ধজলা, তার বিতৃষ্ণাজনক গহ্বরের মধ্যে সে টেনে নেয় প্রতিভা আর প্রেমকে, কবিতা আর চিন্তাকে, কলাশিল্প ও বিজ্ঞানকে।

আমরা দেখতে পাই যে মানবজাতির বলিষ্ঠ দেহে এই রোগাক্রান্ত বিস্ফোটকটি ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছে, তাকে নিহিলিস্টধর্মী ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার বিষে জর্জর করেছে এবং মানুষকে পরিণত করেছে এক বিপজ্জনক গুণ্ডায়, এমন এক প্রাণীতে—যার কোনো আন্তর সংলগ্নতা নেই, মন যার বিধ্বস্ত আর স্নায়ু উদ্বেল, নিজের সহজাত প্রবৃত্তির সারমেয়-চিৎকার আর রুগ্ন কামনার নোংরা ফিসফিসানি ছাড়া জীবনের অন্য সব ধ্বনির প্রতি যে আরোগ্যহীনভাবে বধির।

ফিলিস্টাইনিজমের দরুনই আজ আমরা এসে পৌঁছেছি প্রমিথিউস থেকে গুণ্ডা-তে।

কিন্তু গুণ্ডা ফিলিস্টাইনেরই সন্তান, তারই আত্মজ। ইতিহাস তার জন্য আগে থেকেই স্থির করে রেখেছে জনক-জননী-হন্তার ভূমিকা, আর পিতৃঘাতী সে হবেই, কারণ সে হত্যা করবে তার জনককে।

ব্যাপারটা যেহেতু শত্রুর পরিবারে ঘটছে, সেজন্য নাটকটা আমরা দেখতে পারি সহাস্যে এবং আনন্দ সহকারে, কিন্তু ফিলিস্টাইনিজম নিজেরই জাতকদের বিরুদ্ধে যে-লড়াই চালাচ্ছে তার মধ্যে অমূল্য ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদের জড়িয়ে পড়তে দেখে আমরা দুঃখিত। দ্রুত ভেঙে-পড়া এক পরিবেশ থেকে উদ্ভূত পচা বিষে জর্জর হয়ে চমৎকার ব্যক্তিদের বিনাশ দেখাটা দুঃখজনক।

যারা সমগ্র ও অখণ্ড—সেই ব্যক্তিদের পক্ষে যা উপযুক্ত, তদনুসারে অন্যদের সুস্থ প্রফুল্ল ও সুন্দর দেখতে চাই; আমাদের মনে হয়, জনগণের কর্মশক্তিকে যদি সংগঠিত ও বিকশিত করা হয় তবে তা পৃথিবীর জীবনকে তাজা করে

তুলতে পারে এবং মানবজাতির মুক্তি ও সৌন্দর্যের উৎসবসমাগমকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আমাদের কাছে বিশ্ব-সংস্কৃতির ইতিহাস সুরেলা ও মহৎ ষড়্মাত্রিক চরণে লেখা। আমরা জানি, এমন সময় আসবে যখন অতীতের দিনগুলিতে অর্জিত সবকিছুর প্রতি নর-নারী শ্রদ্ধা নিবেদন করবে এবং আমাদের ভূমণ্ডল তার স্থান গ্রহণ করবে মহাবিশ্বে, মৃত্যুর উপরে জীবনের জয়ের ক্ষেত্র হিসেবে; সেই স্থানে বস্তুতই দেখা দেবে শিল্পের জন্য বাঁচার, মহনীয়তা সৃষ্টির অবাধ শিল্প!

মানবজাতির জীবন পূর্ণ সৃষ্টিশীল প্রয়াসে, প্রাণহীন বস্তুর প্রতিরোধের বিরুদ্ধে জয়লাভের প্রচেষ্টায়—সেই বস্তুর সমস্ত গোপন কথা জেনে তার শক্তিকে মানুষের ইচ্ছার দাস করা এবং তাদের দিয়ে মানুষের সুখ আনার বাসনায় তা পূর্ণ। সেই লক্ষ্য অভিমুখে যাত্রা করার সময়ে আমাদের সেই অভীষ্ট অর্জনকে সুনিশ্চিত করতে হবে পৃথিবীতে বিদ্যমান মানসিক ও কায়িক উভয়বিধ জীবন্ত সচেতন ও সক্রিয় শক্তির যোগফলের নিয়ত বিকাশকে সোৎসাহে লালিত করে। ইতিহাসের বর্তমান মুহূর্তটির কাজ হল সম্ভাব্য সর্বপ্রকারে জাতিসমূহের আয়ত্তের সমস্ত শক্তিসঞ্চয়কে বিকশিত ও সংগঠিত করা, সেই কর্মশক্তিকে এক সক্রিয় শক্তিতে পরিণত করা এবং সৃষ্টি করা শ্রেণী গোষ্ঠী ও পার্টির যৌথ সংস্থা।

১৯০৯

সমাপ্ত

অনুবাদক

প্রফুল্ল রায়

উদয়পুরের উপকথা

ভবানী সেন

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

২৮

ভূপতি এবং মালিনী সপরিবারে দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ চালিয়েছে, তা বিস্ময়কর। সারা উদয়পুর অবাক হয়ে গেছে।

অনাহারে মরার মতো অবস্থায় একমুঠো চালের প্রলোভনে কেউ বা নিজের সন্তান বিক্রি করেছে, কেউ বা নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত কোনো নরপশুর লালসার ইন্ধনে সঁপে দিয়েছে। পরিবারের পর পরিবার ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। কিন্তু ভূপতি আর বন্যর মা, মালিনী আর মেনকা—এরা ভাঙে তবু মচকায় না।

ছোট ছেলে বন্য একদিন খিদের তাড়নায় দাঁতে দাঁত লাগিয়ে অসাড় হয়ে পড়ে রইল। বন্যর মা তাকে কোলে করে চোখের জলে বুক ভাসাল। কৃতান্ত চৌধুরীর গোমস্তা সেদিন ভূপতিকে বলেছিল—"ঐ মেনকাটাকে দিয়ে যা, তোর বন্যর ভাতের অভাব হবে না।" ভূপতি তা শুনে তাকে বলেছিল—"কৃষক সমিতির নাম শুনেছ সরকার মশাই, তোমাদের আসল ওষুধ ঐ সমিতির ডাণ্ডা। এ গাঁয়ে সমিতি নেই তাই সাহস করে আমার কাছে উচ্চারণ করতে পেরেছ।" গোমস্তা—"অতো গরম হোস না রে অতো গরম হোস না, আমার কথাটা ভেবে দেখিস।" ভূপতি থু করে মাটিতে পিক ফেলে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। গোমস্তা অস্ফুটস্বরে বলল—"ব্যাটা চাঁড়াল না খেয়ে মরে তবু তেজ কমে না।"

বন্য আজ মৃত্যুর দুয়ারে উপস্থিত। মালিনীর কান্নার শক্তিও লোপ পেয়েছে। ক্ষীণ স্বরে বলল—"ঠগের রাজত্বে একমুঠো ভাতের অভাবে বন্যকে আজ বাঁচাতে পারব না? মেনকা তুই যা না একবার প্রতিভাদিদির কাছে

আর-এক মুঠো চাল যদি আজ পাস।"

মেনকা জানে আজ আর সেখানে কিছু পাওয়া যাবে না। মনে হয় কপিলেশ্বরী গাইয়ের দুধও বুঝি শুকিয়ে গেছে, মা অন্নপূর্ণার ভাঁড়ারও আজ বাড়ন্ত। কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে রইল মেনকা।

বন্থ্যর মা অবিশ্রান্ত কেঁদে চলেছে।

ভূপতি থেকে থেকে অভিশাপ উচ্চারণ করছে।

মালিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—"ভগবান, এ কী গ্রহের ফের না কর্মফল?"

ভূপতি—"কর্মফল কেন হবে, কুকর্মটা কি করেছি। যে পাষণ্ডরা সারা জীবন কুকর্ম করে এল, তারা তো খেয়ে দেয়ে সুখেই আছে।"

মেনকা—"কর্মফল না ত কি ভূপতিদা। ইংরেজ রাজার অত্যাচারেই মন্বন্তর এসেছে না? আমাদের কর্মফল যদি না হবে ত ইংরেজের রাজত্বটা আছে কি করে?" একটু থেমে বলল—"শুনেছি মা একটা দেশ আছে তার নাম সোভিয়েট রুষিয়া। সে দেশে আছে মজুর-চাষীর রাজ। সে দেশের গরীব মানুষ আর গরীব নেই। সেই সুখী দেশটাকে ঘায়েল করার জন্যই জার্মানরা যুদ্ধ চালিয়েছে।"

কথাটা মালিনীর মনে বেশ ধরেছিল "—হ্যাঁরে মেনো, সেই সুখী দেশের কোনো ছেলে বুঝি এমন করে না খেয়ে মরে না?"

—"না মা, সে দেশে আর জমিদার নেই, মহাজন নেই, চোরাকারবারী নেই। দেশের ধনদৌলত মেহনতী মানুষেরাই ভোগ করে। সে দেশের ছেলে মেয়ে কি আর এমন না খেয়ে মরতে পারে?"

ভূপতি—"এত কথা তুই শিখলি কোথায় রে মেনকা?"

মেনকা—"লিলুয়ায় আর চট্টগ্রামে লালঝাণ্ডাওয়ালা বাবুদের কাছে শুনেছি। তারা মিটিং করত, বক্তৃতা দিত। আরো কত কি কাণ্ড করত!"

মালিনী—"মেনকা যা একবার শোনে তা ভোলে না। ব্রজবাবুর ছেলের কাছে মাত্র কয়েকদিন বই নিয়ে বসেছিল, তাতেই কত শিখে ফেলেছিল।"

বন্থ্যর মা ডুকরে কেঁদে উঠল—"বন্থ্য, সোনা-মানিক রে আমার—"

মালিনী—"গেল? শেষ হয়ে গেল? অ বন্থ্যর মা, বাপধন আমার চলে গেল?"

রোগে শোকে অনাহারে এই পরিবারটি যখন দগ্ধে দগ্ধে মরছিল তখন

তাদের মেরুদণ্ড সোজা করে রেখেছিল মেনকা।

ভূপতি বলেছিল—"বন্যর মা, ভেঙে পড়িস নি দুঃখে শোকে। দুঃখের ওপর আমরা বিজয়ী হব। মরে যাই সেও ভালো, তবু কোনো কুকর্ম করি নি, কাউকে ঠকাই নি, পরের মুখের ভাত কেড়ে খাই নি—সেই ত ঢের।"

মেনকা—"না ভূপতিদা, তা ঢের না। যারা ঠকিয়ে ঠকিয়ে মারল আমাদের —তাদের বরদাস্ত করে যাচ্ছি, এ-পাপের কৈফিয়ৎ কি দেবো? বাঁচার জন্য প্রাণপণে আজ মেরুদণ্ড খাড়া রাখতে হবে যাতে সেই পাষণ্ডদের চরম প্রতিশোধ নিতে পারি। প্রতিশোধ নিতে হবে, বুঝলে? প্রতিশোধ।"

বন্য মারা যাবার পর মালিনী আর কদিন মাত্র বেঁচে ছিল। মালিনীর মৃতদেহ যখন শ্মশানে নিয়ে যায়, অবনী তখন তার মায়ের সৎকার করে ফিরছিল। যে-স্ত্রীলোকটিকে অবনী মালিনীর শবাধারের সঙ্গে দেখেছিল, সে-ই মেনকা। মেনকা ১৪ বছর পরে ফিরে আসার পর অবনীর সঙ্গে এই তার প্রথম দেখা, শ্মশানঘাটে, মড়কের বিভীষিকার মধ্যে।

মেনকাই জুটিয়েছে পাড়ার কয়েকটি ছেলেকে মালিনীর মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্য, নইলে হয়ত শেয়াল-কুকুরেই তার মাংস ছিঁড়ে খেত। তারা চিতেটা সাজিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে চলে যাবে। ভূপতি আর মেনকা থাকবে সেখানে যতক্ষণ চিতা জ্বলে।

ভূপতি অবনীকে দেখে বলল—"দা-বাবু মাসী বিদেয় হয়েছে। আপনার মায়েরও বুঝি সৎকার হল? একটিবার দেখতে যেতে পারি নি। যে অবস্থায় আছি জানেনই ত।"

অবনী মনে মনে নিজেকে অপরাধী করল। বাড়ি এসে একটিবারও ওদের বাড়ি যেতে পারে নি। মন্বন্তরে তাদের কি হাল হয়েছে তার খবরও নেয় নি। মাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

অবনীর চোখ গেল মেনকার দিকে। শবাধার শ্মশানে নামিয়ে ভূপতি বলল—"মালিনীর সেই মেয়ে—মায়ের ডাক তাকে টেনে এনেছে এই মড়কের মধ্যে।"

মেনকা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল—'এই সেই অবনী!' একটু অপ্রতিভ অথচ করুণ দুটো চোখ অবনীর চোখের উপর পড়ল।

গ্রামের ছেলেরা চিতা সাজিয়ে আগুন জেলে দিয়ে চলে গেল—বসে রইল ভূপতি, মেনকা আর অবনী।

তখন মাথার ওপর শরতের চাঁদ জ্যোৎস্নায় চন্দ্রাতপ মেলে ধরেছে।

মেনকাই প্রথম কথা বলল—"মা আপনার কথা কত বলেছে ছোটবাবু, মৃত্যুকালে তাঁর বড় ইচ্ছা হয়েছিল আপনাকে দেখার জন্য, কিন্তু ডাকতে দিল না আপনার মা-র শেষ অবস্থার কথা শুনে।"

মেনকা অবনীকে ছোটবাবু বলে ডাকত। সে যখন ব্রজনাথ রায়ের বাড়ি কাজ করত তখন নিশানাথকে বলত বড়বাবু, ভোলানাথকে মেজবাবু, আর অবনীকে বলত ছোটবাবু। অবনী যেন ঐ বাড়িরই ছেলে ছিল।

ভূপতির বসার সাধ্য ছিল না, ঐখানেই শুয়ে পড়ল। মেনকা বলল—"তুমি বাড়ি যাও ভূপতিদা, বউও ত একা রয়েছে। ছোটবাবুই ত আছেন।" ভূপতি চলে গেল—অবনী আর মেনকা কথা বলে চলল অনেকক্ষণ। মেনকার জীবনের সমস্ত কাহিনী শুনল সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

—"ধন্য মেয়ে তুমি মেনকা, ধন্য তোমার জীবন। এসো মেনকা, তোমার ওই শক্তি আর সাহস নিয়ে দেশের-এবং দশের মুক্তির কাজে লেগে যাই। আমিও সেই পথে এগুতে চাই। তুমি থাকবে, আমি থাকব, আর থাকবে ভূপতিরা।"

মেনকা—"আপনি কত লেখাপড়া জানেন, আপনি যদি আমাদের সাহায্য করেন, আমরা অসম্ভব সম্ভব করতে পারি ছোটবাবু। মেজবাবু এক সময় আমাকে লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করেছিল, তখন যদি আর ক-টা মাস সুযোগ পেতাম!"

অবনী—"লেখাপড়া তোমাকে শেখাব আমি, তোমার মতো মেয়ে যদি লেখাপড়া শিখতে পারে, মস্ত বড়ো নেতা হতে পারবে। তুমিও আমাকে শেখাবে জীবনের অভিজ্ঞতা, আজ যা ঝাপসা ঝাপসা দেখি তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে মেনকা।"

মেনকা—"অন্ধকে যদি চোখ দেন, চিরকাল মনে থাকবে আপনার কথা। মা আমার যাদের জন্য না খেয়ে মরল, তারাই ত আমাকে অন্ধ করে রাখল আর অপবাদের ফোঁটা কেটে দিল কপালে।"

অবনী—"আমি তোমার কপালে কেটে দেব নতুন ফোঁটা, অপবাদের ফোঁটা ঢাকা পড়ে যাবে। তোমার যা গৌরব তাইতে ওরা অপবাদের ছাপ মেরে দিয়েছে বৈ ত নয়। এসো মেনকা, আমরা আমাদের মায়ের চিতাভস্ম সাক্ষী করে শপথ করি—জন্মভূমির মুক্তি ও কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করলাম আমাদের জীবন।"

মেনকা মনে মনে শিউরে উঠল, অবনীর দিকে তাকিয়ে চোখ দুটো তার জলে উঠল, তারপর মুচকি হেসে বলল—"আপনি ভদ্দরলোকের ছেলে, আপনার কি আমাদের সঙ্গে পোষাবে ?"

অবনী—"অর্থাৎ আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছ না ? বিশ্বাস করো মেনকা, তোমাকে আমি ঠকাচ্ছি না।"

মেনকা মাথা নত করল।

অবনী আস্তে আস্তে তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিল —"চলো আমরা উঠি এবার।"

মেনকা মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়াল।

মালিনীর চিতা তখন নিভে গেছে।

শ্মশানভূমির গা ঘেঁষে ছোট্ট নদীটা কুল কুল করে বয়ে চলেছে। ফুরফুরে হাওয়ায় দূর থেকে ভেসে এল অনেক লোকের মিলিত কণ্ঠস্বর। অবনী আর মেনকা কান খাড়া করে রইল। আওয়াজ ক্রমশ নিকটবর্তী হলে শোনা গেল জনতার রণধ্বনি, মন্বন্তরের বিরুদ্ধে অভিযানের আহ্বান। স্বাধীনতার, শান্তি ও শান্তির পথে চলমান জীবনের জয়শংখনাদ।

অবনী আর মেনকা মিছিলের মধ্যে মিশে গেল।

২৯

অবনীর কাছে চিঠিখানা লিখে অবধি প্রতিভার মনে আর শান্তি নেই। 'কেন লিখতে গেলাম অমন করে। হয়ত আর সে আমার সাথে দেখাও করবে না। আসতে লিখেছি একবার, আসবে কি ? আসে যদি কি কথা কব তার সঙ্গে !'

* * * * *

অবনী উদয়পুর এসেছে শুনে প্রতিভা উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'এমন হ্যাংলা পুরুষমানুষ আর দেখি নি ত। কোন সাহসে আমার কাছে প্রেমনিবেদন করল, আমার জবাব পেয়েও কোন মুখে আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে ? কি বলবে সে ? কান্নাকাটি করবে ? গালাগালি করবে ? নাকি তর্ক করে বুঝাতে চাইবে যে স্বামী বর্তমানেও স্বামীকে ছেড়ে তার সঙ্গে উধাও হওয়াই আমার জীবনের পরম সার্থকতা ?'

দিনের পর দিন যায়, কিন্তু অবনী আর আসে না। প্রতিভার বড়ো রাগ হল।

'একবার দেখাও করতে এল না ? প্রেমনিবেদনে সাড়া পাবার আশা নেই

বলে আমার কাছে আর কোনো প্রয়োজন থাকতে পাবে না ? একটি অসহায় স্ত্রীলোককে প্রেমের পাকে জড়াবার জন্যই কি এতকাল এত খাতির কবা হত ?'

অবনীর মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে প্রতিভা মর্মাহত হল। 'মায়ের অসুখের জন্য আসতে পারে নি, আর আমি কি না তাকে মনে মনে এত খারাপ ভাবছি। কী কাণ্ড আমার, তাব মাকে একবার দেখতেও গেলাম না। এখন একবার দেখা করতে যাব ? কিন্তু কোন মুখ নিয়ে যাব ? সে বুঝতেই পাববে কেন যাই নি। রাগ করুক আব যাই করুক, এখন আসবে একবার।'

তারপরও কয়েকদিন গেল, অবনী এল না। প্রতিভার মনটা ছটফট্ করতে লাগল।

'এ কি অন্যায়, এমন অকৃতজ্ঞ লোক ত আর দেখি নি। আমার সঙ্গে দেখা না করেই কি কলকাতায় ফিবে গেল ? কী রাগ বাপরে বাবা।'

তারপরও কয়েকদিন গেল।

প্রতিভার কানে গেল তার বাবা মাকে বলছে—"শুনেছ অবনীব কাণ্ড। মা-বাপের মুখে চুনকালি দিল একেবারে। কী কেলেঙ্কারি। কী কুক্ষণে বেশ্যাটা গাঁয়ে ফিরে এসেছিল। অবনীর মতো ছেলেকেও চরিত্রভ্রষ্ট করে ছাড়ল।"

প্রতিভার মা—"আমার ত শুনে চক্ষু চড়কগাছ। এখন ত মায়ের শ্রাদ্ধ নিয়ে হাঙ্গামা বাধবে। তার বাড়ি যাবে কে ?"

"সে হাঙ্গামা মেটানো যাবে। অবনী ত আর বাড়ি যাচ্ছে না, সাধন বলেছে ভাইয়ের অন্নজল সে গ্রহণ করবে না, সোজাসুজি মালিনীর বাড়িতেই আছে সে। কথায় বলে যার দুই কান কাটা সে যায় গ্রামের ভিতর দিয়ে।"

"—অবনী এমন ভালো ছেলে, সে এমন গোল্লায় যাবে তা ত জন্মে কখনও ভাবি নি।"

মা ডাকলেন—"অ প্রতিভা, এমন অসময় ঘুমোচ্ছিস কেন ? ওঠ, খাবি না ?"

—"না মা, শরীরটা খারাপ, আজ রাতে আর খাব না।"

প্রতিভা সে বাতে অনুভব করল যে অবনীকে সে ভালোবেসেছিল। কত কথাই ভেবে চলল প্রতিভা। সারারাত তাব ঘুম হল না।

'অবনীদার আহ্বান যদি আগে আসত। নিশানাথের খবর পাওয়ার আগে ত ধরেই নিয়েছিলাম যে সে মরে গেছে। আমাকে বিধবা ভেবেই ত অবনীদা লিখেছিল ও কথা। ভাগ্যিস তার আগেই মেনকা খবরটা এনেছিল। নইলে

কী কেলেঙ্কারি হত। যে একগুঁয়ে লোক অবনীদা, বিধবাবিবাহ না করেই ছাড়ত না। মাথা মুণ্ডু কী ভাবছি ছাই, আমি কি আর রাজী হতাম অবনীদাকে বিয়ে করতে। আমাদের পরিবারে বিধবা বিয়ে সধবা বিয়ে সব সমান। জাত যেত একেবারে। কিন্তু রাজী হয়তো হয়েও বসতে পারতাম। মনে মনে ত অভিমান করেছি এক-একদিন—অবনীদা পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে চলে কেন? কী বিশ্রী রুচি এই অবনীদার। শেষে কি না মেনকাকে? একে ত নীচু জাতের মেয়ে, তাতে আবার যে বদনাম তার। যা রটে তার কতকও ত বটে।

'আমার চিঠিতে মেনকার নামে অত করে বাড়িয়ে লিখতে গেলাম কেন? আমার লেখার জন্যে ত ভারী। বাড়ি এসেছিল মা-র সংবাদ পেয়ে, মেনকার চেহারা দেখে মাথা ঘুরে গেছে ছেলের। মেয়েটাও ধুরন্ধর মেয়ে। নিশানাথের কথা হয়তো মিথ্যে করেই বানিয়ে বলেছে। হয়ত গিয়েছিল বাগাতে, সে ছলাকলায় ভোলে নি, অপমানিতা হয়ে এসে এখন কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছে।'

[ক্রমশঃ]

ল্যাসো

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

মনেই হবে না ফাঁস। দিব্যি দড়িখানা
হঠাৎ আকাশ থেকে গলার উপরে
মালার মতন এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে।
সামান্য চমকমাত্র; যেন কি অজানা
কণ্ঠলগ্ন হ'ল। শত করলেও মানা
নিজগুণে গলা থেকে পড়বে না ঝ'রে।
পালাতে চাইবামাত্র ব্যাস ছোট ক'রে
হবে শ্বাসরোধী ফাঁস, দূর থেকে টানা।

ব্যাপারটা গল্প কি শিকারকাহিনী
ব্রাজিল কি মেক্সিকোর অশ্বারোহীদের
নয় কিন্তু। এদের যে তুমি আমি চিনি।
সবাইকে খুব কাছে থেকে শিকারের
চেষ্টা করে। কথা দিয়ে সৃষ্টি করে গ্যাসও।
আর ছোঁড়ে মূল্যবৃদ্ধি, মুনাফার ল্যাসো।

কালিম্পং, ১৩৮০

শান্তিকুমার ঘোষ

এই সিংহগড় পাহাড়ের ধারে মেঘ এসে দাঁড়িয়েছে পিতৃপুরুষের প্রেতের মতন:
বিউগল বেজে ওঠে কুয়াশার স্তর ফুঁড়ে এক···দুই···তিন বার।
দূরবীন বিন্দু থেকে আন্তর্জাতিক সীমারেখা—
তার 'পরে চোখ-রাখা আমাদের প্রাণপণ,

গুপ্তচরী চক্রচরে ছেয়ে গেল দেশ··· কে বিশ্বাস করেছে হনন।
মানুষ গিয়েছে কবে পুঁথি ও হৃদয় নিয়ে পাকদণ্ডী আর ওই নদীরেখা ধ'রে ;
নিশীথে পেরোবে সাঁকো সেবক পেশক থেকে আজ কনভয়।

নিটোল ফলের মেয়ে ডালা নিয়ে ব'সে আছে বিপণি সংসারে :
দেহ আর দেশ ইহকাল পরকাল
তুই-ই বেচবে সে কি মুদ্রা বিনিময়ে।
শুধু শাল ও সেগুন রেখে বোলডারে বোলডার ভেঙে তিস্তার গর্জন।
সহিষ্ণুতা আমাকে শেখাও তরু—হাওয়ার চাইতে চিন্তা আজ দ্রুতগামী।

তুমি কি ফেলবে আভা—ঘুরিয়ে ধরবে হাসি তুষার-মুকুটে :
ফলবে সোনার ডালে হীরার মোতির ফল মোমের আলোয় ;
বেরিয়ে আসবে ধীরে মেঘের নিষেধ ছিঁড়ে একে একে চূড়া···
শেখাবে আমাকে তুমি দাঁড়াতে অমন ঋজু উঁচু ক'রে মাথা ॥

বুক

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সেলাই করতে হবে, জোড়াতালি-দেওয়া জামার
ভিতর থেকে উঁকি মারছে অসংখ্য খোলা বুক
আকাশের মতো দীর্ঘ—মেঘময়
তামাক-রঙা চামড়া
স্পষ্ট ওই দেখতে পাচ্ছি ফুটফুটে হাড়ের সাদা কাঠি
ডিমের কুসুমের মতো হৃদয়—
মুখের হাসির নিচে মুখের কঙ্কাল!

রঞ্জনরশ্মির এই চোখে ধরা পড়বে আরো অনেক কিছু
মহৎ ভিখারির পেছনে অসৎ কুকুর, কৃমি ও কীটের গ্রীষ্ম

ভ্রমরের ডানার নিচে একটি দুষ্ট ব্রণ—
ফুলের রেণুর প্রলেপে তা ক্রমশ শুকিয়েই আসছে ;
ঘুম নেই হরিণের, পায়ের নিচের লতা শিং বেয়ে
যেতে চায় অরণ্যের কাছে ;

যা দেখি তা এক অরণ্যের আপাত-সবুজ ছাড়া কিছু নয়
সবুজের ছাতার নিচেই বেড়েছে দারিদ্র্য, ভনভনে মাছি
কুরে কুরে খায় তামাক-রঙা চামড়া,
মেঘময় আকাশের বুক।

বরং

দিলীপ সেন

মুখের কথায়
এখন আর কিছুতেই জমাট বাঁধে না
রাস্তায় রাস্তায়
জল-ঝড়ের মানুষ

শুভানুধ্যায়ী ভাই-বন্ধুরা
এখন
ঘোরতর শত্রুর তকমা এঁটে
ভাগাড়ে বন্দী

কথায় কথায়
যুদ্ধের পাশে দাঁড়িয়ে
মাটিতে পা ঠুকে
যখন তখন কামান দাগা
বড়ো ছেলেমানুষি

পৃথিবী অশান্ত থাকায়
পা রাখার জায়গা
শুধু
ক-টা দিনের জন্যেই

সামনেই
সারি সারি মৃত্যুর
হাঁ করা প্রকাণ্ড খাদে
রক্ত চোয়ানোর শব্দ

পেছনেও
জোড়হাত করা
ধূর্ত চোরাবালির
নিঃশব্দ আমন্ত্রণ

বরং
পোকায় কাটা তোমার ভাবনাগুলোকে
ন্যূনকল্পে একবার
সূর্যের আগুনে
এপাশ ওপাশ সেঁকে নাও

তোমার পা রাখার জায়গা
অন্তত
ক্ষমাহীন ইতিহাসের চোখে
নিশ্চিত হতে পারে।

বাঙলাদেশের চিঠি

মাহ্‌বুব-উল্‌-আলম

চট্টগ্রামের 'জমানা' দৈনিকপত্রের সম্পাদক জনাব মাহ্‌বুব-উল্‌-আলম বাঙলাদেশের সাহিত্যজগতেও লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তাঁর 'মোমিনের জবানবন্দী' পঁয়ত্রিশ বছর আগে নাম করে। বইখানির ইংরেজী তর্জমা করেন শ্রীমতী লীলা রায়। মাহ্‌বুব সাহেব ও স্বর্গত আশুতোষ চৌধুরী এককালে 'পূরবী' মাসিকপত্র সম্পাদনা করতেন। সেটি একটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্যপত্র ছিল। এই চিন্তাশীল লেখক তাঁর ১৯৭১ সালের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে আমাকে যে চিঠিখানি লিখেছেন সেটি আমাকে প্রকাশ করতে বলেছেন। আমি এটি পাঠকদের সমক্ষে পেশ করছি। চিঠি আকারে লেখা হলেও আসলে এটি একটি প্রবন্ধ। মাহ্‌বুব সাহেবের লেখা ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার। আমরা তাঁর ইতিহাসের জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করব।

—অন্নদাশঙ্কর রায়

২৭.১১.৭৩

আ'লমীন,
কাজির ডেউরী ২য় গলি,
চট্টগ্রাম।
২৯।১০।৭৩

ভাই অন্নদাশঙ্কর,

মনোজ (বসু) বাবুর ডেরায় দেখা করতে গিয়েছিলাম ১৫ তারিখ (অক্টোবর '৭৩)।

আপনি ফজলকে লিখেছিলেন: আমাকে যেন তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। আমিই গিয়েছিলাম। কারণ, তিনি অতিথি।

তাঁকে মনে হল: সোজা লোক।

আমি অনেকটা একা। মার্চের (১৯৭১) এক চরম অবস্থায় ছেলে ও বৌদের নিয়ে আমার স্ত্রী চলে যাচ্ছিলেন। আমি আমার জায়গা ছেড়ে কোথাও যেতে রাজী হলুম না। বললুম: মরি তো নিজের জায়গায় মরব।

তবে, তাঁকে থামানোর কোনো প্রশ্ন ছিল না।

ধকলটা গিয়েছে নারীর উপরই বেশি।

স্বামীকে যখন খুন করল নারীর ক্ষতিকে মনে হল অসহনীয়। কিন্তু, যার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেল, স্বামী নিখোঁজ হয়ে গেল! প্রথমা বলল: আমার তবুও সান্ত্বনা, তাকে মরতে দেখেছি, ঐ ওখানে শুইয়ে রেখেছি; কিন্তু, এ মনকে বোঝাবে কি করে!

দ্বিতীয়া দিনে এয়োতির অলঙ্কার পরেছে, যদি ফিরিয়ে দেয় এসে দেখবে, আমি ঠিক জানতুম ফিরে আসবে। রাত্রে হতাশার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অলঙ্কার খুলে রেখেছে: বিয়োগের সমুদ্রে আরও একটি দিন যোগ হল। এই 'ভিজিল'-এর কোনো তুলনা আছে কি?

মনোজবাবু বোধ হল কিছু ছবি আঁকতে চাচ্ছেন।

আমি বললুম: কল্পনা অত দূর পৌছতে পারে না। ধরুন: হল্যাণ্ডে ট্রেইণ্ড হাইড্রোলিক ইঞ্জিনিয়ার নূর হোসেনের কথা। তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে, তিনি নিখোঁজ। শিশু ছেলেটা বেশ দুষ্টু। দুষ্টুটা একটা খেলা আবিষ্কার করেছে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠবে: আব্বু এসেছে। মার কি পড়ি করে দৌড়ে আসেন তার মা, তার দাদা-দাদী। দুষ্টুটা তখন হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। বার বার ঠকেও তাঁদের মনে থাকে না।

ধরুন, ময়মনসিংহ জেলার চর-নিকৃলি হাইস্কুলের হেডমাস্টার হরিদাসের ব্যাপার।

হরিদাস, দেবদাস, শিবদাস—আঃ দেবতার কী আনুগত্য! বিপদে দেবতা রক্ষা করবেন হয়তো—এটাই ছিল প্রত্যয়। কিন্তু, দেবতা ফিরে তাকান নি, বিপদের উপর বিপদ দিয়ে উপহাস করেছেন।

স্কুলের হেডমাস্টার আর য়ুনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান একই স্তরের পুরুষ-প্রবর। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক থাকে সৌহার্দ্যের। কিন্তু, একদিন চেয়ারম্যান হরিদাসকে জোর পূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে থানার দারোগা মসিহুর রহমানকে বুঝিয়ে দেয়। ফিরে এসে বড় ছেলে দেবদাসকে বলে: থানায় বাপের জন্যে খানা নিয়ে যাবি, বাপ-বেটা এক সঙ্গে চলে আসবি।

দেবদাস খানা নিয়ে থানায় যায়। কিন্তু, তার আগেই দারোগা হরিদাসকে হাওলা করেছে হানাদার বাহিনীর লেঃ খানওয়ারের। অধিকন্তু, দেবদাসকে আটক করে রাখে।

বাপ আর বড় ভাই যখন ফিরল না ছোট ছেলে শিবদাস পা বাড়ালে ভারতের আশ্রয়ের পথে। আর, কিছু দূর গিয়েই ধরা পড়ল হানাদার বাহিনীর হাতে।

পুরুষগুলি মুছে গেল সংসার থেকে। কোন সাহিত্যিক আঁকতে পারবে হরিদাসের বিধবার মর্মযন্ত্রণাকে!

পোড় খেয়ে সোনা খাঁটি হয়। বাঙলাদেশের নারীর পোড়ের কোনো তুলনা আছে কি?

নারী ধর্ষিতা হয়েছে। বন্দীত্বে বার বার ধর্ষিতা হয়েছে। তাকে শাড়ি পরতে দেওয়া হয় নি। শাড়ির ফাঁস খেয়ে কেউ যন্ত্রণার অবসান করেছিল। বার বার ধর্ষণের পর যখন অব্যবহার্য হয়ে পড়ে তখন তাদের পাইকারী হত্যা করা হয়েছে—কসাই লাগিয়ে গলা কেটে ফেলে, নদীতে ডুবিয়ে দিয়ে।

স্বামীকে ধরে নিয়ে গিয়ে খতম করেছে। কিন্তু, বৌকে বলেছে টাকা দাও, ফিরিয়ে দিচ্ছি। এ ভাবে ভৈরবের ধনী মস্ত মিঞার বৌ থেকে লাখ লাখ টাকা গেলেছে। বলেছে: তোমার যৌবন দাও, তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।

স্বামী ও ঘর-সংসার ফিরে পাওয়ার জন্যে হেন ত্যাগ নেই যেটা নারী স্বীকার করতে পারে না।

আমার মাথা নুয়ে আছে, চিরকাল নুয়ে থাকবে বাঙলাদেশের নারীর পদপ্রান্তে।

পাকিস্তান ছিল ইতিহাসের রায়। কিন্তু পাকিস্তানে 'মার' হয়ে দেখা দেয় পাঞ্জাবী সামরিকতাবাদ। বাঙালির প্রতি তাদের ছিল হীনতাবোধ। বাঙালির প্রতি তাদের সাধারণ গালিই ছিল "কাফেরকা বাচ্চা"। কাফের মানে হিন্দু।

আমি প্রথম মহাযুদ্ধে বাঙালি-পল্টনে সৈনিকতা করেছি। ১৯২০ সালে এই ধারণা নিয়ে ফিরে আসি যে বাঙালি মুসলমানের ভালো আর্মি হবে। পরে দেখি যে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মির কর্তৃপক্ষও একই ধারণা করেছেন। তাঁরা সেই অনুযায়ী উদ্যোগও নিতে থাকেন।

পাকিস্তান হল ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট। প্রধান সেনাপতি ফ্রাঙ্ক মেসারভী ঢাকায় ১৭ আগস্টই এই উদ্যোগকে স্বীকৃতি দিলেন এক ভাষণে।

বাঙালি মুসলমানের কয়েকটি য়ুনিট হল। সাধারণ পরিচয় 'ঈস্টবেঙ্গল রেজিমেণ্ট,' বিশেষ পরিচয় 'বেঙ্গল টাইগার্স'—যার চরিত্র হল grace, strength আর speed.

'বেঙ্গল টাইগার্স' গড়ে উঠল পাঞ্জাবী চালনায়, পাঞ্জাবীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

যখন একদিন করাচি গিয়ে নামল, disembarkation-এর যে যোগ্যতা ও শৃঙ্খলা দেখালে তাতে দর্শকরা বললে: একখানা রেজিমেণ্ট যা হয়েছে! তারপর যেখানেই যায় পাঞ্জাবীদের সে কী আদর! বুড়ি মায়েরা ঘড়া ঘড়া 'লসসি' নিয়ে আসে, খাও বেটারা। দোকানি কনসেসন দেয়, সিনেমা ফ্রী।

অতঃপর বাধল ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধ। লাহোরের পতন হবে সকলে ধরে রেখেছিল। অভিজাত *Times* খবর দিয়েছিল পতন হয়েই গেছে। কিন্তু, পতন হল না। বেদিয়ানে বেঙ্গল টাইগার অদ্ভুত যুদ্ধ করলে। জনসাধারণ কৃতজ্ঞতায় একেবারে গলে গেল। বিভূষণের তালিকা যখন বেরুল তখন দেখা গেল সিংহের ভাগ পেয়েছে টাইগার্স। কিন্তু, পাঞ্জাবী ক্ষাত্রবীর্য হয়ে পড়ল ঈর্ষান্বিত। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কিছু সংখ্যক বাঙালি সামরিক অফিসারকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছিল—যাদের রেকর্ড ছিল অতি ভালো।

'মার' যখন কাজে নামল—নারীদের কথা পূর্বে বলেছি—আকাশ ভেঙে পড়ল হিন্দুদের মাথার উপর। হিটলারের যেমন বিশ্বাস ছিল সব গোলযোগের পেছনে Little Jew—এরাও ধরে নিলে সব গোলযোগের মূলে 'মলাউন' (অভিশপ্ত)। একজন বিখ্যাত নেতা 'হিন্দু' বলতেন না, বলতেন 'মলাউন'।

'আলাপ' এ তখন আমি বলেছিলাম ভারতে রাষ্ট্র-মন সুস্থ, কিন্তু সমাজ-মন অসুস্থ। আর, পাকিস্তানে রাষ্ট্র-মন অসুস্থ, কিন্তু সমাজ-মন সুস্থ।

এখন 'মার'-এর চাপে একদিকে শুরু হল বাঙালি-বিহারী হানাহানি (বিহারী মানে অবাঙালি, বিহারীরা যার মধ্যে প্রধান), অপর দিকে বাঙালি মুসলমানও স্থানে স্থানে প্রতিবেশী হিন্দুদের উপর এক হাত নিতে কসুর করলে না—যে উন্মত্ততা আমাকে অত্যন্ত ব্যথা দিলে।

হায়, আমার নিজ জেলাতেই! পটিয়া থানার শিকলবাহা গ্রামের নাথপাড়া। ১৯৭১ সালের ২ শে এপ্রিল। নিশীথ রাতে একদল দালাল পাড়া আক্রমণ করে লুটপাট ও পুরুষ-মেয়ে নির্বিশেষে তাদের উপর জুলুম চালাতে থাকে। সকালে সম্পন্ন অধিবাসী প্রফুল্লচন্দ্র নাথ প্রভৃতি ৭জনকে ধরে নিয়ে যায়। য়ুনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং প্রতিপত্তিশালী এক নাগরিক বাধ দিয়েছিলেন। প্রফুল্ল বলেছিলেন: নাথপাড়ার আমরা সকলেই মুসলমান হয়ে যাব, পাকা মসজিদ দিয়ে দেব, কিন্তু কিছুই তাদের বাঁচাতে পারে নি। দালালরা তাদের নিয়ে গিয়ে চাক্তাইর ক্যাম্পের হাওলা করে। আর দোস্ত মোহম্মদ বিল্ডিংয়ের সামনে ঐ দিনই মিলিটারি তাদের গুলি করে মারে।

তবে, ধর্মের ভেক ধরে কেউ কেউ রক্ষাও পেয়েছে।

লালদিঘির উত্তর পাড়ে এমেরিকান হোমিও স্টোর্স প্রায় ৬০ বৎসরের বনেদী প্রতিষ্ঠান। তাদের চেহারা-স্বরৎ আমাদের সুপরিচিত। ঔষধের প্রয়োজন হয়েছিল। প্রায় দোকানই বন্ধ। সময়টা ই জুলাই। গিয়ে দেখি এই দোকানটা খোলা। কিন্তু, ওমা! চেয়ারে বসে আছেন ইয়া লম্বা দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ ডাক্তার। সাইনবোর্ড ঝুলছে ডাক্তার এম রহমান। কিন্তু, এই নামের কোনো ডাক্তার স্মরণ করতে পারলুম না। আলাপ করে দেখি ডাক্তার মণীন্দ্রবিকাশ দাশ, ইনি যে সস্ত্রীক মুসলমান হয়েছেন। বয়স ৭৩।

তবে, মানুষ মনুষই। আমাদের নারীদের যেমন সব ক্ষতি সত্ত্বেও প্রতিম আরও বেড়ে গিয়েছে, সেরূপ ক্ষতির অমানিশার মধ্যে দাঁড়িয়েও মনুষ্যত্বের আলোক-রেখাকে আমরা ঝিলিক মারতে দেখেছি।

কাপ্তেন আমিন আহ্‌মদ চৌধুরীর ব্যক্তিগত গার্ড ছিল এক বিহারী যুবক। যুদ্ধে আহত হয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। কিন্তু, তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে গার্ড প্রাণ দিয়েছে। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও রয়েছে।

আমি আমার আবাস ছেড়ে যেতে অস্বীকার করি। সাধ ছিল: যুদ্ধ করে মরব। বলি: মরি তো নিজ ঘরেই মরব। ৩০শে মার্চ। স্ত্রী চলে যাচ্ছেন ছেলে বৌ নাতি-নাতনীদের নিয়ে।

তাঁকে বললুম: দুটি কথা মনে রেখো। প্রথমত, এক জায়গায় গিয়ে যাওয়ার শেষ হবে না। বহু জায়গায় যেতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমার সাথে আর দেখা নাও হতে পারে।

৫ই এপ্রিল পাঞ্জাবী আমার বুকে বন্দুকের কুঁদা দিয়ে মারে। ১০ই ও ১৫ই এপ্রিল আমি সার্কিট হাউসে হানাদার কমাণ্ডারের সাথে বাদানুবাদ করতে যাই। ১ম তকরার: সোনার বাঙলা শ্মশান কেন? আওয়ামী লীগের লক্ষ লক্ষ পোস্টার এখনও যত্র তত্র ঝুলছে। এতে disparityর ফিরিস্তি দেওয়া আছে। তোমরা তার উত্তর দাও নি, অথচ এই যুদ্ধ বাধিয়েছ। হয় উত্তর দাও, নতুবা ঘোষণা করো যে সব disparityর অবসান হল, বাঙালি বিগত disparity মাফ করে দেবে। কমাণ্ডার ও এডজুট্যাণ্ট মিলে আর্দালিকে দিয়ে খবর পাঠায় যে আমরা তাঁকে লিখিত উত্তর পাঠাব। কিন্তু উত্তর আসে নি। সেটা কি আর ফীল্ড কমাণ্ডারদের কাজ!

দ্বিতীয় তকরার: সৈন্যরা আমার দুটি মুর্গি ধরে নিয়ে গিছল। প্রশ্ন:

মিলিটারি পুলিশ বসানো হয় নি কেন? বস্তি এলেকাকে out of bounds করা হয় নি কেন?

আমার মোটেই ভয় ছিল না। বরং দ্বিতীয় দিন কথাবার্তায় একরূপ অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায় এবং রাগও। সেন্ট্রি এটাকে গোস্তাখী গণ্য করে আমাকে মারবার জন্যে বন্দুক উঠায়। কিন্তু, আরেক সেন্ট্রি আমাকে কেড়ে নেয়। এদের বিস্ময় ছিল: এই বাঙালি বাঘের মুখে এল কি করে! কারণ, বিহারী সঙ্গে না নিয়ে কোনো বাঙালিই তখন কমাণ্ডারের হেড কোয়ার্টারে যাচ্ছিল না।

আমি মরতে ভীত ছিলাম না। কিন্তু, মানুষ torture সহ্য করতে পারে না। যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে চিৎকার করেছিলেন: এলি এলি, লামা সবোক-তানী! হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ! জোয়ান অব আর্ক স্টেইকে পোড়া সহ্য করতে না পেরে 'ডিক্যাণ্ট' করেছিলেন। আমাদের বহু বুদ্ধিজীবীকে torture করে হত্যা করা হয়। মেরে ফেলার পূর্বে তাদের নাক কান কেটে ফেলা হয়।

স্বাধীনতার কি মূল্যই না আমরা দিয়েছি!

এই তকরারের পর আমার মনে হল আমি সার্কিট হাউসের এত কাছে আর ওদের এত জানা হয়ে গেছি যে আমার পরিবারে ঢুকে ওরা জুলুম চালাবার প্রয়োজন বোধ করবে না। সুতরাং তাকীদ হল পরিবারকে খুঁজে স্বস্থানে নিয়ে আসা।

পরিবার ততদিনে ৬বার আশ্রয় বদলে উত্তর দিকে ৩৩ মাইল দূরে এক পাহাড়ী গাঁয়ে অবস্থান কচ্ছে।

১৭ই এপ্রিল তাদের নিয়ে নৌকায় রওয়ানা হয়েছি। ২৯জনের দল। পথে এক বৌয়ের প্রসব হয়ে আমরা ৩০জন হয়ে গেলুম। আসন্ন-প্রসবার কষ্টটা বুঝুন। প্রাণ ও ইজ্জতের ভয়ে স্থান থেকে স্থানে পলায়নে তাকে সকলের সঙ্গে সমানে পাল্লা রাখতে হয়েছে।

সুখ-প্রসব হয়ে গেল। আমার কাঁধ থেকে একটা বোঝা নামল। কিন্তু, আসল বোঝা শর্তার ঘাটে পাক-মিলিটারি প্রত্যেক নৌকা চেক কচ্ছে - তার কি করা! দলে আছে ৫টি যুবক—বাঙালি যুবক দেখলেই ওদের চোখ টাটায়। যদি ওদের বলে "উঠে এসো" তবে তো আমি গেছি। জীবনে এরকম পরীক্ষায় কখনও পড়ি নি। আর, অনেক বিচার-বিবেচনা করে তাদের আমার সঙ্গে নিয়ে আসারই বুদ্ধি করেছি।

তখন প্রতিরোধযুদ্ধ চলছে। ১০ই এপ্রিল আমরা উভয়পক্ষের ক্রস-ফায়ারের মাঝে পড়ে গিয়েছিলুম। কোনোরূপে বেরিয়ে আসলুম।

এক হাটে মুড়ি কিনতে উঠলুম। মুড়ির খুচি সের কেউ হাঁকছে আট আনা, কেউ সাত আনা, কেউ ছয় আনা। এক অতি বৃদ্ধ মুসলমান দোকানদার বললেন: আমি নেব পাঁচ আনা, তার বেশি কি করে নেওয়া যায়!

তিনি কাঁদছিলেন। জিজ্ঞেস করলুম: কাঁদেন কেন? বললেন: বাবা, দেশের অবস্থা কেন এমন হল? হিন্দুদের উপর এত জুলুম কেন, তাদের কি দোষ!

এই ঝিলিক মানবিকতার।

বাঙলাদেশের নারীর কথা আমি বলেছি। অতঃপর সাধারণ মানুষের মহিমা আমাকে অভিভূত করেছে—যাদের প্রতীক এই বৃদ্ধ দোকানদার। যখনই দেখতে পেয়েছে যে 'মার' মৃত্যু না দিয়ে ছাড়বে না অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে সে মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়েছে যেন এটাই স্বাভাবিক। শুধু একজনকে বলতে শুনেছি: আল্লা, আল্লা, এত জুলুম হয় তা কি তুমি দেখতে পাও না!

অস্ত্রধারীদের অপেক্ষা অস্ত্রহীনদের সাহসই যে বড় হতে পারে তার প্রমাণ রেখে গেছেন আমাদের এক বন্ধু—গাউঙ্গান থানার গহিরার নূতনচন্দ্র সিংহ। যৌবনে জীবিকার সন্ধানে আকিয়াবে চলে যান। সেখানে সাবান ও আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবসা শুরু করেন। অতঃপর বিহারের কুণ্ড-ধাম তীর্থে গিয়ে কবচ ধারণ করেন এবং কলিকাতা হয়ে বাড়ি চলে আসেন। এখানে কুণ্ডেশ্বরী বিগ্রহ ও 'কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়' স্থাপন করেন। ব্যবসায়ে সাফল্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি একদিকে উহাকে প্রসারিত করে আধুনিক বিরাট এক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন, অন্যদিকে গ্রামের ও এলেকার বিভিন্ন উন্নয়ন ও মাঙ্গলিক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

কুণ্ডেশ্বরীর নিজস্ব ফ্যাক্টরি, ডিসটিলারি, জল ও বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা রয়েছে। স্টাফ সহ দৈনিক প্রায় ৫০০ লোক এতে কাজ করে।

'অধ্যক্ষ' নূতনবাবু 'কুণ্ডেশ্বরী ভবন' পর্যন্ত মোটর-রাস্তা তৈরি করিয়েছেন। সারিবদ্ধ গাছ লাগিয়ে তার দুপাশকে সুশোভিত করেছেন। বালকদের প্রাইমারি স্কুল 'কুণ্ডেশ্বরী বালিকা বিদ্যামন্দির', 'কুণ্ডেশ্বরী মহিলা মহাবিদ্যালয়', 'কুণ্ডেশ্বরী ভবন ডাকঘর' স্থাপন করেছেন। দেশের মাঙ্গলিক কাজে যেখানেই তাঁর ডাক পড়েছে সেখানেই এই অমায়িক ভদ্রলোক মুক্তহস্তে দান করেছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর (এখন ভারতে বাঙলাদেশের রাষ্ট্রদূত) ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিক দেশের পক্ষে মনে প্রাণে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং তাঁর অধ্যাপকদের অনুপ্রাণিত রেখেছিলেন। প্রতিরোধ ভেঙে পড়লে ২৯শে মার্চ তিনি ৬৪জন অধ্যাপক সহ কুণ্ডেশ্বরী ভবনে আশ্রয় নেন। ৭ই এপ্রিল এই দলটির সর্বশেষ ব্যক্তি চলে যায়—ভারতের পথে।

১৩ই এপ্রিল 'মার'-এর আবির্ভাব বুঝতে পেরে তিনি সকলকে সরিয়ে দেন। কিন্তু, নিজে কুণ্ডেশ্বরীর মন্দিরকে আঁকড়ে পড়ে রইলেন। তবে, হানাদারদের অভ্যর্থনার জন্যে উঠানে চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে রাখলেন।

হানাদাররা এল ২খানি জীপে, পেছনে ৪খানা ট্যাঙ্ক। তিনি তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। বুঝিয়ে দিলেন: আমি এই কাজ করেছি, আরও এই কাজ করতে চাই। তারা সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল।

কিন্তু, দালাল-কর্তার হুকুম হয়েছে: এই মলাউনকে আস্ত রাখা যাবে না। তাই তারা আবার ফিরে এল।

অন্তিম বুঝতে পেরে তিনি মন্দিরের সম্মুখে বিগ্রহের দৃষ্টির সামনে সম্পূর্ণ আত্মস্থ হয়ে দাঁড়ালেন। তারা তাঁকে ৩টি গুলি করে। প্রথম গুলি তাঁর একটা চোখের নীচে বিদ্ধ হয়, দ্বিতীয় গুলি তাঁর হাতে লাগে, তৃতীয় গুলি তাঁর বুক ভেদ করে যায়। তিনি "মা", "মা" করে মাটিতে পড়ে যান।

শর্তাব ঘাটে আমাদের চেক হয়েছিল। পাঞ্জাবী অফিসার উপর থেকে নজর রেখেছিল, কিন্তু চেক করতে এসেছিল বিরাট-বপু এক বালুচ জওয়ান। সে গৃহিনীকে বললে: আপনি আমার মা, সদ্য-প্রসূতি বৌকে বললে: তুমি আমার বহিন। বললে: কোনো ভয় নেই, আমি শুধু দেখব তোমাদের নিকট কোনো হাতিয়ার আছে কিনা।

আহা, কত বড একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম!

আমার বিবেচনা ঠিকই হয়েছিল। তবে, ঘরে বসে করার কিছুই ছিল না। এখন, মনে হল: বাঙালি জীবনের এই অভূতপূর্ব টাল-মাটালকে ইতিহাসের রায় রূপে বুঝতে হবে। তাই ইতিহাস রচনায় হাত দিলুম। আমার বাতায়ন থেকে যা দেখেছি, যা শুনেছি, যা অনুভব করেছি তার রেকর্ড। পরে যোগ করেছি—অপরের বাতায়ন থেকে যা দেখা গেছে, যা শোনা গেছে, যা অনুভব করা গেছে—যথা সম্ভব।

এই রচনাটা শেষ করেছি ৬ খণ্ডে :

১ বিদ্রোহের বীজ

২ বীজ অঙ্কুরিত

৩ রক্ত, আগুন, অশ্রুজল, স্বাধীনতা

৪ স্মরণিকা

৫ হ ম ভি মিলিটারি

৬ ভারত পাকিস্তান-বাঙলাদেশ ফলশ্রুতি

রচনাটা আমার পত্রিকা 'জমানা'য় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এখন গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হচ্ছে। ২ ও ৩-এর প্রথম পর্ব মিলে যে গ্রন্থটি তৈরি হয়েছে সেটা ৮৬৬ পৃষ্ঠা। গোটা বই এ. টি. দেবের ডিকশনারির চেয়ে বড় হবে। আমার ইচ্ছা : সবটা মিলে একখানি বই হবে।

৬৫ সালের যুদ্ধে বাঙালি অসাধারণ শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিয়েছিল সেটা বলেছি, পাঞ্জাবী সামরিকতাবাদ সেটা নিয়েছিল ঈর্ষার সহিত, অবজ্ঞার সহিত। ফলে তারা বাঙালিকে উল্টা পিঠে ঘষতে আরম্ভ করে। তার চরম পর্যায়ে ২৬শে মার্চই ক্রুদ্ধ আস্ফালনে 'বেঙ্গল টাইগার্স' গর্জে উঠল : হাম ভি মিলিটারি।

তাদের সংহত যোগ দিলে বাঙলার যুব-শক্তি, বাঙলার ছাত্র-সম্প্রদায়। দেখতে দেখতে তাদের চেহারা বদলে গেল। গণ্ডদেশে জুলফি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। আমি বলি এ রাজ-গোখরোর চিহ্ন। বাঙলার বাঘ থেকেও বাঙলার গোখরো কত সর্বনাশা সেটা আপনি জানেন। তাদের হাতে গোপন অস্ত্র—মরণ-ছোবল।

দুয়ে মিলে আগস্ট নাগাদই সামরিক জাণ্টার হুঁস হয়ে গেল—বাঙালিদের দমন করা যাবে না। যুদ্ধের logistics জাণ্টার বিরুদ্ধে।

সারা বাঙলাদেশ যদি রাজ-গোখরোয় ভরে যায় আর তারা মরণ-ছোবল নিয়ে উদ্যত হয়ে দাঁড়ায় তাহলে কি হবে? শত্রু তো শেষ হলই। কিন্তু, তাদের মরণ-ছোবলকে থামাবে কে? তারা পরস্পরকেই ছোবল মারতে থাকবে। বাঙলাদেশে এখনও তা-ই চলছে। কেউ তাদের শান্ত করতেও পচ্ছে না, খেলাতেও পাচ্ছে না।

আত্মরক্ষা করাই পাক-মিলিটারির পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বাঙালির নিকট আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষাও ভারতের নিকট পরাজয় স্বীকার করলে তবুও ইজ্জৎ থাকবে। তাই এঁরা ডিসেম্বর ভারত আক্রমণ করে ভারতকে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। ভারতের ভূমিকা হল পাক-মিলিটারির বিমান-

প্রাধান্য ধ্বংস করে দেওয়া। ৬৫-র যুদ্ধে ভারতের এয়ার-মার্শাল অর্জুন সিং স্বীকার করেছিলেন যে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর সুপেরিয়র ট্রেনিং রয়েছে। আর, এই সুপেরিয়র ট্রেনিং-এর 'হীরো' ছিলেন একজন বাঙালি: স্কোয়াড্রন-লীডার এম. এম আলম। গ্রাম-বাঙলা রাজ গোখরোরা দখল করে নিয়েছিল। বিমানের সাহায্যে শহর-কেন্দ্রগুলোতে পাক মিলিটারি টিকে থেকে প্রহর গুনছিল। বিমানের অভাবে 'বেঙ্গল টাইগার' তাদের মুকাবিলা করতে পারছিল না। ভারতীয় ব্লকেড ও ভারতীয় বিমান তাদের এই ব্যবধানটা চূর্ণ করে দেয়। ১৬ই ডিসেম্বর পাক-মিলিটারি আত্মসমর্পণ করে।

আমরা স্বাধীন হলাম। কিন্তু বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নয়, বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। রাশিয়ায় স্বাধীনতা এসেছিল বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

পাক-ভারতে রাজনীতি ছিল স্লোগান-সর্বস্ব। লক্ষ্য থাকত ক্ষমতার গদী।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়: প্রয়োজন ছিল প্রেম, কর্ম ও জ্ঞানের। গান্ধী রাজনীতিতে কর্মের যোজনা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু, বাঙলাদেশে যদিও ১৯৭০।৭১ সালের মুজিব-নেতৃত্বের কোনো তুলনা হয় না, তিনিও হোতা ছিলেন স্লোগান-সর্বস্ব রাজনীতির। তাঁর প্রেম ছিল, কিন্তু কর্মে কোনো দীক্ষা ছিল না, আর জ্ঞানের একেবারে অভাব ছিল।

তিনি হলেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় -যার সাধনায় সিদ্ধি লাভ হল- কিন্ত কোথায় দেবতার বরাভয় —দেবতার চেহারা দেখেই যার ভয়ে মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম!

এখন তাঁর 'trial and error method' ছাড়া উপায় নেই। বার বার শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর হবে শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ায়।

যে সব স্বাধীন দেশ দাঁড়িয়ে গেছে সব খানেই সরকার-জনসাধারণ সম্পর্ক দো খাতি। বৃটিশরাই এ-দেশে 'মা-বাপ সরকার'-এর ধারণা বদ্ধমূল করে দেয়। যা করতে হয় করবে সরকার। এর পেছনে শোষণ চালানোর সুবিধে হত। সদ্যস্বাধীন বাঙলাদেশে কেন, ভারতেও দো-খাতি সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। স্বাধীন দেশে জনসাধারণ সরকারের অনেক কাজ করে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা ওয়াশিংটনে বিরাট এক Governmental Affairs Institute চালায়। কিন্তু, ভারত-উপমহাদেশে এই সম্পর্ক হচ্ছে এক-খাতি। সরকার লাইসেন্স দেবে, পারমিট দেবে, আর জনসাধারণ যে যতদূর পারে তার ফাঁকে নিজের নিজের উদর মোটা করে নেবে। সম্পর্ক শুধু এইটুকু।

সুতরাং, দেশে মুনাফাখোর ও চোরা-কারবারীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দ্রব্যমূল্য নিত্য উপর দিকে সিঁড়ি ডিঙোচ্ছে। তবুও স্বাধীনতার কি অপারসীম শক্তি! দুর্ভিক্ষ তো নয়ই, শহরে ভিখিরী-উপদ্রবও তেমন বাড়ে নি। বৃটিশের ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্ত বাঙলাকে স্মরণ করুন।

বিপ্লবের পথে না আসায় স্বাধীনতা সত্ত্বেও রাজনীতিতে বৃটিশ আমলের ভূত আমাদের কাঁধে চেপে রয়েছে। মনে হয়, আরও অনেক দিন থাকবে।

গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র ক্রমেই সহিংস রাজনীতি হয়ে উঠছে। রক্তের স্বাদ-পাওয়া বাঘের মতো শক্তির আসনে যারা একবার বসেছে হিংসার পথে তারা টিকে থাকবার চেষ্টা করবে : বিচিত্র কি?

সমাজতন্ত্রের পথে land-ceiling ঘোষণা করা হয়েছে। বাস্তবের মধ্য দিয়ে এখনও এই ঘোষণাকে পরীক্ষা করার কাজ বাকি।

কিন্তু, কঠিনতম ব্যাপার হল ধর্মনিরপেক্ষতা।

রাশিয়ায় চার্চ-ক্রিশ্চিয়ানিটি ছিল স্টেট রীলিজন। বিপ্লব ওটাকে বাতিল করে দেয়। তার ফলে ধর্ম রাষ্ট্র থেকে শুধু স্বাধীন নয়, শর্তাধীন সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় হয়ে যায়। শর্তের মধ্যে প্রধান হল : সব ধর্মের লোককে একই বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা আমল করতে হবে। তার বাইরে যার যার ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই।

ইসলামের একটা বিশ্বরূপ আছে। তার প্রধান plank হল নিরাকার একেশ্বরবাদ। খুঁটি হল কলেমা, নমাজ, রোজা, হজ্জ, যকাৎ—এগুলো সব দেশেই এক রকম, কোনো বিরোধ নেই। আর, কোরাণ ও রসুল। এ দুটোও তাই। একেশ্বরবাদের মুখ্য ফল হল এক মানবতাবোধ, মানুষ মানুষ ভাই ভাই এই বিশ্বাস।

ইসলাম প্রতীকবাদ, খণ্ড ঈশ্বরবাদ বা প্রতিমাপূজার বিরোধী।

রামকৃষ্ণ পরমহংস এই দুটোকে মিলাতে চেয়েছিলেন এই বলে : ঈশ্বর একই সঙ্গে নিরাকার ও সাকার হতে পারেন নতুবা তিনি সর্বশক্তিমান হলেন কিরূপে? কিন্তু, সাকার ঈশ্বরের কোনো বিশ্ব-ভূমিকা থাকে না। অন্য দিকে ইসলাম মানে শান্তি, নিরাকার একেশ্বরবাদ মেনে নিলে মানুষে মানুষে শান্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

বাঙলার প্রকৃতি রূপকধর্মী, প্রতিমাপূজার অনুকূল। শরতের বর্ণনায়

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: পুজো বাটীতে জোড় কাঠিতে বাজ্‌ছে যেন ঢাক। বস্তুত এই ঢাক-বাদ্যি বাঙলার মাটি থেকে স্বতঃ-উৎসারিত মনে হয়। কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথই প্রতিবাদ করলেন যখন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' জোর আন্দোলন চালাতে লাগল যে "বন্দেমাতরম"কে শুধু জাতীয় সঙ্গীত করলে চলবে না, তার সব কলি গাইতে হবে— যথা, "ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণ ধারিণীং··· ।" রবীন্দ্রনাথ বললেন: ওটা আমার ধর্মবিশ্বাসে বাধবে। আমি প্রতিমাপূজক নই, আমার বাবাও প্রতিমাপূজক ছিলেন না।

তাছাড়া তিনটি বৃহৎ শক্তি ইসলামের রথকে চালিয়ে নিচ্ছে।

প্রথমত, কোরাণের বাণী: ইহকাল-পরকাল মিলিয়ে মানুষের অখণ্ড জীবন— পরকালই আসল জীবন, ইহকাল তার শিক্ষানবিশী প্রস্তুতি মাত্র। ইহলোক কারো যখন স্থায়ী হল না দেখা গিয়েছে যে এই বাণী মানুষ সহজেই বিশ্বাস করে।

দ্বিতীয়ত, মিলাদ। বিশ্বাস করা হয় যে রসুলের আত্মা মিলাদ মাহ্‌ফিলে আবির্ভূত হয় এবং ভক্তরা "হে নবী, তোমাকে সালাম" ইত্যাদি রুটিন নান্দী আওড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। এর প্রভাবও বিশ্বজোড়া। ভারত-উপমহাদেশে এই কেল্লা অত্যন্ত শক্ত।

তৃতীয়ত, মুসলমানরা এক ধর্ম রাজ্যের কল্পনা করে যেটা স্থান-নিরপেক্ষ। তুর্কী খেলাফৎ তুলে দিলেও মুসলমানদের আনুগত্য রয়েছে এই ধর্ম রাজ্যের প্রতি। প্রতি শুক্রবার জুমা-র দ্বিতীয় খোৎবায় দোআ করা হয়: প্রভো, সমস্ত ইসলামী রাজ্য যেন চিরদিন স্থায়ী হয়। উভয় হেরেম (মক্কা ও মদীনা) শরীফের খাদেমের রাজত্ব তুমি অটুট রাখো। ইসলামের সোলতানের রাজ্য ও রাজত্ব তুমি চিরস্থায়ী রাখো!

লেনিন মুসলমানের ধর্মীয় বোধের এই বিশেষ চরিত্র সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, তাই সোভিয়েত রাষ্ট্রের একেবারে গোড়াতেই 'রাশিয়া এবং প্রাচ্যের সব কর্মরত মুসলমানদের প্রতি' এক বিশেষ আবেদন প্রচার করার প্রয়োজন বোধ করেন। তাঁর নেতৃত্বে 'কাউন্সিল অব পিপলস কমিশার্স' এই আবেদনে ঘোষণা করেন যে মুসলমানদের জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ, তাদের প্রথা এবং ধর্মবিশ্বাস স্বাধীন ও অলঙ্ঘনীয়; নিজের জীবনধারা চালিয়ে যাবার পূর্ণ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা রাষ্ট্র তাদের দিচ্ছে।

রাশিয়ান ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ রাষ্ট্র কোনো ধর্মেরই ধার ধারবে না। নভোচারী আকাশ থেকে নামলে ক্রুশ্চেভ ঠাট্টা করে বললেন: আমাদের

নভোচারী মহাশূন্যের সব জায়গাই দেখে এসেছে, ঈশ্বরকে কোথাও দেখতে পায় নি। সুতরাং, ঈশ্বর নেই।

রাশিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলে ইসলামী প্রভাব এবং মুসলমানের সংখ্যা খুব বেশি। ধর্মনিরপেক্ষতা ঘোষণা করার পর এই সকল অঞ্চলে চারটি 'মুসলিম থিওলজিক্যাল য়্যাডমিনিস্ট্রেশন' শুধু মুসলমানের ভোটেই গঠন করা হয়েছে। এই সকল য়্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বয়ংক্রিয়। এই ব্যবস্থার পরে ধর্মনিরপেক্ষ সোভিয়েত রাষ্ট্রে ইসলাম ও মুসলিম জীবন আরও পুষ্পিত এবং ফলাও হয়েছে।

ভারত-উপমহাদেশে ধর্মের নামে যা ঘটেছে এবং বাঙলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় তার যে বিস্ফোরণ দেখেছি তাতে আমার মত হল রাষ্ট্রমানসকে সম্পূর্ণ রূপে ধর্মবর্জিত করে তোলা। অতঃপর রাশিয়ার ন্যায় ধর্মকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দেওয়া। রাশিয়ায় দেখা গিয়েছে যে বিশ্ব-শান্তি ইসলাম ও সোভিয়েত রাষ্ট্র উভয়ের লক্ষ্য হওয়ায় তাদের মধ্যে কোনো বিরোধের অবকাশ নেই।

কিন্তু, বাঙলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ক্রমেই রূপ নিচ্ছে সব ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের সমান আচরণের। পাকিস্তান আমলেও তা-ই ছিল। বরং, সংখ্যালঘুদের বিশেষ অধিকার স্বীকার করা হত এবং বলা হত সংখ্যালঘুদের জান-মাল-নিরাপত্তা সংখ্যাগুরুদের পবিত্র আমানৎ স্বরূপ। তবুও 'মার'-এর আক্রমণ থেকে নূতনচন্দ্র সিংহ রক্ষা পান নি—যেমন পান নি বর্ষীয়ান পুরুষ-প্রবর ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত রণদাপ্রসাদ সাহা (সপুত্র), যোগেশচন্দ্র ঘোষ।

পাইকারী চিত্র আরও ভয়াবহ।

পাক-মিলিটারি এরা মে পটিয়া থানার বিরাট হিন্দু পল্লী মুজফ্‌ফরাবাদ ঘিরে ফেলে। এরা সচ্ছল, দুখানা হাইস্কুল স্থাপন করেছে। ঘেরাও করে ২৩৫ জনকে গুলি করে মারে। এদের একমাত্র অপরাধ: এরা হিন্দু। এটা আমাদের চট্টগ্রাম জেলায়। এই নিধনের কিছু কিছু যারা দেখেছে, আর্তনাদ যারা শুনেছে, তাদের কেউ চোখের জল সংবরণ করতে পারে না বর্ণনার সময়। একজন বলেন: পায়রার ঝাঁকেও মানুষ এমন বেদেরেগ গুলি বর্ষণ করে না, পাগলা কুকুরকেও এমন নৃশংসভাবে হত্যা করে না। যুবক ছেলেকে যখন তাক করে সে "বাবাগো" বলে চিৎকার করে উঠে। বুড়ো বাপ এসে সামনে বুক পেতে দেয়। গুলি খেয়ে উভয়েই মরেছে।

আরও বহু চিত্র।

অতঃপর জাতীয়তাবাদ।

বিরোধটা পেকে উঠে ভাষা নিয়ে। ভাষা নিয়ে পশ্চিম ও পূর্ব পৃথক হয়ে যায়। তখনই জন্ম নিয়েছিল রাজ-গোখরোর বাচ্চারা। "সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী, রেখেছো বাঙ্গালী করে মানুষ করোনি!" আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আওড়াতুম। আমরাই কি জানতুম, বঙ্গমাতা আঁচলে লুকিয়ে বড় কচ্ছিলেন তাঁর বাঘা ও রাজ-গোখরো শিশুদের। পাকিস্তান বুঝত শুধু গায়ের জোর, হাতিয়ারের জোর। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারা ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ঢাকায় গুলি চালালে। শহীদ ছাত্র বরকৎ ও তার সঙ্গীরা দেখিয়ে দিলে মুক্তির পথ। শহীদের রক্ত বাঙলার মাটিতে ফুল হয়ে ফুটতে লাগল। ১৯৭০।৭১-এর মুজিবের গর্জন শুনুন: আমরা রক্ত দিতে শিখেছি, যত রক্ত লাগে দেব।

এখন বাঙলাদেশের প্রত্যেক মুসলমানের ৩টা করে জাতিত্ব হয়েছে। প্রথম জাতিত্ব ইসলাম—যেটা স্থান-নিরপেক্ষ। দ্বিতীয় জাতিত্ব বাঙলাভাষীর। আমাদের শহীদেরা এ প্রত্যয় রেখে গেছে। এ দায়িত্ব একা বাঙলাদেশের নয়, সম-পরিমাণে পশ্চিমবঙ্গেরও, সম পরিমাণে বাঙলাভাষী পৃথিবীর যে যেখানে আছে প্রত্যেকের। আমাদের শহীদেরা এ প্রত্যয় রেখে গেছে যে বাঙলাদেশ মানেই বাঙলা ভাষা।

আমাদের তৃতীয় জাতিত্ব বাংগালের। এটা আঞ্চলিক।

আমি ভারত-পাকিস্তান-বাঙলাদেশ ফিলজফির কথা বলেছি। এই ফিলজফির মূল সুর হল: সিন্ধু থেকে ইন্দোনেশিয়া এটা ইন্দো-ইসলামিক বলয়। এই বলয় থেকে ভারতকেও বাদ দেওয়া যাবে না, ইসলামকেও বাদ দেওয়া যাবে না।

আপনার মনে আছে আয়ুব খাঁর উদ্যোগে আর. সি. ডি. প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তুর্কী, ইরান, পাকিস্তানকে মিলিয়ে। সিন্ধুর ওপারে আর. সি. ডি. সম্ভব ছিল। পাকিস্তান নিজেকে ইন্দো-ইসলামিক বলয়ের বাহিরে ভাবতে পারে। কিন্তু, বাঙলাদেশের জন্যে তার সম্ভাবনা কোথায়?

তবুও বাঙলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম।

এখানে ভারতে ইসলাম ও প্রতিমাপূজার পরস্পরের কাছাকাছি হওয়ার সুদীর্ঘ প্রচেষ্টা স্মরণীয়। ইসলামের সংঘাতে ব্রাহ্ম ধর্ম, আর্য সমাজ কতকগুলি নিরাকার একেশ্বরবাদী মতের উদ্ভব হয়েছে। আর, রসূলের বাণী হল: যে বলেছে আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নেই সে-ই মুক্ত। কিন্তু, আলেমরা এই বাণীকে

কাজে লাগাতে পারেন নি। অপরদিকে বাঙলাদেশে সার্বজনীন দুর্গাপূজা বলে বলি-হীন অনুষ্ঠান একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তবে, শংকরের শক্তিশালী গল্পের পরও অনেক বন্ধু তর্ক করেন যে প্রতিমা নির্মাণে বেশ্যার দ্বারের মাটি অপরিহার্য।

তবে, রাজ-গোখরোদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ছিল না। আগে মুসলমানের হিন্দু পত্নীর নজির ছিল। এবার দু-চারটে হিন্দুর মুসলমান পত্নীরও নজির দেখা যাচ্ছে। তবে, এগুলো ব্যতিক্রম। ধৃ ধাতু মন্ করে ধর্ম। আমাদের ধাতই এ রকম যে ধর্ম ছাড়া আমরা থাকতে পারিনে। ব্যক্তিজীবনে এবং সমাজজীবনে আবার প্রতিক্রিয়া আসতে পারে। হয়তো, সেটাই আমাদের দেখতে হবে।

ধরুন, 'বেঙ্গল টাইগার্স'। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, অস্ত্র-শস্ত্র, orientation সবই ছিল আমেরিকা থেকে। রাজ-গোখরোরা যেমন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, টাইগাররাও তেমন সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাদেরও ব্যবহারের বা খেলাবার অবকাশের অভাব।

আর একটা ভুল নীতি হল মুজিবনগরে অর্থাৎ ভারতে যারা আশ্রয় নিয়েছিল তাদের দরজা বড় যারা বাঙলাদেশে রয়ে গিয়েছিল তাদের থেকে।

কোরাণের একটা সূত্র আছে: ন্যায়ের জন্যে যারা দেশত্যাগ করে যায়, যারা ধর্মযুদ্ধ করে নিজের ধন দিয়ে প্রাণ দিয়ে—আল্লার নিকট তাদের দরজা উত্তরোত্তর বড়। দেশত্যাগীদের অপেক্ষা ধর্মযোদ্ধাদের দরজা বড়। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও এটাকে সত্য বলে জেনেছি।

কোনো কোনো গোটা পরিবারই দেশ ছেড়ে না গেলেও ধরে রেখেছিল: আগে মুক্তিযুদ্ধ, পরে অন্য কাজ। যেমন পাবনার এক হেডমাস্টার মোতাহার হোসেন পরিবার। বড় ছেলে মোকর্‌রম, মেজ ছেলে মনসুর সংসারধর্মে প্রবেশ করে কেরানীর কাজ করত। সেজ ছেলে আঞ্জু এবং কনিষ্ঠ ছেলে রঞ্জু কলেজে পড়ত। তারা সকলেই ঠিক করে, আগে মুক্তিযুদ্ধ পরে অন্য কাজ। এমন কি তাদের ভগ্নীপতি যুসুফও দলে ভিড়ে যায়। ২৫শে মার্চের পর আঞ্জু ও রঞ্জু প্রতিরোধ-সংগ্রামে প্রাণ হারায়। অপরেরা তাদের কাজ চালিয়ে নিতে থাকে। কিন্তু, ১২ই ডিসেম্বর পাঞ্জাবীরা তিনজনকেই ধরে ফেলে হত্যা করে। বৃদ্ধ মোতাহার হোসেন এবং তাঁর স্ত্রীকে আপনি কি সান্ত্বনা দেবেন? বলবেন নাকি যে যেহেতু তোমরা মুজিবনগরে পালিয়ে যাও নি, তোমাদের দরজা ছোট!

এন্থনী ম্যাসকেরানহাস এই ব্যাপারকে বলেছেন রাজনীতিকগণ কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধাদের 'পিঠে সওয়ার' হওয়া।

*   *   *   *   *   *

হিন্দু সহকর্মীকে রক্ষা করতে গিয়ে আমাদের কোনো কোনো মুসলমান অফিসার প্রচুর বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। এখন ঐ সহকর্মীদের কেহ কেহ তাঁদের এড়িয়ে চলেন। এর কারণ আমি বুঝি। যে অবস্থায় তাঁরা পড়েছিলেন সেটা স্মরণ করতে তাঁদের লজ্জা হয়।

বহু বাঙালি ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেটাও এমন মনুষ্যেতর অবস্থার মধ্যে যে তাঁদের স্মরণ করতে লজ্জা হয়। একদিন উহা শুধু ইতিহাসের রেকর্ড হয়ে থাকবে।

আপনার প্রীতি-সিক্ত

মাহবুব-উল্-আলম।

বাঙলাদেশের প্রবীণ সাহিত্যিক মাহবুব-উল্-আলম সাহেবের এই চিঠির কোনো কোনো অংশ বিতর্কমূলক।

তাছাড়া, প্রতিবেশী বাঙলাদেশ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র, জন্মলগ্নেই তার সঙ্গে আমাদের রক্তের রাখিবন্ধন হয়েছে। বাঙলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে মাহবুব সাহেবের মূল্যায়নের সঙ্গে একমত হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, সংগতও নয়।

ইতিহাস-বিচারের দৃষ্টিভঙ্গীগত মতপার্থক্যের এই অবকাশ সত্ত্বেও প্রবীণ মাহবুব সাহেবের দীর্ঘ চিঠিটি ঈষৎ সম্পাদিত আকারে প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। কারণ বাঙলাদেশের জন্মযন্ত্রণার কিছু ছবি এতে অনবদ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে। বাঙলাদেশের প্রবীণ মনস্বী জনাব আবুল ফজলের 'দুর্দিনের দিনলিপি'র কয়েক পৃষ্ঠা 'পরিচয়'-এ প্রকাশ করতে পেরেও আমরা কৃতার্থ বোধ করেছিলাম।

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়কে ধন্যবাদ। কারণ, নিজ ভূমিকা সহ চিঠিটি প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে তিনি 'পরিচয়'-এর প্রতি তাঁর পক্ষপাতের পরিচয় দিয়েছেন। —সম্পাদক

জারোয়া

দিনেশচন্দ্র রায়

"The Andamanese are an ill-favoured race, black, wooly headed and short of stature. They are excellent allies at convict catching in case of escape, and they are great at fishing and the collection of birds' nests."

Editorial, *The Statesman*, August 5, 1898.

জারোয়াদের সম্পর্কে প্রায় কেউই কিছু জানে না। নৃতাত্ত্বিক অজ্ঞতা আরও বেশি। যা কিছু জানা যায় তা লোকপরম্পরায়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে, টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতাগুলো একসঙ্গে জোড়া লাগিয়ে। আসলে উঙ্গিদের (ongis) ওপর নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা মোটামুটি বেশ ব্যাপকভাবে হয়েছে, উঙ্গিদের ওপর গবেষণা ও তাদের জৈব এবং অজৈব সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে করতে জারোয়াদের সমস্যা প্রথমে নৃতাত্ত্বিকদের নজরে পড়ে। কিন্তু জারোয়াদের নিয়ে গবেষণা বা সমীক্ষার প্রধান বাধা—তারা অদৃশ্য, বঙ্গোপসাগরের তীরে নিরক্ষীয় অরণ্যের অবিনাশী মেঘের আড়ালে তারা মেঘনাদ, অসূর্যম্পশ্য, প্রচণ্ড বৈরিভাবাপন্ন। তাছাড়া সভ্য মানুষের চিরাচরিত মূর্খতা, এক শতাব্দীর শোষণ, নিষ্ঠুরতা, হনন এবং ধর্ষণপ্রবণতা এই অভিনব অপরূপ একমুঠো ভারতী নাগরিককে আজও আইনের শাসনের বাইরে, উন্নয়নের অতীতে, ভা উত্তাপের ঊর্ধ্বে ঠেলে দিয়েছে।

কিন্তু একটা তথ্য খাঁটি যে বৃহৎ আন্দামানে (গ্রেট আন আগমন খুব দূর অতীতে হয় নি। আসলে, ক্ষুদে আন্দা তারা বাসিন্দা, সেইখানের উঙ্গিদের সঙ্গে তাদের জারোয়াদের বর্তমান বিচরণক্ষেত্র হলেও প পক্ষে সমস্ত ঘটনাটা খতিয়ে দেখলে

দ্বীপে এসে তারা সব জড়ো হয়, তারপর আস্তে আস্তে দক্ষিণ মধ্য এবং উত্তর আন্দামানে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা কাল্পনিক নয়—এটা আজও সমান সত্য। উঙ্গিদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে তারা ক্রমশ উত্তর দিকে অনুপ্রবেশ করতে চায়। উত্তরমুখী প্রবণতার প্রচুর প্রমাণও পাওয়া গেছে। শ্রীলিডিও সিপ্রিয়ানি, একজন ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক, ১৯৫১ থেকে ১৯৫৪ সরেজমিনে তদন্ত করে এই উত্তরমুখী অনুপ্রবেশের নির্দিষ্ট প্রমাণ পেয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ আন্দামান থেকে রুটল্যাণ্ড দ্বীপ পরিষ্কার দেখা যায়। পশ্চিমের দিকে দুপায়ে খাড়া হয়ে দ্বীপটা একটা অতিজাগতিক কচ্ছপের মতো যেন সমুদ্রের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। শুধু কি তাই, ক্ষুদে আন্দামান আর রুটল্যাণ্ডের মধ্যে রামায়ণের সাগরবন্ধনীর মতো কতকগুলি ছোট ছোট নির্জন প্রাণীশূন্য দ্বীপ আছে। এই দ্বীপগুলোতে উত্তরমুখো যাত্রীদের জিরিয়ে নেবার সুবিধা, তাই দক্ষিণ থেকে যাত্রা করে সব জাতির মানুষরাই এই ছোট ছোট দ্বীপগুলোতে একপায়ে একটু জিরিয়ে নিয়েছে। সমুদ্র এখানে গভীর, ক্রুদ্ধ, ক্ষমাহীন। সুতরাং ক্যানুতে এক নাগাড়ে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা অসম্ভব। কিন্তু এই দ্বীপগুলো যেন বিষ্টির জল জমা উঠোনে পাতা ইট, এক ইট থেকে আর-এক ইটে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘরে পৌছনো যায়। সিপ্রিয়ানি প্রায় এগারোটা সত্যিকারের সরাইখানা দেখতে পেয়েছেন। আর প্রতিটি ট্রানজিট ক্যাম্পের ভিন্ন ভিন্ন নামও পাওয়া গেছে, যদিও সবগুলিই উঙ্গি নাম। উঙ্গিরা রুটল্যাণ্ড দ্বীপে বেশ হাত-পা ছড়িয়ে জিরিয়ে নিত, এই দ্বীপেই ওদের সঙ্গে উনিশ শতকের শেষে র‍্যাডক্লিফ ব্রাউনের দেখা হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে দক্ষিণাঞ্চল জনসংখ্যার চাপে, আদিম উপজাতিদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষের জন্য এবং অন্যান্য মানবিক কারণে বসবাসের অনুকূল ছিল না। উত্তর-আন্দামানে আগে থেকেই যে সব মানুষ বসবাস করত, জাড়োয়াদের সঙ্গে তাদের শারীরিক এবং সাংস্কৃতিক মিল ছিল।

আদিম উপজাতিরা রুটল্যাণ্ড এবং তার পরবর্তী ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়বার সময় এক দল উপকূলবর্তী অঞ্চলে এবং অন্য দল অভ্যন্তরে নিরক্ষীয় জঙ্গলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। জাপানী আক্রমণ এবং পোর্টব্লেয়ারের চারপাশে নানা উন্নয়ন-মূলক কাজের প্রসারের জন্য এই আদিম মানুষরা আরও উত্তরে ঢুকে পড়ে। এতে জাড়োয়াদের একটা প্রচণ্ড লাভ হয়, বিচরণ এবং বসবাসের জন্য একটা বিরাট এলাকা তাদের অধিকারে আসে। এর ফল হাতে হাতে পাওয়া যাবে, তারা যে সংখ্যাতে বৃদ্ধি পাবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

দুটো বিষয়ে কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই। (এক) জাড়োয়ারা দক্ষিণ থেকে উত্তরে এসেছে, (দুই) জলপথ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে উত্তরে আসার উপায় নেই। তাহলে একশো বছরের মধ্যে জাড়োয়ারা পুরোপুরি নৌবিদ্যা ভুলে গেল কি করে? কোলব্রুক সাহেব ডোঙানৌকা নিয়ে জাড়োয়াদের চলাচল করতে পর্যন্ত দেখেছিলেন। শ্রীযুক্ত গিলবার্ট রজার্স ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারিতে তাঁর 'সাপ্লিমেণ্ট টু আন্দামান অ্যাণ্ড নিকোবর গেজেটিয়ার'-এ পরিষ্কারভাবে এই ক্যানুর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। তাহলে রাতারাতি এই আদিম পিতামহরা কি করে নৌচালনা বিদ্যা বিস্মৃত হল। এটা ব্যাখ্যা করা একটু মুস্কিল। কিন্তু ব্যবহারিক বা সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের ইতিহাস একটু গভীরভাবে অনুশীলন করলে দেখা যাবে আদিম উপজাতিরা প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাদের অজৈব সংস্কৃতির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান পর্যন্ত খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। উঙ্গিদের শবদেহ সৎকার আলোচনা করলে ওপরে উল্লিখিত মতের অনুকূলে আমরা যুক্তি পাব। উঙ্গিরা আগে শবদেহ গাছে বেঁধে রাখত। কিন্তু ১৯৫১-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সিপ্রিয়ানি সাহেব বৃহৎ আন্দামানের কতকগুলি কম্যুনাল হাট বা ধর্মশালার মেঝে খুঁড়ে মৃতদেহ সৎকারের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। অন্তত জাড়োয়ারা যে সিপ্রিয়ানি-কথিত রীতিতে শব সৎকার করে তা অনুমান করার পক্ষে যুক্তি আছে। কবর দেবার আগে শবদেহকে বেত দিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধে ফেলা হয়। দুহাত এমনভাবে মুখের ওপর রাখা হয় যাতে করতলদ্বয়ে শবের দুচোখ ঢাকা পড়ে, হাঁটু মুড়ে দেওয়া হয়। এই বাঁধাবাঁধির একটা উদ্দেশ্য শবদেহ সংকুচিত করে ছোট করে ফেলা। অতঃপর 'কম্যুনিটি হাট'-এর রান্নাঘরের মেঝের নিচে মৃতকে কবর দেওয়া হয়।

জাড়োয়ারা 'কম্যুনাল হাট' ব্যবহার করে কিনা এটা জানা খুব প্রয়োজন। যদিও তাদের বাস্তুশিল্প সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত কোনো ধারণা করার মতো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কিন্তু এ ব্যাপারেও কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এল. লাপিকুঁ্য জাড়োয়া 'কম্যনাল হাট'-এর ফটো তোলেন এবং ঐ বৎসরেই সেই ফটো 'লা ট্যুর ডু মণ্ডি' পত্রিকাতে ছেপে বের হয়। পোর্টম্যান তাঁর 'হিস্ট্রি অব আওয়ার রিলেশান্স উইথ দি আণ্ডামানিজ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে জাড়োয়া 'হাট'-এ প্রায় একশ লোক একসঙ্গে শুতে পারে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই খাঁড়ি উপত্যকা এবং কন্সট্যান্স খাঁড়ি অঞ্চলে যথাক্রমে .৮৮৪ এবং ১৮৯৯ সালে এ ধরনের কুটির দেখা গিয়েছিল। পোর্টম্যান

ছাড়াও স্যার আর. টেম্পল এ বিষয়ে বিবরণ দিয়ে গেছেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ভারতবর্ষের সেন্সাস রিপোর্টে পোর্ট অ্যানসন অঞ্চলের একটা এই প্রকার 'কম্যুনাল হাট'-এর নক্সা আছে। এই নক্সা অনুযায়ী এই বাড়িগুলো খুব মজবুত, লম্বায় ষাট ফুট, প্রস্থে চল্লিশ ফুট, ব্যাসার্ধ চুয়ান্ন গজ। সাতটা খুঁটি বৃত্তাকারে চাল ধরে রেখেছে। জমি থেকে চাল প্রায় তিন ফুট উঁচুতে। এই কুটিরে একশো লোক বেশ ভালোভাবে শুতে পারে। সাতটা খুঁটি জুড়ে মালার মতো দুশো মনুষ্য-করোটি ঝোলানো। ১৯৫৬ সালে সিপ্রিয়ানি সাহেবও খুদে আন্দামানে এই একই রকমের কুটির দেখেছিলেন। উপরোক্ত তথ্যগুলো থেকে অনুমান হয় যে ঘন বর্ষাতে জাড়োয়ারা এই সব কুটিরে সমবেত হয়।

আন্দামানের সমস্ত উপজাতীয় সংস্কৃতির জন্মদাত্রী উঙ্গি সভ্যতা। জাড়োয়াদের অজৈব সংস্কৃতিও তাই এই জননী সভ্যতারই গর্ভজাত। উঙ্গি আর জাড়োয়া দুই ভাই। সমস্ত আন্দামানে ধনুক আর ক্যানু বানানোর পদ্ধতি মূলত উঙ্গিরা শিখিয়েছিল। উঙ্গি ও জাড়োয়ারা নিতম্ব নৃত্যে খুব পারদর্শী, কিন্তু আন্দামানীরা এই ধরনের নাচ জানে না। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জাড়োয়ারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে। কিন্তু আন্দোমানী এবং উঙ্গিরা তাদের যৌনাঙ্গ সামান্য একটা আচ্ছাদন দিয়ে ঢেকে রাখে। সেটাও হালে।

আন্দামানে এক উপজাতি আর-এক উপজাতির ভাষা কিছুই বুঝতে পারে না। অর্থাৎ উপকূলবাসী আন্দামানীরা জঙ্গলের আন্দামানীদের ভাষা বোঝে না। তেমনি, জাড়োয়া উঙ্গি একে অন্যের ভাষা বুঝতে পারে না। এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে উঙ্গি ভাষাই সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের মূল ভাষা ছিল। কালক্রমে উঙ্গি, আন্দামানী, জাড়োয়া এবং সেন্টিনেলিজ এই চারটি উপজাতি আঞ্চলিকভাবে বিভাজিত হয় এবং সম্পূর্ণভাবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে উচ্চারণগত পরিবর্তন ব্যাপকভাবে ঘটে।

উঙ্গি এবং জাড়োয়া ভাষার উৎস বর্তমান পৃথিবীর কোনো প্রধান ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না, আফ্রিকা মহাদেশের কোনো ভাষার সঙ্গে উপরোক্ত দুটি ভাষার কোনো মিল নেই। সুতরাং ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজ জাহাজ ডুবি হওয়া কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসরা আন্দামান উপকূলে সাঁতরে উঠেছিল এ তথ্য ধোপে টেঁকে না। দ্বিতীয়ত আন্দামান দ্বীপমালা যখন সমুদ্রগর্ভ থেকে দিনের আলোর মুখ দেখেছে, তখন মূল ভূখণ্ডে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আবির্ভাব সম্পূর্ণ, অতএব প্রাণীজগতের স্বাভাবিক বিবর্তনের থিয়োরিও এক্ষেত্রে অচল

তাহলে এ মানুষগুলো এল কোথা থেকে। এই রহস্য এখনও অনুদ্ঘাটিত। এটা অনুমানযোগ্য যে জাড়োয়া বা উঙ্গি ভাষা স্বয়ম্ভু, কোনো মূল ভাষা-গোষ্ঠীর সঙ্গে এদের কোনো আদান-প্রদান নেই, আদি মানুষের স্বরগত ধ্বনির বিশুদ্ধতম অবস্থাতে এই ভাষা এখনও বিরাজমান। প্রাচীনতম উঙ্গি স্বরধ্বনির বিকার অথবা বিকাশ আন্দামানের চারটি উপজাতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে হয়েছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উচ্চারণরীতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে ভাই ভাই হলেও কেউ কারো কথা বোঝে না।

সুতরাং ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষার বিবর্তন খুব একটা অগ্রসর হতে পারে নি। ফলে স্বরধ্বনির সর্বজনগ্রাহ্য মোটামুটি কতকগুলি বৈচিত্র্যকে শব্দ হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং সাইন ল্যাংগুয়েজ বা শারীরিক অভিব্যক্তি দ্বারা শব্দের অভাব বহুলাংশে পূরণ করা হয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যাপক আলোচনার অবকাশ আছে।

উঙ্গিরা যেমন উঙ্গি' শব্দের অর্থ জানে না, জাড়োয়ারা তেমনি 'জাড়োয়া' বলতে কি বোঝায় তা বোঝে না। এই দুই উপজাতিই তাদের এই দুই নাম গ্রহণ করতে রাজী না। উঙ্গিরা নিজেদের 'এন ইরিগেলি' নামে অভিহিত করে। এন ইরিগেলি শব্দের অর্থ "পরিপূর্ণ মানুষ", অর্থাৎ আর সবাইয়ের তুলনায় তারা শ্রেষ্ঠ। জাড়োয়াদের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা। সুতরাং উঙ্গি এবং জাড়োয়া এই শব্দযুগলের জন্মরহস্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

জাড়োয়া শব্দের মতো তাদের জনসংখ্যা আরেক দুরূহ রহস্য। হয়তো বা দুরূহতর। তাদের সংখ্যা কত? দুহাজার না দুশো? সত্যি এর কোনো পাকা হিসেব নেই। কিন্তু লোকমুখে শোনা, আটশো থেকে দেড় হাজারের বেশি জাড়োয়া আন্দামানে নেই।

যে জাড়োয়াদের নিয়ে সভ্যতার এত জ্বালা, তারা শুরুতে সত্যিকারের গুডবয় ছিল। আসলে তাদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নিষ্ঠুর আর হিংস্র করে তোলা হয়েছে। যে কোনো মাইনরিটি বা অনুযান সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্য একটা সাদামাটা পথ আছে। যেখানে সংখ্যালঘুরা দূরে নিজেদের পরিবেশে বিচ্ছিন্ন থাকলে অর্থ নৈতিক শোষণ থেকে পরিত্রাণ পাবে সেখানে তাদের বিচ্ছিন্ন থাকতে দেওয়াই শ্রেয়, কিন্তু বিচ্ছিন্নতা যদি কোনো প্রতিষ্ঠিত শোষণের অনুকূলে হয় তবে তাদের সভ্যতার মূলস্রোতে মিলিয়ে দিতে হবে। গলায় ফোটা মাছের কাঁটার মতো "শোষণ" বিবেচ্য বিষয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইতিহাসের উদ্বৃত্ত এঁটো পাতা নয়, কিম্বা পিঠের কুঁজও নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে যোশেফ স্তালিন উপরোক্ত

সমীকরণ দ্বারাই অনুযান সম্প্রদায়ের সমস্যাবলীর স্থায়ী সমাধান করেছিলেন। এতো ভালোভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আর কোথাও দেখাশোনা করা হয় নি। ভারতে অনুরূপ সমস্যা প্রবল হলেও. কেউ কোনোদিন মন দিয়ে এ বিষয়ে ভাবে নি। এখনও কেউ ভাবে না. কেউই ভাবে না। এই পরিস্থিতিতে জাড়োয়ারাও প্রথমে বৃটিশ শাসনকালে সাম্রাজ্যবাদী উন্মার্গগামীদের হাতে নাজেহাল হয়েছে, আর বর্তমানে কল্পনাশক্তিহীন পাঁশুটে ফাইলবাহিনীর স্বদেশী সেনাপতিদের মন থেকে বিস্মৃত হচ্ছে। কিন্তু তার পুরো ব্যাপারটা বোঝবার জন্য পেছন ফিরে তাকানো দরকার।

পোর্টম্যানের আন্দামান অ্যালবামের তিনটি কপির প্রথমটি তৎকালীন ইণ্ডিয়া অফিসে, দ্বিতীয়টি বৃটিশ মিউজিয়মে এবং তৃতীয়টি কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে জমা পড়ে। চতুর্থ কপিটি তিনি নিজে রেখেছিলেন, কিন্তু কালক্রমে নানা হাত ঘুরে সেটা বর্তমানে কলকাতা যাদুঘরের নৃতত্ত্ব বিভাগে সংরক্ষিত আছে। সেই অ্যালবামের একটি ছবির নিচে পরপর দুটি আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দিয়ে পোর্টম্যান লিখেছেন, "হান্টিং জাড়োয়া" ; ঠিক যেমন করে রয়াল বেঙ্গল টাইগার বা আফ্রিকার সিংহের কথা লোকে লেখে। কিন্তু এ হেন পোর্টম্যান সাহেবও লিখেছেন, "জাড়োয়ারা প্রথমে মোটেই আমাদের কোনো ক্ষতি করে নি, কিন্তু আমরাই চটকে চটকে লেবু এতো তেতো করেছি যে এখন তারা আমাদের দেখলেই মারতে আসে।" দ্বিতীয়ত, এই সাহেবেরই উল্লিখিত দলিল থেকে জানতে পারি যে আকা-বি এবং আন্দামানী নামে দুটি উপজাতিকে বশে এনে সাহেবরা জাড়োয়াদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। এই সব বাধ্য উপজাতিরা প্রচণ্ড হিংস্রতা নিয়ে জাড়োয়া-নিধনে নিজেদের নিয়োগ না করলে তাদের খাওয়াদাওয়া নেশাভাঙ বন্ধ করে দেওয়া হত। আসলে মদে গাঁজাতে আফিমে এবং অবিরত ধর্ষণের প্রতিক্রিয়া যৌনব্যাধিতে খিন্ন এই উপজাতিরা সাহেবদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল। ফলও হাতে হাতে ফলেছে, একশো বছরের মধ্যে আট হাজার থেকে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র তেইশজনে।

জাড়োয়াদের খতম করার জন্য দিনের পর দিন পিটুনি অভিযান চালানো হয়েছে—১৯০১ (টম্পল), ১৯১১ (লাইস), ১৯২১ ও ১৯৩১ (বার্নিংটন)। সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায় ১৮৮৪, ১৮৯৬, ১৯০২, ১৯১০ এবং ১৯১৮ সালে পরপর খতম অভিযান চালানো হয়, আজও তার শেষ হয় নি।

এই সব অভিযান ছিল হিংস্র, নিষ্ঠুর এবং রক্তে মাখামাখি। চারদিক ঘিরে

এদেরকে খতম করার জন্য একবার নয় বারবার সৈন্য লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযানগুলো প্রধানত দুটো কারণে চালানো হয়েছিল।

পোর্ট ব্লেয়ারে নেমে সাহেবরা জাড়োয়াদের ঠেলে আরও উত্তরে যখন সরিয়ে দিল তখন লাঠালাঠি তেমন হয় নি, কিন্তু কালক্রমে সেই ঘন নিরক্ষীয় অরণ্যাঞ্চলে সরে গিয়েও জাড়োয়ারা রেহাই পেল না। সাহেবরা মূল্যবান কাঠ আহরণ এবং জমিদারি বিস্তারের জন্য ওদের পেছু পেছু এগিয়ে এল। জাড়োয়ারা এবার দাবি করল যে তাদের চারণক্ষেত্র তাদের রিপাবলিক এবং সেখানে সাদা প্রভুদের মাতব্বরি চলবে না। ওরা রুখে দাঁড়াল। ফলে শুরু হল এক শতবর্ষব্যাপী অসম যুদ্ধ। এই হচ্ছে প্রথম কারণ। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই যুদ্ধ আজও চলেছে—এই স্বাধীন ভারতবর্ষেও। ফলে আন্দামান-প্রশাসন বছরে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করে বুশ পুলিশ সৃষ্টি করেছে, তারা জাড়োয়া-অঞ্চল ঘিরে রাইফেলের নল সোজা করে রাতদিন পাহারা দিচ্ছে। জাড়োয়ারা মৌকামতো পেলে তীর ছুঁড়বে আর পুলিশরা জাড়োয়াদের দেখলেই গুলি করবে। এটা ভুললে চলবে না যে নির্জন নিরক্ষীয় অরণ্যের উঁচু মাচাতে নিঃসঙ্গ বুশ পুলিশরা সভ্যতার একমাত্র প্রতিনিধি। সুতরাং জাড়োয়াদের সঙ্গে সভ্যতার সম্পর্ক বুশ পুলিশদের সঙ্গে তাদের গুণগত সম্পর্ক দ্বারাই মৌলিক ভাবে নির্ধারিত। আসলে জাড়োয়ারা তাদের প্রাচীনতম নিষ্কলুষ প্রজ্ঞা দিয়ে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আগ্রাসী রাক্ষুসে চেহারাটা চিনেছে, তাই বিশ্বাস করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

দ্বিতীয় কারণ সাহেবরা চেয়েছিল আন্দামানের সব উপজাতিকে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ক্রীতদাসে পরিণত করতে। তাদের বেগার শ্রমে বনসম্পদ, নারিকেলবীথী, সামুদ্রিক সম্পদকে গড়ে তুলতে। তার জন্য ধর্মান্তরিত করার ব্যাপক আয়োজন ছিল, নেশা ধরিয়ে দাসানুদাস করে রাখার জন্য আফিম আর মদের অঢেল সরবরাহ ছিল, অবাধ্যদের হত্যা করার জন্য আগ্নেয়াস্ত্রের অভাবও ছিল না। নিকোবরে সমস্ত মঙ্গোলীয় জনসমাজ এই কৌশলের শিকার হয়েছে—সে আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে করা যাবে। এইভাবে আন্দামানী উপজাতি উপদংশরোগে পঙ্গু, প্রজননহীন এবং মাত্র তেইশজনের জনসমষ্টিতে পরিণত হয়েছে। উঙ্গিরাও মাথা নত করেছে। শুধু সেন্টিনেলিজ আর জাড়োয়ারা তাদের 'সহস্র বর্ষের যুদ্ধ' চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে সাহেবদের দেওয়া "হোস্টাইল" নামে তারা আজও নিন্দিত এবং অভিমন্যুর মতো অবরুদ্ধ। আর অন্যদিকে এক প্রকাণ্ড উপহাসের মতো প্রশাসন খাদ্য, তামাক, আকর্ষণীয় নানা উপহার মাঝে মাঝে অথচ নিয়মিত

জাড়োয়া-অঞ্চলে ফেলে রেখে আসে। কিন্তু ওরা সেগুলো ছোঁয়ও না।

জাড়োয়ারা ভাবে এই দ্বীপপুঞ্জ সমুদ্র অরণ্য তাদের মহাদেশ, তাদের রাজত্ব; তারা হচ্ছে উত্তরাধিকারী। এই অধিকার রক্ষার মনোবৃত্তি জাড়োয়া মনস্তত্ত্বকে পোলারাইজ করেছে। সভ্যতা মানেই বিদেশী, শোষক, অত্যাচারী এবং বুশ পুলিশ। পোশাকপরা রাইফেল হাতে বুশ পুলিশের মূর্তিতে সভ্যতা প্রতিফলিত। ফলে এক নিদারুণ সন্দেহে সমস্ত বৈদেশিক বস্তুতে ওদের ঘৃণা। এ ব্যাপারে একটা মজার গল্প আছে। আন্দামানে উনিশশো সতেরো খ্রীষ্টাব্দে প্রথম হরিণ ছেড়ে দেওয়া হয়। এই দ্বীপপুঞ্জেও অন্য কোনো জন্তু, বিশেষ করে মাংসাশী প্রাণী নেই, ফলে হরিণ পঙ্গপালের মতো বংশবৃদ্ধি করেছে—বায়োলজিকাল ভারসাম্য রক্ষিত না হলে যা হয়। জাড়োয়ারা ভালো শিকারী। ইচ্ছে করলেই তারা হরিণ শিকার করে মৃগমাংস খেতে পারে, কিন্তু হরিণ তারা ছোঁয়ও না। তারা জানে এই প্রাণী তাদের মহাদেশের নয়, বিদেশীদের আমদানী করা কোনো শয়তান। ১৯৫৩ সালে জাড়োয়া-অঞ্চলে জাড়োয়ারা তিনটি হরিণ মারে এবং মধ্য-আন্দামানের রাস্তার মাঝখানে ফেলে রেখে যায়। এটা তাদের সাবধানবাণী, "আমাদের ঘাঁটালে তোমাদেরও এই অবস্থা হবে।"

জাড়োয়ারা ফুড হান্টিং অথবা ফুড গ্যাদারিং অবস্থাতে আছে। ওরা কৃষি-কাজ জানে না, একেবারে উলঙ্গ থাকে। কৃষিকাজের জ্ঞান না থাকলে অজৈব সংস্কৃতি সৃষ্টি হতে পারে না। বেশবাস, লজ্জানিবারণ, বয়নশিল্প অজৈব সংস্কৃতিরই অন্যতম প্রকাশ। জাড়োয়াদের পরিবারের সংগঠন, শিশুপালন, যূথবদ্ধ জীবন-যাত্রা এবং সামাজিক আচার-আচরণ সম্পর্কে কোনো সত্যিকারের সংবাদ জানা নেই। তবে ওরা কাঠের ব্যবহার, গুণাগুণ, কোন কাজে কোন কাঠ ব্যবহার করবে তা জানে। জাড়োয়ারা যূথবদ্ধ জীবন যাপন করে। শত্রুর আগমন অথবা শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য কোনো ওয়ার ক্রাই বা স্লোগান বোধহয় ওরা জানে না। এই ধরনের ঘটনা ঘটবার সময় গাছের গুঁড়িতে আঘাত করে ওরা এক ধরনের নিরবচ্ছিন্ন শব্দতরঙ্গ সারা বনাঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়। কীটপতঙ্গহীন প্রাণীশূন্য বিহঙ্গবিরল নিবাত নিষ্কম্প নিস্তব্ধতায় এই "পাথাবাড়ি" আতঙ্কে ক্রোধে প্রতিহিংসাতে প্রতিধ্বনিত হয়।

জাড়োয়ারা কি খায়? গাছগাছালির মূল, কাঁচা সামুদ্রিক জীব, কিছু লতাপাতা এবং নারকেল ওদের খাদ্যতালিকাতে আছে তাতে সন্দেহ নেই। ওরা আগুনের ব্যবহার জানে না, অবশ্য এটা অনুমান। সভ্য মানুষ যেমন লবণ খায়

অন্তত ওরা সেভাবে লবণ খায় না এটাও নিশ্চিত। ওরা তীরধনুক চালাতে জানে, গাছের বাকলের তৈরি তূণ পিঠে নয় বুকে বেঁধে রাখে (জাড়োয়ারা ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ধরা পড়লে এই রকম বুকে বাঁধা তূণ দেখা গিয়েছিল)। শুধু জলের কষ্ট বড় ভয়ানক। কারণ মৃত আগ্নেয়গিরি আন্দামানের পাতালে জল নেই। বিষ্টির জল ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই। গ্রীষ্মকালে বিষ্টি কম হলে এবং তূণে তীর ফুরিয়ে গেলে পিপাসার্ত অস্ত্রহীন জাড়োয়ারা ক্রোধে আত্মহারা হয়ে জল আর লোহার খোঁজে তাদের নিকটস্থ জনপদ আক্রমণ করে। তারা ডাকাত নয়। এমনি এক মোকাবিলাতে তিনজন জাড়োয়া ধরা পরেছিল মধ্য-আন্দামানে।

কদমতলা নামে একটা গ্রাম আছে। এলাকাটা পুরোপুরি বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসিত অঞ্চল। সেই কদমতলা গ্রামে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন গভীর রাতে একদল জাড়োয়া হানা দেয়। এই গোলমালের সময় তিনজন জাড়োয়া যুবক গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে। ঘটনাটা পৃথিবীর নৃতত্ত্বের ইতিহাসে খুবই উল্লেখ-যোগ্য। কারণ জাড়োয়াদের সাক্ষাৎ কখনও দেখা যায় নি। শুধুমাত্র শোনা যায় আন্দামানে অনেকদিন আগে, কতদিন কেউ জানে না, আরও দুবার নাকি ওদের ধরা সম্ভব হয়েছিল। এই দুবারের মধ্যে একবার একজন তরুণীও নাকি ধরা পড়েছিল। কিন্তু এই তথাকথিত গল্পের কোনও ভিত্তি পাওয়া যায় না, অতএব ধরে নেওয়া যায় এই প্রথম জাড়োয়াদের চোখে দেখা গেল।

তিনটি জাড়োয়া যুবককে মধ্য-আন্দামান থেকে পোর্ট ব্লেয়ারে আনা হল এবং প্রধানত নিরাপত্তার কারণে বিখ্যাত সেলুলার জেলে রাখা হয়েছিল। কিন্তু কোনো ভারতীয় নাগরিককে যদি কোনো অপরাধের জন্য কারাগারে আনা হয় তবে তার জন্য অপরাধীর এবং এক্ষেত্রে অপরাধীত্রয়ের নাম-ঠিকানার প্রয়োজন হয়। কিন্তু নাম কি? ঠিকানা কি? কি তাদের পরিচয়?

বর্তমান সভ্যতা এই প্রকার তীক্ষ্ণ প্রশ্নের মুখোমুখী আর কোনোদিন হয় নি। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস চমকপ্রদ। এই বিশ্বচরাচরের সমস্ত জ্ঞানকে সুসংগঠিত করার মধ্যে মানবপ্রতিভা 'ঈশ্বর' সমতুল্য। কিন্তু তিনটি যুবকের নাম, পরিচয় আর ঠিকানা সভ্যতা জানে না। সেই জন্যই আন্দামানের সেলুলার জেলে এই অপরূপ রূপবান তিনটি কিন্নর যুবককে নামের পরিবর্তে নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হল। এক নম্বর যুবকের বয়স আনুমানিক পঁচিশ বৎসর, দুই নম্বরের বয়ক্রম বিশ বৎসরের অধিক নয়, বছর ষোল বয়স তিন নম্বর কিশোরের।

বর্তমান প্রবন্ধকার যখন প্রথম এই তিনজনকে দেখে তখন ওরা পুরোপুরি

উলঙ্গ ছিল। এই পৃথিবীতে আলটিমেট আর্টিস্ট আছে কিনা জানি না, তবে এটা নিশ্চিত এই তিন তরুণই আলটিমেট মডেল। ওদের দেহে এক ছটাক বাড়তি মেদ নেই। পায়ের পাতা পুরু বা প্যাডেড। এদের নিম্নাঙ্গ উর্ধ্বাঙ্গের চেয়ে পুষ্ট। বুকের ছাতি বত্রিশ থেকে চৌত্রিশ। কিন্তু হাতের আঙুলগুলো দারুন দুর্বল এবং ছোট ছোট। মাথার চুল কোঁকড়া, তামাটে কালো। গাত্রবর্ণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মুক্তার মতো ঝকঝকে সমান দাঁত। মোটা ঠোঁট। থ্যাবড়া নাক। কিন্তু ওদের দুচোখের গভীরতা, সারল্য, 'ভগবান'তুল্য অবিনশ্বরতা, আকাশের ঐতিহ্য···বর্ণনার অতীত। ওরা উলঙ্গ, আর সেই উলঙ্গতা এতো সুন্দর ও পরিপূর্ণ যে ওদের যৌনাঙ্গে কিম্বা দেহের অন্য কোথাও কোনো লোম পর্যন্ত নেই। নৃতত্ত্বের ভাষায় এরা নিগ্রোট।

চার-পাঁচদিন ধরে বর্তমান লেখকের খুব ঘনিষ্ঠভাবে ওদের তিনজনকে লক্ষ্য করবার সুযোগ হয়েছিল। একদিন বিকেলের বঙ্গোপসাগরের নির্জন নিষ্ঠুর নীল জলরাশি পেরিয়ে দক্ষিণে জনমানবহীন মাউণ্ট হ্যারিয়েটের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ওরা কাঁদছিল। সেই কান্নাতে একটা মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য ছিল। এই কান্নাকে তদ্ভব ক্রন্দন ছাড়া আর কোনো তৎসম বা লৌকিক শব্দে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

প্রথম কয়দিন ওরা কিছুতেই কিছু খেতে চাইত না। কারণ প্রচণ্ড অবিশ্বাস। ঐতিহাসিক বৈরিভাব। তারপর ওরা আস্তে আস্তে নখ কাটতে দিল, রান্না করা খাবার খেল, আধুনিক ওষুধ খেল, হাসল মজা করল। কোনোদিন মেদে ভর্তি মোটা লোক দেখে নি! টাকমাথাও বোধহয় এই প্রথম দেখল। ওদের আচরণে তা বোঝা যেত। ওরা কি দারুণ বুদ্ধিমান, ওদের গ্রহণশক্তি কত তীক্ষ্ণ এবং প্রবল তা ওদের না দেখলে বোঝা যাবে না। এই কয়দিনে ওরা শৌচাগারের ব্যবহার শিখে নিল, পশুদের মতো জিব দিয়ে চেটে চেটে জল না খেয়ে গেলাসে জল পান করতে শিখল।

প্রায় এক মাস পরে ওদের যখন ছেড়ে দেওয়া হল ওদের অঞ্চলে, তখন আশা করা গিয়েছিল যে ওরা এখানকার কথা ওখানে গিয়ে বলবে, হয়তো জীবন্ত ফিরে আসবে বার্মানালার পারে, অথবা ওদের তিনজনের মৃতদেহ ফেলে দিয়ে যাবে অসূর্যম্পশ্য অন্যান্য জাড়োয়ারা। কিন্তু জীবিত বা মৃত ওরা আর ফিরে আসে নি।

ঋণ স্বীকার
জাড়োয়া প্রবলেম—লিডিও সিপ্রিয়ানি
বুলেটিন অব ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটুট (বিহার), মার্চ, ১৯৫৯

কবি মধুসূদনের মহাপ্রয়াণ ও শোকসন্তপ্ত সারস্বত সমাজ

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙলার তথা বাঙালির জাতীয় জীবনে ১৮৭৩-এর ২৯শে জুন এবং ১৯৪১-এর ৭ই অগস্ট তারিখ দুটি শুধুমাত্র সময়ের ব্যবধানে দুটি স্বতন্ত্র দিন নয়, বাঙালির চৈতন্য-জগতের তথা জাতীয়তাবোধের বহিঃপ্রকাশের দুটি স্বতন্ত্র দিবস। প্রথম দিনটিতে যে-মানসিকতা ছিল খণ্ডিত হিন্দু-জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন, দ্বিতীয় দিনে তাকেই দেখা গিয়েছিল সার্থক জাতীয়তাবোধের অধিকারী—যথার্থ ভাবে ভারতীয় ও আন্তর্জাতিকতাবাদে পুষ্ট। তাই বাঙালি গণমানসের বহিঃপ্রকাশের দুই প্রান্তবিন্দু রূপে এই দুটি দিন বিশেষভাবে স্মরণীয়।

প্রথম দিনটিতে হয়েছিল কবি মধুসূদনের মহাপ্রয়াণ, আর দ্বিতীয় দিনটিতে ঘটেছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের তিরোধান। প্রথম দিনের বাঙালি কেঁদেছিলেন অন্তরালে—শবযাত্রা থেকে দূরে দাঁড়িয়ে; কারণ সেদিন তাঁর চোখে মধুসূদন ছিলেন ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান, বিধর্মী, বিদেশী। তাঁর অন্তরের শোক অনেকখানি শাসিত হয়েছিল মিথ্যা ধর্মবোধ ও অন্ধ কুসংস্কারের দ্বারা। আর দ্বিতীয় দিনটিতে বাঙলার আপামর জনসাধরণ—হিন্দু হোন, মুসলমান হোন কিংবা খ্রীষ্টান হোন, সর্ব ধর্মের সর্ব শ্রেণীর মানুষ—বাঙালি তথা ভারতীয় এই চেতনায়, এই বোধে সমবেত হয়েছিলেন শোকযাত্রার মিছিলে। সেদিন যথার্থ ভাবে প্রকাশ হয়েছিল দেশবাসীর জাতীয় শোক।

তবে কি ১৮৭৩-এর ২৯শে জুন কবি মধুসূদনের মহাপ্রয়াণে বঙ্গবাসী হাহাকার করেন নি? কেমন ছিল তাঁদের শোকের চেহারা? এ-প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক ভাবেই আজ আমাদের মনে উঠতে পারে, বিশেষত ১৯৭৩-এর ওই দিনটিকে স্মরণে রেখে কবি মধুসূদনের মৃত্যু-শতবার্ষিকী যখন পালিত হল। তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় এই 'খেদ', এই কান্নার কিছু পরিচয় এখনো পাওয়া যায়। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে তার কিছু পরিচয় তুলে ধরতে চেষ্টা করব। কিন্তু তার পূর্বে প্রসঙ্গত দু-একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন।

মধুসূদনের কাব্য-নাটক-প্রহসনগুলি যখন একের পর এক 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত' রূপে প্রকাশ হচ্ছিল তখন বাঙলা কাব্য-সাহিত্য-জগতে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের এক বিপুল আলোড়ন যেমন দেখা দিয়েছিল, তেমনি এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তৎকালীন পাঠককে 'মাইকেল' শব্দটি যথেষ্ট পীড়াও দিয়েছিল। কারণ এই বোধ তাঁদের পীড়া দিত যে মধুসূদনের মতো মহৎ কবি তাঁদের সমাজের, তাঁদের ধর্মের কেউ নন।

এ কথাটি সম্পূর্ণ ভাবে সত্য এবং আরো সত্য যে তৎকালীন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মানসিকতা এই সংকীর্ণতাদোষে দুষ্ট ছিল। কিন্তু এই দোষ কি শুধুমাত্র তৎকালীন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের? আজো কি মধুসূদনের কাব্য-নাটকগুলি সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচকরা প্রসঙ্গত বারবার দেখাতে চেষ্টা করেন না যে মধুসূদন হ্যাট-কোট-প্যান্ট পরিহিত নিখাদ বাঙালি! কবির নামের আগে 'শ্রী' যুক্ত করে তাঁরা কি তাঁকে হিন্দুত্ব অর্পণ করতে চান নি? কবিকে আত্মীকরণের কি করুণ প্রচেষ্টাই না তাঁরা করেছেন! কিন্তু তাঁরা ভেবে দেখেন নি যে মধুসূদনের নামের পূর্বে 'শ্রী' যুক্ত করলেই যেমন তাঁকে হিন্দু করে নেওয়া যায় না, তেমনি তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বও তাতে যথার্থ রূপে ধরা পড়ে না। এর দ্বারা শুধুমাত্র অভিব্যক্ত হয় তাঁদের অন্তরের অভীপ্সা। মধুসূদনের জীবদ্দশাতেই এই আত্মীকরণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কবি মধুসূদনের 'শিল্পী ব্যক্তিত্ব'র পরিচয় দিতে গিয়ে জনৈক সমালোচক বলেছেন :

> মধুসূদনের তিরোধানের পর বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এর পৃষ্ঠায় শোকজ্ঞাপক প্রবন্ধে প্রথম 'শ্রীমধুসূদন' কথাটি ব্যবহার করেন।[১]

তাঁর এই বক্তব্য সঠিক নয়। তিনি আমাদের প্রচলিত ধারণা মতোই তাঁর এই বক্তব্য রেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শোকজ্ঞাপনের বহু পূর্বে প্রাবন্ধিক ও কবি রামদাস সেন মধুসূদনের জীবনকালেই 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত' নামে একটি সনেটে কবির প্রশস্তি করেন। সেই সনেটে তিনিই প্রথম 'শ্রীমধুসূদন' কথাটি ব্যবহার করেন :

মধুসম মধুমাসে মোহন-বাঁশরী।
বাজান নিকুঞ্জবনে রাধাকান্ত হরি॥
শুনি গোপ গোপীগণ আনন্দে বিহ্বল।
চকিত স্থগিত নেত্রে হেরে বনস্থল॥

তেমনি বংশীর রবে শ্রীমধুসূদন।
প্রেমানন্দে ভাসাইলা গৌড় জন-মন॥
বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, তিলোত্তমা মুখে।
তান লয়ে সঙ্গীতের ধ্বনি শুনি সুখে॥
পুনঃ মেঘনাদ মুখে রণ ভেরি শুনি।
সদর্পেতে বীরহিয়া জাগিল অমনি॥
নবরস প্রপূরিত তোমার সঙ্গীত।
কাব্য-প্রিয় বাঙ্গালির যাহে জন্মে প্রীত॥
কাব্যের কানন দিকে পুনঃ কর্ণ ধায়।
শুনিতে নূতন স্বর তোমার গলায়॥[২]

সনেটটি পরবর্তীকালে কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হবার সময় 'জনৈক কাব্যামোদী মান্য বন্ধু কর্তৃক' মূল কবিতার একটি ইংরাজী অনুবাদও ওই সঙ্গে সংকলিত হয়।[৩] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অনুবাদক 'শ্রীমধুসূদন' শব্দটিকে অনুবাদে আবার 'Michael' করে ছেড়েছেন। কবি নিজেও 'সমাধিলিপি'তে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছিলেন "দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!" বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বেই তিনি নিজেকে এই ভাবে বিশেষিত করেছিলেন এবং একজন অজ্ঞাতনামা কবিকেও আমরা পাই যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে মধুসূদনকে 'শ্রী' ভূষিত করেছেন তাঁর মৃত্যুর পর কবি-প্রশস্তি লিখতে গিয়ে :

বঙ্গভাষা তব পাশে ঋণী নিরন্তর
রহিবেন, কবিবর, করিয়া স্মরণ
তব দত্ত, বেশ, ভূষা, কবিতা নিকর ;
ফেলিবেন অশ্রু, বলি, শ্রীমধুসূদন![৪]

তবুও তাঁরা কেউই মধুসূদনের মহাপ্রয়াণে তাঁর শবানুগমন করতে পারেন নি। দায়বোধে কেউ কেউ 'খেদ' প্রকাশ করেছেন, কেউ বা অসহায় 'হাহাকার' করেছেন, কেউ বিলাপ করে শোকগাথা রচনা করেছেন ; কিন্তু পারেন নি শবানুগমন করতে। কারণ তাঁদের অন্ধ ধর্মবোধ ও সামাজিক কুসংস্কার তাঁদের পথ আগলে ধরেছিল। আর সেইজন্যেই পারেন নি তাঁরা জাতীয় কবির মৃত্যুতে জাতীয় শোক পালন করতে। জনৈক সম্পাদক তাই দায়বোধে 'খেদ' প্রকাশ করে লিখেছেন :

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৬ই আষাঢ় দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি একজন সুকবি ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা দেশ

ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তিনি জীবিত থাকিলে আমরা মেঘনাদ বধ কাব্যের অনেক সহোদর দেখিতে পাইতাম। তিনি একটী নূতন ছন্দের সৃষ্টিকর্তা, ছন্দটি সুললিত ও সহৃদয় জনের হৃদয়গ্রাহী হয় নাই বটে; কিন্তু বাগদেবী তাঁহাকে কবিত্ব শক্তি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। উহা নব্যদলে এক প্রকার লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়াছে। ছন্দ যেরূপ হউক, তিনি যে অসামান্য কবিত্ব শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া খেদ করিতেছি, কিন্তু তাঁহার কৃত কাব্যগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া তুলিয়াছে।[৫]

এ-রচনা যাঁরই হোক না কেন তিনি যে অত্যন্ত সংযত ভাবে রচনাটি লিখেছেন তা সহজেই বোঝা যায়। নিঃসন্দেহে তিনি প্রাচীনপন্থী কিন্তু একটা কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে মধুসূদন "অসামান্য কবিত্ব শক্তি"-র অধিকারী, কবি "নব্যদলে এক প্রকার লব্ধ প্রতিষ্ঠ" এবং তিনি "অমর"; অথচ এ-হেন কবির মৃত্যুতে যখন রচনাকার শুধুমাত্র 'খেদ' প্রকাশ করেই তাঁর দায় শেষ করেন তখন আমাদের সত্যই একটু অবাক হতে হয়। আমাদের সন্দেহ জাগে যে রচনাকার মধুসূদনের মৃত্যুতে বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের ক্ষতি কতখানি তা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কিনা। কিন্তু আমরা আশ্বস্ত হই যখন দেখি যে সমকালেই আরেকজন সম্পাদক লিখছেন :

হা মাইকেল, তোমার অন্ত্যেষ্টির সময় তোমার নিকট গিয়া তোমার আত্মীয়গণ রোদন করিতে পারিল না। তুমি পরের মত বিদেশী ম্লেচ্ছগণের হস্তে মস্তক প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছ! তুমি কবরে যাইবার সময় বিজাতীয়েরা তোমার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিল, আমরা সজল নয়নে দূর হইতেই কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, নিকটে যাইবার ইচ্ছা করিলেও যাইতে পারিলাম না। হিন্দুধর্মের পারে গমন করিয়া তুমি যেন সমুদ্র-পারবর্ত্তী জনের ন্যায় বহু দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িলে।[৬]

এই রচনায় তৎকালীন বঙ্গদেশবাসীর মানসিক অবস্থা যথার্থ ভাবেই লেখক তুলে ধরেছেন। জাতিচ্যুতি সমাজচ্যুতির ভয়ে সেদিনের বাঙালি কবির শবানুগমন করতে পারেন নি। কিন্তু তাই বলে কি তৎকালীন সামাজিক অবস্থার ও বাঙালি মানসিকতার যথার্থ পর্যালোচনা না করেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে : "মাইকেলের মৃত্যুতে দেশব্যাপী যে খুব একটা 'হাহাকার' উঠেছিল তা বলা যায় না।"[৭] বরং সঠিক ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় যতটুকু যে ভাবে ঘটা উচিত ছিল তা সঠিক ভাবেই ঘটেছিল।

দেশবাসী তার সীমাবদ্ধ চৈতন্যের ভূমিতে দাঁড়িয়েও মধুসূদনের জন্য 'হাহাকার' করেছিল। আর এ-কথা যদি সত্য না হয় তবে সমকালে বঙ্কিমচন্দ্র যা লিখেছিলেন তা আমাদের মিথ্যা বলে গ্রহণ করতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র শোকজ্ঞাপক প্রবন্ধে লেখেন :

> আজি বঙ্গভূমির উন্নতি সম্বন্ধে আর আমরা সংশয় করি না—এই ভূমণ্ডলে বাঙ্গালি জাতির গৌরব হইবে। কেন না বঙ্গদেশ রোদন করিতে শিখিয়াছে —অকপটে বাঙ্গালী, বাঙ্গালী কবির জন্য রোদন করিতেছে।
>
> যে দেশে একজন সুকবি জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য। যে দেশে সুকবি যশঃ প্রাপ্ত হয়, সে দেশের আরও সৌভাগ্য।...মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে যশস্বী হইয়া মরিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে বাঙ্গালা দেশ উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে। ...কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ 'শ্রীমধুসূদন'।
>
> বঙ্গদেশ বঙ্গ কবির জন্য রোদন করিতেছে। বঙ্গ কবিগণ মিলিয়া বঙ্গীয় কবিকুল ভূষণের জন্য রোদন করিতেছে। কবি নহিলে কবির জন্য রোদনে কাহার অধিকার ?[৮]

সেদিন বাঙালি যথার্থই কেঁদেছিল। সেদিন ছিল শোকের দিন, বিলাপের দিন। জাতীয় কবির বিয়োগবেদনা, প্রিয়জনের বিয়োগবেদনার সমতুল ; হয়তো বা সমধিক। কবির বিচ্ছেদবেদনা কবির প্রাণেই অধিক আঘাত হানে। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলেছিলেন, "কবি নহিলে কবির জন্য রোদনে কাহার অধিকার ?" তাই এই বিয়োগবেদনায় রচিত হল শোকগাথা 'মধু বিলাপ !!!'[৯] —বিলাপী ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মধুসূদনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই শোকগাথাটি রচিত হয়। কবির মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে যতগুলি শোকগাথা রচিত হয়েছে তার মধ্যে এটি সম্ভবত সর্বপ্রথম রচিত ও প্রচারিত এবং বাঙলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত প্রথম শোকগাথা। আমাদের এই অনুমানের কারণ, ভুবনচন্দ্র শোকগাথাটির প্রারম্ভে অতি সংক্ষেপে মধুসূদনের জীবনের মূল ঘটনাগুলি উল্লেখ করে লিখছেন :

> [...অদ্য বৈকালে আলীপুরের জেনারেল হাসপাতালে
> তাহার মৃত্যু হইয়াছে। বয়ক্রম ৪৫ বৎসর।[১০]
> রবিবার—১৬ই আষাঢ়, ১২৮০।]

যাঁরা ভুবনচন্দ্রের কবিকর্ম ও সাহিত্যকৃতির পরিচয় রাখেন, তাঁরা আমাদের এই

অনুমানের যে যথেষ্ট ভিত্তি ও যুক্তি আছে তা অনুমোদন করবেন। ভুবনচন্দ্রের লেখনী ছিল সদাপ্রস্তুত। তিনি ক্রমান্বয়ে কাব্য-নাট্য-প্রহসন, নক্সা-আখ্যায়িকা-উপন্যাস, রক্ত-রোমাঞ্চ-রহস্য রচনা করে গিয়েছেন। তাঁর রচনার সংখ্যা-প্রাচুর্যও কম নয়। তাঁর ন্যায় একজন সপ্রতিভ ও অত্যুৎসাহী সাহিত্যিকের পক্ষে মধুসূদনের তিরোভাবের অব্যবহিত পরে তড়িৎগতিতে একটি শোকগাথা রচনা করা অনায়াস-সাধ্য ব্যাপার। সম্ভবত রচনাটি 'পথসাহিত্য' হিসাবে প্রচারিত হয়।

পুস্তকখানির রচনাংশ মাত্র বারো পৃষ্ঠা। কোনো নামপত্র নেই। প্রচ্ছদপটই নামপত্র রূপে ব্যবহৃত এবং শোকচিহ্ন-সূচক কালো রেখা প্রচ্ছদপটের চতুষ্পার্শ্বে মুদ্রিত। অনুরূপ ভাবে শোকচিহ্ন-সূচক কালো-রেখা-বন্ধনীর মধ্যে প্রচ্ছদের চতুর্থ বা শেষ পৃষ্ঠায় প্রয়াত কবির জন্য বিলাপ করে বলা হয়েছে :

হায়!!!
শূন্য করি মধুর বৃন্দাবন!
নিদয় হয়ে—
কোথা গেলে হে
মধুসূদন!!! বঙ্গধন!!!

এবং তার নীচে গার্ড-ক্যাপ পরিহিত বন্দুক হাতে মাইকেল মধুসূদনের একখানি চিত্র মুদ্রিত। আমরা কবির এমন ছবিও আর কোথাও দেখতে পাই না। পুস্তকখানি বেঙ্গল লাইব্রেরিতে তালিকাভুক্ত হয়েছে প্রকাশের একমাস পরে ওই বৎসরের ২৫শে জুলাই তারিখে।

মধুসূদনের প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দেই ভুবনচন্দ্র শোকগাথাটি রচনা করেছেন এবং তাতে বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অবদানের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ভুবনচন্দ্র কোনো কোনো পঙক্তি মধুসূদনের কাব্য থেকে উদ্ধার করে তাঁর নিজের রচনায় যুক্ত করেছেন যাতে পাঠকের মনে সহজেই মধুসূদনের কাব্যের মনোরম স্মৃতি জেগে ওঠে। বিলাপী ভুবনচন্দ্র বলেছেন, "গৌড়জন প্রিয়-মধু. এ জগতে নাই" — এ কথা বিশ্বাস করতে মন চায় না। মধুসূদনের তিরোভাবসংবাদ অবিশ্বাস্য। যাঁর তেজোময় কবিতা-কিরণে এই বঙ্গদেশ উদ্ভাসিত, যদি সে-আলোর উৎস আজ স্তিমিত হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে "বঙ্গের গৌরব রবি অস্তাচলগামী।" মধুসূদনের মধুর বাণী তবে কি আর শুনতে পাওয়া যাবে না?

হা মধু! তোমার বাণী, চির মধু মাখা
তেজস্কর, যথা বনে মধুমক্ষি-কোষে
অনাঘ্রাত অস্পৃষ্ট মানবে—চোখ স্বাদ,—
তেমনি তোমার মধু, অমিত্র অক্ষর,
ক্ষরেছে মধুর মধু অক্ষরে অক্ষরে —
জুড়াইয়ে ভাবুকের ভাবুক হৃদয়,
হায়! নীরবিল এবে! মধু-প্রস্রবণ—
নীরবিল মধু-ধ্বনি! শুনিব না আর! পৃ ২

মধুসূদনের তিরোভাবে তাঁর·বি চিত্র সৃষ্টিগুলির বিচিত্র রূপ কবি ভুবনচন্দ্রের একে একে মনে উদয় হচ্ছে। তাঁর মনে পড়ছে সু-রূপসী দৈত্যরাজবালা "রহস্য নায়িকা" শর্মিষ্ঠাকে—দানব-নন্দিনী বলে মনে হয় না তাকে, পঙ্কে জন্মগ্রহণ করলেও পঙ্কজের মতো সে শোভাময়ী। যে ফণীর শিরে মণি আছে সে দংশন করলে মৃত্যু হতে পারে—এ-কথা কে স্মরণ রাখে? মধুসূদনের যেমন আদরের ধন দানব-কুমারী শর্মিষ্ঠা, বাঙালিরও তেমন আদরের ধন কবি মধুসূদন-সৃষ্ট 'শর্মিষ্ঠা'। কবির দ্বিতীয় সৃষ্টি "পরমা সুন্দরী গুণবতী" সতী 'পদ্মাবতী' আর তৃতীয় রচনা কিন্নর-নন্দিনী 'তিলোত্তমা'—

······স্বভাবের চারু গুণে গাঁথা
স্তবকে স্তবকে শোভে অতি জ্যোতির্ময়
ধুক ধুকি। সুচিকন সুর মনোহরা,
চারু নেত্রা চারু হাসা সুরপুর বালা,—
সুরবালা গলে যথা মন্দারের হার। পৃ ৫

মধুসূদনের পরবর্তী রচনা "বঙ্গ-সংস্কারের জন্য" লিখিত 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন। যে সভ্যতা হস্তীর ন্যায় পদ্মবন দলনে ব্যাপৃত, সে সভ্যতার প্রতি এ-পুস্তক যেন "অঙ্কুশের ন্যায়" ব্যবহৃত হয়। কবির পঞ্চম রচনা "রহস্য-কণা" হাস্যরস মিশ্রিত "ঘৃণারসে" রচিত 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া'। এই পুস্তকের দ্বারা দুরাত্মা-পাষণ্ড-ভণ্ডেরা উত্তম শিক্ষা পেয়েছে। আর মধুসূদনের ষষ্ঠ রচনা কাব্যচূড়া 'মেঘনাদ'—

....স্বর্ণচূড়া
শোভে যথা রণজয়ী নৃপতির শিরে
অর্চনীয়; যবে তিনি দিগ্‌বিজয় করি

বীর দর্পে, প্রাপ্ত হয়ে সম্রাট পদবী,
ফিরে এসে বার দেন পূর্ব্ব সিংহাসনে
স্বর্ণময় ; সেইরূপ কবীন্দ্র ! তোমার
গউড় কাব্যের চূড়া বীর-তেজোময়
বীরকুল গর্ব্ব সিংহ, বীর মেঘনাদ
(সাহিত্য ভাণ্ডারে তীব্র নাস্বাদিত মধু !)
মেঘনাদ,—মেঘনাদ সম নাচাইছে
ভাবুক ভাবুকী চিত্ত ময়ূর ময়ূরী। পৃ ৬-৭

কবির এই কাব্য নির্জীব বাঙালির মনে সাহস সঞ্চার করে। এই "বীরেন্দ্র-গাথা" শ্রবণ করলে "ভৈরব বেশে ভৈরব সংগ্রামে" প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে। অশ্বের হ্রেষা, গজের বৃংহন, রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি, তুরী-ভেরী-শঙ্খ-ডঙ্কা নাদে—

..................মত্ত করে তব মেঘনাদ !
বীররস সৃষ্টিকর্তা তুমি বঙ্গদেশে !
সাহিত্য সংসার ঋণী, নিকটে তোমার !
নবরসে নবরস কোরেছ প্রকাশ !
সগরবে বলি আজি, (বলিতেও পারি)
'কর্ব্বুর কুলের গর্ব্ব মেঘনাদ বলী,—'
কবিকুল গর্ব্ব বঙ্গে মধু মায়িকেল। পৃ ৭-৮

মধুসূদনের সপ্তম সৃষ্টি "মুরলী মধু, রাধিকা সুন্দরী ব্রজাঙ্গনা"। ব্রজে মুরারির মুরলীর সুরে ব্রজাঙ্গনা রাধিকা যেমন উন্মাদিনী বাহ্যজ্ঞানহারা হয়েছিলেন—

তেমনি তোমার মুখে প্রতিধ্বনি পুনঃ
হয়েছে হে মধু সখা ! বিরহ রাধার !
ধন্য তুমি কবি কুলে ! রস ভাবভাবি !
অতি মধুময় মধু ! তব ব্রজাঙ্গনা। পৃ ৯

কবির অষ্টম রচনা 'কৃষ্ণকুমারী'—বঙ্গ রঙ্গভূমিতে এ নাটকের অভিনয় দর্শন করে "কে পারে রোধিতে শোকে অশ্রু বেগধার" ? আর মধুসূদনের পরবর্তী সৃষ্টি অভিনব "রসবতী-গীতি"কাব্য 'বীরাঙ্গনা'। কাব্যের নামকরণ 'বীরাঙ্গনা' হলেও—

········ বীরাঙ্গনা কিন্তু সবে নয়,
প্রেমাঙ্গনা, কুলাঙ্গনা, মানী, বিরহিণী ,—
ধীরতা, করুণা ক্ষমা, আছে সহচরী
কবিতার তব কবি! অবশ্য স্বীকার
নীলধ্বজপত্নী জনা সত্য বীরাঙ্গনা। পৃ ৯

কবির দশম রচনা কতকগুলি সৌরভপূর্ণ পুষ্প 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' যা পাঠ করে বঙ্গবাসী আনন্দিত। আর তাঁর একাদশ রচনা ইলিয়ড' অবলম্বনে গদ্যছন্দে রচিত, বীররস পূর্ণ 'হেক্টর বধ'। মধুসূদন বঙ্গ-রঙ্গভূমিতে অভিনয়ের জন্য তাঁর দ্বাদশ রচনা 'মায়া-কানন' রচনা করেন। কবি 'মায়া-কানন'-এ শুধুমাত্র বৃক্ষ রোপণ করেছেন, সে বৃক্ষে পত্র পল্লবিত হলেও কোনো ফল ফলে নি। ভুবনচন্দ্র প্রশ্ন করেছেন, কবি মধুসূদন এই 'মায়া-কানন'-এর মায়ার ভয়েই কি দেহ সম্বরণ করেছেন? কাল-ব্যাধের আচরণ দেখে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। কাল কী নির্মম। কবিপ্রেয়সী ও কবিকে নির্মম কাল তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করেছে। এ দৃশ্য কি নিদারুণ।

উপসংহারে ভুবনচন্দ্র কবির নিরাশ্রয় শিশু সন্তানদের সাহায্যের জন্য বাঙালি জাতির নিকট আকুলভাবে আবেদন করেছেন:

ওগো বঙ্গ বন্ধুগণ। করুণা বিতরি
সহায়তা দান কর, কবির সন্তানে,
কর হে বন্ধুর কার্য্য, এ মম মিনতি।

সেকালের সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকায় মধুসূদনের তিরোভাব উপলক্ষে বহু শোক-গাথা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত তার কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লেখ করছি।

কবির তিরোভাবের পক্ষকালের মধ্যে আরেকটি শোকগাথা প্রকাশিত হয়। গাথা রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। শোকগাথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কারণ গাথা-রচয়িতা সমালোচকের দৃষ্টিতে মধুসূদন ও ভারতচন্দ্রের কাব্যবৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিচার করে মন্তব্য করেছেন:

'ভারত ভারত খ্যাত' নহে তোমা সম,
'কবিরাজ' তুমি, তুমি কাব্যের ভাণ্ডার,
তাঁহার 'প্রসাদগুণ' রস অনুপম,
তোমার 'ওজস্বীভাব' অতি চমৎকার।

আবার অন্যত্র বলছেন :

'অন্নদা মঙ্গল' 'বিদ্যাসুন্দর' তাঁহার
ভারতে প্রকাশ বিদ্যাসুন্দর তাঁহার !
'তিলোত্তমা' 'মেঘনাদ' তব কাব্য সার
অনুপমা বীরাঙ্গনা বঙ্গ অহঙ্কার ! ১১

প্রখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ একটি শোকসঙ্গীত রচনা করেন। মধুসূদনের নিরাশ্রয় শিশু সন্তানদের সাহায্যার্থে 'ন্যাশানাল থিয়েটার'-এ কবির রচিত 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয়ের দিনে সঙ্গীতটি গীত হয়। গিরিশচন্দ্রের অন্তরের আক্ষেপ সঙ্গীতটিতে প্রকাশ পেয়েছে :

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে ।
মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এতদিনে ॥
কুহকী কল্পনাবলে, কে আনিবে রঙ্গস্থলে,
কুমারী কৃষ্ণা-কমলে, মোহিতে মনে।
বীরমদে অম্বুনাদে, কে আনিবে মেঘনাদে,
কাঁদিবে প্রমীলা সনে, কেলি বিপিনে ॥ ১২

অপর একজন অজ্ঞাতনামা কবি শোকগাথায় মধুসূদনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে গিয়ে বলেছেন :

বঙ্গভূমি ! বঙ্গ ভাষা রবে যতকাল
রবে তুমি ; যত কাল থাকিব আমরা
কাঁদিব তোমার তরে—তোমার কাহিনী
উপকথা হয়ে রবে আমাদের ঘরে। ১৩

পরবর্তী শোকগাথা রচয়িতাদের মধ্যে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি নবীনচন্দ্র সেনের রচনা আমাদের সকলেরই পরিচিত। উভয়েই একত্রে 'বঙ্গদর্শন'-এ শোকগাথা প্রকাশ করেন। কবি হেমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত 'স্বর্গারোহণ' কবিতায় মধুসূদনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। মধুসূদনের কবি স্বভাবের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তিনি লেখেন :

বীর অবয়ব বীর ভাষা প্রিয় গৌড়-সন্ততি সার,
প্রিয়ম্বদ সখা প্রণয়ের তরু কামিনী-কণ্ঠের হার
সাহিত্য কুসুমে প্রমত্ত মধুপ বঙ্গের উজ্জ্বল রবি
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার শ্রীমধুসূদন কবি।

আর নবীনচন্দ্র লিখলেন :

> শূন্য হলো আজি   বঙ্গ কবি-সিংহাসন
> মুদিল নয়ন
> বঙ্গের অনন্য কবি   কল্পনা সরোজ রবি,
> বঙ্গের কবিতা মধু হরিল শমন।

বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের এই উক্তির প্রতিবাদ করে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখেন :

> কিন্তু 'বঙ্গ কবি-সিংহাসন' শূন্য হয় নাই। এ দুঃখ সাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নক্ষত্র। মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক! বঙ্গ কবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গ মাতার ক্রোড় সুকবি শূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না।

সমকালীন সাহিত্য-বিচারকের যে ভ্রান্তি অতি স্বাভাবিক ভাবে দেখা দেয়, বঙ্কিমচন্দ্রও সে-ভ্রান্তি থেকে অব্যাহতি পান নি। মধুসূদনের কবি-সিংহাসন কোনোক্রমেই হেমচন্দ্রের প্রাপ্য নয়। মধুরাজ্যে মধু-কবি অনন্য, অদ্বিতীয়। হেমচন্দ্রের পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের এই অহেতুক ওকালতির জন্যই নাকি নবীনচন্দ্র বঙ্কিম-তিরোভাব-কালে তাঁরই কথা তাঁর প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন :

> এক রাজা যাবে অন্য রাজা হবে
> সাহিত্যের সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।

নবীনচন্দ্র কি সত্যই একথা বলেছিলেন? যদি বলে থাকেন, তবে এ বড় নিষ্ঠুর রসিকতা!

পাদটীকা :

১। মাইকেল মধুসূদনের শিল্পী ব্যক্তিত্ব—নারায়ণ চৌধুরী। চতুষ্কোণ, বৈশাখ ১৩৮০। পৃ ৫৫

২। সোমপ্রকাশ, ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৭৩। ১০ ডিসেম্বর ১৮৬৬

৩। উৎসাহী পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কবিতাটি উদ্ধৃত হল :

On M. M. S. Dutt Esq.

Sweet as the charming lute in pleasant May,
Radha's beloved Hurry was wont to play,

When at the notes enruptured with delight,
Each rustic gazed the grove with steadfast sight,
Michael's strains refind with many an art,
Fills with ecstatic joy Bengalees heart,
The Heroine, Maid, and Tilat'ma sweet,
Have sung their varied lays with metres meet ;
And martial notes from Meghnads bugle grave,
Hath roused with pride the heart of many a brave,
Sweet your lays with pathos filled of every kind,
Fit to delight poetic native mind,
The ear still lingers by the music grones,
to hear new songs of thee, it so much loves.

কবিতা লহরী, শ্রাবণ ১২৭৪। পৃ ৫৪

৪। ভারত সংস্কারক, ১১ই জুলাই ১৮৭৩। ২৮শে আষাঢ় ১২৮০
৫। সোমপ্রকাশ, ৭ই জুলাই ১৮৭৩। ২৪শে আষাঢ় ১২৮০
৬। সমাজদর্পণ, ১৮৭৩ (চতুষ্কোণ, বৈশাখ ১৩৮০। পৃ ১৬৩)
৭। মেঘনাদবধ কাব্য ও রবীন্দ্রনাথ—নেপাল মজুমদার। চতুষ্কোণ, বৈশাখ ১৩৮০। পৃ ১৭৩
৮। বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০
৯। শোকগাথাটির প্রচ্ছদপট নিম্নরূপ :
মধু-বিলাপ!!! / অর্থাৎ / মাইকেল মধুসূদন দত্ত-বিয়োগ-বিলাপ /

"অহমিহ নিবসামি—।
স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা।"

বিলাপী / শ্রী ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় / নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র / কলিকাতা—মানিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৮। / সম্বৎ ১৯৩০
শেষ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :
("Printed by S. P. Chatterjee, at the New Bengal Press—1873")
সংস্কৃত শ্লোকটির অর্থ :

"আমি এই কথা বলছি—।
মধুসূদনকে স্মরণ করেও আমার চেতনা হচ্ছে না॥"

১০। প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের বয়স তখন প্রায় ৫০ বৎসর। কারণ তাঁর জন্মতারিখ ১২ই মাঘ ১২৩০ বঙ্গাব্দ। ২৫শে জানুয়ারি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ বলে জীবনচরিতকার উল্লেখ করেছেন।
১১। ভারত সংস্কারক, ১১ই জুলাই ১৮৭৩, ২৮শে আষাঢ় ১২৮০
১২। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' ন্যাশানাল থিয়েটারে ১৬ই জুলাই ১৮৭৩ তারিখে অভিনীত হয়।
১৩। ভারত সংস্কারক, ৮ই আগষ্ট ১৮৭৩

লিখিতং

জীবন দে

পাহাড় পরিবেষ্টিত খাডাই-উতরাই অসমতল সামন্ত রাজ্য। উৎপন্ন বলতে কৃষি, রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র রাজবাড়ি। প্রাণশক্তি প্রজারা—ধর্তব্যের বাইরে হলেও হিসেবের খাতায়। ফালতু নয় কেউ। রাজ্যের পরিধি ছোট হলেও নির্ধারিত খাজনায় রাজশাসন চলার দিন অনেক আগেই বিগত। বাজনার দিকে নজর এই কারণে ক্রমবর্ধমান। ক্ষেতমজুর কত, ভাগচাষী এত, প্রকৃত রায়ত কারা কারা—তোষাখানা, খাজাঞ্চখানায় সব কণ্ঠস্থ। আরো সংক্ষেপে বললে—ছোটলোক এত, অর্থাৎ তের আনা; ভদ্রলোক তিন ভাগ।

রাজা স্বয়ং দানবীর। আর সব রাজার মতোই তিনি অপার তিনি অসীম। এই তো ধরুন ঘাটিয়াল রামেশ্বর চৌধুরীর কথা। তিন পুরুষের রাজকোষে তিনটি পয়সা ফেলার নাম নেই। কিন্তু ফেরিঘাট ভোগদখলে তার জন্য জটিলতা কোনোদিন কেউ দেখে নি। মহারাজের শিকার-অভিযানের পথে পড়ে এই ঘাটটা। চৌধুরী নিজে সেদিন পারাপারের নিখুঁত ব্যবস্থায় ব্যস্ত। গেট সাজায়। ফুলের মালা, গন্ধ জলের ঝারি হাতে সদলবলে অপেক্ষা করে মহামহিমের জন্য। কখন তিনি আসবেন—মাননীয় যিনি।

গাজিপুরের আতর এমনিতেই খ্যাত। চৌধুরী তার সাহায্যে শিকার-ক্যাম্পে কেবল বিখ্যাতই নয় একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে ক্রমে ক্রমে। মহারাজ তৃপ্ত। পরম পরিতৃপ্ত প্রজাসাধারণ অলৌকিক দয়া দান এবং দক্ষিণার সুবাদে। রাজরাজড়ার কথা, তার মেজাজই আলাদা। নইলে রামা শ্যামাও দেখতে দেখতে রাজা বনে বসত।

এ ছাড়াও ঝারি-ধরা পাখা-ধরার অন্ত নাই সারা রাজ্যে। বার্ষিক ভাতার উপর দিয়ে আছে নিষ্কর জমির বরাদ্দ সবার জন্য। কোতোয়াল থেকে নায়েব গোমস্তা পাইক বরকন্দাজ তো আছেই। ব্যবসায়ীও আছে কয়েকজন। রাজ-শাসনের সদা সতর্ক দৃষ্টি তাদের উপর। ওদের নগদ মজুরির ব্যবস্থাটাই একটা প্রলয়ঙ্করী ব্যাপার। মজুরি থেকে মূল্য দেবে দেবে, না দিবে নেই। ঝুলিয়ে রাখতে জানে না তারা। উৎসবে আনন্দে বলিদান করে যে তার উপাধি খাড়া-ধরা।

সিংহদ্বারে লক্ষ্য করুন দুপাশে দুটি আড়ত। তার নাম কুঠি। ছোট কুঠি আর বড় কুঠি। নীলকর সাহেবদেরও কুঠি ছিল এক সময় মাইল খানেক দূরে।

এখন আর নেই। স্বহস্তে রাজস্ব গ্রহণের দৈন্যতামুক্ত রাজাবাহাদুর। কুঠিগুলো আছে তবে কেন ? ছোট কুঠিতে ক্যাশ, বড় কুঠি আছে কাইণ্ড-এর জন্য। আধুনিক মতে ট্রেজারিও বলতে পারা যায়।

টাকায় খাজনা নেওয়া হয় না এমন নয়। তবে আগ্রহটা ফসলের দিকেই অধিক। ঈশ্বর বৃত্তি আছে চলতা আছে তার মধ্যে। প্রজাদের মনে চাপা ক্ষোভ আছে সে জন্য। যার নাম খেদ। অস্থিরতা মুক্ত বিধায় আতঙ্ক বর্জিত। নিষ্কর্মা লোকগুলো তবে খায় কি ? ঐ সব আছে বলেই না বাড়তি কিছু লোকের দিন চলে যায়। রাজ্য পরিচালনা সহজ ব্যাপার নয়। মন্তব্য করেন বৃদ্ধরা। তাঁদের মতে আভিজাত্যহীন রাজা গন্ধবিহীন গোলাপের মতোই অকেজো।

প্রতি টাকা খাজনার জন্য এক মন ধান এখানে দেয়। বাজারদর বাহুল্য। রাজা যদি বাজারের মুখাপেক্ষী হন, তেমন রাজত্ব থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান। অধিক মূল্যে কাউকে লোভ দেখানোর অর্থ—সরাসরি রাজদ্রোহিতা। পরিণাম রাজ্য থেকে বহিষ্কার। ব্যবসায়ীদের সাত শত ভালোমন্দ বিচার করে তবে গিয়ে চলতে হয়।

রাজাধিরাজের সখের শিকার কার কাছে কম লোভনীয় ? চৌকিদারদের ছমাস যায় সে দিনের মুখ চেয়ে—টারী-বাড়িতে হাঁস কৈতর পাঁঠা খাসির মুসাবিদা করতেই। তারপর আদায়ে তহশীলে যাবে তিনমাস। কেবল কি রাজা মনে করেন ? ঝারিধরা, পাখাধরা, খাড়াধরা থেকে পাত্রমিত্রঅমাত্য যত যাবে কোথায় ? না কি রাজধানীতে গিয়ে খেয়ে আসবে তারা ? অতএব প্রজারা খুশী দিয়ে, কর্মচারী মোসাহেবদের আনন্দ দশহাতে কুড়িয়ে।

উৎসবমুখর রাজবাড়ি। বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। কারা সব উপভোগ করে সে সমস্ত ? অবারিত দ্বার প্রজাদের জন্য। তহুরি আর নজরানাটাও তাই অগণ্য। মাচামুছনি, দুধখাওনি, সিঁড়িপোতা, পুণ্যা প্রভৃতি তারই কারণ। বাড়ি গিয়ে করে দেখুন তো অমন একটা উৎসব ?

রাজবাড়ির পুরাতন ধানের গোলা পয়-পরিষ্কার, সাফ-সাফাই করতে হবে। তাই বেগার খাটো এখন। খাটবে না যে, ধান দেবে সে। যাকে বলে আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা। এর চাইতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর কি থাকতে পারে ? রাজপরিবারে গর্ভবতী নারী আছে। সম্ভাব্য শিশুর দুধ যোগাবে কি অন্য রাজ্যের প্রজারা ? একজন প্রজার দেহে জীবন থাকতেও তা হতে পারবে না। দুধ তো আর মাসের পর মাস জমা রাখা যায় না। সুতরাং ধানেই তার দাম

পরিশোধেয়। রাজার সুখে প্রজার সুখ। প্রবাদটা চলে আসছে কি মাগনা? নতুন ঘর উঠবে, যাত্রাগানের আসর বসবে রাজবাড়িতে। খুঁটি পুঁততে চলো। যাবে না যে, ধান পাটের কোনো একটা বুঝিয়ে দেবে সে। এতো আর ছাগল ভেড়ার জন্য ব্যবস্থা নয়। পেল্লায় কাণ্ড।

জায়গামতো বেগার খেটেও সুখ। দৈবাৎ রাজা কিংবা রাণী অথবা ধরুন উভয়ই একবার এসে গেলে বেঁচে থাকাটাই সাথক হবে তখন। না হলেও দশবার আভূমি নত হয়ে ভক্তি জানাবে, কৃপা প্রার্থনা করবে তারা। পথের ধুলো নিয়ে মাথায় দেবে, কপালে ঠেকাবে, জিভের ডগায় রাখবে শেষ পর্যন্ত। কোনটা আগে —ইহকাল না পরকাল? ইহকাল যে কি প্রত্যেকেরই তা জানা শেষ। কেবল তাই পরকালের অপেক্ষা। অজানা অচেন হলেও হাজার গুণে ভালো।

নিজ সন্তান বিয়োগেও রাজ্যের প্রজাসাধারণ তেমন বেশি ভত বেশি কাঁদে না। অপচয় করবার মতো সময় কোথায় তাদের? কান্নার কোলাহলে কান পাতা দায় হবে রাজপরিবারের বিয়োগপর্বে। মেয়ে-মরদ, ছোট-বড় সবাই উদাম গায়ে খালি পায়ে এসে ভিড় জমায়। অন্তিম শয্যায় রাজ-দর্শনের সৌভাগ্য অতুলনীয়। দেখতে পেল না যে মহাপাতক সে।

মুলিবাঁশ, নলবাঁশে ঘরবাড়ি তুলতে এমন দক্ষ কারিগর এই রাজ্যের প্রজাদের মতো একান্তই বিরল। সিমেন্ট গলে কিংবা ফুটো হয়ে ছাদ দিয়ে জল গড়াতে পারে। কিন্তু একফোঁটা জলেরও এমন সাধ্য নেই হাদলার চালা দিয়ে ভেতরে এসে নামে। রাজবাড়ির পুজোমণ্ডপ, বিয়ের বাসর, গানের আসর সর্বত্রই এই বাঁশের বেল্লার ভোজবাজি। মজুরের সংখ্যা দশজন, কিন্তু তারিফ করবে না হলেও এমন দশ হাজার মুখ থেকে চোখ।

এ হেন ন্যায়ের রাজ্যেও অজন্মার মতো আপদ আসতে পারে, এটা চিন্তার বাইরে। তবে দৈবের কথা বলা যায় না। এইতো সেবার ফ্যাসাদে পড়া গেল —বৃষ্টি নেই, আবাদ নেই। পণ্ডিতেরা প্রতিকারের পথ নিয়ে মাথা ঘামাতে ত্রুটি করেন নি। রাজগুরুই শেষ অবধি রোগ নির্ণয় থেকে প্রতিকারের পথ দেখিয়ে অনিবার্য নিমজ্জনের হাত থেকে রাজ্যটাকে বাঁচিয়ে দিলেন। ছোটলোকের কৃত দুষ্কৃতির পরিণাম। অজন্মা না হয়ে যায় কোথায়? লক্ষ্মণ হাজংয়ের বউটা এক কথায় পটের বিবি। পোয়াতি অবস্থাতেই গেছে ক্ষেতের কলাই কাটতে? অজন্মার আর দোষ কি! বেজাত বেজন্মারাই যত অনাসৃষ্টির মূলে।

যা হোক করে সে বছর বাঁচা গেল। উধাও হল বৌটা। দেবতার নামেই তাকে উৎসর্গ করে দেয় লক্ষ্মণ। সে মাসেই আর-একটা বিয়ে করে তারপর। রাজা রামচন্দ্রও নাকি এমনটি করেছিলেন শাস্ত্রে আছে। লক্ষ্মণ সে শাস্ত্র দেখতে যায় নি, কার কাছে কোথায় সেটা আছে খোঁজখবরও ছিল তার সাধ্যের বাইরে। রাজা আর সমাজ আছে কিসের জন্য তবে ?

অজন্মা যদি লক্ষ্মণের স্ত্রীর উপর দিয়েই গেল, পোকার হাতে এখন মরণ সুনিশ্চয়। দুর্মূল্য খাদ্য বেয়াদব পোকার পেটেই বিনাশ হবার উপক্রম। লক্ষ্মণই মাঠ থেকে আবাদ ছেড়ে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে ছুটে আসে সর্বপ্রথম। হে ভগবান—একি হল ? সবই গেল।

এই পাড়ার মহেশ কোচ, ঐ পাড়ার ললিত হাজং জুটে গেল ক্রমে ক্রমে। পাহাড়ী নদীর ঢালুটাতে গিয়ে জমায়েত হল তারা। সংখ্যায় কয়েকশত ছুটে চলল সবাই রাজবাড়ি অভিমুখে। গাছ গাছালি ছেয়ে গেছে পোকা আর পোকায়। এক কথা, একই বিলাপ সবার মুখে। রাজবাড়ির প্রাচীরের গায়ে গিয়ে আছড়ে পড়ে তারা। জয় রাজাধিরাজ শ্রীশ্রী হংসধ্বজ মহারাজের জয়। বাঁচা রাজা, বাঁচা আমাদের।

অকস্মাৎ মন্দিরের সব ক-টা ঘণ্টা বেজে উঠল একসঙ্গে। এটাই নিয়ম। বিধির বিধান বললেও চলে। দর্শন দিলেন তিনি, স্বয়ং রাজাধিরাজ। দে রাজা দে, লিখিতং দে আমাদের। প্রজাসাধারণ পায়ের উপর আছড়ে এসে পড়ে। এক আওয়াজ, একই কথা সবার মুখে।

এখনকার মতো স্টেনোগ্রাফার ছিল না তখন ঐ রাজ্যে। টেবিল চেয়ার থাকলেও মহারাজ তার কাছ ঘেঁষলেন না। খাজাঞ্চির হাত থেকে পাখার কলমে এক কলম কালি তুলতেই কে একজন হেঁটমুণ্ডে পিঠটা উঁচু করে দেড় হাত তফাৎ গিয়ে টেবিল হয়ে দাঁড়ায়। রাজাধিরাজ তালপাতাটা সেখানে রেখে, দিলেন লিখে স্বহস্তে যেমন যেমন আদেশ দেবার।

রাজগুরু একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে নিয়েই ধ্যানস্থ হলেন। প্রজাসাধারণ দশগুণ উল্লাসে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে ফেটে পড়ে। পাওয়া গেছে, লিখিতং দিয়েছেন মহারাজা। একখণ্ড বাঁশের মাথায় স্থাপিত হল হুকুমনামা। হাজার কাঁসর ঘণ্টা, বাদ্য ভাণ্ড বেজে উঠল এক সঙ্গে। নৃত্যের তালে তালে এগিয়ে চলে জনতা। অকস্মাৎ উপবীত হাতে একটা হুঙ্কার দিলেন রাজগুরু। উচ্ছন্নে যা। এই মুহূর্তে যা।

হাজার কণ্ঠ প্রতিধ্বনি তোলে এক সঙ্গে। রামসিঙ্গার তূর্য নিনাদ টিলার পর টিলা, দিক থেকে দিগন্তে গিয়ে আঘাত করে। থেকে থেকে মাটি অবধি কেঁপে ওঠে তার প্রকোপে। পালা শিগগির পালা।

তারপরও লেদা পোকার কি সাধ্য আছে না পালিয়ে পারে ? পালাতেই হবে—আজ আর কাল।

দুটি কবিতা

গৌরীশঙ্কর দত্ত

১

জপের থলেতে হাত ডুবিয়ে
ছানিপড়া চোখ তার
হলুদ রোদে ওৎ পেতে থাকে

কবে যে

আয়নায় জ'মে থাকা
আশ্বিনের কুয়াশার
স্থির ছায়া ছিন্ন ভিন্ন

কবে যে

দুষ্টু নাতিটার এক হাত কোমরে
অন্য হাত
দেড় টাকার পিস্তলের ট্রিগারে।

২

রক্তে
থৈ থৈ
চৌরাস্তার মোড

হৃৎপিণ্ডের ক্ষতে
এক হাত রেখে
ঘর পালানো লোকটা

জ্যামের ভিতর দিয়ে রাস্তা বেছে নেয়

লেনিন

[১০৪তম জন্মদিবস : ২২ এপ্রিলকে মনে রেখে]

দেবপ্রসাদ সিংহ

লেনিন এখন সর্বনাম
তুমি আমি সে
লেনিন এখন কর্মব্যস্ত
নতুন দিনে যে

লেনিন এখন বনে-বাদায়
জলে জলায় জঙ্গলে
লেনিন এখন সর্বময়
মানুষজনের দঙ্গলে ॥

শিয়রে শমন রেখে

অলককুমার চৌধুরী

শিয়রে শমন রেখে সংসারের কঠিন মায়ায়
বাঁধা প'ড়ে আছি
জীবন মহৎ বড়, বড় মাখামাখি আহা
জলকাদা
আষাঢ় শ্রাবণে

নবান্ন দিনের রোদ ঝলসে ওঠে চোখের তারায়

বাঁকা আলপথে

সভ্যতার সমান বয়সী পা দুখানি হাঁটে দ্রুত

হঠাৎ কখনো আল কেউটে বিদ্যুৎ যেন কালো

জীবনের বিপরীতে শনশন হাওয়া

শিয়রে শমন, তবু ম'জে আছি হালে জোতে

ঘন অঙ্গীকারে

বটের ছায়ায়

ইন্দ্রের পায়স অন্ন ভুল ঠিকানায়

ফুটো পাতে ফেনভাত

ডাঁটো লঙ্কা সুঘ্রাণে আস্বাদে

ছোট্ পেঁয়াজের কাঁচা অনুরাগ

আমানি সুগন্ধে ভারি সুবাতাস

প্রচণ্ড ভাদ্রের বেলা

হা অন্ন উপোসী

গাঁ-গঞ্জের যতেক ইঁদুর

পোড়া পেটে মিছিল মিছিল

নাড়ির মোচড়ে চোখে জল

তিন বছরের শিশু

এক আঁজলা বয়সের জলে মুখ দেখে

ত্রিতাপ দুঃখের

তবু, বড়ো টান হে

শিয়রে শমন রেখে বেশ আছি রোদে জলে

ভাঙা দেহে বেলা অবেলায়।

শব্দ তুমি

কামাখ্যা সরকার

শব্দ তুমি হেঁটে বেড়াচ্ছ
ঘোড়ায় চড়া উদ্ধত রাজপুত্রের মতো
হাতের লাগামে কারুকার্য
মেধার দুর্গের পাশ দিয়ে
প্রহরী তোমাকে সেলাম জানাচ্ছে।

শব্দ সময়ের হাতিয়ারে তুমি শান দিচ্ছ
রুগ্ন জরাগ্রস্ত পৃথিবীর স্বাস্থ্যে
তোমার খোলস ফাটা চাবুক
ঝকমকিয়ে উঠলেই
উষ্ণীষ খুলে মানুষের জন্যে
তুমি মিছিল তৈরি করবে।

নিরাপত্তা ভূলুণ্ঠিত

পূর্ণেন্দুনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

স্নায়ুর মধ্যে ভয় ঢুকেছে, নিরাপত্তা ভূলুণ্ঠিত,
অনেক দিনের রঙ্গমঞ্চ, উষ্ণ স্মৃতির স্বর্ণালি খাম,
সরঞ্জামের আলমারিতে যত্নে রাখা গীতাঞ্জলি,
দাউ দাউ দাউ আর্তনাদের মধ্যে জ্বলে ইন্দ্রের ধাম।

দিন কেটেছে গতকালও এই বিদেশে নির্ভাবনায়,
নির্ভাবনায় হাত রেখেছি কোমল বুকের অন্তরালে ;
ডালিম ফুলের মতো মৃদু ওষ্ঠাধরে মুখ রেখেছি,
জাহাজ-ভরা যাত্রাভিনয় অতর্কিতে কোন অতলে
অন্তর্হিত, এই অবেলায় ; মূর্ছিত ঢেউ ফিরে আসে
রক্তস্রোতে, কিম্বা বিবেক নিভিয়ে দিয়ে একটি ফুঁয়ে।
বুকভাঙা প্রেম ইতঃস্তত ছড়িয়ে পড়ে এই বিদেশে
অভিমানের মতো হৃদয় অশ্রুপাতে খুইয়ে দিয়ে

যাত্রা শুরু করতে যাব, চোখ পড়েছে কোন ভাগাড়ে,
রক্তারক্তি, সংবিধানের নাছোড় ভক্তি বাঁচিয়ে রেখে
ভীড়ের মধ্যে গা ঢেলেছি আত্মসমর্পণের মতো,
বুকের রক্ত চমকে ওঠে সম্মুখে বেয়োনেট দেখে।

এমন লোক চাই

শান্তনু ঘোষ

মিনমিনে বজ্জাত বা
        বেহেড মাতাল নয়—
সাচ্চা মরদের বাইচ্চা চা।

জিরজিরে বুকের খাঁচায়
ধিকিধিকি প্রাণ নয়···জলন্ত অঙ্গার,
        চোখের মণিতে ফণা তুলেছে
        পবিত্র বিদ্বেষ—
একটি এমন লোক চাই।

ক্ষয়া দুনিয়ার পেটে বারুদ পুরে
        পলতেয় আগুন দিতে হবে—
আজ এমন লোক চাই।

ফিরে পাওয়া চাই

যতন বসুমজুমদার

হারালেই হবে না হে   আবার তো ফিরে পাওয়া চাই
দু-হাঁটুর বিছানায় উবু শিরদাঁড়া
টানটান করো
চাবুক মনের গায়ে শ্যাওলা জমেছে হে
করো করো সাফসুফ করো
হারালেই হবে না তো
আবার যে ফিরে পাওয়া চাই !

শীতের রাতের শেষে ফিরে আসে একফালি দিন
বছর বছর ঘুরে খেতের ফসল ঘরে তুলে
দুটো বেলা পেট পুরে খাওয়া
এই কি দিনকে ফিরে পাওয়া ?

হাভাতে গিরস্তির হাতে গাল রেখে
আর কত দেখবে হে
সবুজ-সংসারপাতা দেয়ালের ছবি ?
ভেবে দ্যাখো বাদবাকি সূর্যটা
চুরি হয়ে প'ড়ে আছে হিম গুম ঘরে ।

এখন চোখের বরাবর
ভবিষ্যের ক্যানভাসে
অভিজ্ঞতার তুলি হাতে
রক্ত দিয়ে এঁকে যাও পূর্ণ সবিতাকে ;
নদী আঁকো, গাছপালা পাহাড়পর্বত
ভোরের শিশির ঝরা শিউলি বকুল
সকলই তোমার ।

হারালেই হবে না তো

ঠাণ্ডাযুদ্ধের কবলে ভারত মহাসাগর

কমল সমাজদ্দার

বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের মধ্যমণি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে ভারত মহাসাগরের বুকে দিয়েগো গার্সিয়ায় বিশাল নৌ-বিমান-ঘাঁটি নির্মাণ পূর্ণ গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। মহাসাগরীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রদের ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ ও বিশ্ব-জনমতকে পদদলিত করে মানবসমাজের চরমতম শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শান্তির এলাকা-রূপে খ্যাত ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধের দাবানল বিস্তারে এগিয়ে এসেছে।

দীর্ঘকাল ধরেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সন্ধান করছিল যেখান থেকে তারা সদ্যস্বাধীন দেশ ও যে সকল দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব-রণনীতি ও আক্রমণাত্মক কার্যকলাপকে সমর্থন করে না, তাদের উপর অনবরত চাপ-ভীতি প্রদর্শন করতে পারবে। যুদ্ধোত্তর-কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জবরদস্ত রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান পাকিস্তানকে "ভারত মহা-সাগরীয় অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের জন্য দক্ষিণ-এশিয়ার বিশ্বস্ত মিত্র" হিসাবে গণ্য করতেন। পরবর্তীকালে ১৯৬৩ সালে মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ম্যাকসওয়েল টেলর ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে বলেন, "সপ্তম নৌবহরের কয়েকটি জাহাজ ভারত মহাসাগরে ঘুরে বেড়াবে এই অঞ্চলের সমুদ্রের সঙ্গে পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তীরভূমি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের একটি অঞ্চলের সঙ্গে পরিচয় লাভের মধ্য দিয়ে যে চক্রান্ত শুরু হয় তা-ই কালক্রমে পল্লবিত হয়ে একটি বিরাট সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের মধ্যে সমাপ্ত হতে চলেছে।

ইয়োরোপে উত্তেজনা প্রশমন ও ভিয়েতনাম এবং বাঙলাদেশে শোচনীয় পরাজয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের দুই দশক ব্যাপী যুদ্ধ ও আক্রমণাত্মক নীতি থেকে পিছু হঠতে বাধ্য করেছে। এর ওপর স্বদেশে চরম আর্থিক সংকট এবং বন্ধু রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক প্রতিটি ক্ষেত্রে সমর্থনদানে অস্বীকৃতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বেশ অসুবিধায় ফেলে। বিশ্বব্যাপী এই পরাজয় ও অপমানের মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন পথ খোঁজার চেষ্টা করে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সমুদ্রকে

ব্যবহার করে তাদের পুরাতন ঠাণ্ডাযুদ্ধের কূটনীতিকে চালু করার জন্য যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, ভারত মহাসাগরে ঘাঁটি স্থাপন সেই ঠাণ্ডাযুদ্ধের নীতিরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

দুই

ভারত মহাসাগরের বুকে দিয়েগো গার্সিয়ার রণনৈতিক অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই দ্বীপপুঞ্জে 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ওস্যান টেরিটরি' নামে বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপিত হয়। শ্রীলংকার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এই প্রবাল দ্বীপের দৈর্ঘ্য ২০ কিলোমিটার ও প্রস্থ ৬ কিলোমিটার। এখানকার অধিবাসীসংখ্যা মাত্র ৫ শত। একটি সুন্দর নৌবন্দর এখানে থাকায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এটিকে বেশ ভালোভাবে ব্যবহার করা হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে বৃটিশ দখলী স্বত্বের অবসান হতে থাকে। আর এই শূন্য স্থান পূরণ করতে থাকে প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এইভাবেই দিয়েগো গার্সিয়ায় মার্কিন আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছে।

১৯৭২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে ৫০ বছর মেয়াদী এক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই চুক্তি মারফৎ আমেরিকাকে এই অধিকার দেয়া হয় যে নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে এই দ্বীপে যে ব্যবস্থা নেয়া দরকার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা নিতে পারবে। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, এই চুক্তির বলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দিয়েগো গার্সিয়ায় বিরাট সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে।

অতীতে ঘোষিত হয়েছিল যে, এই দ্বীপে ব্রিটেন ও মার্কিন নৌবাহিনীর একটি যোগাযোগকেন্দ্র স্থাপন করা হবে, প্রকাশ্যে এই কথা ঘোষণা করা হলেও সঙ্গোপনে এই দ্বীপে এক বিরাট মার্কিন নৌঘাঁটি নির্মাণের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এই সকল সংবাদ জনসাধারণের নিকট থেকে গোপন রাখার জন্য মার্কিন সরকারী মহল নানা চেষ্টা করেও সফল হতে পারে নি। অবশেষে সাম্রাজ্যবাদী জগতের শিরোমণির সকল চক্রান্তের কথাই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে।

তিন

ভারত মহাসাগরে দিয়েগো গার্সিয়ার অবস্থান সামরিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই স্থান থেকে পশ্চিমে আফ্রিকার মালাগাসি, তাঞ্জানিয়া,

কেনিয়া, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া, এডেন, উত্তর-ইয়েমেন, মস্কট, পারস্য ও আরব উপসাগরীয় অঞ্চল এবং ভারত, শ্রীলংকা, বাঙলাদেশ, পাকিস্তান, বার্মা ; ও পূর্বদিকে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর, জাপান প্রভৃতি স্থানের উপর প্রত্যক্ষভাবে বা আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের প্রবেশ-পথের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা সম্ভব। এভাবেই দিয়েগো গার্সিয়া থেকে ২ কোটি ৮০লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত ভারত মহাসাগরীয় এলাকা ও এই এলাকার উপ-কূলবর্তী দেশগুলির উপর প্রাধান্য স্থাপন করার চেষ্টা চলছে। সুতরাং ভারতের তটভূমি থেকে ১৪০০ মাইল ও শ্রীলংকার তটভূমি থেকে ১০০০ মাইল দূরের একটি স্থানকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাদের ঘাঁটি স্থাপনের জন্য বেছে নিয়েছে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বিখ্যাত ইংরেজ ভাষ্যকার ডিক উইলসন মনে করেন আগামী দিনে রণনীতির দিক দিয়ে দিয়েগো গার্সিয়ার মতো দ্বীপপুঞ্জের উপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার, কারণ এখান থেকে বোমারু বিমানগুলি সহজে আফ্রিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে যাতায়াত করতে পারবে।

১৯৫৫ সালে ব্রিটেন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদী সরকারের সঙ্গে সাইমনস টাউনের নৌঘাঁটিকে ব্যবহার করার জন্য এক চুক্তি করে। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই 'ন্যাটো'র সক্রিয় সদস্য। এদের পক্ষ থেকে 'সেনটো'কে সক্রিয় করে তোলার জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা চলছে।

কেবলমাত্র দিয়েগো গার্সিয়াই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানকেও প্রবলভাবে অস্ত্রসজ্জিত করছে। মার্কিন সরকার ইরানের সঙ্গে ২৫০০ লক্ষ ডলার মূল্যের অস্ত্র সরবরাহের জন্য এক চুক্তি করেছে, ইরানীয় বিমানবাহিনীর ৮৩০ জন লোককে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করেছে। গত কয়েক বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহু বোমারু বিমান ইরানকে সরবরাহ করেছে এবং বর্তমানে জাহাজ, ক্ষেপণাস্ত্র, ট্যাংক, হেলিকপটার বিক্রির জন্য কথাবার্তা চলছে। করাচি থেকে ৩০০ মাইল দূরে ইরানী বালুচিস্তানের চাহবারে এক বিরাট নৌঘাঁটি তৈরি হচ্ছে। নামে ইরানী হলেও কার্যত একে নিয়ন্ত্রণ করবে আমেরিকা। পারস্য উপসাগর ও ভারতের উপর নজর রাখার উদ্দেশ্যেই প্রধানত এই নৌঘাঁটি নির্মাণ করা হচ্ছে।

চার

দিয়েগো গার্সিয়ায় সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফ্রিকা ও

উপসাগরীয় অঞ্চলের দুর্বার মুক্তি-আন্দোলনের গতি রোধ করার চেষ্টা করছে। সাইমন্‌স টাউনের সামরিক ঘাঁটি থেকে তারা ভারত মহাসাগরে অবাধ চলাচলের উপর বাধা সৃষ্টি করতে পারবে ও দক্ষিণ-আফ্রিকার কুখ্যাত ভোরস্টার প্রশাসনকে দক্ষিণ-আফ্রিকার মুক্তি-আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে। পর্তুগালের লোরেনকো মারকোস ও নাকালা-র ঘাঁটি থেকে মোজাম্বিক ও জিম্বাওয়ে-র (রোডেশিয়া) বীর মুক্তিসংগ্রামীদের আন্দোলনকে দমন করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।[১]

কিছুকাল আগে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে মার্কিন সরকার মনে করেন আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ অবসানের ফলে উভয় দেশের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণে সুয়েজ খাল খোলার সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হচ্ছে। এই জন্যই দিয়েগো গার্সিয়া সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন।

এই সকল সামরিক ঘাঁটি সুয়েজ খালের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পথে বাধার সৃষ্টি করবে এবং এশিয়া-আফ্রিকার বিকাশমান দেশগুলির বিরুদ্ধে চাপসৃষ্টির মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

পাঁচ

সম্প্রতি-প্রকাশিত কয়েকজন মার্কিন কূটনীতিকের বিবৃতিতে প্রকাশ সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের পর ভারত মহাসাগরে বিমানবাহী জাহাজ 'হ্যানকক' ও পাঁচটি ডেসট্রয়ার পাঠানো হয়েছিল। উদ্দেশ্য—আরবদের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানানোর অপরাধে অপরাধী ভারত ও বাঙলাদেশ সরকারকে সতর্ক করা। কিন্তু এই প্রথম নয়, গত দু-বছর ধরেই মার্কিন সরকার নানা চক্রান্তজাল বিস্তার করে চলেছে।

বাঙলাদেশের ঐতিহাসিক মুক্তিসংগ্রামকে দমন করার জন্য মার্কিন সরকার বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহরের আণবিক অস্ত্রসজ্জিত জাহাজ 'এণ্টারপ্রাইজ'কে পাঠিয়েছিল। কিন্তু ভারতের জনগণের অভূতপূর্ব ঐক্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অবিচল সমর্থনের ফলে মার্কিন সরকারের বোম্বেটে কূটনীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

---

১ অবশ্য, সাম্রাজ্যশক্তির বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে পর্তুগালে সম্প্রতি যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে গেছে। সমকালীন ঘটনাবলীর ওপর এর প্রভাব গভীর অনুধাবনার বিষয় হবে সন্দেহ নেই। —সম্পাদক

বিভিন্ন সংকটময় মুহূর্তে ভারতের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনের ফলে এই দেশে সোভিয়েত ইউনিয়ন অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা মার্কিন সরকারের পক্ষে মোটেই প্রীতিকর হয় নি।

এই কারণেই ভারত মহাসাগরে সোভিয়েত নৌবহরের কাল্পনিক উপস্থিতির কথা ঘোষণা করে এই দেশের জনমানসে সোভিয়েত ইউনিয়ন-সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা মারফৎ মার্কিন সরকার নিজের অপকীর্তিকে আড়াল করতে চাইছে। সোভিয়েত সরকার একাধিকবার ভারত মহাসাগর অঞ্চলে তাদের নৌবহরের উপস্থিতির কথা অস্বীকার করে এই এলাকাকে শান্তির অঞ্চলে পরিণত করার কামনা ব্যক্ত করেছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে বলেছেন, ভারত মহাসাগরে কোনো সোভিয়েত নৌবহর নেই! সঙ্গে সঙ্গে, এই অঞ্চল বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে পরিণত হবে—এমন আশংকার কথাও তিনি ব্যক্ত করেছেন।

দুই বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর কথা তোলায় জনগণের মনে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব যে ভারত মহাসাগরে সোভিয়েত ইউনিয়নও বোধহয় মার্কিন সরকারের পথই নিয়েছে। সকল মুক্তিকামী দেশ ও বিকাশমান দেশের পরম বন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়ন। কোনো দেশকে পদানত করা নয়, মানুষের সার্বিক মুক্তিই সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান ব্রত। অন্যদিকে মানবজাতির হিংস্র শত্রু সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানুষকে নিজের পদানত করে রাখতেই চায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের লক্ষ্য শান্তি, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য যুদ্ধের দাবানল সৃষ্টি করা।

ছয়

মনে রাখা দরকার, ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি নানা প্রাকৃতিক সম্পদে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের বেনামদারেরা প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছে এবং এই সকল স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই দিয়েগো গার্সিয়া সহ অন্যান্য স্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই বিস্তৃত অঞ্চলে পৃথিবীর তেল সম্পদের ৬০ শতাংশ, হীরা উৎপাদনের ৯৮ শতাংশ, ইউরেনিয়াম ৬০ শতাংশ ও সোনার ৪০ শতাংশ পাওয়া যায়।

এখানে পৃথিবীর সামগ্রিক উৎপাদনের ৯০ শতাংশ রবার, টিন, পাট, চা পাওয়া যায়। এ ছাড়া এই অঞ্চলে কোবালট, টাংস্টেন, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, রূপা, লবণ, গন্ধক, কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে ব্রিটেনের অর্থবিনিয়োগ ৬০ শতাংশেরও বেশি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থবিনিয়োগও, বিশেষ করে তৈলসম্পদে, ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

ভারত মহাসাগরে ঘাঁটি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সরকার আমাদের দেশের কয়েকটি মূল শিল্পে—বিশেষ করে সার, রসায়ন, উপকূলবর্তী সমুদ্রে তেল আহরণ প্রচেষ্টায়—অর্থনিয়োগের চেষ্টা করছে। বিড়লার হিন্দ মোটরে মার্কিনী বহু জাতীয় কোম্পানি জেনারেল মোটর কর্তৃক অর্থ বিনিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে মার্কিনী অনুপ্রবেশের জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা চলছেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কম দামে খাদ্য আমদানীর জন্য নানা-ভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

নতুন পি. এল. ৪৮০ চুক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক চাপের কাছে আমাদের সরকারের আত্মসমর্পণের আর-একটি নজির মাত্র। এরই সঙ্গে খাদ্য আমদানীর কথা ধরলে বলা যায়, আমাদের দেশের কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এক অশুভ আঁতাত চলছে।

ওয়াশিংটনস্থ ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীত্রিলোকীনাথ কাউল যখন তারস্বরে ঘোষণা করে চলেছেন যে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব ক্রমবর্ধমান, তখনই ভারতের জাহাজশিল্পকেন্দ্র ও তেলশোধনাগার কোচিনের অনতিদূরে দিয়েগো গার্সিয়া বন্দরে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত নৌ-বিমান-ঘাঁটি স্থাপন বন্ধুত্বের সার্থক নিদর্শনই বটে!

সাত

দিয়েগো গার্সিয়ায় মার্কিন নৌ-বিমান-ঘাঁটি নির্মাণ সারা পৃথিবীর বিভিন্ন মহলে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে এই ঘাঁটি স্থাপনকে নিন্দা করা হয়েছে। লুসাকা ও আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির সম্মেলন থেকে ভারত মহাসাগরকে বৃটিশ-মার্কিন চক্রান্তের কার্য-কলাপের ক্ষেত্রে পরিণত করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। ভারত সরকার ছাড়াও শ্রীলংকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, বাংলাদেশ, দক্ষিণ-ইয়েমেন, তাঞ্জানিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশও মার্কিন সরকারের ঘৃণ্য কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেছে। ভারত, শ্রীলংকা, বার্মা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি

দেশ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে শান্তির এলাকায় পরিণত করার দৃঢ় দাবিও উত্থাপন করেছে।

বিশ্ব-শান্তিসংসদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের নিন্দা করে বিশ্ব-প্রতিবাদ-সংগঠনের প্রথম ধাপ হিসেবে উপকূলীয় অঞ্চলের এক সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শান্তিসংসদের আহ্বানে ১০ ফেব্রুয়ারি বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে সারা ভারতে ভারত মহাসাগর দিবস পালিত হয়েছে।

দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ভারতের দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক শক্তির সামনে এক গুরুদায়িত্ব উপস্থিত হয়েছে। কারণ, নিছক কামনা করলেই ভারত মহাসাগর শান্তির এলাকায় পরিণত হবে না। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, পৃথিবীর সকল মুক্তিকামী দেশ ও বিকাশমান দেশের চরম শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ শুরু না হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের আবেদনের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করে না।

আমাদের দেশ ও জাতির সংকটক্ষণে যখন আবার নয়া-উপনিবেশবাদী ও তাদের বেনামদারেরা নানা চক্রান্ত করছে, তখন ভারতের সকল গণতান্ত্রিক-দেশপ্রেমিক মানুষ ভারত মহাসাগরকে যুদ্ধের দাবানলের ক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হতে না দেয়া ও শান্তির এলাকায় পরিণত করার দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠবেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাজেন্দ্রলাল মিত্র [১৮২২-১৮৯১]

ভুবনবিখ্যাত ভারতবিদ্যাবিৎ ও সুপণ্ডিত হিসেবে পরিচিত ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর জীবৎকালে। বস্তুত রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কিত আলোচনায় কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির প্রসঙ্গ অনিবার্য ; কেননা প্রথমজনের সঙ্গে শেষোক্তের সম্পর্ক অন্যোন্যসম্বন্ধ। আঠারো শতকের শেষার্ধে (সেপ্টেম্বর ১৭৮৩) জনৈক উইলিয়ম জোন্‌সের ভারত আগমন এবং অচিরেই কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন (১৫ জানুয়ারি ১৭৮৪) প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার ইতিবৃত্তে অবিস্মরণীয় অধ্যায়। যদিচ আমরা জানি, এই সোসাইটি সংস্থাপনের অর্ধ যুগ পূর্বে ওলন্দাজ পণ্ডিতদের প্রয়াসে বাটাভিয়ায় (বর্তমানে জাকার্তা) অনুরূপ এক সংস্থা, বাটাভিয়াস্থ রাজকীয় কলা ও বিজ্ঞান পরিষৎ (Koninklijk Bataviaasch genootschap van Kunsten en Wetenschappen), প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জ্ঞানচর্চার বহুধাবিচিত্র শাখায় অনেককাল নিয়োজিত থাকার পর ইন্দোনেসিয়ায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠান্তে অবলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু কার্যত কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমেই আমাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে প্রথম স্বদেশসন্ধিৎসার বীজ সংক্রমিত হয় এবং এই সোসাইটির আদর্শেই উত্তরকালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদ্বজ্জন প্রাণিত হন এবং কার্যকারণসূত্রে Societe Asiatique (১৮২২), Asiatic Society of Great Britain and Ireland (১৮২৩), American Oriental Society (১৮৪২), Deutsche Morgenlaendische Gesellschaft (১৮৪৪) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, Societe Asiatique ব্যতিরেকে রাজেন্দ্রলাল উপর্যুক্ত বিদ্বৎসমাজের সম্মানিত সদস্য ছিলেন। আর মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক ও সহকারী সচিবের পদে তাঁর নিয়োগ (৫ নভেম্বর ১৮৪৬) থেকে শুরু করে সাধারণ সদস্য (১৮৫৬), সচিব (১৮৫৭), সহ-সভাপতি (১৮৬১), সভাপতি (১৮৮৫) এবং তাঁর মৃত্যুর (২৬ জুলাই ১৮৯১) অব্যবহিতপূর্ব পর্যন্ত উক্ত সোসাইটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটির তিনি ছিলেন সদস্য। বলা বাহুল্য এবংবিধ সম্মানলাভ রাজেন্দ্রলালের পূর্বে কোনও ভারতীয় পণ্ডিতের পক্ষেই সম্ভবপর হয় নি।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে যোগদানের পরের বছরেই রাজেন্দ্রলালের গবেষণা-পত্র Inscription at Oomga প্রকাশিত হল (***Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, December 1847***)। অতঃপর তাঁর শতাধিক গবেষণা-পত্র সোসাইটির ***Journal*** ও ***Proceedings***-এ প্রকাশিত হয়। তাঁর গবেষণা-কর্মের বিষয়বস্তু মূলত প্রাচীন ভারতীয় লিপি ও মুদ্রা বিষয়ক, সন্দেহ নেই ; তৎসত্ত্বেও তাঁর অন্বেষণ ছিল প্রাচীন চিত্র, ভাস্কর্য, ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে সর্বদা জাগ্রত। লক্ষ্মণ সেনের নামানুসারে লক্ষ্মণাব্দের প্রচলন সম্পর্কিত সন্ধান প্রথম মেলে রাজেন্দ্রলালের গবেষণায়। উপকরণ সংগ্রহের আয়াসসাধ্য অভিযানে তাঁর বাঙলাদেশ তথা ভারতবর্ষ পরিক্রমণ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিপ্রয়োগের ব্যবহার তাঁর গবেষণাকর্মে অনুস্যূত। আইন ও চিকিৎসাশাস্ত্র উভয়কেই শেষাবধি বৃত্তি হিসেবে ত্যাগ করলেও যুক্তি ও বস্তুনিষ্ঠা সমানে তাঁর সহায়ক ছিল। আর তাই অদ্যাবধি তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যাদি ও সিদ্ধান্ত কচিৎ নস্যাৎ হয়েছে।

এশিয়াটিক সোসাইটির Bibliotheca Indica গ্রন্থমালায় এক ডজন সুপ্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এবং এই গ্রন্থ-মালায় তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদ, পাতঞ্জল যোগসূত্র ও ললিতবিস্তারের অংশ-বিশেষ ইংরেজী তরজমায় প্রকাশ করেন। দুষ্প্রাপ্য পুঁথির সন্ধানেও রাজেন্দ্র-লালের ঔৎসুক্য ছিল নিরন্তর। এবং তাঁর এই শ্রমসাপেক্ষ গবেষণায় বহু নূতন ও মূল্যবান পুঁথির আবিষ্কার সম্ভবপর হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত নয় খণ্ডে রাজেন্দ্রলালের ***Notices of Sanskrit Manuscripts*** (১৮৭০-১৮৮৮)—এদেশের বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত পুঁথির বিবরণমূলক এই তালিকা প্রণয়ন পরবর্তীকালে পণ্ডিতদের প্রাণিত করেছে। কার্যত এ বিষয়ে রাজেন্দ্রলালকে পথিকৃৎ হিসেবে আখ্যাত করাই যুক্তিযুক্ত।

রাজেন্দ্রলালের সুবিখ্যাত গ্রন্থচতুষ্টয়—***The Antiquities of Orissa*** (প্রথম খণ্ড, ১৮৭৫ ; দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৮০), ***Buddha Gaya, the hermitage of Sakya Muni*** (১৮৭৮), দুখণ্ডে ***Indo-Aryans*** (১৮৮১) ও ***The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*** (১৮৮২) পাঠ আজও অনু-সন্ধিৎসুদের কাছে প্রায় প্রেয় অভিজ্ঞতা। অবশ্য উপর্যুক্ত তালিকার প্রথম ও শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় ঔপচারিক বৈভবে অদ্যাবধি অবিস্মরণীয়। প্রথমোক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু প্রাচীন সাহিত্যের প্রেক্ষিতে ওড়িশা ; অতঃপর ভারতীয়

স্থাপত্যের ইতিবৃত্ত, ওড়িশার মন্দির স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকলার বহুধাবিচিত্র বিশ্লেষণ। দ্বিতীয় খণ্ডে খণ্ডগিরির প্রত্ননিদর্শন, ভুবনেশ্বর, পুরী, কোনারক প্রভৃতি স্থানের মন্দির সম্পর্কিত তথ্যসমৃদ্ধ সার্ভে। নেপালের সংস্কৃত-বৌদ্ধ সাহিত্যের সবিশেষ ঐতিহাসিক ঐশ্বর্যের কথা রাজেন্দ্রলালই (সংকলন ও অনুবাদের মাধ্যমে) সর্বপ্রথম বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টিগোচর করেন।

সর্বোপরি মাতৃভাষাও রাজেন্দ্রলালের কাছে বিদ্যাচর্চার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। আর আপন মাতৃভাষায় এই অপরিসীম অনুরাগেই বাঙলায় প্রথম সচিত্র 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ অর্থাৎ পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র' (কিঞ্চিৎ অনিয়মিতভাবে কার্তিক ১৭৭৩ শক—চৈত্র ১৭৮১ শক) তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার ৭ম পর্বের সম্পাদক ছিলেন স্বনামপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ। অতঃপর এই পত্রিকার প্রকাশন বন্ধ হলে রাজেন্দ্রলাল 'রহস্য-সন্দর্ভ নাম পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র' (মাঘ ১৯১৯ সংবৎ—আশ্বিন ১৯২৮ সংবৎ ; নিয়মিত প্রকাশনা সম্ভবপর না হলেও ৬ষ্ঠ পর্বে মোট ৬৬ খণ্ড বর্তমান) সম্পাদনায় যত্নবান হন। এতদ্ব্যতীত বাঙলা ভাষায় ভৌগোলিক পরিভাষা প্রণয়ন, মাতৃভাষায় মানচিত্র প্রকাশন ব্যতিরেকে রাজেন্দ্রলালের 'প্রাকৃত-ভূগোল' (১৮৫৪), 'শিল্পিক দর্শন' (১৮৬১), 'ব্যাকরণ-প্রবেশ' (১৮৬২) প্রভৃতি পুস্তক সেকালীন ছাত্রসমাজের পক্ষে বিপুল সহায়ক হয়।

রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কিত এই সংক্ষিপ্ত ভাষ্যের উপসংহারে এক মহামতি ব্যক্তিত্ব ও ভারতবিদ্যাবিৎ ফ্রিড্‌রিশ্‌ মাক্স্‌ মূল্যর্‌—যাঁর নাম আজও বাঙলাদেশ নামীয় এই জোলো প্রদেশের মানুষের মুখে মুখে ফেরে—লিখিত *Chips from a German Workshop* (প্রথম খণ্ড, ১৮৬৮) থেকে রাজেন্দ্রলাল সম্বন্ধীয় প্রশস্তির অংশবিশেষ আপাতত প্রণিধানযোগ্য : "He is a pandit by profession, but he is at the same time, a scholar and critic in our sense of the word···and his arguments would do credit to any Sanskrit Scholar in England।"

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

[জন্ম ২৯ ডিসেম্বর ১৮৭৩ ; মৃত্যু ১২ আগস্ট ১৯৬০]

"তোকে আমি যে সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্রভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কোনো লেখায় হয়নি। ...তোর এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে, সত্য আপনি তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ হয়। সে তোর নিজের গুণে। যদি কোনো লেখকের সবচেয়ে ভালো লেখা তার চিঠিতেই দেখা দেয়, তাহলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে। আমি তো আরও অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পারেনি। ...যে শোনে এবং যে বলে এই দুজনে মিলে তবে রচনা হয়—

"তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ,
তবে সে কলতান উঠে।
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে,
তবে সে মর্মর ফুটে।"

এই চিঠিটির লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লিখেছেন ইন্দিরা দেবীকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তারিখে। পদ্মার পারে পারে উত্তর-বাঙলায় বোটে করে ঘুরে বেড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃতিকে দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন তার রহস্যব্যাকুল এবং মধুর রূপ। বাঙলাদেশকে আবিষ্কার করেছেন প্রাণের চলস্রোতে বিচিত্র চঞ্চল তরঙ্গে তরঙ্গে। 'ছিন্নপত্র' তারই আলেখ্য। "সুখ-দুঃখের দিনরাত্রিগুলি" অপরূপ রূপে গাঁথা হয়েছে 'ছিন্নপত্র' সংকলনে। আর সংকোচহীন চিত্তে রবীন্দ্রনাথ এই অসামান্য চিঠিগুলি পাঠিয়েছিলেন তাঁর মনের যথার্থ সঙ্গীনী ইন্দিরাকে—বয়সে যদিও রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তিনি ছোটই ছিলেন। স্বভাবতই কৌতূহল জাগে কী অতুলনীয় গুণে তিনি মুগ্ধ করেছিলেন বিশ্বকবিকে—যাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না।

ইন্দিরা দেবীও তাঁর সারাজীবনে সর্বক্ষেত্রে রবিকাকার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবকে স্বীকার করেছেন শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে : "আমরা যা কিছু করেছি, হয়েছি, এমন কি ভেবেছি পর্যন্ত তা তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আচ্ছন্ন।" সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয়—সংস্কৃতিচর্চার প্রেরণাও ছিলেন রবীন্দ্রনাথই।

রবীন্দ্রনাথের পরম স্নেহের এই বিদুষী ভ্রাতুষ্পুত্রীর শৈশব কেটেছে বোম্বাই প্রদেশে, পিতার কর্মস্থলে। পাঁচ বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে বিলাতযাত্রা করেন। দু-বছর পরে দেশে ফিরে পড়াশোনা শুরু করেন প্রথমে সিমলায়, পরে লোরেটো হাউসে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করেন মেয়েদের মধ্যে প্রথম

স্থান অধিকার করে। ফরাসী ছিল তাঁর অন্যতম পাঠ্যবিষয়। কিন্তু বিদ্যাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতচর্চাও ছিল অব্যাহত। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির আকাশে বাতাসে যে-গান ভেসে বেড়াত, ইন্দিরা দেবী তা কান পেতে শুনেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে কেটেছিল তাঁর শৈশব-কৈশোরের দিনগুলি। তাই সঙ্গীতের রাজ্যের সদর-দরজা ছিল তাঁর কাছে উন্মুক্ত। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর মনীষা। দেশী-বিদেশী উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীত, পিয়ানো, বেহালা, সেতার, এস্রাজ—সর্বক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অসামান্য পারদর্শিতা। শিক্ষাগুরু হিসেবে পেয়েছিলেন সেকালের দেশী-বিদেশী বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ বদ্রিদাস স্কুল, প্রোফেসর ছেদি ব্রতিয়া, অর্গ্যানিস্ট মিঃ শ্লেটার, বেহালা-বিশারদ মান্‌জাটো এবং অতুলপ্রসাদ সেন ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে। স্বরলিপি রচনা, সুরসংযোজন, সঙ্গীত রচনা এবং সমালোচনায় তিনি ছিলেন দক্ষ শিল্পী। 'সঙ্গীত সংঘ' পরিচালনায় সহায়তা করছেন, 'আনন্দসঙ্গীত' সম্পাদনা করেছেন। রচনা করেছেন প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে 'হিন্দুসংগীত' এবং 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণীসঙ্গম'। গানই ছিল তাঁর চিরকালের সঙ্গী। গানের মধ্যে দিয়েই তিনি ভুবনকে চিনেছেন, দেখেছেন জীবনকে।

সঙ্গীতের সঙ্গে সাহিত্যের সর্বার্থক মিলন হয়েছিল জীবনসঙ্গী হিসেবে প্রমথ চৌধুরীকে পেয়ে—যিনি সাহিত্যের রাজপথে সবুজ পতাকা উড়িয়েছিলেন। যাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ ঋণস্বীকার করেছেন নির্দ্বিধায়, বরমাল্য পরিয়েছেন বারবার, সরস্বতীর বীণায় যিনি ইস্পাতের তার চড়িয়েছেন। তাঁর রচনারীতি ইন্দিরা দেবীর রচনাকে সমৃদ্ধ করেছিল। প্রমথ চৌধুরীর বিদগ্ধ মার্জিত সাহিত্য-রুচি, অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্য, অগাধ পাণ্ডিত্য ইন্দিরা দেবীর সাহিত্যসাধনার যেমন প্রেরণাস্বরূপ, তেমনি 'সবুজপত্র' সম্পাদনায় তাঁর ছিল অপরিসীম অবদান। ইন্দিরা দেবীর মাতা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়—শৈশবে ইন্দিরা দেবীর সাহিত্যচর্চার শুরু ওই পত্রিকাতেই, রাস্কিনের রচনার একটি অংশের অনুবাদের মধ্যে দিয়ে। উত্তরকালে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুবাদকের সম্মান লাভ করেছিলেন। আঁদ্রে জিদ-এর ফরাসী 'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকাটির অনুবাদ তিনি 'সবুজপত্র'য় প্রকাশ করেন। 'পরিচয়' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় রেনে গ্রুসে-র *L'Inde*-এর অনুবাদ। পিতা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীও অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'জাপানযাত্রী'র অনুবাদও ইন্দিরা দেবীই করেছিলেন। অবশ্য শুধুই অনুবাদ নয়, কয়েকটি

মৌলিক গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। 'নারীর উক্তি' তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙলার 'স্ত্রী-আচার'গুলিকে সংগ্রহ করে তিনি একটি গ্রন্থ সম্পাদনাও করেন। আর করেন 'পুরাতনী' নামে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর জীবন-চরিত সম্পাদনা।

সাহিত্য এবং সঙ্গীতচর্চার মধ্যে দিন কাটালেও ইন্দিরা দেবী কখনোই দেশ-কালকে বিস্মৃত হন নি। তাই নারীর জাগরণের কথাও চিন্তা করেছেন। অবশ্য এই চিন্তাধারা তিনি কিছুটা লাভ করেছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর কাছে। উনিশ শতাব্দীতে জোড়াসাঁকোর-ঠাকুর পরিবার ছিল নবজাগরণের অন্যতম পীঠস্থান। এই ঠাকুর পরিবারে সত্যেন্দ্রনাথই ছিলেন স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত। তিনি বিদ্যাসাগরের মতো সমাজসংস্কারক ছিলেন না। নারীমুক্তি-আন্দোলনে তাঁর অবদান মূলত পরিবারের ক্ষেত্রেই। কিন্তু তার প্রভাব শুধু ঠাকুর পরিবারের চৌহদ্দীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না—সে প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারিত, দেশময় পরিব্যাপ্ত। স্টুয়ার্ট মিলের ***Subjection of Women*** ছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অত্যন্ত প্রিয় একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থটির অনুসরণে তিনি 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' নামে একটি পুস্তিকা বিলেত যাওয়ার আগেই প্রকাশ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'প্রগতিমূলক, আচার-বিরুদ্ধ কাজের প্রেরণাও ছিলেন পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ। আজীবন পর্দাপ্রথার বিরোধী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেতে স্বপ্ন দেখেছিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়ির খড়খড়ি ভেঙে দিচ্ছেন। এই স্বপ্নকে তিনি সার্থক করে তুলেছিলেন সমগ্র জীবনের সাধনায়। স্বামী সত্যেন্দ্রনাথের আদেশে ইংরেজী ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত হওয়ার জন্য দুটি শিশুকে সঙ্গে নিয়ে স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী বিলেত যান। স্বামীর প্রভাবে তিনিও নিজেকে সুশিক্ষিত ও সুসংস্কৃত করে তুলেছিলেন। তাঁর অপরিসীম জ্ঞানস্পৃহার জন্যই তিনি ইংরেজী, ফরাসী ও সংস্কৃত—এই তিনটি ভাষাতেই পারদর্শিতা লাভ করেন। সকল মানুষের প্রতি সমান দৃষ্টি, ধর্ম সম্পর্কে উদারতা···আধুনিক নারীর সব কটি গুণেরই সমাবেশ হয়েছিল তাঁর চরিত্রে। অভিনয়ে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। শিশুদের সাহিত্যচর্চায় উৎসাহিত করার জন্য 'বালক' পত্রিকার সম্পাদনা তাঁর অসামান্য কীর্তি। বাঙালি রমণীর পরিচ্ছদ প্রচলনের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। আর ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুর-চারিণীদের প্রথম আলোকচিত্র গ্রহণের মধ্যেও তাঁর আধুনিক মনেরই প্রকাশ। আবার সনাতন ভারতীয় নারীর সৎগুণাবলীরও তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক।

পাশ্চাত্য আদবকায়দা সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর স্বদেশ-প্রীতি ছিল অটুট। স্বদেশী আন্দোলনে তাঁর যোগদান এবং 'হোমরুল'-এর প্রতি সমর্থনও নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এই সত্যেন্দ্রনাথ এবং জ্ঞানদানন্দিনীর কন্যা ইন্দিরা। পিতা-মাতার কাছে যা তিনি পেয়েছিলেন তাকেই আত্মস্থ করেছেন, বিকশিত করেছেন নিজের জীবনে। নারীমুক্তি আন্দোলনে তাঁর অবদানও পিতার মতোই। তাঁর আন্দোলন নিঃশব্দ আন্দোলন। ভারতীয় নারীর মুক্তি কোথায়—এ প্রশ্ন ইন্দিরা দেবীর মনে জেগেছিল এবং তিনি একটি পথের সন্ধানও দিয়ে গেছেন। বলা বাহুল্য, ভাববাদী জাতীয়তাবাদী ও মানবিকতায় বিশ্বাসী ইন্দিরা দেবীর সেই পথে ছিল অনিবার্য সীমাবদ্ধতা। তথাপি এই মহিয়সী রমণী তাঁর সাধ্যমতো চেষ্টা করে গেছেন। ইয়োরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় নারীর গ্রহণযোগ্য আদর্শের পথটিই তিনি বারবার চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। ভারতীয় আদর্শের ভুলভ্রান্তি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি, কিন্তু তাকে সংশোধন করে গ্রহণ করতেই বলেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ইন্দিরা দেবীর কাছে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিক্ষার সুষ্ঠু সমন্বয়ই ছিল আদর্শ শিক্ষা। পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, কিন্তু সেই শিক্ষাকেই শেষ কথা মনে করেন নি। তাঁর বিশ্ববোধের মূল দেশের মাটিতেই প্রোথিত ছিল। তাই মনে করতেন আমাদের শিক্ষার পূর্ণতা ভারতীয় আদর্শের মধ্যে। নারীর যথার্থ চিত্তমুক্তি সেখানেই। নারীর স্বাধীনতা তিনি চেয়েছেন, কিন্তু স্বেচ্ছাচারকে স্বাধীনতা বলে ভুল করেন নি। "সংস্কার মানে বিকার নয়, শিক্ষা মানে পাখী-পড়া নয়।" "ভাব ও কাজের সেতুবন্ধন" নারীজীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য এই ছিল তাঁর অভিমত।

সাহিত্য, শিল্পকলা কেবলমাত্র পুরুষের উপভোগের সামগ্রী নয়, সে আনন্দে নারীরও অধিকার আছে। নারীত্বের বিকাশে সাহিত্য-শিল্পকলার ভূমিকাটিও তিনি বিশেষভাবে ঘোষণা করেছেন। ইন্দিরা দেবী ছিলেন সামঞ্জস্যের পক্ষপাতী। প্রাচীন ও আধুনিক—দুই কালকে তিনি একসূত্রে বিধৃত করতে চেষ্টা করেছেন।

"সেকালের ধীরাস্থিরার সঙ্গে একালের ধীমা হতে হবে; অথবা সেকালের শ্রী ও হ্রীর সঙ্গে একালের ধী মেলাতে হবে—বঙ্কিমবাবু হলে যাকে বলতেন প্রখরে-মধুরে মেশা। এই সামঞ্জস্যই নারীজীবনের মূলমন্ত্র।"

নারীকে সংসারজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্যাটেল বিলকে সমর্থন জ্ঞাপনে তাঁর মুক্তবুদ্ধি ও আধুনিক রুচির পরিচয় পাই। অসবর্ণ বিবাহকে সমর্থন করে হিন্দু সমাজের মূলে এই বিল কুঠারাঘাত করে। ইন্দিরা দেবী দেশের মানুষকে এই বিল সমর্থন করতে আহ্বান জানান। আইন মানুষের মনে পরিবর্তন আনতে পারে না—একথা যেমন তিনি স্বীকার করেছেন, আবার তেমনই স্বীকার করেছেন পরিবর্তন-সাধনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তাকে। অবশ্য মানবিক পরিবর্তনের ওপরই জোর দিয়েছিলেন বেশি।

নারীর সসম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অনেক সামাজিক সংস্কারও দাবি করেছেন। বিবাহব্যবস্থার সংস্কার, বিবাহবিচ্ছেদ সমর্থন, জন্মনিরোধ, পর্দাপ্রথা ও পণপ্রথার অবলুপ্তি, অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার প্রবর্তন, স্বেচ্ছাবিবাহ প্রচলন, অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র বিস্তৃততর করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। এ ছাড়া মেয়েদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার দান, নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, পরিবারে রমণীর ব্যক্তিত্ব ও মতামতকে যথাযোগ্য সম্মান জানাতে তিনি অন্যদের উদ্বুদ্ধ করেছেন।

আধুনিক যুগের নারী-আন্দোলনের মূলসূত্রগুলি তিনি নির্দেশ করেছিলেন অনেক আগেই। সে পথেই আমাদের চলার শুরু—সে চলার শেষ হয় নি আজও।

নারীজাগরণের অন্যতম নেত্রী হিসেবে তিনি অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেমন—বেঙ্গল উইমেনস এডুকেশন লীগ, অল ইণ্ডিয়া উইমেনস কনফারেন্স, হিরণ্ময়ী বিধবাশ্রম, সঙ্গীত-সম্মিলনী। কোনো কোনো সময় এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রীর পদও তিনি অলংকৃত করেন।

নারীমুক্তির আন্দোলনে তাঁর ভূমিকাটি তাই বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। "চৌমাথায় খাড়া দ্বিধাগ্রস্ত পথচারিণীকে ডেকে যে অনাহূত পরামর্শ" দিয়েছেন তার মূল্য অতুলনীয়। তিনি বলেছেন—পূর্ববাহিনী-পশ্চিমবাহিনী নদীর মিলিত স্থান পবিত্র সঙ্গমে অবগাহন করে নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত হওয়ার মধ্যেই নারীজীবনের পরম সার্থকতা; "দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, দুঃখহারিণী কমলা, বিদ্যাদায়িনী বাণী"—বাঙলার নারীর মধ্যে এই ত্রিমূর্তির একত্র সমাবেশেই নারীর সাধনার সিদ্ধি, সার্বিক জীবনচেতনার বিকাশ।

ইন্দিরা দেবীর ছেলেবেলা অতিক্রান্ত হয়েছে বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন শহরে, বিলেতে, ফ্রান্সে, সিমলায় এবং কলকাতায়। এই কলকাতা শহরেই জীবনের

অনেকগুলি দিন কাটিয়ে ফিরে গেছেন তিনি রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নলোক শান্তিনিকেতনে —বিশ্বভারতীর কর্মময় জীবনে। সেখানে কেটেছে তাঁর শেষবেলাকার দিনগুলি। ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে তাঁর শান্তিনিকেতন যাত্রা। বিশ্বভারতীর সঙ্গীত-ভবনের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাত্রী। সঙ্গীতশিক্ষাদানেও ছিল তাঁর অপরিসীম উৎসাহ। তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন। স্বরলিপি-সমিতির সভানেত্রী হিসেবে 'স্বর-লিপি-গ্রন্থমালা' সম্পাদনার কাজে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা বিশেষভাবে স্মরণীয়। "প্রামাণ্য স্বরলিপি রচয়িতা, পুরনো গানের বিশ্বস্ত রক্ষক" রূপে ইন্দিরা দেবীর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল অবিসংবাদিত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের রহস্যনিকেতনে তিনি ছিলেন আলোকবর্তিকা। শান্তিনিকেতনের 'আলাপিনী' মহিলা-সমিতির সংগঠনে তাঁর অবদান অসামান্য। এই সমিতির মুখপত্র 'ঘরোয়া' পত্রিকাটির প্রকাশেও তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না, পরিচালনাকাজেও তাঁর সক্রিয় সহযোগ ছিল। ইন্দিরা দেবীর কর্মময় দীর্ঘজীবনের আর-একটি বিশিষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্যপদের দায়িত্বগ্রহণ। বৃদ্ধ বয়সে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার কাজে অল্প সময়ের মধ্যেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন।

রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ রেনেসাঁসের যে-আলোকশিখাটি জ্বালিয়েছিলেন, তারই উত্তরসাধিকা ইন্দিরা দেবী। ইন্দিরা দেবীর আশি বছরের জীবনকে সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে অতুলচন্দ্র গুপ্ত যে-ভাষায় সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন, তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সে-ভাষাতেই মহিয়সী এই রমণীর প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি—

> "তোমারই মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি সেই তাপসগণকে—সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে, জ্ঞানে ও ধর্মে, ভাবে ও কর্মে জাতীয় নবজাগরণের যাঁহারা উদ্যোক্তা—তোমরা দিশারী, আমরা অনুসারী। তোমাদের জীবনালোকে আমাদের পথ হোক উজ্জ্বল।"

সুলেখা মল্লিক

রবার্ট ফ্রস্ট : কবির শতবার্ষিকী

একালের আমেরিকান কবিদের মধ্যে রবার্ট ফ্রস্ট কোনোদিনই ফ্যাশনেবল ছিলেন না, কিন্তু তাঁকে বাদ দিয়ে আমেরিকান কবিতার বিষয় আলোচনা

নিশ্চয়ই খণ্ডিত। তাঁর কবিতার মাধুর্য সম্ভবত ছিল তার সারল্য—স্বচ্ছ অথচ গভীর। লৌকিক ভাষায় স্বগত সংলাপের মতো তাঁর কবিতায় অজস্র এবং অনিবার্য প্রাকৃতিক চিত্র—ঘাস, পাখি, ম্যাপল পাতা ছড়ানো বনতল এবং শস্যের সুরভি। নাগরিক ও বৈষয়িক আমেরিকায় এই শতাব্দীতে এমন নিষ্পাপ ও সরল কবিতা রচনার মতো মন বাঁচিয়ে রাখা অবিশ্বাস্য ঠেকবে পাঠকের কাছে। সম্ভবত এই কারণেই তরুণ ফ্রস্টের কবিতার আদর প্রথম উপার্জিত হয়েছিল অতলান্তিকের এপারে ইংরেজি ভাষার আদিবাড়ি ইংল্যাণ্ডে।

এ বছর রবার্ট ফ্রস্টের জন্মশতবার্ষিকী। উননব্বই বছর বয়সে কবির মৃত্যু হয় ১৯৬৩ সালের ২৯ জানুয়ারি। সে বয়সেও তিনি কবিতা লিখে গেছেন। কবিতার স্বপ্ন তাঁকে কোনোদিন পরিত্যাগ করে নি। হুইটম্যানের পর রবার্ট ফ্রস্টই আমেরিকার অনুচ্চারিত জাতীয় কবি। যদিও হুইটম্যানের কবিতার বিশাল ব্যাপকতার ছায়া পড়ে নি ফ্রস্টের রচনায়।

ফ্রস্ট একান্তভাবেই শান্ত আমেরিকান। একালের পক্ষে বেমানান, হয়তো বা জনতায় একা, উপেক্ষিত এবং স্বেচ্ছানির্বাসিত। নগর-আমেরিকা থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন মানুষের পবিত্র আকাংক্ষার তাগিদে। তার কোনো দেশকাল ভেদ নেই। ফ্রস্ট তাঁর সরলতার জন্যই বেঁচে থাকবেন।

ফ্রস্টের কবিতায় আমেরিকার যে-চিত্র তা একান্তভাবেই নিউ ইংল্যাণ্ডের। এ ছবি আর কোনোদিন পাল্টায় নি। বার বার তারই নিসর্গ কবিকে জাদু-মায়ায় মুগ্ধ করে। ফ্রস্টকে তবু আভিধানিক অর্থে নিসর্গের কবি বলা যায় না। তার নিসর্গ মানুষের পটভূমিতেই বিচার্য। সে মানুষ ঘোড়ায় চড়ে কোনো এক তুষার-গলা সন্ধ্যায় বনতলে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবে—এখন এই রমণীয় অরণ্য দেখার সময় নয়, আমাকে কথা রাখবার জন্য মাইলের পর মাইল যেতে হবে ঘুমোবার আগে। তিনি নীতিবাক্যে বিশ্বাসী ছিলেন না। আমেরিকার সাধারণ মানুষের জীবনের আপাত-উপেক্ষণীয় ছবি তুলে ধরে কতকগুলি চিরন্তন সত্যের দিকে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ফ্রস্ট সে কারণেই একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁর কবিতায় অন্য এক আমেরিকার চিত্র পাই যা সমস্ত কলুষ ও বিকৃতির ছোঁয়াচের বাইরে। তাঁর কবিতায় শরীর নিয়ে উঠে আসে গ্রামের চাষী, বাগানের মালি, আপেল-কুড়ানো কোনো মেয়ে, খামারবাড়ির সামনে একবুক শস্যের ভিতর মানুষ এবং তাদের সুখ-দুঃখের জগৎ। ফ্রস্টকে তাই সরল ও আপনজন বলে মনে হয়। সেই নিজস্ব কথা

বলার ভঙ্গিকে কাব্যে এনে তিনি আধুনিক আমেরিকান কবিতাকে নতুন বিশ্বাস-যোগ্যতা দিয়েছিলেন। একটি ক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট সমাজের পক্ষে ফ্রস্টের কবিতার আয়নায় মুখ দেখার প্রয়োজন কখনোই ফুরিয়ে যাবে না।

কৃষ্ণ ধর

তরুণ কথাসাহিত্যিক রবি সেনের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

রবি সেনের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট শিল্পী-সাহিত্যিকগণ গত ফেব্রুয়ারি মাসে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতির স্বাক্ষরকারীরা হলেন :

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। অমলেন্দু চক্রবর্তী। অমিতাভ দাশগুপ্ত। অরুণ সান্যাল। অশোক ভট্টাচার্য। অসীম রায়। অহিভূষণ মালিক। কৃষ্ণ ধর। কানাই পাকড়াশী। গোলাম কুদ্দুস। গৌরকিশোর ঘোষ। গৌরাঙ্গ ভৌমিক। চিত্ত সিংহ। চিত্তরঞ্জন ঘোষ। চিন্মোহন সেহানবীশ। তরুণ সান্যাল। তারাপদ মুখোপাধ্যায়। তুলসী মুখোপাধ্যায়। তুষার চট্টোপাধ্যায়। দক্ষিণারঞ্জন বসু। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দিব্যেন্দু পালিত। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবকুমার বসু। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ধনঞ্জয় দাশ। নিখিলচন্দ্র সরকার। নির্মাল্য আচার্য। পবিত্র মুখোপাধ্যায়। পুষ্কর দাশগুপ্ত। প্রসূন বসু। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। বিজন ভট্টাচার্য। বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। বিমল কর। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত। মতি নন্দী। মৃণাল সেন। রঞ্জিত সিংহ। রবীন সুর। রাম বসু। শক্তি চট্টোপাধ্যায়। শিবশম্ভু পাল। শীতাংশু মৈত্র। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। সত্য গুহ। সন্তোষকুমার ঘোষ। সমীর রক্ষিত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সুনীল সেন। সোমনাথ লাহিড়ী ও সৌরি ঘটক প্রমুখ। সম্প্রতি-প্রয়াত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ও বিবৃতির অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে :

গত ৩রা জানুয়ারি ১৯৭৪ তরুণ বুদ্ধিজীবী ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কথা-সাহিত্যিক শ্রীরবি সেনকে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ গ্রেপ্তার করা হয়েছে জেনে আমরা বিস্মিত হলাম। শ্রীসেন 'দেশ' ও 'যুগান্তর' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাছাড়া তাঁর 'সূর্য বেড়িয়ার করচা' ও 'আজ রাতে পৃথ্বীরাজ' বাংলাসাহিত্যের দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

আমরা আরও অবগত হলাম যে শ্রীসেনের বিরুদ্ধে পুলিশের পক্ষ থেকে মামলা রুজু করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি বিচারাধীন বন্দী। আমরা জানি ইদানিংকালে এই জাতীয় অনেক মামলা আদালত কর্তৃক মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং আদালত পুলিশের বিরুদ্ধে অহেতুক হয়রানির অভিযোগ করেছেন। আমাদের আশঙ্কা শ্রীসেনের ক্ষেত্রেও এই জাতীয় ঘটনা ঘটতে পারে।

সরকারের কাছে আমরা তাই অনুরোধ করি যে অবিলম্বে শ্রীসেনের গ্রেপ্তারের কারণ পুনরায় অনুসন্ধান করে দেখা হোক। রাজনৈতিক মতামতের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলে আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করি।

মনীষী নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয়ের মহাপ্রয়াণে

বিশ্ববিশ্রুতকীর্তি আচার্য নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয়ের নাম বৌদ্ধদর্শন ও বৌদ্ধশাস্ত্র সাহিত্যের জগতে সুপরিচিত। বর্তমান বৎসরের আরম্ভে মহামনীষী বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু লোকান্তরিত হন। গত ২৭শে নভেম্বর (১৯৭৩) ৩৯নং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীটস্থ স্বগৃহে অধ্যাপক দত্তের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বেও তিনি কথা কহিয়াছেন। সেইদিনে তিনি যথাবিহিত নিজের শেষ গ্রন্থখানি সম্পর্কিত লেখাপড়াও করিয়াছেন। তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্রালোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এক দুষ্পূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। আচার্য গত দশ বৎসর হইতেই খুব সুস্থ ছিলেন না। সৌম্যদর্শন অনিন্দ্যকান্তি দেহাবয়ব জরার আক্রমণে যেন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল। গত দুই বৎসর পূর্বে একবার তিনি কঠিন পীড়াগ্রস্ত হন। তাহার পর হইতেই আর সারিয়া উঠিতে পারেন নাই। তৎসত্ত্বেও এই মহামনীষীর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্তও মননশক্তি অটুট ছিল—অক্লান্ত ছিল সাধনা। সার্ধ এক বর্ষ কাল পূর্বেও (১৯৭২ জুন) তাঁহাকে শেষবার দেখি। তখন তিনি তাঁহার শেষতম গ্রন্থরচনা প্রায় সমাপ্ত করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলিয়াছিলেন যে এই শেষ গ্রন্থে তাঁহার পূর্বাপূর্ব বহু মতবাদ তিনি নূতনভাবে পুনরালোচনা করিয়াছেন। তিনি এমনও বলেন যে হীনযানী ও মহাযানী বৌদ্ধমতকে সত্যই পৃথক করা যায় না—এবং বুদ্ধও মহাযানীই ছিলেন। বর্তমান লেখিকার সহিত এ প্রসঙ্গে তাঁহার আলোচনাও হয়। পরিক্ষীণ অশক্ত দেহ বাদ না সাধিলে মনে হয় আচার্য তাঁহার আশ্চর্য মানসিক শক্তিতে আরও কিছুকাল মৌলিক চিন্তার ঐশ্বর্যে বৌদ্ধজগতকে সমৃদ্ধতর করিতে পারিতেন।

আচার্য নলিনাক্ষ দত্তের পিতার নাম ছিল সুরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি পিতার দ্বিতীয় সন্তান। তাঁহাদের আদি বাস ছিল বর্ধমানের পূর্বস্থলিতে। পিতার কর্মস্থল ওয়লটেয়রে ১৮৯৩ সালে ৪ঠা ডিসেম্বর তাঁহার জন্ম হয়। ১৪ বর্ষ বয়সে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া পিতার সহিত তিনি চট্টগ্রাম যান ও সেখানেই কলেজে অধ্যয়ন করেন। বিজ্ঞানে ও গণিতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল, ইচ্ছা ছিল এঞ্জিনীয়ার হইবার। এতদ্ব্যতীত তৃতীয় ভাষা ছিল পালি। সম্ভবতঃ বৌদ্ধপ্রধান চট্টগ্রামে

থাকাকালে তিনি এ ভাষার প্রতি আগ্রহশীল হন। বি. এ. পড়েন প্রেসিডেন্সি কলেজে। পালি ভাষায় অনার্স ও এম. এ.-তে তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম হন। রেঙ্গুনে জাডসন কলেজে তাঁহার প্রথম অধ্যাপনাকার্য আরম্ভ হয়। ইহার কিছুদিন পরই তদানীন্তন উপাচার্য গুণগ্রাহী স্যার আশুতোষ তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগে অধ্যাপক রূপে আহ্বান করেন। ঐ সময় অধ্যাপক বি. এম. বড়ুয়া বিভাগীয় অধ্যক্ষ ছিলেন। অত্যল্প সময়ের মধ্যে তিনি পি. আর. এস., পি. এইচ. ডি. ও বি. এল. ডিগ্রী পান। এবার সরকারী বৃত্তি লইয়া তিনি ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে লণ্ডনস্থ প্রাচ্যবিদ্যাবিভাগে ভর্তি হন। তদানীন্তন অধ্যক্ষ টমাস মহাশয় তাঁহাকে গবেষণার সুবিধার জন্য বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত লুই দ্য লা ভ্যালি পুসঁা মহাশয়ের কাছে বেলজিয়ামে পাঠাইয়া দেন। অধ্যাপক দত্ত মহাশয়ের কাছে পূর্বোক্ত মনীষীর গভীর শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে নানা বিস্ময়কর কথা শুনিবার সৌভাগ্য আমার হইত। গবেষণা শেষে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ ***Aspects of Mahayana Buddhism in its Relation to Hinayana*** রচনার জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী ডি. লিট. লাভ করেন। দেশে আসিয়া পুনর্বার অধ্যাপনাকার্যে ব্রতী হন। পরবর্তীকালে বৌদ্ধজগতে তাঁহার স্থান শার্বৎস্কই, পুসঁা, সুর্জ্যাকি, টাকাকুসুর সঙ্গেই।

অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জ্ঞানচর্চার নানা শাখার সঙ্গে সম্পর্কিত হন। এই সময় কাশ্মীর সরকার তাঁহাকে প্রসিদ্ধ গিলগিট ম্যানুস্ক্রিপট সম্পাদনার জন্য আহ্বান করেন। এই প্রসঙ্গে আচার্যের মুখেই শুনিয়াছি যে অধ্যাপক গিসেপ্পি তুচ্চিও এই সম্পাদনাকার্যের অভিলাষী ছিলেন। অধ্যাপক তুচ্চি ১৯৩৮-৩৯ সালে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তৎকালে আমাদের মনীষী অধ্যাপক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের কলিকাতাস্থ ভবনে আসিতেনও। আমরা তখন দর্শনের ছাত্রী। পরবর্তীকালে অধ্যাপক আমার গবেষণা-নিবন্ধের অন্যতম পরীক্ষক হিসাবে অধ্যাপক তুচ্চিকে মনোনীত করেন। গিলগিট ম্যানুস্ক্রিপট প্রধানতঃ বৌদ্ধ বিনয়গ্রন্থ এবং এই একটি মাত্র সংস্কৃতে লেখা গ্রন্থই ভারতে পাওয়া যায়। সেজন্য ইহার মূল্য অপরিমেয় হইলেও পুঁথিটি নিতান্ত খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই কারণে ইহার সম্পাদনা করিতে আচার্যকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়। দুইজন ডোগরা পণ্ডিত তাঁহাকে সহায়তা করিতেন। এই অসম্পূর্ণ পুঁথির পাঠ মিলাইয়া পাঠোদ্ধারের জন্য আচার্য চীনা, তিব্বতী, পালি ও সংস্কৃত ভাষায় প্রাপ্ত অথবা অন্য ভাষায় রূপান্তরিত সংস্কৃত গ্রন্থাদির

সহায়তা" লইয়াছিলেন। বহু খণ্ডে এই গিলগিট ম্যানুস্ক্রিপট প্রকাশিত হয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে পাকিস্তান হইবার পর পাকিস্তানী সরকারের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া অধ্যাপক তুচ্চি ও রোম-প্রাচ্যবিদ্যাবিভাগীয় গবেষকগণও সম্প্রতিকালে গিলগিট ম্যানুস্ক্রিপটের উপর পুনর্গবেষণা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহা দ্বারাই বুঝা যায় যে উক্ত পুঁথিসম্ভারের মূল্য কতখানি। প্রথম পথিকৃৎ আচার্য দত্ত মহাশয়ের গবেষণা তথা কর্মশক্তি কি বিস্ময়করভাবে এই পুঁথির পাঠোদ্ধারকল্পে নিয়োজিত হয় তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য হইতে হয়।

গবেষণাকার্যের মধ্যেই তিনি ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের সম্পর্কে আসেন। লাহা মহাশয়ের সহযোগী হিসাবে স্ফুটার্থাভিধর্মকোশব্যাখ্যা গ্রন্থের তিনটি বড কোশস্থান দেবনাগরী অক্ষরে সম্পাদনা করেন। পরবর্তীকালে স্বয়ং চতুর্থ ও পঞ্চম কোশস্থানও বাহির করেন। বৌদ্ধদর্শনের সহিত কিছুমাত্র পরিচয় থাকিলে এই কার্যের গুরুত্ব অনুধাবন করা সম্ভব। বৌদ্ধদর্শন অধিগত করিতে হইলে অভিধর্ম্ ব্যতীত উপায় নাই। একমাত্র ওয়গীহারা সম্পাদিত তাই শো এডিশন স্ফুটার্থা রোমান অক্ষরে পাওয়া যাইত। আচার্য দত্ত সেইজন্যই এই অমূল্য গ্রন্থ সম্পাদনায় ব্রতী হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে বাকি চারটি (বা তিনটি মতান্তরে) কোশস্থান আর বাহির হইল না।

অধ্যক্ষ বি. এম. বরুয়া মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতে আচার্য দত্ত বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক হিসাবে পালি বিভাগে কাজ করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন বলিয়া বলা যায়। কারণ সে সময় সেই বিভাগে তাঁহার স্থান পূর্ণ করার মত কেহ না থাকায় কয়েকবারই তিনি অবসরোত্তর অধ্যাপনাকার্যে নিযুক্ত থাকেন। এতদ্ব্যতীত তিনি দুইবার এশিয়াটিক সোসাইটির অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে তাঁহার অধ্যক্ষের ভাষণে একটি অতি মূল্যবান দলিল সংযোজিত হয়। এটি ছিল তাঁহার সময়কার প্রাপ্ত একটি অশোক-অনুশাসনলিপি। এক পৃষ্ঠে গ্রীক ও অন্য পৃষ্ঠে আরামাইক অক্ষরে লেখা এই অনুশাসন খ্রীষ্টীয় বিংশ শতকের মধ্যভাগে এশিয়া মাইনরে পাওয়া যায়। তিনি ইরান সমিতিরও অধ্যক্ষ ছিলেন। ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লির প্রকাশনার সহিত তিনি দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি ও তৎসংক্রান্ত প্রকাশনা ও ইরান সোসাইটির অধ্যক্ষতা তিনি করেন। মহাবোধি সোসাইটির সহিত তাঁহার দীর্ঘকালীন যোগ ছিল। তিনি ইহার উপাধ্যক্ষ ছিলেন। মহাবোধি পত্রিকার সম্পাদনা সমিতির সভ্য ছিলেন।

মহাবোধি সোসাইটির কার্যাধ্যক্ষ সমিতির সভ্য ছাড়াও তিনি মহাবোধি পরিচালিত অনাথাশ্রম ও সমাজউন্নয়ন কর্মসংস্থার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ধর্মাঙ্কুর বৌদ্ধবিহারের তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স কর্তৃক নির্বাচিত রাজ্যসভার সভ্যও তিনি ছিলেন। সিকিমের গ্যাংটকে নবপ্রতিষ্ঠিত তিব্বতী বৌদ্ধধর্মানুশীলন সংস্থার তিনি কার্যকরী সমিতির সভ্য ছিলেন। উহার অধ্যক্ষ (তদানীন্তন) ডঃ নির্মল সিংহ মহাশয়ের নিকট আচার্যের কথা শুনিয়াছি। আচার্য সেখানে স্বয়ং গিয়াছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি পাটনাস্থ জয়সওয়াল ইনস্টিট্যুট ও বিহার রিসার্চ সোসাইটির আমন্ত্রণে পাটনা যান। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার প্রথম যে ভাষণ হয় তাহাতে আমরা দুইজন বন্ধুবন্ধুর উল্লেখ শুনি। অধ্যাপক তুচ্চির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রোম-প্রাচ্যবিদ্যাবিভাগের গবেষক ফ্রাউ ওয়ালনার মহাশয়েরও তাহাই মত। পরবর্তীকালে বর্তমান নিবন্ধ-লেখিকা স্বীয় গবেষণায় উক্ত মত খণ্ডন করেন। আচার্য দত্ত মহাশয়ের সস্নেহ প্রশ্রয়ে সে স্বাধীনতা তাঁহার ছাত্রছাত্রীগণ সর্বদাই পাইতেন। তবে, যুক্তির ফাঁকি তিনি সহ্য করিতেন না। ১৯৫৭ সালে তিনি জাপান সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে ২৫০০ বৌদ্ধজয়ন্তী উৎসবে যোগদান করেন। এতদপূর্বেও তিনি ঐ দেশে গিয়াছিলেন। ১৯৬০ সালে রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধধর্মমহাসভায় ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যান। এ মহাসভা অসীম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বুদ্ধের পরিনির্বাণের শতবর্ষ অতীত হইলে বৈশালীতে প্রাচীন বৌদ্ধসংঘ মহাবিভেদের ফলে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায়। আর এই বিংশশতকে অনুষ্ঠিত রেঙ্গুন ধর্মসভায় দুই প্রধান শাখা হীনযান মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার একটা একত্রীভবনের আশা দেখা গিয়াছিল! ১৯৫৮ সালে তিনি ভারততত্ত্ববিদ হিসাবে সুপণ্ডিত আচার্য রাঘবন প্রভৃতির সহিত সোভিয়েত দেশ পরিভ্রমণ করেন। পরবর্তীকালে ১৯৬২ সালে আমরা সেখানে পণ্ডিতবর্গের কাছে তাঁহার কথা শুনি। আচার্যকে জগৎপ্রসিদ্ধ *St. Petersburg Dictionary* উপহার দান করা হইয়াছিল। ঐ সময় তাসকেন্দে সেই বৎসরই আফ্রো-এশিয়ান লেখক সম্মিলন হয়। সেই প্রসঙ্গে আমার স্বামী কিছুকাল ঐখানে প্রিপারেটরি কমিটির সভ্য হিসাবে ছিলেন। সেই সময় তাসকেন্দের তুলা ও তুলাজাত পণ্যের বিপুল সমারোহ তিনি লক্ষ্য করেন। আচার্য দত্তকে তিনি যাত্রার প্রাক্কালে ঐ সকল তুলাজাত পণ্যের কারখানা ও মিল ইত্যাদি দেখিয়া আসার জন্য বলেন। আচার্য দত্তের ব্যক্তিগত দুইটি কাপড়ের মিল ছিল। তিনি সোৎসাহে ঐ সব কলকারখানা দেখিয়া আসেন।

মনীষী নরেন্দ্রনাথ লাহার সম্পর্কে আসার পর হইতে আচার্য শুধু বাণীর নহে লক্ষ্মীর উপাসনাতেও মনোযোগ দেন। তীক্ষ্ণধী ও বিচক্ষণ ব্যবসায়ী হিসাবে সেদিকেও তিনি সিদ্ধকাম হন। একসঙ্গে বাণীসাধক ও লক্ষ্মীর বরপুত্রের সমন্বয় তাঁহার মধ্যে ঘটিয়াছিল। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গেই সুবিস্তৃত ব্যবসায়ের দায়িত্বও তিনি সমান দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বয়ং একবার বলেন—"শুধুই যদি ১০০০ টাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনাই করতাম তাহলে কি যখন ইচ্ছে যেমন ইচ্ছে পৃথিবীর যেখানে যে নূতন গবেষণার বই বার হচ্ছে তা এইভাবে পড়াশুনোর জন্যে আনিয়ে নিতে পারতাম?" পড়াশুনা ও ব্যবসায় একত্রেই চলিত। বিশাল কর্মভার সম্পন্ন করার মধ্যেই তাঁহাকে সর্বদা দেখিয়াছি। একটু সামান্যক্ষণের জন্যও নিষ্ক্রিয় দেখি নাই।

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহাকে খুব নিঃসঙ্গ বোধ হইত। ছাত্রছাত্রী বা গবেষকও তাঁহার কাছে খুব বেশি আসিতেন না। কারণ, তাঁহাকে কোথাও ফাঁকি দেওয়া চলিত না। কিন্তু যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা এই কঠিন পরিশ্রমী জ্ঞানতপস্বীর সতর্কতা নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ে বিস্ময়বোধ না করিয়া পারেন নাই। এজন্য যে-ছাত্রছাত্রীগণ তাঁহার কাছে আসিতেন, তাঁহারা কঠিন পরিশ্রম করিতে স্বীকৃত হইয়াই আসিতেন। তাঁহারাই একমাত্র তাঁহার সস্নেহ উদার ছাত্রবাৎসল্যের পরিচয় পাইয়া ধন্য হইতেন। তিনি বিশেষজ্ঞনীতি মানিতেন। সর্ববিদ্যায় বিশারদ হওয়া সম্ভব মনে করিতেন না। অভিজ্ঞ সতর্কতা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিসহ গবেষণাকার্যই তাঁহার কাছে আনন্দদায়ক ছিল। সামান্যমাত্র ত্রুটিও তাঁহার চোখ এড়াইয়া যাইত না। স্বীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি ছাত্রছাত্রী গ্রহণ করার সময়ই তিনি কঠিনভাবে বিচার করিয়া গ্রহণ করিতেন। একবার গ্রহণ করার পর কিন্তু তাঁহার সহায়তা ঠিক ঠিক প্রয়োজনে ও মীমাংসার সময় দেখা দিত। নিজে গুণগ্রাহী ছিলেন। ভালো গবেষণার কাজ দেখিলে আনন্দ পাইতেন। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্রী। সাক্ষাৎভাবে আচার্যের ছাত্রী নহি। পাটনায় আমার কর্মজীবন। তাহারই ফাঁকে ফাঁকে হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রাদি প্রখ্যাত শাস্ত্রবিদ্ আচার্য শ্রীকেদারনাথ ওঝা মহাশয়ের কাছে পাঠ করার সুযোগ পাই। দীর্ঘ দুই বৎসর অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজির পাঠ্যক্রম পড়ি। এইভাবে ১২ বৎসর কাল পরিশ্রম করার পর অভিধর্মকোশশাস্ত্রের উপর কাজ করার অভিলাষে পাটনা

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছুটি লইয়া কলিকাতায় আচার্য দত্ত মহাশয়ের কাছে আসি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক তদানীন্তন অধিকারী আমায় প্রশ্ন করেন—বিদেশে যখন গবেষণা করিতে যাইব না, তখন ছুটি লওয়ার কি দরকার! তাঁহাকে আচার্যের কথা বলি। বলিলেও বুঝাইতে পারি নাই। যাহাই হউক, প্রথম দর্শনে তিনি সুকঠিন অভিধর্মশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়া পরীক্ষাচ্ছলে আমায় নিরস্ত করিতে চান। আমার বিস্তর অনুরোধে তিনি দ্বিতীয় একদিন নানা প্রশ্নাদি করিয়া তাহার পর আমাকে অন্তেবাসীরূপে গ্রহণ করেন। উহা আমার জীবনের এক গভীর আনন্দ ও আশ্চর্য গৌরবের দিনই। ইহার পর হইতেই তাঁহার দ্বিতল-গৃহের পাঠকক্ষে বসিয়া পাঠের অবাধ অধিকার আমি পাই। তাঁহার কাছে পাঠগ্রহণের ও তাঁহার সহিত আলোচনার সৌভাগ্য শুধু নহে, তাঁহার পাঠকক্ষে বসিয়াই আমার অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছি। বৌদ্ধশাস্ত্রের সর্বপ্রকার পুঁথিপত্র গ্রন্থাদি এবং তৎসহ সম্পর্কিত ভারততত্ত্ব ভাষাতত্ত্ব ইতিহাস দর্শন ও অপরাপর বহুবিধ মূল্যবান সংগ্রহ সেখানে একত্র দেখিতে পাই। এরূপ দুর্মূল্য দুর্লভ অথচ প্রয়োজনীয় গ্রন্থের সমাবেশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থালয় অথবা এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতেও অন্ততঃ তখনকার মত ছিল না। সস্নেহ দায়িত্ববোধ লইয়া তিনি আমার সমগ্র কাজটির আনুপূর্বিক বিচার করেন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলিতে পারি যে আমি তাঁহার নিয়মিত (Registered) গবেষক-ছাত্রী ছিলাম না। আমার বিষয় ছিল বৌদ্ধমনোবিজ্ঞান—সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান শাখার তদানীন্তন অধ্যাপক সুহৃৎচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কাছেই আমার তালিকাভুক্ত নাম ছিল। কিন্তু সমগ্র সংস্কৃত পালি ভাষায় প্রাপ্ত উপাদান এবং তৎসহ যৎসামান্য ফরাসী, জার্মান, তিব্বতী ও চীনা ভাষার প্রাপ্ত উপাদানের তুলনামূলক মান নির্ণয় রূপ কঠিন কার্যটিতে একমাত্র আচার্য দত্তকেই আমি অবলম্বন বলিয়া জানিতাম। অধ্যাপক মিত্র তাঁহার আন্তরিক সততায় এ কার্যে উৎসাহ দিয়াছিলেন—শেষকালে ফ্রয়েডীয় ও আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তিনিই অবশ্য দেখিয়া দেন। আমার কাজের শেষ পৃষ্ঠাটি যেদিন দেখা শেষ হয় সেদিন আচার্য বলেন—"তোমাকে যেভাবে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছি তুমি যখন কোনও ছাত্রছাত্রীকে কাজ শেখাবে এইভাবেই শিখিও।"

বিচারবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি পূর্ণপ্রজ্ঞ মুক্তবুদ্ধি। পাশ্চাত্য গবেষণায় পথই তাঁহার বৈজ্ঞানিক আদর্শ। অথচ দিনের পর দিন তাঁহাকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের

সঙ্গে বসিয়া তুলনামূলক পুঁথির পাঠ প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছি। আচার্যের কাছেই শুনি যে তিনি স্বীয় কৃতিত্বে স্বীয় গুরু লুই দ্য লা ভ্যালি পুসাঁর চিত্তজয় করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি গুরুশিষ্য কাহারই পঠনপাঠনকালে সময়জ্ঞান থাকিত না। অতঃপর অধ্যাপক-গৃহিণীর অনুরোধ আসিত—"দত্ত, তুমি আজ এখন যাও—পরে এসো। নাহলে আমি তাঁকে স্নানাহার কিছুই করাতে পারব না।" প্রায় দুই বৎসরকাল নিত্য যাতায়াতে নানা রূপে তাঁহাকে দেখিয়াছি। সকালে পণ্ডিতমহাশয় আসিতেন। আমি আটটার পর পাঠকক্ষে গিয়া কাজ করিতাম। নটা নাগাদ আচার্য নীচে নামিয়া ব্যবসায়সংক্রান্ত কাজ করিতেন। মোটামুটি সাড়ে-দশ বা এগারোটায় তিনি আমার কাজ দেখিতে শুরু করিতেন। নিজেই প্রয়োজনবোধে সিঁড়ি বাহিয়া উপরের তাক হইতে পুস্তক নামাইয়া একেবারে প্রয়োজনের পৃষ্ঠাটি খুলিয়া দিতেন। সাধারণতঃ প্রায় বারো বা সাড়ে-বারোটায় আমার ছুটি হইত। কিন্তু যেদিন তাহা অপেক্ষাও দেরি হইত সেদিন শান্তপদে অবগুণ্ঠিতা শ্রীমতী মিত্র, আচার্যের ভাগিনেয়-পত্নী, আসিয়া দাঁড়াইতেন দেরি যেন বেশি না হইয়া যায় সেজন্য। আচার্যের দৃঢ়তার সহিত যুক্ত হইয়াছিল চরিত্রমাধুর্য। বিপত্নীক জীবনে পুত্রপ্রতিম ভাগিনেয় ও তাঁহার সংসারটিই আচার্যের স্নেহের অবলম্বন ছিল। ভ্রাতুষ্পুত্রেরাও সপরিবারে আসিতেন দেখিয়াছি। স্নেহে দায়িত্ববোধে কর্তব্যনিষ্ঠায় তাঁহাকে গৃহস্থ সংসারের গৃহপতিরূপে দেখিয়াছি। পুরাতন ভৃত্য দরোয়ান ড্রাইভার সকলের প্রতিই দেখিয়াছি আন্তরিক মমতাবোধ। সকলেই তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন কোনও না কোনও সহায়তা বা সমস্যার সমাধানের জন্য। ঐশ্বর্য সেখানে জীবনের সহজ রূপকে ম্লান করে নাই, এতটুকু বিকৃত করে নাই। বরঞ্চ তাঁহার কর্মজীবনে মনীষা ও বুদ্ধির সহিত এমন একটি পরিমিতিবোধের সমন্বয় ঘটিয়াছিল যাহা এদেশে সচরাচর দেখা যায় না। আচার্য নলিনাক্ষ দত্ত মিতভাষী মৃদুভাষী এবং সর্বাবস্থায় অপ্রাকৃতরূপে স্থিতধী। মনুষ্যচরিত্র তিনি বুঝিতেন—মনুষ্যের চিন্তাও নিজে যাচাই করিয়া তবে গ্রহণ করিতেন। তাঁহার সাহচর্যকালে দেখিয়াছি তিনি বৌদ্ধমতের "আকাশানন্ত্যায়তন" কথাটিকে আধুনিক রূপে বুঝিবার জন্যই হোয়াইটহেডের সমগ্র পুস্তক পড়িলেন, অধ্যাপক আলেকসাণ্ডারের স্পেস টাইম ডিয়েটি গ্রন্থ লইয়া আলোচনা করিলেন। অথচ গবেষণাক্ষেত্রে তিনি আমার মত অকৃতিজনকেও পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন। বৌদ্ধমতের শব্দার্থ বিকৃত করা চলিবে না; কিন্তু সেই শব্দার্থকে যখন আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায়

রূপান্তরিত করার প্রয়াস পাইতাম—অক্লান্ত ধৈর্য ও অধ্যবসায় লইয়া তিনি তা অনুধাবন করিতেন। আমার অপর অধ্যাপক মিত্র মহাশয়ের সহিতও প্রয়োজনবোধে আমার জন্যই আলোচনা করিতেন। পিতামাতা যেমন সন্তানের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ তেমনই সদ্‌গুরুও যে ছাত্রের প্রতি নিয়ত কর্তব্যপরায়ণ এ সত্য আমি তাঁহাদের সাহচর্যে আসিয়া বারবার সকৃতজ্ঞ আনন্দে উপলব্ধি করিয়াছি ও কৃতার্থ হইয়াছি বলিয়া মনে করি।

সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে বিদ্যার অনুরাগের জন্যই তিনি বিদ্যার্থীকে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষকোচিত দৃঢ়তা ও ধৈর্য দুইই তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। আচার্যের কথা বলিতে গেলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কথা হইয়া ওঠে এজন্য পাঠক লেখিকাকে যেন মার্জনা করেন। তবুও মনে হয় বর্তমান উদাহরণটি আমি যাহা বলিতে চাহি তাহা স্পষ্টতর করিয়া তুলিবে। পূর্বে বলিয়াছি যে আমি কয়েকটি শাস্ত্রগ্রন্থ পাটনা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের দর্শনের প্রবীণতম অধ্যাপক আচার্য কেদার-নাথ ওঝা মহাশয়ের কাছে পাঠ করিয়া আসি। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে আচার্য কেদারনাথ ওঝা মহাশয়ের নাম ভারতবিদিত। তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের নৈষ্ঠিক আচার ও সংস্কারে পূর্ণ অভ্যস্ত ছিলেন। হিন্দুধর্মের প্রধান কথা ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং আত্মার অস্তিত্ব-প্রতীতি যে কোনও হিন্দুর চিত্তে জ্ঞানে অজ্ঞানে বদ্ধ সংস্কার হিসাবেই কাজ করে। এবং বলা প্রয়োজন যে এই সংস্কার দ্বারাই মূলতঃ আমাদের সাধারণ সমাজনীতি গার্হস্থ্যধর্ম ও ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-গুলিও পরিচালিত হয়। আমার শাস্ত্রজ্ঞ গুরু ওঝা মহাশয়ও ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার কাছে অধীত বৌদ্ধশাস্ত্রাদি (অভিধর্মকোশ-ব্যাখ্যা, ন্যায়বিন্দু প্রমাণবার্তিক ইত্যাদি) আমি তাঁহার মতানুসারেই ব্যাখ্যা করিতে শিখিয়া আসিয়াছিলাম। মনের অবচেতনায় আত্মা বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব সূচক যুক্তি ক্রমশ এমন প্রবল হয় নাই যাহাতে সে প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন অনুভূত হয়; কখনও প্রসঙ্গতঃ প্রশ্ন না উঠিয়াছে একেবারে তাহাও নহে। তখন শিক্ষাগুরুই তাঁহার নিয়মে মীমাংসা করিয়াছেন—"বৌদ্ধরা ব্যবহারিক রূপে সকল কিছুই মানেন—পারমার্থিক রূপে হয়ত মানেন না।"

আচার্য দত্ত মহাশয় প্রথম দিনই এ প্রশ্ন তুলিলেন। কারণ, সত্যই এ প্রশ্ন বৌদ্ধদর্শনের অতি মৌলিক প্রসঙ্গের সহিত যুক্ত। প্রতি বিজ্ঞান, প্রতি তত্ত্বেরই কতকগুলি আবশ্যিক postulate বা নিষ্প্রশ্ন সূত্র মানিয়া লইলেই তবে যুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। যেমন বস্তু বা ভূতজগৎ আছে ইহা মানিলেই তবে ভৌতিক

বিজ্ঞান বা physics-এর জ্ঞান গবেষণা করিতে পারা সম্ভব। পরিশীলিতচিত্ত অধ্যাপক আধুনিক ইয়োরোপের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণাপথের পথিক। আমি যখন প্রথম দিন তাঁহার প্রশ্নানুযায়ী কোশকারিকার কোনো কোনোটি ব্যাখ্যা করিতে থাকি, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার গোড়ার গলদটিই অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন ইহা আমি অনেক পরে বুঝিতে পারি। একটি যে কোনও সংস্কার আমাদের চেতনাকে কত যে সূক্ষ্মভাবে অভিভূত করিয়া রাখে তাহা অনেক সময় আমাদের চোখ এড়াইয়া যায়। আবার, সেই সংস্কারকে ভ্রান্তবোধে উন্মূলিত করিবার জন্য সচেষ্ট ও সক্রিয় প্রয়াস অত্যন্ত সচেতনভাবে করিতে হয়। তবেই একটি সংস্কারের আমূল পরিবর্তন করা যায়। সেই সংস্কারের স্থানে অন্য একটি সংস্কারের অভিরোহণ বা আরোপণ তখনই সম্ভবপর হয়। মনোবিদ্যার এই নিয়মানুসারে আমার বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের প্রথম পাঠ আচার্য দত্তের নিকট আমি গ্রহণ করি।

আচার্য দত্ত দৃঢ়ভাবে বলিলেন "ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের সংস্কারানুসারী চিত্তে বৌদ্ধ মতবাদ বুঝা যায় না। বৌদ্ধধর্মের তিনটি প্রামাণ্য সূত্র বা postulate প্রথমে জানা দরকার। সেইগুলি হইল অনিত্যতা (impermanence) অনাত্মতা (non existence of soul) এবং অনীশ্বরতা (non existence of a God as a causal agent)।" তিনি সোজাসুজি বলিলেন সেদিন হইতেই এই তিনটি তত্ত্ব সচেতনভাবে মনে রাখিয়া তবেই শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতে হইবে। নতুবা অধ্যয়নে কোনও ফল হইবে না অথবা পঠিত উপাদানের সারও উপলব্ধি হইবে না। আমি চমৎকৃত হইলাম। আরও আশ্চর্যবোধ করিলাম যখন ইহার পর ঐ তিন সূত্রের অভ্যাসে সত্যই কতকটা উপকারও হইতে লাগিল। দার্শনিক মতবাদের মধ্যে কতকটা যুক্তির ফাঁকি রহিয়া যায়। বিজ্ঞানই একমাত্র সেই ফাঁকি সরাইতে পারে। "বৌদ্ধরা ব্যবহারিক 'আত্মা' বা 'ঈশ্বর' মানেন"—এই কথা এক। আর, "বৌদ্ধরা ঐ সকল সংজ্ঞা মানেন না"— এই কথা অন্য। নিঃসন্দেহে দুই বাক্যের মধ্যে অর্থের প্রচুর প্রভেদ বর্তমান। এই নূতন সংস্কার গ্রহণে অভ্যস্ত হইবার পর বুঝিলাম সত্যই সেদিন অধ্যাপক আমার 'মগজ ধোলাই' করিয়াছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে গুরুর নাম কেন 'কল্যাণ-মিত্র' তাহা বুঝিতে পারিলাম।

আচার্য দত্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত লোকসঙ্গ করিতেন না। একটা সুপরিমিত সুপরিকল্পিত জীবনচর্যার মধ্যেই তাঁহার বিচরণ ছিল। অকারণ আড়ম্বর,

খ্যাতিলোলুপতা কোথাও তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। আপনার আনন্দলোকের অনলস তপস্যা একাকী তিনি এই বৌদ্ধশাস্ত্রাধ্যয়নের মধ্য দিয়া নিঃশব্দে করিয়া চলিতেন। এ ধরনের জ্ঞানতপস্বী বিদেশে বিরল না হইলেও এতদ্দেশে বিরল। ইহারই মধ্যে তিনি অনেকগুলি মূল গ্রন্থের লেখক; অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখিয়াছেন; বহু গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়াছেন। বহু পুঁথিপত্রের পাঠোদ্ধারও করিয়াছেন। পুঁথির অক্ষর সাজাইতে সাজাইতে একটি চোখ চিরদিনের মত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ওঠে। উহাও তাঁহারই কাছে শুনি। বৌদ্ধধর্মের সর্ব শাখায় তাঁহার অনায়াস গতিবিধি থাকিলেও মূলতঃ প্রথম যুগের বৌদ্ধদর্শনেই তাঁহার বেশি আগ্রহ ছিল বলিয়া মনে হইত। দেশে বিদেশে প্রকাশিত বৌদ্ধগ্রন্থ সাগ্রহে পাঠ করিতেন ও মতামত দিতেন। একদেশদর্শিতাও ছিল না। আর, পণ্ডিতাগ্রগণ্য ছিলেন বলিয়াই ক্ষুদ্র পরশ্রীকাতরতা একেবারেই ছিল না। ছাত্রবাৎসল্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার জীবনালেখ্য সামগ্রিকভাবে বহুজনের আনন্দদায়ক হইবে এই আশায় বিস্তারিতভাবে এই স্মৃতিচারণা করিলাম। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি প্রবন্ধে গৃহীত তথ্য ও উপাদানগুলি আচার্য দত্তের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত অনিল মিত্রের নিকট পাইয়াছি, মহাবোধি সোসাইটির একটি পত্রিকার সাহায্যও লইয়াছি।

আচার্যের কাছে প্রাপ্ত ঋষিঋণ পরিশোধ কবিবার ক্ষমতা আমার নাই। তাঁহার কথা বলিতে গেলে গুরুপ্রণামের মন্ত্রটিই আমার হৃদয়ে ভাসিয়া ওঠে—

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

তাঁহার লিখিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের তালিকা নীচে দেওয়া হইল :

1. **Aspects of Mahayana Buddhism in its Relation to Hinayana**
2/3. **Early Monastic Buddhism vols 1/2**
4. **Development of Buddhism in Uttara Pradesh**
5. **Buddhist Sects in India**
6. **Bodhisattva Bhumi (Edited critically)**
7. **Madhyamaka Sastra (Do)**
—17. **Gilgit Mss.**
18. **Mahayana Buddhism**

অরুণা হালদার

'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র'

আগস্ট ১৯৭৩ থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপরিষদ 'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র' মাসিক পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। মার্কসবাদী রাজনীতিতে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে 'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্রে' সম্পর্কে ভূমিকা বা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন কেবল নয় ধৃষ্টতা।

'ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ' আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারক ও বাহক রূপে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তার সুদীর্ঘ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৫৮ সালে নূতন নামে 'শান্তি ও সমাজতন্ত্রের সমস্যাবলী' (প্রব্লেমস অফ পীস অ্যাণ্ড সোশ্যালিজম) প্রকাশিত হল। তারই বর্তমান নাম 'শান্তি স্বাধীনতা সমাজ-তন্ত্র'। ১৯৫৮ সালে 'শান্তি ও সমাজতন্ত্রের সমস্যাবলী'র ছিল ২২টি জাতীয় সংস্করণ এবং তা ছিল ৮০টি দেশে প্রচলিত এবং ১৯টি ভাষায় প্রকাশিত। ১৯৭৩ সালে 'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র'র হয়েছে ৩৯টি জাতীয় সংস্করণ এবং তা ১৪২টি দেশে প্রচলিত ও ২৬টি ভাষায় প্রকাশিত। এরই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে পত্রিকার প্রচারসংখ্যা। শুধুমাত্র ১৯৬৯-৭৩ এই চার বছরে এর প্রচার-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১ লক্ষর উপরে। 'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র'র এই প্রচারবৃদ্ধি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং মার্কসবাদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তারই নির্ভুল সাক্ষ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাঙলাই প্রথম ভারতীয় ভাষা যে-ভাষায় 'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র' প্রকাশিত হয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে বাঙলাভাষা আর-একবার তার প্রাপ্য আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করল।

'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র'র পর্যালোচনা করা সহজসাধ্য কাজ নয়, বিশেষ করে যদি বিচ্ছিন্নভাবে মাত্র কয়েকটি সংখ্যার আলোচনা করতে হয়। এই প্রবন্ধে আমরা মোটের ওপর পত্রিকাটির সূচীপত্র বিশ্লেষণ করেই সন্তুষ্ট থাকব। কারণ তার চাইতে বেশি অগ্রসর হওয়ার অর্থ প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর উৎকর্ষ বিচার। এই প্রবন্ধগুলির লেখক-পরিচয়—যা আমরা এখনই উপস্থিত করব—লক্ষ্য করলেই পাঠক বুঝবেন স্বল্প পরিসরে সে-কাজটি নিতান্ত সহজসাধ্য নয়।

'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র' তার সূচীপত্রকে কয়েকটি মূল ভাগে বিভক্ত করেছে, যথা : 'তত্ত্ব', 'রাজনীতি', 'পার্টি', 'বিভিন্ন দেশের পার্টি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সংবাদ,' 'গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা সম্পর্কে আলোচনা', 'পাঠকের মতামত' প্রভৃতি। এর মধ্যে 'তত্ত্ব', 'রাজনীতি' এবং 'পার্টি' পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যার সিংহভাগ অধিকার করে। 'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র' মূলত মার্কসবাদের তত্ত্বালোচনার আন্তর্জাতিক পত্রিকা। সেজন্য এটাই স্বাভাবিক। সংবাদ ও তথ্য পরিবেশনা বা বিভিন্ন দলিল (গুরুত্বপূর্ণ হলেও) প্রকাশনা এর প্রধান কাজ নয়। তার জন্য ভিন্নতর মাধ্যম আছে।

'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র'র লেখকদের মধ্যে প্রথম সারিতে আছেন বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির প্রথম সারির নেতারা। এই পত্রিকারই সেপ্টেম্বর (১৯৭৩) মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে এই পত্রিকায় বিগত ১৫ বছরে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় ১০০ জন সাধারণ সম্পাদক এবং চেয়ারম্যান প্রায় ৩০০টি প্রবন্ধ লিখেছেন। ধরা যাক আমাদের আলোচ্য চারটি সংখ্যার মধ্যে অক্টোবর সংখ্যাটি। এর লেখকসূচীতে আছেন এরিখ হোনেকার (জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির প্রথম সম্পাদক), গিলবার্টো ভিয়েইরা (কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক), তাছাড়া বেলা বিস্‌জ্‌কু (হাঙ্গেরির সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোর সদস্য), ইরউইন স্কার্ফ (আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক), সান্তিয়াগো আলভারেজ (স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য), পেদ্রো ওর্তেগো দিয়াজ (ভেনেজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোর সদস্য), ইব নরলাণ্ড (ডেনমার্কের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী কমিটির ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য) এবং গর্ডন ম্যাকনেলান (জাতীয় সংগঠক, গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টি)। এছাড়া এতে খ্যাতনামা মার্কসবাদী পণ্ডিত, গবেষক, অধ্যাপক, অ্যাকাডেমিসিয়ানদের সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত কূটনীতিক, রাজনীতিজ্ঞ এবং গণআন্দোলনের খ্যাতিমান নেতারাও এতে প্রবন্ধ লেখেন। কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও বিভিন্ন প্রগতিশীল পার্টি এবং জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের নেতারাও এই পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন।

মার্কসবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনাচক্র ও

সম্মেলনের ফলাফল এবং সংক্ষিপ্তসার এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যেমন আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে "আজকের দিনে লেনিন প্রণীত 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'-এর প্রাসঙ্গিকতা" সম্পর্কে গবেষক-গ্রুপের আলোচনা 'বিপ্লবের প্রধান বিষয়'। অনুরূপভাবে অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে "লেনিনের 'বামপন্থী কমিউনিজম একটি শিশুরোগ'-এর বর্তমান তাৎপর্য" সম্পর্কে আন্তর্জাতিক গবেষক-গ্রুপের রচনা 'অগ্রগামী বাহিনী (ভ্যানগার্ড) ও জনগণ'। বলা বাহুল্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মার্কসবাদী পণ্ডিতরাই এইসব গবেষক-গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হন। ফলে এই ধরনের আলোচনা বিদগ্ধ পাঠকদের কাছে বিশেষ আদরণীয় হয়ে ওঠে।

'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র' পত্রিকায় কখনও কখনও একটি মূল বিষয়ের উপরে বিতর্কের সূচনা করা হয় এবং পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে ধারাবাহিকভাবে সে-বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে। অবশ্যই বিষয়টির বর্তমানকালীন প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব বিবেচনা করেই বিষয় নির্বাচন করা হয়। যেমন সম্প্রতি কয়েকটা সংখ্যায় (আগস্ট, অক্টোবর, নভেম্বর) 'আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংযোজন' প্রসঙ্গে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন মত ও তত্ত্বের বিনিময় ও বিতর্ককে বিশেষভাবে স্বাগত জানান 'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র'র সম্পাদক-মণ্ডলী, শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশই নয় পুঁজিবাদী দেশগুলিও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংযোজনের আশ্রয় গ্রহণ করায় বিষয়টির বাস্তব ও তাত্ত্বিক উভয়বিধ গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই আলোচনাচক্র অনুধাবন করলে সমাজতান্ত্রিক সংযোজন এবং পুঁজিবাদী সংযোজনের মূলগত পার্থক্য সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা সম্ভবপর হবে।

'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র' অনেক সময় একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের রাজনৈতিক বিশ্লেষণে বিশেষ মনোনিবেশ করে। সম্প্রতি ধারাবাহিকভাবে লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংখ্যা কয়টিতে কোস্টারিকা, নিকারাগুয়া, পুয়ের্তোরিকো, কলম্বিয়া, চিলি, ব্রাজিল এবং ভেনেজুয়েলা এই কয়টি দেশের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 'লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক রেখাচিত্র প্রবন্ধমালা' 'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র'র সাম্প্রতিক সংখ্যাগুলির একটা প্রধান আকর্ষণ। এই প্রসঙ্গে নভেম্বর সংখ্যায় চিলির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক কমিশনের সদস্য ভলোদিয়া তিতেলবোইম-এর লেখা 'একটি বিজয়ী বিপ্লবের

জন্ম, বেদনাময় অভিজ্ঞতার বিবরণ সহ' ও ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত চিলিয়ান প্রচারবিদ ফেলিপে সুয়ারিজ-এর লেখা 'চিলি-ফ্যাসিবাদের শিকড় উপড়ে ফেল' লেখা দুটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কলকাতায় বসে যেসব নকল মার্কসবাদী চিলির ক্যু থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেছেন, তাঁরা অনুগ্রহপূর্বক চিলিব ঘটনা সম্পর্কে সে-দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ একটু পড়ে দেখতে পারেন।

এই পত্রিকায় গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলন সমূহের সিদ্ধান্তও প্রকাশিত হয়। ভার্না (বুলগেরিয়া)-তে সম্প্রতি-অনুষ্ঠিত বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন মহাসম্মেলনের উপরে একটি রিপোর্টাজ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও সংক্ষিপ্ত সংবাদ এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও পত্রিকাটির বিভিন্ন সংখ্যায় নানা সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া 'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র'য় বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ মার্কসবাদী প্রকাশনার রিভিয়ু নিয়মিত প্রকাশিত হয়। অনেক সময়ই ঐ বইগুলি পাওয়া আমাদের সাধ্যায়ত্ত হয় না, তবে গ্রন্থ-সমালোচনা পড়ে বই-গুলির মূল চিন্তাধারার সঙ্গে কিছুটা পরিচয় আমাদের ঘটে।

আগস্ট-সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রচ্ছদটি একটু হাল্কা ধরনের হলেও অক্টোবর থেকে শোভন একরঙা বহিরঙ্গ পত্রিকার গম্ভীর চরিত্রের সঙ্গে সুসমঞ্জস এবং রুচিসম্মত হয়েছে। কিছু কিছু ছাপার ভুল থেকে গেলেও পত্রিকার মুদ্রণসৌকর্যের প্রশংসা করতেই হয়। দাম অবিশ্বাস্য রকম সুলভ। আয়তনেও পত্রিকাটি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়—প্রতি সংখ্যায় ডিমাই সাইজের আনুমানিক একশত পৃষ্ঠা পাঠ্যবস্তু থাকে এবং তাতে বিজ্ঞাপন নেই। প্রকাশক যে আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে 'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র' প্রকাশ করছেন না তা সহজেই বোঝা যায়। তবে, অনুবাদের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ বিরূপ সমালোচনা করা উচিত। অনেক প্রবন্ধের অনুবাদে কেমন যেন আড়ষ্টতা আছে। সমস্ত প্রবন্ধই যে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা—তা যেন কিছুতেই ভোলা যায় না। বাঙলায় একই ইংরেজি শব্দের একাধিক পরিভাষা আছে। বিভিন্ন অনুবাদক বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করে অকারণ জটিলতা সৃষ্টি করেছেন। আমার মনে হয় ভাষাবিদ্ পণ্ডিতদের সঙ্গে মার্কসবাদী পণ্ডিতদের সম্মিলিত সভায় নিত্যব্যবহার্য মার্কসবাদী বাক্‌শৈলী এবং বিশেষার্থক শব্দগুলির সুনির্দিষ্ট পরিভাষা নির্ধারণ এ প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, অনেক অনুবাদক অনাবশ্যকভাবে তৎসম-প্রেমী। তার ফলে অনুবাদ

কখনও কখনও 'আধুনিক কবিতা'র মতো দুর্বোধ্য হয়ে গেছে। নমুনা হিসাবে পাঠকের অর্থোপলব্ধির জন্য একটি মাত্র বাক্য উল্লেখ করছি : "ভূগঠনবিন্যাস সম্পর্কে উপলব্ধি অর্থাৎ ক্রমবিকাশের কিছু স্তর এড়িয়ে অপরিপক্ক অবিশিষ্ট বহিরঙ্গের মধ্য দিয়ে ক্রমবর্ধিষ্ণু বিবর্তনের উপলব্ধি, সজীব প্রকৃতিতে বহিরঙ্গ ও আধেয়ের দ্বন্দবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করছে।" পাঠকের অবশ্যই মনে হবে ইংরেজি সর্বথা সহজতর। ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে আরও একটু নজর দেওয়া প্রয়োজন।

সবশেষে বঙ্গভাষী চিন্তাশীল পাঠকদের মধ্যে এই পত্রিকাটির বহুল প্রসার কামনা করে এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলিতে এর সমধিক প্রচার সুপারিশ করে এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন এই তাত্ত্বিক পত্রিকাটিকে যাঁরা বাঙলা পত্র-পত্রিকার জগতে এনে দিয়েছেন—'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র'র সেই সম্পাদক ও প্রকাশককে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি।

মৃন্ময় ভট্টাচার্য

* শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র। সম্পাদক : জ্যোতি দাশগুপ্ত। প্রাপ্তিস্থান : মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১২

'ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ত্রিশের দশকের এক অধ্যায়'

রণেন সেন
MEMBER OF PARLIAMENT
(LOK SABHA)

কলিকাতা
১।৪।৭৪

সম্পাদক 'পরিচয়'
কলিকাতা

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

১৩৮০র শারদীয় 'পরিচয়' সংখ্যা অনেকদিন পরে পড়ি। কমরেড ধরণী গোস্বামীর তিরিশ দশকের কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে প্রবন্ধটি পড়ে বিস্মিত হই। কেননা কিছু ভুল তথ্য ও একপেশে প্রসঙ্গের অবতারণা পাই। ভেবেছিলাম কিছু সংশোধনী ধরণীদার কাছেই পাঠাব বা একান্তে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে ভুল সংশোধন করাব। কিন্তু নানা কারণে এর কোনোটাই সম্ভব হল না।

তাঁর দ্বিতীয় পর্ব পড়ে দেখলাম পুনরায় অনেক ভুল তথ্য ও একপেশে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। ব্যাপারটা এখন শুধু ধরণীদার রইল না। তাই কয়েকটা তথ্য ও বক্তব্য উপস্থিত করতে চাই।

ধরণীদার সঙ্গে আমার পরিচয় ও হৃদ্যতা আজ চল্লিশ বছরের মতো। বহু আন্দোলন—প্রকাশ্য ও গোপন—এক সাথে করেছি। একত্রে জেলবাসও করেছি। আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর।

প্রথমত, ধরণীদার ভুল হয়েছে তাঁদের মীরাট গ্রেফতারের পরবর্তী যুগের ইতিহাস হয় সরকারী দলিল (যা বেশিভাগ ক্ষেত্রেই নির্ভুল নয়) বা শ্রীসুধাংশু অধিকারীর বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে লেখাটা।

দ্বিতীয়ত, মীরাটোত্তর যুগে যাঁরা বাঙলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনা করেছেন তাঁদের কাছে খোঁজখবর না করে লেখা দ্বিতীয় ভুল।

এই দুইটি ভুলের জন্যই তাঁর লেখা দুটি ইতিহাসসিদ্ধ হয় নি। তার উপর 'ইয়ং কমরেডস লীগ'-এর ভূমিকা যেভাবে দেখিয়েছেন সেটাও সঠিক নয়। এই লীগের অনেককে আমি ১৯২৯ থেকে ভালোভাবেই জানতাম এবং তাঁদের কার্যকলাপও লক্ষ্য করেছি।

ধরণীদা সুধাংশুবাবুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্যই জানতে পারেন নি যে ১৯৩০-এর শেষভাগে 'নং মৌলভী লেনে 'কলিকাতা কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' গঠিত হয়। এবং ১৯৩১ সালের প্রারম্ভে কমরেড ভবানী সেন ও কয়েকজনের সঙ্গে কমিটির সভ্যবৃন্দ কথা বলেন ও ঠিক হয় যে ভবানী-বাবুরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই ভবানীবাবুরা মত পরিবর্তন করেন এবং জামান, ছবি চ্যাটার্জি প্রভৃতি কয়েকটি সন্দেহজনক ব্যক্তির দ্বারা গঠিত 'কারখানা' গ্রুপে যোগ দেন। বস্তুত এই গ্রুপ বোম্বাই-এর দেশপাণ্ডে-রণদীভে গ্রুপের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে যাতে বাঙলাদেশে কোনও সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত না হয় তারই প্রচেষ্টা চালিয়েছে। পরে অবশ্য এই গ্রুপ দেউলিয়া হয়ে ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়। সুধাংশু অধিকারীও এই গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৯৩২ ও ১৯৩৩-এ 'ইনপ্রিকর'-এ ভিবমাকের নামে কয়েকটি লেখা বের হয় যাতে পূর্বোক্ত কলিকাতা কমিটির ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ থাকে। পরে চীন ও জার্মান পার্টির ও আরও পরে তিন পার্টির যে দলিল বের হয় সেগুলিরও উৎসস্থান ঐ পূর্বোক্ত কমিটির রিপোর্ট, যা অত্যন্ত সংগোপনে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কাছে পাঠানো হয়।

আব্দুল হালিম তাঁর স্মৃতিচারণায় এসব বিষয়ে লেখেন নি, কারণ আমাদের মধ্যে ঠিক হয় যে একত্র বসে সব ঘটনাবলী আলোচনা করে লেখা হবে। তাঁর সঙ্গে বসে আমি অনেকদিনের ঘটনাবলীর নোট করেছিলাম। তাই সবই মনে আছে। নোটগুলিও আছে। ১৯৩১-এর অগস্ট মাস থেকে সোমনাথ লাহিড়ীও ঐ কলিকাতা কমিটির সভ্য হন। তিনিও পরবর্তীকালের ঘটনাবলী জানেন।

ধরণীদার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রেখেই এই কথাগুলি লিখছি। আপনি যদি দয়া করে পত্রটি 'পরিচয়'-এ ছাপেন তো বাধিত হব।

নমস্কার নেবেন।

রণেন সেন

পরিচয়
বর্ষ ৪৩। সংখ্যা ১০-১২। বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮১। মে-জুলাই ১৯৭৪

সাহিত্য সংখ্যা

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

সামাজিক ছড়া

কবিতাগুচ্ছ

বড়গল্প

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণ সান্যাল

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়

বর্ষ ৪৩ | সংখ্যা ১০ ১২ | বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮১ | মে জুলাই ১৯৭৪

নতুন চোখে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ

লুই আরাগঁ

[১৮১৫ সালের ১৯শে থেকে ২৬শে মার্চ পর্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে ফ্রান্সে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। এই সময়ে নেপোলিয়ন এলবা থেকে ফিরে পারী শহরে প্রবেশ করলেন এবং অষ্টাদশ লুই পালালেন উত্তর দিকে। এই সপ্তাহের ঘটনাবলী নিয়ে লুই আরার্গ **La Semaine Sainte** বা 'পবিত্র সপ্তাহ' নামে একটি অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন। ফ্রাঁন্সের সাহিত্যিক মহল এক বাক্যে আরার্গর উপন্যাসটিকে মহৎ সাহিত্যকীর্তি বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। 'পারী সাহিত্যপত্র' কাগজে মোরিয়াক লিখলেন: "এই বই লিখে আরার্গ আবার সাহিত্যিকদের মধ্যে ফিরে এলেন; ত্রিশ বছর ধরে পার্টি ফ্রান্সের একজন শ্রেষ্ঠ লেখককে চিন্তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছিল: আরগঁ যে কমিউনিজম বর্জন করেছেন এমন নয় তবে তিনি এবার পার্টি থেকে নিজের দূরত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন।" মোরিয়াকের কথাই কি ঠিক? আরার্গ পার্টির অত্যাচার থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন এবং আর্টের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বর্জন করেছেন বলেই কি তাঁর এই সাহিত্যিক সাফল্য? বর্তমান প্রবন্ধে আরার্গ নিজেই এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রবন্ধটির ইংরাজী অনুবাদ বেরিয়েছে 'Mainstream' পত্রিকায়। প্রবন্ধটির মাঝের অংশে আরার্গ নিজের বিভিন্ন লেখা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেই অংশটুকু বাদ দিয়ে বাকিটার অনুবাদ বাংলায় প্রকাশিত হল। আশা করা যাচ্ছে, আরার্গর বক্তব্য কমিউনিষ্ট ও অকমিউনিষ্ট, সকলকে ভাবিয়ে তুলবে।—সম্পাদক]

অনেক লেখক আছেন যাঁরা লেখেন এমনভাবে যেন তাঁরা কখনও ভুল করেন নি। এঁরা অবশ্য নানা জাতের। কারুর লেখার ভাবখানা এমন যেন তাঁদের লেখার ভিতর দিয়ে পরম পিতা ঈশ্বর স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করছেন; কেউ কেউ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, নিয়তি তাঁদের গলায় সাহিত্যিক জীনিয়াসের বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছে; আবার কেউ কেউ কমিউনিজম সম্বন্ধে এমন ভঙ্গিতে লেখেন যেন তাঁরা একেবারে জেনে ফেলেছেন কমিউনিজম কি ছিল, কি হয়েছে এবং কি হতে চলেছে। যাঁরা তাঁদের সঙ্গে একমত নন, তাঁদের সম্বন্ধে এই সব লেখক-দের মনে আছে অবজ্ঞা, কৃপাদৃষ্টি। অন্যের লেখা যে তাঁরা পড়েন এমন নয়—

কী দরকার পড়ার। পাতা উল্টেই তাঁরা নির্ঘাৎ বুঝে ফেলেন অপরাপর লেখকরা কি ভাবছেন।

এই ভাবভঙ্গি আমার কাছে অগ্রাহ্য। বহু লোক বহু পথ ধরে আলোর দিকে যাত্রা করে চলেছেন ; কেউবা চলেছেন ভীরু পদক্ষেপে, কেউবা চলেছেন পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ে ভরা শক্ত পা ফেলে। এঁদের সকলের সব পথ সম্বন্ধেই আমার কৌতূহলের অন্ত নেই। এও বিশ্বাস করি যে, আমি যতটুকু যা সত্যদৃষ্টি লাভ করেছি, তারও কোনো মূল্য নেই যদি আমিই কেবল হই তার এক ও অদ্বিতীয় অধিকারী। চক্ষুহীনদের মধ্যে একমাত্র চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি বলে গর্ব অনুভব করা দূরে থাক, আমি মনে করি যে, এমন দৃষ্টিশক্তির কোনো মূল্যই নেই যার কোনো ভাগীদার নেই।

নতুন গলার আওয়াজ আমি কান পেতে শুনি। যা কিছু ঘটছে সাহিত্যে —যেটা আমার পেশা—সে সম্বন্ধে আমার উদ্বেগ অসীম। আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেক মানুষই লাভ করেছে কোনো না কোনো খণ্ডসত্য এবং সত্যের সেই বিশেষ খণ্ডটিকে আমি না পেয়ে থাকতেও পারি। প্রত্যেক মানুষই চলেছে সত্যের দিকে তার নিজস্ব চলনে, এবং যদিই বা চোখে পড়ে তার পদস্খলন, তৎক্ষণাৎ স্মরণ করি নিজে কত ভুল পা ফেলেছি এবং এখনও কত ভুল পা ফেলতে পারি।

শুধু নিজের চিন্তা সম্বন্ধেই কুতূহলী হওয়া যদি আমার কাছে অর্থহীন হয়, আরো কত বড় পাগলামি হবে এই বিশ্বাস যে, আর একজনের চিন্তা একেবারে খাপে খাপে মিলে যাবে আমার চিন্তার সঙ্গে। জগৎকে এইভাবেই দেখি যে, জগতের মূলে রয়েছে বিপরীত জিনিসের বিরোধ। এটি এমন সব নরনারীর জগৎ, যাদের পরস্পরের ঠোকাঠুকি লেগেই আছে, যারা জানেই না তারা নিজেরা কি, যদি না অপরের সহিত তাদের বিরোধ বাধে। এ জগতে ছায়া ছাড়া আলো নেই। সুতরাং আলোছায়ার খেলা যে বইয়ে নেই, তার কোনো মানেই হয় না। এমন বই না খোলাই উচিত। প্রাণহীন, শিলীভূত চরিত্রের দ্বারা মানুষের আত্মাকে ভোলাতে যাওয়ার মতো বিপজ্জনক কাজ আর কিছুই নেই। এই যদি চান যে, আপনাকে অবিরত কেবল ভরসার কথা শোনানো হবে—এমন সব কথা যা আপনার মনে কোনো প্রশ্ন জাগাবে না এবং যে-সব কথা আপনি আগে থাকতেই জেনে নিয়েছেন—তাহলে আমাকে দিয়ে আপনার চলবে না। কয়েক শত পৃষ্ঠার মধ্যে যে সাহিত্য জীবনের সব

কিছু বিপদ, আপদ ও সমস্যাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে তাকেই তো বলে ইউটোপীয় সাহিত্য। ইউটোপীয়ত্ব বড় ছলনাময়। ওটা লোকেদের ঘুম পাড়ায় এবং ঘুম ভেঙে যখন তারা বাস্তব জগতের সংস্পর্শে আসে তখন তাদের অবস্থাটা হয় সেই সব স্বপ্নচারীদের মতো, ঘুমের ঘোরে যারা একেবারে ছাদের কিনারার কাছে এসে পড়েছে এবং ছাদ থেকে পড়ে যাদের নির্ঘাৎ মৃত্যু।

গত পঁচিশ বছর ধরে আমার এই অহঙ্কার চলে আসছে যে, সমাজ সম্বন্ধে আমার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিটা যে রকমের, অর্থাৎ আমি যেমন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি, বাস্তববাদী আর্ট সম্বন্ধে ঠিক তারই অনুরূপ একটা ধারণা আমি পোষণ করি। এই ধারণাটিকে বলা হয় সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ। এটি এমন একটা ধারণা নয় যার কোনোদিন কোনো নড়চড় হতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ কাকে বলে? যদি এই প্রশ্নের শেষ ও চিরন্তন উত্তর চান, তাহলে এ বিষয়ে প্রচলিত সূত্রগুলিকে মুখস্থ করতে হবে। কার্যত: দেখা যায় যে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ জিনিসটিকে হরেক রকমে ব্যাখ্যা করা হয়। বহু ক্ষেত্রে এই নাম নিয়ে যা লেখা হয় তা বেশ একটু খেলো ধরনের বাস্তববাদ— কিংবা হয়তো মোটেই বাস্তববাদ নয়। তা হয়ত একটা ফটো তোলার কায়দা, একপ্রকার প্রাকৃতিকবাদ; অথবা বলা যায় তা লোককলার একটা খেলো সংস্করণ এবং তারই গায়ে লেখক জুড়ে দেন "খাঁটি শ্রমিক"-এর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে একটা তথাকথিত কমিউনিস্ট সুনীতি। সম্প্রতি এক প্রবন্ধে Pierre Daix বেশ চমৎকার ভাবে এই ধরনের বইকে বর্ণনা করেছেন "বাৎসল্যপরায়ণ" বলে।

এই রকমের সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ আমার জন্য নয়। আমার কারবার সেই সব মানুষ নিয়ে যাদের ভাগ্য নিয়তির দ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট নয়, যাদের মন আগে থাকতেই ওই জিনিসটা মেনে নেয় নি যেটাকে তারা মনে করে রাজনৈতিক প্রয়োজন বলে। যে সব বই মোটেই এ রকম ভান করে না যে তারা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেই সব বইয়েই আমি এমন সব জিনিস খুঁজে পেয়েছি যেগুলিকে অবিকল সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তববাদের আলোয় পরীক্ষা করে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এবং নিজেকে বাড়াতে পেরেছি। আমার সব কিছু বিশ্বাসের ফলে যেটিকে আমি সকল আর্টের শেষ লক্ষ্য বলে মনে করি, সেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের দিকে এই সব বইই আমার বিচারশক্তিকে চালিত করেছে।

যে পথের সন্ধান করছি তা খুঁজে পেতে যে লেখক অজ্ঞাতে আমাকে সাহায্য করছেন, মতামতের দিক থেকে তাঁর সঙ্গে আমার কোনো মিল না থাকতেও পারে; এমনকি তাঁর ধ্যানধারণা হয়তো আমাকে শত্রুর মতো আঘাত করতেও পারে।

বড় দুঃখ হয় তাঁদের দেখলে যাঁরা নিজের ধ্যানধারণা ছাড়া অন্য কিছু বইয়ের মধ্যে দেখলে সইতে পারেন না, যাঁরা বিরোধী ধ্যানধারণার মধ্যে এমন কিছু পান না যা তাঁদের নিজেদের ধ্যানধারণার প্রসার ঘটাতে পারে: এমন সব লোক আছেন যাঁরা ছোট্ট একটা মোলায়েম, নির্বিরোধ জগৎ গড়েন। তাঁরা চান ভিন্ন মতের বই একপাশে ঠেলে ফেলে দিয়ে আরাম কেদারায় শুয়ে শুধু ইউটোপিয়া সম্বন্ধে বই পড়তে। এতে করে শুধু সাহিত্যই নয়, মানুষের চিন্তার পদ্ধতিটাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। যেখানটায় লেশমাত্র মতভেদ নেই সেখান থেকেই যদি সাহিত্য শুরু করতে হয়, শুধু এমন সাহিত্যই যদি চাই যা মত ও পথ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলবে না, তাহলে কেবল স্বমতাবলম্বীদের জন্যই লেখকদের লিখতে হবে। তাহলে শ্রেণী-স্বার্থের অতিশয় তর্কাধীন সাফাইয়ের আড়ালে সাহিত্যের জাতীয় চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে, তার বিশ্ব-সম্পৃক্তির কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না।

একথা বলছি না যে, সাহিত্যে কদাচ শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত নয়। সাহিত্যিকদের রচনায় সর্বদাই একটা শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। প্রশ্নটা শুধু এইটুকু যে, শ্রেণীটি কোন্ শ্রেণী। কিন্তু লেখকদের শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা এমন সব মূল্য সৃষ্ট হওয়া আবশ্যক, যা তাঁর শ্রেণীসীমানার বাইরেও স্বীকৃতিলাভ করবে। বুর্জোয়া সাহিত্য এমন অসংখ্য বই সৃষ্টি করেছে যেগুলি সেই সব নরনারীর মনে মূল্যবান প্রেরণা জুগিয়েছে যাঁরা মোটেই বুর্জোয়া-শ্রেণীর লোক নন। এর উল্টোটাও কেন যে না ঘটবে তার কোনো কারণ নেই। দুই ক্ষেত্রেই রচনাটির জাতীয় চরিত্রই হবে তার মূল্যায়নের মাপকাঠি। রচনাকে সার্থক করে তুলতে হলে তাকে জাতীয় সাহিত্যভূমিতে স্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ সার্থক সাহিত্য সমসাময়িকদের সহিত সম্পর্কবিহীন কোনো পরম পুরুষের লেখা নয়। সমসাময়িক সাহিত্যের গর্ভ থেকে এবং জাতির সাহিত্যিক ঐতিহ্য থেকেই ভাল বই জন্মায়। যে লেখক অল্প বুদ্ধির বশে সাহিত্যের জাতীয় জন্মভূমির সহিত নিজের লেখার বিচ্ছেদ ঘটতে দেন, তিনি অপরাপর লেখকদের স্বার্থকে নয়, নিজের স্বার্থকেই আঘাত করেন।

যে পরিবেশে শ্বাসগ্রহণের দ্বারা শিল্পকৃতি বেঁচে থাকতে পারে, তার থেকে যে লেখক নিজেকে বঞ্চিত করেন, তাঁকে দেখে মনে হয় যেন জলের মাছ ডাঙ্গায় উঠে খাবি খাচ্ছে।

অতীতে সাহিত্যের যে সব শাখা গড়ে উঠেছিল তারা প্রত্যেকেই নিজেদের এক-একটি অচলায়তন রচনা করেছিল। যা কিছু নিজেদের সঙ্গে মিলত না তাকেই তারা নরকস্থ করত। ঘরের লোক ছাড়া বাইরের সবার সঙ্গেই চলত তাদের বিবাদ। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ এই রকম অচলায়তনের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে না। এইখানটায় সাহিত্যের অতীত শাখাগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের মূলগত পার্থক্য রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই চলতে পারে এবং নিজের বিরোধী জিনিসকে ব্যাখ্যা করতে এমনকি, আত্মস্থ করতেও তা সক্ষম। কেননা কোন বিশেষ স্টাইলের জয়লাভের পরিবর্তে জগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা সৃষ্টি করাই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের লক্ষ্য। আমি জানি যাঁরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের বড়াই করেন তাঁরা অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হবেন না—কিন্তু এ বিষয়ে আমি অসহায়।

আমার মতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদকে এইভাবে দেখা ছেলেমানুষী যেন একটি যুধ্যমান শিল্পপদ্ধতি নিজের চারিপাশে ব্যূহ রচনা করে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্বন্ধে আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি গণ্ডীবদ্ধ নয়। আমার বিশ্বাস যিনি এই শিল্পপদ্ধতির অধিকারী বলে গর্ববোধ করেন, তাঁর উচিত এই পদ্ধতির সাহায্যে নিজের শিল্পকর্মকে সমৃদ্ধ করে তোলা। তা করতে গেলে এমনটি চলবে না যেন নিজের বেড়া দেওয়া একটুখানি জমিতেই বিচরণ করছি। সর্বসাধারণের জন্য যে জমি রাখা হয়েছে তার যেখানে যেখানে উৎকৃষ্ট তৃণের সম্ভাবনা বিদ্যমান, সর্বত্র বিচরণ করতে হবে—অবশ্য গ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গে সর্বদা সবিচারে কিছু বর্জনও আবশ্যক।

সাহিত্যের অভিযানে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ অগ্রণী বাহিনী কিন্তু তাই বলে মনে ভাববেন না যেন অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আপন এবং "পর", এই দুই ভাগে যদি সাহিত্যকে ভাগ করেন তাহলে সাহিত্যের জীবন্ত দেহটার অঙ্গব্যবচ্ছেদ ঘটবে এবং আপনি যে বাহিনীটার বড়াই করছেন, তা হয়ে পড়বে একটি কর্তিত ও মৃত অঙ্গ বিশেষ। সাহিত্যের অগ্রণী বাহিনীর সঙ্গে সমগ্র সাহিত্যের যোগসূত্র যদি ছিন্ন করে দেন, তাহলে

যাঁরা অপরাপর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লিখছেন এবং যাঁরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের সহিত তাদের নিজ নিজ শিল্পকর্মের উপাদানগত ঐক্য সম্বন্ধে মোটেই অবহিত নন, আপনার বাহিনীতে তাঁদের যোগদান কি করে দেখতে পাবেন? ফলে সাহিত্যের অধঃপতন ঘটবে না, ঘটবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের অধঃপতন। সরু মোটা নানা গলায় অন্যেরা ঠিক এই কথাটাই বরাবর আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করে আসছেন; অর্থাৎ কি না সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ টিঁকবে না এবং যাঁরা এটিকে ভজনা করছেন তাঁরাও এটিকে ছেড়ে দেবেন, যেমন ধরুন আমি নিজে।

এইবার বাস্তববাদ সম্বন্ধে বলব।

১৮৮৩ সালে "সাহিত্যে বাস্তববাদ সম্বন্ধে মন্তব্য" নামক নিবন্ধে বিরাট ইংরেজ ঔপন্যাসিক রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন লিখেছিলেন: "গত শতাব্দীর তুলনায় আজকের সাহিত্যে যে বিপুল পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে তার মূলে রয়েছে সাহিত্যকর্মে বিস্তারের প্রবর্তন।" ষ্টিভেনসনের উক্তিটিকে তাঁর সমগ্র লেখাটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে তবেই তার পূর্ণ অর্থগ্রহণ সম্ভব। তবে বিস্তার (detail) কথাটিকে তিনি কিভাবে ব্যবহার করেছেন তা অনুধাবন করলে বোঝা যায় ষ্টিভেনসন কি বলতে চান। শিল্পকলায় পর্যবেক্ষণের অস্তিত্ব অবশ্য সর্বকালেই দেখা গিয়েছে। যেমন ধরুন মধ্যযুগের চিত্রকলায় পর্যবেক্ষণের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়, কিংবা ধরুন অষ্টাদশ শতাব্দীতে (বা যে কোনো শতাব্দীতে) এমন কোনো উপন্যাস লেখা হয়নি যার মধ্যে কিছু না কিছু বাস্তবানুগ পর্যবেক্ষণ নেই।

কিন্তু বিস্তার অন্য জিনিস। বিস্তারণই এক শ্রেণীর রোমান্টিকবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এইখানটাতেই রোমান্টিকবাদের সহিত চিরায়তবাদের অমূর্তায়নের পার্থক্য। ষ্টিভেনসন নিজে অবশ্য উঁচুদরের বাস্তববাদী। কিন্তু স্বভাবতই তিনি স্বযুগের পরিভাষাই ব্যবহার করেছেন। বিস্তারতন্ত্রের সহিত ষ্টিভেনসনের বিবাদের কারণ প্রাকৃতিকবাদী শিল্পকলায় আলোকচিত্রসুলভ খুঁটিনাটি অতিপ্রাচুর্য। (ষ্টিভেনসন ভুল করে বাস্তববাদকে প্রাকৃতিকবাদের সহিত এক করে ফেলেছেন; তাঁর বাস্তববাদ রোমান্টিকবাদের একপ্রকার বিকৃতি)।

ষ্টিভেনসন যে বিস্তার শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেই শব্দটিকে আমি কি-ভাবে বুঝেছি তা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। অতীতের অ-বাস্তববাদী শিল্পকলায়

দেখা যায় যে, শিল্পীর পক্ষে খুঁটিনাটিকে পরিহার করে চলা অসম্ভব ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় Vezelay-এর খিলানে ও চ্যাপেলে, তৎকালীন স্বর্গ-নরকের বর্ণনায়, ভাস্কর্যের রূপায়নে, নৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনার সাহিত্যিক উল্লেখে। Breughel-এর উদ্ভট কল্পনাময় দৃশ্যাবলীও খুঁটিনাটির দিক থেকে বেশ বাস্তববাদী। কিন্তু চিরায়তবাদ, এবং বিশেষ করে ফরাসী চিরায়তবাদ বর্ণনাকে পর্যবসিত করল একটা সেকেলে কৌশলে। চিরায়ত-বাদের সিংহাসনে বসল আইডিয়া (অর্থাৎ বিশদ পর্যবেক্ষণের অন্তরালে অবস্থিত তথাকথিত থিসিস)। তাই চিরায়তবাদ হয়ে উঠল রোমান্টিকবাদের বিরোধী। রোমান্টিকবাদের ভিতর দিয়েই ঘটেছিল বিস্তারের পুনর্জন্ম, হোক তা গথিক অথবা সমসাময়িক, স্কট অথবা বালজাক। এই বিবর্তনের শেষ প্রান্তবিন্দু জোলা। তাঁর হাতে, অন্ততঃ গোড়ার দিকে, বিস্তারণ কার্যটি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের মনোভাবের বিরোধী একটা সমালোচনামূলক ও রাজনৈতিক চেহারা লাভ করল।

প্রতিক্রিয়াসঞ্জাত প্রাকৃতিকবাদী শিল্পকলায় বিস্তারণ-প্রক্রিয়া সমগ্র শিল্পকৃতির ভারবর্ধন না করে ক্রমশঃ হয়ে দাঁড়াল নিজেই নিজের চরম উদ্দেশ্য—এবং ফলে গাছই বড় হয়ে উঠল, বন চলে গেল চোখের আড়ালে। বিংশ শতাব্দীতেই হোক বা অন্য কোনো যুগেই হোক, এমন শিল্পকলা সৃষ্টি করা কখনও সম্ভব হয়নি যা বিস্তার, পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে চলতে পেরেছে। যে-সব শিল্পকৃতিকে বাস্তববাদ থেকে সবচেয়ে দূরের জিনিস বলে মনে হয় তাদের ক্ষেত্রেও বিস্তারণের একটা মুখ্য ভূমিকা বিদ্যমান ; এমনকি, এই সকল শিল্পকর্মেই দেখা যায় সমগ্র দৃশ্যে খুঁটিনাটির সর্বাধিক প্রাধান্য। বিগ্রহবাদীদের বা সাররিয়ালিস্টদের বিরুদ্ধে একথা বলছি না ; প্রুস্ট বা জয়েসের বিরুদ্ধেও নয়। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, বাস্তববাদের বিরুদ্ধে ভিন্নমতাবলম্বীরা অনেক মৌলিক বিশ্বাস ঘোষণা করেন বটে, কিন্তু এই সব ঘোষণার সাথী হিসাবে যে শিল্পকর্ম আবির্ভূত হয় তা বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য অগ্রাহ্য করে বেশী দূর চলতে পারে না। তফাতটা শুধু এইটুকু যে, বাস্তববাদী শিল্পকলা খণ্ড খণ্ড বস্তুসত্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কিন্তু অ-বাস্তববাদী শিল্প তা করতে নারাজ। অ-বাস্তববাদী শিল্পের বিস্তারকার্যে খুঁটিনাটির সামগ্রিক তাৎপর্যটিকে বাদ দিয়ে খণ্ডিত খুঁটিনাটিকেই জয়যুক্ত করা হয়।

শিল্পজগতের লড়াইয়ে যে প্রশ্ন ওঠে তা উদ্ভাবন বনাম পর্যবেক্ষণ-এর প্রশ্ন

নয়। বিশুদ্ধ উদ্ভাবন অস্তিত্বহীন ; অন্যদিকে পর্যবেক্ষণ ব্যতীত কোনো শিল্পই চলতে পারে না। আসল প্রশ্নটি এই যে, শিল্পকৃতির প্রকৃত তাৎপর্যের উপরই জোর দেওয়া হবে না তার তুচ্ছ ডালপালার উপরে। শিল্পের জগতে স্বাধীনতা বলতে বরাবর এই জিনিসটাই বুঝিয়েছে যে, শিল্পকর্মকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে হবে ; অন্যদিকে শিল্পীর দাসত্ব উদ্ভূত হয়েছে সেই সব বহিঃশক্তির চাপে যারা চেষ্টা করেছে পর্যবেক্ষণকে সীমিত করতে এবং শিল্পকৃতিকে শিল্পী যে অর্থের দ্বারা মণ্ডিত করতে চান তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে।

শিল্পকলা বরাবরই স্বাধীনতার জন্য বিরাট লড়াই চালিয়ে এসেছে। যাঁরা এই স্বাধীনতাকে খর্ব করতে চেয়েছেন, তাঁদের চোখে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে বিস্তারণ কার্যটি অনেক সময়েই বিপজ্জনক মনে হয়েছে কেননা বিস্তারণের দ্বারা এমন সব ব্যাপার ফুটে বেরনোর সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে যেগুলি নীরবে চেপে যাওয়াই এই সব ভদ্রলোকের অধিকতর মনঃপূত। আবার যখনই এঁরা আবিষ্কার করেন যে, শিল্পী বিশদ পর্যবেক্ষণের মধ্যে ডুবে থাকলে নিজের লড়াইয়ের ব্যাপারটিকে বেমালুম ভুলে যাবেন এবং বিস্তারের দিকে তাঁর দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখলে তাঁর চোখে এই কথা বলে ঠুলি পরিয়ে দেওয়া সহজসাধ্য হবে যে তাঁকে খুঁটিনাটি দেখার সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে, তখনই শিল্পীর স্বাধীনতার শত্রুরা বিস্তারণকেই নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ হিসাবে অবলম্বন করেছেন। এই সব লোকেরা সর্বদা সৃজনশীল উদ্ভাবকদের বুলি ধার করেন সৃজনশীলতাকে খোঁড়া করে দেওয়ার জন্য।

এই ঘটনাই ঘটেছে প্রাকৃতিকবাদ বা তথাকথিত "এক চাকলা জীবন" বলতে যা বোঝায় তার ইতিহাসে। সামগ্রিক তাৎপর্য থেকে বঞ্চিত বর্ণনা-রাশির দ্বারা সৃষ্টির প্রেরণাকে সীমিত করার জন্য প্রাকৃতিকবাদকে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং গলা মেলাতে হয় ওই আওয়াজের সঙ্গে যে, "শিল্পের জন্যই শিল্প।" শিল্পের এই কৈবল্যবাদী ব্যাখ্যা অবলম্বন করলে শিল্পীর পক্ষে পারিবারিক অ্যালবাম রচনা করা ছাড়া আর কিছু করণীয় থাকে না। হাসি পায় এই অ্যালবামটিকে দেখলে যখন চোখে পড়ে মূর্তিগুলির সেকেলে পোষাকপরিচ্ছদ কিংবা যখন নজরে আসে, সেকালের সামাজিক অবস্থার পটভূমিতে এই পরিবারটির সত্যকার চেহারা অকস্মাৎ কি রকম ফুটে বেরিয়েছে। ইস্রায়েলের ভগবান একদা মানবমূর্তির অঙ্কনকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন কিন্তু পরে, ভাল হোক, মন্দ হোক, এই নিষেধাজ্ঞাকে বলবৎ করার

ক্ষমতাটি তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণী চায় পারিবারিক চিত্র সংগ্রহ করতে এবং তাই তার শিল্পীদের শুধু এই কাজেই লাগিয়ে রাখতে চায়।

শিল্পে কি কি জিনিস অনুমোদন করা হবে তার চরিত্র যখনই বদলায় তখনই শিল্পীর স্বাধীনতা নতুন করে বিপন্ন হয়ে পড়ে। মনে হয় বুঝি বা শিল্পের নতুন অভিব্যক্তির সঙ্গে তাল রেখেই নতুন নিয়মকানুন (sanctions) রচিত হচ্ছে কিন্তু কার্যতঃ তার উদ্দেশ্য হল শিল্পীর স্বাধীনতাকে খর্ব করা। একদা যে-সব কথা মানুষের মুখ দিয়ে বেরলে কেউ সহ্য করত না সেই সব কথা পশুপক্ষীকে দিয়ে বলানো হল। মহৎ সাহিত্যিক উদ্ভাবন সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি ধরুন লেখকরা অনন্তকাল ধরে শুধু Roman de Renart-এর আবিষ্কারটারই চর্বিত-চর্বণ করতেন? তাহলে যে সব বিধিনিষেধকে লঙ্ঘন করাই উদ্ভাবনটির উদ্দেশ্য ছিল, তাদের কাছেই কি লেখকদের নতিস্বীকার ঘটত না? সাহিত্য ও শিল্পকলার ইতিহাসের প্রত্যেক স্তরেই এই ব্যাপারটি দেখা যায়—আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও বটে, বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও বটে।

আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আমরা পেয়ে আসছি বেশ একটা নতুন জিনিস, অর্থাৎ কাব্যে ফরাসী ছন্দের প্রবর্তন যাতে করে জনসাধারণের কানে কাব্যের আবেদন অর্থপূর্ণ হয়। পুরাতন লাতিন ছন্দ কেউ বুঝত না, অন্ততঃ অশিক্ষিতেরা। সমান মাত্রার গোনাগুনতি লাইনের সঙ্গে অন্ত্য মিল যুক্ত হয়ে শব্দের পর শব্দের এমন মালা গাঁথা হল যা মানুষের চেতনা ও স্মৃতি থেকে কোনোদিন মুছে যাওয়ার নয়। (ঘটনাটি যখন ঘটল তখন পুস্তকের প্রচলন হয় নি এবং সমাজের অধিকাংশ লোক পড়তে জানত না।) কাব্যে গীতিকলার উদ্ভব ঘটল এই বিশেষ সামাজিক অবস্থায় কিন্তু তার গুরুত্ব এমনই বেড়ে গেল যে ওই সামাজিক অবস্থার তিরোধানের বহু শতাব্দী পরেও গীতধর্মী কাব্য টিঁকে রইল। বইয়ের আবিষ্কার ঘটল, একই বই লাখে লাখে ছাপার কৌশল উদ্ভাবিত হল, জিনিস মনে রাখার শতেক রকম কৌশল অবলম্বিত হল কিন্তু গীতিকাব্যের জাদু টিঁকে রইল।

কিন্তু গানের ছন্দ উপায় হিসাবে বিবেচিত না হয়ে ক্রমশই হয়ে পড়ল কবিতা লেখার উদ্দেশ্য। তখন আর তার বিশেষ কোনো তাৎপর্য রইল না। পুনরায় উঠল কবির স্বাধীনতার প্রশ্ন। সুতরাং যখন কবিরা সনাতন গীতিছন্দ বর্জন করে তথাকথিত vers libre বা বাঁধনছেঁড়া মুক্ত ছন্দে কবিতা লিখতে

লাগলেন, তখন অবশ্যই তাঁরা শুধুমাত্র নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনার দ্বারাই চালিত হন নি। কাব্যের এই রূপগত স্বাধীনতা কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে হয়ে দাঁড়াল কবির স্বাধীনতার উপর নতুন এক শৃঙ্খল। গীতরূপের পরিহার ব্যাপারটা হয়ে পড়ল কলাকৈবল্যেরই অন্যতর অভিব্যক্তি এবং নিয়মিত ছন্দে কবিতা লেখার অননুমোদন রীতিমতো একটা অত্যাচারে পরিণত হল। ত্রিশ বছর আগে এই সমস্যাটা আমার কাছে প্রথম উপস্থিত হয়: কবিতার প্রকৃত অর্থকে কিভাবে অপরের মনে সঞ্চারিত করা যায়? অপণ্ডিত লোকেরা যাতে আমার কথায় কান দেয় তার জন্য গীতরূপ অবলম্বন করা উচিত হবে কি? অবশ্য মানি যে, এ বিষয়ে জনমতের একটা প্রকাণ্ড প্রভাব আছে এবং সমালোচক ও পণ্ডিত ব্যক্তিরাই এই জনমতটি সৃষ্টি করেন। তীরধনুক যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর কিউপিডের নিত্যসঙ্গী, মুক্ত ছন্দের সহিত সমসাময়িক কাব্যের সম্পর্কটাও প্রায় তেমনই। আমি এই সমসাময়িক স্টাইলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আমার স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম। গানের মতো করে কবিতা লিখে চললাম, অর্থাৎ কিনা সনাতন ফরাসী কাব্যের কায়দায় অমুক্ত ছন্দে, যাতে করে অপণ্ডিত লোকেরা তার রস উপভোগ করতে পারে।

কিন্তু অন্যান্য স্টাইলেও কবিতা লেখা আমি কোনোদিন বন্ধ করি নি। সম্প্রতি বলা হয়েছে, আমার নানা "স্ববিরোধ"-এর একটা দৃষ্টান্ত, এই যে, আমার মুক্ত ছন্দে লেখা ও অমুক্ত ছন্দে লেখা কবিতার পারস্পরিক অনুপাত ১৯৪৩ সাল থেকে কেবলই বদলাচ্ছে। আমার স্বাধীনতাটা ঠিক এইখানেই যে এসব ব্যাপারে কারুর কাছে জবাবদিহি করতে আমি বাধ্য নই—কোনো একটা বিশেষ আঙ্গিকের কাছে আমি দাসখৎ লিখে দিইনি। আঙ্গিক আমার কাছে উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়মাত্র। আমার শ্রোতা কারা, তাদের শিক্ষাদীক্ষা কি রকম, এবং তাদের কাছে আমি কি বলতে চাই, এই সব বিবেচনার দ্বারাই ঠিক হবে আমার বক্তব্যের গড়নটা কি ধরনের হবে। আসল ব্যাপারটা হল শ্রোতাদের মনোযোগের ও স্মৃতির নাগাল পাওয়া, এক মাধ্যমে না হয় অন্য মাধ্যমে শব্দের পর শব্দকে এমন অবিস্মরণীয়ভাবে গেঁথে দেওয়া যাতে লেখকের চিন্তাধারা মানুষের মনে প্রবেশ করতে পারে এবং মানুষকে বদলাতে পারে—ঠিক যেমন বিজ্ঞান মানুষের কর্মপদ্ধতিকে বদলে দিচ্ছে; ঠিক যেমন শিল্পকলার নিয়মকানুনকে অগ্রাহ্য করে সমাজ বদলে চলেছে।

কাব্যের যে সব বৈপরীত্য দেখা যায় তা উপন্যাস জগতের বৈপরীত্যের চেয়ে কম বিস্ময়কর নয়। যাঁদের মাধ্যমে কাব্যে বিস্তারের প্রবেশ ঘটেছে তাঁরা অনেকে মোটেই নিজেদের বাস্তববাদী লেখক বলে মনে করেন না। যেমন ধরুন Guillaume Apollinaire। তিনি বিগ্রহবাদী ঐতিহ্যের কবি। অথচ যে-সকল শব্দ কাব্যে এতদিন অপাংক্তেয় ছিল, যেগুলিকে এলুয়ার বলেছেন "অকারণে নিষিদ্ধ শব্দ", সেই-সব শব্দকে এই বিগ্রহবাদী কবিই সবচেয়ে অধিক সংখ্যায় কাব্যজগতে চালু করেছেন। তিনি সমসাময়িক অধুনাতম বিস্তারকর্মের জন্মদাতা। যাঁদের আগল খুলে তিনি জীবনের মুক্তধারা বইয়ে দিলেন কাব্যক্ষেত্রের আনাচেকানাচে। কথিত ভাষার জগৎ থেকে লিখিত ভাষার জগতে চলাচলের পথটি তিনি উন্মুক্ত করলেন। জীবনের বহু বাস্তব সত্যকে অপরিশুদ্ধ অবস্থায় তিনি কাব্যের এতদিনকার কায়েমী দরবারে ঢুকতে দিলেন।

এই ধরনের গীতিকাব্যগত বিস্তার ঐকান্তিক উদ্ভাবনপ্রীতি ও সৃজনানুরাগ থেকেই জন্মলাভ করেছে। এর সঙ্গে স্টিভেনসন কথিত আলোকচিত্রের খুঁটিনাটি তথা প্রাকৃতিকবাদী বর্ণনাবিস্তারের কোনো মিল নেই। আধুনিক সাহিত্যে যে বিস্তারের আবির্ভাব ঘটেছে তা মানুষের বিবেকেরই বাহন। তা আলোকচিত্রের মতো হুবহু অনুলিখন নয়। বরং তা জীবনের পরিবর্তনশীল বস্তুসত্যেরই মুসাবিদা।

তাই বলছিলাম, আধুনিক বাস্তববাদের বহুবিধ উৎস। এক উৎস ও অন্য উৎস অনেক ক্ষেত্রে আপাতবিরোধী। বর্তমান শতাব্দীর শিল্পকলা খুঁটিনাটির দাস নয়। বরং তা অতীত অভিজ্ঞতার দ্বারা খুঁটিনাটিকে কাজে লাগাতে ও শাসন করতে শিখেছে। আজ কেউ যদি প্রাকৃতিকবাদী পর্যবেক্ষক হতে চান তাতে ক্ষতি নেই তবে এই শর্তে যে পর্যবেক্ষণ ব্যাপারটি উদ্দেশ্য না হয়ে উপায় হিসাবেই অবলম্বিত হবে; কিংবা যদি কেউ দাবি করেন যে তিনি আইডিয়ালিস্ট (অবশ্য কথাটার সাহিত্যিক অর্থে), এই দাবিও অগ্রাহ্য নয় যতক্ষণ পর্যন্ত ভাষাগত পরীক্ষানিরীক্ষা উদ্দেশ্যস্বরূপ না হয়ে আইডিয়াকে প্রকাশ করার উপায়স্বরূপ হয়ে থাকে।

প্রায়ই আলোচনা ওঠে এ বিষয়ে যে আজকাল আমরা দেখছি একটা নতুন রকমের রোমান্টিকবাদ, না একটা নতুন রকমের চিরায়তবাদ? আমি নিজে এই উভয়সংকটের মধ্যে আটকে থাকতে রাজী নই। আগামী কালের

মানুষ যেমন রোমান্টিকবাদ থেকে, তেমনই চিরায়তবাদ থেকে নিজের যা দরকার বেছে নেবেন। মানুষ কাল যে কাজ করেছে আজ তিনি তারই পুনরাবৃত্তি করবেন না। কিন্তু তাঁর পক্ষে অভিজ্ঞতার মূল্যকে এই কারণেই অস্বীকার করা হবে ছেলেমানুষী যে, তা রোমান্টিক অথবা চিরায়ত, প্রাকৃতিকবাদী অথবা বিগ্রহবাদী। বাস্তবতার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে পূর্বকালীন অভিজ্ঞতাকে যাচাই করার এই নতুন বিচার-সূত্রটির মধ্যেই রয়েছে নতুন শিল্পকলা বিরাজ করছে। এই নতুন শিল্পকলা অবশ্যই নতুন রকমের এক বাস্তববাদ। তা যুগপৎ বৃক্ষ ও অরণ্য, উভয়কেই চিত্রিত করে এবং জেনে-শুনে বেশ সজ্ঞানেই করে। এই বাস্তববাদ খুব সক্রিয়। শিল্পের জন্যই শিল্প, এমনতরো অহেতুকী শিল্পকলার সঙ্গে তার আকাশপাতাল প্রভেদ। এই বাস্তববাদ মানুষকে সাহায্য করে, তাকে পথ চলতে আলো দেখায়, তার অগ্রগতির দিশা নির্ণয় করে এবং সর্বদা তার অভিযানের শীর্ষদেশে অবস্থান করে।

অবশ্য ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, শিল্পীর মনে মানবপ্রগতির স্বরূপ সম্বন্ধে উপলব্ধি বিদ্যমান; শিল্পী জানেন তাঁর অভিযান কোন কোন শক্তির দ্বারা ব্যাহত হচ্ছে এবং মানবের বিবর্তন আজ কোন নতুন স্তরে উপনীত। আমি জানি একথা শুনে কেউই বিস্মিত হবেন না যে আমার কাছে এবং আরো অসংখ্য লোকের কাছে এই নতুন স্তরটির নাম সমাজতন্ত্র। সুতরাং স্বভাবতই নতুন বাস্তববাদ নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ নামে অভিহিত করেছে। সমাজতন্ত্র কথাটাই হল সমস্ত ব্যাপারটির চাবিকাটি।

একথা ঠিক যে নতুন শিল্পকলার এই নামকরণ সোভিয়েত ইউনিয়নেই উদ্ভাবিত হয়েছিল। তারপর আমরা সকলেই নিজ নিজ দেশে নতুন বাস্তববাদের ওই নামটাই গ্রহণ করেছি। কিন্তু এটা কি সত্য নয় যে জার্মান দর্শন ও জার্মান সাহিত্য থেকেই আমরা রোমান্টিকবাদের নাম ও সংজ্ঞার্থ গ্রহণ করেছি? প্রতিটি যুগেই মানবিক মননপ্রবাহ যেখানে সম্ভব সেখানেই নিজের ধনরত্ন আহরণ করে এসেছে। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ যে অবস্থায় বিকশিত হয়েছিল, ফ্রান্সে সে অবস্থা অবিদ্যমান। সবচেয়ে বড় তফাত এই যে, সমাজতন্ত্র যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রতন্ত্র, তাই সোভিয়েত ইউনিয়নে গোড়া থেকেই শিল্পীর সহিত সমাজের নেতাদের বোঝাপড়াই হয়েছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের ভিত্তি; কিন্তু ফ্রান্সে বর্তমান

সামাজিক অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বিরোধী শিল্পকলা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

এটাই সোভিয়েত ইউনিয়নে ও ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের পার্থক্যের মূল কারণ। এই পার্থক্যকে অস্বীকার করার কোনো মানে হয় না। এদেশে এবং ওদেশে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্বন্ধে ধারণার যে বিরোধিতা দেখা যায়, এই পার্থক্যই তার কারণ। কিন্তু তাই বলে সোভিয়েত অভিজ্ঞতাকে অবজ্ঞা করা উচিত হবে না। বিরাট এক নতুন ধরনের পাঠকসাধারণ সোভিয়েত ইউনিয়নে দেখা দিয়েছে। সাহিত্য ও শিল্পকলার ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। যে শিল্পী নিজের রচনার প্রভাব ও আয়ু সম্বন্ধে চিন্তিত, তাঁকে এই মূল সত্যটির সহিত মোকাবিলা করতেই হবে।

যাই হোক, সোভিয়েত ইউনিয়নেই বলুন আর অন্যত্রই বলুন, আমি তর্কাতীত সত্য বলে মানতে প্রস্তুত নই যে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের কোনো বিশেষ থিসিস প্রমাণিত বলে বিবেচ্য। এক্ষেত্রে এ যুক্তির মূল্য নেই যে সর্ব-সম্মতিক্রমে কোনো কিছু মেনে নেওয়া হয়েছে বলেই তার প্রমাণ প্রশ্নাতীত। বরং লেনিনের কথাই ঠিক যে শিল্পকলাগত ব্যাপারকে ভোটে দেওয়া চলে না। এ-প্রসঙ্গে আরো বলা যেতে পারে যে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের মতো একটা ধারণার কোনো জাতীয় সীমানা থাকা উচিত নয়। একটা ছাঁচে ফেলে তার সংজ্ঞার্থকে শাশ্বত ও অনমনীয় করে ফেলা উচিত নয়। সমাজতান্ত্রিক বাস্তব-বাদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা দাবি করে যে, রচনাকে প্রতিপদে মূলনীতির দ্বারা যাচাই করতে হবে। শুধু যে নীতির ও ফলাফলের দিক থেকেই সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তববাদের পুনঃপরীক্ষা আবশ্যক তাই নয়; বরং আরো বেশী আবশ্যক বাইরেকার, এমনকি, বিরোধী অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদকে পুনর্বার যাচাই করা। এর ভিতর দিয়েই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ মহনীয় হয়ে উঠবে: এটা প্রমাণিত হবে যে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ ওই সব অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করতে ও আলোকিত করতে সক্ষম; তাদের মধ্যে যা মানবপ্রগতির সহিত সমান্তরাল তাকে গ্রহণ করতে ও আত্মস্থ করতে সক্ষম। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদকে গড়েপিটে কেউ আমাদের হাতে তুলে দেয় নি; আমরা তাকে যা করে তুলব, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ তাই-ই। তার শিকড় রয়েছে আমাদের অতীতের বিশাল ঐতিহ্যে। কেউ কেউ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বলতে এমন জিনিস বোঝেন যার অতীতে কোনো শিকড় থাকবে

না ; কিন্তু এই শিকড়কে কেটে ফেললে উপরকার ডালপালাও শুকিয়ে যাবে। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের পিছনে রয়েছে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যা অতীত ঐতিহ্যকে জিইয়ে রাখতে চায় ও আলোকিত করতে চায় এবং যা নিজের অনুচরদের অনুমতি দেয় অতীতের চিন্তাধারা থেকে পুষ্টিগ্রহণ করতে। শুধু ফরমূলা চিবিয়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বাঁচতে পারে না। তার বৃদ্ধির জন্য তার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার ও সাহিত্যেরও বৃদ্ধি ও প্রসার দরকার। ভিক্তর হুগো 'তাঁর উইলিয়ম শেকস্পীয়ার' গ্রন্থের শেষে ইতিহাস সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেছিলেন :

"এটা খুব পরিষ্কার যে, ইতিহাসকে নতুন করে লিখতে হবে ; এতদিন শুধু তথ্যের দীন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ইতিহাস লেখা হয়েছে : এইবার নীতির দিক থেকে ইতিহাস লেখার সময় এসেছে।"

পুরাতন সমালোচনার সহিত নতুন সমালোচনার সম্পর্ক সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা যায়।

এতে ঘাবড়াবার কিছুই নেই। অবশ্য একথা ঠিক যে, ঘটনার ও কাজের বাইরে ইতিহাসের কোনো অস্তিত্ব নেই ; হুগো তা ভালো করেই জানতেন। কিন্তু এই প্রতিভাশালী লেখক এই সত্যকেই আমাদের কাছে সরলভাবে উপস্থিত করেছেন যে, শুধু তথ্যের স্তূপ রচনা করাটা হচ্ছে এক প্রকার ঐতিহাসিক প্রাকৃতিকবাদ ; নীতির দিক থেকে তথ্যগুলি চিহ্নিত, সংগঠিত ও আলোকিত হওয়া দরকার। আমি অবশ্য ইতিহাসের আলোচনা করছি না। সাহিত্যেরই আলোচনা করছি। তবু দুই ক্ষেত্রে একই সমস্যা ; তাই হুগোর বচন উদ্ধৃত করলাম। সমালোচকের কাছে সাহিত্যের গ্রন্থরাজিই সাহিত্যের তথ্য ; এবং সময়ে সময়ে নীতির নামে, যেমন ধরুন সমাজতন্ত্রের নামে, যাঁরা তথ্যকে উড়িয়ে দিতে চান তাঁদের বিরুদ্ধে যাওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে যে সমালোচক সমাজতন্ত্রের নীতিতে বিশ্বাস করেন, তাঁর পক্ষে সাহিত্যের তথ্যগুলিকে— অর্থাৎ গ্রন্থগুলিকে—সমাজতন্ত্রের কাঠামোয় ফেলে বিচার করা দরকার। ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জগৎ থেকে এগিয়ে গিয়ে মানবসাধারণের সংগ্রামে অংশ-গ্রহণের পথে লেখকের অগ্রগতি সমাজতন্ত্রের কর্মসূচীর এক অংশ। এ বিষয়ে সমাজতান্ত্রিক সমালোচকের হাতে এক মহৎ দায়িত্ব ন্যস্ত এবং পাঠক হিসাবে আমরা প্রত্যেকেই এক-একজন সমালোচক—উৎসাহের সহিত গ্রহণই করি পঠিত পুস্তকটিকে অথবা বর্জনই করি।

একথা বলছি এই জন্য যে, যাঁরা বই না পড়ে সমালোচনা করেন তাঁদের চেয়েও সেই সব সমালোচকরা আমার কাছে বেশী সন্দেহভাজন যাঁদের দাবি এমনধারা যে তা কেউ মেটাতে পারে না। এই ধরনের লোক সর্বদাই আমাদের চারিপাশে রয়েছেন। যখন তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে সমালোচনা করেন, তখন আমি বেশী চিন্তিত হই না। কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়ি যখন দেখি যে, যিনি আমাদের ঘরের লোক অর্থাৎ প্রগতিশীল সমালোচক, তিনিও ক্রমাগতই দাবি করছেন যে দৃশ্যপট আরো একটু চড়ানো হোক। কিছুতেই তাঁর মনে পছন্দ হয় না। কবিতা বা উপন্যাস তাঁর চোখে কখনই যথেষ্ট বাস্তববাদী বা যথেষ্ট সমাজতান্ত্রিক বলে মনে হয় না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ এমন উঁচু ডালের ফল নয় যা একেবারে আমাদের নাগালের বাইরে। তা এইখানেই রয়েছে আমাদের মধ্যেই। আসল কথা হল, জিনিসটি কি তা জানা এবং তার দেখা পেলে তাকে চিনতে পারা।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্বন্ধে আমার নিজের ধারণা একটু চওড়া রকমের। আমার বিশ্বাস, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের এইভাবে চলা উচিত যাতে অগ্রণী বাহিনীর সঙ্গে জনসাধারণের বিচ্ছেদ না ঘটে; যাতে জাতীয় সাহিত্যের ক্রমান্বয় সংরক্ষিত হয় এবং অন্যান্য প্রকাশভঙ্গির সহিত তার সম্পর্ক দাক্ষিণ্যযুক্ত হয়। এটা করতে না পারলে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদের দিকে এবং সমাজতন্ত্রের দিকে এগুতে পারবে না; তা হয়ে রইবে একটি সাম্প্রদায়িক, পণ্ডিতী শিল্পকলা এবং বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে তা এমন সাহিত্য ও শিল্পকৃতি সৃষ্টি করতে পারবে না যার ধাপ বেয়ে আমরা ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ হতে পারি।

বুঝতে পারছি যে, আমার এই সব কথার এমন ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব যে এতে করে কমিউনিজম সংগ্রাম বলতে যা বোঝে অর্থাৎ শ্রেণী-সংগ্রাম, তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তা একেবারেই অননুমোদনীয়। তাই সবিনয়ে ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *Cahiers du Communisme* পত্রিকায় প্রকাশিত এবং আংশিকভাবে প্রাভদা কাগজে পুনর্মুদ্রিত লরাঁ কাসানোভার একটি লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিই:

"...পার্টি একথা জানে যে, ফ্রান্সের মতো দেশে পার্টি যদি প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে একটি অদ্বিতীয় মার্কসীয় ভাবসমষ্টিতে পর্যবসিত করে বা করছে বলে মনে হয়, তাতে বিপদ ঘটবে। তার ফলে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের

সৃষ্টিক্রিয়তা প্রগতিশীল ভাবজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং যে ভাব-বিনিময় পরস্পরের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে, তার থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন। অনেক কমরেড অপরের সঙ্গে রাজনৈতিক মৈত্রী স্থাপন করতে খুবই রাজী কিন্তু এই রাজনৈতিক মৈত্রীর কাঠামোর মধ্যে কোনোরূপ ভাববিনিময় করতে তাঁরা যেন নারাজ বলে মনে হয়। তাঁরা রাজনীতিকে ভাবাদর্শ থেকে কৃত্রিম উপায়ে আলাদা করে ফেলেন, যেমনটি করেন সুবিধাবাদীরা অপরাপর উদ্দেশ্যে। পার্টি এটা একটু দেরিতে বুঝতে পেরেছে যে, মার্কস যে কাজটি কদাচ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, মাঝে মাঝে অবিকল সেই কাজটি করাই হয়েছে পার্টির দোষ: অর্থাৎ কিনা সারা জগতের সামনে তত্ত্ববাগীশরূপে নিজেদের দাঁড় করিয়ে এই বলে চেঁচানো ; "ইহাই সত্য। বিশ্বজন, নতজানু হও।"

আমি এই প্রবন্ধে যা বলেছি তার সঙ্গে কাসানোভার চিন্তাধারার খুব বেশী অমিল নেই। যে সংগ্রামে আমি বারবর অংশগ্রহণ করে এসেছি তার স্লোগানটাই আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। কাসানোভার চেয়ে আমি অবশ্য আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে রোমান্টিকবাদ সম্বন্ধে আমার ধারণার কথাই পুনর্বার বলব। রোমান্টিকবাদের উৎপত্তি ও স্টাইল বিচিত্র। সম-সাময়িক ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ গড়ে তোলার ব্যাপারে রোমান্টিক-বাদকে ব্যবহার করা আবশ্যক। কারা কারা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের অধিকারী বলে নিজেদের মনে করে, তাদের একটা তালিকা রচনার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তব-বাদ "ইউনিয়ন" নয় এবং তাতে আপনার "যোগদান" অসম্ভব। এই ভুল ধারণাও আপনাকে ছাড়তে হবে যে, কেবল সমাজতান্ত্রিক দেশেই সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্ভব। তারপর এ কথাও ঠিক যে, যাঁরা নিজেদের গায়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের টিকিট লাগিয়ে দেন না, যাঁরা এর নিন্দা করেন, তাঁদের রচনাতেও সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের মূল জিনিসটি থাকতে পারে, যদিও অন্যান্য বিপরীত ধারণার সহিত মিশ্রিত হয়ে।

সুতরাং ব্যাপারটিকে এইভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে। আমরা সমাজতন্ত্রের যুগের লেখক একথা জানি বা নাই জানি। আমাদের কাজের স্টাইলটা কি হবে, কিভাবে লিখব, তার নানা পথের বাছবিচার করে যেটিকে চাই বেছে নিতে আমরা অবশ্যই পারি। কিন্তু যে পথই অবলম্বন করি না কেন, যদি লেনিনের এই তত্ত্ব সত্য হয় যে আর্ট জীবনেরই প্রতিফলন—এবং আমি

এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ—তাহলে আমাদের ভিতর দিয়ে অবশ্যই আমাদের নিজেদের যুগটাই প্রতিফলিত হচ্ছে। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, কখনও হয়তো বাঁকাচোরাভাবে, এমন কি উদ্ভটভাবে, আমাদের লেখার ভিতর দিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে মানবের অভিযানই প্রতিফলিত হচ্ছে। সাহিত্যের অসংখ্য তথ্যকে এবং শিল্পকলার অজস্র খুঁটিনাটিকে ঐক্য ও সংহতি দেওয়ার জন্য যে ধারণার প্রয়োজন তার নাম সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ। এই ধারণার সাহায্যে লেখক নিজের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের সীমা অতিক্রম করে শিল্পকলার অফুরন্ত বিস্তারকে ব্যাখ্যা করেন, তাকে তাৎপর্যময় ও শক্তিমান করে তোলেন এবং তাকে মানবের অগ্রগতির সহিত একীভূত করেন। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের মতো শিল্পকলাও বহু বিচ্ছিন্ন উদ্ভাবনের সমষ্টিমাত্র নয়। অপরে যা উদ্ভাবন করেছেন তার প্রতি আমরা উদাসীন থাকতে পারি না, তাকেও অর্থপূর্ণ করে তোলা আমাদের কর্তব্য। যে-সব বাস্তববাদী এমন এক বাস্তববাদের বড়াই করেন যা বৈজ্ঞানিক এবং যার একটি আভ্যন্তরীণ লজিক আছে, তাঁদের কাজ হল মানবের বিবর্তনের সহিত সঙ্গতি স্থাপন করে সমবেতভাবে সাহিত্যের ও শিল্পকলার ক্রমান্বয়তাকে সংগঠিত করা। আমি যদি আমার নিজের লেখা দিয়ে এবং অপরের লেখার প্রতি মনোযোগ দিয়ে এই কাজে সামান্য কিছুও সাহায্য করে থাকি তাহলে বুঝব যে আমি আমার জীবনের ও শক্তির সদ্ব্যবহার করেছি; তাহলে এই চরিতার্থতা বোধ জন্মাবে যে আমার নিজের কাজের ক্ষেত্রে দৈবক্রমে একদা যেখানে নিজেকে দেখতে পেয়েছিলাম সেখান থেকে বিশ্বমানবের লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেছি। আজকের অর্ধেক বয়সে সেদিন নিজের শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী এগিয়ে চলার যে সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম তা অপরিবর্তনীয়।

অনুবাদক ঃ অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

'পরিচয়' ফাল্গুন ১৩৬৬, মার্চ ১৯৬০

কয়েদখানা

দেবেশ রায়

পরদিন খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায়, ওপরে, মাঝখানে ছবি, বাঁ পাশে প্রধান সংবাদ—সুপ্রিম কোর্ট মিসা আইনের সতেরর ক ধারা বাতিল করে দিয়েছেন। ডানদিকের শিরোনামা,—আবার জেল ভাঙা, আবার সন্ত্রাস।

দুটো সংবাদ মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন, এতেই প্রমাণ হচ্ছে মিসার সতেরর ক ধারার মতো বা নিবর্তনমূলক আটক আইনের মতো একটি আইন কতো জরুরি। এই অধিবেশনেই প্রয়োজনীয় নতুন আইন আনা হচ্ছে। আহত পুলিশদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। যে ভাবেই হোক, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা হবে।

দুটো সংবাদ মিলিয়ে জনৈক যুবনেতা মন্তব্য করেছেন সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি আদালত স্তব্ধ করতে পারবে না। জয় আমাদের হবেই, কারণ লক্ষ্য আমাদের সমাজতন্ত্র, নেত্রী আমাদের ইন্দিরা গান্ধী।

* * *

হাত দুটো মাথার দুদিকে ছড়ানো, ডান হাঁটুতে একটা ভাঁজ, বাঁ পা-টা খাটের কিনারা বরাবর সোজা, ফলে কোমরটা একটু বেঁকা, বাঁয়ে—বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ ঘুমটা ভেঙে গেলে, হাত পা নাড়াবার জোরটুকুও নেই হাসপাতালের এমন কোনো রুগীর মতো নসু পড়ে থাকে, সামনের দেয়ালের ঘুলঘুলির দিকে চেয়েই, যেখানে সারাদিন চড়ুই পাখিদের কলরব। দুপুরের ঘুম নয়, ঘুমের পর এই নিরুদ্যম শুয়ে থাকাটুকুই জেলখানায় এসে নসুর নতুন অভ্যেস। আর না ঘুমিয়েও জেলখানাটাকে ভুলে থাকা যায় এই সময়টুকুতেই। বাড়িতেও এই সময় চড়ুই পাখিরা ঘুলঘুলিতে যায় আর আসে।

টুবলার খাটে ভোম্বল, টুবলা আর জয়। জেলখানায় এসেও ওদের দুপুরের ঘুমের অভ্যেস হয় নি। "জেলখানার বাইরে ও ভেতরে তফাৎ-টা কোথায়, একটা দেয়ালের। একটা দেয়াল তো আর সামাজিক অবস্থাটা বদলে দিতে পারে না। বাইরেও যে সমাজ, ভেতরেও সেই সমাজ। আমরা

ভদ্দরলোকের ছেলে বলে আরামে আছি আর জলিলকে কনভিক্টদের সঙ্গে রেখেছে—ও আধিয়ারের ছেলে। সুতরাং জেলের বাইরে লড়াইয়ের যে কায়দা, জেলের ভেতরেও তাই।" সবই ঠিক, কিন্তু নসুর পেটে ভাত পড়লেই চোখ জুড়িয়ে আসে। ওরা না ঘুমিয়ে থাকে কি করে। আর কেউ হলে এই ঘুমের অপরাধেই তাকে টুবলা গ্রুপ থেকে বের করে দিত। কিন্তু নসু মিত্তিরের সঙ্গে ও সব করতে আসবে কে। পাঁচটা মার্ডার অ্যাকশন, তার মধ্যে একজন সাব-ইনস্পেক্টর। দু-দুটো রিভলবার, একটা রাইফেল, ছেনতাই। নসু মিত্তির জেলের বাইরে দু-বছর ঘুমোয় নি, এখন দুপুরেও ঘুমোবে। ঘুমের পর খাট থেকে নামার জন্য এতোগুলো কৈফিয়ত নসুকে মনে মনে দিতে হয়, রোজই। আর এই কৈফিয়তগুলো মনে মনে আওড়াতে শুরু করলেই ধীরে ধীরে চড়ুইপাখীর ঘুলঘুলিটা ঢাকা পড়ে যায়, দেয়ালটাও দূরে সরে যায়, আর টুবলার খাটে টুবলা, ভোম্বল আর জয়ের দিকে তাকাতে নসুকে চোখ নামাতে হয়। ঐ উদ্যমহীন শুয়ে থাকার অবস্থাতেও, তাকিয়েই নসু বুঝতে পারে ব্যাটারা কোন ফন্দি এঁটেছে। মানে জেলের ভেতরে কোনো সংগ্রাম ইত্যাদি। বুঝতে পেরেই নসু চোখটা আবার দেয়ালে তুলে দেয়। তারপর ভাবে চোখটা বুজে ফেলবে কিনা। কিন্তু ওরা যদি ইতিমধ্যে চোখ খোলা দেখে থাকে, তাহলে ভাববে নসু কাটছে। অবিশ্যি এমন হতেও পারে নসুকে ওরা এখন জানাতেও চায় না, অ্যাকশন শুরু হয়ে গেলে নসু তখন জানবে বা পজিশন নিতে নিতে নসু তখন ব্যাপারটা বুঝতে থাকবে। নসু যেন সেটাই চায়। প্রথম থেকেই সব ঠিকঠাকের ভেতর থাকলে পরে নানা কথাবার্তার ভেতর যেতে হয়। অত কথা বলতে নসুর ভালো লাগে না। আর কি অ্যাকশনের কথা হচ্ছে কে জানে। বাইরে কোনো খবর পাঠানো হতে পারে, বাইরের কোনো খবর এসে থাকতে পারে, ভেতরে কাকাদের গ্রুপের কোনো ব্যাপার হতে পারে, ছোরা বা লাঠি ইত্যাদি আর্মস কালেকশন হতে পারে—এই সব নটখটি ব্যাপার টুবলা আর জয়ই ভালো সামলায়। দেয়ালে চোখ রেখে নসুকে কান পেতে থাকতে হয় ওদের কোনো কথা শুনতে। একটা শব্দ বা অর্ধেকটা শুনেও নসু বুঝে যাবে কি কথা হচ্ছে। বাইরে ওরা নসুকে কুকুর বলত—ও নাকি পুলিশের গন্ধ পেত। একবার একটা ঘরে নসু আর কানাই শুয়ে, সেই ঘরটার বাইরে সি. আর. পি.। সেই ঘরটার সিঁড়িতে দুজন সাড়া-পাড়া তছনছ হচ্ছে। তিন-তিন ঘণ্টা নসু আর

কানাই সেই ঘরের ভেতর নিঃসাড়। আর সেই ঘরে বসে বসে যেন নসু বুঝতে পারছিল পাড়ার কোথায় কোথায় তল্লাসি চলছে, কোন কোন মোড়ে পুলিশ। আর তিন-তিন ঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পর কী অসম্ভব দ্রুততায় দরজা খুলে সিঁড়িতে বসা দুই সি. আর. পি-র রাইফেল দুটো নিয়ে কানাই আর নসু হাওয়া। যে-ক্ষমতা দিয়ে নসু বাইরে সি. আর. পি-র গন্ধ পেত, এখন, সেই ক্ষমতাতেই নসু এক পলক তাকিয়েই টের পেতে পারে ওরা তিন জন কোনো ফন্দি আঁটছে। ফন্দিটা কি সেটা বুঝতে আধখানা শব্দও নসুর পক্ষে যথেষ্ট—তাই তাকে কান খাড়া রাখতে হয়, যেমন কান খাড়া রাখতে হত, বাইরে, এমন কি ঘুমের ঘোরেও। কিন্তু অত কথার ভেতর নাই যদি থাকবে নসু, আধখানা কথা শোনার জন্য তার এতো চেষ্টা কেন। ব্যাপারটা যদি জানা থাকে, অথচ সবাই যদি জানে সে কিছু জানে না, তাহলে অ্যাকশনের সময় নিজের পজিশন নেয়ার সুবিধে হয়, বা নিজে কি করবে সেটা আগে থাকতে ঠিক করা যায়। "জেলের বাইরে লড়াইয়ের যে কায়দা, জেলের ভেতরেও তাই।" এক একটা অ্যাকশন স্কোয়াড তৈরি করো আর অ্যাকশন করো। নিজ নিজ এলাকাকে মুক্ত এলাকায় পরিণত করো। নসুর নিজের অ্যাকসন স্কোয়াড ছিল। সবাই জানে নসু মিত্তির পাঁচটা মার্ডার-অ্যাকশন, তিনটি ছেনতাই অ্যাকশন লিড করেছে। কিন্তু এখানে তো আর বাইরের ছেলেরা নেই যে তাদের দিয়ে অ্যাকশন স্কোয়াড বানাবে। সুতরাং নিজেরা নিজেরা মিলেই এক-একটা অ্যাকশনের স্কোয়াড হয়। নসু বুঝতে পারছে না যে অ্যাকশনের তাল ওরা এখন করছে তাতে নসুকে স্কোয়াডের ভেতর নিয়েছে কিনা। নসু বা আর এ রকম দু-একজনকে সব স্কোয়াডই পেতে চায়। নসু বুঝে নিতে চায় ওদের তালটা কি। কিন্তু ওরা যদি একবার নসুকে ডেকে ফেলে আর নসু যদি একবার শোনে, তাহলে তো আর না বলার উপায় থাকবে না। না বললেই নসু হয়ে যাবে পাতিবুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবী।

নসু খুব আস্তে ডান কাত হয়, যেন ঘুমের ঘোরে, তারপর বাঁ পা-টা খাটের পাশ থেকে নামিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাইরের দিকে যেতে থাকে। আর পেছন থেকে "এই নস" ডাকলে নসু না-ঘুরে একহাত তুলে আমার আসছি।

ডেপুটি জেলারের বাড়ির পেছনের বিরাট আমগাছটার আড়ালে তখন সূর্য,

সারা আঙিনা জুড়ে ছায়া। ভলিবল নিয়ে চান্দু, ইন্দ্রজিত আর কাঙ্কা প্র্যাকটিস করছে। পরনের লুঙিটা টেনে নিয়ে হাঁটু জড়িয়ে নসু সিঁড়ির ওপর বসে। কাঙ্কা চেঁচায়, "এই নসুদা, প্যান্ট পরে এসো না।" কাঙ্কার কথার জবাবে "তোদের তো টিমই নেই" বলতে বলতে নসুর মনে হয়, এখন খেলতে নেমে গেলে লকআপের আগে আর টুবলাদের অ্যাকশনের প্ল্যান জানতে হবে না। কিন্তু পরণে এই আধা লুঙি, এখন প্যান্ট আনতে গেলেই তো ওদের কথা শুনতে যেতে হবে। কথাটা জেনে এলে হত। কিন্তু নসুর একেবারেই ইচ্ছে করছিল না এখন এই আমগাছের লম্বা ও বিস্তারিত ছায়ায় ভলিবলের দাপাদাপি ছেড়ে আঠারো জনের থাকবার ঘরে ঐ তিনজনের ফিসফিস কথায় যেতে। আর আগে বুঝে নিয়ে তবে নসু ওদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চায়।

ভলিবলটা এসে হাতের ভেতর পড়তেই নসুকে উঠে পড়িমরি মারতে হয়, নেটে ঠেকে গেলে কাঙ্কা সেটা নেট করে, ইন্দ্রজিতটা এমন লম্বা, লাফিয়ে উঠে আস্তে টুপ করে ঠিক কোটের মাঝখানে ফেলে দিলে নসুকে বাঁ হাতে বলটা লিফ্‌ট করে ডানহাত দিয়ে লুঙি সামলাতে মাটিতে পড়ে যেতে হয়। নসুর অবস্থা দেখে ওরা কোমরে হাত দিয়ে হাসতে থাকে। চান্দু বলে, "এই নসুদা, খেলছ ভলিবল, আর ধরে আছ যেন বাস্কেট বল।" নসু উঠে দুহাতে দিয়ে ধুলো ঝাড়তে মাথা নিচু করে কিছু বলে। বলটা ড্রপ খেতে খেতে কোট ছাড়িয়ে দেয়ালের দিকে দূরে একলা হয়ে যায়। নসুর জিভটা মোটা। তার ওপর তাড়াতাড়ি অথচ নিচু স্বরে কথা বলার অভ্যেস। ফলে কান খাড়া করে না শুনলে বা ও খুব ধীরে না বললে ওর কথা কিছুই বোঝা যায় না। সে চান্দুকে বলে, "যা তো, আমার প্যান্টটা নিয়ে আয়।" চান্দু ছুটে যায় নসুর প্যান্ট আনতে আর বল আনতে ছুটতে ছুটতে নসু ভাবে, যাঃ শালা, আমাকে আর এখন ঘরে যেতে হচ্ছে না। কিন্তু ওরা তালটা কি আঁটছে জানতে পারলে হত। আপন মনে গড়িয়ে গড়িয়ে বলটা দেয়ালের কাছাকাছি গিয়েছিল। সেটা তুলে ওখান থেকেই কাঙ্কার দিকে ছুঁড়ে দেয়। ততোক্ষণে চান্দু প্যান্টটা নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে নসুর দিকে ছুঁড়ে দেয়, "টুবলাদারা তোমার খোঁজ করছিল"... ।

"আচ্ছা, আচ্ছা, তুই ডাক সবাইকে এখন, টিম নামা"

চান্দু আর ইন্দ্রজিতের চিৎকার জুড়ে, দেয়ালের দিকে মুখ করে নসু প্যান্ট

পরতে থাকে। সেপাইদের চিৎকারের নকল করে ওরা ওদের ডাক বানিয়েছে—"হে-এ—এ-এ-আটনম্বর, তিন নম্বর, ছয় নম্বর, খে-এ-লা-আ-র মা-আ-ঠে-এ,—এ।" প্যান্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বাঁ দিকে তাকাতেই নসুর ভুরু কুঁচকে যায়, দূরের দৃশ্য দেখতে গেলে যেমন। কিন্তু প্যান্টের বোতাম থেকে তার আঙুল সরে না। নিজের ভাবনা, কাজ-কর্ম, চাউনি—তিনটিকে পরস্পর থেকে আলাদা রাখতে এতো বেশি অভ্যস্ত হয়ে গেছে নসু যে যা সে দেখেছে সেটা দেখতেই যেন আরো মন দিয়ে প্যান্টের বোতাম লাগিয়ে যায়, তারপর দৌড়ে দেয়ালের কাছে গিয়ে পেচ্ছাপ করতে করতে বাঁ দিকে চেয়ে নেয়, তাদের ওয়ার্ডের পেছন দিকে তিন নম্বরের পায়খানার পেছনেই ইলেকট্রিকের কাজের মস্ত লম্বা একটা মই দেয়ালে লাগানো, এতো লম্বা যে দেয়ালটার মাথার ওপরেও হাতখানেক বেড়ে আছে। চারপাশে কোথাও কেউ নেই, ঠিক এখনই নসু এখানে পেচ্ছাপ করতে না এসে যদি তাদের ওয়ার্ডের পেছন দিকটাতে যেত তাহলে দৌড়ে গিয়ে মই বেয়ে দেয়ালের ওপর উঠে লাফিয়ে নিচে নামলে কেউ দেখবার নেই। দেয়ালের ওদিকে বা তিন নম্বরের ছাতে বা কোথাও কোনো ইলেকট্রিক মিস্ত্রি থাকতে পারে, নসু ছুটে গিয়ে মই বেয়ে উঠলে তারা কিছু করতেও পারবে না। কিন্তু নসু যাতে ছোটে আর মই বেয়ে উঠে পালাতে পারে তার জন্য এমন নিরালায়, এমন অসম্ভব সুবিধেজনক জায়গায়, পাহারাহীন এতো দীর্ঘ মইটি রেখে দেয় কেন।

"এই নসুদা, কতো পেচ্ছাব করছো?" শুনে, থুতু ফেলে, প্যান্টের বোতাম আটকাতে আটকাতে খেলার মাঠের দিকে ছুটতে ছুটতে নসু ভাবে, দেয়ালের ওপরে ফ্লাড লাইট বসাতে আর থামের আলোর লাইন ঠিক করতে গত তিনদিন ধরে কি মইটি সারাদিন ধরে এমন নিরালায় নিরালায় পাহারাহীন পড়ে থাকছে।

খেলা শুরু হয়ে যায়। নেটের দুই ধারে কোর্ট ভর্তি এতগুলো ছেলে কোর্টের সীমানার ভেতর বলের গতির সঙ্গে তাল রেখে দ্রুত ঘুরছে, নাচছে, টলছে, বেঁকছে। বলটা যেন নৃত্য পরিচালকের হাতের কাঠি, যাতে এই এতগুলো ছেলের গতি নিয়ন্ত্রিত। নসু, লম্বা, পাতলা, নেটে খেলে। চাপা প্যান্ট, গোলগলা গেঞ্জিতে নসু যখন লাফিয়ে ওঠে তখন নেটের মাঝামাঝি পর্যন্ত ওর মাথা পৌঁছায়। বাঁ হাত ছড়িয়ে দিয়ে ডান হাতটা তুলে ডান হাতের আঙুল

থেকে ডান পায়ের আঙুল পর্যন্ত একটা তীব্র বক্ররেখা তুলে চাপা নসুর বল তুলতে বিপরীত দিকে কুমার বসে পড়ে আর দু হাতের দশ আঙুলে বলটা তুলে দেয়। কুমার বেঁটে, হাফপ্যান্ট আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে খেলছে। প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে ও খুব সুন্দর বল তোলে। বলটা উঠে এক কোণ তৈরি করে নসুদের দিকে মাঝখানে একটা অনির্দিষ্ট জায়গায় পড়তে থাকে। আকবর বলটা তুলতে ছুটে যায় কিন্তু শিবু এসে পড়ায় হুমকি খেয়ে সরে যায়। শিবু বলটা ঠিক মতো ধরতে পারে না। তার হাত থেকে পিছলে পেছনে যায়, পেছন থেকে বলটা টেনে মারে বিমলেন্দু। কিন্তু বিজু বলটা আর তুলতে পারে না। বলটা বাইরে ছুটে যায়। আকবর হাঁটুর ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে শিবুর ওপর খেঁকিয়ে ওঠে, "পারবি না তো ধরতে এলি কেন ?" ততোক্ষণে একেবারে নেট ঘেঁষে কার্তিকের সার্ভিসের বল থার্ড লাইনে রঞ্জুর নাকের ওপর এসে পড়ে। নাক বাঁচাতে রঞ্জু দুই হাতে সামনে মেলে ধরে। কার্তিকের সার্ভিস তোলা খুব মুসকিল, এমন একটা অদ্ভুত জায়গায় এসে বলটা পড়ে। এক ভরসা, নেট ঘেঁষে আসে বলে প্রায়ই নেটে লেগে যায়। কার্তিক দ্বিতীয় সার্ভিসটা করতেই নসু দুহাত মাথার ওপরে তুলে দিয়ে নেটের কাছাকাছি উঠে যায় আর তার তালুতে লেগে বলটা হঠাৎ বেঁকে কার্তিকদের দিকে সেকেণ্ড লাইনের বাঁ কোণায় মানুর হাতের ভেতর গিয়ে পড়ে। মানু হকচকিয়ে বল-টাকে একটুখানি মাত্র তুলে দিতে পারে। বলটা প্রায় মাটি ছোঁয় ছোঁয়। কিন্তু কুমার মাটিতে শুয়ে পড়ে তার দশ আঙুলে বলটাকে নেটের ওপর তুলে দেয়। বলটা ঠিক নেটের ওপর পড়ে একটু টলে যায়, তারপর নসুদের দিকে পড়ে। সেকেণ্ড লাইন থেকে এগিয়ে এসে শিবু বলটা একবারেই তুলে দেয়। লাফিয়ে শিবুর তোলা বলের ওপর চান্দু আঙুল ছোঁয়াতেই নেট গড়িয়ে বলটা নসুদের দিকে পড়তে থাকে। ধনুকের মতো বেঁকে গিয়ে নসু বলটা তোলার চেষ্টা করে। বলটা পেছন দিকে চলে যায়। আসলে কাশ্লাকে তুলতে দেয়া উচিত ছিল। পর পর তিনটি পয়েন্ট নষ্ট, টেন-সেভেন। কোর্টের বাইরে থেকে বলটা তুলে আনতে গিয়ে নসু দেখে টুবলা, জয় আর ভোম্বল দাঁড়িয়ে। ওদের দেখা, বল আনতে ছুটে যাওয়া, বলটা তোলা—প্রায় ওদের পায়ের কাছ থেকে, তুলে দাঁড়িয়ে আবার ওদের দিকে তাকানো, তাকিয়ে থাকা আর তারপর বলটা নিয়ে ছুটে আসতে আসতে নসু সহসা বুঝে ফেলতে পারে, ওরা আজকে এসকেপ-অ্যাকশন করবে। বলটা ওদিকে কার্তিককে ছুঁড়ে

দেয়ার আগে মাটিতে ড্রপ দেয়। সার্ভিস করার জন্য কার্তিক বলটা নিয়ে সার্ভিস লাইনে যায়। কার্তিকের বাঁ হাতের তালুর ওপরে বল। ওরা আজকে নিশ্চয়ই এসকেপ-অ্যাকশন করবে। নসু কোমর একটু ঝুঁকিয়ে লাফিয়ে ওঠার জন্য তৈরি হয়। কার্তিকের আগের সার্ভিসটা ও যখন ফিরিয়ে দিয়েছে কার্তিক তখন এবার একটা গোলমাল নিশ্চয়ই করবে। টাইমিংটা আসল কথা। নসু কার্তিকের চোখের দিকে তাকায় না, তাকিয়ে থাকে বলটার দিকে। যে-মুহূর্তে কার্তিকের খালি হাতটা দেখা যাবে, যে মুহূর্তে বলটা শূন্যে উঠে আসবে, সেই মুহূর্তে যদি লাফিয়ে ওঠা যায়, তাহলে নেটের ওপরে বলটাকে ঠিক ধরা যায়। যেদিন থেকে কার্তিকের সার্ভিসের কায়দা ধরতে পেরেছে নসু, সেদিন থেকেই সার্ভিসের পাল্টা মার আয়ত্ত করছে। তাই কার্তিক আর নসু কখনো একদলে খেলে না। নসু বুঝেছে টাইমিংটাই আসল। তিনদিন ধরে ইলেকট্রিক লাইনের কাজ হচ্ছে, তিনদিন ধরে ঐ লম্বা মইটা সারাদিন ধরে এ-দেয়ালে ও দেয়ালে লাগিয়ে রাখা হচ্ছে, তিনদিন ধরে নিরালায় নিরালায় সেপাইহীন মই দেয়ালে হেলানো পড়ে থাকছে—অথচ একটাও এসকেপ-অ্যাকশন হয় নি কেন কেন, ওটাই আশ্চর্য। কার্তিক সার্ভিস করে, টেনিসবলের বেগে বলটা কার্তিকের সোজা লাইন ধরে নেটের দিকে ছুটে আসে, নসু গোলকীপারের মতো দুই হাত মাথার ওপর তুলে কোণাকুনি উঠে যায়, বলটা নসুর আঙুল প্রায় ছুঁয়ে থার্ড লাইনে গিয়ে রঞ্জুকে ধরাশায়ী করে। হেসে ফেলে নসু হাত তুলে কার্তিককে বাহবা দেয়। দারুণ মেরেছে, ভাবা যায় না। কব্জিটা এমন ঘুরিয়েছে যে ওর সরলরেখায় বলটা এসেছে। বাহবা। ইলেভেন-সেভেন। কিন্তু ওরা কি তাহলে এখনই অ্যাকশন করবে। এখনো কি মইটা লাগানো আছে। ওরা কি এখন স্লোগান দিয়ে 'রাশ্' করবে মইয়ের দিকে। যদি করে, সেটাই তো সবচেয়ে ভালো হয়। টাইমিংটাই আসল কথা। কিন্তু ওরা এখন ছুটে গেলে সবাই হয়তো বুঝবে না অ্যাকশনটা কি, সবাই নিজের নিজের পজিশন নিতে পারবে না। অ্যাকশনের সময় পজিশনটাই আসল। কার্তিকের দ্বিতীয় সার্ভিস নেটে ঠেকে যায়। সেভেন-ইলেভেন। বলটা এদিকে আসতে ও রঞ্জুর হাতে যেতে যেতে হাতের তালু দিয়ে নসু একবার মুখটা মুছে নিতে নিতে নিতে তাকিয়ে দেখে ওদের তিন জন আর দাঁড়িয়ে নেই। রঞ্জুর সার্ভিস দেখতেই যেন নসু ঘাড়টা অত তৎপর পেছনে ঘোরায়, হ্যাঁ, ওরা তিনজন পজিশন নিয়েছে। টুবলা

যেন খেলা দেখার জন্য রঞ্জুর পেছনে কোর্টের উত্তরে দুই নম্বরের দেয়ালে হেলান দিয়ে। জয় যেন খেলা দেখার জন্য আকবরের পাশে চার নম্বরের দেয়ালে হেলান দিয়ে। ভোম্বলকে দেখা যাচ্ছে না। রঞ্জু সার্ভিস করেছে। থার্ড লাইনে বিকাশ বাবুর কাছে গিয়ে বলটা পড়ল। পয়েন্ট। এইট ইলেভেন। বিকাশ বাবুর পেছনে ভোম্বল দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে। তার মানে টুবলা প্রথমে সাইন দেবে, জয় প্রথম অ্যাটাক করবে আর ভোম্বল খেলোয়াড়দের সবাইকে অ্যাকশনে নিয়ে যাবে। কিন্তু অ্যাকশন স্কোয়াডটাতে আর কারা কারা আছে, নাকি ওরা তিনজনই মাত্র। বাইরে হলে মাত্র তিনজনে কোনো বড় অ্যাকশন করা যেত না। "জেলের ভেতরে আর বাইরে লড়াইয়ের কায়দা একই।" জেলের ভেতরে সুবিধে আছে—কাউকে রিক্রুট করতে হয় না, পালাতে হয় না, দুজন মিলে—এমন-কি একজনও কোনো অ্যাকশন শুরু করে দিলে তার দায়দায়িত্ব এসে পড়ে সকলের ওপর, কারণ পুলিশ সকলকেই আক্রমণ করে। সুতরাং নিজেদের স্কোয়াড বানাও আর অ্যাকশন চালাও—এই নীতি জেলখানায় চালানোর সুবিধে অনেক বেশি। এদের স্কোয়াডে আর কে কে আছে বুঝে নিতে সবার মুখের ওপর দিয়ে নসু নিজের চোখ ঘুরিয়ে নেয় দ্রুত—এতো দ্রুত যাতে ওরা তিনজন বুঝতে না পারে যে সে বুঝেছে। মানুর তোলা বলে চান্দু চাপ মারে। মাটিতে হাঁটু গেড়ে নসু বলটা কাঞ্চার দিকে ঠেলে দেয়, কাঞ্চার নেটিঙের ওপরে ইন্দ্রজিতের চাপের ওপরে লাফিয়ে উঠে নসু মারে, কুমার মাটিতে শুয়ে দশ আঙুলে বলটা ঠিক নেটের ওপরে তুলে দেয়, শিবু আবার নেট করে। পয়েন্ট নাইন-ইলেভেন. গেটের সেপাই রাইফেলের ওপর ভর দিয়ে খেলা দেখছে। ইন্দ্রজিতদের দিকে কোর্টের বাইরে দু-চারটে সেপাই এসে দাঁড়িয়ে। জেল গেটের জানলায়, দূরে বেশ অনেকগুলি মুখ। অত দূর থেকে তো খেলা দেখতে পারা সম্ভব নয়। তাহলে কি পুলিশও পজিশন নিয়েছে। এখন এই নেটটার দুপাশে বল নিয়ে খেলা চলছে। আর মাত্র কিছুক্ষণ পর বা যে কোনো মুহূর্তে, কোনো নিরালায় রাখা মইটা নিয়ে আর একরকম খেলা শুরু হবে। সেই খেলার জন্য যে যার মতো পজিশন নিয়ে নিয়েছে। নির্মলের বলটার ওপর নসু লাফিয়ে উঠতে পারত, কিন্তু সে বিজুকে বলটা ছেড়ে দিল। বিজুর তোলা বলটার ওপর শিবু লাফিয়ে উঠল আর বলটা গিয়ে পড়ল ইন্দ্রজিৎ আর চান্দুর মাঝখানে এমন জায়গায় যে কুমার দৌড়ে এসেও বলটা তুলতে পারল না। পয়েন্ট টেন-ইলেভেন। কুমার সব

চেয়ে ভালো তুলতে পারে কিন্তু তার জন্য ওর অন্তত পজিশন নেয়ার সময়টুকু দরকার। রঞ্জু সার্ভিস করছে। কিন্তু টুবলা আর জয় যেমন অদ্ভুত জায়গায় একা একা দাঁড়িয়ে আছে তাতে তো যে-দেখবে তারই সন্দেহ হওয়া উচিত খেলাদেখাটা ওদের কাজ নয়। তাহলে কি এই যারা খেলছে তারা প্রত্যেকেই বা অনেকেই জানে ও তাদের পজিশন ঠিক করা আছে। তাহলে কি নসুরই পজিশন ঠিক করা নেই। তাহলে কি এই সেপাইরাও সব জেনে শুনেই নিজেদের পজিশন নিয়েছে। বিকাশবাবু নতুন খেলা শিখছেন, ফলে ওঁর বল খুব এলোমেলো ভাবে আসে। কুমার নেট করলে কাঞ্চা আবার তুলে দেয়। মানু খুব উঁচুতে বলটা উঠিয়ে দিলে সেটা এদিকে বিমলেন্দুর মাথার ওপর পড়তে থাকে। বলটা আউট হবে বলে বিমলেন্দু ক্রমেই পেছনে সরতে সরতে শেষে ছেড়ে দেয়। বলটা লাইনের বাইরে গিয়ে পড়ে। "ডিসিশন!" বলে টুবলা হাততালি দিতেই নসু এতো চমকে ওঠে—তাহলে কি শুরু হয়ে গেল—যে তার আর দেখা হয়ে ওঠে না আর সবাইও অমন চমকে উঠল কি না। ইলেভেন অল—রঞ্জু সার্ভিস করছে। কোর্ট শুদ্ধু লোক রঞ্জুর দিকে তাকিয়ে। বলট, রঞ্জু কেমন ভাবে, কোথায় পাঠায় তার ওপর পুরো খেলাটা নির্ভর করছে। রঞ্জুর সার্ভিসটা সবাইকে তাদের ঠিক ঠিক পজিশনে নিয়ে যাবে। যদি রঞ্জু ভুল স্টার্ট দেয়, তাহলে সবটাই পণ্ড, খেলাটাকে আর বাঁচানো যাবে না। জয় সিগন্যালে থাকলে ভালো হত, ওর মাথা খুব ঠাণ্ডা, হুড়বড় করত না। টুবলা কখনোই টাইমিং বুঝতে পারবে না। ও ঠিক একটু আগে সিগন্যাল দেবে। কিন্তু ওরা কি বুঝতে পারে নি জেল কর্তৃপক্ষ টের পেয়ে গেছে। ওর আগেও তিন-তিনটি এসকেপ অ্যাকশন আগে থাকতেই ফাঁস হয়ে গেছে বলে কিছু করা যায় নি। কিন্তু যদি সত্যিই কর্তৃপক্ষ জানতে পারত তাহলে কি আগের বারগুলো যেমনি, তেমনি আরও, আগে থাকতেই ব্যবস্থা করত না? তা হলে কি এ রকম খোলা নিরালা মই রেখে দিয়ে সেপাইরা ভলিবল খেলা দেখত? সাইড আউট ইলেভেন অল। আবার কার্তিক সার্ভিস করছে, নসু দুই পা ফাঁক করে দুই হাত ফাঁক করে যে কোনো পজিশনে মারার জন্য তৈরি হয়ে যায়। কার্তিক যদি আবার সোজা লাইনে মারে, তাই, নসু দু-পা পেছিয়ে বাঁয়ে সরে যায়। এখান থেকে তাহলে সোজা ডাইভ করা যাবে না, ডান হাত দিয়ে বলটাকে ঝারতে হবে। কার্তিকের বাঁ হাতের তালুর ওপর বলটা টলটল, আর কার্তিক ডান হাতটা মেলে ধরে শরীরটা দোলায়। দু-কোর্টের

বাকি সব খেলোয়াড়রা যেন খেলা দেখছে। কার্তিকের হাতে সার্ভিস গেলেই সেটা কার্তিক আর নসুর খেলা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ যদি জেনে-শুনেও এসকেপ অ্যাকশনটা ঘটতে দেয়, যাতে নিজেদের ইচ্ছেমতো পাল্টা অ্যাকশন নিতে পারে। অথবা। আর। অথবা। আর। ফাঁস হয়ে গেছে জেনেও টুবলারা যদি ইচ্ছে করে অ্যাকশনটা ঘটায়—যাতে, সবাইকে এই অ্যাকশন দিয়ে বেঁধে ফেলা যায়, নইলে বড় আলগা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি জেল কর্তৃপক্ষ আর টুবলাদের ভেতর একটা অজ্ঞাত বোঝাপড়ায় অ্যাকশনটা ঘটতে যাচ্ছে। পাল্টা অ্যাকশন নেয়া যাবে বলেই যে অ্যাকশন ঘটতে দেয়া, পুলিশ অ্যাকশনের সামনে সবাই লড়াইয়ে সংগঠিত হয়ে উঠবে বলেই যে-অ্যাকশন ঘটানো, সে অ্যাকশনে নসুর পজিশন কোথায়। কার্তিকের বলটা নেট ছুঁয়ে ধনুকের মতো গোলাকৃতি বেঁকে যায় আর নসু প্রায় পেছন দিয়ে লাফিয়ে উঠে হাতের পাঞ্জা খাড়া রেখে বলটাতে এমন খাড়া মারে, যে ইন্দ্রজিতের মুখের ওপর গিয়ে বলটা পড়ে, পেছন থেকে কার্তিক বলটাকে তুলে দিলে ইন্দ্রজিৎ নেট করতে পারে, তার ওপর খেপা আক্রোশে লাফিয়ে উঠে নসু চাপ মারে। সাইড আউট। কথা নেই বার্তা নেই, যার ইচ্ছে সে অ্যাকশন শুরু করবে আর নসুকে তার হ্যাপা পোয়াতে হবে। এখানে সবাই জানে এখনই একটা অ্যাকশন হবে, যে সে অ্যাকশন নয়, এসকেপ অ্যাকশন, কজন পালাতে পারবে কে জানে, ফিরে কে কে ধরা পড়বে—তাই বা কে জানে, যারা জেলের ভেতরে থাকবে তাদের তখন প্রাণান্ত অবস্থা। তাহলে কেন এখন সবাই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে দিচ্ছে না, আমরা এই অ্যাকশানে নেই। কেন নসু বলে দিচ্ছে না। সে তো সেই কখন থেকে এড়িয়ে যাচ্ছে, পাছে জয় ভোম্বল টুবলা কিছু বলে ফেলে। না। নসু মিত্তির কারো অ্যাকশনের হ্যাপা পোয়াতে পারবে না। এদিকে রঞ্জুর একটা সার্ভিস নষ্ট হল। ইলেভেন অল্, আবার কার্তিকের সার্ভিস। আবার দুই পা দুই হাত ফাঁক করে কারো ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যেন তৈরি। নসুর লম্বা রোগা শরীরের প্রতিটি পেশী টানটান। লম্বা ঘাড়ের ওপর এককমাথা চুলে ভারি মাথাটা পিঠের সঙ্গে একটা কোণ তৈরি করেছে। কার্তিক সার্ভিসের জন্য হাতের তালুতে বল রেখেছে, ডান হাতটাকে সে নাড়াচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে সার্ভিস করবে। সার্ভিসের লাইন ভাবছে। এই সার্ভিসটা ঠেকিয়ে, পারলে জেতার একটা চান্স নিতে হবে। কিন্তু টুবলারাই বা কি করবে, যদি তিনদিন ধরে একটা দেয়াল টপকানো মই সারাদিন চোখের

সামনে থাকে। যেন এসকেপ অ্যাকশনের নেমন্তন। না। নসু ব্যাপার স্যাপার না বুঝে এগোবে না। এখন, যখন কার্তিক সার্ভিসের বল তাওয়াচ্ছে তখন এই দুই কোর্টের সবাই জানে খেলাটা যেন নসু আর কার্তিকের ভেতরই। কার্তিক সার্ভিস করল। নসু লাফিয়ে উঠল। আর আকাশমুখো অতগুলো খেলোয়াড়ের ভেতর থেকে ছুঠে উঠে, শূন্যে, নসু বাঁ পায়ের আঙুল থেকে মাথার ওপরে তোলা বাঁ হাতের আঙুল পর্যন্ত সামান্য ভাঙচুরের একটি সরল রেখায় আর ডান হাঁটুর একটি কোণে শূন্যে, মূর্তিতে স্থির হয়ে যায় আর ডান হাতের পাঞ্জার উল্টো মারে বলটাকে নেট-পার পাঠাবার তীব্রতায়, শূন্যে, সেই মূর্তি খান-খান ভেঙে যেতে থাকে, তখন, শূন্যে, মূর্তিভাঙা পাথরের ছিটকে যাওয়ার বেগে নামতে নামতে নসু, শূন্যে, শুনতে পায়—টুবলার চাপা চিৎকার। মাটিতে পড়েই ঘুরে, নেটের দিকে পেছন ফিরে, ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে, হাত পা শরীর থেকে সরিয়ে, যেন ওদিক থেকে এবার কার্তিকের সার্ভিস, নসু দেখে মইটা ঝুলিয়ে নিয়ে আসে যে-ইলেকট্রিকমিস্ত্রি, তার হাত থেকে কেড়ে নেয়া মই জয়ের হাতে, মইটা ছেড়ে দিয়ে মিস্ত্রি আর মইটা কেড়ে নিয়ে জয় বিহ্বল দাঁড়িয়ে, চারপাশে চকিত স্তব্ধতার ভেতর দিয়ে দিয়ে, হাত ঝুলে পড়া খেলোয়াড়দের মূর্তিগুলোর ভেতর দিয়ে দিয়ে পথ করে করে ক্রমঘন ধপধপ শব্দে ড্রপ খেতে খেতে বলটা জয় আর মইয়ের দিকে, তারপর, দেয়ালের দিকে তারপর, দেয়ালের দিকে চলে খেতে যেতে নসুকে মনে পড়িয়ে যায়, এই অ্যাকশন তার নয়, সে এই অ্যাকশন স্কোয়াডে নেই, যে জানেও না প্ল্যান কি, যে যার মতো অ্যাকশন করবে আর হ্যাপা সামলাবে নসু মিত্তির, মাত্র কয়েক পা বাঁয়ে সরে গেলে নসুর ওয়ার্ডের দরজা, তার পাশে দাঁড়িয়ে অ্যাকশনটা দেখা যায়, তারপর অবস্থা বুঝে নিঃশব্দে ওয়ার্ডের ভেতরে বা ছুটে মই বেয়ে দেয়ালের ওপরে ও টপকে বাইরে, চলে যাওয়া যায়, কিন্তু অত বড় মইয়ের মাথাটা ধরে জয়ের বিমূঢ়তায় নসুকে সহসা বুঝে ফেলতে হয়, মইয়ের মাথাটাই শুধু দেখা যাচ্ছে, বাকিটা চার নম্বরের আড়ালে, নিশ্চয়ই ও মাথার মিস্ত্রি মই ফেলে পালিয়েছে, অতবড় মইটার মাথা ধরে জয় তাই বিমূঢ় দাঁড়িয়ে, এই সময়টা চলে গেলে একজন-ও বেরতে পারবে না, টাইমিং আর পজিশনটাই আসল, তার পক্ষে দ্রুত দীর্ঘতম পা ফেলে ছুটে যাওয়ায় নসুর কোমরের নিচের অংশটা ওপরের অংশের তুলনায় কতো দীর্ঘ, ভলি কোর্টের চৌহদ্দিতে বাঁধা খেলোয়াড়েরা বন্দুকের শব্দে ঝাঁক বেধে পাখি ওড়ার আকস্মিকতায় ছুটে

যায়, ভলিখেলার চারপাশ জুড়ে কোথায় সেপাই, কোথায় কয়েদি, যেন কোনো ফারাক নেই, যেন এক খেলা ঘিরেই সবার সংসার, যেন এই জেলখানার মিলিত সংসার, যেন এই জেলখানা মিলিত সংসার, শুধু নসুর সন্দিহান চোখে ধরা পড়েছিল টুবলা জয় আর ভোম্বল, গেট আর ছাতের সেপাইরা পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে, আর এখন মুহূর্তের মধ্যে নসুরা সবাই একদিকে ছুটে যায়, সেখানে দেয়ালের আড়াল থেকে সবাই আক্রমণ চালাতে পারবে আর দেয়ালে মই আটকে একের পর এক টপকানো যাবে, নসুদের সমস্ত দলটা মইটাকে দেয়ালে দাঁড় করিয়ে দেয়, অতগুলো মানুষের পায়ের ভারে মইটা দোলে—দেখতে দেখতে মইয়ের মাথা থেকে তলা পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি তাকেই একজন করে দাঁড়িয়ে, নসু তখন নিচে চার নম্বর আর দেয়ালের মাঝখানের ফাঁকটাতে ব্যারিকেড বানাবার জন্য ওয়ার্ডের ভেতর থেকে খাট আনতে হুকুম দিচ্ছে, খাট এসে যায় আর হাতে হাতে এলুমিনিয়মের থালাকাটা ছোরা বিলি হয়ে যায় আর ঠিক সেই মুহূর্তে ব্যারিকেড বানাতে হাতে ছোরা নিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে নসু দেখে সবচেয়ে ওপরে টুবলা দেয়ালের মাথায়, একটা গভীর লাফ দেয়ার জন্য টুবলা দেয়ালের ওপর বসে পড়ে, ঝপ, চারটে খাটের দেয়াল উঠে যায়, সামনে গেটের মাথায় শাস্ত্রীর হাতে রাইফেল, অথচ ঝপ, ঝপ, ঝপ, এসকেপ ঘটে যাচ্ছে অথচ জেল কর্তৃপক্ষ এখনো কিছু করছে না, তবে কি, তবে কি, "নসু, তুমি পালাও, নসু, ডোন্ট বি ইডিয়ট" পাশে বিমলবাবুর গলা, নসু ছুটে গিয়ে মইয়ের গায়ে হাত দেয়, মইয়ের তাকে পা দেয়, একজন সাব-ইনস্পেক্টর-সহ পাঁচটা মার্ডার আর দুটো আর্মস ছেনতাই, নসুকে ওরা কোনোদিন ছাড়বে না, মই বেয়ে নসু তরতর উঠে যায়। এমন বাধাহীন, তবে কি ওরা নসুদের পালাতে দিচ্ছে, ইচ্ছে করে, তবু নসুকে উঠে যেতে হয়, আর একটা হুইসলের শব্দেই চৌকির আর জলের ড্রামের ব্যারিকেড ভেঙে যায়, নসুর মাথার ওপরে অর্ধেকটা মই এখনো, নসুদের কি ওরা পালাতে দিচ্ছে, তাহলে নসু পালাবে না, মইটা হঠাৎ দুলে ওঠে, তিন-চারজন সেপাই মইটা টেনে নামাতে চেষ্টা করছে আর বিমলবাবুর লিডারশিপে এরা বাধা দিচ্ছে নসুকে ও নসুর নিচে আরো কজনকে নিয়ে মইটা দোলে, নসু দুই হাতে মইটা চেপে ধরে, নিচে তাকিয়ে দেখে আরো কজন সেপাই এসে মইয়ের গোড়া ধাক্কায়, বিমলবাবুর হাত একবার আকাশে, তারপর সামনে সেপাইটার পেটের ভেতরে, ছুরিটা আমূল বিঁধে গেলে সেপাইটা মইয়ের গোড়ায় পড়ে,

নম্বর ঠিক নিচের ছেলেটি মই থেকে ছিটকে যায়, নসু সহ মইটা দেয়াল থেকে ডানদিকে, ভলিখেলার কোর্টের আঙিনার দিকে, ধীরে ধীরে হড়কায়, হড়কায়, হড়কায়, যেই মইটা হুড়মুড় পড়ে যেতে থাকে, নসু ওপর থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়েই ডান পায়ের গোড়ালি দুইহাতে ধরে মাটিতে গড়িয়ে যায়, মচকে গেছে, "বিমলবাবু, মইটা টেনে নিন, টেনে নিন" চিৎকারে বিমলবাবু মইয়ের গোড়ায়, মইয়ের গোড়ায় বিমলবাবুর হাত, মইয়ের মাথা সেপাইদের হাতে, টাগ অব ওয়ার, নসু গোড়ালি ছেড়ে মই ধরে ঝুলে পড়ে, "বিমলবাবু, ওদের পেছন থেকে কোনো অ্যাটাক চালান, নইলে পারবেন না," আকবর আর কজন তিন নম্বরের পেছন দিয়ে ছুটে যায়, ছাতের শান্ত্রীর হাতে রাইফেল ছিল, ভলিখেলার কোর্ট ঘিরে সেপাইরা পজিশন নেয়, নস এতোক্ষণে যেন নিশ্চিত যে তখন সেপাইরা পজিশনে ছিল, তিন দিন ধরে সারাদিন এমন খোলামেলা মই, তবে কি, তবে তো, তবে, তো, সরকার তাদের পালানোর অ্যাকশন করতে দিচ্ছে, তবে তো এ অ্যাকশন নসুর নয়, হয় টুবলার, নয় সরকারের, যার অ্যাকশন সে বুঝুক, নস কেন সামলাবে, নসুর কেন গোড়ালি মচকাবে, সেপাইরা মইটা অনেকটা টেনে নিয়ে যেতে পারে, আকবর এখনো কেন রেয়ার অ্যাকশন করে না, ছুটে তো গেল, কি দিয়ে অ্যাকশন করবে, ইঁটপাটকেলও তো জড়ো করা নেই, 'স্কোয়াড বানাও অ্যাকশন করো, একটা অ্যাকশন করলেই সবাইকে জড়িয়ে পড়তে হবে,' জড়িয়ে তো পড়তে হবে কিন্তু তখন দরকারমতো একটুকরো ইঁটও পাওয়া যাবে না, কে কাকে জড়ায়, চোখের সামনে এতগুলো, এসকেপ ঘটে যায়—অথচ জেলকর্তৃপক্ষ পাল্টা আক্রমণে এতো দেরি করে কেন, প্রাণপণে টানতে টানতে ওরা মইটা নিয়ে চার নম্বরের দেয়ালের আশ্রয় নেয়, কার লড়াই লড়ছে নসু—টুবলার, জেলারের, না তার— সে জানে না, মইটাকে আপাতত টেনে আনতে হবে, সেপাইয়ের দলটা টিউবওয়েলের পারে পৌঁছে গেছে, চার নম্বরের দেয়ালের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে নসরা মই টেনে রাখছে, মই টানাটানি করতে করতে নসুদের কি ওরা খোলা মাঠে নিয়ে যেতে চায়, হয়তো খোলা মাঠে রাইফেল নিয়ে সারি দাঁড়িয়ে, আর নসুরা বেরনো মাত্রই ঝাঁকের পর ঝাঁক গুলি আসবে, সুতরাং কোনো-ভাবেই চার নম্বরের দেয়ালের আড়াল ছাড়া হচ্ছে না, হবে না, জীবন দিয়েও মইটা ধরে রাখতে হবে, কিন্তু যদি সেপাইরা মইটা ছেড়ে দেয়, এখন তাহলে সেই মই নিয়ে কি আবার দেয়াল টপকানো হবে, আবার দেয়াল টপকানো

হবে কি যখন নসু জানে না দেয়াল টপকানো অ্যাকশনটা কার, সরকারের না টুবলার না আর কারো, হঠাৎ সেপাইরা মইয়ের ঐ মাথায় থু থু করে থুতু ছিটিয়ে মইটা যেন ছেড়ে দেয়, বিমলবাবু নসুসহ অন্যান্যরা মইটা খানিকটা টেনে আনতেই আবার সেপাইরা টানতে থাকে, টানতে থাকে আর থু থু করে, তাহলে আকবর রেয়ার অ্যাকশন শুরু করেছে, আকবর সেপাইদের লক্ষ্য করে কিছু ছুঁড়ছে, ঢিল নয়, ঢিল পাবে কোথায়, তবে, হঠাৎ একটা গন্ধ পাওয়া যায়, আকবর তাহলে ওদিক দিয়ে গিয়ে চুনঘরের পায়খানার ময়লা ছুঁড়ছে, সেই ময়লার আক্রমণের সামনে আর না পেরে সেপাইরা এক সঙ্গে একটা হ্যাঁচকা টানে বেশ খানিকটা টেনে নিয়ে মইটাকে টিউবওয়েলের মাথার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে ওদিককার দেয়ালের আড়ালে সরে যায়, আর এটা যেন হাডুডু খেলা, অপর পক্ষের খেলোয়াড় লাইন পেরতে না পেরতে তার পেছনে ধাওয়া করতে হবে, সেপাইরা যদি টিউবওয়েলের মাথায় মইটা আটকে দেয় তবে এই মুহূর্তে গিয়ে সেটা খুলতে হবে, যান্ত্রিক নিয়মে মই থেকে নসুর হাত খুলে যায়, চাপা স্বরে বলে, "টেনে নেবেন" দুই হাতে দেয়াল আঁকড়ে একবার মুখ বাড়িয়ে দেখে নেয় ভলিখেলার কোর্টের ওদিকে কোনো রাইফেল আছে কি না, থালাকাটা ছোরা একটা বিমলবাবু পেছন থেকে নসুর হাতে গুঁজে দেন, না তাকিয়েই হাতটা নসু মুঠো করে ধরে, তারপর একটা পা বাড়িয়ে দেয়, মইটাকে আনুভূমিক বাঁ হাতে রেখে, ডান দিকে সম্পূর্ণ খোলা মাঠ রেখে টিউবওয়েলটার দিকে ছুটতে শুরু করা মাত্র নসুর মনে পড়ে তার ডান গোড়ালি, মচকে গেছে, নসু বুঝতে পারে সে ছুটতে পারছে না, কিন্তু তখন আর ফেরার উপায় নেই, ডান হাতের মুঠোয় ছুরিটা সবাইকে দেখিয়ে ধরে, নসু ডান দিকে তাকিয়ে খোলামাঠে একটা নির্জন ভলিনেটের ওপারে জালিকাটা আকাশ থেকে গেটের ওপরে শান্ত্রীর হাতে রাইফেল পর্যন্ত চোখে ঘুরিয়ে ডান পা-টাকে নেহাত যতোটুকু নইলে নয় ব্যবহার করে, চল্লিশ ফুট মইয়ের মাথার দিকে চলে, ডান গোড়ালি মচকে যাওয়ায় শরীরে সেই ছন্দ আর গতিটুকু আসে না যাতে কোথাও থেকে ছুটে আসা রিভলবারের বা রাইফেলের গুলি এড়ানোর আত্মবিশ্বাসটুকু অন্তত কার্যকর হয়, ফলে নসুর কী করুণ চল্লিশ ফুট দীর্ঘযাত্রার ল্যাংচানো, ডান দিকের এতো শূন্য মাঠ, বাঁ দিকে দেয়াল, সামনে ও মাথার ওপরে সেপাইদের হাতে লাঠি ও রাইফেল, পেছনে বন্ধুদের হাতে এলুমিনিয়ামের থালাকাটা ছুরি আর

পায়খানার ময়লা, মই বেয়ে বেয়ে নসুকে একই সমতল পেরতে হয়, নসু তো মাত্র কয়েক মিনিট আগেও জানত, এ-অ্যাকশন তার অ্যাকশন নয়, এ-লড়াই তার লড়াই নয়, নসু তো মাত্র কয়েক মিনিট আগেই দেখেছে ভলিখেলার কোর্টের চারপাশে সেপাইরা পজিশন নিয়েছে, নসু তো এইমাত্র দেখেছে পজিশন নেয়া সত্ত্বেও জেল কর্তৃপক্ষ গুলি করে নি, আক্রমণ করে নি, নসু তো এইমাত্র জেনেছে যে এ লড়াই তার লড়াই নয়, এ অ্যাকশন তার অ্যাকশন তার অ্যাকশন নয়, স্কোয়াড বানাও অ্যাকশন চালাও সে স্কোয়াড বানায় নি, সে অ্যাকশন চালায় নি, অ্যাকশন করলেই সবাই জড়িয়ে পড়বে, নসু জড়িয়ে পড়েছে, এই অ্যাকসনে, এই তো সে জড়িয়ে পরেছে, এই তো সে মইয়ের মাথাটা খুলতে যাচ্ছে, মইয়ের মাথাটা যখন সোজা হবে, মইটা যখন একদিকে টিউবওয়েলের মাথা আর একদিকে বিমলবাবুদের হাতে আটকা থাকার বদলে খাড়া থাকবে, দেয়ালে, তখন নসু মই বেয়ে উঠবে না, কারণ এ অ্যাকশন নসুর নয়, যদিও এখন নসুর পেছনেই মাঠের সবটা, যদিও এখন নসুর সামনে সেপাইদের মুখ গুলো, যদিও এখন নসুকে পাকড়ে ধরে টেনে নিয়ে যেতে পারে সেপাইরা, যদিও এখন চারদিকের ভেতর নসুই চলছে, আর সব যেন স্থির, আর নসুর সমস্ত চলাটা জুড়ে পাগলাঘন্টির ঢং ঢং ঢং ঢং যেই বেজে যায়, আর হাতের নাগালের ভেতর শত্রু না থাকলেও নসুর হাতের ছুরিটা বাতাসেই বিদ্ধ হয়ে হয়ে যায়, পারলে যেন নসু তার মাথাটা কাঁধের ভেতর ঢুকিয়ে নিত, কাঁধদুটো তার এমনই উঁচু হয়ে থাকে, জখম পাটা নসুকে পেছু টানে, যতোটা ছুটতে পারলে তার আত্ম বিশ্বাস আসত ততোটা সে ছুটতে পারছে না, মাত্র এই চল্লিশ ফুট রাস্তা পেরতে এত সময় লাগছে কেন নসুর, ওদিকে যে বিমলবাবুরা অপেক্ষা করে, কখন মই খাড়া উঠবে, তারপর মই বেয়ে তারা ওপরে উঠবে, দেয়ালে, তারপর ঝপ ঝপ, কতগুলো ঝপ ঝপ, লাফিয়ে পড়ার শব্দ তখন শুনতে পেয়েছিল নসু, দুটো না চারটে, মনে হয়েছিল যেন অসংখ্য, টুবলাকে লাফিয়ে পড়তে সে দেখেছে, এক টুবলাকেই সে দেখেছে লাফিয়ে পড়তে, আর কাউকে দেখে নি, আবার এখন মইটার মাথা খুলে দিলে যারা মই বেয়ে উপরে উঠবে, দেয়ালে, তারপর দেয়াল থেকে ঝাঁপাবে তাদের কি চিনতে বা গুনতে পারবে নসু, চিনবে কি গুনবে কি, এক অ্যাকশনে, যে অ্যাকশন তার নয়, নসু টিউবওয়েলের মাথায়

পৌঁছে যায়, বাঁ হাত দিয়ে সে মইটা টেনে তোলার চেষ্টা করে, পারে না, হ্যাণ্ডেলে আটকে যায়, ছুরিধরা ডান হাতটা দিয়ে চেষ্টা করে, পারে না, তখন ছুরিটাকে দাঁতে চেপে ধরে দুই হাতে মইটাকে টেনে তুলতে গেলে, দেয়ালের আড়াল থেকে সেপাইটি যান্ত্রিক এসে বাতাসে শিষ তুলে লাঠিটিকে নামিয়ে আনে নসুর মাথার ওপর, নসু মাথা সরিয়ে নেয়, লাঠিটি পড়ে তার বাঁ কাঁধের ওপর, আর নসুকে ছুটে গিয়ে সেপাইটির তলপেটে ছুরি বসিয়ে দিতে হয়, যেন এটুকু করতেই তার এতোদূর আসা, সেপাইটি পুরনো কোনো অভ্যস্ত ভঙ্গিতে নসুর পায়ের কাছে পড়ে যায়, নসু গিয়ে পেটে ছোরা চেপে, সে ছোরায় নসু রক্তের, নররক্তের স্বাদ পেয়েছিল, দুই হাতে ঝাঁকিয়ে মইটাকে টিউবওয়েলের মাথাটা থেকে খুলে মাটিতে ফেলে দেয়, আর দেখে বিমল-বাবুরা মইটা টেনে নিচ্ছেন, মইটা দেয়ালের গায়ে খাড়া দাঁড়িয়ে গেলে আর মই বেয়ে পর পর একজন দুজন তিনজন বা কজন, নসু জানেনা কারণ এ-অ্যাকশন নসুর নয়, পর পর উঠে গেলে, নসু তখন ফিরতি পথের মাঝামাঝি জায়গায় ছুটছে, নসু তার সম্পূর্ণ মুক্ত পেছন দিকে একটা প্রতীক্ষিত যুক্তিযুক্ত শব্দ যেন শুনতে পায়, আর তারপরই নসুর মাথায় বেশ খানিকটা উপর দিয়ে বাতাস গুলিবিদ্ধ হয় আর নসু মাটিতে শুয়ে পড়ে দেখে মইয়ের প্রায় মাথা থেকে গুলিবিদ্ধ পাখির মতো কেউ বাতাস জুড়ে পড়ে যাচ্ছে, আর নসুর দুপাশ দিয়ে, নসুকে মাড়িয়ে, নসুর ওপর দিয়ে প্রতীক্ষিত যুক্তিসিদ্ধ পদক্ষেপ সবুট ছুটে যেতে থাকে, পাগলাঘণ্টি ঢং ঢং ঢং ঢং বেজে যায় এই সমবেত পদক্ষেপ জুড়ে, নসু বুকে হেঁটে এগোতে থাকে, মাত্র এক মিনিট বা তার কম সময় আগে এখানে একটা মই ছিল, এখন নেই, নসুর সহকর্মীরা পায়খানার ময়লা ছিটিয়ে রেয়ার অ্যাকশন করেছিল, সেই ময়লায় বুক পেট হাঁটু পা কপাল ঘষে ঘষে ঘষে নসু এগোচ্ছে, তার বাঁদিকে তখন অস্ত-আকাশের লালিমায় একটি নিঃসঙ্গ ভলিনেট জালি কাটছে ; নসু তার ওয়ার্ডের দরজার কাছে গেলে তিন-চারটি বুটজুতো তাকে এক লাথিতে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় ।

সন্ধ্যা উতরে গেলেও প্রথামতো লকআপ হয় না। অনেকক্ষণ আগেই কয়েদীদের ভেতরে ঢুকিয়ে তালা আটকে দেয়া হয়েছে। গণতি হয় নি। রাতের খাবার দেয়া হয়নি।

চার নম্বরে, নসুদের ওয়ার্ডে, ভেতরে বিছানায় মাত্র দু-একজন গেছে।

ব্যারিকেড তৈরির জন্য খাট টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় সমস্ত ঘরটা তছনছ হয়েছিল। দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরের দিকে নসু একবার তাকালে, সমস্তটা অপরিচিত ঠেকেছিল, কারণ ঘরের ভেতরের এ-অবস্থাটা তার সামনে ঘটে নি। কয়েকটা চৌকি কাত করা—সেগুলোর জায়গাতেই। আর কয়েকটা চৌকি কাত করা পড়ে আছে দরজা দিয়ে বের করে নেবার পথের এদিকে ওদিকে। এল্যুমিনিয়মের থালাকানা একটা ছোরা মেঝের ওপর ওপর পড়ে—গোপন জায়গা থেকে ওগুলো নিয়ে যাবার সময় ছিটকে পড়ে গেছে, হয়তো। যে-চৌকিগুলো বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বা হচ্ছিল, সে-গুলোর বিছানার চাদর, বালিশ, সতরঞ্চি, তোষক ঘরময় ছড়িয়ে। একটা বালিশ ওয়ার্ডের দরজার ওপরে পড়েছিল, যাতায়াতের সময়ও কেউ সেটা সরিয়ে দেয় নি। ঘরময় ছড়ানো এই চাদর, বালিশ, তোষকের ওপর দিয়েই সবাই যাতায়াত করে। কারা ওয়ার্ডে এসেছে, নসু খুব হিসেব কষে দেখে নি। কাদের কথাবার্তা থেকে নানারকম খবর তার কানে এসেছে, 'এগারজন এসকেপ করেছে,' 'তিনজন এসকেপ করেছে,' 'আচ্ছা কে কে কাকে কাকে দেখেছ হিসেব কষো' 'ও-সব হিসেব বাদ দাও' 'আমাদের কি কোনো ক্যাজুয়ালটি হয়েছে' 'আমাদের ক্যাজুয়ালটি হয়েছে' নসদাকে তো আমি নিজে দেখেছি রাইফেলের গুলি খেয়ে পড়ে যেতে' 'নসুদার বডিটা নিয়ে এলে হত, নইলে···' 'ডেসট্রয় করে ফেলবে, বলু এসকেপ করেছে,' 'তাই নাকি'—যেন, নসুকে ক্যাজুয়ালটি ভেবে যুদ্ধটা অনেক বেশি জমকালো হচ্ছে। 'পুলিস ক্যাজুয়ালটি কতোজন' 'পাঁচ-সাতজন বটেই' 'সবগুলোই ফাটাল'? 'নিশ্চয়ই'। 'কিন্তু আমাদের যারা ঘরে ফেরে নি?' 'তারা এসকেপ করেছে নিশ্চয়ই।' 'যদি না করে থাকে?' 'তাহলে ক্যাজুয়ালটি! ক রাউণ্ড গুলি ছুঁড়েছে, দেখো শেষ পর্যন্ত কতো ক্যাজুয়ালটি বেরয়' 'আমি তো প্রথমটা বুঝতেই পারছিলাম না, ওরা ফায়ার করছিল না কেন' 'বললেই তো আর ফায়ার করা যায় না, তারপর যদি এসকেপ-কেস প্রমাণ করতে না পারে' 'ও-সব বাদ দাও, পুলিশের হাতে রাইফেল থাকলে, ওরা আবার প্রমাণের অপেক্ষা করবে?' 'অ্যাসেম্বলি-পার্লামেন্টে প্রশ্ন উঠতে পারে' 'চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা, কয়েকটা লম্বা চওড়া বক্তৃতায় কি এসে যায়, পুলিশের' 'তাহলে ওরা ঠিক তৈরি হতে পারে নি বা অ্যাসেস করতে পারে নি' 'হ্যাঁ সেটাও হতে পারে, কিন্তু এর আগের সবগুলো এসকেপ অ্যাকশনের প্ল্যান

ওরা আগে থাকতে জানতে পারল আর এইটিই পারল না ? 'এ-কেমন করে হবে ?' 'এবার হয়তো প্ল্যানটা খুব ভালো করে ছকা হয়েছিল, আর গ্রুপটাও হয়তো ছোট ছিল, বা হয়তো প্ল্যানটা আজই মাত্র মিনিট পনর আগে বা আধঘন্টা আগে হয়েছে, তাই কেউ টের পায় নি' ' বা হয়তো খেলতে খেলতে চোখের ইশারায় প্ল্যানটা হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন, ফলে আমরা যেমন টের পাই নি, পুলিশও তেমনি টের পায় নি' 'অ্যাকশন করতে হলে এই রকম একেবারে হঠাৎ অ্যাকশনই করতে হয়, তাহলে সাকসেসের সম্ভাবনা বেশি থাকে' 'একেবারে প্রস্তুতি ছাড়া অ্যাকশন তো ফেইলও করতে পারে' 'কখনোই নয়, যদি তুমি ঠিক বুঝতে পারো জনতা কি চাইছে', 'জনতা নিজেই হয়তো সেটা জানে না'.'বিপ্লবীর কাজ সেটা বোঝা ও লীড করা', 'চেয়ারম্যান বলেছেন জলের ভেতর মাছের মতন, তাহলে তোমার অ্যাকশন শুরু হওয়া মাত্র জনতা সেটা টেক্-আপ করবে' 'আজকের অ্যাকশনটা লীড করল কে' 'ফার্স্ট' সিগন্যালটা কে দিল সেটাই বুঝতে পারলাম না', 'একটা চীৎকার শুনে তাকিয়ে দেখি জয়ের হাতে মই আর নসুদা সেটা টেনে তুলছে' 'নসুদা মই টেনে তোলে নি, নসুদা ব্যারিকেডের অর্ডার দিয়েছে' 'হ্যাঁ, নসুদা ব্যারিকেডের অর্ডার দিয়েছে' 'তাহলে নসুদারই প্ল্যান বোধ হয়, যে-রকম সুইফট-অ্যাকশন, তাই তো মনে হয়.' 'এই গবেষণা-গুলো বাদ দিলে হয় না ? যতো পেটিবুর্জোয়া সেন্টিমেন্ট। অ্যাকশনটাই বড় কথা। কার অ্যাকশন তা দিয়ে কি হবে' 'আমরা জিতলাম না হারলাম' 'আমাদের সবসময়ই জিত'।

আলো তীব্র এসে পড়ে ঘরের ভেতর। আলোটা একটা মোটা ধারায় ঘরের প্রায় অর্ধেকটা পর্যন্ত যায়, নসু সেই ধারার নিচে পড়ে যায়, নসুর কোথাও আলো লাগে না, কিন্তু আলোর ছটাতে সেও আভাসিত হয়। নসু তাকিয়ে থাকে মাত্র, একটুও নড়াচড়া করে না। এ-সবই তার জানা, অত্যন্ত বেশি জানা। হাত-পা চালাবার অভ্যেসে এসে যায় যে-প্রথা, অর্থবোধহীন মন্ত্রোচ্চারণে এসে যায় যে-প্রথা, তা অনুসরণ করতে যেমন মনের কোনো উদ্যম দরকার হয় না বা শরীরের কোনো উদ্যোগ, তেমনি এখন নসুর শারীরিক-মানসিক উদ্যম-উদ্যোগ নেই। ঐ কথাগুলো হয়ে যাবার পরই এমনি আলো এসে পড়ে আর এই আলোতে সমস্ত কথা বন্ধ হয়ে যায়। নসু জানে না অ্যাকশনটা কার। ইচ্ছে করলে জানতে পারত, হয়তো। হয়তো টুবলা,

জয় আর ভোম্বলের, হয়তো নসুকেও ওরা প্ল্যানে নিতে চাইছিল, নসু কেটে গেল। হয়তো আর কেউও ছিল। নসু শুধু জানে সে অ্যাকশনটার কোথাও ছিল না, এক মুহূর্তের জন্যও ছিল না। কার্তিকের সার্ভিসটা ফেরত পাঠাবার জন্য লাফ দিয়ে উঠে বাতাসে সে টুবলার সিগন্যাল শুনতে পেয়েছিল। তারপর মাটিতে পড়ে গিয়ে তার তো আর কিছু করার ছিল না, ছুটে যাওয়া ছাড়া। নসু মই খাড়া তুলে দিলেও মইয়ে পা দেয় নি, কিন্তু সে বোধহয় প্রথমেই চলে যেতে পারত। তার পক্ষে চলে যাওয়াটা সবদিক থেকেই ঠিক হত। এতগুলো কেস আর কার মাথায় ঝুলছে। বাইরে গিয়ে অ্যাকশন সংগঠিত করতে তার মতো আর কে পারবে। বিমলবাবু জোর করে তাকে মইয়ে তুলে দিলেন। তারপর গোড়ালিতে ব্যথা। সেই ব্যথা নিয়ে তাকে ছুটে যেতে হয়েছিল দুপাশে ও সামনে পিছনে খোলা যুদ্ধক্ষেত্রে। খোঁড়া গোড়ালি নিয়েও আর কিছু করার ছিল না নসুর। এখন, খোঁড়া গোড়ালি নিয়ে এইখানে চৌকাঠে পড়ে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই নসুর, এখন, যখন আলো মোটা ধারায় ঘরময় ভাসতে থাকবে, খাড়া চৌকিগুলোর জন্য আলোটা যখন নানা জায়গায় প্রতিহত হবে, খাড়া চৌকির দেয়ালজোড়া ছায়াগুলো চক্রান্তের মতো মনে হবে।

সেই আলোর ধারার দিকে তাকিয়ে থাকে নসু, পুলিশ ফিরে গেছে? এস. পি., ডি. আই. জি. সাহেবরা কি চলে গিয়েছেন? তলায় কুণ্ডলিত রক্তাক্ত ইউনিফর্ম সহ মইটার ছবি কি তোলা হয়ে গেছে, পুলিশের ও বিশেষ সংবাদ-দাতার? যার পেটে নসুকেছোরা মারতে হয়েছিল, তার ছবিও কি তোলা হয়েছে? এরা কি মারা গেছে? নিহত, দুইজন পুলিশ—এটা ভালো খবর, কিন্তু নিহত যদি না হয়ে থাকে, তা হলে আহতের সংখ্যা নিশ্চয়ই বাড়বে? পলাতক আসামীর সংখ্যাও নিশ্চয়ই বাড়বে? তারপর তাদের একে একে পাওয়া যেতে থাকবে, বেশির ভাগটাই আজকালের ভেতর? দু-চারজনকে শুধু দু-চার বছর জুড়ে ফিরে পাওয়া যেতে থাকবে, শেষ পর্যন্ত দু-একজনকে যে কোনোদিনই পাওয়া যাবে না—এই হিসেবটা ঠিক রাখতে? স্থানীয় সংবাদ কি পড়া হয়ে গেছে? নিশ্চয়ই আজকের প্রথম সংবাদ? মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই তাঁর বিবৃতি দিয়ে ফেলেছেন। নসু দেখতে পায়, আকবর মুখ মোছার জন্য দুই হাত মুখের কাছে তোলে তারপর ওয়াক দিয়ে বমি শুরু করে। ওর হাতময় তো পায়খানার ময়লা।

ঝনঝন শব্দে দরজা খুলে যায়, আলো নিবে যায়। এতো উজ্জ্বল আলোর এতো হঠাৎ নিবে যাওয়ায় চোখ ধাঁধায়। আর সেই ধাঁধার ওপর দিয়ে সিমেন্টের ওপর লোহার নালের শব্দের ঝড় ওঠে। পুলিশগুলো ঘরের ভেতর লাফিয়ে ঢোকার সময় নসুর গায়ে বুটের ধাক্কা লাগতে থাকলে, নসু আস্তে তার কাঁধটা সরিয়ে নেয়। তারপর সবুট পাগুলির ছুটে যাওয়ার বাতাস গায়ে লাগাতে লাগাতে নসু ভাবে, এখন কি এই আঁধারে এতগুলো রাইফেলধারী পুলিশের সঙ্গে অ্যাকশন শুরু হবে? শুরু হলে হোক। নসু শুয়ে থেকেও একটু প্রস্তুতি নেয়। শুরু না হলে না হোক। প্রস্তুতি নিয়েও নসু শুয়ে থাকে। ওরা কি অন্ধকারে বেয়নেট চার্জ করছে, তা হলে তো ওদের নিজেদের গায়েই সেটা লেগে যেতে পারে। সিমেন্টের ওপর বুটের ছুটে যাওয়া ছাড়া কোনো আওয়াজ নেই। তা হলে পুলিশ এখন পজিশন নিচ্ছে। এরপর পুলিশ অ্যাকশন করবে। কিন্তু ওরা কতোজন আসছে, কতো, মাত্র এই আঠার জন জন আসামীর থাকার মতো ঘরে। ঐ টুকু ঘরে এতগুলো লোহার নালের আওয়াজের ঝড় নসুকে যেন অবশ করে দেয়। সেই আওয়াজে, সেই লোহার নালের মানুষগুলির দ্রুত ঘন নিশ্বাসে নসু যেন এই জেলখানার বইরে পৃথিবীর সংবাদ পায়—যেন সেই লোহার নালে নানা দেশের ধুলো আছে। সেই বাইরের পৃথিবীতে এখন জ্যোৎস্নায় নির্জন রাস্তা, কারণ আজকাল আকাশে চাঁদ থাকছে। সেই বাইরের পৃথিবীতে তাদের লড়াই চলছিল। খোলা মাঠ-ফাঁকা রাস্তা পেরিয়ে পেরিয়ে তারা অলিগলির ভেতরে, ঘরগেরস্থালির ভেতরে লড়াই ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছিল। 'বিপ্লবীর সদাসতর্ক দৃষ্টি থেকে দালাল আর প্রতিবিপ্লবীদের কোথাও পরিত্রাণ নেই' যতো নিরাপত্তার ব্যবস্থা, আক্রমণ ততো চতুর। নসুরা ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। তারা নসুদের আশ্রয় দিত, খেতে দিত, লুকিয়ে রাখত, খবর দিত, অথচ নসুরা যখন কোনো বাড়িতে আশ্রয় নিত, তখন বাড়ির লোকরাই নিজ বাড়িতে রাত কাটাত দিন কাটাত যেন নসুদের আশ্রিত, নসুদের হাতে বন্দী। কেউ হয়তো সরকারি অফিসে চাকরি করে, ঘুষ পায়, নেয়। কেউ হয়তো চাকরির ওপরও পার্টটাইম, ওভারটাইম পায়। কেউ হয়তো ডাক্তারি ওকালতি করে। কারো হয়তো গোপন সুদি কারবার। কেউ হয়তো পাটের দালাল। ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল, নসুরা। তাদের জন্য ঘরে ঘরে আশ্রয়। ঘরে ঘরেই তাদের শত্রু। তাদের লড়াইকে কেউ নিজের

লড়াই ভাবে নি। প্রত্যেকেই ভেবেছে নসুদের অস্ত্র তার বিরুদ্ধে তোলা। কারণ প্রত্যেকেরই পেটে লুটের চালের ভাত, প্রত্যেকেরই গায়ে লুটের রক্ত। নসু মিস্তির পাঁচ-পাঁচটা খতম অ্যাকশন লীড করেছে—একজন সাব-ইনপেক্টর সহ, তিনটি আর্মস ছেনতাই অ্যাকশন লীড করেছে—একটা সি. আর. পি. সহ। কিন্তু এতো খতমটতম করেও নসু মিস্তির সেই চৌহদ্দিটাই পেরতে পারল না যার বাইরে সেই মানুষজন থাকে, যারা নসুদের লড়াইটাকে নিজেদের লড়াই ভাবে। উচ্ছিষ্ট খেয়ে বাঁচে এমনি কতকগুলো উকিল-ডাক্তার-মাস্টার-দোকানদার-দালাল খতম করতে করতেই নসুরা এসে এখানে, এই জেলখানায়, আটকা পড়েছে। আর এই জেলখানায় প্রাচীরের পর প্রাচীর, ঘরের ভেতর ঘরের ভেতর ঘর, গরাদের ভেতর গরাদের ভেতর গরাদ। এখানে তাদের ঢুকিয়ে দিয়ে সেই বাইরের দুনিয়াটা পায়ের তলায় লোহার নাল লাগিয়ে, হাতে লোহার ফলা বাগিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঝড়ের বেগে ঘরের ভেতর ঢুকছে। নসুরা এখন ঘরের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে। কিন্তু নসুরা কি কোনোদিনই বাইরে বেরিয়েছিল, কোনোদিনই ?

এখন, যে-কোনো মুহূর্তে অ্যাকশন শুরু হতে পারে, তাই নসুর শরীরে একটা ক্ষিপ্রতা এসেছিল। ভেতরে ঘরের দুই সীমানা থেকে দুটো শিকারী টর্চলাইট মাঝে মাঝে জ্বলছে আর নিবছে। তারপর হিন্দিতে প্রথম খিস্তিটা শোনার পর নসু আবার গা ভলিয়ে দেয়, এই সিমেন্টের ওপরই, দরজার পাশে দেয়ালের এই খাঁজটাতে, লাথি মেরে ঘরের ভেতর তাকে ফেলে দেয়ার পর সে যেখানে আটকে গিয়েছিল। অ্যাকশন হল না। এখন সার্চ শুরু হল। অবশ্য অ্যাকশন বলতে তো এখন হাতাহাতি, পুলিশের টুঁটি টিপে ধরা যাতে রাইফেল বা বেয়নেট চালাতে না পারে। যদি কেউ তেমন একটা অ্যাকশন করতে পারত, তাহলে হয় এই সবগুলো পুলিস কুত্তার মতো পালাত আর নয়তো দেদার গুলি ছুঁড়ে নিজেদের গুলিতে নিজেরাই মরত, নসুদেরও মারত—এমন নিশ্চিত বিশ্বাসে নসু কথাগুলো ভাবতে পারে যে তার ঠোঁটে হাসির রেখা তৈরি হয়। এমন ডরপোক, মাত্র আঠারটা আসামী তো থাকে এই ঘরে, তার ভেতর কজন খুন হয়ে গেছে আর কজন পালিয়েছে কে জানে। এখন বড় জোর ডজনখানেক আছে, সেই ডজনখানেক আসামীকে সার্চ করতে কমপক্ষে পঞ্চাশ জন আর্মড পুলিস, ঘর অন্ধকার করে নেয়া, মাঝে মাঝে টর্চ

জ্বালা! সে যে এখানে আছে তা কেউ টের পায় নি, সে এখন ইচ্ছে করলে পা টিপে টিপে গিয়ে পেছন থেকে দরজার পুলিশটার গলা টিপে ধরতে পারে, হ্যাঁ, এই ঘরের ভেতরও নসুরা পরাক্রান্ত—প্রমাণ হয়ে যাবে, আতঙ্কে গুলি চলবে, গুলিতে তারাও মারা যাবে, মারা গেলে তাদের মনোবল বাড়বে আর পুলিশের মনোবল একেবারে ভেঙে যাবে—একটা অ্যাকশনের পক্ষে সমস্ত যুক্তি একের পর এক অনায়াসে এসে যেতে থাকে আর নসুর সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎশিহরণ এসে এসে চলে যায়, নসু চোখ বুজে ফেলে—নইলে সে দেখে ফেলবে তার হাতের আওতার ভেতর কোন গলাটা, দুই হাতে নসু মুঠো পাকায় —নইলে তার আঙুলগুলো দুর্দমনীয় হয়ে উঠতে পারে। না, আমার কোনো অ্যাকশন নেই, না, আমার কোনো লড়াই নেই, না—দু হাতের পাতায় নসু মুখ ঢাকে। নাকে ঘাসের গন্ধ আসে, দুর্গন্ধও, তখন বুকে হেঁটেছিল।

"সালে, হাত তুলো উপরমে", টর্চের আলোয় খাড়া করা খাটের ছায়াগুলো দেয়াল জুড়ে পড়ে। এক পুলিশ একটা খাড়া খাটের ওপরে লাথি মারে, ফলে খাটটা সরে যায়। পুলিশটা আবার লাথি মারে, খাটটা আবার একটু সরে যায়। আর একটা পুলিশ খাটটার আর একদিকে লাথি মারে, তাতেও খাটটা সোজা হয় না। তখন নেহাত বাধ্য হয়েই দুজন বাঁ হাতে খাটের কোণাটা ধরে, পা দিয়ে খাটটা যাতে না সরে তেমনিভাবে চাপ দিয়ে খাটটা সোজা করে দেয়। খাটটাকে অমন খাড়া দেখে হয়তো ওদের ভয় ধরেছিল। ঐটুকু একটা খাটের আড়াল আর কি কাজে ব্যবহৃত হতে পারে, তবু ভয় তো কোনো যুক্তি মেনে চলে না। তারপর এই ঘরের ভেতর শেষ পর্যন্ত ডান হাতে রাইফেল পাশে চেপে ধরে বাঁ হাত লাগিয়ে খাটটা যে সোজা করতে হল, যেন, সেটা বড় বেশি অপমানজনক। তাই সেই পুলিশ দুটি সামনের ছেলেটিকে হুকুম করে, "এই সালে সিধা কর।"

আসলে, এই পুলিস দুটি সমস্ত কাজটাতে একটা শৃঙ্খলা আনে। একটি শিকারী টর্চের আড়াল থেকে আদেশ আসে, প্রত্যেককে তাদের খাট ঠিক ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, বিছানা ঠিক করতে হবে, তারপর বিছানার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দুহাত ওপরে তুলে দাঁড়াতে হবে। আর দুই সারি খাটের মাঝখানের ফাঁকটাতে দুদিকে রাইফেল বাগিয়ে পেছনে পেছন লাগানো প্রায় গায়ে গা লাগানো পুলিশ। কয়েক মিনিটের ভেতর সমস্ত ঘরে একটা শৃঙ্খলা এসে যায়। কয়েকটা খাট অগোছালো থেকে যায়—তাদের মালিক

নেই। শিকারী টর্চটা সেই খাটগুলো গুণে গুণে যায়, পাঁচ। তার মানে পাঁচজন হয় এসকেপ, না হয় ক্যাজুয়ালটি। না, আমি এসকেপও নই, ক্যাজুয়ালটিও নই, আমি এখানে, আমি নসু মিস্ত্রির।

হাসপাতালে সগুমৃতের বেডের মতো সারি সারি শূন্য শয্যা, দেয়ালে গা লাগানো দুই হাত ওপরে তোলা সারিবদ্ধ মানুষ, উদ্যত রাইফেলে সারিবদ্ধ পুলিশ—এই সম্পূর্ণ স্থিরতায় দুটো টর্চ শূয়োরের মতো অন্ধকার খুঁড়ে খুঁড়ে যায়, অন্ধকার থেকে উপড়ে আনে বিছানার ডোরাকাটা চাদর, পাজামা, ইনল্যাণ্ডের চিঠি, ওষুধের ছোট শিশি, সিগারেটের খালি প্যাকেট।

পুলিশরা বেরিয়ে যাওয়ার সময় খুব ধীরভাবেই বেরয়। দরজায় একটা টর্চ ভেতরে, আর একটা টর্চ বাইরে আলো দেখায়। ভেতরের টর্চটা আবার মাঝে মধ্যে দেয়াল দুটো দেখে নেয়, ওপরে তোলা সারিবদ্ধ হাত নড়ছে কিনা। বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার পথে লোহার নালে যেন খানিকটা ছন্দও আসে, যেন, এখন আর কোনো ব্যস্ততা নেই, যেন জানা হয়ে গেছে এদের আর কোনো অস্ত্র গোপন নেই। কিন্তু আমার কব্জি, আমার হাতের আঙুল? নসুর মনে অবধারিত পাল্টা আসে।

এখন এরা আমাদের ভেতর থেকে দু একজনকে নিয়ে চলে যাবে, এখনো যখন গণতি করল না, তখন এদের হিসেবনিকেশ মিটিয়ে কাল সকালে হিসেব খাতাপত্রে মেলাবে, হিসেব মেলানোয় এত বড় সুবিধে যখন হাতে—যাকেই পাওয়া যাবে ন তাকেই এসকেপ করেছে বলে যখন ঘোষণা করা যায়, তাহলে কি ওরা নাম ধরে ডাকবে না, নাকি যাদের পাবে—তাদেরই নিয়ে যাবে, আমি কি সেজন্যই এখানে বসে আছি, আমাকে দেখতে পায় নি, আমাকে দেখতে পাবে না বলে?

ভেতরের দিকে টর্চটা ফেলে রেখেই লোকটা পিছু হঠে চৌকাঠ পেরয়, দরজা পেরয়, টর্চের আলোতে দেয়ালে উত্তোলিত হাতের সারি, তখনো, তারপর গরাদদেয়া দরজা ধাতব শব্দে বন্ধ হয় আর গরাদের ফাঁক দিয়ে টর্চের আলো দেয়ালের খাঁজে আটকানো নসুকেই শুধু আলোকিত করে রাখে, তখন থেকে আমি তো শুধু এই জন্যই অপেক্ষায়, নাম ধরে যাতে ডাকতে না হয়, আমাকে শুধু আমাকেই যাতে সবটুকু আলোভরে দেখা যায়।

গরাদের ওপাশ থেকে ফেলা টর্চের আলোয় শরীরময় গরাদের অতিকায় ছায়া নিয়ে নসু উঠে দাঁড়ায়, ধাতব শব্দে তার শরীরের ওপর থেকে গরাদের

ছায়া সরে যায়, একটা হ্যাঁচকা টানে নসু বাইরে ছিটকে পড়ে, জ্যোৎস্নায়, ভলিকোর্টের সীমানায়। অলৌকিক নেটে জ্যোৎস্নায় জালিকাটা। ঐ গরাদের ওপারে নসু মৃত ঘোষিত। এখন, রাইফেলের পাহারায়, নসু জানে না, নিজের ছায়ার ওপর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোন লড়াই, কার লড়াই সে লড়তে চলেছে।

এখন নসুর দুই হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি—কারণ পায়ে বাঁধা-শেকলকে হাতকড়া বলা উচিত নয় আর পা-কড়া কথাটার চল নেই। কিন্তু আসলে নসুর হাতেও যা, পায়েও তাই। নসুর অভিজ্ঞতায় দুটোই হাতকড়া। নসু শুনেছে হাতে পায়ে ডাণ্ডা বেড়ি দিয়ে রাখা হয়, সেক্ষেত্রে পায়ে অশ্বধরণের শেকল থাকার কথা ও হাত-পায়ের দুটো কড়াকে যুক্ত করে একটা ডাণ্ডা থাকার কথা। নসু শুনেছে দমদমে আর প্রেসিডেন্সিতে এ-রকম ডাণ্ডাবেড়ি দিয়ে কাউকে কাউকে রাখা হয়েছে। আর এক হতে পারে, দেয়ালের দুই কড়ার সঙ্গে দুই হাত দুই দিকে টেনে নিয়ে হাতকড়া লাগানো। আর একই ভাবে দুই পা দুই দিকে টেনে দেয়ালের দুদিকের কড়ার সঙ্গে লাগানো। নসু শুনেছে, দেওঘরে বা পাটনা জেলে আর অনে কাউকে কাউকে, উচ্চতম নেতৃত্বের কাউকে কাউকে, এ-রকম করে রাখা হয়েছে। নসুকে যখন এই সেকল্যুসন সেলে আনা হলো, নসু এই দুই রকম ব্যবস্থার কথাই ভাবছিল। নসু ভাবছিল এখন এটাই তার করণীয়, এই সেকল্যুসন সেলে দিন কাটানো। কিন্তু তাকে এই হাতে বেড়ি, পায়ে বেড়ি করে এখানে রেখে দিয়ে যাওয়া হলো। পায়ের বেড়িটা পায়ে খুব লাগছে, খুবই লাগছে, পা আর একটু মোটা হলে তো আটকাতই না। ডান পায়ের গোড়ালিটা নিশ্চয়ই ফুলেছে। রা'ফেলে ঘেরা নসু যখন এই সেলের দিকে আসছিল, তখন সে হাঁটতে পারছিল না, গোড়ালিতে এত ব্যথা, ফলে পেছনে একবার লাথি পড়ায় নসু নিজের ছায়ার ওপর হুমকি খেয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখন গোড়ালির সেই ব্যথা বোধে আসে না। এখনকার সব ব্যথাটাই যেন পায়ে হাতকড়া লাগানো হয়েছে বলে। নইলে, নসুর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, তেমন কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, তাদের ওয়ার্ডেও তো সে আসলে একা একাই ছিল, সেই ঘুম থেকে ওঠার পর জয়, ভোম্বল আর টুবলার ওপর থেকে সে কেমন চোখ সরিয়ে চোখ বুঁজেছিল,, তারপর খেলা, আসলে তো ওদের কাছ থেকে কাটার জন্যই খেলা, তারপর তাকে লাথি মেরে ওয়ার্ডের ভেতর যে জায়গায় ফেলে

দিয়েছিল—প্রায় সেখানেই পড়ে ছিল, যতোক্ষণ না তাকে তুলে নিয়ে এল। এখন, এখানে বসে থাকতে থাকতে নসুর কেবল এই কথাটাই মনে হতে থাকে কেন, তাকে হাতে পায়ে যে সেপাই হাতকড়ি পরাল, সে ভুল করে দুটোই হাতকড়া নিয়ে এসেছে, নাকি এদের পায়ে বাঁধার শেকল নেই-ই।—এই সমস্যাটির সমাধান করাই যেন এই মুহূর্তে নসুর সবচেয়ে বড় কাজ।

বাইরে জ্যোৎস্না, তাই নসুর এই সেলের ভেতরের অন্ধকার অস্পষ্ট। নসুকে যখন এখানে ঢোকানো হল, তখন টর্চের আলোতে সে দেখবার চেষ্টা করেছিল, খুব একটা বুঝে উঠতে পারে নি। মাঠ পেরিয়ে, দু-নম্বরের পেছন দিয়ে, পুরো দু নম্বরটি ডান হাতিতে রেখে আবার ডান দিকে বেঁকে একটা গরাদের সামনে তাকে আনা হল। নসু ভেবেছিল, গরাদ খুলে তাকে ঢুকিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু গরাদ খুলে টর্চ লাইট জ্বেলে চারজন আর্মড পুলিস এক সেপাইকে নিয়ে আগে ঢুকল। বাইরে মাঠে দাঁড়িয়ে আরো একটা গরাদ খোলার শব্দ পেয়েছিল। ভেতরের সেপাইয়ের গলায় একটা চিৎকারের মতো শোনা গেলে এরা নসুকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। টর্চের আলোতে নসু দেখেছিল সেলের ভেতরে গরাদের দিকে রাইফেলে উচিয়ে দুই পুলিশ, আর গরাদে রাইফেলের নল ফেলে দুই পুলিশ। এই চার পুলিশের মাঝখানে সেপাইটা হাতে পায়ে হাতকড়া লাগাতে কী রকম অস্বস্তিবোধ করছিল যেন। বিশেষত যখন লোকটা উবু হয়ে বসে নিচু হয়ে পায়ে চাবি লাগাচ্ছিল আর নসু মাথা নসুয়ে দেখছিল। ছোটবেলায় জুতো কেনার সময় ছাড়া নসু নিজের পায়ের কাছে এতো দীর্ঘ নত কাউকে দেখে নি। লোকটির নার্ভাসনেসের জন্যই এখন নসুর মনে হচ্ছে, লোকটি ভুল করে হাতকড়াই পায়ে পরিয়েছে। পায়ের চাবিটা লাগাতে লোকটার একটু দেরি হয়েছিল। গরাদ দিয়ে ফেলা টর্চের আলোতে সেলের ভেতরে দাঁড়ানো পুলিশ দুটোকে ঘিরে নসুর আর নসুর পায়ের কাছে সেপাইটির অদ্ভুত ছায়া পড়েছিল। পায়ের চাবি লাগিয়ে সেপাইটি তড়াক করে উঠে বাইরে গেল, নসু অপেক্ষায় যে আরো কিছু আসবে; কিন্তু ভেতরের পুলিশ দুটোও বেরিয়ে যেতে নিলে নসু পেছনটা শক্ত করে দাঁড়ায় বেয়নেটের খোঁচা, রাইফেলের বাঁটের মার, নিদেন একটা লাথির অপেক্ষায়। কিন্তু নসুকে অপ্রস্তুত করে ওরা বেরিয়ে যায়। গরাদ বন্ধ করা, বিরাট চাবির গোছার নাড়াচাড়া ইত্যাদিতে বেশ কিছুক্ষণ ধাতব শব্দ উঠতে থাকে। টর্চের আলো আর রাইফেলের নিশান ছিল নসুর

ওপরে। তারপর সেপাইটি চলে যায়, হঠাৎ টর্চের আলো নেবা আর এক-সঙ্গে তিনজোড়া পায়ের ত্রস্ত প্রস্থান নসুকে কান পেতে শুনতে হয়, নসুর তো এখন হাতে পায়ে হাতকড়া, তবু ওরা ভয় পেল কেন। আর হাতে পায়ে হাতকড়া না থাকলেও নসু কিছু করত না, কারণ এখন তাকে চুপচাপ বসে থাকার কাজেই রেখে দিয়ে যাওয়া হল। হল যখন, তাই করবে নসু।

এখন নসু দেয়ালে হেলান দিয়ে, পা দুটো উচু করে, হাত দুটি কোলের ওপর রেখে। তার এই সেলটার সামনে গরাদের ওপারে একটুখানি বারান্দা-মতো, দেয়ালঘেরা। প্রথমে সামনের এই জায়গাটাতে ঢুকে ডান দিকে বেঁকে তার সেল। নসু ভেবেছিল, এর পরও বোধহয় আরো সেল আছে। কিন্তু পাশেই দেয়াল, সুতরাং সেল আর নেই, এক যদি ওপাশে থাকে। নসু গরাদ ঘেঁষে বসেছে। কেন। যদি ওদিকের গরাদ দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়, সেইজন্য কি এখনই, এই রাত থেকেই, মাত্র কয়েকঘণ্টার ভেতর, নসুর অপেক্ষা সুরু হয়ে গেছে।

অসংখ্য মশা নসুর মুখ কান নাক হাতের পাতা পায়ের পাতা ছেঁকে ধরে। পায়ের পাতা দুটো ঢেকে জোড়াসনে বসতে গিয়ে নসু বোঝে পারবে না, পায়ের গোড়ালি দুটো বাঁধা হয় শিকলে, সেটা অতটা ছড়ায় না। নসু দুই হাত দিয়ে পায়ের পাতা ঢাকতে চেষ্টা পায়, পারে না। তারপর হাঁটুটা থুতনির কাছে এনে হাত দুটো হাঁটু ঘিরে নাবিয়ে দিলে কোনোরকমে পায়ের পাতা পায়। মশাগুলো ভন ভন উড়ে গিয়ে আবার হাতের পাতায় এসে বসে, হাতটা একটু ঝাঁকালে উড়ে গিয়ে আবার একে একে বসে। হাঁটুর ওপর কপাল মুখ ঘষে নসুর মুখের মশা তাড়াতে পারে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই পেটে আর বুকে চাপ বোধ হয়, তখন নসু হাতটা বের করে আনে। পা টা পিছিয়ে একটু আয়েস ধরে নেয়। তারপর শরীরটা ডান দিকে একটু বেঁকিয়ে দুই হাতে গরাদ ধরে উঠে দাঁড়ায়। হাতটা মাথার ওপর তুলে গরাদের শিক ধরে নসু, গরাদের ফাঁকে মুখটা চেপে ধরে, লোহার শীতলতায় মশার জ্বালানিধরা জায়গাগুলোতে আরাম লাগে বুঝে, মুখটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লোহাতে ঠেকায়। তারপর নসু একটু হাঁটতে চেষ্টা করে—কিন্তু পায়ের কড়ার জন্য আধ-ইঞ্চি মতোও এগোতে পারে না। নিশ্চয়ই সেপাইটা ভুল করেছে। নসু দুই হাতে গরাদ ধরে নিজেকে উঁচু করে খানিকটা এগোয়। আবার উঁচু হয়ে খানিকটা এগোয়। বার পাঁচেক চেষ্টা করে

নসু বিপরীত দিকের দেয়ালের কাছে আসতে পারে। নসু সেইখানে বসে পড়ে।

সেই বিকেল থেকে এতো কিছুর পর, সামান্য এই পরিশ্রমেই নসু যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আর দেয়ালে হেলান দিয়ে, পা ছড়িয়ে সে এলিয়ে যায়, তার হাতে পায়ে মুখে মশার অজস্র কামড় সে আর বোধ করে না।

প্রথমে কানে আসে ঝন ঝন ঝন। তারপর নসু চোখে খোলে। সে যেন অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে। টর্চের আলো পড়েছে সামনের জায়গা টুকুতে। হকচকিয়ে নড়তেই হাতে পায়ে ব্যথা পায়। নসুর শরীরটা ঠিক করে, ধীরে ধীরে উঠে বসার সময়টুকু জুড়ে গরাদের ঠিক সামনে একটা বস্তামতো কিছু ফেলা হয়, বাইরের গরাদ বন্ধ করার সময়টুকুতে জ্বালানো টর্চের আলোতে নসু শুধু চাপ চাপ রক্ত দেখতে পেয়েছিল। টর্চের আলো নিবে যাওয়ার আগে নসু গরাদ ধরে উঠে দাঁড়ায়, গরাদে মুখ চেপে দেখবার চেষ্টা করে। বোঝে মেঝের ওপর বসে বসেই দেখার সুবিধে, যদি দেখা যায়। নসু বসে পড়ে, তারপরে গরাদে মুখ চেপে ধরে। কে। কে। কাকে খুন করে এখানে রেখে গেল। এ কি বেঁচে না মরে। একটুখানি আলোর জন্য হাঁফানি রোগীর মতো ছটফটিয়ে নসু দেখে, এখান থেকে সামনের যে গরাদটা সে দেখতে পাচ্ছে না, সেই গরাদ গলে একটা খুব মলিন আলো সামনের দেয়ালটার কোণায় লেগে আছে। আলোটা চাঁদের না প্রথম সূর্যের নসু বুঝতে পারে না। সে ঐ এক চিলতে মলিন আলোর দিকে নিমেষহীন চেয়ে থাকে। চেয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হয়, ওটা আলো নয়, দেয়ালের নোনার অথবা চটা ওঠার দাগ।

নসু তখন মেঝের ওপর শুয়ে পড়ে। তারপর দুই হাত গরাদের ফাঁক গলিয়ে বের করে সামনের লোকটাকে ধরতে চেষ্টা পায়। কিন্তু কনুইয়ের পর হাত এগোয় না। তখন নসু হাত ফিরিয়ে এনে কাত হয়ে পা দুটো বের করার চেষ্টা পায়। হাঁটু পর্যন্তও বেরতে পারে না। নসু পা গুটিয়ে এনে দেয়ালে হেলান দেয়। লোকটা কি বেঁচে আছে। কাকে ওরা মেরে রেখে গেল। একে কি গুম করতে চায়।

দেয়ালে হেলান দিয়ে নিজে নিশ্বাস বন্ধ করে নসু সামনের লোকটির নিশ্বাস শোনা যায় কিনা পরখ করে। কিন্তু কোনো শব্দ পাওয়া যায় না। একসময় নসুর মনে হয়, আসলে ওখানে কেউ নেই, তাকে ভয় দেখাবার জন্য রক্তে জোপানো জামা কাপড় হয়তো ফেলে রেখে গেছে। কিন্তু মশা ভন ভন করে

ওখান থেকে উড়ে এসে নসুর সেলের ভেতর ঢোকে আবার বেরিয়ে যায়। পারলে নসু মশার মুখের রক্ত দেখে জানতে চেষ্টা করত লোকটা বাঁচা কি মরা।

নসুর সহসাই মনে পড়ে যায়, লোকটি যদি বাঁচাই হবে, তাহলে তার এই সেকল্যাসন সেলে একে রেখে যাবে কেন। সামনের ঐ লোকটির কাছ থেকে ঠিক তখনই, যেন একটা আওয়াজ আসে, মৃদু একটা কোঁকানির মতো। তাহলে কি লোকটা বেঁচে আছে, জ্ঞান ফিরছে, নাকি মারা গেল, এই এখনই। এতোক্ষণে নসু জিজ্ঞাসা করে, "কে" "কে"। নসুর স্বাভাবিক স্বর সেই নির্জনতায় নসুর নিজের কাছেই ভৌতিক শোনায়। যেন আর কারো কণ্ঠস্বর শুনছে, এমনভাবে নসু আবারও জিজ্ঞাসা করে, "কে" "কে।"

পাঁচ-পাঁচটা মার্ডার অ্যাকশনের লীডার, আজকে একটা পুলিশ মেরেছে, নিশ্চয়ই মরেছে—হিটটা জুত মতোই হয়েছিল, ছ-ছটা মার্ডার অ্যাকশনের লীডার, নসু মিস্তির, মাত্র দেড় দুই হাতের তফাতে লোকটা মরা না জ্যান্ত বুঝতে পারে না। নসু মিস্তির তো দাঁড়িয়ে মরা দেখে নি বা কোনো মৃতদেহ দেখেনি। সে শুধু ছুটেছে, ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তারপর হাতে লোহা তুলে নিয়েছে —পাইপগান বা ছোরা, পরের দিকে শুধুই রিভলবার। তারপর আবার ছুটেছে শুধু ছুটেছে। ছুটতে ছুটতে নসু মিস্তির এখন এই সেলে। তার হাত দেড় দূরে তাদেরই দলের কেউ, "কে" "কে," জীবিত না মৃত, "কে" "কে"।

যেই হোক, নসু ডাকে, "কমরেড", যেন কমরেড-ডাকলে সাড়া না দেবার কোনো উপায় নেই। আবার খানিকক্ষণ পর ফিসফিস স্বরে নসু ডাকে, "কমরেড।" আবার খানিকক্ষণ পর নসু ফিসফিস স্বরে ডাকে, "কমরেড"। এরপর নসু দুই হাতের মাঝখানে হাঁটু ঢুকিয়ে চুপচাপ বসে থাকে, সামনের দিকে তাকিয়ে। কমরেড, এখনো নিশ্চয়ই সূর্য উঠে নি, তাহলে এর ভেতর আলো আরো স্পষ্ট হত। এটা নিশ্চয়ই চাঁদের আলো। পুলিশও ইচ্ছে করলে সূর্য ওঠা বন্ধ করতে পারবে না, তখন আমি জানতে পারব, সামনে কে, বাঁচা না মরা।

নসুকে তখন গরাদের সামনে ও-দিকের লোকটার মুখোমুখি বসে থাকতে হয়। হাত পায়ের বেড়ির জন্য নসুর বসার একটিই মাত্র ভঙ্গী হতে পারে, হাঁটু জোড়া করে থুতনির কাছে আনা, তারপর হাঁটুটা ভেতরে নিয়ে হাত দুটো দুপাশ থেকে নামিয়ে দেয়া। মশা আসে, অজস্র। মশার শব্দ পাখির কলরবের

মতো উচ্চকিত হতে পারে, তা নসু এই প্রথম বুঝছে। কপাল, নাক, গলা, ঘাড়, কানের ফুটো, পায়ের পাতা, হাতের পাতা সমস্ত জায়গায় অজস্র মশা অজস্র হুল ফুটিয়ে নসুর রক্ত শুষে নেয়। উপায়হীন নসুকে গত কয়েকঘণ্টার ভেতরই অবস্থাটা জেনে যেতে, মেনে নিতে হয়েছে।

গরাদের ওপারে আর একটি মানুষ থাকায় নসুর মনে হয়, তার এই বসে থাকাটা একটা অপেক্ষা হয়ে যায়, অপেক্ষা—সূর্য ওঠার, আলোর, যাতে সে চিনতে পারবে সামনের মানুষটি কে, যাতে সে জানতে পারবে, সামনের মানুষটি বেঁচে না মরে।

এ-ভাবে বসে থাকতে নসুর মেরুদণ্ডে ব্যথা লাগে, বিশেষত মেরুদণ্ড যেখানে শেষ হয় সেখানে টনটন করে, হাত দুটোও টনটনায়, তলপেটে আর বুকে চাপ বোধ হয়, ঘাড়টা খুব ভারি ঠেকে। কিন্তু এ-ভাবে ছাড়া নসুর বসে থাকার উপায় নেই। কারণ তার হাতে পায়ে বেড়ি। হয়তো সেপাই-টির ভুলের জন্য হাতের বেড়ি পায়েও লাগানো হয়েছে বলে পা ফাঁক করার জায়গাটা কয়েক ইঞ্চি, এক বা দুই বা পাঁচ, কমে গেছে। কম না হলে হয়তো নসু আরো একরকম ভঙ্গীতে বসতে পারত। তাতে এই অবস্থাটার কোনো বদল ঘটত না। তাহলেও নসু গরাদের এপারে আর ঐ মানুষটি গরাদের ওপারে থাকত। সূর্য উঠলে, আলো হলে, আমি হয়তো মানুষটিকে দেখতে পাব, কিন্তু মানুষটি যদি আমার কমরেড হয়, এবং নিশ্চয়ই আমার কমরেড—নইলে আমার সেলের সামনে রেখে যাবে কেন, আর আমার কমরেড যদি জীবিত থাকে, একফোঁটা জলের জন্য ছটফট করে, তাহলেও তার মুখে আমি এক ফোঁটা জল দিতে পারব না।

আর এতোক্ষণে যেন নসু বুঝতে পারে, সেজন্যই লোকটিকে তার সামনে ফেলে রেখে গেছে, যাতে নসু তাকে একফোঁটা জলও দিতে না পারে।

এবার, এই কথা বুঝে যাবার পর, নসুকে হাতটা বের করে আনতে হয়, পা-টা গরাদের দিকে ছাড়িয়ে দেয়, হাত দুটো কোলের ওপর। তাহলে লোকটা বেঁচেই আছে, নইলে এখানে ফেলে যেত না, নইলে এক ফোঁটা জল দেবার অক্ষমতায় আমাকে দগ্ধানো হবে কি করে। এক হতে পারে, আমাকে ভয় দেখানো, আমারও এই পরিণতি হবে। কিন্তু আমার তো কোনো ভয় নেই। ভলি খেলার কোর্ট থেকে ছুটে না গেলে হত। ছুটে যাওয়া ছাড়া আমার কিছু করার ছিল না। অ্যাকশনটা আমার নয়। কিন্তু

আমার পক্ষে অ্যাকশনে যাওয়া ছাড়া কিছু করার নেই, আর আমি অ্যাকশনে যাবই, এটা হিসেবে রেখেই প্ল্যান করা হয়েছে। কলের মাথায় আটকানো মই খুলে দেবার জন্য আমি ছুটে না যেতে পারতাম। আমি যাবই, এটা হিসেবে রেখেই মইটা কলের মাথায় লাগানো হয়েছিল। আমার ওয়ার্ডের ভেতর আমি চুপচাপ দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম। তাতেও পরিত্রাণ মিলত না। আমাকে যখন ওয়ার্ড থেকে তুলে আনা হল, আমি জানতাম আমাকে মেরে ফেলা হবে। তার বদলে আমাকে এই সেকল্যুসন সেলে রাখা হয়েছে। আর একে মারা হয়েছে। এ কে? টুবলা? জয়? ভোম্বল? আকবর? বা আর কেউ। আর কারো সেলের সামনে আমাকে ফেলে রেখে যেতে পারত, যায় নি, আবার যেতে পারে।

য অ্যাকশন আমার নয়, সেই অ্যাকশন ঠেকাবার কোনো চেষ্টা করি নি। আমি চেষ্টা করলেও অ্যাকশন ঠেকাতে পারতাম না। তিন দিন ধরে সারাদিন চোখের সামনে চল্লিশফুটি মই নাচানো হতে থাকে, যাতে এ-রকম একটা অ্যাকশন হয়, সেই উদ্দেশ্যেই। তাই অ্যাকশন হয়েছে। তাই অ্যাকশন হতই, গতকালও হতে পারত। আগামীকালও হতে পারত। হলে, আমাকে কোথাও একটা আসতেই হত তো, গরাদের এপারে বা ওপারে। কারণ ও মই বেয়ে পালানো যায় না। দেয়াল টপকালেও পালানো যায় না। দু চার বছর গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারলেও পালানো যায় না। এরপর ওদের যেদিন যেদিন দরকার, ওরা খবরের কাগজের সংবাদ বানাবে অমুক জায়গা থেকে অমুক সালের অমুক জেল পালানো আসামী গ্রেপ্তার। আগামী কয়েক বছর ধরে যেখান থেকে খুশি সেখান থেকে, যাকে খুশি তাকে ধরতে, ওরা, আমাদের, জেলের আসামীদের, পালিয়ে যাবার জন্য মাঝে মাঝে এমন মই রেখে দেয়। দেবে।

আর আমাকে যদি এই সেল থেকে বের করে নিয়ে আবার ওয়ার্ডে রাখে, আগামীকাল দেয়ালের গায়ে যদি আবার মই হেলানো দেখে যে কেউ আবার এসকেপ-অ্যাকশন লীড করে, আমি আবার নিশ্চিত সে অ্যাকশনে যাব, টানটান মই খাড়া ধরব, ছুরি মেরে নইলে টুটি টিপে যে বাধা দেবে তাকে মারব। তারপর এই গরাদের হয় এধারে নয় ওধারে পড়ে থাকব। কারণ জেলে থাকলে পালাবার অ্যাকশন করতে হয়।

আমাকে যদি এই সেল থেকে বের করে নিয়ে বাইরে ছেড়ে দেয়,

আগামীকালই আমি বাইরে আবার খতম অভিযান চালাব। হয়তো অস্ত্র আর সঙ্গীর অভাবে আমি যাকে মেরে ফেলতে চাই, তাকে সত্যি সত্যি মারতে পারব না, কিন্তু আমার ইচ্ছার শক্তি তাতে একটুও চিড়বে না। কারণ যে আমাকে মারবে তাকে আমি মারব।

কিন্তু এই এসকেপ-অ্যাকশন বা সেই খতম অভিযান কোনোটাই আমার অ্যাকশন নয়। যেমন এই হাত-পা বেঁধে থাকাটা আমার ইচ্ছেয় নয়।

নসু গরাদ ধরে উঠে দাঁড়ায়। সামনে সেই লোকটি পড়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে থেকেই নিজের শরীর শক্ত করে নিয়ে নসু পেশীগুলোকে একটু আরাম দেয়। তারপর গরাদ ধরে শরীরটাকে পেছনদিকে একটু ঝুলিয়ে দেয়। আবার সামনে এগিয়ে আনে। তার শরীরে এতোটা নাড়াচাড়ায় মশার দল ভনভন শব্দে উড়তে থাকে। নসুর শরীরের নাড়া-চাড়ার গতির সঙ্গে তাল রেখে মশার ভন ভন বাড়ে, কমে।

কিন্তু, এখন সামনে এই বাঁচা বা মরা সহযোদ্ধাটিকে নিয়ে, একফোঁটা জল দেবার বা ওর গা থেকে একটা মশা তাড়াবার ক্ষমতাও যখন আমার নেই, আমাকে কি করতে হবে। একে এখানে ফেলে রেখে যাওয়া হল আমাকে দিয়ে কোন কাজটি করিয়ে নিতে, যা আমাকে বাধ্যত করতে হবে, যা না করার কোনো উপায়ই আমার হাতে রইবে না। একটার পর একটা খতম অভিযান আমাকে চালাতে হয়েছে। সে ছিল আমার বিশ্বাস, পরি-বর্তনের এক ও অনন্য পথ। আমার হাতে একমাত্র অস্ত্র। কিন্তু তারপর থেকে সবটাই তো আমাকে অবস্থার ফিকিরে করতে হচ্ছে, মানতে হচ্ছে। এখন এসকেপ-অ্যাকশন হয়েছে। তাতে ঢুকে যাওয়া ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না। এখন এই সেকল্যুসন সেলে আছি। কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু এখন এই জীবিত বা মৃত সহযোদ্ধার সামনে, আমাকে কি করতে হবে।

গরাদের ওপর তার কপালটা নোয়ানো ছিল। মাথাটা তোলা মাত্রই মশা ভন ভন উড়ে গেল। হাতটা গরাদ থেকে নামিয়ে আনল। আরো বেশি মশা আরো বেশি ভন ভন করে উঠল। কিন্তু অবলম্বনহীন এই দাঁড়িয়ে থাকাতে যেন তার ভরসা নেই। সে আবার গরাদটা ধরে আর টের পায় তার খুব পেচ্ছাপ পেয়েছে। গরাদের ফাঁক দিয়ে পেচ্ছাপের জন্য তৈরি হবার চেষ্টা করতেই নসুর কাছে সহসা স্পষ্ট হয়, এইজন্য, এইজন্যই, শুধু

এইজন্যই, একে মৃত বা মৃতপ্রায়, আমার সামনে রেখে দিয়ে যাওয়া হল, যাতে এই সেকল্যুসন সেলের নিঃসঙ্গতায় আমার কফ, থুতু বা পেচ্ছাপ দিয়ে আমি আমার সহযোদ্ধাকে, মৃত বা মৃতপ্রায় সহযোদ্ধাকে, অপমান করতে পারি, অপমান করে যাই। জয় হতে পারে, ভোম্বল, টুবলা বা বিমলবাবু বা আকবর হতে পারে, যে কেউ হতে পারে, আমি হতে পারি। আমার নিজের শবদেহের ওপর আমাকে পেচ্ছাপ করানো হচ্ছে।

হাতে পায়ে বেড়ি নিয়ে হাতকড়া বাঁধা দুই হাত মাথার ওপর টানটান তুলে নসু দুই হাতের মুঠোয় একটা শিক চেপে ধরে ডান বাহুর পেশীর ওপর মুখটা চেপে ধরে শরীরের সমস্ত পেশী সংকোচনের চেষ্টা করে, বলে, না।

তারপর, শরীরের নিয়মে একসময় নসুর প্যান্ট ভিজিয়ে শরীর ভিজিয়ে পেচ্ছাপ হয়ে যেতে থাকে। আর জলের নিয়মে জল গরাদের ফাঁক দিয়ে সেই জীবিত বা মৃতের দিকে গড়িয়ে যেতে থাকে।

মানুষের ঠিকানা

চার্বাক সেন

জন্ম এবং মৃত্যু এই সময়রেখার মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের জীবনের যা কিছু বিকাশ ঘটে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র…নানা কিছুর অন্বয় ও সংঘাতের মধ্য দিয়েই তার যাত্রা, তার চিন্তা, ভাবনা, কামনা, বাসনা, স্বপ্ন, কল্পনার স্ফূর্তি। কিন্তু তার আসা এবং যাওয়া এই দুটো প্রশ্ন নিয়েই সব থেকে সে বিচলিত এবং তার বিস্ময়েরও সীমা-পরিসীমা নেই। আমি এলাম, এই আসায় আমার তো কোনো হাত নেই। এই আসার রহস্যবোধই পূর্বজন্মের কল্পনার জন্ম দেয়, জন্ম জন্মান্তের রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত কর্মফলযুক্ত মানব-জীবনের অস্তিত্ব কোনো অদৃশ্য স্রষ্টার ইচ্ছাসাপেক্ষ ব্যাপার বলে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। এবং সেই সঙ্গে মৃত্যুরও একটা রমণীয় ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। মৃত্যু সে তো অবিনশ্বর আত্মার জীর্ণদেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণের অভিসার। জন্ম ও মৃত্যুর সময়সীমায় আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সৎপথে থেকে পরমকরুণাময় ঈশ্বরের উপর আস্থা রেখে কাজ করে যাওয়া, কর্মফলের দিকে না তাকিয়ে সর্বকর্মফল তাঁকেই সমর্পণ করে শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হওয়া। সব ধর্মের মোদ্দা কথাটা প্রায় এই রকমই। তার সঙ্গে ইহজীবনে সামাজিক-পারিবারিক আচার-আচরণের কিছু নীতিউপদেশ। শেষ পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর রহস্য ভেদের আকুতি ঈশ্বরের রহস্যোপলব্ধির আধ্যাত্মিকতায় রূপান্তরিত হচ্ছে। সব দেশের ধ্রুপদী ধর্ম-দর্শনের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্ট মানবাত্মার নৈতিক জীবন।

মানুষের স্রষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করলে, 'মানুষ কি' প্রশ্নটির উত্তর দেবার দায়িত্ব বর্তায় আমাদের উপরই। এযাবৎকাল 'মানুষ কি' প্রশ্নটিকে পাশ কাটিয়ে মানুষ কি হতে পারে—তা নিয়েই মাথা ঘামিয়েছি বেশি। অর্থাৎ মানুষ কি তার ভাগ্যের নিয়ন্তা হতে পারে, সে কি তার জীবনকে নিজেই গড়ে তুলতে পারে? ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তরটা কখনো পুরোপুরি নেতি-বাচক—"প্রাণ দিয়েছেন যিনি অন্ন দেবেন তিনি" গোছের; কখনো বা—ঈশ্বর আমাদের ক্ষমতা দিয়েছেন। আমাদের স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে,

কর্মী পিতার সন্তান হিসাবে আমাদের কর্মযোগের সাধনা করতে হবে ; তা না হলে—"যে শুয়ে থাকে, তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে," অর্থাৎ অমৃতের পুত্রদের পৌরুষ ইহলোকে কিঞ্চিৎ স্বীকৃত।

কিছু কিছু মানুষ বড়ো অকৃতজ্ঞ এবং সব কিছুতেই তাদের সন্দেহ, অর্থাৎ এরা নাস্তিক। "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর" এই নীতিবস্তুকে দূর করে "সব কিছুকে সন্দেহ করো" (doubt everything) নীতিতে বিশ্বাসী। তাঁরা বলে বসলেন, ঈশ্বর বলে কিছু নেই, "মানুষই দেবতা গড়ে, তাহার কৃপার পরে করে দেব মহিমা নির্ভর।" মানুষের স্রষ্টা কোনো ঈশ্বর নন। বিবর্তনের পথে মানুষের আবির্ভাব। মানুষ প্রকৃতির অংশ এবং "man becomes man only among men".

তবুও কিন্তু রয়ে গেল। "মরিয়া না মরে রাম"—বস্তুজগৎ নিরপেক্ষ পরম-চৈতন্যের স্বীকৃতি রয়ে গেল দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির স্রষ্টা হেগেলের চিন্তাধারার। ফয়েরবাকের নৃতাত্ত্বিক বস্তুবাদ ধর্ম ও ঈশ্বরের কল্পনায় কুঠারাঘাত করলেও, জড় ও আত্মার সমন্বয়ে মানুষের জৈব অস্তিত্ব স্বীকৃত হলেও দেখা গেল, নৃতত্ত্ববাদের সীমাবদ্ধতাও কিছু কম নয়। কারণ বাস্তব সমাজ নিরপেক্ষ মানুষের জৈবসত্তা শেষ পর্যন্ত কিন্তু নির্বিশেষ মানুষের তত্ত্বকেই প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি, ফিক্‌তের "man becomes man only among men' আর ফয়েরবাকের নৃতাত্ত্বিক নিরীশ্বরবাদের ঐতিহ্য বহন করেই মার্কসের দ্বন্দ্ব সমন্বয়ীবস্তুবাদের আবির্ভাব। অর্থাৎ মানুষ ঈশ্বরের পুত্র নয়, বিবর্তনের পথে প্রকৃতি জগতের অংশ হিসাবে মানুষের আবির্ভাব। মার্কসের ভাষায় "The self-mediating Being of nature and of man", মানুষ চেতনাসম্পন্ন প্রাণী তবে মানুষের চেতনা বস্তুজগৎ নিরপেক্ষ নয় (My relationship to my surroundings is my consciousness—*The German Ideology*)। সর্বোপরি মানুষ সমাজে বিচরণশীল, রক্তে মাংসে জীবন্ত, চেতনাসম্পন্ন ক্রিয়া-শীল বাস্তব। মানুষ প্রকৃতির অংশ, তাই বলে প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্কটি সরলরেখায় ব্যক্ত হয় না। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জটিল বুনোটের মধ্যে তার অবস্থান। এই সম্পর্ক আবার যান্ত্রিকও নয়। মানুষ প্রকৃতির অংশ, তবে সে একটি বিশেষ গুণের অধিকারী (self-mediating), সে নিজেই প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে, প্রয়োজনমতো প্রকৃতিকে বদলে নিতে পারে, অর্থাৎ কর্মের পথে তার মস্তিষ্কের বিকাশ ক্রমাগত উন্নততর স্তরে পৌঁছেছে, সে

সচেতন কর্মপ্রয়াসের অধিকারী। অতএব আমরা বলতে পারি প্রকৃতির সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, ব্যক্তির সঙ্গে বিচিত্র সম্পর্কের আধার মানুষ। জটিল সম্পর্ক-সমূহের সামগ্রিক বুনোটকে বাস্তবের দাবি অনুযায়ী ক্রমাগত বদলে নিয়ে সে অগ্রসর হচ্ছে। ক্রিয়াশীল বাস্তবের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিমানুষের গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়েই বলতে হবে, মানুষের ধারণায় 'ব্যক্তিসত্তা'ই একমাত্র বিবেচ্য নয়। ব্যক্তিসত্তা, পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও মানবগোষ্ঠী এই ত্রিবিধ উপাদানের সম্পর্ক, সংঘাত ও অন্বয়ের আঙ্গিক বুনোটের মধ্যেই ব্যক্তিত্বসচেতন সামাজিক মানুষের অবস্থান এবং দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ধারা-বাহিকতার মধ্যেই মানব প্রজাতির অগ্রগমন। বাস্তব জগতে ক্রিয়াশীল বাস্তব মানুষ তার পারিপার্শ্বকে বদলায়। যদি ব্যক্তিসত্তা এই সম্পর্কসমূহের একমাত্র প্রধান অংশ হয়, তাহলেও ব্যক্তিত্ব অর্জনের অর্থ হচ্ছে এই সম্পর্ক-সমূহের সামগ্রিক সচেতনতা। এবং ব্যক্তিত্বের রূপান্তর কথাটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই সম্পর্কসমূহের জটিল গতিপ্রকৃতির বুনোটকে পরিমাণগত ও গুণগতভাবে বদলে নিয়ে, ব্যক্তিবিশেষ সমষ্টির সঙ্গে অন্বয়েই নিজেকে বদলে নেয়।

ইতিপূর্বেই আমরা বলেছি এই সম্পর্কসমূহের বুনোট খুব সহজ সরল নয়। অধিকন্তু এই সম্পর্কের কতগুলো ব্যক্তি-ইচ্ছা নিরপেক্ষ, কতগুলো আবার স্বেচ্ছাবৃত। একদা যে সম্পর্কসমূহ প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত, তাই আবার দৃষ্টিভঙ্গী ও গুরুত্বের দিক থেকে পরবর্তীকালে বদলে যেতে পারে। এই অর্থে বাস্তব পরিস্থিতির স্বীকৃতি একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই সমস্যাটা অন্যদিক থেকেও খুবই জটিল। একটা নির্দিষ্ট সময়ের, বিশেষ কাঠামোর মধ্যে, সম্পর্কসমূহ যে অবস্থায় রয়েছে, তার সামগ্রিক রূপটা জানাই যথেষ্ট নয়, তার সৃষ্টি এবং গঠনের প্রেরণার উৎসটি জানাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ব্যক্তিসত্তা বর্তমান সম্পর্কসমূহের সমন্বয় মাত্র নয়। সে সম্পর্কসমূহের ইতিহাস এবং অতীত সম্পর্কসমূহের সামগ্রিক যোগফল। মার্কসের ভাষায়, "the human essence is no abstraction inherent in each individual. In its reality, it is the ensemble of the social relations". একজন ব্যক্তিমানুষ হচ্ছে "The ensemble of the social relations" অর্থাৎ তার জন্ম এবং বিকাশকে বোঝা যাবে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেই। এই অর্থেই ব্যক্তি মাত্রই সমাজসম্ভূত, "Man becomes man only among men"—এই সামাজিক ও ঐতিহাসিক

দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের আত্মিক জীবন ও কর্মধারাকে বিচার-বিশ্লেষণ করা মার্কসীয় তত্ত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক।

ব্যক্তিবিশেষের রূপান্তর সাধনের সচেতনতা থাকতে পারে, কিন্তু সামজিক রূপান্তর সাধনে একজন ব্যক্তির ক্ষমতা কিন্তু অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু যখন সে একই ধরনের রূপান্তর সাধনে আগ্রহী বন্ধুর সঙ্গে আঙ্গিকঐক্যে নিজেকে সংযুক্ত করে, তখনই সেই ব্যক্তি যুক্তিসম্মত রূপান্তর সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তা না হলে ব্যাপারটা "ঐ মহামানব আসে" বা "সম্ভবামি যুগে যুগে" জাতীয় ইচ্ছাপূরণের কল্পনায় পর্যবসিত হয়, কখনো বা ব্যক্তি কাল্ট (Personality cult)-জাত একনায়কের প্রত্যাশার প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনে রূপান্তরিত হয়।

অতএব আমাদের বুঝতে হবে, বহু বিচিত্র সামাজিক সংঘ ও সম্পর্কসমূহের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের অবস্থান। এই সামাজিক সম্পর্কেব মাধ্যমেই ব্যক্তি-বিশেষ, মানবপ্রজাতির একজন হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে। এবং যে ভাবে প্রকৃতির (Nature) সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে, ক্রমাগত বদলের পথে তাকেও সে বহুগুণত করে তোলে। মানুষ শ্রমশীল, সচেতন এবং কৌশলী। কৌশল বলতে আমরা শুধু শিল্পের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার প্রয়োগ কৌশলই বুঝি না, মানসিক হাতিয়ার ও দার্শনিক জ্ঞানের কথাও বুঝিয়ে থাকি। একটা খুব চলতি ধারণা, নির্দিষ্ট সামাজকাঠামোর বাইরে একজন নির্দিষ্ট মানুষকে চিন্তা করা সম্ভব নয়। কথাটা ঠিক, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কোনো ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্কে কড়াকড়ি ভাবে প্রয়োগ করতে যাওয়া ঠিক হবে না, তাহলে সমাজকাঠামোর সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্ক নির্দেশ করতে গিয়ে আমরা যান্ত্রিকতাকে প্রশ্রয় দেব। ব্যক্তি যেমন সমাজের অংশ, সে তেমনি একজন ব্যক্তি বিশেষও বটে ; তাই এই সম্পর্কটা বুঝতে হবে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্কটা সচেতন, সক্রিয় এবং নিজস্ব ঢঙে গতিশীল। মানুষের ব্যক্তিচেতনা, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা, স্বকীয় ঢঙে সৃষ্টি বাসনার মূল্য এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে কম নয়। কিন্তু ব্যক্তি কখনোই বিচ্ছিন্ন একক নয়। অন্যান্য ব্যক্তি ও সমাজ-সংঘের প্রাণবান শক্তির অংশীদার হিসাবেই সে ব্যক্তিত্বময়।

প্রত্যেক মানুষই একটা নির্দিষ্ট দেশকালের মধ্যে অবস্থান করে, অথচ 'মানবতা' এই গুণটি কিন্তু অনেক সময়ই দেশেকালের নির্দিষ্ট অর্থে সীমাবদ্ধ

নয়। এর একটা সার্বজনীনতার দিক আছে। ভৌগোলিক কারণে মানুষের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। মানবতার ধারণাটিও শাশ্বত কোনো স্থানুবৎ সত্য নয়। এই ধারণাটিও গতিশীল ও পরিবর্তনশীল।

মানবপ্রকৃতি হচ্ছে মানবিক সম্পর্কের জটিল বুনোট, এই ধারণার সঙ্গে মানুষের হয়ে ওঠার (becoming) ধারণাটি অনেকাংশে সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ মানুষ হয়ে ওঠে (বিমূর্ত মানুষ নয়) অর্থাৎ বাস্তবের দ্বাবিমাত্রিক পরিবর্তিত সামজিক সম্পর্কসমূহের সঙ্গে তাল রেখে সে নিজেকে ক্রমাগত পালটে যায়। বাস্তবত মানবসমাজের বিকাশটি একই সঙ্গে তাল রেখে সর্বত্র সরল রেখায় ঘটে না, তাই সামাজিক সম্পর্কের ও বহু বিচিত্র ও জটিল বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ধারণাটি তাই জটিল কুটিল দ্বান্দ্বিক গতিরেখায় রূপাবয়ব লাভ করে।

মানবসত্তার তাৎপর্য আবার ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে খুঁজতে যাওয়া ঠিক হবে না, খুঁজতে হবে মানবজাতির সামগ্রিক ইতিহাসের গতিশীল রূপরেখার মধ্যে। ব্যক্তিমানুষ জন্মায়, বৃদ্ধি পায় মারা যায় প্রাকৃতিক নিয়মে। কিন্তু বংশ-পরম্পরায় মানবপ্রজাতির অগ্রগমন অব্যাহত—এই অর্থে মানুষ নিঃসন্দেহে অমৃতস্য পুত্র:। 'আত্মা', 'সত্তা', 'চৈতন্য' বা 'মন' এই ধারণাগুলো সমাজে ক্রিয়াশীল রক্তে মাংসে জীবন্ত মানুষ থেকে আলাদা কোনো ব্যাপার নয়। সবকিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে বাস্তব মানুষের মধ্যে "The human essence is no abstraction inherent in each individual. In its reality it is the ensemble of the social relations". বাস্তব মানুষ এবং তার ব্যক্তিত্বের সঠিক ঠিকানা তাই পাওয়া যায় মার্কসবাদের কাছেই।

সমাজে ক্রিয়াশীল বাস্তব মানুষকে তার স্বমহিমা থেকে বিযুক্ত করে (alienate) কখনো দেবত্ব কখনো দানবত্ব কখনো পরম চৈতন্যের ধারণা বা পরমাত্মার অংশ জীবাত্মা রূপে, কখনো বিমূর্ত সত্তায়, কখনো স্বাধীন ইচ্ছার (Freewill) আধার হিসাবে, কখনো বিচ্ছিন্ন একক সার্বভৌম স্বয়ম্ভুসত্তা হিসাবে অর্থাৎ রকমারি ভাববাদী ফন্দিফিকিরের মধ্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। মার্কসবাদ এই সবকিছুর মধ্য থেকেই বাস্তব মানুষের সঠিক ঠিকানা খুঁজে বের করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। "Communism therefore as the complete return of man to himself as a social (i, e, human) being—a return become conscious and accomplished within the entire wealth of previous development." [*Economic and philosophic manuscripts of 1844*, Page No 95]

অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতা প্রসঙ্গে

রাম বসু

পরিমিত পরিসরে জীবননিষ্ঠ কোন কবির আলোচনা প্রায় দুঃসাধ্য, হয়তো বা অসম্ভব। কারণ সেই কবি শুধু আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে আবদ্ধ নন। তিনি ছড়িয়ে থাকেন অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস, তার সার্থকতা ও সংকটকে নিজের অগোচরেই তিনি অঙ্গীকৃত করে নেন। 'অমিতাভ দাশগুপ্তের নির্বাচিত কবিতা' আলোচনা করার সময় এই কথা আবার মনে পড়ল।

তার আগে কবিতার বইটি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করি। সাধারণভাবে কবিতার বই যেমন সাজানো হয়ে থাকে, অমিতাভ তেমন ভাবে সাজান নি। অর্থাৎ ১৯৬৯-৭৩ সালে লেখা অগ্রন্থিত কবিতা স্থান পেয়েছে প্রথমে, পরে এল ১৯৬৮ সালে লেখা 'মধ্যরাত্র ছুঁতে সাত মাইল' থেকে নির্বাচিত অংশ, তারপরে ১৯৬৬ সালে লেখা 'মৃত শিশুদের জন্য টফি'-র কবিতা, তার পরে ১৯৫৭ সালে লেখা 'সমুদ্র থেকে আকাশ' কবিতার বই থেকে দুটি কবিতা এবং শেষে আবার ১৯৭৩ সালে অগ্রন্থিত কবিতা সংযোজন হিসাবে। অমিতাভের কাছে সময়ের স্বরূপ কি চক্রাকার?

ইচ্ছাকৃত ভাবে হোক অথবা আকস্মিক ভাবেই হোক 'সমুদ্র থেকে আকাশ' কবিতার বই থেকে সংকলিত দুটি কবিতার মধ্যে, আমার মনে হয়, অমিতাভের বিকাশের ধারার ইঙ্গিত ধরা আছে। 'রাধার জন্য' কবিতা একটি সহজ প্রেমের কবিতা। নিরাভরণ, কিন্তু বেশ। অন্যটি 'শতরঞ্চ'। কি কবিতা একে বলব? প্রেমের কবিতা? জীবনের গভীরে ব্যাপ্ত জীবনবোধের কবিতা? "রাজ্য যায় পাট যায় কৃষ্ণা যায়, তবু এই শতরঞ্চ খেলা/এর বুঝি শেষ নেই।" শেষ নেই বলে "আঁজলা ভ'রে যতই না জল তুলি তবু কুলোবে না / জীবনের অগস্ত্যপিপাসা।" এই শতরঞ্চ খেলায় "যুধিষ্ঠির নিয়মিত হেরে চলে সৌভাগ্যের পাশা।" তাই কবিতা লিখতে গিয়ে অমিতাভ একটা মারাত্মক ও চূড়ান্ত

অমিতাভ দাশগুপ্তের নির্বাচিত কবিতা। অমৃত প্রকাশনী, কলিকাতা—৯। পাঁচ টাকা

বোধে নিজের মনকে বেঁধে নিল। একদিকে এই ট্রাজিক বোধ, জীবনের মর্মে যার বাসা ; অন্যদিকে সেই ট্রাজিক আর্তিকে ঢেকে দিয়ে, বোধ ও চেতনাকে আরও এক নির্মল ও প্রশ্নাতীত নিশ্চয়তার মধ্যে স্থাপন করার আগ্রহ, যা শরীর নেয় প্রেমের ভিতরে। প্রেমের মধ্যে সব বিরোধের অবসান, সব আর্তনাদের শান্তি অনন্ত কাল থেকে কবিরা খুঁজে আসছেন। ইয়োরোপের রোম্যানটিক কবিরা তাকে আরও এক নতুন পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর আমরা যদি সেই ভাষ্য ধরে নি যে শিল্পসাহিত্যে যা চলছে তা আসছে সাবেকি ক্লাসিসিজম আর রোম্যানটিসিজমের প্রতিযোগিতা, পার্সোনাল আর্ট আর ইমপার্সোনাল আর্টের চোর পুলিশ খেলা, তবে এ কথা মানতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না যে সিম্বলিজম সুররিয়ালিজম ইত্যাদি শিল্পচিন্তা আদপে রোম্যানটিক চিন্তার নতুন রূপান্তর ও পরিপুষ্টি। বাঙলা সাহিত্য উনিশ শতক থেকে ইয়োরোপকে তার চিন্তানায়ক বলে মেনে এসেছে এবং ইয়োরোপের হাওয়া-বদলে সেও নিজেকে অনেকটা সেই ভাবে বদলে নিয়েছে, সে হেতু আমাদের অনেকের মতো অমিতাভও নিশ্চয়ই আন্দোলিত হয়ে থাকবে। সেই ধারা অনুসরণ করে অমিতাভ যে কবিতার আবহাওয়া তার চেতনার চারপাশে তৈরি করেছে, তা হল রোম্যানটিক। তার ট্রাজিক বোধও রোম্যানটিকতা থেকে উৎসারিত।

অমিতাভ যে সময় কবিতার জন্যে নিজেকে পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত করল সেই সময় যদি আমেরিকা ফেরৎ ৺বুদ্ধদেব বসু আমার মতো অর্ধশিক্ষিত মানুষের জন্যে বোদলেয়র র‍্যাবো রিলকে সহজ করে, তাদের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত করে, বালকোচিত তরলতায় পরিবেশন না করতেন, যদি বেট আর একজিসটেনসিয়ালিজমের দৈনিক পত্রিকার কলম পুষ্ট করা শিহরণ জাগানো বার্তা না আসত যদি জীবননিষ্ঠ সাহিত্যিকরা চরিত্র না হারিয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতেন, জানি না অমিতাভ নিজেকে কোন মেরুতে স্থাপন করত। মনে হয়, নরক পরিক্রমা তাকে করতে হত না। তাই অমিতাভকে যে মাশুল গুনতে হল তার জন্যে দায়ী সে নয়। দায়ী সময়, দায়ী আমাদের বিপর্যস্ত ইতিহাস।

আমাদের অনেকের মতোই সময়ের স্বরূপ বুঝতে পারে নি অমিতাভ। আমাদের অনেকের মতোই অমিতাভ আরও বেশি আধুনিক হবার জন্যে পশ্চিমের দরজায় হাত পাতল। আমাদের অনেকের মতোই অমিতাভ বুঝতে

পারে নি, যে-পশ্চিম মাইকেলকে রবীন্দ্রনাথকে দুহাত ভরে দান করেছিল, সেই পশ্চিম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দানো-পাওয়া বাড়ি। দুঃস্বপ্ন ছাড়া তার আর দান করার কিছু নেই। স্থূল বস্তুবাদী বা ভালগার মেটিরিয়ালিস্টের মতো শোনালেও বলব সংস্কৃতির জগতে বান্দুং সম্মেলনের তাৎপর্য আমরা কেউ বুঝতে পারি নি। অমিতাভও পারে নি।

শুধু মাত্র রোম্যানটিক মানসিকতা আর দুর্বিনীত যৌবনই তাকে, হয়তো বা সচেতন বুদ্ধির অগোচরে, নিয়ে গেল প্রতিবাদ আর বিদ্রোহের দিকে। অমিতাভের 'মৃত শিশুদের জন্য টফি' আর 'মধ্যরাত্র ছুঁতে আর সাত মাইল' যুগের কবিতাকে আমি বলব রোম্যান্টিক প্রতিবাদ আর বিদ্রোহের কবিতা। অবশ্যই প্রতিবাদ আর বিদ্রোহের কবি অমিতাভ। কিন্তু অগ্রন্থিত পর্য্যায়ের কবিতাগুলিতে তার বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্বাদে চরিত্রে, ধ্যানে ও চেতনায় এই কবিতাগুলি গুণগত ভাবে আলোচ্য বই দুটির কবিতা থেকে পৃথক। কিন্তু সে কথা পরে।

আগেই বলেছি, অমিতাভ জীবনের কাছ থেকে প্রথম পাঠ নিল—যুধিষ্ঠির জীবনের শতরঞ্চ খেলায় ক্রমাগত হেরে যায়। তাই অমিতাভ যখন অপেক্ষাকৃত পরিণত কণ্ঠে বলে "সে কালে বিশ্বাস ছিল। বিশ্বাসের ক্রাচে ভর দিয়ে / পঙ্গু গিরি পার হত।" তখন "খৃষ্টের মহিমা গান গেয়ে / কেউ কেউ সরাসরি চলে দেত সিংহের গুহায়। শোণিত যৌনতা ব্যথা বিশ্বাসে বিলীন হয়ে যেত।" সেই আশীর্বাদ পায় নি অমিতাভ। সে শুনেছে বুকের অন্দরে ঘণ্টাধ্বনি, "একটানা ফিউনার‍্যাল" যেন তার "সব চেয়ে প্রিয়তাকে" তুলে দিতে হবে। তাই সমস্ত অস্তিত্বকে বাজি রাখতে হয়েছে তাকে। সে দেখেছে কোথাও অসীমতা বলে কিছু নেই।' "চিতা, নিধে ডোম, গঙ্গা, সিঁদুর, শঙ্খ ও ভিজে মালা / 'অসীমতা এই সবে সমবেত মনে হতে পারে।" সে যখন গিয়েছে স্বাস্থ্যনিবাসের কোলে, যখন বিকেলের শেষে ফুটে উঠল সোঁয়াকুল, ঘাটশিলার আকাশ ঢেকে গেল টাটানগরের গনগনে আগুনে, তখন, সেই ব্যাপ্তির মধ্যেও নিজের আইডেনটিটির প্রশ্ন ভুলতে পারে নি অমিতাভ। এই সময় অভিমানী রক্তাক্ত যুবক আবার মুখ ফিরিয়েছে প্রেমের কাছে, এবং পরোক্ষে জলের কাছে। 'মৃত শিশুদের জন্য টফি'-তে অমিতাভের ত্রাণের প্রতীক হল জল। মনোবিজ্ঞানের দোহাই না পেড়েও আমাদের মেনে নিতে অসুবিধা নেই যে জলই আদিম, প্রবহমান প্রাণের

প্রতীক, জীবনের উৎস। খ্রীষ্টীয় ও হিন্দু কসমোলজিতে আমরা তার প্রমাণ পাই।

এই জল, আদিম প্রাণশক্তি, আমাদের আদি মাতা, রক্তাক্ত আহত খ্যাংলানো অমিতাভকে কিছু তৃপ্তি দিয়েছে। দিয়েছে বলেই প্রাণের প্রবল আবেগে নিজেকে সে মুক্ত করছে, অর্পণ করছে গতির কাছে। সে গতি তখনও অমিতাভের কাছে অন্ধ, বিচারবুদ্ধিহীন অন্ধকার শক্তি বা ইররাশানাল ড্রাইভ। 'মধ্যরাত্রি ছুঁতে আর সাত মাইল' পর্যায়ে অমিতাভ আবেগগত সংযুক্তি বা ইমোশানাল ইকুইভ্যালেন্ট খুঁজে গেল 'ঘোড়া'য়। এই সময় ঘোড়া হল তার প্রতীক। অমিতাভ এক জায়গায় বলছে, মেয়েরা ভালোবাসে জল। আর, পুরুষেরা ভালোবাসে মাটি। 'মধ্যরাত্রি ছুঁতে আর সাত মাইল' পর্যায়ে মাটিতে এসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল অমিতাভ। ভাবনার এই উদ্দামতা, আবেগের এই নৈরাজ্য নাকে দড়ি দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে গেছে। তখনও দিক্‌ভ্রষ্ট যুবকের আন্তরিক আর্তনাদ কবিতাকে দিয়েছে রক্তাক্ত সৌন্দর্য, গঠন প্রণালীতে এনে দিয়ে দুঃসহ ব্যাপ্তি। বিস্তার, ক্রমাগত বিস্তার, যেন তার নেশা হয়ে দেখা দিল এই সময়। 'অরুণা করুণা' কবিতাকে প্রমাণ হিসাবে হাজির করা যায়। বলে নেওয়া ভালো 'অরুণা করুণা' কবিতাকে আমি তার সার্থক কবিতার মধ্যে ঠাঁই দি না। পূর্ববর্তী কিছু কবির প্রভাব তাকে স্বকীয়তা অর্জনে, এবং তাই, আত্মপ্রকাশে বাধা দিয়েছে। তবু কবিতার গঠন প্রণালী, নতুন রূপকল্প নির্মাণ, শব্দ প্রয়োগের রীতির দিকে নজর দিলে দেখা যাবে অমিতাভ ব্যপ্ত পরিবেশে নিজেকে আবিষ্কার করতে চেয়েছে। বুঝতে চেয়েছে তার আইডেনটিটিকে। দৃশ্য অদৃশ্যের রহস্যময় দ্বান্দ্বিক লীলায় যে ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে, অমিতাভের অন্বিষ্ট সেই ব্যক্তিই। আর, সেই অন্বিষ্ট তখনও তার গোচরাতীত বলে অমিতাভ ব্যবহার করে "করুণ লিঙ্গের মতো কৃশ হাত" "গায়ে কেন্নো হয়ে লেগে থাকা"র মতো কিছু কিছু কথা যা আমাদের চমকে দিতে যথেষ্ট। এখন অবধি অমিতাভের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ সেই স্তরে আছে, যে স্তরের প্রতিবাদে ও বিদ্রোহে, যাদের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ, তারা বিচলিত হয় না। হাততালিও দিতে পারে।

কিসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল অমিতাভ? মূল অসুখ, শ্রেণীস্বার্থভিত্তিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়। তখনও অবধি অমিতাভের বিদ্রোহ আমাদের জীবনের কয়েকটি আপাত-দৃশ্যমান উপসর্গের

বিরুদ্ধে। আমাদের বাঁচার রীতি, আমাদের বস্তাপচা ধ্যানধারণা, প্রথাসিদ্ধ কয়েকটি কনসেপ্ট আর আত্মসন্তুষ্টির বিরুদ্ধে। এবং এই বিদ্রোহ, তখন আরম্ভ হয়ে গেছে ইয়োরোপে। এক যুগে ইবসেনের 'ডল্স হাউসর' আর শেকভের 'দ্য চেরি অর্চার্ড' যেমন ইয়োরোপে নতুন চেতনার জগতের উষা, আমাদের সময় অসবর্ণের 'লুক ব্যাক ইন এ্যাংগার' ও তাই। সিদ্ধির কথা বলছি না, লক্ষণের কথা বলছি। সময় সম্পর্কে অমিতাভ তখনও পাঠ নিয়েছে সেখান থেকে। 'কনসেপ্ট' ও 'ক্যাটিগরি'গুলি গ্রহণ করেছে সেখান থেকে।

এবার আগের কথায় ফিরে যাই। আমাদের অনেকের মতো অমিতাভ সময়ের স্বরূপ বুঝতে পারে নি। আমাদের অনেকের মতো অমিতাভেরও ধারণা—ক্যাপিটাল. মাইন, স্টিয়রিং, সাইক্লোট্রোন ইত্যাদি পদ যুতসই লাগাতে পারলেই, কিছু আঁকাড়া কথা ব্যবহার করলেই নতুন যুগ, ছাল-চামড়া ওঠা জীবনের বাস্তবতাকে ধরা যাবে। এই ব্যর্থতা, আমার ধারণা ভুল হতে পারে, আমাদের সকলেরই।

বিচার করলে দেখা যাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সম্পূর্ণভাবে নতুন বাস্তবতা এসেছে মানুষের সংস্কৃতির জগতে। ইয়োরোপে এসেছে এক রকম ভাবে, আমাদের দেশে এসেছে অন্য রকম ভাবে। শুধু মাত্র সাম্রাজ্যবাদের পতন আর সমাজতান্ত্রিক শক্তির বিকাশ বললে চেতনার জগতে রূপান্তরের রূপরেখা স্পষ্ট করে বলা যায় না। সংস্কৃতির 'কনসেপ্ট' ব্যবহার করে আমরা বলতে পারি জার্মান আইডিয়া ও ফরাসী বিপ্লব থেকে 'ব্যক্তি' সম্পর্কে আমরা যে ধারণা পেয়ে এসেছি, যে ধারণা অভিষিক্ত হয়েছে রোম্যানটিক কবিতায়, দেখেছি যার উন্নত বিকাশ, প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কায় সেই ধারণা প্রথম আঘাত পেল। জটিল ইতিহাসের ধারা বেয়ে ব্যক্তি সম্পর্কে সেই ধারণা সূর্যাস্তের গোধূলিতে অপরূপ মায়া জড়াল কিউবিজম, সুররিয়্যালিজমে। শুদ্ধ কবিতার স্বরূপ নিয়ে মগ্ন হতে দেখলাম এলিয়টকে, ভ্যালেরিকে। আত্মাহীন যান্ত্রিক সভ্যতায় বিরক্ত হলেন রিচার্ডস। এই ভাবে কাফকায় যার আরম্ভ হল তার শেষ হল 'ওয়েটিং ফর গোদো'তে। একজিসটেনসিয়ালিজমও কোনো সান্ত্বনা নয়। কারণ সেখানে ব্যক্তি একক ও নিঃসঙ্গ। সেখানে উত্তরণ বা ট্রানসেনডেন্সের কোনো ঠাঁই নেই। তাই জার্মান আইডিয়া ও ফরাসী বিপ্লব থেকে পাওয়া ব্যক্তি ও ব্যক্তির স্বাধীনতা সম্পর্কে ধারণা প্রেতের মতো আর্তনাদ করছে চূড়ান্ত

বিযুক্তি বা এ্যালিয়েনেশনে। অসবর্ণ বা বেটদের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ সেই প্রাচীন ব্যক্তির প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে থেকে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আরও ব্যাপকভাবে, সমাজবিজ্ঞান আমাদের হাত ধরে শেখাল সমাজে ও ইতিহাসে ব্যক্তি নয় গোষ্ঠী বা গ্রুপ হল বেসিক ইউনিট। উনিশ শতক থেকে যন্ত্রবিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতি কিন্তু জীবন সম্পর্কে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে নি। তার নোঙর তখনও স্বীকারের ভিতর এবং অস্বীকারের ভিতর, সেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানবিকতায়। কিন্তু পরে, কমপিউটার, সাইবারনেটিকস, মহাজাগতিক বিজ্ঞান আমাদের শিক্ষা দিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিগত বিদ্রোহ মারফৎ বা ব্যক্তিমনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রস্তুতীয় অধ্যবসায়ে আলো ফেলে আত্ম আবিষ্কার করা যায় না। আত্ম-আবিষ্কার করা যায় শৃংখলায়, সংহতিতে, যোগাযোগে, পারস্পরিক সহযোগিতায়। দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে মানুষের ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। এই মৌলিক পরিবর্তনের ফলে শিল্পীর মূল প্রশ্ন, তার আইডেনটির প্রশ্ন, এই বিরাট বিশ্বে আমি কে, আমি কি, আমি কোথায়,—এই প্রশ্ন নতুন প্রেক্ষিত অর্জন করেছে। ব্যক্তি এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে কেন্দ্র করে জীবন সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনের যে মূল্যমান গড়ে উঠেছিল—তার পতন ঘটে গেছে। কোনো আর্তনাদই আর তাকে জীবনের আলোয় ফিরিয়ে আনতে পারবে না। আজ মানুষ অর্জন করতে চলেছে নতুন মূল্যবোধ যার ভিত্তিমূল স্বাতন্ত্র্য নয়, সহযোগিতা। আজকে আধুনিকতা বলতে বোঝায় এই চেতনাকেই।

অন্যদিকে, রঙ্গময়ী ইতিহাস ঠাঁই বদল করেছে। একদিন ইতিহাস বলতে বোঝাত ইয়োরোপকে। যন্ত্রবিজ্ঞানে, দাপটে ইয়োরোপ আমেরিকা আমাদের কাছে প্রতীয়মান সত্য; কিন্তু বাস্তব সত্য হল ইতিহাস বলতে এখন বোঝায় এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকা বা তৃতীয় বিশ্ব। তাই ইয়োরোপকে পাশ কাটিয়ে আফ্রিকার কবিতা নিজস্বতা অর্জন করল আমাদের চোখের ওপর, আরব দুনিয়া আর জাপান স্থাপন করল নিজেদের মূল্যমান। লাতিন আমেরিকায় দাঁড়ালেন নেরুদা, অক্টোভিয়ো পাজ। আধুনিকতার উৎস আজ খুঁজতে হবে এখানে। চীনের কথা জানি না। জানি না সেখানে কি হচ্ছে।

স্বাধীন ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই আত্ম আবিষ্কার করতে পারে নি। ইয়োরোপ-

মুখী নেতৃত্ব আমার ভারতবর্ষকে ক্রমাগত টেনে নিয়ে যাচ্ছে আঁস্তাকুড়ের দিকে। কারণ তারা জানে আত্মসম্মানহীন গ্লানির পাঁকে ডুবে থাকা মানুষের ওপর শ্রেণীর শাসন চালানো যায় পুরোদমে।

তাই আজ প্রতিবাদ আর বিদ্রোহের কবিতার মূল সুর হল সহযোগিতা, ব্যাপ্তি, শ্রেণী-বন্ধন ভেঙে আরও বিপুল পাঠকগোষ্ঠীর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করা।

অগ্রন্থিত কবিতা পর্যায়ে অমিতাভ মুখ ফিরিয়েছে সেই দিকে। অমিতাভ ঠিকই বলে, "ভাসান, ভাসান সারা বেলা।" আগে, এমন কি ঘাটশিলাতেও, যে অমিতাভ নিসর্গ থেকে ভয় পেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিত, টুরিস্টের মতো ক-কেজি শুয়ারের মাংস, পেঁয়াজ রসন কিনত, দেখত সাঁওতাল মেয়ের রক্তমাখা ব্লাউজ, সেই অমিতাভের কণ্ঠে স্তবের মতো ফুটে ওঠে—

"বন পথ ফুলে ফুলে ঢাকা কারা গিয়েছে মাড়িয়ে
সেই পথে চোরা জ্যোৎস্না আসে
এসে, কিছুক্ষণ রয়ে, হলুদ গাই-এর তৃষ্ণা থেকে
পানার সরের মতো খুব চাপা, মন্থর আবেগে
ভীরু পায়ে সরে যায়,
পাছে কোন ত্যক্ত দেবালয়
দক্ষিণা প্রয়াসী হয়—সরে যায় মন্থর আবেগে।"

প্রবলভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অমিতাভ। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে যা কিছু গ্রহণীয় তাকে আত্মস্থ করে অমিতাভ অঙ্গীকার করে নিয়েছে ব্যাপ্ত জীবনকে। অন্তর্মুখীনতা থেকে একক নিঃসঙ্গ ব্যক্তির উপসর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অমিতাভ প্রসারিত দৃষ্টি মেলেছে বহির্বিশ্বে, বাস্তবতায়, অংশিদার হতে চেয়েছে বিরাট মানুষের কর্মযজ্ঞের, তার সার্থকতার ও ব্যর্থতার। অমিতাভের দিকভ্রান্ত বিদ্রোহ শেষে অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদ করেছে।

[আমি আদৌ বোঝাতে চাই না অমিতাভ নিজেকে ব্যাপক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে বলে, সিদ্ধি তার আয়ত্তের মধ্যে। কমিটেড কবিতায় যে সংকট আছে, অমিতাভের কবিতা সেই সংকট থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু এই প্রশ্নের আলোচনা এখনে সম্ভব নয়। আলোচনা প্রসঙ্গে শুধু এই কথাই বলব

সংকট আছে বলেই সন্ধান আবার। বস্তুতপক্ষে কবিতা রচনায় প্রতি পদক্ষেপেই রোমাঞ্চকর সংকট থেকে যায়।]

চেতনার এই মুক্তি তার সামনে খুলে দিয়েছে লোকায়ত শব্দের ভাণ্ডার। রূপকথা, পুরাণ, লোককথা থেকে সংগ্রহ করেছে উপমা। তাকে ব্যবহার করেছে নতুন প্রেক্ষিতে, যেন সেই উপমা ও শব্দপুঞ্জ নতুন তাৎপর্য পায়। সাধারণ মানুষের ব্যবহার-রীতি, বাঁচার ভঙ্গী তার কবিতায় উপকরণ হয়ে ওঠে। জীবননিষ্ঠ কবি জীবনের দিকে পা বাড়ায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দীক্ষা পাওয়া রোমানটিক অমিতাভ তার জীবনের ও চেতনার সাজুয্য খুঁজেছে নতুন রোমাণ্টিকতায় যার ভিত্তিমূলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নেই। আছে পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে জানবার জন্যে, আইডেনটিটির সার্থক উত্তর খোঁজার জন্যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বাসনা। নিজের বুকটাকে দিগন্ত করে দিতে চায় অমিতাভ, হতে চায় নদী।

আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি, অমিতাভ যদি সত্যিই সাগরসঙ্গমে পৌঁছাতে পারে কোনদিন!

'সাম্যবাদ একটা বিরাট কোরাস, একটা উৎসব"। কিন্তু…

সত্য গুহ

জীবনের কাছে, সমাজের কাছে, মানুষ ও মনুষ্যত্বের কাছে দায়বদ্ধ এমন কথাশিল্পীর সন্ধান যদি আজ করেন কেউ, তাহলে কিংবদন্তীর শেয়ালের কুমীরবাচ্ছা দেখানোর মতো করে তাঁকে দেখাতে হয় ইনি উনি তিনি। ব্যাস! সংখ্যা তিনের পর আর চার-এ এগোতে চায় না। তবু যদি অমুক তমুক সমুকের নাম করে জিজ্ঞাসা, তো একটু শূন্যদৃষ্টিতে বাঙলা বইয়ের সাম্প্রতিক বাজারের দিকে চোখ বুলিয়ে উত্তর দিতে গিয়ে বিব্রত হওয়া ছাড়া বোবা থাকা যায়। কারণ, জাতে ও ধাতে আলাদা যে দুজন-তিনজনের নাম স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উচ্চারণ করা হয়, তাঁদের নামের পাশে ঐ নামগুলি আসে না! এঁরা কম লেখেন। কিন্তু যখন লেখেন এবং যেটি লেখেন, সেটি মোক্ষম লেখা। তাই দেখতে পাই "কথাগুলো মানে হারিয়ে ফেলেছে" জেনেও 'শব্দের খাঁচায়' বন্দী শব্দগুলোকে মানুষের জীবনে চৈতন্যে ধস-নামা বিপন্নতা প্রকাশের জন্যে সরল সহজ সাবলীল রেখেও, পাঠকের সঙ্গে লেখকের এবং লেখক-পাঠক দুয়ের সঙ্গেই সময় সমাজ ও জীবনের সংযোগ-সামর্থ্য দিতে পেরেছেন অসীম রায়। মানুষের প্রতি নিবিড় এবং গভীর ভালোবাসায় তাদের যন্ত্রণা-বেদনা-কান্না, বিক্ষোভ-বিদ্রোহ-বিকার, আর জিজ্ঞাসা-অন্বেষা-প্রত্যাশার পাণ্ডুলিপি নির্মাণে তিনি সেই শব্দগুলোকেই ভিত্তি থেকে চিলেছাদ অব্দি অর্থবহ করে ব্যবহার করেছেন এবং একটা সর্বজনীন অভিজ্ঞতাকে সুনির্দিষ্ট মৌল বিন্দুতে এনে এমন নতুন করে পরিবেশন করেছেন যে পাঠকের মনে হয়েছে যেন 'অসংলগ্ন কাব্য'-র সময়সীমা থেকে বেরিয়ে এসে লেখককে তিনি স্বগতোক্তির সুরে শুধোচ্ছেন "সব কি রকম ওলোট পালোট হয়ে গেল—তাই না।"

অথচ আশা ছিল উৎসব সম্পন্ন করা যাবে। কি সে উৎসব? লেখক

অসংলগ্ন কাব্য। অসীম রায়। প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা—৭। সাত টাকা

বলতে কোনো ফাঁক রাখেন নি, "ঐ পোড়ো মন্দিরটার গায়ে প্লাইউডের কারখানার সামনে যে দুটো হিন্দুস্থানী মুটে বসে আছে, সাইকেলের দোকানে যে ছোকরা মাডগার্ডে রঙ বোলাচ্ছে, যে লাল শাড়ি পরা মেয়েটা লজিক মুখস্থ করে ঘামতে ঘামতে দৌড়চ্ছে কলেজের দিকে, এমন কি ঐ গঙ্গাস্নান ফেরতা বৃদ্ধবৃদ্ধা—এরা কেউ একা নয়। এদের মাঝখানে একটা প্রচণ্ড যোগসূত্র আছে। সাম্যবাদ আমাদের এই যোগসূত্রটা আরও সুদৃঢ় করার আহ্বান জানাচ্ছে···সাম্যবাদ একটা বিরাট কোরাস, একটা উৎসব।" কিন্তু ১৯৬৭ থেকে ৭২ এই পাঁচ বছর-ছ বছর সময়ে ধারণার যে বিঘ্ন সেই মৌলিক যোগসূত্রটাকে বিচ্ছিন্ন করে মানুষকে 'একা' এবং বিপন্ন করে দিয়েছে, কোরাসকে করে ফেলেছে ব্যক্তির মৌন যন্ত্রণা, আর উৎসবকে ঠেলে দিয়েছে দূরতর সুদূরে—সেই হাতপাওয়ালা বিষদাঁতনখের জীবন্ত বিঘ্নর মরার মাথা দিয়ে গেণ্ডুয়া খেলার মাঠ এই পশ্চিমবাঙলার প্রত্যক্ষ চিত্রকে, সাম্প্রতিক সময়ের "বামপন্থী রাজনীতি"র এক ব্যাপক অংশের পৈশাচিক রক্ত তৃষ্ণার কলঙ্কিত ইতিহাসকে অসীম রায় আগ্নেয় অক্ষরে পরিবেশন করেছেন। সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর, সমর্পিতপ্রাণ তরুণ বাঙালিকে তথ্যে ও লক্ষ্যে বিভ্রান্ত করে নিশ্চিত ধ্বংস ও চূড়ান্ত ব্যর্থতার অতল খাদে ঠেলে দিয়ে ঐ সব নেতৃত্বের যে রাজনৈতিক উচ্চাকাংক্ষা এক নারকীয় কুরুক্ষেত্র রচনা করল, পরিণামে সর্বত্র যে সমবেত জিঘাংসামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং চৈতন্য এলোমেলো করে দেয়া প্রায় উদ্দেশ্যবিহীন বারুদ-গন্ধক আর রক্ত পোড়ানোর আবহাওয়া রচিত হল, যার পরিসমাপ্তি এক করুণা ও ভীতি সঞ্চারক সিমফনির সুরে, মর্মান্তিক ট্রাজেডিতে—'অসংলগ্ন কাব্য' সেই নিষ্ঠুর সিমফনির স্বরলিপি, সেই চৈতন্য সাদা করা ট্রাজেডির পাণ্ডুলিপি। 'অসীম রায়ের গল্প'-এ যার নান্দি রচিত হয়েছিল, 'অসংলগ্ন কাব্য' উপন্যাসে তার পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপন। অতিসাম্প্রতিকের পুরো রাজনৈতিক ঘটনাকে বিষয় করে সার্থক গল্প যদিও বা কয়েকটা হয়েছে দু-একজন দায়বদ্ধ লেখকের হাতে, প্রকৃত উপন্যাস অসীম রায়ই লিখেছেন এবং লিখেছেন বহুতের মধ্যে এক এবং একের মধ্যে বহু বোধে সচেতন থেকে সুগভীর মমতার সঙ্গে, নিষ্ঠুর সমালোচনা করে আর বেদনায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। বস্তুত অসীম রায় গোটা পশ্চিম বাঙলার এই কুরুক্ষেত্র-পর্ব ও পরবর্তী অস্তিত্বের শূন্যতাটাকে এমন ভয়ঙ্কর রেখায় ও ভালোবাসার রঙে চিত্রিত করেছেন যে, পাঠক মাত্রেরই মনে হবে, এ এক দুর্ধর্ষ উপন্যাস।

এর কথা : এই দেশ আর দেশের মানুষ, এ সময়ে "একালের সবচেয়ে চমৎকার কবিতা" রচনা করতে চেয়েছিল, কিন্তু তা হয়ে উঠেছে "অসংলগ্ন কাব্য।"

কেন ? মহাভারতের সঞ্জয়ের মতোই বিবৃতি দিয়েছে সূর্য ব্যানার্জির কাহিনীকার বংশী মিস্তির। "যখন নয়াদিল্লীতে শুধু বিদেশী ব্যবহৃত গাড়ি কিনবার জন্যে নয়, বিদেশী-বিদেশিনীদের পরিত্যক্ত বাথটাব কিম্বা আণ্ডার-ওয়্যার কিনবার জন্যে কিউ লাগে ভারতীয় ব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবী মহলে,-এবং দিগবিজয়ী বামপন্থী নেতা ময়দানে বিপ্লবের আগুন ছিটিয়ে নিজের ছেলেকে পাঠান বিদেশে এই বিপ্লবের আগুন থেকে বাঁচাবার জন্যে, তখন এ কথা মনে না হয়ে পারেনা যে যাঁরা এক মহৎ কবিতা বাস্তবে পরিণত করার জন্যে আমার চোখের সামনে জীবন দিলেন অথবা তার চেয়েও কোনো ভয়ঙ্কর ভবিতব্যের পথে ধাবিত হলেন" তাদের কাহিনী লেখাতেই তার "জীবনের সামান্য সার্থকতা।" কিন্তু, তার কথা "আমার একটা বিশ্বাস গজিয়েছে, বোধ হয় গত দু'তিন বছরের অভিজ্ঞতায় নিজেদের কুরেকুরে, চেখে চেখে, চেটে চেটে যে, আমাদের কালের মহৎ কবিতা বোধ হয় অসংলগ্ন হতে বাধ্য।"

'অসংলগ্ন কাব্য'র নায়ক সূর্য ব্যানার্জি বা সোনা এবং তার ক্যাডার বংশী মিস্তিরের কাছে সাম্যবাদ ছিল বিপুল উদ্দীপনার। তারা দেখেছিল "সাম্য-বাদের জোর দিনকে দিন বেড়ে চলেছে, একটার পর একটা দেশে তার বিজয় পতাকা উড়ছে।" বুকচাপা নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে উঠে মানুষ "আবার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছে জীবনের দিকে। এটাই হল, একালের চমৎকার কবিতা।" কিন্তু সে বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে, দেখা দিয়েছে প্রবল সংশয়। বংশী মিস্তির বলেছে, "হয়ত আমরা মনের মাধুরী দিয়ে এক নিরবয়ব অস্তিত্বকে অবয়ব দান করেছি। হয়ত সাম্যবাদ মানে আসলে অন্যকে ক্রমাগত ল্যাঙ মেয়ে ফেলে দেওয়া, রোজ ভোরবেলায় উঠে কর্তার পাদোদক খাওয়া, রাত্রে শয়ন কালে একশ আটবার নেতার নাম জপ, রিভিশানিষ্ট, হঠকারী, সেকটেরিয়ান ইত্যাদি গালভরা শব্দের মাদুলী ধারণ। এমনি হতেই পারে সাম্যবাদ মানে আসলে কোন এক গোষ্ঠীর অন্তহীন পাওয়ারস্ট্রাগল। আমার এ সংশয় সন্দেহ প্রশ্ন— এও কিন্তু সোনারই অবদান। সাম্যবাদী জগতের যে সব লোকজনদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে তারা এসব কথায় প্রায় সিঁটিয়ে যান দেখেছি। এ সবই বুর্জোয়া কাগজের দুনিয়াজোড়া অপপ্রচারের মার্কিনী অর্থপুষ্ট প্রোগ্রামের অন্তর্গত এই রকম কথা বাল্যকাল থেকে শুনেছি।" কিন্তু তবু তারা সাম্য-

বাদেরই অর্থ খোঁজে এবং উত্তর পায় "সাম্যবাদ পিতলের প্রতিমা নয়, সাম্যবাদ একটা গাইড টু এ্যাকশান।" এবং সূর্য ব্যানার্জি হয়ে ওঠে তরুণ কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা। তার কথা "মার্কসের আগে পৃথিবীকে অনেক দার্শনিকই ব্যাখ্যা করেছিলেন কিন্তু পৃথিবীকে বদলাবার কথা কেউ বলেন নি। আমার আজ পৃথিবীকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বদলাবার কথা বলছি। নিজেদের না বদলালে কিছু হবে না। দেখছেন না, গত বছর দুবছরে এই বামপন্থী নেতাগুলো কি রকম মূর্তিমান আস্ফালনে পরিণত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা এই সমাজ ব্যবস্থার অলঙ্কাররূপে শোভা পাচ্ছে।"

'অসংলগ্ন কাব্য' কমিউনিস্ট আন্দোলনের চূড়ান্ত ফাঁপাপনার দিকটিকে নিষ্ঠুরভাবে উন্মোচিত করেছে। এই একটি দিককেই বারবার অসীম রায় তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেই সমালোচনা করে এসেছেন। কমিউনিজম না, কার্ল মার্কস, লেনিন ও লাল পতাকার নামে শপথ গ্রহণকারী আদতে পেটিবুর্জোয়া ঐ ফিকিরবাজ বা ভ্রান্ত নেতা ও কর্মীদের গভীর গভীরতর অসুখটা সারানোর জন্যে সৎ সমালোচকের ভূমিকা নিতে তিনি যেন জনতার কাছে, না, সহৃদয় সামাজিকের কাছে দায়বদ্ধ। শ্রমিকশ্রেণীর দর্শনকে তিনি যে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন, গভীর ভালোবাসা দিয়ে দেখতে চান নেতা ও কর্মীদের—একথা অসীম রায় তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেই অস্পষ্ট রাখেন নি। 'কিন্তু অসংলগ্ন কাব্য'-র অসীম রায় সেই সুরটিকে বজায় রেখেই ব্যথিত, ক্রুদ্ধ, আত্মযন্ত্রণায় নীল এবং ঘৃণা করা উচিত এমন দিকগুলোকে নির্মমভাবে কশাঘাত করেছেন করেছেন আর মমতাময় হৃদয়ের সুগভীর দরদে সেইসব মৃত কিশোরদের বেগবান প্রেরণায় আবেগময় আত্মহননের চিত্রকে অপরিসীম বেদনায় উপলব্ধি করে পরিবেশন করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি বারবার ধুয়ার মতো একটি কথাই সবাইকে শোনাতে চেয়েছেন "মানুষ বুঝেছে, তাকে নতুন কিছু করতে হলে তাকে নিজেকেই নতুন বানাতে হবে।" সূর্য ব্যানার্জির জীবন-ট্রাজেডির কথা বলতে গিয়ে অসীমবাবু একটা সময় খণ্ডের সত্যমূর্তিকেই—সময় মানুষের ট্রাজিক উপলব্ধিকেই—জীবন্ত ভাষায় উপস্থিত করেছেন। দেশকালের একটা বাস্তব বিভীষিকা শিল্প হয়ে উঠেছে চেতনাসম্পন্ন চরিত্রবান লেখকের হাতে।

একশো তেষট্টি পাতার এই উপন্যাসে যে-কটি চরিত্র অসীমবাবু উপস্থিত করেছেন—শুধু সূর্য ব্যানার্জি না, বংশী মিত্তির, তার বাবা, "যার জীবনে দুটি মাত্র গ্র্যাণ্ড প্যাশান—মামলা ও মেয়েমানুষ"; তার মা, যার কান্না "এ

বাড়িতে আমার সঙ্গী কেউ নেই, কতকগুলো দুশ্চিন্তাই আমার সঙ্গী" ; আর, যাকে দেখে বংশী মিস্তির একদিন ভয় পেয়েছে, লিখেছে, "আরুর সঙ্গে কথা বলতে আমার ভয় হোলো। এমন টানটান উদগ্রীব লড়াকু চেহারা বানিয়েছে এই দু তিন মাসের মধ্যে যে, সেই কচি বাঁশের কেঁপে ওঠার স্মৃতিটা ধাক্কা খেল ;" এবং সেই বিনতা, যার সঙ্গে বংশীর প্রেম ; এবং পোচখানে-ওয়ালারা—ছোট-বড় টুকটাক আঁচড়ে সেই প্রতিটি চরিত্রকে যথাযথ সিচুয়েশানে ফেলে একটিও বাড়তি কথা না বলিয়ে সুনির্দিষ্ট ভঙ্গিমায় বিচিত্রিত করতে পেরেছেন। এবং তিনি সার্থক শিল্পীর দক্ষ হাতেই জীবনের ভারসাম্য হারানো সূর্য ব্যানার্জিকে পাগলা গারদে নিয়ে যাবার পথে ম্যমিওয়ালা মিউজিয়মে নিয়ে গিয়ে জানালেন "যে মহাশূন্যটা আবিষ্কারের জন্যে এত কোটি কোটি টাকা খরচা করে মানুষ রকেট পাঠাচ্ছে সেই মহাশূন্য আমাদের মনের মধ্যেই। সূর্য ব্যানার্জির রকেটটা সেখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

অসীমবাবুর প্রকৃত বাহাদুরি এইখানে যে সূর্য ব্যানার্জির প্রতি নিখাদ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি সত্ত্বেও তিনি নিজের দ্বান্দ্বিক চেতনাকে (বা ইতিহাসবোধকে) পথভ্রষ্ট হতে দেন নি। অপরিসীম সততা ও বীরত্ব সত্ত্বেও সূর্যদের ভ্রান্ত পথের পরিণাম যে আত্মঘাতী হতে বাধ্য তা জানেন বলেই লেখক একেবারে গোড়া থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে সেই অনিবার্যতার দিকে কাহিনীকে টেনে নিয়ে গেছেন, তাঁর কলম কোথাও কাঁপে নি।

প্রকৃত সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে এই ভাবেই লেখক নিজেকে সংলগ্ন করেছেন।

বিপ্লববাদ থেকে সাম্যবাদ

সুনীল সেন

স্বদেশী যুগে বাঙলায় বিপ্লবী আন্দোলনের শুরু, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ তার শেষ পর্বের চমকপ্রদ ঘটনা। পেশাদার ঐতিহাসিকদের মধ্যে ডঃ রমেশ মজুমদার সর্বপ্রথম বিপ্লবী আন্দোলনকে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবময় পর্ব হিসাবে চিহ্নিত করেন। নলিনীকিশোর গুহ, বারীন ঘোষ, যদুগোপাল মুখার্জি, ভূপেন দত্ত, হেমচন্দ্র কানুনগো এবং স্বয়ং অরবিন্দ বিপ্লববাদের দর্শন এবং ইতিহাস সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। কিন্তু একমাত্র ভূপেন দত্ত ছাড়া আর কোনো পুরনো বিপ্লবীর লেখায় মার্কসবাদী বিশ্লেষণ চোখে পড়ে না। ভূপেন দত্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ না থাকায় বিপ্লবী আন্দোলন অনিবার্য ব্যর্থতার পথে অগ্রসর হয়। হেমচন্দ্র কানুনগো বিপ্লবীদের বাস্তবকে অতিরঞ্জিত করবার প্রবণতার সমালোচনা করেছেন। রাশিয়ার নারদনিকদের মতো বাঙলার বিপ্লবীরাও সন্ত্রাসবাদের অন্ধগলিতে আবদ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করেন। প্রশ্ন থেকে যায় যে বিপ্লবী আন্দোলন আমাদের জাতীয় আন্দোলনকে প্রসারিত এবং শক্তিশালী করতে কতটুকু সাহায্য করেছিল। সম্ভবত বলা চলে যে বিপ্লবী আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ প্রতিবাদ।

বিশিষ্ট মার্কসবাদী লেখক শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনের আলোচনা করেছেন। ভূমিকায় তিনি বলেছেন, তাঁর বই "জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের কাহিনী।" বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবার সময় তাঁর মনে বহু প্রশ্ন জমতে শুরু করেছিল ; তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা এই বইতে প্রতিফলিত। মনে প্রশ্ন জাগলেও দলের প্রতি আনুগত্য থাকায় তিনি বিপ্লবী আন্দোলন থেকে সরে আসেন নি ; বিপ্লববাদ

আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা। সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১২। দশ টাকা

স্বাধীনতা-সংগ্রামে দ্বীপান্তরের বন্দী। নলিনী দাস। মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১২। দশ টাকা

তাঁর আস্থা অটুট ছিল, যদিও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে তাঁর উৎসাহ বিশেষ ছিল না বলেই মনে হয়। শেষ পর্যন্ত আত্মজিজ্ঞাসার পথ পরিক্রমা করে তিনি সাম্যবাদী মতবাদ গ্রহণ করেন।

শ্রীমজুমদারের পরিচ্ছন্ন ভাষা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এমন সুখ পাঠ্য বই দেশে সুলভ নয়। তাঁর লেখা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করায় লোভ সামলানো গেল না। শিলিগুড়ি শহরের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন: "চেনা চোখে ধরা পড়ে ঐ তিনধারিয়ার আলোকস্তবক, ঐখানে কার্শিয়াং শহরের দীপালোকমালা আর ঐ দেখা যায় পূব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত পাঙখাবাড়ী রোডের আলোকিত আভাস।" বন্দী জীবনের নিঃসঙ্গ রজনীর কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: "সেনট্রাল টাওয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে চলে। নিস্তব্ধ নিশীথের প্রহর গুণতে গুণতে নিজের মনের রাশ টেনে ধরি। অধীর ভাবে সেলের ভিতরে পদচারণা করতে করতে কল্পনায় ভাবি আমি যেন প্রমেথিউস।"

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে সত্যেন্দ্রনারায়ণের জন্ম। তাঁর কিশোর মনে ছাপ ফেলে বিবেকানন্দের লেখা, শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'। অনুশীলন সমিতির এক দাদা তাঁকে দলে টানেন; "দাদা"-দের সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা অকুণ্ঠিত। দলের নির্দেশে রাজশাহী জেলার ছাত্র সমিতিতে তিনি সক্রিয় হন এবং বন্ধুদের দলভুক্ত করার চেষ্টা করেন। দলের সভ্য সংগ্রহ করাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। জওহরলালের বক্তৃতা শুনে তাঁর "মনের অনেকগুলি জানালা যেন একসঙ্গে খুলে যায়।" ডঃ ভূপেন দত্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ডঃ দত্তের কথাবার্তায় আবেগের লেশমাত্র ছিল না; বিপ্লবী দলগুলির দাদাদের বিরুদ্ধে তিনি সমালোচনা করেন। সেকালে ডঃ দত্ত দাদাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সমাজতন্ত্রের প্রচার করতেন। কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয় নি। সত্যেন্দ্রনারায়ণ অনুশীলন সমিতির দাদাদের অনুগত থাকেন এবং প্রত্যাশিত ভাবে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেলে যান।

ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনোয় তাঁর প্রবল আগ্রহ। বইপত্র পড়ে স্বভাবতই তাঁর মনে জাগে অনেক প্রশ্ন। "দাদারা কি সত্যি সংগ্রামের কোন পরিকল্পনা রচনা করেছেন?...আসন্ন গণ-আন্দোলনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি হবে?" অনুশীলন-যুগান্তরের ঝগড়া এবং প্রদেশ কংগ্রেসের দলাদলির পরিণতিতে ছাত্র সংগঠন দ্বিধা বিভক্ত হয়—একদিকে এ. বি. এস. এ., অন্য

দিকে বি. পি. এস. এ। তাঁর মনে হয় এই দলাদলি "শক্তির নিছক অপচয়।" যে সংকল্প তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে তা হল সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত করা। কিন্তু কি ভাবে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত করা হবে তা তিনি দাদাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। স্বাধীনতার রূপ সম্পর্কেও দাদাদের ধারণা খুব পরিষ্কার ছিল না; তাঁরা বলতেন যে তাঁদের লক্ষ্য নিপীড়িত জনগণের মুক্তি। কিন্তু কারা নিপীড়িত জনগণ? কি ভাবে তাঁদের সংগঠিত করা যাবে? প্রেসিডেন্সি জেলে কিছু কমিউনিস্টের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু তাঁর ভালো লেগেছিল শুধু ভবানী সেনকে। অবশেষে আন্দামানে বন্দী থাকার সময় তিনি অধ্যবসায়ের সঙ্গে মার্কসবাদী সাহিত্য পড়েন, কিন্তু "হৃদয় দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারে নি"। সর্দার গুরমুখ সিংহ তাঁর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেন এবং ১৯৩৭ সালে তিনি কমিউনিস্ট কনসলিডেশনে যোগ দেন।

বিপ্লবীদের অতি মানুষ ভাবা ভুল। তাঁদের মধ্যে আসে অবসাদ, শ্রান্তি-বোধ। কিন্তু সত্যেন্দ্রনারায়ণ হতাশায় আচ্ছন্ন হননি, তাঁর নজর রয়েছে "ইতিহাসের উদয় দিগন্তের পানে।" মধ্যবয়সে পা দিয়ে তাঁর মধ্যে "প্রবল হয়ে উঠেছে কোন কল্যাণীর স্নেহরসে সিক্ত পরশের জন্য আকাঙ্ক্ষা।"

নিঃসন্দেহে এই বই একজন বিপ্লবীর স্বপ্ন, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নিষ্ঠা, মনোবল আর সর্বোপরি গভীর দেশাত্মবোধকে বুঝতে সাহায্য করবে।

বাঙলার যে কয়েকজন বিপ্লবী বার্ধক্যের প্রান্তে এসেও ক্লান্ত হয়ে পড়েন নি, শ্রী নলিনী দাস তাঁদের অন্যতম। অসাধারণ দরদ দিয়ে তিনি লিখেছেন তাঁর পুরনো বন্ধুদের কথা, আন্দামানের সেলুলার জেলে যাঁদের জীবনের বহু বছর কেটেছে এবং শেষে যাঁরা কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। যতদূর জানি এই পর্বের ইতিহাস শ্রী নলিনী দাসই প্রথম লিখলেন। বইটি আরো মূল্যবান এই কারণে যে আন্দামান বন্দীদের কথা সমসাময়িক সংবাদপত্রে বিশেষ স্থান পায় নি ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত।

আন্দামানের সেলুলার জেল সাত.শত সেল বা ছোট কোঠা দিয়ে তৈরি। বেশির ভাগ বন্দী ছিলেন বাঙলার বিপ্লবীরা; ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকেও বিপজ্জনক বন্দীদের এখানে আনা হত। ১৯৩৩ সালে রাজবন্দীরা সাহসের সঙ্গে যে অনশন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, শ্রীদাস তার বিবরণ দিয়েছেন। এই সংগ্রামের পর থেকেই বন্দীরা কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা পেতে থাকেন, যেমন

পড়াশুনোর সুযোগ, আর তার ফলেই সেলুলার জেল সত্যি পরিণত হয় "বিপ্লবীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে"। মার্কসবাদী সাহিত্য পড়ে বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদী ধ্যানধারণা ছেড়ে সাম্যবাদের দিকে আকৃষ্ট হল। ১৯৩৫ সালে পঁয়ত্রিশ জনকে নিয়ে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন গঠিত হয়। ধীরে ধীরে বন্দীদের প্রায় সবাই সাম্যবাদী মতবাদ গ্রহণ করেন। শ্রীদাস বন্দীদের দ্বিতীয় অনশন সংগ্রামের বিবরণ দিয়েছেন, যা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং যার ফলে বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

জনমানসে বিপ্লবীরা বীরের আসনে প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের গভীর দেশপ্রেম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলন যে ব্যর্থ হয়েছিল তা মনে রাখতে হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বা তার পরে কোনো দেশব্যাপী অভ্যুত্থান তাঁরা সংগঠিত করতে পারেন নি। শ্রীমজুমদার এবং শ্রীদাসের বই পড়ে মনে হয় বিপ্লবীদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীও ছিল না। বিপ্লবী আন্দোলনের একটি ফল উল্লেখযোগ্য। এবং তা হল এই যে বিপ্লবীদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে ভারতীয় বামপন্থী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীর দল।

বাম ও দক্ষিণ সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে

নরহরি কবিরাজ

গ্রন্থকার মুখবন্ধে লিখেছেন :

"উগ্র বিপ্লববাদের প্রতি আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোকের, বিশেষ ক'রে তরুণ সম্প্রদায়ের আকর্ষণের কথা সকলেই জানেন এবং তার মারাত্মক পরিণতির কথাও সুবিদিত। এ ঘটনা যে আমাদের দেশের অবস্থারই বিশেষ বৈশিষ্ট্য-জাত নয়, এই তত্ত্বের যে আন্তর্জাতিক বিকাশের একটি ধারা আছে—সেইটি প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।"

গ্রন্থকারের এই বক্তব্য বিশেষ ভেবে দেখার মতো। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একেবারে গোড়া থেকেই এক ধরনের মেকী বিপ্লববাদ মার্কসবাদের নামাবলী গায়ে দিয়ে বার বার আত্মপ্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। মার্কসবাদকে সংশোধন করার এঁরা চেষ্টা করেছেন কখনও দক্ষিণপন্থী অবস্থান থেকে, আবার কখনও বামপন্থী অবস্থান থেকে। মার্কস ও এঙ্গেলস দক্ষিণ ও বাম উভয়বিধ সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম পরিচালনা করেন। মার্কসবাদী আন্দোলনের ভিতর থেকেই মার্কসবাদের ওপর এই আক্রমণ কেন বার বার দেখা যায় তার উত্তর দিতে গিয়ে লেনিন বলেছেন—ধনতান্ত্রিক সমাজের মধ্যেই এর বীজ রয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের অঙ্গ হিসাবে "মধ্যশ্রেণীর" এক ধরনের লোকের উৎপত্তি হয়ে থাকে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই মধ্যশ্রেণীর লোকেরা (যারা ক্ষুদে মালিক) প্রতিনিয়ত বিড়ম্বিত জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। শ্রমিকের সারিতে নেমে আসার সম্ভাবনা সব সময়েই তাদের সামনে বিদ্যমান থাকে। এই কারণে তারা কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু তারা তাদের পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীদৃষ্টি সহজে পরিত্যাগ করতে পারে না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর ছাপ কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভিতরে দেখা যায়। (লেনিন—'মার্কসবাদ ও সংশোধনবাদ' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

উগ্র-বিপ্লববাদী তত্ত্বের মারাত্মক বিপদ। রণধীর দাশগুপ্ত। লোকায়তিক, কলকাতা-৩। ছ-টাকা

এরা মার্কসবাদী আন্দোলনের মধ্যে দুই ধরনের সংশোধনবাদের আমদানী করে। একদল—অর্থাৎ দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদীরা বুর্জোয়াশ্রেণীর চিন্তাধারা মার্কসবাদের আবরণে প্রচার করার চেষ্টা করে। অপর দল মার্কসবাদের জায়গায় স্থাপন করতে চায় এক ধরনের পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদ। এই পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লববাদকে লেনিন বলেছেন শিশুরোগ,। অর্থাৎ কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে অংশ মার্কসবাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে নি, যারা পেটি-বুর্জোয়ার ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী মার্কসবাদকে ঢেলে সাজাতে চায়, লেনিন সেই প্রবণতাটিকে শিশুরোগ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয়বিধ সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে বার বার সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়েছে।

সম্প্রতিকালে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভিতরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একথা সুবিদিত যে মাত্র কয়েক বছর আগে চেকো স্লোভাকিয়ায় একদল দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী ভিতর থেকে সেখানে কমিউনিজমের বনিয়াদ ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আজ চীনে বামপন্থী সংশোধনবাদীরা অনুরূপভাবে কমিউনিজমের মূলনীতির ওপর অনবরত আক্রমণ চালিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে ধ্বংস করে তাকে একটি সুবিধাবাদী পেটিবুর্জোয়া পার্টিতে রূপান্তরিত করার জন্য উদ্যত হয়েছে।

এই গ্রন্থে লেখক পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের এক বিশদ বিবরণ তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে ট্রটস্কিবাদ এই পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের মূল। ট্রটস্কিবাদের বিপদ যে আজও কাটে নি তার একটির পর একটি উদাহরণ তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি ঠিকই বলেছেন যে একদা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সামনে ট্রটস্কিবাদ যে বিপদ সৃষ্টি করেছিল, তারই রকমফের মাওবাদ আজ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে তার থেকেও বড় রকমের বিপদ সৃষ্টি করেছে। ট্রটস্কিবাদ বিভিন্ন নয়া রূপে দেশে দেশে প্রভাব বিস্তারের যে চেষ্টা চালাচ্ছে, তারও চরিত্রটি লেখক তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত চিলিতে পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের ভূমিকার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, রেজিস দেব্রের 'বিপ্লবের ভিতরে বিপ্লব' নামক চাঞ্চল্যকর তত্ত্বটির তিনি স্বরূপ উদঘাটন করেছেন, আফ্রিকার বিপ্লবের পটভূমিতে লেখা ফাদার ফ্যাননের অতি-বিপ্লবী তত্ত্বের তিনি জবাব দিয়েছেন। লেখক ঠিকই বলেছেন—আজ পৃথিবীর সব দেশের, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের বিপ্লবী আন্দোলনগুলির সামনে এই

উগ্র বিপ্লববাদী তত্ত্ব ও তার সমর্থক পার্টিগুলি এক বিরাট বাধা সৃষ্টি করছে। এর বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম না চালিয়ে বিপ্লবী আন্দোলন অগ্রসর হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতের বিশেষ পরিস্থিতিতে এই পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের বিপদের প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন। ভারতে অর্থনৈতিক সংকট যত ঘনীভূত হচ্ছে, ততই পেটিবুর্জোয়া সমাজের এক ব্যাপক অংশ ধ্বংসের সম্মুখীন হচ্ছে। ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার—এরা বিপুল সংখ্যায় সমাজতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এরা আন্দোলনের ভিতরে নিয়ে আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখা ধ্যান-ধারণা। তারা মার্কসবাদকে নিজেদের মতো করে গ্রহণ করছে। পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য—অস্থিরতা, অতি-বিপ্লববাদ, তাড়াতাড়ি কাজ সারার প্রবণতা, চরম সুবিধাবাদ প্রভৃতি নিয়ে তারা কমিউনিস্ট আন্দোলনকে নিজেদের ছাঁচে গড়তে চাইছে। এরই রাজনৈতিক প্রকাশ নকশালপন্থী আন্দোলনে। এরই অভিব্যক্তি সি. পি. এম-এর পরস্পরবিরোধী, একান্ত সুবিধাবাদী চিন্তাধারায়।

শেষে একটি বিষয়ের প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যেহেতু বামপন্থী বিপ্লববাদ ও দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদের একই মাতৃগর্ভে জন্ম এবং এরা যমজ ভাই, তাই এই দুই ধরনের সংশোধনবাদের উৎস সম্পর্কে, এবং এদের মূলগত ঐক্য বিশ্লেষণ করে, একটি আলাদা অধ্যায় পরবর্তী সংস্করণে সংযোজন করলে বইটির মূল্য আরও বৃদ্ধি পাবে। সাম্প্রতিক কালের কয়েকটি ঘটনা লক্ষ্য করলে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। একদিকে অতি-দক্ষিণপন্থীরা (রজার গারোদি প্রভৃতি) সোভিয়েত-বিরোধিতায় অন্ধ হয়ে চীনের কাজকর্মের সাফাই গাইতে আরম্ভ করেছে, অন্যদিকে চীনের মাওপন্থীরা প্যারিসে ট্রটস্কিবাদী ছাত্রদের আন্দোলনের সমর্থনে, চেকোস্লোভাকিয়ার ঘটনার সময়ে প্রতিবিপ্লবকে সরাসরি সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছে। কার্যক্ষেত্রে, অতি-দক্ষিণপন্থী ও অতি বামপন্থীদের ঐক্য—সোভিয়েত-বিরোধিতায় এদের মধ্যে রাখিবন্ধন—এদের উভয়ের শ্রমিকবিরোধী পেটিবুর্জোয়া চরিত্রটি স্পষ্ট করে তুলেছে।

বইখানি সুখপাঠ্য, প্রচ্ছদ সুন্দর। ছাপা আশানুরূপ নয়। বইখানির বহুল প্রচার অবশ্য প্রয়োজন।

ঘরে

সুরজিৎ বসু

মা—মা···দরজা খোলো···দরজা খোলো···তুতু···তুতু···নীরা···নীরা··· দরজা খোলো, দরজা খোলো, দরজা খোলো···।

আসছি, বাবা আসছি, বাড়িতে যেন ডাকাত পড়েছে, এ কী—এমন করছ কেন, তোমার কী হয়েছে···মা···মা···শিগগির আসুন···। ব্যস্ত হয়ো না··· আমাকে একটু বসতে দাও। কী হয়েছে তোমার···হাঁপাচ্ছ কেন···কথা বলো ···মা। বৌমা, কী হল ? বাবা কেমন করছে ঠামমা। গা তো তেমন গরম··· একটা পাখা আনো। পাখা লাগবে না, আমার কিছু হয় নি। তবে এমন করছ কেন···শরীর খারাপ লাগছে না তো···কদিন ধরে বলছি প্রেশারটা চেক করাও, কিছুতেই কানে নিচ্ছ না···। একটু জল দাও। চলো, ঘরে চলো। এমন করে কড়া নাড়লে যেন কেউ তাড়া করেছে।

নাও, শুয়ে পড়ো, পাখাটা খুলে দেব ? না। তুতু এদিকে আয়। তোমরা কখন শুনলে ? কী ? কারফিউ। আর বোলো না একটা জানলা খুলে দেব ? জানলা সব বন্ধ করেছ কেন ? মা বললেন। ও। একটা খুলে দেব ? কি জানি···একটু চা দাও।

সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে ?···তুমি কী করে এলে—রিকসা পেয়েছিলে ? আর রিকসা···ওদেরও তো প্রাণের ভয়। হেঁটে এলে ? কি আর করব ! আপিশের আর সবাই ? সবার এক অবস্থা। বাজারে নাকি লুট হয়েছে ? কি জানি—সেবার কারফিউর কথা তোমার মনে আছে ? বছর দশেক আগে, না ? ষাট সালে বোধহয় ··আসামের দাঙ্গার···। তারপরে এই প্রথম।

এত লোক খুন হল তখন কারফিউ নেই—কোর্ট-ইনস্পেক্টর খুন হতেই—। কে জানে···তোমরা এ্যানাউন্স শুনেছিলে ? আমাদের এই গলি দিয়েই তো গেল। অথচ আপিশে বসে আমরা কেউ শুনতে পাই নি। শুনতে পাও নি ? না। আপিশ তো নয়, আড্ডাখানা।

অদ্য বিকাল পাঁচ ঘটিকায়…। এই তুতু, চুপ ! জানালাটা আবার কেন খুললে ? কিছু হবে না।

অদ্য বিকাল পাঁচ ঘটিকায়…। আবার ! তুতু বিছানায় আয়। না। আয় বলছি।

রাস্তায় কি দেখলে ? আর কি—সব কাছাখুলে দৌড়চ্ছে—কালীদা গিয়েছিলেন বেবী ফুড খুঁজতে—পান নি, এদিকে রিকসা ছেড়ে দিয়েছেন, ভেবেছিলেন ফেরার পথে অন্য রিকসা নেবেন—বুড়ো মানুষ, একটু হাঁটতেই হাঁপিয়ে পড়লেন, শেষে পেছনে ভ্যানের গোঁ-গোঁ আওয়াজ শুনেই সোজা রাস্তায় বসে পড়লেন। আহা ! আমিও দাঁড়াতে পারছি না, শরীর কাঁপছে—কি করব, তাঁকে ঐখানে রেখে চলে এলাম। চলে এলে ! কি করব, একটা রিকসা নেই, ভাবলাম, বুড়ো মানুষ, ওঁর আর কী হবে…

বারোটা থেকে কারফিউ, খবর পেলাম সাড়ে-এগারোটা বাজার পর… বেরিয়ে দেখি রাস্তা প্রায় ফাঁকা…শেষে যা থাকে কপালে বলে…অনেক দিন পর ভীষণ ছোটবেলায় ফিরে যেতে ইচ্ছে হল, ইশকুলে যাবার পথে, ফেরার পথে, এঘর থেকে ওঘরে কি আর হেঁটে যেতাম !

তোমার খাওয়া হয়েছে ? এখনই ? বেলা কম হয় নি। একগাদা বাসনপত্র, ঝি হয়তো ওবেলা আসবে না। একটু চা দাও—।

গুণধররা সব কোথায় ? কি করে বলব ? ওদের নিয়ে আর পারা যায় না, মাকে জিজ্ঞেস করো। মা কি করে জানবেন, ওরা কি কিছু বলে বেরোয় ? সব লায়েক হয়েছে। ওবেলা কী খাবে ? কেন ? বললে তো ওবেলা এসে বাজার করবে—তখন—। কিছু নেই ? কি করে থাকবে, ক-টা আলু পড়ে থাকতে পারে, তাছাড়া মা কি খাবেন, এবেলা দুধও আসবে না—।

অদ্য বিকাল পাঁচ ঘটিকায়—। তুতু !

পাড়ার দোকানে হয়তো—। বুড়োর দোকান ? হরতালের দিন একটু খোলা রাখে। হরতাল আর কারফিউ এক নয়, সর্বনাশ ! সিগারেট আনতে ভুলে গেছি। রাঃ, এই ফাঁকে ছেড়ে দাও।

খোকা। মা এসো। নীলু-বিলু তো…। তার আমি কী করব মা ? কোথায় থাকে কোথায় না-থাকে। দেশ উদ্ধার করছে।

দেশ উদ্ধার তোর বাবাও এক সময়ে করেছে, জেল খেটেছে, বোমা অব্দি বানিয়েছে—একবার স্বদেশী ডাকাতি করতে গিয়ে—। সে-জিনিস আর

এ-জিনিস এক নয় মা। কি দিনকাল! ভেব না মা, ঠিক ফিরে আসবে, হয়তো পাড়াতেই আছে, বন্ধুবান্ধবের—।

চেয়ারম্যান মাও যুগ যুগ জীয়ো, যুগ যুগ জীয়ো। তুত্তু আবার! পাড়ার ছেলেরা সব রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। মজা পেয়েছে।

দীনেশবাবুর ছেলেটা ফিরেছে? না। কী দুর্ভোগ ভদ্রলোকের।

ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ—ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ—। তোকে মেরে শেষ করব পাজি মেয়ে কোথাকার।

বারান্দায় গিয়ে দ্যাখো তো বুড়োর দোকান খোলা আছে কি না।

কারফিউ কতক্ষণ থাকবে? কাল সকাল ছ-টা অব্দি। ভদ্রলোকের কে কে আছে? কার? ঐ যে খুন হল। যারা যারা থাকে, সবাই—বৌ ছেলে মেয়ে মা। পথে বসল। অন্ ডিউটিতে মারা গেছে, কিছু টাকা-পয়সা হয়ত পাবে। তুমিও পাবে আমি খুন হলে। কী বাজে বকছ। সংসারটা ভেসে গেল। সংসার কোনোটাই ভেসে যায় না, একভাবে না একভাবে···।

সকালে একটা কাণ্ড হয়েছে—মামু বলে যে ছেলেটা, রমেশবাবুর ভাগনে, পাড়ার ছেলেরা ওকে মামু বলে ডাকে—। চিনি তো ওকে···। হ্যাঁ, কোত্থেকে ছ-টা বোমা এনে রান্নাঘরের পিছনে লুকিয়ে রেখেছিল—। বোমা! হ্যাঁ, লুকিয়ে যখন রাখে তখন কয়েকটা বাচ্চা ছেলে দেখতে পায়—। বলো কি! কত বয়স? বেশির বেশি আট-দশ বছর সব কটার। তারপর? ছ-টার ভেতরে তিনটে সরিয়ে ফেলেছে। ঐ দুধের শিশুরা! দুধের শিশু কাকে বলছেন মা, আট-দশ বছরের ছেলে আজকাল আর—। পেকে ঝানু।

স্কুকু না মা সকালে একটা বোমা—। চুপ, বেশি পাকা, না? তা কি হল? মামু জানতে পেরে একে ধমকায়, ওকে ধমকায়—। পাওয়া গেল? কোথায় পাওয়া যাবে, কেউ মুখ খোলে নি। সব খেলা পেয়েছে, স্কুল-কলেজ নেই তো কি করবে।

তোর বাবাও বোমা বানাত। সে-বোমা আর এ বোমা এক নয় মা।

ছেলেগুলো সব দৌড়ে এদিকে আসছে। গাড়ির শব্দ পেয়েছে।

কি রে অনন্ত, কি হয়েছে? গাড়ি আসছে। কোথায়? কে জানে! বুড়োর দোকানটা খোলা নাকি রে? না। সব বন্ধ? না, ফাঁক আছে। আছে? কেন? একটা কাজ করে দিবি? চারটে-ডিম···ঘরে খাওয়ার কিছু নেই। দিন। ওকে টাকা দিয়ে দাও—আর দু-প্যাকেট সিগারেট—নাম্বার

টেন, কেমন ! আচ্ছা। আর যদি কলা পাস, চারটে কলা—। কিছু পেঁয়াজ আনিয়ে নিলে হত। বাদ দাও, পেঁয়াজ ছাড়াই হবে। কত লাগবে ? পাঁচ টাকার নোট দাও না, যা লাগবে, দেখিস পেঁয়াজ পাস কিনা, আড়াই শো— বাজারে কোনো দোকান লুট হয়েছে শুনেছিস ? হ্যাঁ, তিন-চারটে দোকান লুট হয়েছে। এই কারফিউর মধ্যে লুট।

লুট তো কারফিউর মধ্যে করতেই সুবিধা। ও, বুঝলাম। কোন চোরের সাহস আছে এই কারফিউর মধ্যে বেরুবে ? তাছাড়া চালের বস্তা তেলের টিন ডালদার টিন এসব তো আর ঘাড়ে করে চুরি করা যায় না—। তাহলে—। বুঝে দেখুন, কোনো ফাদার-মাদার নেই, গাড়ি নিয়ে এসে দোকানের দরজা ভাঙছে মালপত্র তুলে নিয়ে যাচ্ছে, কে বাধা দেবে ?

ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ, ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ—। উঃ, এই মেয়েটাকে নিয়ে তো আর পারা যায় না। তাড়াতাড়ি এসো।

ছেলেটি ভালো। কে ? এই অনন্ত। আজকাল কে ভালো, আর কে যে…ওর নামেও তো নানা কথা শুনি —। তবু তো ওকেই দোকানে পাঠিয়ে তুমি ঘরে রইলে।

বৌমা স্নানে যাও। চা দিও। অনন্ত আসুক। এলে আমি নিয়ে নেব। মাধু কোথায় ? ঘুমোচ্ছে।

কম্যুনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ, মার্কসবাদী পার্টি জিন্দাবাদ। তুতু বিছানায় এসো, জানালার উপরে উঠেছ কেন ? হাত ফসকে পড়ে গেলে আর দেখতে হবে না। পড়লেই ভালো, শিক্ষা হয়, সারাদিন জানালার উপরে উঠে শিক ধরে দোল খাবে।

দোলনা তো জীবনে চোখে দেখল না ওরা, আমরা বিয়ের পরেও বাপের বাড়ি গিয়ে দোলনায় চড়েছি—উঠোনের ওপরে ছিল একটা বড় আমগাছ, পরেশদা বলে চাকর ছিল, তিনি গাছের ডালের সঙ্গে দড়ি দিয়ে দোলনা বানিয়ে দিয়েছিলেন।

রাজস্থানে একরকম সুন্দর দোলনা হয়।

রাজস্থানে ! কোথায় দেখলে !

কি একটা সিনেমায়।

গুলির আওয়াজের মতো হল না ? তুতু, জানালা থেকে সরে এসো বলছি। তুমি স্নানে যাও, একটু চা দিও।

ওদের আর চিঠিপত্র দিয়েছিস ? আগের চিঠিরই তো উত্তর আসে নি।

আর তা ছাড়া গরজ করেও বা কি হবে, এ অবস্থায় বিয়ে—। কিন্তু দিতে তো হবে। কি করব বলো, কিছুই তো আমাদের হাতে নেই—মাধুকে তো আজকাল গীটার নিয়ে বসতে শুনি না। ইশকুলে যেতে পারছে না, কি করবে? যা শিখেছে তাই বাজাক, একটা কিছু নিয়ে থাকুক।

ঠাকুরঝিকে তুলে দিন মা, আমার বেশিক্ষণ লাগবে না, চা নাও। রাখো এখানে। যাও মা, অনেক বেলা হল।

শোনো, একটা কথা। কি কথা? কোণার ঘরের মেঝে ভর্তি রঙের দাগ—। রঙের দাগ। ছোটঠাকুরপো পোস্টার লেখে। মেঝেটা ভালো করে মুছে রাখো, রঙ তুলি সব কোথায়? তুলি কোথায়, কাঠির আগায় তুলো পেঁচিয়ে—। রঙ? আলতা আর নীল। ও। পত্রিকা-তত্রিকা? কি জানি? মেঝেটা মুছে ফেলো, চা খেয়ে আমি দেখছি।

এই যে নিন। কে, অনন্ত? জানালা দিয়েই দাও।

মাধু, মাধু। কি মা? তুই কোণার ঘরটা মুছে ফেল, বৌমা স্নানে যাক। তোমার খাওয়া হয়েছে মা? এই বসব, বৌমার হোক। বৌমার সঙ্গে কি, তুমি বসে পড়ো।

ডিম পেয়েছে? হ্যাঁ। সিগারেট? হ্যাঁ। মাছ গেল। কলা? না।

একটা দেশলাই আনতে দিলে হত। দেশলাই আছে। আছে?

তুতু আয়। গল্প বলব। রাজপুত্রের গল্প আমি শুনব না। অন্য গল্প বলব। কি গল্প? আয় না, বলছি, কাপটা নাও, আয় তুতু। ওরা কি বাড়ি বাড়ি সার্চ করবে? কে জানে। তুতু আয়। দাঁড়াও আসছি।

কোণার ঘরের কাগজপত্র দেখবে বললে। দেখব, মাধু গেছে? হ্যাঁ। সারাটা রাত কি করে কাটবে। ভেবে আর কী হবে? চারদিকে কেমন সব চুপচাপ। কাকগুলোও যেন সব টের পেয়েছে। দ্যাখো তো কে এল, গেট খোলার শব্দ হল। মেজঠাকুরপো। বিলু? হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করো তো কোথায় ছিল। তুমি জিজ্ঞেস করো। কেন, তুমি—? আমার কথা কানেই তোলে না। বেশি লায়েক হলে অন্য ব্যবস্থা করতে বলো, এখানে এসব চলবে না, নীরাকে বলো। বৌমা স্নানে গেছে।

মাধু, মাধু।

যাই বড়দা।

এদিকে শোন, তুতু এখনও বলছি নেমে এসো।

কি বলছ ? কোণার ঘর মোছা হয়েছে ? হ্যাঁ। ঘষে মুছেছিস ? হ্যাঁ। বিলু এল না ? হুঁ। জিজ্ঞেস কর এতক্ষণ কোথায় ছিল, সারা শহরে কারফিউ ! আর-একজন কোথায়, কখন বেরিয়েছে ? সকালে চা খেয়ে। এদের এই বিপ্লবের ঠেলায় তো আমার জীবন যায়, তোমরা যাও মা, এ যে কী এক অস্বস্তির মধ্যে পড়েছি, আয় তুতু। আমি ঠামমার সঙ্গে যাব। এখন বাবার কাছে থাক, পরে আমি ডাকব। ঠিক তো ? হুঁ।

আমি ঘুমোব না কিন্তু। শো তো, ঘুমোতে হবে না। জানো বাবা, খোকা না কাল চানাচুর খেয়েছিল। চানাচুর ? হুঁ, যখন পেট খারাপ হবে, তখন বুঝবে। তুমি খাও নি তো ? ছোটরা কি চানাচুর খায়, হুঁ বাবা, বড় হলে আমাকে অনেক চানাচুর কিনে দেবে ? দেব, একটা গল্প বল তো। কোন গল্প ? ঐ যে সেদিন তোকে বললাম। টুনটুনির ? বল। দাঁড়াও। একি, গল্প বলতে হলে বুকের ওপর চড়ে বসতে হবে নাকি ? শোনো না। না নেমে বসো, এখন কি পারি, তুই বড় হয়েছিস না ? আমার কথা শোনো, আমার কথা শোনো। কি কথা ? এক বেতাল ছিল, এক বেতাল ছিল, এক বেতাল ছিল। কেবল তো এক বেতাল ছিল বলছিস, তারপরে কী ? তারপরে এক বেতাল ছিল। যাঃ ! তুমি বলো। আমি বলব কেন, গল্প তো তুই বলছিস। তুমি বলো। তাহলে তুই চিৎ হয়ে শো, আমি তোর বুকের ওপরে চড়ে বসি। তুমি কি মহাদেব ? কেন, মহাদেব কী করে ? মা কালীর বুকের ওপরে। তুই সব গুলিয়ে ফেলছিস, মহাদেবের বুকের ওপরে কালী দাঁড়ায়। তুমি খুব বেশি জানো, না ? ঠিক আছে, ঠামমার ঘরে ছবি আছে, দেখে আয়। বাবা, কালীপুজোর সময়ে আমাকে অনেক বাজি কিনে দেবে ? দেব। বাবা, সি.আর.পি. র মা কোথায় থাকে ? বাড়িতে। কোন বাড়িতে ? ওদের বাড়িতে। ওদের বাড়ি কোথায় ? অনেক দূরে। অনেক দূরে ? হুঁ। আকাশের চেয়ে দূরে ? হুঁ।

তোমার হয়ে গেল ? হুঁ। বিলু খেয়েছে ? বসেছে। একটা পান দিও তো। তুমি পান খাবে ? খাব। মা আমিও একটা পান খাবো। আয় খাওয়াচ্ছি।

তুতু !

ঠামমা ডাকছে, আমি যাই।

মেজঠাকুরপোকে বললাম। কি বলল ? কাগজপত্রে হাত দিতে মানা

করল। মানা করল মানে? বলল, এসে রাগারাগি করবে। তার জন্যে বাড়ির লোক সব বিপদে পড়বে? বলল, কিছু হবে না। কী করে জানল কিছু হবে না? বলল তো। তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না, সার্চ করে বাড়িতে বে-আইনী কাগজপত্র পেলে কী হবে ভেবে দেখেছ? তার আমি কী জানি! তুমি কী জানো মানে কী?—ন-মাসে ছ-মাসে আমার সঙ্গে একটা কথা হয় কিনা সন্দেহ, তোমার সঙ্গেই যা—। এসব কথা আমি বলতে পারব না। কী আশ্চর্য, এরাও বা ব্যাপারটা বুঝছে না কেন, মাকে বলতে বলো। মা কিছু বলবেন না। কেন? তা আমি কি করে বলব? তাহলে সব কি একা আমাকে সামলাতে হবে? সে তুমি জানো। কে এল দ্যাখো। কেউ না। গেটে শব্দ হল। ঠাকুরপো বেরিয়ে গেল। বিলু? হ্যাঁ। আবার বেরোল, এরা কি চায় আমি পাগল হয়ে যাই? পান নাও। দ্যাখো, এ-সব টেনশন আমি একদম সইতে পারি না। তুমি বেশি বেশি ভাবো। ভাবব না? ভেবে কী হবে? ভেবে কি হবে মানে? তুমি ভাবলে কি ঠাকুরপোরা বদলাবে, কারফিউ উঠে যাবে? আশ্চর্য! ঠিক আছে; চলো কোণার ঘরটা দেখি। ওর মধ্যে তুমি যেও না। কেন? মা হয়তো—। মা! মা কিছু বলেছে? কিছু বলেন নি, তবু—। ও, ছোটছেলে! আশ্চর্য। বাবা জেলে মারা গেছেন তো। তাতে কি? তুমি বুঝবে না, মানুষের মন। ও, তাহলে থাক, যা হবার হোক—ঘর যে এত নির্মম, অপরিচিত তা আগে টের পাই নি নীরা, ঠিক আছে, আয় তুতু। ..যা শুয়ে পড়।

তাছাড়া নানা রকম কাগজপত্র থাকে, তোমার না দেখাই ভালো। ও, তা এ-বিদ্যে আবার কবে থেকে হল? আমি কি হিসেব করে রেখেছি, একদিন বালিশের ওয়ার খুলতে গিয়ে নজরে পড়ল, তাই বলছি। বই, না ছবি? ছবি, ফটো। ছিঃ ছিঃ! এরা করবে দেশ উদ্ধার। বয়স কম, তাই। কম বয়স আমারও একসময়ে ছিল; আমাদের ছিল গণনাট্য, আর এদের হয়েছে হিন্দি সিনেমা, হবেই তো। হিন্দি সিনেমা তো আর ওরা বানায় না। ওরা দেখে বলেই কালো টাকা সেগুলো বানায়। আর তোমরা হলে-হলে সেগুলো চলতে দাও।

রেডিও খুলল কে? ঠাকুরঝি হয়তো। বন্ধ করতে বলো, ওরা কী বলো তো, কারফিউটাকে ওরা কি ছেলেখেলা বলে ভাবছে? বন্ধ করেছে? রোজ খাওয়ার পরে এসে ধরে তো—অভ্যাস—। দম মারো দম···। তুতু এখন

পান কোরো না। কেন ? মানা করছি তাই, তর্ক কোরো না, চোখ বোজো।

পা-টা সরাও তো। পায়ের কাছে কেন, এখানে এসো। না, পা সরাও।

চল চল চল মেরে হাথী ·। তুতু।

আমার হারটা আর ছাড়িয়ে আনা হবে না। আসলেব চেয়ে সুদ বেড়ে গেছে। আগে আনলে—জিনিস গেলে আর আসে না। তাও ভস্মে ঘি ঢালা। ঐ কবে পরীক্ষার দিন দেওয়া হল—পরীক্ষা বাতিল হল—আবাব কবে হবে কে জানে, আর দিন পডলেই বা লাভ কি ?—যারা পরীক্ষা দেবেন তারা তো—। আবাব ফিস দিতে হবে না তো ? কে জানে। লোককে পাগল না বানিয়ে এসব থামবে না। তুতু ঘুমিয়েছে ?

এই তুতু, তুতু—ঘুমিয়েছে। তুতুর নখগুলো কেটে দিও, কী বড় হয়েছে।

চুলটাও ছাঁটাতে হবে, সামনেব রবিবারে নিয়ে যেও।

রবিবারে ভীষণ ভীড হয়।

আজ সুন্দর যেতে পারতে, কিন্তু—আচ্ছা, সার্চ করতে এসে মেয়েদেরও নাকি ওরা—। কি জানি। পত্রিকার লেখা যদি সত্যি হয়—। আমাদের কিছু করার নেই—।

মা গো।

ওপরে উঠে এসো। না, ঠিক আছে, মাঝে মাঝে বুকটা—মনে হয়—কিছু বলছ না যে ? কি বলব ?

তোমার পায়ে পর পর তিনটে লাল তিল। থাক। বাঃ। দেখি, পা-টা একটু তোলো তো—এই ত্যাখো আর-একটা, ডান পা দেখি, এ-পায়েও গো। ক-টা ? এক দুই তিন—পাঁচটা। বলো কি, লক্ষ্য করি নি তো। এই আর-একটা। লাল তিল থাকলে কী হয় ? কি হয় জানো না—যদি রঙ বদলায়—।

লাল রঙ ?

হ্যাঁ।

ক্যান্সার !

দেখি, উঠে বোসো তো, পাঞ্জাবিটা তোলো—ইস, এক্কেকটা কত বড় হয়েছে ত্যাখো—তোমাকে বারবার বলি সিগারেট ছেড়ে দাও—সিগারেট ছেড়ে দাও—তুমি কাল সকালেই ডাক্তারের কাছে যাবে। এই ত্যাখো কানের কাছে একটা—,নাঃ, সব ব্যাপারে তুমি ভীষণ গড়িমসি করো। কাগজে এসব

ছাপানো খুব খারাপ। লোককে সাবধান করে দেবার জন্যই ছাপানো—যে গ্রাহ্য করবে না, সে ভুগবে। এই ছাখো, গলার নিচে আর-একটা। বাদ দাও। বাদ দেব কি! এ তিল আমার আগে থেকেই ছিল। ককখনো না। থাকলে আমার নজরে পড়ত—আর তুমি তো একটু পেট কামড়ালেই আমাশার ওযুধ খাচ্ছ। এখানকার জলের দোষ। তার মানে তোমার পায়খানা ভালো হচ্ছে না—পত্রিকায় ঠিক এরকম লিখেছে। নাও, ছাড়ো। না, ছাড়ব না, ঘুরে বোসো, পিঠটা দেখি। কি ছেলেমানুষি করছ? ঘুরে বোসো। আমার কী হবে! পিঠ ছেয়ে গেছে—। ক'টা? কত গুনব? একটা দুটো তিনটে চারটে—। দাঁড়াও, আমি উলঙ্গ হয়ে বসি, তুমি সারা বিকেল বসে বসে গোনো—যাও চা বসাও। আচ্ছা, তিলগুলো এতদিন আমার নজরে পড়ে নি কেন?

এ কথার আমি কি উত্তর দেব? হয়তো যখন কেবল লাল ছিল তখন ভালোই ছিল, তিলগুলো বেশি লাল হতে চেয়েই বিপদ ডেকে আনল।

তোমার কথা আমি বুঝি না।

আমাকেও তো তুমি বোঝো না। আমরা পর হয়ে যাচ্ছি; ভাগ্যিস কারফিউ হয়েছে তাই এখন ভাবতে বসেছ।

বাড়িতে পাঞ্জাবি পরাটা তুমি ছাড়ো—আমার বাবা তো খালি গায়েই থাকেন। আমি তোমার বাবা হলে খালি গায়েই থাকতাম। কাল তুমি নিশ্চয় ডাক্তারের কাছে যাবে, আগে থেকে সাবধান হওয়া ভালো। কি লাভ! ক্যান্সারের চিকিৎসা করার টাকা আমার নেই—তাছাড়া, বাড়িতে বেআইনী পত্রপত্রিকা আছে জেনেও যখন তুমি কিছু করতে পারছ না—অসহায়ের মতো মেনে নিতে হচ্ছে তো, সব ব্যাপারেই তাই। তোমার সেই অপারেশনের জন্যেই এসব হচ্ছে কিনা কে জানে। অপারেশনের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী? থাকতেও তো পারে, লুপ লাগিয়ে ইনুমাসীর কী কাণ্ড হল ছাখো নি—ডাক্তার তো বলেছিল খুব 'সেফ'। পুরুষের ব্যাপারটাই আলাদা, তোমাকে বলি নি? ঠিক করে আনতেও তো হাঙ্গামা নেই। তবে তাই করে এসো। সময় চাই, তাছাড়া আমি ঠিক হলে তোমার তরফে খরচ বেড়ে যাবে—তারপর বড়ি খেলেও অনেক মহিলার নানারকম উপসর্গ দেখা দেয়—। তাহলে?

তাহলে হাতে থাকে পেন্সিল।

তার মানে ?

তার মানে পেন্সিল, যেদিকে যাবে তোমার মাথা ঠুকে যাবে।

তুমি এমন ভাবে কথা বলো যে দম বন্ধ হয়ে আসে। দম আমি বন্ধ করছি, না তুমি ? জানালাগুলো খুলে দাও। না। ভেতর দিকের একটা জানালা অন্তত খুলে দাও। না। তাহলে মরো দম বন্ধ হয়ে, আমি কি করব। বিয়ের সময় তোমাকে আজীবন বাঁচাব এমন মন্ত্র যদি পড়ে থাকি তাহলে উইথড্র করছি—আসলে, বাঁচানো রক্ষণাবেক্ষণ করা বা ভরণপোষণ আশ্রয় ইত্যাদি বাক্যগুলো আজকাল প্রধানমন্ত্রীর শপথবাক্যের মধ্যে থাকলেই ভালো হয়—অসহায় স্বামী বেচারিরা—কি হল ? এত অল্পে চোখে জল এলে চলবে কেন—কি, মুখ তোলো—বোকা কোথাকার—তোলো। হ্যাঁ, হাসো —না হাসলে কিন্তু চুমু খেয়ে দেব—পাগলি !. যাও চা বসাও, মন খারাপ কোরো না—ভেবে ছাখো সারা রাত এখনও বাকি, তখন কি করবে—যাও ওঠো। বাতিটা জেলে দাও—ছাখো নীলু এল কিনা—এই তুতু, তুতু, আর ঘুমোয় না, ওঠ—ওঠ—তুতু, ওঠ মা।

আমাকে বলছিস ? না মা, তুতুকে তুলে নিয়ে যাও তো—ঘুম থেকে উঠে কোলে না উঠলে তো আবার—। আয় হিসি করবি আয়—আয়। আয়, ছাখ ছোটকাকু কী নিয়ে এসেছে, আয়। ওকে একটা তিলের নাড়ু দিও তো মা। নাড়ু কি আর আছে, নীলুর জ্বালায়—পেটের ভেতরে রাখলেও খুঁজে বের করে, এমন। ছোটকাকু সেদিন তিনটা খেয়েছে। তোকে দেয় নি ? মাত্র একটা। ছোটকাকু একটা রাক্ষস। যাও হিসি করে এসো।

বাবা, একটা স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্ন, হাঃ হাঃ ! তুইও স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিস ! দেখি কি গাছের ওপরে একটা সি. আর. পি. বসে আছে। কি গাছ রে ? গভীর জঙ্গলের ধারে একটা সরোবর, সেই সরোবরের তীরে একটা বটগাছ। গভীর জঙ্গল ! সরোবর থেকে একটা বিরাট অজগর সাপ এসে ঘোড়াগুলোকে সব খেয়ে ফেলল। স-ব ? হ্যাঁ। তখন সি. আর. পি.টা কি করল ? সি. আর. পি.টা তখন আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে এসে সাপটা যে মণিটা রেখেছিল তার ওপরে এক খাবলা গোবর ফেলে দিল। গোবর ? হ্যাঁ। তারপর কি হল ? চারদিক অন্ধকার—সেই অন্ধকারে সেই সাপটা—তারপর কি হল বাবা ? কি করে বলব, এখনও তো অন্ধকার হয়

নি। বলো না। ঠামমার কাছে যাও, ঠামমা জানে। বলো ঠামমা। সন্ধ্যার পর বলব! সন্ধ্যা হয়ে গেছে—বলো।

বাতি জ্বালিয়েছিস কেন? জানালাগুলো সব বন্ধ দেখছ না—থাক। বলো ঠামমা। তারপর আর কি, রাজপুত্র এসে রাক্ষসীটাকে মেরে ফেলল। রাক্ষসী কই? সি. আর. পি.টাই আসলে রাক্ষসী—সি. আর. পি.র রূপ ধরে এসেছিল। আর রাজপুত্র। রাজপুত্র ছিল গভীর জঙ্গলের ভেতরে—সে পথ হারিয়ে ফেলেছে, বেপথে হাঁটতে হাঁটতে তেষ্টায় তার বুক ফেটে যাচ্ছে—শে যে—সঠিক পথ খুঁজে পে-য়েই ছাখে সরোবর—আর সেই সরোবরের তীরে—। নীলু এলে তুমি একটু বোলো মা—। বলে লাভ নেই—তারপর সেই রাজপুত্র—। বলো। বলছি, তুই আমার কোলে আয়। এবার বলো, তারপর সেই রাজপুত্র—। চোখের জল মুছে ফেলো মা—কি করবে, যা দিন কাল—। বলো ঠামমা। চা নাও। তুতুকে নিয়ে যাও—যা তুতু। কপালে আরও কি আছে কে জানে। তুমি কিছু ভেব না মা, আমি তো আছি।

মা, ক-কৌটো চাল নেব? ভাত আছে? ছোট্‌ঠাকুরপো তো খায় নি—দু কৌটো নাও। ওবেলার কিছু আছে? না। ডিম করো, আর ডাল বসিয়ে দাও। আমাকে একটু খেতে দাও। কি খাবে? দুখানা পরোটা যদি—। না, পরোটা খেতে হবে না—এমনিতেই অম্বলের জ্বালায়—। তাহলে দাও যা খুশি। রান্নাঘরের পাট তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফ্যালো। পাড়া আজ একেবারে চুপ। ছেলেগুলো কি এখনও বাইরে? ছাখো তো কে ডাকে। কোথায়? কড়া নড়ল যেন। না। ছাখো একবার। না, কেউ নেই। শুনলাম যেন! রাস্তায় লাইট নেই। কেন? বাড়িতে কানেকশন কতক্ষণ থাকে ছাখো। আজকাল এই এক—। লণ্ঠনগুলো ঠিক করে রাখো ছাখো তেল আছে কিনা। মোম আছে? একটা দেশলাই দাও, পকেটে রাখি—আমার যেন কি রকম শীতশীত লাগছে। তোমার তো ঐ এক বাতিক—। বাবা, আজ পড়তে বসব? না, আজ পড়তে হবে না। মাধু কি করছে একাএকা। শুয়ে আছে। তুমি ওঘরে যাও মা। ওরা এখনও বাড়িতে ফিরল না, কি জ্বালাতন বল তো। ছাখো তো এ্যাসপ্রো আছে কিনা। কেন? মাথাটা কেমন টিপ টিপ করছে। ঐ তোমার এক রোগ। ভেবেছিলাম এমনি সেরে যাবে—কিন্তু, তুতু, আমার চুলটা একটু টেনে দে তো মা।

ওগো শুনছ, ও-গো। ঘুমোও নি ?

আসছে না—তোমার ?

নাঃ, মাথাটা—টিপে দেব ? না, থাক। দিই, ভালো লাগবে। রাত কটা এখন ? কে জানে ! দুটো-আড়াইটে হবে ! হতে পারে। মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। এ্যাসপ্রো খেয়েছ ? একটা। তোমার ঘুমের ওষুধ ? হ্যাঁ, আর খেও না। মা বোধহয় ঘুমোয় নি। কি জানি। ওরা আসে নি ? না। বিলুও আসে নি ? এসেছে। নীলু ? না। বিলুও না এলে ভালো করত। বলল ওদের নাকি ভয় নেই। কিন্তু বয়সটা ? বলল থানার লোক সঙ্গে থাকে। ও। ওর ভয় সাদা চোখে যদি না আসে। আর ভাবতে পারি না। ঘুমোও। বুকে একটু হাত বুলিয়ে দাও তো—কেমন যেন—। একটা জানালা খুলে দেব ? না। ভেতরের দিকের ? না। শব্দ না ? না, কৈ ? হ্যাঁ, চুপ করো। গলিতে ঢুকেছে। চুপ করো। আমার কেমন করছে। শুয়ে পড়ো। আমার ভয় করছে—ওগো। ভয় নেই। ঐ শোনো, কড়া নাড়ছে, শুনছ ? না। চুপ করো। আমাদের বাড়িতে নয়। আমাদের বাড়িতেই।

বড়দা—বড়দা !

মাধু ডাকছে।

আমার মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে—।

বড়দা—বড়দা—।

আমি পারি না, নীরা, তুমি যাও।

আমার হাত-পা কাঁপছে।

তুমি যাও।

বড়দা—বড়দা !

শোনো কে দৌড়ে যাচ্ছে—একি, তুমি হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছ কেন ? কি হলো !

নীরা—নীরা—। এই যে আমি—। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আমি—। বাতি জ্বালি ? না—না।

বড়দা—বড়দা—।

আমার বুকে একটু হাত বুলিয়ে দাও। তুতু শুয়ে থাক—শুয়ে থাক—উঠতে হবে না।

বড়দা—বৌদি—বৌদি—।

যাও, দরজা খুলে দাও। বাবা! তোমার কী হয়েছে বাবা? কিছু না মা—কিছু না। লাইট জ্বালো—আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।

বৌমা দরজা খোলো—বৌমা।

ওরা বোধহয় পাড়ায়—।

মা, ও কেমন করছে। মশারিটা তুলে দাও—মোম জ্বালো। আলোটা ঢেকে দে—ঢেকে দে। বড় অন্ধকার মা আমার ভয় করছে বাবা কি হবে নীলুটা বিলু কোথায় ভেবে কি হবে মা বৌদি আলোটা আরও ঢেকে দাও এই পত্রিকাটা নাও অত জোরে কথা বোলো না ঠাকুরঝি বোসো কে চিৎকার করছে কি হল ওগো অমন করছ কেন মা একটু জল আনো কষ্ট মা বড় কষ্ট এই জলটা খা একটু খা মা তুই এমন করলে আমরা কি করব বাবা তুতু আয় আমি হাওয়া করব পরে তুতু পরে কেন পরে কোরো একটু ভালো লাগছে না মা শব্দ কিসের মা ওকথা থাক কে চিৎকার করছে ওকথা থাক পাখাটা থাক ভীষণ শব্দ কি হল ছাখো মেজোঠাকুরপো কি হল মা হাওয়া পরে পরে ওকে ঘরের কোণে বসিয়ে দাও কাগজ পাতো বোস তুতু বিলু বোস তুই অন্য কোথাও অন্য কোথাও বারান্দায় কে চুপ মা ওর মুখে ন্যাকড়া গুঁজে দাও শোনো শোনো বুঝতে পারছি না একটু জোরে বলো বড় দুর্গন্ধ বড় দুর্গন্ধ বড় দুর্গন্ধ···

একটি স্বাভাবিক মৃত্যু

বিশ্বনাথ বসু

মহীনের লাশ চিৎ করে রাখা ছিল পিছল আঙিনায়।

উত্তর পাশে একটাই খেড়িঘর। ঘরের পেছনময় সুপুরির সারি, লতিয়ে লতিয়ে কঙ্কা কেটে কেটে তাতে উঠে গেছে অজস্র সাঁচি পান-মৃদু বাতাসের একটু ছোঁয়ায় চঞ্চল। এ মুলুকে হিমেল হাওয়া বয় উত্তুরে, বা রাক্ষুসে ঝড় ছুটে আসে কখনো। তাই সুপুরি গাছের সারি উত্তরেই হয়। মাথা গোঁজবার ঠাঁই—বাসা বেঁধে থাকার ঘরকে, গৃহ নীড়কে বাঁচায়। দক্ষিণে চোখ মেললে খোলামেলা আকাশ আর মাঠের নিধুয়া পাথার বুক ভরে নেয়ার তাজা হিয়াল বাতাস বয়। পূবে জাগে সূর্য, তাই পূবে থাকল ডোবাটা। জলের অপর নাম জীবন, রোদে প্রাণ, ডোবার রোদমাখা জলে হাঁস সাঁতরায়। পশ্চিমে সূর্য ডোবে। ডুবন্ত সূর্যের মরা আলোকে আড়াল দিতে নীরন্ধ্র গহন বাঁশবন।

একা একা এক খেড়ি ঘর, বাড়িটার পূবে কিন্তু কোনো ডোবা নেই। চাষবাড়িগুলোর ধার ঘেঁষে নদী বয়ে গেছে এ গ্রামে সর্পিল। নদীর নাম তালমা। তালমা নদী দুকূল ভাসি টলমল।

এটা শ্রাবণ মাস। তিতকালো মেঘে কাল রাতে তুমুল গভীর বৃষ্টি হয়ে গেছে। আজ এখন দুপুর। রৌদ্র নেই তবু দুফর। আকাশে আকাশে জল টসটসা কাজলা মেঘ। সে মেঘ ছেয়েছে বাঁকাচুর আলুলায়িত মোমশালী বাঁশঝাড়ের মাথা। শ্রাবণের মেঘখানি আর ভেজা বাঁশবন বাই চাষ দিয়ে যেন চষ।

এগিনায় বা আঙিনায় ছোটমতো কিছু জটলা। ঘরের একফালি দাওয়ায় নেভানো আখা। আধপোড়া পাটকাঠি-আমডাল-সুখা বাঁশের বাতা-বিষন্ন নির্জন নদীতীরে যেমন পড়ে থাকে। আখার পাশে চিটকালি মাটি মাখা একটা ডেগ, ছোট কানতাই আর কালাই করা শূন্য থালার উপর দিয়ে ঘুর ঘুর করছে কালো কাজো ডাই পিঁপড়া।

ঘরের একপাশে মুখ থুবড়ে পড়েছিল লাঙ্গলটা। ফালখানা যেন ঘরের ডোয়া কামড়ে ধরেছে। ভেজা-কাদামাখা লাঙলের মুঠাটায় দেগে বসা আঙ্গুলের ছাপ। ছানচা তলায় জমে আছে জল। তুলসী ও মেঘকালো গাছের জংলা উঠোন। জাংলা বেয়ে ঘরের চালায় লকলকিয়ে উঠে ছড়িয়েছে মিঠ কুমড়ার লতা। মাচাংয়ে পুঁইয়ের পুরুষ্টু রক্তবাহী ধমনীর মতো জটিল বিস্তার। আর এগিনার এক কোণে ঝোপা কামরাঙ্গা গাছটা। সেই তলে কামরাঙ্গার 'জাঙ্গালিয়া' পাতা আর 'লাল লাল' ফুল চুঁইয়ে কাল সারাটা রাতের বৃষ্টির জমা জল ফোঁটায় ফোঁটায় টপ টপ করে পড়ছিল চিৎ হয়ে পড়ে থাকা লাশে। মহীনের লাশে।

—কালি পরশু সারা রাতি বৃষ্টি হয়া গেইসে—মাতন দিয়া বৃষ্টি। কালি তামান দিনটায় অয় রোয়া দিসে, মানষিটা মহীন হুই পূব পারের দহলী জমিনটায়। এই মাসটায় তো শ্বাস ফেলাবারও কনকো ফুরসৎ না পায় হালুয়ার ঘর। আষাঢ় মাসটা তো চলি গেইল বাবু বৃষ্টি না হওয়া। ভাদোই ধানলার অবস্থাও তো বুঝি যেমন তেমন। দেওয়া (আকাশ) তো বর্ষেবার ধচে মাওর কয়টা দিন। কিন্তু কয় দিন হুবে-কতলা হুবে-কেনং-হুবে কায় জানে বাবু জল? মানুষটা চোখ তুলে আকাশে তাকায়। নিজে সে বসে আছে মাটিতে। শীত রাত হলে যেন আগুনের কুণ্ড, এদেশী ভাষায় যাকে বলে পোর-তা পাথরফাটা-গল্ গনগনা জ্বলতে থাকত। পাথরফাটা গপ-অসম্ভব কাহিনী শোনায় বিভোর ছোয়া ছোটি-মাইয়া মরদ আর পাঁচ জনে থাকত। এখন দারোগার চোখের নখদর্পণ।

মানুষটা দারোগার চোখে চোখ রাখে না, বলে যায়: দেওয়াৎ থাকি ঝরা বৃষ্টি বাবু শাওনের হামার হালুয়ালার কলিজাটা হাতে বহে যেন রক্ত-ঝোরা নদী নালা যেন হামার দেহার রগ ধমনী শিরা। মাটি মোর নিজের নামটার না হইল—দলিল হাল খতিয়ানে মোর মাওবাপ দেয়া নামটা লিখা-না থাকিল মাটিং তো কারো নাম লিখা নাই মাটি মোর কৃষানের মাও ধোত্তির। মানুষটার কণ্ঠ যেন রোয়া গাড়ার দেহের মতো প্রণত এখন।

আর দারোগা আনমন দেখল তার বুটজুতোর ডগায় চেবড়ে লেগে আছে কাদা।

—জেঠ আষাঢ়ে মাটি মোর রসিকের সজোনী-মোর মুঠা ধরা নাঙ্গলের চাষানে কাঁপি কাঁপি ওঠা গাবুরি হওয়া দেহাটা, শাওনের মাটি মোর তালমা,

তিস্তা হাতে সিনান করি ফেরা যেন ভিজা গা রাধার, আশ্বিন কাতিকের ক্ষেত মোর অছলা লক্ষ্মীর আঁচল, আর অঘোন পৌষ মাসেতে নয়া পাকা ধানে হুবে তায় অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার।

মাটি মোর সাজোনী, মাটি মোর জলোনি—মাটির নগত পিরীতি মোরে, মাটিং জনম হামার, মাটিং মরণ।

মহীনের লাশ কামরাঙ্গা গাছের তলে ভেজা মাটিতে শোয়া ছিল। মহীন কৃষাণ, কাল রোয়া দিয়েছে জমিতে সারাটা দিন।

—মাটি-ফাটি নিয়ে তবে কাচাল কিসের ? জমিনের দাঙ্গা-খুনোখুনি ? বলি মাটি কার ? কহ তো হে মাটিটা কার ? দারোগা বাঁ হাত বাড়িয়ে পুঁইপাতা ছিঁড়ে বুটের ডগার কাদা বিরক্তিতে মুছতে থাকল।

—আকাশটা যেনং পোথির-মাটি সেই নং কৃষাণের। উড়িবার পারে বলি যদি পোখির আকাশ হয়—চষিবার পারি বলি মাটি না হামার কৃষাণের ?

—মানে লাঙল যার জমিন তার আর কি ? দারোগাবাবু পা ঠুকলেন এবার। ভেজা নরম মাটিতে ভারী বুটের সোলের দাগ বসে যায় যেন চিতিয়াল বাঘের পা-ছাপ। বললেন :

—রসটস একটু কম করে বাপু। সময় নেই দরকারও নেই আমার।

—বসিবার কথাটা যখন মোক বলিবার কসেন তখন ভাঙ্গিনা সব বলা ভাল ?

—বলো বলো। আসল কথাটা বলো।

—কালি অয় তামান দিনটায় রোয়া দিসে পুবপারের দহলা জমিনটায়। মুঁই ছিনু উয়ার পাশের টায়। মুঁই আর মহীন খুকলু দেউনিয়ার আধি কাম করি। কিন্তু এলায় আসলে তো পেটে ভাতে হইছি। হামরা পেটে ভাতে !

—পেটেভাতে কি ?

—যায় খালি খোওয়ার বাদে কাম করে। দুইটা কিছু পেটে দিবার বাদে বাবু।

—বুঝলাম।

—এলায় বৈশালী দিন বাবু, বৃষ্টির দিন। ঘুমবার রাতি ছাড়া হামার তো কোন অবসর নাই। জেট আষাঢ়ে ধরা গেইসে তো হামার দেহায় যেন ত্যাজ নাই। তামান দিনটায় তিনটা খোটু জমি পারিবারও জোরও না।

হামারলার কৃষাণের পেটে ভাত নাই বলি পেটে ভাত নাই। পেটে ভাতেও না হামরা। মানুষটা হাসে, হেসে হেসে হাঁপায়।

—কালি খিব সাকাল সাকাল মুঁই কাদো বাড়িৎ গেনু। জমিনে হামার চাষ মই দেওয়া কাম সারা—খ্যালা বাকি খালি রোয়া গাড়া। পোখিলা বাসা বাড়িৎ কলকলাছে। মুঁই য্যায়া দেখেনু মহীন আধখোটু রোয়া গারি ফেলাইসে। পোখির কলকলানি শুনির না পায়, মোক যেন দেখিল না অয় এই মতোন ব্যস্ত। মৌলভী সাহেব নমাজে বসি—সাধুপুরুষ প্রণাম করে ছাওয়া ছোট নামতা কযে—খেলায় ভোক্ লাগা কোন মানষি খোওয়া খাসে এই মতোন ব্যস্ত।

—হোয় মহীন তাংকু খাবুরে বাউ? মুঁই ওক ভাকিনু।

—মোরযে আগুন নাইবো। অয় উত্তর করে।

—আইসো ক্যানে। মুঁই ভূতিটা (সাপের মতো খড়ে তৈরি) তুলি দেখালু। ভূতির মুখে আগুন জ্বলিছে—চাপা আগুন—নাঁল ধওয়া নিকলি যাসে। অয় আসি ভিজা আলিৎ বসিল।

—কালি রাতিৎ বৃষ্টি হইসে-জমিনৎ মি আসে জল। কাদা জলে মাটি হইসে আঠিয়া—ক্ষীরের মতন। মহীনের গাওয়ের রং মাটিয়া—কাদামাটি যেন বুঝা না যায়। মুঁই কনু—তামানটায় গারিবার পারবুরে আজি, মহীন?

—তিনটা খেটু গাড়ির পারিলেক হয়তো কপলোৎ না সিঁন্দুর। রগড় করি কয় মহীন।

—তুহে যে আন্ধার আন্ধার চলি আসিল বড়? মুঁই কনু।

—কালি রাতিৎ ঘুম তো আইসে নাইমোর কন্‌কো-পাছৎ জলটা ঝরা থামি যায় এই মোর ভয়; এই নং বরিষা—কি কহ বন্ধু বরাৎ? ছিলিমের আগুনে ফুঁ দেয় মহীন।

—কালি সন্ধ্যায় গিরিরঠে (জোতদার) গেনু-কনু মোক দশসের খোওয়ার ধান দ্যাও। ১৫ সের না হয় ২০ সের ফিরি দিস। ঠকাইম না তোমাক। কায় কে ঠকায় বন্ধু? কাক কে ঠকায়? মহীন হাসে।

—ভা গিরি কসে, গিরি (পাহাড়-বিশাল সম্পত্তি আছে হেতু) মোর মাও বাপ কবস, আগেৎ গাড়া শ্যাষ হবে…খ্যালা (তখন) দেখা যাবে। কালি তামান বাতিটায় তো বৃষ্টি হইসে ঘুম আইসে নাই—ভয়; আর তাতে তো

নেশা আসে বন্ধু—পেটং ভাত মজিলেই না চোখং ঘুম হয়—মোর সে ঘুম নাই ; আজি তাই রাতি রাতি মুঁই একেলাই একা, সিঁদ দিবার বাদে যেন নিকলিছুরে ভাই। মহীন ছিলিমে টান দেয়। ধোঁয়া যেন বুকে টানে না—খায়। 'পেট ভরি যেন ধোওয়া ওঠা গরম ভাত খায়।'

মানুষটা দারোগা সাহেবের সামনে ফ্যাক করে হেসে ফেলে।

—সিঁধ দেবার কথা কি যেন বলছিলে? দারোগা যেন হাসি শোনে নি।

—হু। কার ঘরং সিঁদ দিবি মহীন—গিরির ঘরং? মুঁই কনু। আর ঘরলা তো ভাঁদা।

—গিরির ঘরটায় তো আবার ইটার ডোরা। দিলে না ডাকাত দিবার নাগে। সিঁদ দিবার যদি হয় কি আর করিম তোর ঘরেই না দিম খ্যাষে। আকালে মানষিলাতো মানষিরই মোসম খাসে।

—মোসম যদি চাস আর সেই ভূখ যদি শেষে হয় তো মোর ঘরং সোন্ধাইলে মোর বনুস (বউ) টাক না মিলিবে। ঐ খিদার কাল আকাল নাই মহীন। কিন্তু ভাঁড়ারে এলায় মোর ছুলেযাও (বড় ইন্দুর—ধান খায়) বেজার।

—আর পেটের ভিতরকার নাড়ি গিলা মোর যেন হইসে এলায় গোমা (গোক্ষরা), ফণা তুলে তুলে উটেসে আর বিষের জ্বালার মতন জ্বলিছে জ্বালা। ছিলিমতাং শেষের জোর টানটা মারি অয় কহিল—পোকা টোকা নাগিলেক হয়—লাগিলে হয় মানষি লা কুমড়া কত্তর জাংলায় দেসে ধোওয়া—মধু পরিবার বাদে মৌচাকং দেসে ধোওয়া, গিরি মোর দেউনিয়া কাম—প্যাঁচ করিবার তানে বুদ্ধির গোরাং দেসে গন্ধালি তাংকুর গন্ধ আর হামরা দিসি পেটং—জ্বালাটা কনেক তায় যেন কমে বন্ধু। কমেসে না?

—তা খালি পেটে রোয়া গাড়া দিবার কাম ক্যানে? আলসি-মৌতাত করিবার বাদে তাংকুর চাষ করি আইসেক।

—খ্যালা (তখন) হামরা আলবলা আর চুরুট খাম। গিরিরটে আর না যাম। ব্যালা পড়ি যায় তাঁও না নাগে ভোক। হামার না নাগে কোন ভোক। বন্ধুরে···এ—এ

—মজাকটা করি অয় উঠি চলি গেইল। হামার এদেশী জাতের দোষ কহেন বাবু আর গুণ কহেক মজাক—রগড় রস ছাড়া হামরা থাকিবার না

পারে, কথা কওয়াও না আইসে হামার। মরিবার কালেও হামার ঐ রস—যমরাজাও যদি আসি দাঁড়াক না ক্যানে মোর দারোগাবাবু !

বর্ষার পাট গাছের পাতায় লেগে থাকা ছেঁদার গায়ে লবণ পরার মতো কুঁচকে গেল ভ্রূ দুটো দারোগার। তিনি মোড়াটায় একটু নড়েচড়ে বসলেন। ডায়েরির পাতা একটু নাড়াচাড়া করলেন। বললেন—গিরির বাড়ি কত্‌দুর ?

—বেশি দূর না হয়। হুই দেখা যাচ্ছে।

—খবর জানে।

—এলায়ও আইসে নাই ?

—না।

—লাটসাহেব। কাউকে গিয়ে ডেকে আনতে বল। বল গিয়ে দারোগা-বাবু এসেছে। তুমি না, তুমি যাও। হাঁ বলো !

সারাদিনটায় রদ্দুর উঠিল না। আকাশ ছাওয়া ম্যাঘ—ম্যাঘের বরণ পান পাতার মতন। তামান গ্রামটায় কাদো বাড়িং নামি গেইসে। সারা অঙ্গে সগার কাদা। কাদামাটির শরীর হামারলার। কিন্তু তবু মাটির পুতুল তো না হয়। তাই টের পানু ব্যালা পড়ি যাসে—টের পানু খালি পেটে। কোমর যেন ভাঙ্গি যায়—বুকৎ বাঁও নাঈরো। দম দিবার তানে আঁও দিনু—মোর-হা, মহীন, মোর-হা, সগারে ধান আউল ঝাউল, মোর ধান মোলটা চাউল। মোর-হা !

—অয় সাড়া দিল। খালি পেটের ঠনঠনা আওয়াজ—আক—মোব-হা, পোকা মাকড় নেন্দুর ভেন্দুর দূর হ।

—মোর-হা সলারে ধান টোনা মোনা, মোর ধান পাকা সোনা—মোর-হা।

—এ্যাক-মোর-হা, সগারে ধান হিতি হুতি, মোর ধান গোলার ভিতি।

শ্যালা মুঁই সুর টানি হেউতিলার নাম করনু দম নেওয়ারই তানে বাবু। মুই কনু-কাঁকুয়া। কাঁ—কুয়া। অয় কয়—এন্দুর শাইল। এ-ন্দুর শা-ই-ল।

—বোগ্নি বো-ও-ও গ্নি।

—তুলাপাঞ্জি। তুলা পাঞ্জি।

—কালো নেনিয়া। কা-লো-ও···নে-নি-য়া···

—দুধ কলম। দু-উ-উ-ধ ক-ল-য়-ম···

—বিন্না ফুলি। বিন্না ফুলি।

—পোংখি রাজ। পো-ং-খি—রাজ।

ঐলা হেউতি ধান হামরা ফসল করি বাবু। খোওয়ার না পারি। ঐলা চিকন গন্ধালি চাউল গিরির তানে বাবুর তানে ফলাই। আর হামার ভাগে তো লোহা জাং। লোহা জাং চিনেন বাবু, মোটা রাঙা চাল। চাল যেন না হয় মরচ ধরা লোহা কুচা। তা বিনা আসে বোল্ডার—মাকোই যাক কয়। বো-ডারও যদি না মিলে তো কচু না হামার আসেই। এলায় বুঝি কচুও শ্যায। যা হোক না ক্যানে খালি পেটে যত জোরে আঁও করা যায় তত জোরে অয় আঁও দেয়—বিন্দি ভোগ। বি-ই-ন্দিই ভো ও-গ, ব্যালা পড়ি যায় তাও মোর না লাগে ভোক্। বন্ধু মোর না লাগে ভোক্।

—খালি পেট, অর্থাৎ পেটে ওর কিছু ছিল না তুমি জানো কি করে? দারোগা।

—চোখ দেখিলে তোমরা যেমন বোঝেন কায় অপরাধী—মানষির কাথা বা কি আঁও কি হাসিটা না দেখিলেই মুখের, পেটের কথা হামরা টের পাও বাবু।

—পেটের কথা মানে তো তোমার ভাষায়—গোপন রহস্য?

—সে তোমরা যা ভাল বোঝেন মোর কাথায় কিন্তু রহস্য কন্‌কো নাই। অয় কহিল—বিন্দিভোগ। ব্যালা পড়ি যায় তাও মোর না নাগে ভোক্। ব্যালাটা সত্যি করি শ্যায হয়া গেইল। চারোটা দিক আন্ধার করি আসিল। পোখির ঝাঁক বাসাৎ ফিরিবার ধচ্চে। মোর একটা খোটু গাবা শ্যালা বাকি। কিন্তু দেহা আর না চলে। মোর চোখৎ নিশারাতি নামি গেইসে—বুকৎ নিদান কালের মতন ধরপর করেসে—দমফম ফুরি আসে। মুঁই কনু—মহীন, বাড়িৎ যাবু না রে? মুঁই যাস।

—তোমরা যান বারে। মুঁই খোটুটা আর শ্যায করি যাম। উমার আঁওটা যেন শ্যালা কেমন দূর থাকি আসা। ওর শরীর তামান শরীরটায় কাদা যেন লেপা। মাটিয়া শরীর কাদা আর চারোটা পাথের আন্ধারে মিশি মানষিটা যেন কোন মানষির আর না হয় ধুকুপুকু করা যেন একটা ছায়া!

…মুঁই নদীৎ গেনু। নদী কোন দূর না হয়—হামার জমিন থাকি দেখা যায়। শাওনের নদী হইসে সাগরের মত অথাই—নদীর জল পার উপ্‌চি বাঁশবনের গোড়ৎ টলটলায়। দেয়াৎ কালো ঘন ম্যাঘ টসটস্যা।

সাবধান করি মুঁই নদীৎ নামলু। নদীটায় চোরা সোতা। দূর না গেনু। বাঁশঝাড়টার—তেতালি আর শ্যাওড়া গছটার জাঙ্গালিয়া আন্ধারে আন্ধারে যেন ভূতুরা। সনঝা হইসে। বক গিলা বাঁশগাছের মাথাৎ বাসাৎ বসি আসে—ছানা গিলা ডাকেসে যেন রাতবিরাতে ভূখা বাচ্চা ছোয়ার ছ্যাঁচানি কান্দা—যেন মরণ ঘোর গংগরানি। কি কহিম মোর মাথাটা ঝিম ঝিম করিবার ধচ্ছিল—বুক ধরপর—পেটে ভোক্; শ্যালা সারা গাওটাই মোর ছম ছম করিবার ধরিল। মুঁই ওঠে আর না রহিলু—চলি আসিনু ঝটিৎ।

—কোথায়? কিসের ভয়ে, ভূতের? দারোগা নির্ভয় হাসে।

—হামরা হালুয়ার ঘর বাবু রোয়া গারার দিনে পৈ-সন্ধ্যায় দুয়ারে খিল দি ঘরে ফিরি। মুঁই ঘুমি গেনু। কালি তামান রাতিটায় বুঝি তামান পৃথিবীটা ভাসি দিবার মতন বৃষ্টি হইসে—সাথে আরো উথল পাথল বাঁও। মুঁই কোন কিছু আর না টের পানু।

—এতো দেখি বারোমাস্যা দিলে হে। শেষে তামান পৃথিবীটাই ভেসে যায় আর তুমি নিদ্রা যাও। কেস Doubtful.

—কি করিম বাবু, হামার নিজের কাথায়—নিজের ভাষায়—নিজের মতো করি না কওয়া লাগে। হামরা কি জানিব কিবা কহে ডাবুট ফুল না সরিষার ফুল!

—ইতরামি রাখ। কেবল নিজের কথাই না বলে—

—মোর কাথাই না সবার কাথা বাবু। হামারলার কাথা সগ্লার ঐ মতোন। সগ্লার ভোক্‌টা যেমন।

একটা মানুষ মরেছে, অকালে, জোয়ান মরদ—রোজ দেখা—তবু কেউ কেউ হাসে।

—কিন্তু লাশ তো তোমার না। দারোগা গম্ভীর গলায় বলে।

—লাশ কি কাথা বলিবার পারে বাবু?

—ভাগ্যিস বলে না। কিন্তু লাশও কথা বলে। এ লাশও বলবে। তা, জানলে কখন লোকটা মরেছে?

—সাকালে উঠি শুনিনু মহীন কালি রাতিৎ বাড়ি ফিরে নাই। ফুলমণি আসি খবরটা করি গেইল। বাড়িৎ ফিরে নাই তো মানষিটা কুঠে গেইসে? কিন্তু হামার তো এলায় দুঃশ্চিন্তা করিবারও ফুরসৎ নাই বাবু। সিধা গেনু

কাদোবাড়িং। চাষবাড়ির তামান মুলুকটা বাবু শূন্য—ফাঁকা—যেন কলিজাটা ছাড়া বুকটা।

দেয়াৎ আজিকার আন্ধারা ম্যাঘ। আর নীচে মহীন কালি তামান খোটুটায় রোয়া দিসে। মোর নাগারা খোটুটা। মোর ভিজি রাখা রোয়া গিলা মুঁই ওঠালু হাজারটা জোঁক বিজবিজ নড়েসে। সবুজ রোয়া কালো জোঁক।

মুঁই ওঠে আর থাকিবার পারলেক না হয়। মনটা মোর কেমন যেন করেসে অমঙ্গল কোন ছুবার হলে বা হাতাসে কবুতর পোখি নিশারাতে খোপের ভিতর যেইনং ছটফট করে। কুঠে যামু? মুঁই গিরির ঠে গেনু। উমায় কসে মহীন তো আইসে নাই। তা অয় বাদে চিন্তা করাটা তোর কাম না—জমিং যা তুই। আজির মদ্দে যেন গারাটা সব শ্যাষ হয়, না তো মুসকিলত্‌ পরিবু। মহীনের সাথে দেখা হইলে ওক একবার আসিবার কইস—খোওয়ার ধান ১০ সের নিগি যাবার বলিস—দিয়া দিম। মুঁই গিরির বাড়ি থাকি জমিং ফিরিবার আস্তা ধল্লু। মাঝ রাস্তাৎ রতিকান্তটা দৌড়ি আসি খবর করিল মহীনের লাস ধরা পচ্ছে নেসারের আংটা জালে।

হালুয়ার হাল, জালুয়ার জাল
জলে রোদে তার পিঠি হয় নাল।

—কারো সাথে ওর কোনো কি কাচাল ছিল? বউটার স্বভাব চরিত্তির কেমন?

—মুঁই আর না কিছু জানি বাবু। মুঁই আর না কিছু বলিবার পারো—মোর কাথা আসেছে না আর কোন। হঠাৎ মানুষটার কথা যেন গলায় আটকে গেল। সে নিচুপ।

—ওর বউকে ডাক। শোনো, তোমাদের এখানে চায়ের দোকান টোকান নেই? চা মিষ্টির দোকান কোনো?

—না বাবু। একজন কেউ বলে।

—এরেই কয় গ্রাম। বিজু তোমার শালাইটা দাও, আছে তো আবার? দারোগাবাবু প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে বিজু নামে কনস্টেবলের কাছ থেকে দেশলাইটা নিয়ে ধরালেন। শালাইয়ে হরিণ জল খায় আর পেছনে ঝোপে বাঘ ওৎপাতা।

মেঘলা শ্রাবণ গগন তলে বেলা শেষের থমথমায় সিগারেটের নীল ধোঁয়ায়

তিনি মহীনের বোনুসকে ধরাধরি করে আনতে দেখলেন—বিয়ের কনেকে যেন সাতপাঁকে বাঁধবার জন্য পিঁড়িতে করে আনা হচ্ছে। সে কাঁদছে না, কেবল একটু একটু হাঁপাচ্ছে। চুল তার ঘোমটাহীন। তেলহীন রুক্ষ যেন বিযতিতা মেছা পাটের অযত্নে ধোয়া ছাল আর আঁশ জড়ানো। 'রূপকোৎ সিন্দুর নাই'—পায়ে চলা ঘাস ওঠা মেঠো পথের মতো সিঁথি। মুখখানা উপবাসী, শক্ত শুকনো যেন আমের পুরনো লম্বা আঁটি। কাপড়চোপরের ঠিক নেই—অন্তঃস্বত্তা। দারোগাবাবু চোখ ফিরিয়ে নিলেন। হাতে ধরা বাসকেটের মতো ডায়রি আর আঙুলে ধরা আগাচোখা পেনটার দিকে তাকিয়ে বললেন—নামটা কি ?

—ফুলমণি। অন্য কেউ একজন পুরুষকণ্ঠ বলে।

—বয়স কত ?

—এক কুড়িও না হুবে।

—বিয়ের হল কয় বছর ?

—এক বছর তো হুবে।

—ঐ লাশটা তোমার চেনা ? এবার তুমি নিজেই বলো :

৺ মাথা নাড়ে।

—তোমার সোয়ামীর ?

ঠোঁট দুটো তার প্রথমে পাখনার ছেঁড়া পালকের মতো দুলল, আর কাঁপল যেন বাঁশপাতা খসে পড়বার মতো। পড়ল।

পরক্ষণেই তার সমস্ত শরীর হিস্টিরিয়ার মতো মোচড়াতে থাকল থর থর। হুমড়ি খেয়ে মুখ হুবড়ে যেন পড়ে যাবে। শেষে যদি ফিটটিট হয়ে যায়! দারোগা তাড়াতাড়ি করলেন।

—তোমার চেনা, তোমার স্বামীর লাশ ঐ কামরাঙ্গা গাছের তলে? কাউকে সন্দেহ হয় ? আচ্ছা ঠিক আছে। যাও, ঘরে নিয়ে গিয়ে ওকে শুইয়ে দাও। মধু থাকলে মধু, বরং একটু গরম দুধ না হয় খাইয়ে দাও।

মনে মনে তিনি ভাবেন—কাঁদে না কেন? চোখের জল তো নাকি এ্যান্টিসেপটিক!

দারোগা শ্রীচক্রবর্তী মোড়াটি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—কেউ বাঁশ আর দড়িদাড়া এনে লাশটা বাঁধো তো। তাড়াতাড়ি, নইলে মাঝ রাস্তায় আবার রাত নিশুত হয়ে যাবে। তখন হয়ত আবার আমাকেই লাশ

হতে হবে। দিনকাল তো ভালো না। এক বাঁশেই বাঁধবে। মাচাটাচা থাক। চারজন লাগবে না, দুজন হলেই চলবে। বিজু, তুমি একটু গ্যাখো।

জটলার ভীড়টা একটু হালকা হল দারোগা সেটা লক্ষ্য করলেন। বিজু তো আছে, ঠিক ম্যানেজ করে নেবে। পিছল এগিনায় তিনি সন্তর্পণে পায়ে পায়ে এগুলেন। ··বাঃ, মিঠকুমড়োয় কেমন জালা এসেছে। শ্রীচক্রবর্তী উদাস আর অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তারপরই জিভের ডগায় তাঁর জল জমতে শুরু করল, নাকে পেলেন অনিবার্য ফোড়নের গন্ধ। কচি কচি মিঠকুমড়ো আর গলদা চিংড়ির রসা···কিংবা পাতায় সর্ষে বাটা দিয়ে মুড়ে ইলিশে গরম ভাতের ভাপ···আহা, লকলকে পুঁইডগাগুলো···ডালের বড়ি দিয়ে···আসলে প্রাণ তো খাওয়ার জন্যই।

—বাবু! লাশটা বাধিম ক্যানে?

—উনি শহরে যাবেন। জানো না আনন্যাচেরাল মৃত্যু সম্পর্কে পুলিশকে রিপোর্ট করলে পুলিশ যদি স্পটে আসে তবে লাশের পোস্টমর্টেম হয়? অবশ্য—যা, বাঁধগে। কি করিস?

—ঘরামী বাবু।

—তোকে যেতে হবে। বাঁশটা বানা। আরও একজন চাই। ঘরামী হল, এবার একজন ঘটক। দারোগা হাসে। বিজু মোচ বানায়।

সেই ভীড়ে একজন মানুষ ছিল—কেমন একটু বৈরাগী বৈরাগী ভাব, কাঁধ-ছোয়া বাবড়ি চুল, বুক নামা দাড়ি, হাতে দোতারা—গীতাল গিরিজা। লোকটা বসেই ছিল যেন একটু আলাদা। সেই থেকে একটার পর একটা বিড়ি ফুঁকে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঠোঁট বিড় বিড় করছিল, কিন্তু তার ঢিলা দোতারার মতোই সে-বিড়বিড়ানির কোনো আওয়াজ ছিল না। মানুষটা ঠায় চেয়েছিল দক্ষিণে ধুয়ার দিকে: রোয়াগারা ক্ষেত, খয়েরী আর সবুজ সুনিবিড় পাটক্ষেত, আলুথালু উদাস গহন বাঁশঝাড়, আকাশে করুণ মেঘ, চোখে লোনা জল।···সে উঠে দাঁড়ায়। কাছে এসে মৃদুস্বরে বলে—বাবু, মোর একটাই কাথা। কি কহিম? কি রাখিবেন তোমরা?

—কহ। রাখার হলে রাখিব।

—মোর মহীনক ছাড়ি দ্যান। সংকারটা হামরা সগাই এই মাটিৎ শান্তি করি সারি। জলের মরা তো হামার চিতাৎ না পোড়াই—মাটিৎ গারি—মাটিৎ মিল যায়।

—সৎকার জমিতে করো না উঠানে পারো, চিতা সাজাও কি মাটি খোঁড়ো ঘুম যায় কি ভূত হয়—সে আমার দেখার নেই। লাশ আগে শহরে চালান হবে। ময়না তদন্ত হবে, অর্থাৎ কাটা-ছেঁড়া-চেরাই হবে, তারপর। কিছু তো হদিশ হল না, পোস্ট মর্টেমের উপরই এখন সব নির্ভর করছে।

একজন খ্যান খ্যানা বুড়ো খোনা খোনা গলায় বলে—কামটাবাবু মোর মন কসে তিসিলা মাসনার কাম। অয় অপদেবতা—দ্যাঁও, জলৎ থাকে, সিনান করিবাব গেইলে পাঁকড়ায়, ডুবি মারে।

—বুড়ো, ঠিকই বলেছো। ঐ রকমই মনে হয়। দ্যাঁও খতায় মরে পড়ে আছে, লোকে কয় দ্যাঁও মারিছে। মাথা চেরাই করো, বুক চেরাই করো, পেট চেরাই করো—ভূতের কেরামতি বেরিয়ে পড়বে। জানো তো অণ্ডকোষ চেপে ধরে, তুমি বুড়ো কোন ছার, একটা মরদ জোয়ানকেও খতম করে দেয়া যায়। ধরা যাক এই কেসটাই: জলে ডুবে একটা মানুষ মরেছে—নাথিং এ্যাবনরম্যাল। কিন্তু চোখে সবার সরিষার ফুল। তুমি বলো তিসিলা মাসনার কাম। লাশ চেরাই করো, মাথা কেটে হয়ত দেখা গেল brain-এ wound, brain displaced। কি পাকস্থলিতে পাওয়া গেল মদ আর ধুতরার বিচির মেশাল। আর তাতেও যদি পেটের কথা না বেরোয় —দেহ পুড়ে যাবে—ভিসেরা চলে যাবে কোলকাতায়, chemical exam-এ। ভিসেরা বুঝলে ভিসেরা, যে বিষ সে হোক না কেন—ধুতুরার কি হীরার— ধরা পড়বেই, পড়তে বাধ্য। ফোরেনসিকে? আরে শালা সাত বা সতেরো বছর পরে হোক না কেন একটা চুল থেকেও হদিশ মেলে হত্যা না আত্মহত্যা—আততায়ী কে বা কারা? একটা চুল থেকে বুঝলে, একটা লোম থেকে। আর অসিফকেশনে সতেরো কেন সাতশো হাজার বছর পরেও পাছার এক টুকরো হাড় দেখে বলে দেওয়া যায় বেটা কি বেটি ছাওয়া। দারোগার একটু বক্তৃতার মতো আবেগ এসে গিয়েছিল। তিনি সচেতন হলেন, একটু যেন বিরক্ত। তাই শেষের কথাটা বাঘমারা গলায় বলে ফেললেন—কে জানে শালা আত্মহত্যাও হতে পারে। নেংটির তলায় হয়ত আছে খারাপ রোগ—V.D.। কি মনেতে প্রবল দুঃখ—হতাশা। তার চেয়ে বরং লাঙলটা গলায় বাঁধা থাকলে ল্যাঠা চুকে যেত। ওহো, লাঙল তো আবার জলে ভাসে, হলধর বলরাম।

—স্যার, লাশ তো ঝুলিয়ে নিতে হবে।

—কাপড়-টাপর একটা দিতে বলো।

—সে কি আছে? নেংটি খুলি?

—রাস্কেল। নেংটি দিয়ে কি সমস্ত শরীর ঢাকবে? তার চেয়ে কলা-পাতা ভালো। পাতাগুলো দেখেছ কেমন বড় বড়? বিজু কলাগাছগুলো দেখল। পাতাগুলো তার চওড়া ও উজ্জ্বল, নেমন্তন্নের ভোজের পাতা হবে চমৎকার তৃপ্তিকর। মোচা ধরেছে দুটো গাছে যেন টোপর। মুখেভাতের শিশুর মাথার মুকুট।

—ছালা নেই? ছালাটালা দ্যাখো।

—ছ্যালা আছে পাটের ছ্যালা? বিজু একজনকে জিজ্ঞেস করল।

—নাইরো।

—ভালো করে দ্যাখো।

—ঘরং খুঁজিতো দেখেনু। মানুষটা দূরের ফুলফোটা ভাদেয়া নাল পাট ক্ষেতের দিকে চেয়ে বলল। শ্রাবণের ফসল ভাদেয়া নাল, আঁশ তার হবে মোলায়েম হলদিয়া সোনালী।

সাঁতাল গিরিজাই অবশেষে একটা সাদা থান এনে দিয়ে বলে—হামার জীবনটায় তিনটাই ঘটনা। একটা জনম, একটা মরণ, আর একটা বিহা। জনম হইলেক হয় ছোয়ার গা ঢাকা যায় এই সাদা থান কাপড়ায়, বিহার সাজটাও তাই, মরণেও সাদা থান লাগে হামার।

—আর লাশ চালানের, চেরাইয়ের কোন খরচ লাগবে না। এখন থেকে সব খরচাই সরকারের। দেউনিয়াটাকে পাকড়ে নিয়ে এসো—একটা সই লাগবে। দারোগা সাহেব বলেন।

সূর্য ওঠার দিক বরাবর ভেজা নতুন ঘাস ছাওয়া, শ্যামল পিছল বড় আলির পথে শববাহকেরা চলেছিল হনহনিয়ে। আগে আগে সেপাইয়ের ইউনিফর্ম পরিহিত বিজু। কাঁধে রাইফেল। পেছনে পেছনে দারোগা। কোমরে পিস্তল। তবু রাস্তার ওৎপাতা ভয়। তাড়াতাড়ি শহরে যাবার এটাই সিধা পথ—কখনো আলি, কখনো ছোট, কখনো বড়; উদ্দাম মাঠ দহলা বা ডাঙ্গা; কোথাও নালা-জামপাই-দ্যাওখতা-বাঁশবন-আসশ্যাওড়া কি বুনো কুল-গাছের ঝাঁক—নদীর সাঁকো-ইউনিয়ন বোর্ডের মাটির কাঁচা রাস্তা এবং পাকা সড়ক। পাঁচ পথ চলে গেছে মর্গে।

শববাহকেরা—প্রহরী দারোগা সবাই—হাঁটছিল দ্রুত। সন্ধ্যা হয়ে

এল। এখন গোধুলি। চব্বিশ ঘণ্টা পরের গোধুলি-যখন নোঁখালিয়া গরু নিয়ে গহালে, পাখীরা নীড়ে, কৃষাণেরা ঘরে ফেরে। তারা চলছিল আলি পথে যে পথ চলে গেছে মহীনের রোয়া-রোপা জমিটির কোল ঘেঁষে। জমিতে কাল রাতের বৃষ্টির জল। আর আকাশে ঘোলা মেঘ যেন গভীর পলিমাটি।

মহীনের হাতে বোনা রোয়াগুলো কাল সারারাত জল পেয়ে, হেউতির চারাগুলো নিশান্তি-শাওন মেঘের সুধাজলে জলজীয়ন্ত।

'এ্যাক মোর হা, ছোট নাঙ্গলের বড় দশ, হামার ধানের হলহল শিষ।'

হরিধ্বনি নেই। সরু সর্পিল আলিপথ। শববাহকদের চলার বেগে ও দোলে দোল খায় মোমশালি বাঁশে ঝুলানো কৃষাণ মহীনের লাশ। বাতাসে নড়ে ধানচারা অগণন দীঘল সবুজ।

লাশ অবশেষে শহরে চালান হয়ে মর্গে জমা হয়ে যায়।

পরদিন টানা রোদ।

ময়না তদন্তে দেখা যায়: মাথায় আঘাত কিছু নেই বা মস্তিষ্কের কোনো দোষ; ফুসফুসে—যে-ফুসফুস জন্ম-কান্না কাঁদা থেকে বাতাস পেয়ে ফুলের মতো ক্রমশ ফোটে--মাঠের বাতাস নেই কোনো, এক মুঠোও; হৃদপিণ্ডের সহজাত ছন্দ-বোল আচমকা থেমে শীত-নাড়া ক্ষেতের মতো নিস্পন্দ নিষ্পত্র নিথর। পেট ভরে ছিল শুধু জল—শ্রাবনের—নদীর নির্মল জল। আর ধরা পড়ল মলভাণ্ডে কিছু মল!

একছিটা মলে দুর্ভিক্ষ আইনে মৃত্যু অনাহারজনিত না প্রমাণ হয়ে যায়। সুতরাং পেটের কথা বা পাথর ফাটা গপ্প নয়। মহীনের মৃত্যু যে স্বাভাবিক তাতে কারোরই আর সন্দেহ থাকে না।

শিবঠাকুরের দয়া

মানস দেববর্মণ

আকাশে মেঘ ছিল, ছাড়া ছাড়া পাতলা সাদাটে মেঘ—হাওয়ায় জমতে পারছিল না মোষের কালো বিকট অবয়বে। লজ্জা এখনো ভাঙে নি আকাশের, ভাঙার মহড়া চলছে। নতুবা এ সময় দু-চার পশলা হওয়াই স্বাভাবিক, ক্ষেতের মাটি তাতে কাদায় থকথকে হয়, পেটের চামড়া টান টান মানুষেরা ক্ষেতে নেমে পড়ে। রাস্তার পাশের অকেজো পড়ে থাকা জলের পাম্প মেশিনও ক্রমাগত জলে ভিজে এবং রৌদ্রে পুড়ে বিদঘুটে একটা চেহারা নিতে পারে। কিন্তু, জল কোথায়? মার্তণ্ডের প্রখর তাপে চরাচর খাঁ খাঁ করছে, দীর্ঘশ্বাসের মতো তাতে শুধু হাওয়ার মাতামাতি। তবে বর্ষার জল ছিল, এবং তা ছিল ক্ষেতের ধারে প্রাকৃতিক খালে যা এখন শুকনো খটখটে। হাতির শুঁড়ের মতো পাম্প মেশিনের পাইপের মুখটি মুখ গুঁজে আছে মাটির কঠিন ফাটলে। মরা মাটি থেকে প্রাণ সঞ্চারে অক্ষম মানুষ শুকনো দুগ্ধহীন মাইয়ে মুখ দিয়ে ক্ষুধার্ত শিশু যেন কাঁদে, এমনি আকাল। জল থাকবে কি করে? খালের সাথে গভীর জলাশয় কিংবা স্রোতস্বিনী কোনো নদীর যোগাযোগ নেই, মানুষ এখন এ সমস্ত ভাবছে এবং ভাবতে ভাবতে গেল বছর অজন্মায় পেটে তার টান পড়েছে, কিন্তু সময় তখন পেরিয়ে গেছে। এ-বছরও এমন হবে কে জানত, নতুবা খালের জলে কমই হাত দিতে হয়েছে, যদি দরকারও হত, তাতে জল থাকে প্রচুর। এ-বছরও এমনি ভাবনা, সময় চলে যায়—ক্ষেত মাটির উপর রৌদ্র ভেংচিকাটা মুখের নকশা কেটে চলে, মানুষ চমকায়, আতঙ্কিত—"একটু বৃষ্টি দে" বলে উপরের দোয়া মাগে; শহরের মানুষ চড়া বাজারের কারণ খুঁজতে গিয়ে "খরা" "খরা" বলে চেঁচামেচি করে, "প্রয়োগহীন আধুনিক কৃষিব্যবস্থা"—এইরূপ সং[illegible]র উপর জনতার প্রাসাদে তর্কাতর্কি চলে; কিন্তু মুনিষ্যিদের কাছে জলসেচ শব্দটি ইংরাজির মতো অর্থহীনই থেকে যায়। বর্ষার খালের জলের জোঁক দিয়ে তারা বাত-রক্তের দোষ সারায়। গায়ের চামড়া পলিমাটির মতো প্রকৃতি প্রদত্ত রূপের উপর নির্ভরশীল, কখনো মসৃণতার চেকনাই, কখনো বা খুসকি পড়ে খসখসে,

সাদাটে ; 'রক্তাল্পতা' তাদের চোখেও প্রকাশিত, অনাহারে ভিতর দিকে ঢুকে পড়া পেটের চামড়ার বলিরেখার খাঁজে খাঁজে ময়লা জমে, আধবোজা চোখে কুঁজো হয়ে তারা হাঁটে, আকাশে তাদের চোখ ওঠে না, সামর্থ্য নেই, এমনই হতাশা।

অথচ বৈশাখের আকাশে মেঘ তখন ইতস্তত বিচরণরত এবং উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের দিকচক্রবালে টিলার উপরিস্থলে কিছুটা নিম্নাভিমুখী, অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত মেঘ ওখানে ঘনীভূত, তবে কাজল কালো নয়, অনেক আঁক মুছে ফেলা শ্লেটের মতো উদাসীন, ধোঁয়াটে। তবুও মেঘ জমছে। প্রাণদায়িনী, বৃষ্টির ধারাভরপুর মেঘ, মানুষ এবং উদ্ভিদের উদলা শরীর এবং জমিনের মৃত্তিকার উপর ঝুঁকে পড়া মেঘ। এমন দেরি হয়! সে অভিমান। প্রকৃতি এমনই হয়, সে ভালোবাসা। মাছির পায়ের মতো ভাতের গন্ধ তুলে নিয়েছে তারা, ম ম করে—জননীর বুকের দুধের ঘ্রাণ যেমন। কাঁঠালের আঠায় বারবার ঠোঁটে ঠোঁট আটকা পড়ে, ভাত নেই অথচ ভাতের গন্ধে উদর উথলে ওঠে, এমনি পড়ে থাকে মরা মাঠময় ভাতের ঘ্রাণ ; এমতই ভালোবাসা।

ঘুম ভালো হয় না, তা স্বাভাবিক। কারণ সে, আনন্দ, সময়ের মুখ দেখার ভয়ে সারাক্ষণই ঝিমোয়, যেন বা বন্ধ চোখে মেঘের বাসা ভাঙে, খালি উদরে ভরা জলের কলসি নিয়তই উপুর হয়—এমন শব্দ, আনন্দ চমকে চমকে ওঠে, ঝিমুনি ভেঙে যায় এবং বেড়ার ফোকরে আবছা আলোর ঝাপটায় তার মনে হয় আজ আলোটা কেমন যেন মাদা মাদা—প্রতিদিনকার খেলার মতোই, অর্থাৎ আশা এবং আশাভঙ্গের খেলা। জোড়া হাত কপালে ঠেকিয়ে, চক্ষু মুদ্রিত, যেন সূর্যপ্রণাম নতুন দিনের আগমনে প্রীত এরূপই অর্থবহ, আনন্দ চোখ খুলে সূর্য দেখতে পায় না, পাতলা মেঘের আস্তর ভেঙে সূর্যের আলোচ্ছটায় তার অবস্থিতি শুধু অনুমান করে।

"আ—লো তুরা ঘরের বাইরে আয়, চাইয়া ছাখ"—এ-উল্লাস আনন্দের সারা শরীর ফুঁড়ে বেরোয়, নতুবা এমত দুর্বল মানুষের গলার স্বর এমন কল্লোলিত শোনাত না। হাপরের মতো বুকের খাঁচা ফুলে ফুলে ওঠে, আনন্দ হাঁপায়। অস্থির হয়। উঠোনময় পায়চারি করে।

এমন হয় না, কারণ আলো ফোটার আগেই পাখির মতো তারা একসাথেই জেগে ওঠে, কিন্তু এখন কি-আর কাজ, দিনের আলোর সাথে কাজের যোগসূত্র ছেঁড়া—রান্নার সাথে বাড়ির আর সকল কাজ যেমন। উনুনে নিয়মিত হাঁড়ি

চড়ে না, সেই কতদিন থেকে। নতুবা এ-সময়, রান্নাঘরের চালের উপর ধোঁয়ার মেঘ উড়ত, আনন্দের যেমন এখন মনে হয় উড়ছে, ক্ষুধার বোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, সুতরাং এরকম সময়ে থেলো হুঁকো হাতে গোয়াল ঘরে যেতে যেতে মনোর মাকে তাড়া দেয়, লঙ্কা পোড়ার গন্ধ পেয়ে বোঝে আহার তৈরি ; আসলে, আনন্দ রান্নাঘরের চালের উপর হাল চষা আকাশ দেখে। মেঘের প্রতিটি জলকণা যেন প্রত্যক্ষ হয় এমনি প্রয়াস, কুঞ্চিত চক্ষু যে-শস্যের আকৃতি নেয়—সে ধান, আউষের ধান।

আনন্দ আবারো বলে—"ঘুম থেইক্যা উঠছ না, দ্যাখ কত মেঘ" এবং বলতে বলতে নিজে ঘরে ঢুকে মনোর মাকে উবু হয়ে ঠেলা মারে, মনোর মা যেন সব জানা হয়ে গেছে এরকম কৌতূহলবিহীন চোখে তাকায় অর্থাৎ আনন্দ এরকম ভাবেই তাকে জাগায়, এমনি অভ্যাস, কিন্তু এখন প্রকাশ্য আলোক, সুতরাং তা নয়, ফলে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে, এমন ক্রিয়ায় অনভ্যাস বসত সে অকারণে হাঁপায়।

"শিবের দয়া বুজ্জতনি, চাওন জানন লাগে, বাইরে যাইয়া দ্যাখো"— এরকমভাবে কথাগুলো জোড়া বাঁধতে লাগে নতুবা, ঘুমন্ত মানুষের মতো নিঃসঙ্গ দুঃখের উপর ভগ্নমুখ সেতু, এমনি দুরন্ত রচনার প্রয়াস, যা এতদিন ছিল অর্থাৎ দুঃখ গোপনীয়ই বটে, এরকমই প্রিয়জনের প্রতি মমতা যা এখন সুখের পুরনো সেতু পেতে দেয়। মনোর মা ওঠে, ঝট করে উঠতে গিয়ে আনন্দের হাঁটুর উপরে হাতের ভর রাখে, সেতুটি আন্দোলিত হয়—সে পায়া নড়বড়ে একটা তক্তপোষ।

মায়ের রূপটি এরকমই, সব সময়েই দুঃখী, যেরকম প্রতিমার চোখের রঙ ছলছল, সে তো মুখের দিকে তাকালে, কিন্তু এখন মা যে রকম বাবার হাঁটুর উপর হাতের ভর দিয়ে নতমুখী তাতে মনো অর্থাৎ মনোরমার মায়ের চোখ নজরে আসে না, আসে শুধু তৃষ্ণার্ত ডাঁটা চারার শীর্ণ প্যাকাটি সদৃশ কাণ্ডের উপর একগুচ্ছ শুষ্ক পাতার মতো জট পাকানো আলুলায়িত চুল। মনোরমা ততটা দুর্বল নয়, সে এমন নয় যে ভিন্ন কোনো জীবন যাপন দ্বারা শক্তি সঞ্চয়ে সমর্থা, বরং আরো কষ্ট তার এই বাপের সংসারে, একই পাত, তা নয়, পাত শব্দে সুখ, তারা হাতে হাতেই খাবার তুলে তুলে খায়, আর তাছাড়াও মনোরমার অকালে প্রাপ্ত বিশেষ একটা অবস্থা যা সব মেয়েকেই সমান দুঃখী করে, একই রকম নির্লিপ্ত জীবনের দিকে ঠেলে দেয়, অর্থাৎ—

মনোরমা বিধবা। তথাপি, একটা বিশেষ সময়ে, তা বয়স, মানুষের বেঁচে থাকার ক্ষমতা কচ্ছপের মতো কিংবা সরীসৃপ যেমন সারা শীতকাল কিছু খায় না, অথচ বেঁচে থাকে, ঠিক ততটা নয়, এখানে প্রাণের সাথে সামর্থ্যও স্বাভাবিকভাবেই একটু এঁটে থাকে ; তা বলে যৌবন নয়, যদিও সময়টা তাই, মনোরমার শুকনো বুকে সাত মাসের শিশুটি হামলা করে। পিঠের দিকে শুয়ে আছে মনোর প্রথম সন্তান, সে এখন বালক, ডান দিকে কাত, কেননা বাম গালে শিকের ফুটো এখনো সারে নি—সেদিকে ব্যথা, দামু মাঝে মাঝেই কঁকায়।

"মনো, উঠ লো"—আনন্দ এবার মনোরমাকে ডাকে। অনেক কাল পর বাবার গলায় এমন আদুরে ডাক শুনে মনোরমার মনটা হু হু করে, সে সেই এক ডাকেই উঠে দাঁড়ায়, বলে—"কি অইছে বাবা !"

"আলো, মেঘ কইরছে"—বলে আনন্দ মনোরমার কাছাকাছি হয় এবং আনন্দের আতিশয্যে ছোঁ মেরে শ্রীদামকে বিছানা থেকে তুলে ফেলে। দামু চোখ খোলে কিন্তু সে চোখে দৃষ্টি নেই, কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকে। আনন্দের এসবে চোখ নেই, সে দামুর বাঁ গালে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বলে—"শিবঠাউর আমরার ডাক হুনছে রে, ওঠানে জাইয়া গাজন নাচ।" শ্রীদাম তখনো অবাক, আনন্দের হাত মাঝে মাঝে বাঁ গালের শিকের ক্ষতে চাপ দিচ্ছিল, দামু শিউরে উঠতে উঠতে হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে।

"আমি জামু না, আমি জামু না"—শ্রীদাম মনোরমাকে আঁকড়ে ধরে ছটকায়। আনন্দও থতমত খায়। তারপর সে-ভাবটা কেটে গেলে হেসে উঠে বলে—"আরে দূর বেটা, কই জাইবি। অহন কি চৈত মাস ?" শ্রীদাম তথাপি সুর করে কাঁদে, ফাঁকে ফাঁকে বলে—"মিছাকথা, আমাকে লইয়া ভিক্ষা মাঙ্গতে জাইবা, মা গ, আমি জাইতাম না।"

মাগো শব্দটি আনন্দের কাছে ব্যথারই অভিব্যক্তি বলে মনে হয়, কিন্তু মনোরমা ভাবে সেই সম্বোধিত ; সুতরাং ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—"ছিঃ, ভিক্ষা কইতে নাই, পাপ দিব, গাজনের মাগন আননের লেইগ্যাই না গেছিলি।"

আনন্দও দোহার দেয়—"অয়অ, অয়অ।"

শ্রীদাম আরও ভয় পায়, আনন্দ তাকে নিয়ে আবার বাড়ি বাড়ি হাঁটবে নিশ্চয়ই ভেবে মনোরমার গায়ে একেবারে লেপ্টে থাকে।

এমন বয়সের ছেলেকে ভুলানো তেমন কঠিন নয় এবং যেখানে ভুলানোর উপকরণ খেলার সামগ্রী নয়, তা খাদ্য—ভাত—শ্রীদামের মা প্রতিদিনকার কান্নার কারণ, সেখানে আনন্দ সহজেই শ্রীদামকে ভুলাতে পারে, লোভী করে তুলতে পারে।

"মাই গো, এটু বাত, ক্ষুদা লাগে।" মনোরমা চুপ করে থাকে। শ্রীদাম এরকম কাঁদে—"পাকের ঘরে চলছ্‌ না, পেড্‌ ভাত দুঃক্ষু পাই, মাই গো চলছ্‌ না।"…

আনন্দ ফাঁদে শিকার পড়েছে এমনি ভঙ্গী, পায়ের পাতার উপর ভর, ত্রস্ত অথচ নিঃশব্দ হুলো বেড়ালের মতো শ্রীদামের কাছে সরে যায়।

"অহ, দাদুর মুর ক্ষুদা পাইছে, বাত খেতি চাইছে, চল যাইবি, চাউল লইয়া আনি।"

শ্রীদামের চোখ চক চক করে, মার কাছ থেকে দাদুর কাছে সরে আসে, হাত ধরে টানে, বলে—"চলেন না।"

আনন্দ কুঁজো হয়, দামুর কানের কাছে মুখ এনে প্রায় ফিস ফিস করে—"আগে কয়ডা কথা হুন, বাইরে আয়।"

গোয়ালঘরের পাশে মুলি-বাঁশঝাড়ের ছায়ায় আনন্দ শ্রীদামকে এনে বসায়, বলে—"ঠাউর হইবি নি, শিব ঠাউর?"

"কেমনে?" শ্রীদামের দু-গালের ময়লার উপর অশ্রুধারার দাগ।

"কেমনে আবার, শিবুর মত।"

শ্রীদাম ভয়ে কেঁপে ওঠে। গত বছর গাজন মাঙ্গতে শিবুকে সে দেখেছে। একটা লম্বা লোহার শিকের একপ্রান্ত মুখের ভিতর দিয়ে ঢুকে গাল ফুঁড়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে, শিকের দুপ্রান্তে লাল জবাফুল আটকানো, মুখ বেয়ে কষের ধারা। শ্রীদাম এবার তারস্বরে চেঁচাতে থাকে।

আনন্দ হাত দিয়ে দামুর পিঠ চাপড়ায়—"আরে, র র। হুনছ না। বাত খেতি পাবি, দেখছ্‌ নাই শিবু কত চাউল লইয়া ফিরত, কত ট্যাহা। তুরে টাউনের মাইনসে পেন্নাম কইরব। তুই ঠাউর অইবি। তুই খাইবি, তুর মা খাইব, আমরা হগ্‌গলে বাত খামু, এ-ত, এত।" আনন্দ হাত ছড়িয়ে পরিমাণ দেখায়।

ভাত কথাটা উচ্চারণ করলেই শ্রীদাম মুখ বন্ধ করে ঢোঁক গেলে—আনন্দ তা লক্ষ্য করে। সে বলে চলে—"কত বাত, মাছি ধইরা খাইকব কালা

অইয়া, হক্কাল বেলা পান্তা করুম, উকনা মইচ পুড়া দিয়া হেই বাত খাবি, আমরা হগ্‌গলে খামু। বাতের ঘেরাণে বলদা দুইডা পাকের ঘরের দুয়ারে আইয়া মাথা তুইল্যা দাড়াইব। ছড়াইন্যা বাত মাইঝখানে পুকুর কাইট্যা তেতুলের জল চাইলা মহিখবি। খাইতে খাইতে অড়ান অইয়া যাইবি। দাদুরে, মুর কথা হুন।"

শ্রীদামের ততক্ষণে কান্না থেমে গেছে। দুই চক্ষু বিশাল, আনন্দের কথা-গুলো সে গিলছিল। চোখের মণিদুটো মরা মাছির মতো; আনন্দ স্পষ্ট তার সে চোখের দৃষ্টি পড়তে পারে, পড়তে পেরে নিজেও হয়ে ওঠে। সুখী শ্রীদামের চোখের ভেতর বিশাল থালায় ভাতের স্তূপ, কি ঠাণ্ডা সে ভাত। আনন্দও ঠোঁটে জিভ বুলায়। কিন্তু সে ক্ষণেক্ষণ, আনন্দের চটকা ভেঙে যায় এবং বুঝতে পারে শ্রীদামের ভয়ের পাল্লা উঠে যাচ্ছে, লোভের পাল্লা নীচে ঝুঁকছে, মাঝখানে দ্বিধার দাঁড়ি একটু একটু নড়ছে। আনন্দ হাত ধরে টানে —"উঠ তাইলে, আগ্গা ভালা দিন। দাদু, ল যাই।"

শ্রীদামের চোখের পাতা পড়ে, একটু জোর করে তারপর উঠে দাঁড়ায়। কাঁপা গলায় বলে—"দুঃক্ষু পামু না?"

আনন্দ তখন শ্রীদামের হাত ধরে রওয়ানা দিয়েছে; যেতে যেতে বলে—"দূর, এট্টু-ও টের পাবি নি। ঠাউর মশাই মন্তর পইড়বেন, দেখিস পিমড়ার কামড়ের দুঃক্ষুও পাবিনি।"

শ্রীদাম আর কথা বলে না, কিন্তু হাতের মুঠোয় ধরা দামুর হাত তির তির কাঁপছে আনন্দ বুঝতে পারে।

আনন্দরা প্রখর রৌদ্রের মাঠে নেমে পড়ে, যে-মাঠ শস্যক্ষেত্র। কিন্তু কে বলবে এ শস্যক্ষেত্র, মাঠের নাড়াগুলোও শুকিয়ে মড়মড়ে হয়ে ভেঙে কুচি কুচি হয়ে উড়ে গেছে। শুধু হালচষার কারণে মাটি এবড়োখেবড়ো—এ শস্যক্ষেত্র এই একমাত্র তার সাক্ষ্য।

—"একডা ফুডা বৃষ্টি নাই। হুকনা পুষ্কুনির মাছের প্রায় হারাডা ক্ষেত রোইদে ছটকাইতেছে মুর পরানডার লাখান। আকাশডা ভাইঙ্গা পইড়লেও এ মাডি জুড়াইব না। না খাইয়াই মরুম, মরুম কিতা, মইরতাছিই ত; মাডডার লাখান জল না খাইয়াই মরুম। বাবা বিশ্বনাথ, তুর মাথার গঙ্গা-ডারে নামাইয়া দে, তুর নামে মু বলদ ছাড়ুম।"

এবং বলেই আনন্দ চমকে ওঠে, হাত দুটো মাথায় ঠেকায়—"পাপ লইও

না ঠাউর, অনেগা কইয়া লাইছি, দুইডা মাত্র বলদা গুয়াইলে, হাল চমু কেমনে, মু কাংগাল, মুরে ক্ষেমা দাও ; তুমার লাই ঠাউর এই পুলাডারে লইয়া যাইতাছি, তুমার সেবার লেইগ্যা ওরে লইয়া দুয়াইরে দুয়াইরে ঘুইরা মাঙ্গন আনমু।” আনন্দ আস্তে আস্তে ধাতস্থ হয়, শ্রীদামের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। কারণ, ওর জন্য তার পাপের কিছুটা স্খালন হল—এমনি ধারণা। আনন্দ সারা রাস্তা আর কোনো কথা বলে না। টিলায় পৌঁছে শ্রীদামকে সাধুবাবার হাতে তুলে দিয়ে—কেন, কি বৃত্তান্ত—এ-সমস্ত বলারও দরকার হয় না। কারণ সাধু যেন সর্বজ্ঞ এমনিভাবে শ্রীদামকে নিয়ে মন্দিরে ঢোকে, আনন্দ মন্দিরের বাইরে বটগাছের ছায়ায় বসে থাকে।

শ্রীদাম সাধুবাবার হাত ধরে যখন বেরোয়, গালে ফোঁড়ানো শিকের চেয়েও শ্রীদামের অমানবিক বিশেষত্ব আনন্দকে আশ্চর্য করে। চোখের দৃষ্টি-হীন চাউনি, চেহারায় একটা অস্বাভাবিক নৈঃশব্দ্য যা কেবল শব্দহীনতা নয়, যেন অপার এক শান্ত জলাশয়—এমনি আচ্ছন্নতা, যেন শ্রীদাম কোনোকিছু ছুঁয়ে নেই, এমনকি বাতাসও নয়, যার ফলে বাতাসও থেমে আছে কিংবা বইতে পারছে না, তা যেন এখন শ্রীদামেরই উপর নির্ভর করে, আনন্দ তাকে তার নাতি বলে চিনতে পারে না। দাঁতের চাপে ধরা আছে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা লোহার শিক, অথচ মুখ অবিকৃত। এখন প্রায় সন্ধ্যা। আনন্দ এক ভৌতিক চেতনায় আচ্ছন্ন হতে থাকে এবং সেই সময়েই সাধুর হাতের শিঙ্গা বেজে ওঠে। আনন্দ চোখ বুজে হাত কপালে ঠেকায়। তার কপালে জোড়া হাতের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে তার নাতি—শ্রীদাম।

শ্রীদামের এমনি ভাব চরক পূজো পর্যন্ত ছিল। স্বপ্নের ভেতরে যেন তার সে সমস্ত দিন কেটেছে। আনন্দ তাকে নিয়ে অনেক দূর—টাউনে—চলে যেত। হাতে দুটো ঝোলা থাকত। একই মাঙ্গন অর্ধেক অর্ধেক করে দুটোতে জমা পড়ত। প্রথমটায় শিবের মাঙ্গন, দ্বিতীয়টায় তার নিজের অর্থাৎ পরিবারের খোরাক। অপরাধ বোধ ছিল, ছিল পাপবোধও ; কিন্তু আনন্দ একটা সহজ সরল যুক্তিও করে নিয়েছিল, যা সান্ত্বনাই বটে ; শিবের অর্থাৎ শ্রীদামের শরীর না ছুঁলেই হল, ছুঁলেই সেটা শিবের ভোগ্য হয়ে পড়ে। শহরের মানুষের চোখে ভক্তির চেয়ে কৌতূহলই ফুটে উঠত বেশি। প্রথমদিকে আনন্দ বলত—“সবই বাবার দয়া।” অর্থাৎ যেন বাবার দয়াতেই শ্রীদাম কোনো শারীরিক কষ্ট পায় না। অবশ্য তার মুখে সে-রকম কোনো অভিব্যক্তিও ছিল না যেমন ছিল

না আনন্দেরও। তারপর থেকে আনন্দ বলত—"না কত্তা, এটুও না।" বাড়ি থেকে আনন্দ বেরোত শ্রীদামের হাত ধরে। তারপর আস্তে আস্তে সেই ধরা হাতে শ্রীদাম বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে ঝুলছে; তারপর ক্রমশই. শ্রীদামের হাত আনন্দের কাঁধে উঠে আসে, কাঁধে ভর দিয়ে শ্লথ গতিতে সে হাঁটে। দিনমানেই আনন্দরা গ্রামে ফিরে আসত। টিলার নীচে নিজেদের জন্য মজুত করা চালের ঝুলিটা রেখে অন্যটা দিয়ে আসে সাধুর কাছে। যখন বাড়ি ফিরত তখন শ্রীদাম আনন্দের কোলে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

এসবই চৈত্র মাসের কথা।

এখন তারা সবাই উঠোনে দাঁড়িয়ে মেঘের খেলা দেখছে। সারা আকাশ তাদের মাথার উপর বিরাট কড়াই যেন উপুড় হয়ে আছে। হাঁড়ির পেছনে লেপা মাটির মতো রঙ আকাশের উত্তর পশ্চিম কোণে জমাট-বাঁধা মেঘ থেকে আকাশময় ছড়িয়ে যাচ্ছে, যেন শিবের জটা ভাঙতে লেগেছে এবং সে জট-ভাঙা চুলে হাওয়া এলো পাথাড়ি চালাচ্ছে। মাঝে মাঝে হাওয়ার তোড় সেই অবিচ্ছিন্ন রঙ থেকে দু-এক খাবলা তুলে নেয়, আকাশের ফিকে নীল বেরিয়ে পড়ে, আনন্দরা ক্ষিপ্র হয়; কিন্তু পলকাপেক্ষ সে জায়গাটুকু ভরাট হয়ে যায়, আবার ক্রমশ জমে জমে দুধের সরের মতো পরতে পরতে ভারী হয়ে ওঠে। জলকণার ভার নিয়ে এলোমেলো হাওয়া বইছে, চারিদিকে, বাঁশপাতায় তার সন সন শব্দ হয়। দিনের আলো নিভিয়ে যেতে যেতে লেবুপাতার মতো কালচে যা অসময়-সন্ধ্যার আঁধার নয়, যা প্রাণীকে ঘুমের দিকে ঠেলে দেয়, সারা ত্রিপুরা বরং মেঘের এই শ্যামল ছায়ার নীচে ঘুম ভেঙে নড়ে চড়ে ওঠে। অননুমেয় কোনো এক প্রান্ত থেকে, যেন অন্তরীক্ষ থেকে, ভেসে আসে গাভীর প্রাগৈতিহাসিক কণ্ঠস্বর; সাথে সাথে গোয়াল ঘরে গরুর পায়ের ছটফটানির শব্দ হয় এবং ঠিক তখুনি দিনের প্রথম ডাক কোণাকুনি অনেক দূর থেকে গুড়্ গুড়্ করতে করতে মাথার উপর এসে ভেঙে পড়ে। আনন্দ শ্রীদামকে কাঁধে তুলে নেচে নেচে শ্রীদামের হাতের সাথে জোড়া তার হাত নেড়ে চীৎকার করে ডাকে —"আয়, আয়।" এবং বৃষ্টি আসে। অনেকদূর থেকে অশ্বখুরধ্বনির মতো তার শব্দ দ্রুত এগিয়ে আসতে থাকে, বাতাসের শাঁ শাঁ যেন ডাকে

তাড়িয়ে আনে এবং খই ফোটার শব্দ তুলে আনন্দদের মাথার উপর দিয়ে পেরিয়ে যায়। এরকম কয়েকবার হয়। কিন্তু ক্রমশ তাদের সময়ের ব্যবধান কমতে কমতে একসময় নিরবচ্ছিন্ন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। আনন্দের মনে হয় তার চারিদিকে যেন অসংখ্য খঞ্জনি বাজছে, সে তাতে পা মেলায়। পায়ের নীচে ছপ ছপ করে চাপা নূপুরের শব্দ হয়। অপর এক তৃপ্তির ঘোরে তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হতে থাকে। হাওয়ায় ভেঙে যাওয়া বৃষ্টির রেণু পরিব্যাপ্ত এই চরাচরকে চোখের সামনা থেকে সরিয়ে নিয়ে পেতে দেয় ধান গাছের শরীরে লেগে থাকা সবুজ কুয়াশাময় এক স্বপ্নের জগৎ। পান্তা মাথায় ছিল না আনন্দের তাই জলের ধারা তার চুল বেয়ে সারা মুখের উপর দিয়ে নদীর খরস্রোতের মতো নেমে আসে। জিভ দিয়ে ঈষৎ নোনতা সেই জল মুখে টেনে আনন্দ যেন তার প্রাণের স্বাদ নেয়। উদ্ভিদের মতো দাঁড়িয়ে সারা শরীর পেতে সে বারি-ধারায় ভিজতে থাকে।

দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মনোর মা আনন্দকে ডাকে—"শুনছেন!" সে ডাক আনন্দের কানে যায় না, শরীরময় জলের প্লাবন নিয়ে সে নেচেই চলে। দাওয়ার বাইরে গলা বের করে আরো জোরে মনোর মা ডাকে "শুনছেন নি।" আনন্দ এবার শোনে, মুখ ফিরিয়ে নিঃশব্দেই চোখের মধ্যে জিজ্ঞাসা ফুটিয়ে তোলে। মনোর মা বলে—"জলে এক্কেরে ঘর ভাইস্যা যাইতাছে।"

"কস্ কি"—বলে আনন্দ এক লাফে দাওয়া ডিঙিয়ে ঘরে ঢোকে। তার শরীর বেয়ে নেমে আসা জলের ধারায় ঘরের মাটি ভিজে কাদা হয়ে যেতে থাকে। ঘরের মধ্যে প্রায় সবখানে টপ টপ শব্দে অনবরত জল পড়ছে। আনন্দ প্রথমে ঘরের পাতলা ছাউনি দেখে তারপর মনোরমার দিকে তাকায়। মনোরমা বাচ্চাকে তার বুকের ওমে জড়িয়ে আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে ক্রমশ ঠাকুরের আসনের দিকে সরছে। সে-কোণায় বৃষ্টির জল পড়ছে না। আন্দেরও এবার যেন শীত শীত করতে থাকে। একটু ইতস্তত করে সে ঠাকুরের আসন খাটের নীচে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলে—"ইখানডায় ছালা পাইত্যা জ্যাইত কইরা ব। বড় ঘরেরই ইমন অবস্থা, পাকঘরে ত জানি হামানই জাইব না। আধা কাডালতা ভাজ, ইখানে বইস্যাই হগ্‌গলে মিইল্যা খাই।" ছি ছি করেতে করতে আনন্দ গামছা দিয়ে শরীর মোছে।

দুপুর পর্যন্ত একটানা বৃষ্টি চলে, তারপর একটু একটু করে লেক্ দিতে দিতে

একসময় ধরে যায়। আনন্দ গোয়াল থেকে গরু দুটোকে ছেড়ে দেয়, তাবপর তাদের সাথে নিজেও মাঠেব দিকে বেবোয়। মাটিতে আবার সোঁদা গন্ধ ফুটে বেরিয়েছে। ধুলায় ধুলায় ধসব ঘাস এখন সতেজ, সবুজ। সারা অঞ্চল স্নান সেরে মাথায় চিরুনি বুলিয়ে ফিটফাট, চারিদিকে এমনি একটা সুখী সুখী ভাব। আকাশ ক্রমশই নীল হয়ে উঠছে, পশ্চিম দিকে হেলে পড়া সূর্য রোদ ছড়াচ্ছে, কিন্তু এতদিনের দৃপ্ত ভঙ্গীমায় নয়, রৌদ্রের কাঠিন্য বৃষ্টির ছোয়ায় ভেঙে গিয়ে এখন কোমল স্নিগ্ধ এবং মায়াময়। প্রাকৃতিক এই মায়াময় পরিবেশে হাঁটতে হাঁটতে আনন্দ সূর্যের দিকে তাকায় এবং যেন দুরন্ত সন্তানেব অশ্রুভেজা মুখ দর্শনে ব্যথিত হৃদয় সে অতি সহজে আদিগন্ত প্রসারিত মাঠেব সম্মুখে দাঁড়িয়ে সূর্যকে ক্ষমা করে দেয়।

খালের ভেজা মাটিতে পায়েব গভীব ছাপ রেখে আনন্দ তার আপন ক্ষেতে এসে দাঁড়ায়। কঠিন মাটিব পিচ্ছিলতাতেই শুধু বৃষ্টিব ছাপ, নতুবা মাটি পরিতৃপ্ত নয়, কারণ গভীর ফাটলগুলো এখনো উর্ধ্বমুখী হাঁ করে আছে। দু একটা শালিক সেই সমস্ত ফাটলে ঠোঁট ঢুকিয়ে কি যেন খুঁজছে। আড়াই কানি পরিমিত জায়গায় ঘুরে ঘুরে আনন্দ হাতের কঞ্চি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মৃত্তিকার কাঠিন্য পরীক্ষা করে। আশাপ্রদ এক ভবিষ্যত যেন তার চোখে ক্রীড়া করে। মনে মনে আনন্দ বীজ থেকে ধান এবং ধান থেকে চালের হিসেব করে। অনেকদিন পর এমন ভাবনায় সে বিহ্বল।

বিকেলের দিকে সূর্য অসময়ে হঠাৎ ঝুপ করে ডুবে যায়। পশ্চিম আকাশের উত্তর দিক ঘেঁষে একসার মেঘ কষ্টিপাথরের পর্বতমালার মতো শৃঙ্গ উঁচিয়ে। তাদের মাথার প্রান্তসীমানা সূর্যালোক পড়ে যেন ছড়ে যাওয়া চামড়ার উপর রক্তের রেখা এমনি গাঢ় লাল। মেঘের শরীর বেয়ে মোষের শিংয়ের মতো বাঁকানো মেঘের স্তর খুব ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে আসছে, যেন কেউ হাত বুলিয়ে থালায় শুকোতে দেয়া থকথকে আমসত্ব সবদিকে সমান ঘন করে দিচ্ছে। গাছের মাথায়ও বাতাস নেই। সকালের এত বৃষ্টির পরও একটা গুমোট, দমবন্ধ ভাব চারিদিকে ফেটে পড়ো পড়ো ক্রোধের মতো থমথম করছে। প্রান্তর ধরে অন্ধকার ধীরগতি ক্রমশ সরে আসে না বরং উপর থেকে একটা বিরাট কালো ছাতা অতি দ্রুত যেন নেমে আসতে থাকে।

আনন্দ তড়িঘড়ি গরু বাড়ি ফিরিয়ে আনে। তার মুখ আবহাওয়ার মতোই থমথমে, কপালের ভাঁজে ভাঁজে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতালব্ধ দুশ্চিন্তার

ছাপ। গরু বাঁধতে বাঁধতে সে বিড় বিড় করে—"হায় কপাল, হায় কপাল।" ঘরে ঢুকে আনন্দ আবছা অন্ধকারে, সবাই মাটিতে বিছানো চটের উপর জড়সড় হয়ে বসে আছে দেখতে পায়। তাদের নৈঃশব্দ্য এবং হাবভাবে সম্ভাব্য দুর্যোগের আশংকা স্পষ্ট। আনন্দ নিরুদ্দিষ্ট গলায়, যেন স্বগতোক্তিই করে—"খরায় ঘরবাড়ি হগ্‌গল শুকাইয়া মটমট করতাছে, অহন তুফান ছুটলে আইর রক্ষা আছে। বেবাক মাথার উপরে ভাইঙ্গা পইড়ব। কই বান ডাইক্যা বৃষ্টি আইব না আইয়ে তুফান, হায় মুখপুড়া কপাল।" কিংকর্তব্য-বিমূঢ়তায় হতবুদ্ধি আনন্দ খামাকা ঘরবাহির করতে থাকে।

মেঘ যত উপরে উঠে আকাশময় ছড়াতে থাকে, ততই অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়। বাঁশঝাড়ের মাথার অন্ধকার কালো মেঘের পটভূমিকায় ঈষৎ নীলাভ বলে বোধ হয় এবং এই নীলাভ তরল যেন সারা উঠোনে, এমনকি আনন্দের চোখেও, ছায়া ফেলছে। রাক্ষুসে অন্ধকারের চেয়েও অন্ধকারে মিশে থেকে আন্দোলিত এই নীলাভ ছায়া বিষবৎ আনন্দকে আতঙ্কিত করে। মাথার উপর উঠে আসা মেঘ এবং ঘরে নিস্পন্দ বসে থাকা আপনজনদের পর্যায়ক্রমে দেখে দেখে ক্লান্ত আনন্দ একসময় হাত দিয়ে উঠোনে বসে পড়ে চীৎকার করে ওঠে "হায় ভগমান।" ঠিক সেই সময়ে কোদালের সাথে পাথরের সংঘাতে জাত চোখধাঁধানো অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো বিদ্যুৎ চমকে ওঠে এবং পরক্ষণে ঠাঁ ঠাঁ শব্দে বাজ পড়ে।

বাইরে অস্থির, গর্জনমুখর ঝড়ের তাণ্ডব আর ঘরের এক কোণায় অন্ধকারে চটের উপর বসে কয়েকজন নির্বাক নিস্পন্দ মানুষ। ঝড়ের প্রতিটি আঘাতে সারা ঘর আন্দোলিত হয়, মটমট করে ওঠে ঘরের প্রতিটি বাঁধুনি ; বসে থাকা মানুষেরা পরস্পরের কাছে আরো সরে আসে, আরো ঘনিষ্ঠ হয়। গোয়াল ঘরের দিক থেকে ভেসে আসা গরুর ভীত চীৎকার হাওয়া কখনো আত্মসাৎ করে নেয়, কখনো বা দ্বিগুণভাবে উগরে দেয়। করুণ আর্তনাদের মতো দু-একটা শঙ্খধ্বনিও ভেসে আসে। ঝড়ের শব্দ থেকে এই সমস্ত শব্দগুলোকে আলাদা করে বসে থাকা মানুষেরা যেন তাদের বেঁচে থাকাটাকে উপলব্ধি করে।

বৃষ্টির সহযোগিতায় ঝড় যেন আরো উন্মুক্ত, এক এক ঝাপটায় সমস্ত ঘর কাত করে নুইয়ে দেয় ; এবং এক মুহূর্তের অবসরে তা সামলে উঠতে না উঠতে

আবার ঘর কাত হয়, এরকমই চলতে থাকে। ঘরের কোথাও আশ্রয় নেই, সবখানেই অঝোর ধারায় জল পড়ছে। উবু হয়ে বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থেকে পিঠ পেতে বারিধারার তীক্ষ্ণ শলাকাগুলোকে তারা প্রতিহত করতে চেষ্টা করে। এরকমভাবে বসে থেকেই আনন্দ তার জান্তব দৃষ্টি ফিরিয়ে ফিরিয়ে ঘরের অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করে। কোথাও একটা বৃক্ষপতনের শব্দ হয়, আনন্দ চীৎকার করে ওঠে—"ঘরডা আর টিকব না, খাটের নীচে হামা, নাঅইলে ঘর চাপা পইড়াই হগ্‌গলে মরমু।"

চতুষ্পদ জন্তুর মতো হামাগুড়ি দিয়ে বুকে মাটি ঘষতে ঘষতে সবাই একে একে তক্তপোষের নীচে গিয়ে আশ্রয় নিতে থাকে। আনন্দ তাদের সাহায্য করে। শ্রীদাম অতি সহজেই বেড়ালছানার মতো খাটের নীচেই ঢুকে যায়। মনোর মায়ের মাথা ঠকাস করে খাটের ধারে ঠোকা খায়। বুক ভেঙে বেরিয়ে আসা কান্না আনন্দের ঠেলা খেয়ে খাটের নীচে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে কোঁৎ করে গিলে ফেলে। আনন্দ ধমকায়—"ভিৎরে হামাইয়া আগে বাইচ্যা ল খন। ইয়ার পর পরান খুইল্যা চেচাইস।"

মনোরমাকে অতি সন্তর্পণে যেতে হয়। মা-বানরের মতো ডান হাতে বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে ধরে টেনে হিঁচড়ে শরীরটাকে নিয়ে সে এগুতে থাকে। আনন্দ মনোরমা'র পিঠ হাত দিয়ে চেপে রেখে ধীরে ধীরে ঠেলে। কেঁচোর মতো পিঠের উপর তরঙ্গ তুলে তুলে এক সময় মনোরমা খাটের আশ্রয়ে চলে যায়। সবার শেষে খাটের নীচে ঢোকার মুখে আনন্দ উত্তরের চাল উড়ে যাওয়ার শব্দ পায়। কচ্ছপের মতো দ্রুত মাথাটা খাটের নীচে সেধিয়ে নিয়ে, পিঠটা উঁচু করে, শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে আনন্দ খাটটাকে নীচ থেকে ঠেকা দিয়ে রাখে। ভয়ে এবং ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে অন্য সবাই ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হতে হতে তার বুকের নীচে এসে জমা হতে থাকে। আনন্দ মোরগের মতো নিজেকে আরো ছড়িয়ে দেয়। তার পায়ের আঘাতে ঠাকুরের আসন খাটের তলা থেকে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে চিৎপাত বৃষ্টির অজস্র ধারায় ভিজতে থাকে।

কান্নাহাসির ইতিহাস থেকে কয়েকটি ছড়া

বিষ্ণু দে

শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে 'কান্নাহাসির ইতিহাস থেকে কয়েকটি ছড়া'কে 'সামাজিক ছড়া' বলেছেন। ৬. ৬. ৭৪ তারিখের একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন: "তোমার চিঠির যত্নে নতুন বড় কবিতা পারছি না ব'লে এক গোছা পুঁরোনো ও নতুন ছড়া কাপি ক'রে পাঠাচ্ছি। কিছু কিছু উন্নতি করতে পেরেছি বোধহয়। পছন্দ হলে ছাপাতে পারো।…"

পরে, আরেকটি চিঠিতে তিনি লেখেন: "ছড়াগুলি দেশের রাজনৈতিক কাণ্ড বিষয়ে মুখ্যত কংগ্রেস বিষয়ে ১৯৩৭-এ যখন একটা বামদক্ষিণ ভেদ স্পষ্ট হল, তারপরে নির্বাচন ও মন্ত্রিত্ব ইত্যাদি নিয়ে।…" —সম্পাদক

[১৯৩৭]

দিল্লিযাত্রা

হায় দুয়োরানী! এই কি কপালে মিলল ছলে!
সুয়োরানী শেষে বেনেবউ দিয়ে করলে মাৎ,
কাশ্মীরী চালে লুফে নিলে বালখিল্যদলে!
দেখ দুয়োরানী, সুয়োরানী চলে রাজপ্রাসাদ।

দক্ষিণেবামে

বুরিদানী গাধা মরেছে দাঁড়িয়ে, শুনেছি বটে।
দক্ষিণেবামে একী টানাটানি! হয় নাকাল,
ডিগবাজি খায়, ভিরমি লাগায়, খবর রটে,
ছেলেরা পালায়, বেহুঁশ নহুষ দেশের দুলাল।

পূবে বুলবুল

"সাতভাই চম্পা, জাগো রে!"
"কেন বোন পারুল, ডাকো রে ?"
"বাংলার মেয়ে আমি, পূবে বুলবুল—"
"সত্যের রাজকোর্টে ভাঙবে সে ভুল।"

জয়ের প্রকাশ

জয়ের প্রকাশ এই যদি হয়
দেশে ঘোর দুর্যোগ, নারায়ণ !
এতে মার্কস-কে ধরবে অক্ষয়
স্বর্গে অনিদ্রারোগ, নারায়ণ !

কত ভাই

বুলাভাই, ভল্লভাই, সারাভাই, আর
পাত্তাভাই তাই তাই নাচে বারবার ;
এদিকে করেছে বটে সকলই পাচার,
বলে : মামাবাড়ি বাছা হবেন নাচার।

[১৯৫২]

জানোআরির কাহিনী

১

ছোট ছেলে নাচে ধেই ধেই, বলে : ছেলেমানুষ !
বলে নেচে নেচে : "চার বছর কি পাঁচ বছর।"
বলে : "নেচে চাই ইয়াংকিডুডল, চাই ফানুষ,
পেলে বেঁচে যাই চার বছর কি পাঁচ বছর।"

দুর্ভিক্ষের স্লোগান বুঝি না দুর্মূল্যেও
জোগান কমে না, ধেইধেই আমি ছেলেমানুষ।
বলে : "পচা চাল খাই নেকো, সেই রব তুললেও
আমার কানে তা যায় না এলে বা বেলে মানুষ।

পাঁচটি বছর যদি পাই আমি হব বড়ো,
হাড়ের পাহাড়ে কান্নার কড়ি করি জড়ো।”
পাঁচ বছরে বা চার বছরেই এই প্রতাপ !
ন-দশে না জানি কি হবে রে ভাই! বাপরেবাপ।

২

পার্লামেন্ট কোথায় সেই টেমসনদীর ধারে,
আবার দেখ কুরুক্ষেত্রে এই যমুনার পারে।
বোলস্ শাহেবের কোলাকুলি, হও না সং দেশে,
কংগ্রেস তো ওয়াশিংটনে, আবার কংগ্রেসে !
রামরাজাসভায় জনগণ দেখে যা ম্যাজিক !
বাবু সাজেন কৃষকপ্রেমী, নিদারুণ সামাজিক।

৩

এত নাক উঁচু, গলাটি যায় না শোনা,
স্বতন্ত্র চুলে পালক যায় না গোনা,
নিজবাসভূমে পরবাসী, মাথা চাল
আকাশের চাঁদে ঠেকে [illegible] কপাল !

৪

কুবের আলয় ছাড়ি উত্তরে আমার বাড়ি
ছিনু শিবুঠাকুরের ষাঁড়,
আমাকে আনল কিনে কোনো অপরাধ বিনে,
কোথায় রে কৈলাস পাহাড় !
বড়বাজারের গলি, অসহায় বসি, চলি,
বেঁধে দিলে কোথা থেকে জোড় !
কান্তে দিয়ে যদি দড়ি কাটো তবে ফেটে পড়ি
এক ছুটে লালবাজার মোড় ॥

[১৯৫৫]

বামেতর

বামেই হেলেন দেবী, দাক্ষিণ্যের সুসাম্যে সর্বদা
বামে তাঁর পক্ষপাত, জীবধাত্রী বাগ্‌দেবী বরদা
ত্রিনয়নী ভ্রূকুটিতে মারেন সরোষে বামেতরে।
অবশ্য বোঝে না মূর্খ বামেতর কখন সে মরে ॥

এলার্জি

অবাক, সবাই ভাবি কী অধ্যবসায়,
বাক্‌দেবীকে ক'রে দিলে মুমূর্ষু মশায়!
কীর্তিনাশা লেখা ছাপে কীর্তির আরজিতে,
জানে না বাক্‌দেবী দুস্থ তারই এলার্জিতে ॥

স্বাধীন সংস্কৃতি

কোথা পুত্তলিকা ? ভোজবাজিতে কঙ্কাল
দিকে দিকে সংস্কৃতির সাজে দ্বারপাল।
শিল্পী সাহিত্যিক সব পাপোশে বাহিরে,
সরস্বতী কেঁদে যান : ত্রাহি রে ত্রাহি রে ॥

পাঁচসিকে

সিদ্ধান্ত যেই না হল, বিরাট দপ্তর
খোলা হল, দপ্তরিও ষাট কি সত্তর,
লক্ষ লক্ষ টাকা গেল এদিকে ওদিকে,
অধিকর্তা ডিম দেন কুল্লে পাঁচ সিকে ॥

পেনসন

এ চাকুরি ও চাকুরি, তবু কর্তা কন :
মাহিনার পরিবর্তে চাই না পেনসন।
শুনেছি বেকার সবে পরলোকে স্বর্গে।
কর্তার নরকে লোভ—কমপক্ষে মর্গে ॥

জমিদারিলোপ

আদিতে শেঠেল বংশ, দুপুরুষে গণ্ডেরিয়া-রাজ,
পিতাকে সভ্যতা দিলে হাজারী সুন্দরী মম্‌তাজ।
বহু জমি বেচে দিয়ে সম্প্রতি ভূদানে দেন খোয়া
লক্ষ বিঘা, তারপরে হন বুঝি শেয়ারে বুর্জোয়া।

Quantity changing into Quality

গরিবেই চুরি করে, তাই খায় আর পরে বটে,
নিদেন জমায় পয়সা। তাঁর নামে মিথ্যা কথা রটে।
নিষ্কাম সাধক তিনি, দশ কোটি টাকা ব্যবসায়,
বিশ লাখ খরচা তাঁর, বাকি সব দেশেরই সেবায় ॥

সেনরাজ

বঙ্গ ছেড়ে গেছিলেন যে লক্ষ্মণ সেন
কতকাল পরে ফের সদরে ফেরেন!
আশুলোভে তোষামোদে ক'রে যান স্তব,
দপ্তরে গদিতে তৈলে বৈদ্যকুলোদ্ভব ॥

পুনশ্চ সেনবংশ

কেউ বলে গুপ্তরাজবংশ, কেউ সেন
—অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেন, নয় লাউসেন।
কপোতকপোতী নন, আসেন বসেন
উচ্চবৃক্ষচূড়ে যত শকুন ও শ্যেন ॥

জানি, তবু বলব না

বাঙলা কি জানি না ওরে! চোপ খবরদার!
জানি, তবু বলব না তা; খিদ্‌মদ্‌গার
বাবুর্চিরা ইংরেজিই বলে, ওরে পাজি!
চেষ্টার অসাধ্য নেই, বলি ইংরাজি।

[১৯৬৭]

Beware the Jabberwock, my son !

নিবাস আজব এই কলকাতা শহরে,
ফেটে ছিঁড়ে পচে আজ ওসারে ও বহরে।
মোটা রোগা নানা পেট
পায় কত শত ভেট,
বাকি যারা কেউ মারে কেউ মরে স্বঘরে ॥

[১৯৭০]

আপিশে বা বাড়িতে ঢুকো না

ট্যাঁশগরু নয় ; শুধু ছোঁয়াছুঁয়ি চায় না,
আলগোছে ভালোবাসা এই তার বায়না।
সুতরাং যাও যদি আপিশে বা বাড়িতে
ঢুকো না, আলাপ কোরো নিরাপদ গাড়িতে ॥

রামগরুড়ের ছানা

ধৃতরাষ্ট্র আজ রামগরুড়ের ছানা,
হাতে সে হস্তিনা নেই, মস্তিও যে মানা।
চোখ বুজে ভেবে যান মাথামুণ্ডুহীন,
চুইং-গম ছেড়ে নাকি চোষেন কুইনিন ॥

তেজারতি শর্ত

লোক ভালো ? হবেও বা। কিবা তার অর্থ,
ভালোমন্দ যদি হয় তেজারতি শর্ত ?
বেচাকেনা গুপ্তি ক'রে মনুষ্যত্ব জমে ?
অসত্য কোথায় কবে সৎ মতিভ্রমে ?

নিজে মার্কস, স্বয়ং লেনিন

অজয় বিজয় ছার ! নিজে মার্কস, স্বয়ং লেনিন
জলাতঙ্ক রোগী দেখে ঘাট হয়ে গেছে বাবা ব'লে
আমোদ প্রমোদ পরিহার ক'রে দেখি যান চ'লে
সহিষ্ণুর রাজ্যে—কালরাত্রি হবে ভোর একদিন ॥

খেল্ চলে সর্বত্র, ভাই-হে

এ তো বড় রঙ্গ ! দেখ খেল্ চলে সর্বত্র, ভাই-হে !
দিল্লি বলে, ভঙ্গবঙ্গে ধনেপ্রাণে নিহত সবাই !
পিকিং বেতারে নাকি বাবুদের করেছে জবাই !
এদিকে অমুক দেখে তমুকের তমশুকে সি-আই-এ ॥

১৭।৩।৭০

ধোলাই ঝালাই

এ বলে ধোলাই দেবো, ও বলে ঝালাই,
বক্ষ জাপটে থাকে প্রাণের বালাই।
চতুর্দিকে কী উদ্‌ভ্রান্তি !
কারো বা মালাই শান্তি !
পালাই পালাই বলে কানাই বলাই ॥

কোথায় এদের ডেরা

এদিকে ওদিকে কোথায় এদের ডেরা ?
দূর বর্ক্‌লিতে, মার্কিনী কেম্‌ব্রিজে
আগুন লাগায় সে-ও কি নক্‌সালেরা ?
রং ছোঁড়ে ? কপি নয়, কপ্‌ যায় ভিজে ?

দায়ী কে ? না, ঐ কম্যুনিস্টি

হেসেছেন সেই কবে আমাদের লীলাময় রায়—
বানে ভাসে দেশ, দায়ী কে ? না ঐ কম্যুনিস্টি !
তারাই আবার দায়ী, যদি দেশে না হয় বৃষ্টি।

—এখন সবাই নকশাল ব'লে চারদিকে চায়।
এবারও বলুন আমাদের প্রিয় লীলাময় রায়॥

[১৯৭১]

বড়ে খান্ ছোটে খান্—

বড়ে খান্ দিবানিশি পাশে রাখে আয়না,
আর চোখ রাঙিয়ে সে ধমকায় নিজেকে—
কেন ছায়া তারই মতো ! কেন মুখটা বেঁকে ?
লাফায় হাঁপায় ভাঙে ! অদ্ভুত বায়না।

বলে : ওটা আরবী না উর্দু বা ফার্‌শি,
তাই গোটা চেহারাটা ভীষণ দেখাচ্ছে।
বলে : চাই স্বতন্ত্র হত্যার আরশি—
বড়ে খান্ চেঁচাচ্ছে, খাচ্ছে ও নাচছে।

খান্‌শাহী আরশি বা বাঙালির আয়না,
ও হে বড়ে শা'ব্ এক চিজ্, বৃথা বায়না।
দেখ ক্ষেপে নাচছে ও লাশ তুলে খাচ্ছে।
বড়ে খান্ ছোটে খান্ হাঁকে : হম্ হায়েনা॥

[১৯৭৪]

১৯৭৪ : জয়ের প্রকাশ খোঁজে

এখনও কি গোটা দেশ ম'রে ম'রে বাঁচে ?
থেকে থেকে মেতে ওঠে, আবার ঝিমায় ?
দুঃখের অবধি চায়, দুই হাতে যাচে ?
জয়ের প্রকাশ খোঁজে মধুর বীমায় ?

২৮।৪।৭৪

বৃদ্ধেরও হঠাৎ বুঝি মিতা জুটে যায়

জানি না যৌবন আজ কিবা ঠিক ভাবে।
শুধু বুঝি: জ্বালা তার তীব্র,
ঝনঝনাও শুনি বুঝি
মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্ন কিংখাবে,
দেখি চোখ অন্ধকার তারাজ্বলা প্রেমে,
কিংবা ঘৃণাভরে দীপ্র।

পাহাড় বুঝি এ নয়, একি এক নদী?
মাঝে মাঝে পাড় ভাঙে,
চর জাগে জলে,
টলোমলো করে বুঝি মসনদ বা গদিই।
বৃদ্ধেরও হঠাৎ বুঝি মিতা জুটে যায়
চরে চরে, এই তিনপুরুষের দলে॥

৯।৬।৭৪

কিছু নয় ঃ সংবাদ

সৌরি ঘটক

১৯৭৪ সাল বয়ে যাচ্ছে। আর ছ-মাস পরেই পড়বে ১৯৭৫ সাল। আর এর ২৫ বছর পরে অভ্যুদয় হবে নতুন শতাব্দী—কুড়ি শত খ্রীষ্টাব্দ।

আমরা যারা বয়সের একটা প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি তারা এই পঁচিশ বছর বেঁচে থাকব কিনা জানি না। তবে আজ যাঁরা তরুণ, তাঁরা নিশ্চয়ই বাঁচবেন। অনাগত শতাব্দী জীবন ও সভ্যতার সামনে যে নতুন পথের সিংহদ্বার খুলে দেবে তাঁরা হবেন সে পথের যাত্রী।

যদি বেঁচে না থাকি তবে তাঁদের সৌভাগ্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যাব।

কিন্তু এ হল ভবিষ্যতের কথা। আজ এই বয়ে যাওয়া শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে যখন প্রথম দশকের দিনগুলির দিকে তাকাই, যখন এর বিগত অতীতের বুকের ওপর কান পাতি—তখন যে ঘুমন্ত কলরোলের স্তব্ধ প্রতিধ্বনি কানে এসে বাজে, আজকের পরিবেশে তার অনেক কিছুকেই মনে হয় অদ্ভুত আর অবাস্তব। সেই উনিশ শো এক, দুই, তিন, চার সাল! কি ছিল সে সময়কার সমাজ-সচেতন বুদ্ধিজীবীদের মূল আলোচ্য বিষয়!

—'বিধবাদের বিবাহ হওয়া উচিত কি উচিত নয়'

—'মূর্তি পূজা কি বেদের বিধান সম্মত'

—'পৃথিবীতে হিন্দু ধর্ম্ম'ই শ্রেষ্ঠ কিনা'

—'সেই বৈদিক যুগের প্রাচীন তপোবনের আদর্শে গড়তে হবে জীবন'

—'গুপ্ত হত্যা করে খতম করতে হবে এদেশের ইংরেজদের'

—'পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, এমনকি স্বরাজও নয়, ইংরেজ রাজপুরুষদের কাছে চাই কিছু শাসন সংস্কার'।

—'স্ত্রীশিক্ষা মেয়েদের পক্ষে কি কল্যাণকর!'

এমনি অনেক, অনেক কথা।

আজ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে কথাগুলোকে মনে হয় কত হাল্কা, কত অপরিণত চিন্তার বহিঃপ্রকাশ।

কিন্তু আজকের মন—পঁচাত্তর বছর পরের মন। সেদিনের মানুষের

কাছে এগুলি ছিল জীবন্ত সত্য। এরই পক্ষে বিপক্ষে দাঁড়িয়ে সেদিন সংগ্রাম করে গিয়েছে আমাদের পূর্বপুরুষরা।

সেদিনের ইতিহাসের পাতায় আমাদের এই পল্লীবাঙলার গ্রামগুলির যে ছবি দেখি তা হল দীর্ঘ এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ইংরেজ আর তাদের দালাল জমিদার ভূস্বামীদের শোষণে নিঃস্ব রিক্ত কতকগুলি ভাঙা মাটির কুটির—জীর্ণ চালে তার খড় নেই—সে কুটিরের বাসিন্দাদের ঘরে নেই অন্ন। একটার পর একটা দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারীতে উজার হয়ে যাওয়া গ্রামকে ঘিরে ফেলেছে বন, পরিত্যক্ত বাড়িগুলোর দেওয়াল ধসে ধসে পড়ছে মাটিতে, ম্যালেরিয়ায় শীর্ণ হাত পা আর পেট ভর্তি পিলে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে পালাচ্ছে একমুঠো খাবারের সন্ধানে।

আর এই দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামের কল্যাণের জন্য সমাজহিতৈষীরা ভাবছেন—'পুকুরের কচুরিপানা পরিষ্কার করতে হবে'—'রাস্তায় মাটি দিতে হবে'—'গ্রামে গ্রামে পল্লীমঙ্গল সমিতি গড়ে তুলতে হবে'—'কৃষককে শেখাতে হবে স্বাবলম্বী হতে।

এই হল সেদিনের কথা। আজ কি কেউ বিশ্বাস করে যে রাস্তায় মাটি দিলে কি কচুরিপানা পরিষ্কার করলে কৃষকের সমস্যার সমাধান হবে!

কদিন আগে সমগ্র বিশ্বকে সচকিত করে ভারত-তার পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটাল। বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রথম সারিতে এসে দাঁড়ালাম আমরা। সেদিন আর এদিন!

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিতর্ক, আর পরমাণু বিস্ফোরণের বজ্রনির্ঘোষ।

শতাব্দীর শুরু আর শতাব্দীর শেষ।

এর মাঝখানে গ্রামের সেই মানুষগুলির অবস্থা কি?

যেদিন ভারত পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটাল তার কদিন পরে আমার দপ্তরে ভেসে এল একটি সংবাদ। সেই সুদূর উত্তর-বাঙলা থেকে পোস্ট অফিসের অনেক সিলমোহরের ছাপ গায়ে মেখে সেখানকার সংবাদদাতা পাঠিয়েছে—"দিনহাটা থানার কিসামত দশগ্রাম অঞ্চলের ক্ষেতমজুর বাবু বর্মণের পরিবারে পাঁচজন লোক। বাবু বর্মণ কদিন কাজ পায় নাই—খেতে পায় নাই। কাজের খোঁজে পথ চলতে চলতে অনাহারী বাবু বর্মণ কয়েকদিন আগে আবুতারা স্টেশনের কাছে মাথা ঘুরে পড়ে গেল, মূর্ছা গেল। কয়েকজন

লোক এসে জল ঢালল মাথায়। কিন্তু বাবু বর্মণ আর চোখ মেলে তাকাল না। সংসারের বাকি চারজন অনাহারক্লিষ্ট পোষ্যকে পেছনে ফেলে রেখে সে আগে চলে গেল।"

আণবিক বোমা বিস্ফোরণ—আর বাবু বর্মণের মৃত্যু।

চরম গৌরব আর চরমতম লজ্জা !

যেন পৌরাণিক যুগের শিব—কপালে চাঁদ, কণ্ঠে বিষ !

অথচ এটা হল সেই শতাব্দীর শেষ ভাগ—যে শতাব্দীর চতুর্থ দশকে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। এক রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে রয়েছে সমস্ত ভারতবর্ষ। এক অশোকচক্র লাঞ্ছিত পতাকা উড়ছে কাবুলের সীমান্ত থেকে ব্রহ্মদেশের প্রান্ত, কাঞ্চনজঙ্ঘার সুউচ্চ চূড়া থেকে কন্যাকুমারিকার সমুদ্রতট অবধি।

এ স্বাধীনতা আমাদের কাছে কত বড় আবেগের জিনিস তা আজকালের ছেলের কি বুঝবে ?

তারা কি বুঝবে আমাদের জীবনের প্রথম অংশ কেটেছে বৃটিশের দাস হিসাবে।

তারা কি করে জানবে 'ব্লাডি নিগার' গাল আমরা কত শুনেছি।

তারা কি করে দেখবে চৌরঙ্গী পাড়ায় রেস্টুরেন্টে সাইনবোর্ড 'ওনলি ফর ইউরোপিয়ানস'।

তারা কেমন করে জানবে ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় গলামাল্য সাহেব উঠলে গার্ড এসে আমাদের ঘাড় ধরে নামিয়ে দিয়ে [illegible]।

উঠতে বসতে এ অপমান আমাদের সইতে হত বলে আমরা মর্মে মর্মে জানি স্বাধীনতা মানে কি।

তাই সঙ্গত কারণেই আর পাঁচটা দেশের স্বাধীন নাগরিকের মতো এই সেদিন মাথা উঁচু করে পালন করেছি স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উৎসব।

আর তার দু-বছর পরে আমার মফস্বল সংবাদের বাক্সে কখন যেন নিঃশব্দে এসে চুপিসারে ঢুকেছে একটি মেয়ে।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম 'তুমি আমার সংবাদের বাক্সে এসে ঢুকেছ কেন ?'

সে বলল 'আমি এখন সংবাদ হয়েছি।'

—'তুমি! সংবাদ! কি করে। কি নাম তোমার ?'

—'অঞ্জলি মিত্র।'

—'কি করতে।'

—'বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজের গোবিন্দনগর হাসপাতালের স্টাফ নার্স।'

—'তারপর ?'

—'আত্মহত্যা করেছি।'

—'কোথায় ?'

—'ওপরের কোণের ঘরে।'

—'কি করে ?'

—'আর্সেনিক খেয়েছিলাম।'

—'কেন ?'

—'এই যে আমার ডাইরি।'

মরার আগে লেখা ডাইরির দু-তিনটে পাতা : "আমার নাম অঞ্জলি মিত্র। আমার বাড়ি সিংভূম জেলার পাম্প রোডের কামিনী সার্কাস ব্যারাকের কাছে। আমার বাবার নাম শ্রীদোলগোবিন্দ মিত্র। বাবা আগে ছিলেন ধানবাদ ডি. ও. এস. অফিসের কেরানী। এখন অবসর নিয়েছেন। বাবার আমরা সাত মেয়ে। আমার বড়দি ইলা ধানবাদে টিচার্স ট্রেনিং নিচ্ছে। সেজদি রমা পুরুলিয়া হাসপাতালে নার্স। কিন্তু নিজের খাওয়া-থাকা চালিয়ে সে বাড়িতে বেশি কিছু দিতে পারে না। আমার বাকি চার বোন পড়াশুনা করে। সংসারের সব খরচের বোঝার চাপ বইতে হয় আমাকে। কদিন আগে বড়দি ইলা পরীক্ষার ফি দেওয়ার জন্য আমার কাছে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিল। আর তারপরের দিন বাবা চিঠি লিখেছিল "ঘরে চাল বাড়ন্ত হয়েছে"।

"এ বছর নববর্ষের দিন ভেবেছিলাম মা-বাবাকে দুখানা কাপড় দেব। বোনদের দেব নতুন ফ্রক। কিন্তু পারি নি। দিদি ফি এর টাকা চেয়েছে কিন্তু দিতে পারব না। বাবাকেও চাল কেনার টাকা দিতে পারব না। কারণ মাসের মাঝে আমি টাকা কোথায় পাব। এই নিয়ে কদিন ভাবলাম খুব। তারপর দেখলাম মা বাবা ভাই বোন এদের সামান্য চাহিদা যদি মেটাতে না পারি তবে বেঁচে থেকে কি লাভ! তাই আর্সেনিক খেলাম।"

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম 'স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উৎসব পালন করেছিলে ?'

'হ্যাঁ। কেন! তাহলে কি আর আমি আপনার কলমে খবর হব না ?'

একটু চুপ করে থেকে বললাম 'আমার কলমে স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী আর তোমার আত্মহত্যা দুটোই খবর।'

য়্যুরি গাগারিন। নামটা প্রথম যেদিন শুনলাম সেদিন মনটা কেমন ছিল? ফুলে ফেঁপে নেচে ওঠা ভরা নদীর মতো।

মাধ্যাকর্ষণের বন্ধন কাটিয়ে য়্যুরি গাগারিন মহাকাশযানে চড়ে মহাশূন্য পরিক্রমা করছে।

নিউটন তুমি যে বলেছিলে আমায় যদি কেউ একবার এই মাধ্যাকর্ষণের বাইরে নিয়ে যেতে পারে তবে আমি কড়ে আঙুলে করে পৃথিবীটা উল্টে দিতে পারি।

তুমি আজ কোথায় নিউটন। তুমি কি জানতে পারছ যে তোমার উত্তর-সূরীরা মাধ্যাকর্ষণের শক্তি ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছে পৃথিবীর বাইরে। রূপালী চাঁদের বুকে পড়েছে মানুষের প্রথম পদচিহ্ন।

এই শতাব্দী। প্রকৃতিবিজয়ে চরম সাফল্যে গর্বিত মানুষের আমিও একজন।

কেপ কেনেডি থেকে আমার দেশের বিজ্ঞানীরাও একটি উপগ্রহ আকাশে ছেড়েছে—শিক্ষার প্রসার যার উদ্দেশ্য।

সংবাদটি করে সেই দিনই বাড়ি গেলাম সাত দিনের ছুটি নিয়ে।

অপরের স্ত্রীরা কেমন জানি না তবে আমার স্ত্রী আমার কাছে চিরকালই দুর্বোধ্য রয়ে গেল।

ডালে তেজপাতা ফোরন দিলেই বা পৃথিবীর কি লাভ হয় আর না দিলেই বা কি সর্বনাশ হয় তা আমার বুদ্ধির অগম্য—কিন্তু এই সামান্য এক-খানা তেজপাতা কি দুটো পাঁচফোরনের জন্যে আমার স্ত্রীর সারাদিনের খাওয়া মাটি ঘুম মাটি। তাই প্রতি মাসেই বাড়ি যেতে হয় সংসারের খুঁটিনাটি হাটবাজার করে দিতে।

এবারও বাড়ি গিয়ে একদিন বিশ্রাম নিলাম, তারপর একটা লোক নিয়ে শহরে গেলাম মাসকাবারী বাজার করে দিতে।

বাজার করে গ্রামে ফিরতে হয়ে গেল দুপুর প্রায় একটা। গ্রামে ঢোকার মুখেই স্কুল। গ্রীষ্মের ছুটির আগের দিন। হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। আমার ছেলেটা ক্লাস সিক্সে পড়ে। প্রতি বছরই সব পরীক্ষাতেই ফার্স্ট হয়। আমার ধারণা ছিল এবারও তাই হবে। কিন্তু পথে একজন মাস্টারমশায় বললেন 'ও সেকেণ্ড হয়েছে।'

ছেলেকে কোনো দোষ দিলাম না। আমি থাকি না। দেখিয়ে শুনিয়ে

দেওয়ার লোক নেই। নিজের চেষ্টাতেই ও প্রথম হয়। এবার একটা মাস্টার দিতে হবে—ভাবতে ভাবতে বাড়ি ঢুকলাম।

কিন্তু একি ! বাড়ি না ঢুকে বাইরের দরজার কপাটটা ধরে আমার ছেলে অঝোরে কাঁদছে আর আমার স্ত্রী আর অন্য ছেলেমেয়েরা ঘরের দাওয়ায় জড়ো হয়ে বসে আছে।

মনে মনে একটু ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম 'কি হয়েছে।'

—'ও প্রথম হতে পারে নি, তাই কাঁদছে'। স্ত্রী আমাকে দেখে মনে বল পেল 'কি ছেলে বলো দেখি। বলছি ভালো করে পড় তাহলে বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম হবি তা শুনছে না।'

আমি হাতের বোঝা নামিয়ে বললাম 'তা কেঁদে কি হবে। ভালো করে পড়ো !'

কথা শেষ করার আগে স্ত্রী বলল 'ওর দোষ নেই। রাত জেগে যে একটু পড়বে, কেরোসিন তেল কোথায় ? ঐটুকু ছেলে একটু তেলের জন্যে এ গাঁ ও গাঁ এ ডিলার ও ডিলার কাছে ধরাধরি করল—কেউ দিল না।'

য়ুরি গ্যাগারিন ! স্পেস্ ক্লোনাড ! শিক্ষার উপগ্রহ ! একটু কেরোসিন তেলের অভাবে পড়তে পায় নি আমার দশ বছরের ছেলে ! দ্বিতীয় হয়েছে। জীবনে এই তার প্রথম পরাজয়, প্রথম লজ্জা।

ডুকরে ডুকরে ফুলে ফুলে কাঁদছে সে। আমি তাকে কি সান্ত্বনা দেব !

ধরিত্রী, তুমি কি দ্বিধা হয়ে আমায় এই পিতৃত্বের লজ্জা থেকে বাঁচাতে পারো না !

এ শতাব্দী শুধু স্পুটনিক আর কমপিউটরের, শুধু চাঁদে যাওয়া আর বৃহস্পতিতে রকেট পাঠানোর শতাব্দী নয়; এ শতাব্দী নভেম্বর বিপ্লবের শতাব্দী।

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এল সেই দিন, ৭ নভেম্বর—যেদিন এই গ্রহের একটি রাষ্ট্রের শোষিত মানুষ সভ্যতার চিরদিনের শোষণকে স্তব্ধ করে দিয়ে স্পর্ধিত ঘোষণা করল : এখন থেকে ইতিহাসের আমরা, শোষিতরা, এলাম সমাজ পরিচালনার দায়িত্বে। সমস্ত শোষকশ্রেণীকে চিরকালের জন্য অবলুপ্ত করে দিলাম এ দেশের মাটি থেকে !

তারপর অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় বয়ে গেছে। আজ আর শুধু রাশিয়া নয়, দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশে শোষণহীন জীবন দিন দিন নব নব রূপে বিকশিত করছে নিজেকে।

আর এই শতাব্দীর শেষ ভাগে আমাদের দেশে!

মে মাসের একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ : "জলপাইগুড়ি জেলায় ব্যাপক খাদ্যাভাব।···ক্ষুধার জ্বালায় সন্তান বিক্রয়ের হিড়িক। এই জেলার শিবনাথপুরের আনন্দ বর্মণ তার ষোল বছরের মেয়ে যতনেশ্বরীকে বিক্রি করেছে, ভেরা বর্মণ বিক্রি করেছে আট বছরের মেয়ে বালমনীকে। আউচান পাড়ার টাউ বর্মণ বিক্রি করেছে তার এগার বছরের ভগ্নী রূপবালাকে, কাঁদুয়া বর্মণ বিক্রি করেছে তার তের বছরের মেয়ে তুলো বর্মণকে।"

হ্যাঁ। এটা উনিশ শো চুয়াত্তর সালের মে মাসের প্রকাশিত সংবাদ।

কে এই আনন্দ বর্মণ, টাউ বর্মণ ; কে যতনেশ্বরী আর রূপবালা ? আমি তাদের চিনি না—কোনোদিন চিনবও না। তবে কল্পনায় ভাবতে পারি বাবা আদরযত্ন করে মানুষ করবে বলেই মেয়ের নাম রেখেছিল যতনেশ্বরী। হয়ত রূপসী বলেই নাম হয়েছিল রূপবালা। খাদ্য কেনার জন্য কিছু টাকার প্রয়োজনে বিক্রি করে দেওয়া হল তাদের।

আমাদের পরিচিত পরিবেশে কত হাসি কত গান। কত সঙ্গীতের সন্ধ্যা। খেলার আসর, কত বিতর্ক, সেমিনার।

আর এরই নীচে কালো ছায়ার আড়ালে নারীমাংসবিক্রেতা দালালের হাত ধরে গুটি গুটি পায়ে যতনেশ্বরী রূপবালারা চলেছে বেশ্যালয়ে—দেহ বিক্রি করে জীবন ধারণ করতে।

ইতিহাস তুমি আমাদের ক্ষমা করো না, বিচার করো।

আর শতাব্দীর শেষ প্রহর তুমি আমার মনে দিও শুধু একটু অনুভূতি—যাতে অঞ্জলি, যতনেশ্বরী, রূপবালারা আমার বিবেকে সংবাদের চেয়ে অন্য কিছু অর্থ বয়ে আনে।

চীনের ভূমিকা

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

চীনের বিপ্লব বর্তমান শতাব্দীতে রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পর দ্বিতীয় যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘটনা সারা দুনিয়াতে, বিশেষত এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির জনগণের মনে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে চীনসহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অভ্যুদয় গোটা পৃথিবীর ভারসাম্যকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং সমাজতন্ত্র, জাতীয় মুক্তি ও শান্তির শক্তিগুলির অনুকূলে পরিবর্তিত করে। এই পরিস্থিতিতে উপরোক্ত শক্তিগুলির সামনে দ্রুত অগ্রগমনের এক নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হয়। কিন্তু ১৯৫৬ সালের পর থেকে মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ক্রমশ মার্কস-লেনিনবাদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এমন এক সুবিধাবাদী অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে যে তার ফলে ঐ সম্ভাবনা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। মাও সে তুং-নেতৃত্ব মার্কস-লেনিনবাদের পথ থেকে সরে আসা এবং সুবিধাবাদী অবস্থান গ্রহণের পিচ্ছিল প্রক্রিয়াকে অতি বিপ্লবী বাগাড়ম্বর ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আস্ফালনের আড়ালে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু ক্রমশ পর পর বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে যে মাও-নেতৃত্বের এই পদস্খলনের মূলে রয়েছে উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং আধিপত্য বিস্তারের আকাংক্ষা। তার মাশুল যোগাতে হয়েছে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে, বিশেষভাবে চীনের প্রতিবেশী দেশগুলির জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক অজস্র তথ্য এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়াটির স্বরূপ অনাবৃত করে তুলে ধরেছেন। মাও-নেতৃত্বের বিচ্যুতির সুদীর্ঘ কাহিনী চীন বিপ্লবের প্রতি শুভেচ্ছাসম্পন্ন সকল মানুষের কাছে বেদনাদায়ক হলেও তার সম্বন্ধে চোখ বুজে সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া চলে না। চীনের বিপ্লবের মহান সাফল্যের প্রতি বিশ্বের জনগণের মনে স্বাভাবিকভাবে যে শ্রদ্ধা

ভারত ও তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে চীনের ভূমিকা। ভাসুদেব দত্ত। ছ-টাকা। ক্ল্যাসিকাল পাবলিকেশান, কলকাতা—১৭

রয়েছে তাকে সুচতুরভাবে কাজে লাগিয়ে চীনের বর্তমান নেতৃত্ব বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে বিভ্রান্তি ও বিভেদ সৃষ্টির হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করছে। সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ মাওবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, "এই মতবাদ সামগ্রিক বিশ্বপরিস্থিতির উপর এক ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে···মাওবাদকে আঘাত করার দরকার, কারণ বিশ্বজনমতের এক প্রগতিশীল অংশ এখনও পর্যন্ত বিশ্বাস করে যে চীনের বর্তমান নেতৃত্বের মধ্যে বিপ্লবী বাসনা রয়েছে এবং তারা সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করছে।"

লেখক মাওবাদের বিচ্যুতির প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করেছেন যথেষ্ট সংযত ও বস্তুনিষ্ঠভাবে। তাঁর লেখায় বিদ্বেষের লেশমাত্র নেই, বরং বেদনাবোধ সুস্পষ্ট। মার্কসীয় তত্ত্ব ও ইতিহাসের তথ্য উভয়েরই সাহায্যে তিনি ঐ প্রক্রিয়াটির একটা সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক রূপরেখা আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। বিভিন্ন অধ্যায়ের শিরোনামাগুলি থেকেই লেখকের বিশ্লেষণ ও তথ্য পরিবেশন-পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়: যথা ১। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন ও বিশ্ববৈপ্লবিক প্রক্রিয়া (জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের কাঠামোতে দক্ষিণ-এশিয়া, বুর্জোয়াশ্রেণী ও বিশ্ববৈপ্লবিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা); ২। বিচ্ছিন্নতাবাদের উৎস সন্ধানে (মাও সে তুঙের মার্কসবাদ অনুশীলন, চীনের জাত্যভিমান, মার্কসবাদের চৈনিকীকরণ, জাতীয়তাবাদী বনাম আন্তর্জাতিকতাবাদী ভাবধারা, সোভিয়েত-বিরোধিতার আরম্ভ); ৩। ১৯৫৯-১৯৬২ পর্যন্ত সময়কাল (ভারতের দিকে চীনের দৃষ্টি কেন, কেন চীন পাকিস্তানকে আক্রমণস্থল হিসাবে বেছে নেয় নি, ভারত-চীন বিরোধ, ১৯৫৯-১৯৬২ সালের মধ্যে স্বীকৃত কর্মপন্থা থেকে চীনের বিচ্যুতি, ১৯৫৯ ১৯৬২ সালের মধ্যে চীন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক, আসল কারণ আধিপত্য বিস্তারকামী মনোভাব—সীমান্তবিরোধ নয়, ১৯৫৯-১৯৬২ সাল সময়কালে অন্য দেশগুলির সঙ্গে চীনের সম্পর্ক); ৪। ১৯৬৩-১৯৬৪ পর্যন্ত সময়কাল (১৯৬৩-১৯৬৪ সালে ভারতে চীনের ভূমিকা, মতাদর্শের পোশাক ও চীনের নতুন অভিযান, ১৯৬৩-১৯৬৪ সালে অন্যান্য দেশ বনাম চীন); ৫। ১৯৬৫ সাল (১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধে চীনের ভূমিকা; ৬। ১৯৬৬-১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালে চীনের ভূমিকা (ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে চীনের ভূমিকা, ভারত-

বিরোধী মনোভাবে চীন ও পাকিস্তান, ১৯৬৬-১৯৭১ সালের মধ্যে অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক, বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও চীনের ভূমিকা)।

এটি লেখকের প্রথম বই। প্রথম প্রয়াসের নানা চিহ্নও রয়েছে। তা-ছাড়া তিনি তথ্যের জন্য আরো অনেকগুলি প্রামাণ্য উৎস (Source) ও দলিলের সাহায্য নিলে বইখানি সবদিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ হত। তবু অসংকোচে বলা চলে যে এইসব ত্রুটিকে তিনি পুষিয়ে দিয়েছেন একনিষ্ঠভাবে অশেষ পরিশ্রম ও ধৈর্যের সঙ্গে সংগৃহীত তথ্য পরিবেশনের ও যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণের মাধ্যমে। আশা করি বইখানি তথ্যসন্ধানী পাঠকদের কাছে সমাদর লাভ করবে।

নীল পাহাড়, লাল মাটি

অসিত রায়

টাটানগর থেকে দক্ষিণে ওড়িশার দিকে দুটো রেলপথ চলে গেছে। দক্ষিণপূর্ব রেলের টাইমটেবল খুললে দেখা যায় এক লাইনের শেষ প্রান্তে বাদাম পাহাড়, অপর লাইনের শেষ স্টেশন গুয়া। পূর্বভারতের বৃহত্তম লোহা এবং ম্যাংগানিজের এলাকাকে টাটানগর তথা ভারতের অন্যান্য শহরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এই দুই রেলপথ।

ময়ূরভঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাদাম পাহাড ও গরুমহিষানীর লোহা আজ প্রায় নিঃশেষিত। মাইনিং বন্ধ আছে। কাজেই এ পথে লোকের আনা-গোনা এখন কম। কিন্তু অপর রেলপথটি ধরে ডিসেল ও বিদ্যুৎ ইঞ্জিনে টানা মালগাড়ির সারি অবিশ্রামভাবে আকরিক লোহা, ম্যাংগানিজ এবং অন্যান্য খনিজপদার্থ পরিবহণ করছে। এ পথে আজ যাত্রী সমাগমও বিস্তর।

গুয়া যাবার লাইনে প্যাসেঞ্জার ট্রেন মাত্র দুটি। টাটানগর থেকে একটি ছাড়ে ভোর সাড়ে পাঁচটায়, অপরটি বেলা নয়টা নাগাদ। দূরে ভ্রমণের ইচ্ছা থাকলে ভোরের ট্রেনই প্রশস্ত। টাটানগর স্টেশনে এক কাপ গরম চা খেয়ে এই চারশ তের নম্বর আপ গুয়া প্যাসেঞ্জারে উঠে পড়তে হবে। অবশ্য গন্তব্যস্থল এবং বিশেষ করে খাওয়া-থাকার জায়গাটি যাত্রার পূর্বেই ঠিক করে রাখা ভালো। কারণ এ পথে হুট করে যেখানে খুশি নেমে পড়লে খাবার জোগাড় হওয়া মুস্কিল এবং অধিকাংশ জায়গাতেই হোটেল রেস্টুরেন্ট আবিষ্কারের দুরাশা না রাখাই ভালো।

টাটানগর ছেড়ে গুয়া প্যাসেঞ্জার এগিয়ে চলে পশ্চিমে। প্রথমে থামে সিনি জংশনে, তারপর রাজখার্সোয়ান স্টেশনে। মধ্যে দু-একটা ছোটখাট স্টেশনও পড়বে। তারপর কখন যে গাড়ি দক্ষিণে বাঁক নেবে প্রকৃতির ছবি দেখতে তন্ময় হয়ে গেলে তা বোধহয় খেয়াল রাখা অসম্ভব। আর এই তন্ময়-তার মধ্যে হঠাৎ মনে হতে পারে যেন মানুষের অজানা অপরিচিত কোনো দেশে প্রবেশ করছি। প্রকৃতির সেই আশ্চর্য দৃশ্যপটে ভেসে উঠবে দূরে, অদূরে এবং বহুদূরে নীল আকাশের পটভূমিতে একের পর এক ঢেউয়ের মতো নীল

পর্বতশ্রেণী, অসমতল প্রান্তরের উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে অগ্রসর হতে হতে শেষে দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া কতকগুলো পায়ে চলা পথ, ঘন সবুজ ঝোপের অন্তরালে অদৃশ্যপ্রায় এক-একটি গ্রাম এবং রেল লাইনের দুপাশে নেকড়ে বাঘের মতো গুঁড়ি মেরে বসে থাকা অজস্র গ্র্যানিট পাথরের ঢিবি। প্রান্তরের বন্ধুরতা ক্রমশ বেড়ে যায়। মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা অজস্র কোয়ার্টজ আর ফেল্ডস্পারের দুধের মতো সাদা বা ঈষৎ গোলাপি রঙের টুকরোগুলো সকালের রোদে ঝকমক করতে থাকে। পাথরভাঙার খাদ থেকে মজুরেরা একটু কাজ বন্ধ করে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে ট্রেনের দিকে। হঠাৎ কোথাও একটা বিরাট হলদে রঙের গালচের মতো সর্ষেক্ষেত দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে যায়। পার্বত্য নদীর শুভ্র বালুচরে বকের দল ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ট্রেনের বাঁশি শুনে পাখা ঝাপটে উড়ে পালায়। ইতিমধ্যে থার্ডক্লাস কামরা প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। বসার জায়গা একটিও খালি নেই। দরজার কাছে অনেকে দাঁড়িয়ে। কেউ কেউ মেঝের উপরই বসে পড়েছে। যাত্রীদের অধিকাংশই সুগঠিত চেহারার কালো রঙের মানুষ। সংখ্যায় মেয়েরাই বোধহয় বেশি। তাদের কারুর হাতে ঝুড়ি, কারুর সঙ্গে গামছায় বাঁধা ভাতের গামলা, কারুর পাশে একবোঝা লকড়ি কিংবা দু-একটা মাটির কলসি। সঙ্গে কাচ্চা-বাচ্চাও রয়েছে। এরা কিন্তু চুপ করে বসে থাকার পাত্র নয়। পরস্পরের সঙ্গে অনেকেই কথা বলছে, যেন সবাই পরস্পর পরিচিত। ভাষা—কিছুটা হিন্দী এবং বাকিটা বাইরের লোকের কাছে দুর্বোধ্য অর্থাৎ তাদের মাতৃভাষা। এরা সবাই মিলে এক সঙ্গে কথা বলে না। দু-একজন দু-চারটে কথা বলে, সবাই মিলে হাসে, আবার কেউ দু-একটা কথা বলে আবার সবাই হেসে ওঠে। মজার কথা হলে সবাই সমস্বরে হেসে এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে। এত হাসি, এত কৌতুকের কথা জীবনে ওরা কোথা থেকে পায় তা একমাত্র ওরাই জানে। ট্রেন ক্রমশ এগিয়ে চলে দক্ষিণ সিংভূমের পথে। একের পর এক স্টেশন পার হয়ে সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ গাড়ি এসে পৌঁছায় চাইবাসা স্টেশনে। এ লাইনে চাইবাসা বেশ বড় স্টেশন। এখানে গাড়ি থামবে পাঁচ মিনিট। তাই ইচ্ছে থাকলে স্টেশনে নেমে একদফা চা সিঙ্গাড়া খাওয়া নেওয়া চলতে পারে।

দুই

চাইবাসা সিংভূম জেলার সদর। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে শহর বলতে

তেমন কিছুই ছিল না। দুটো পাকা রাস্তা, খানকতক পাথর দিয়ে গাঁথা বাড়ি, একটা ধর্মশালা, একটা পোস্টঅফিস আর কয়েকজন খনি মালিকের বাড়ি, অফিস এবং গুদামঘর। স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল আদিবাসী। 'কিছু বাঙালির বাস অবশ্য এখানে বহুকাল ধরেই আছে।' কিন্তু আজ নতুন শহর পুরনো শহরের গণ্ডী ছাড়িয়ে অনেকদূর ছড়িয়ে পড়েছে। টাটানগর থেকে সুদৃশ্য বাসগুলো কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর ঝড়ের মতো ছুটে এসে এখানে থামে। তারপর এখান থেকে বেরিয়ে চলে যায় বড় জামদা ও কেওনঝোড়ের দিকে, অথবা আবার ফিরে যায় টাটানগরে। নতুন শহরে গড়ে উঠেছে বড় বড় আধুনিক প্যাটার্নের বাড়ি, সিনেমা হাউস ; তৈরি হয়েছে স্কুল, টাটার কলেজ, রুংটার প্রাসাদ এবং গেস্ট হাউস, ব্যাংক, পাম্পিং স্টেশন ইত্যাদি। সন্ধ্যার পরে শহরের রাস্তাগুলোতে বিজলিবাতি জ্বলে ওঠে। রঘুর মিষ্টির দোকানে নীলাভ নিয়ন বাতি জ্বলে, রেকর্ড প্লেয়ারে বাজনা শুরু হয়, নানারকম ভাজা ও মিষ্টির প্লেট নিয়ে গল্প চলতে থাকে। মোটর বাসের কল্যাণে যে ধরনের রেস্তোঁরা গড়ে ওঠে, সেরকম অজস্র ছোট বড় রেস্তোঁরাতে ছোট ছোট টেবিলের দুধারে গ্লাসভর্তি দেশী মদ নিয়ে আড্ডা জমে। দোকান পসার আলোয় ঝলমল, বাজারে অজস্র লোক সমাগম—কেনাকাটা, দরাদরি। এখানে ওখানে এসে থামে দামী ঝকঝকে গাড়ি, জিপ, স্টেশন ওয়াগন। খনি মালিক, কাঠের ব্যবসাদার, ম্যানেজার ও সরকারী কর্মচারীদের গাড়ি। নাইলন, জর্জেট পরা অলংকারে শোভিত দেশী মেমসাহেবরা নামেন। তাঁদের সঙ্গে টেরিলিন স্যুট নেকটাই শোভিত দেশী সাহেবেরা। কারো সঙ্গে ফুটফুটে ছেলেমেয়েরা। এঁরা ব্যস্ত ও কাজের লোক। কেউ কেউ এখানে দু-একটা অফিসিয়াল কাজ সারবেন বা ঐ সংক্রান্ত ব্যাপারে কারুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করবেন। তারপর কিনবেন টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিস—যেমন দু-এক বোতল ভালো বিলাতী মদ, হয়তো পছন্দসই কোনো কাপড়, সিগারেট ইত্যাদি। তারপর এঁরা ফিরে যাবেন যে যার বাংলোয়—কেউ জোজোহাটু, কেউ ঝিংকপানি কেউ বা নোয়ামুণ্ডি। এই আলোকিত শহর-এলাকা কিন্তু খুব সীমিত। ওই সীমার বাইরে একটু পশ্চিমে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে পরিষ্কার নক্ষত্রখচিত আকাশের তলায় ম্লান চাঁদের আলোয় সাপের মতো এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে একটি জলধারা—তার নাম রোরোগারা। রোরোগারা এবং তার উপনদী গুমুয়াগারা দুইটিই

পাহাড়ী নদী। সারা গ্রীষ্মকাল ধরে এরা থাকে শুষ্কপ্রায়। দুপাশে পড়ে থাকে সাদা বালির চর। তারপর যখন বর্ষা নামে তখন লাল জলস্রোত প্রবল বেগে বয়ে চলে নদীখাত প্লাবিত করে। রোরোগারার ধার দিয়ে যে পায়ে চলা পথ, তা ধরে এই সন্ধ্যার অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে একের পর এক ছোট ছোট দল—দূরে দূরে ছড়ানো গ্রামের দিকে। ছোট ছোট দলগুলো যেন মিছিল করে চলেছে। অবশ্য কোনো রাজনৈতিক মিছিল এ নয়। এই মিছিলে চিরকাল যারা সামিল হয়ে এসেছে তারা ভারতের কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসী, এইটাই তাদের বড় পরিচয়।

এদেশের ইতিহাসের কোনো এক অস্পষ্ট অতীত যুগে এরা দুর্ভাগ্যক্রমে অভিযুক্ত হয়েছিল অনার্য নামে। আর কেবলমাত্র সেই অপরাধে তাড়া খেয়ে বনে জঙ্গলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। উন্নত বর্বরতার আক্রমণের কাছে সেই যে পরাজয় স্বীকার করল, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তারা নিজেদের দাসত্বের শৃঙ্খল আর ভাঙতে পারে নি। মুক্তির জন্য চেষ্টা তারা করে নি তা নয়, কিন্তু প্রত্যেকটাই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আর্য রাজতন্ত্রের নিষ্ঠুর তলোয়ার রক্তের বন্যা বইয়ে এই বেয়াড়াপনাকে শায়েস্তা করেছে। তারপর হাজার হাজার বছর পার হয়ে গেল। ইংরেজ আমল শুরু হল। ভারতবর্ষে গড়ে উঠল বণিকী সভ্যতা এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের খুঁটি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল এক নয়া-সামন্তবাদ। তখন ঐ কৃষ্ণকায় জাতিগুলো অভিহিত হল অ্যাবরিজিনালস রূপে। ফলে তখনও তারা জঙ্গল ছেড়ে সভ্য সমাজে বাস করার হুকুম পেল না। স্বাধীন ভারতে এই লোকগুলিকে শিডিউল্ড ট্রাইব রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। আজও সেই আদিম কালের পাহাড় ও বনভূমি তাদের বাসভূমিরূপে নির্দিষ্ট। চারটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেল। দেশের মধ্যে গড়ে উঠল কত শহর, কত বাঁধ, কত বিদ্যুৎকেন্দ্র, কত আকাশচুম্বী অট্টালিকা। টেলিভিসান চালু হয়ে গেছে কতকগুলি শহরে, মহাকাশে রকেট ছুটছে; আর একই সঙ্গে কলিকাতা, বোম্বাই ও দিল্লীর অত্যাধুনিক হোটেলগুলিতে কালো টাকার বন্যায় বিলাস ও সম্পদ ফেনায়িত হয়ে উঠছে। কিন্তু তবু আজও ঐ হতভাগ্য উপজাতিগুলোর জীবন কাটে পাহাড়ের কোলে বা গভীর অরণ্যের প্রান্তে ছোট ছোট মাটিলেপা পাতার কুটিরে। কনট্রাক্টারের অধীনে পাহাড়ের পাথর ভেঙে, বনের কাঠ কেটে, নদীতে মাছ ধরে কিংবা বড়জোর দু-চারটে আনাজের ব্যবসা করে তাদের

দিন গুজরান হয়। পৌষ মাসের হাড়কাঁপানো শীতের সন্ধ্যায় যখন কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে এদের উলঙ্গ কচি শিশুরা এবং ছেঁড়া নেকড়া-পরা বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা কাঁপতে কাঁপতে প্রায় অবশ হয়ে পড়ে তখন অগ্নিদেবই একমাত্র ভরসা। গুহামানবের জীবনেও তাই ছিল। আবার গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে যখন পাহাড়গুলো ভীষণ তেতে ওঠে, গাছপালা ঝলসে যায়—তখন উত্তপ্ত বালি আর পাথরের উপর দিয়ে খালি পায়ে বহুদূরে হেঁটে গিয়ে কোনো শুষ্কপ্রায় ডোবা থেকে কিংবা নদীর বালি খুঁড়ে এরা পানীয় জল সংগ্রহ করে আনে। বর্বর যুগেও মানুষরা এমন করেই জল আনত। বর্ষায় যখন পাহাড়ের গা বেয়ে জল নামে—ডোবা, পুকুর, খানাখন্দ সব জলে ভর্তি হয়ে যায়—তখন এরা গামছা দিয়ে ধরে চুনোমাছ কিংবা ব্যাং। সাপ, ইঁদুর, খরগোস অর্থাৎ বিবরবাসী প্রাণীরা এই সময় বেরিয়ে পড়ে। তখন সেগুলিকেও এরা ছাড়ে না। কিন্তু তাতেও খাদ্যসমস্যা মেটে না। কারণ আগের বছরের চাষ থেকে পাওয়া ধানচাল অনেকদিন আগেই ফুরিয়ে গেছে। তাই তারা অরণ্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে, খুঁজে আনে নানারকম গাছের মূল—যা সিদ্ধ করে তাদের পরিবারের আহারের ব্যবস্থা হয়। এইভাবে প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভর করে খাদ্যসংগ্রহ—আদিম যুগেও মানুষ করেছে, করেছে তাদের পূর্বপুরুষরা, তারাও আজ করছে। নতুনত্ব কিছু নেই।

এই জীবনসংগ্রাম তাদের জীবনযাত্রার মানকে এক পাও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি। কারণ এই সংগ্রামে মানুষকে অসহায়ভাবে প্রকৃতির দাসত্ব করতে হয়, যেমন ভাবে দাসত্ব করে জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীরা। কিন্তু এই কৃষ্ণবর্ণ মানুষগুলোর জীবনসংগ্রাম আজ আরও কঠোর, আরও ভয়ানক। বাঘ, ভাল্লুক, বুনো হাতির উপদ্রব আজ পূর্বের তুলনায় অনেক কম বটে কিন্তু তাদের জায়গায় আর এক ভয়ানক শত্রুর আবির্ভাব ঘটেছে। এই শত্রু হল বিত্তবান "সভ্য" মানুষ। মহাজনের কাছে ঋণ আজ এদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। প্রতি বছর খোরাকি বাবদ ঋণ হয়ে যায়। ঋণ হয়ে যায় ঘর বাঁধতে, কাপড় কিনতে, কারুর অসুখের সময় ওষুধ কিনতে কিংবা ছেলেমেয়ের বিয়ের সময় দু-চার জন আত্মীয় পাড়াপড়শীকে একটু মাংস-মদ খাওয়াতে। এই দেনা লাফে লাফে বেড়ে চলে। ক্রমশ ফাঁসির রজ্জুর মতো সে দেনা গোটা পরিবারের গলায় চেপে বসে। তারপর কেউ মরে অনাহারে, কেউ করে অপরাধ, কতকগুলো মানুষ ভিটেমাটি থেকে উৎসন্ন হয়ে কোথায় ছড়িয়ে

পড়ে ; আবার অনেকে নির্বোধ পশুর মতো অসহায়ভাবে সেই দড়ির টানে এগিয়ে চলে অদৃষ্টের উপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে।

এই ছোট ছোট মিছিলের মানুষগুলো কিন্তু তাদের বিচিত্র ঐতিহাসিক ভাগ্য নিয়ে এতটুকু বিব্রত বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নয়। কারণ এখন তারা ঝুড়ি খালি করে দিয়ে ঘরে ফিরছে। তাদের আনা মুরগির ডিম, চুনোমাছ, তরিতরকারী, কুলো, ধুচুনি, মুরগি—সবই বিক্রি হয়ে গেছে চাইবাসার বাজারে। হাতে যে দু-পয়সা এসেছে তার থেকে কিছু খরচ করে তারা শালপাতার ঠোঙায় কিংবা মাটির ভাঁড়ে পেট ভরে হাঁড়িয়া খেয়ে গিয়েছে। তাই এখন স্ফূর্তির মেজাজ। তরুণ-তরুণীরা চলেছে হাত ধরাধরি করে সমস্বরে গান গাইতে গাইতে। মাথায় সংগৃহীত কাঠকুটোর বোঝা আর কোলে ছেলে নিয়ে মায়েরাও সে গানে যোগ দিয়েছে। একটু পিছনে পিছনে ধীরে ধীরে মৌনমুখে লাঠি হাতে হেঁটে চলেছে ন্যুব্জ দেহ বৃদ্ধ আর বৃদ্ধারা। বহুদূর থেকে সেই মিছিলের গান শুনলে মনে হবে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ মাঝে মাঝে ডুকরে উঠছে, মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে। অন্ধকার রোরো নদীর বাঁকে বাঁকে, জোনাকি জ্বলা প্রান্তর ছাড়িয়ে, শাল মহুয়া আর পলাশের জঙ্গল পার হয়ে সেই দুর্বোধ্য একঘেয়ে সঙ্গীত বিলীন হয়ে যায় সিংভূমের নির্মেঘ তারকাখচিত রাত্রির আকাশে। এমনিভাবেই বিলীন হয়ে গেছে তাদের হাজার হাজার বছরের আরণ্যক জীবনে গাওয়া গানগুলি। চাইবাসাকে সিংভূম জেলার সদর করার যথেষ্ট যুক্তি আছে। উত্তরে টাটানগর এবং দক্ষিণে সিংভূম ও ওড়িশার খনি অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে এই শহর। চাইবাসার অদূরে জোজোহাটুর জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়গুলোর মধ্যে রয়েছে ক্রোমাইটের সঞ্চয়। জমাট চিনির দানার মতো কালো রঙের ভারী মিনারেল। খনি থেকে তুলে এই মিনারেলের খণ্ডগুলো ট্রাকে বোঝাই করে চাইবাসায় চালান করা হয়। সেখান থেকে রেলপথে চালান হয়ে যায় ইস্পাতের কারখানায় এবং কিছু অংশ রপ্তানী হয় বিদেশে। ক্রোমাইট ক্রোমিয়াম ধাতুর আকর। এই ধাতু লোহার সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি হয় স্টেনলেস স্টীল, ফেরোক্রোম প্রভৃতি মিশ্রণ। নানারকম রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করতে, তাপসহ ইঁট প্রস্তুত করতেও এই ধাতুর ব্যবহার হয়। চাইবাসা থেকে দক্ষিণে এক স্টেশন পার হলেই ঝিংকপানি। সেখানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে

রয়েছে চুনাপাথরের স্তর। এই চুনাপাথর গুঁড়িয়ে, কাদার সঙ্গে মিশিয়ে চুল্লির মধ্যে পুড়িয়ে এবং শেষে আবার গুঁড়ো করে প্রস্তুত করা হয় উৎকৃষ্ট পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট। ঝিংকপানি স্টেশনের অল্প দূরেই অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানির বিরাট কারখানা। বস্তা বস্তা সিমেন্ট ট্রাকে ভর্তি করে এখান থেকে প্রতিদিন চালান হয়ে যাচ্ছে। ঝিংকপানি ছাড়িয়ে আরও দুটো স্টেশন এগুলে আসবে কেন্দ্‌পোসী। এখানে দেখা যাবে কেওলিন বা চীনামাটির খাদ। খাদের দুপাশে ধবধবে সাদা চীনামাটির পর্বতপ্রমাণ স্তূপ। এখানেই এই মাটিকে জলে ধুয়ে, পলি ফেলে মোটা, মাঝারি, চিকন এবং খুব মিহিদানার মাটিকে আলাদা করে ফেলা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মাটির কোনোটা চলে যায় পটারি ফ্যাক্টরিতে—কাপ, ডিশ, বাসনপত্র, ইলেকট্রিকের এবং স্যানিটারির সাজসরঞ্জাম তৈয়ারির জন্য। কোনো শ্রেণীর মাটি চালান হয় ফার্নেসে লাইনিং দেবার ইঁট তৈরির জন্য। আবার কোনোটাকে পাঠানো হয় কাগজ কলে কিংবা রবার ফ্যাক্টরিতে।

এ ছাড়া চাইবাসার আশে পাশে রয়েছে আরও বহু রকম খনিজ পদার্থের সঞ্চয়—কোথাও অ্যাসবেস্টস, কোথাও ফেল্‌ডস্পার, কোথাও ম্যাংগানিজ আকর, আবার কোথাও রয়েছে স্লেটের খনি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারতের প্রধান তামার খনি মোসাবনি এবং তামার কারখানা মৌভাণ্ডার এই সিংভূম জেলারই মধ্যে। তামার সঙ্গে এখন অল্প পরিমাণে নিকেলও পাওয়া যাচ্ছে যা ভারতে একটি দুষ্প্রাপ্য ধাতু। আর এই তামার খনির কাছেই ঘাটশিলার অনতিদূরে অরণ্যময় পার্বত্যভূমিতে আবিষ্কৃত হয়েছে ইউরেনিয়াম আকর এবং গড়ে উঠেছে যাদুগোড়ার ইউরেনিয়াম খনি। তাছাড়া সিংভূমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সুবর্ণরেখা এবং আরও কয়েকটি পাহাড়ী নদীর বালির সঙ্গে মিশে আছে স্বর্ণরেণু—যদিও এই সোনার উৎস আজও আবিষ্কৃত হয় নি।

কাজেই সিংভূম জেলাকে ভারতের একটি রত্নভাণ্ডার বললে অত্যুক্তি হয় না। কারণ এই জেলার মাটি, পাহাড়, অরণ্যসম্পদ আর শস্তা মজুরি লক্ষ লক্ষ ডলার বিদেশী মুদ্রার এবং কোটি কোটি টাকা মুনাফার উৎস। আর যেহেতু ন্যূনতম মূল্যে মানুষের শ্রমশক্তিকে ক্রয় করে এবং তারপর তার কাছ থেকে শ্রমের চরম মূল্য আদায় করে নিয়েই এই মুনাফা অর্জিত হয় তাই সিংভূমের শ্রমিক জনতার দারিদ্র্যেরও বোধহয় তুলনা নেই।

একদিকে বিপুল ঐশ্বর্য এবং অন্যদিকে চরম দারিদ্র্যের একটি পাশাপাশি

চিত্র যদি দেখতে হয় তবে সিংভূমের লোহার খনি অঞ্চল একবার ঘুরে আসা দরকার। কারণ লৌহ আকরই সিংভূমের প্রধান খনিজ সম্পদ—যে সম্পদের ভিত্তিতে ভারতের শ্রেষ্ঠ ধনকুবের টাটার মুনাফার পাহাড় তৈরি হয়েছে। অবশ্য টাটা কোম্পানি একাই এই রত্নভাণ্ডারের একচ্ছত্র সম্রাট নন। ছোট বড় আরও অনেক প্রভুত্ত এ অঞ্চলে রয়েছেন। আর শুধু সিংভূমেই নয়—তাঁরা কায়েমী হয়ে রয়েছেন ওড়িশার বিস্তীর্ণ খনিজ এলাকাতেও।

তিন

লোহার খনি দেখবার জন্য চাইবাসা থেকে আর একটু দক্ষিণে যেতে হবে। ট্রেনে চাইবাসা থেকে নোয়ামুণ্ডি প্রায় সওয়া দু-ঘণ্টা লাগে। এখান থেকে লৌহ আকরের আসল রাজ্যের শুরু। কিন্তু ততক্ষণে ট্রেনের কামরা অনেকটা খালি। টুপটাপ করে কে কখন কোথায় নেমে পড়েছে ঠিক নেই। অবশ্য যারা আরও দূরের অর্থাৎ বড়-জামদা বা গুয়ার যাত্রী তারা তখনও বসে আছে। কয়েকজন শ্রমিক উঠেছে—তারা যাচ্ছে নোয়ামুণ্ডির খনিতে কাজ করতে।

নোয়ামুণ্ডি স্টেশন থেকেই টাটার (Tisco) আয়রন মাইনস দেখা যায়। বেঞ্চ পদ্ধতিতে অর্থাৎ সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে লাল রঙের পাহাড়গুলোকে কাটা হচ্ছে। স্টেশনের কাছেই এক বিরাট এলাকাকে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে তার মধ্যে আকর স্তূপ করে রাখা হয়েছে। নোয়ামুণ্ডি স্টেশন থেকে আয়রন মাইনস-এ যাবার বাস পাওয়া যায়। Tisco-র সুদৃশ্য নীল রঙের বাস। প্রত্যেকটা আপ এবং ডাউন ট্রেনের নির্দিষ্ট সময়ে বাস দাঁড়িয়ে থাকে। যারাই মাইনস-এ যেতে চায় তাদের সবাইকে তুলে নেবে ড্রাইভার। বাসে ভাড়া বা টিকিট নেই। স্টেশন থেকে মাইনস-এর মধ্যে যেখানে খুশি নামতে পারা যায়। প্যাসেঞ্জার ভর্তি হয়ে গেলেই বাস ছেড়ে দেয়।

অসমতল লাল মাটির উপর দিয়ে প্রশস্ত পিচের রাস্তা। দু-পাশে অল্পস্বল্প ঝোপ জঙ্গল। দূরে দূরে ছড়ানো বস্তী-অঞ্চল। জঙ্গলের মধ্যে মেয়েরা কাঠ-কুঠো কুড়োচ্ছে—জ্বালানির জন্য। কিছুদূর গিয়ে বাস থামে নোয়ামুণ্ডির বাজারে। ছোট বাজার। অল্প কিছু দোকানপাট। কয়েক বছর আগেও বাজার এলাকা অনেক বড় ছিল। কিন্তু নোয়ামুণ্ডি খনির যন্ত্রীকরণ হবার পর

শ্রমিকসংখ্যা দারুনভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফলে ছোট ছোট ব্যবসাদাররা মার খেয়েছে। অনেকে ব্যবসার পাততাড়ি গুটিয়ে সরে পড়েছে। জিনিসপত্র এখানে অগ্নিমূল্য। অধিকাংশ জিনিসই বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়। দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট দেখা যায় লোকের চোখে মুখে। খাবারের দোকানের সামনে কুকুরের সঙ্গে মানুষের কাড়াকাড়ি চলে উচ্ছিষ্ট পাতায় লেগে থাকা এক-আধটু খাদ্যবস্তু নিয়ে। এঁটো চায়ের ভাঁড় চাটে শিশুরা—যারা রাস্তার ধুলোয় বসে খেলা করে, গড়াগড়ি দেয়। অবশ্য এ দৃশ্যে আজ আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কারণ একই দৃশ্য আজ ভারতের সর্বত্র—কলকাতায়, দিল্লীতে, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে, সমস্ত শিল্পাঞ্চলে, সমগ্র শহরতলী অঞ্চলে, গ্রাম-এলাকায়। এ এক আশ্চর্য দেশ যেখানে এক অদ্ভুত অর্থনীতি, অপূর্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা মানুষের সঙ্গে জন্তুর ব্যবহারিক পার্থক্যটুকুও বিলুপ্ত করে দিয়েছে। জীববিবর্তনের একটা নিয়মে বলা হয় Ontogeny repeats Phylogeny. এ যেন সেই নিয়মেরই প্রদর্শনী চলেছে সারা দেশ জুড়ে। দেখানো হচ্ছে—মানুষ বিবর্তনের আদিস্তর অর্থাৎ জন্তুর স্তর থেকে আবার শুরু করতে পারে।

বাজার ছাড়িয়ে বাস উঠতে থাকে পাহাড়ের উপরে। রাস্তাটা ঢেউয়ের মতো উঠছে, কোথাও নামছে, কোথাও বা রাইট্ অ্যাঙ্গেলে বেঁকে যাচ্ছে। দুপাশে লাল মাটির উপর বড় বড় গাছ, কোথাও বা ঘন ঝোপ। লাল, হলদে এবং ডোরাকাটা নানা আকারের পাথর রাস্তার দুধারে। এখানে প্রধানত দু ধরনের পাথরের সঙ্গে লোহার আকর পাওয়া যায়। ভূতাত্ত্বিক পরিভাষায় এগুলির নাম B.H.Q (ব্যাণ্ডেড হেমাটাইট কোয়ার্টজাইট) এবং B.H.J (ব্যাণ্ডেড হেমাটাইট জ্যাসপার)। এই সব পাথরে 'হেমাটাইট' অংশটাই হল আকরিক লোহা। দক্ষিণ সিংভূমে এবং বিশেষত ওড়িশায় দেখা যায় লোহার আকর প্রধানত শেল (shale) বা কাদা পাথরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। B.H.Q, B.H.J এবং shale—এই সবগুলিই আসলে পাললিক বা পললজাত (sedimentary) শিলা। এদের মধ্যে প্রথম দুইটি তাপ এবং চাপের প্রভাবে অনেকটা রূপান্তরিত।

সিংভূমে যে রূপান্তরিত পাললিক সংগঠনের সঙ্গে লোহার আকর রয়েছে, ভূতাত্ত্বিক বিবরণীতে সেই শিলাসংগঠনের নাম আয়রন ওর সিরিজ (Iron ore series)। ১৯৩১ সালে এফ. জি. পার্সিভাল, ১৯৩৪ সালে এইচ.

সি. জোন্স, ১৯৩৫-৪০ সালে জে. এ. ডান প্রভৃতি ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার ভূতাত্ত্বিকেরা এই শিলাসংগঠন সম্পর্কে প্রচুর গবেষণামূলক রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলেন। সাম্প্রতিককালে সিংভূমের ভূতত্ত্ব সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ডক্টর অজিত কুমার সাহা · এবং ধানবাদ স্কুল অফ মাইনস-এর অধ্যাপক ডক্টর সমরেন্দ্রনাথ সরকারের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহা, সরকার এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর জে. এ. মিলার সিংভূমের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে দেখা যায় লৌহ আকর যুক্ত শিলাসংগঠন বা Iron ore series-এর বয়স ২৭০ কোটি বছরের বেশি এবং ৩২০ কোটি বছরের কম। সুতরাং মোটামুটিভাবে বলা যায় যে প্রায় ৩০০ কোটি বছর আগে এই শিলাসংগঠনের সৃষ্টি হয়েছিল। আধুনিক তেজস্ক্রিয়তা পদ্ধতিতে (Radiometric method) বয়সের এই পরিমাপ করা হয়েছে। এই সমস্ত গবেষণা থেকে লৌহ আকর যুক্ত শিলাসংগঠনের যে ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস পাঠ করা সম্ভব হয়েছে তা সংক্ষেপে এইরূপ :

৩০০ কোটি বছর পূর্বে অর্থাৎ মানবজাতি তো দূরের কথা এমনকি উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের আবির্ভাবেরও বহু আগে সিংভূমের এই অঞ্চল ছিল এক সাগরের তলায়। সেই সাগরের তলদেশে যে পাললস্তর সঞ্চিত হয়েছিল তার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল প্রচুর পরিমাণে লোহার অক্সাইড এবং কোথাও আবার লোহা ও ম্যাংগানিজের অক্সাইড। তারপর বহু যুগ পরে সেই সাগর শুকিয়ে গেল এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ বলসমূহের ক্রিয়ার ফলে সেই পললরাশি (পাললিক শিলায় পরিণত) উত্থিত হয়ে সৃষ্টি হল পর্বতমালার। এই অভ্যুত্থানের সময়ে কোথাও কোথাও পাললিক শিলাগুলি তাপ ও চাপের প্রভাবে রূপান্তরিত হয়েছিল। . তারপর সেই পাললিক শিলার অভ্যন্তরে প্রবাহিত জল ও নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রবণের দ্বারা লোহা এবং ম্যাংগানিজ মিশ্রিত পললের 'সিলিকা' অংশ দ্রবীভূত হয়ে বেরিয়ে এল এবং তার ফলে নানাস্থানে লোহা এবং ম্যাংগানিজ অক্সাইড কেন্দ্রীভূত অবস্থায় সঞ্চিত হল।

অবশ্য বিবর্তনের এই ইতিহাসটি খুবই সরলীকৃত এবং এ সম্পর্কে কিছু দ্বিমতও আছে। তবু এইটেই হল সাধারণভাবে স্বীকৃত ব্যাখ্যা।

নোয়ামুণ্ডি মাইনস বর্তমানে টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানির বৃহত্তম লোহার খনি। এখান থেকে বছরে ২০ লক্ষ টন আকর উৎপাদিত হয়। এই

আকরের প্রায় সবটাই চলে যায় টাটার লোহা ও ইস্পাতের কারখানায়। নোয়ামুণ্ডিকে ভারতের বৃহৎ খনিগুলির অন্যতম বলা যায়। বর্তমানে ভারতের বৃহত্তম লোহার খনি মধ্যপ্রদেশের বয়লাদিলা মাইনস—যার বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ৩০ লক্ষ টন ; তারপরের স্থানে আছে ওড়িশার কিরিবুরু মাইনস। এর বাৎসরিক উৎপাদন হল ২১ লক্ষ টন। বয়লাদিলা এবং কিরিবুরু উভয়ই রাষ্ট্রায়ত্ত খনি। কিরিবুরু মাইনস জাপানী সহযোগিতায় তৈরি করা হয়েছে এবং এই খনি থেকে উৎপাদিত আকরিক লোহা প্রধানত জাপানে রপ্তানী হয়।[২]

লোহার আকর বলতে বোঝায় প্রধানত দুটি মিনারেলকে—হেমাটাইট এবং ম্যাগনেটাইট। প্রথমটি ফেরিক অক্সাইড (Fe_2O_3) এবং দ্বিতীয়টি হল ফেরাস ও ফেরিক অক্সাইডের মিলিত রাসায়নিক যৌগ (Feo, Fe_2O_3)। ম্যাগনেটাইট চুম্বকধর্মী। অর্থাৎ চুম্বকে এই মিনারেল আকৃষ্ট হয়। এই মিনারেলের গলনাঙ্ক ১৫৯৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। হেমাটাইটকে ১৩৯০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে তা ম্যাগনেটাইটে পরিণত হয়। অর্থাৎ উচ্চ তাপমাত্রায় ম্যাগনেটাইট সুস্থিত (stable) কিন্তু হেমাটাইট তা নয়। সাধারণত লোহা নিষ্কাশনের জন্য হেমাটাইট আকরই ব্যবহার করা হয়। ব্লাস্ট ফার্নেসের মধ্যে হেমাটাইট, কোক কয়লা ও চূনাপাথর একত্রে ঢেলে দিয়ে গরম বাতাসের স্রোতে (blast) প্রায় ১৫০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়। এই উত্তাপে হেমাটাইট গলে যায়। চূনের সঙ্গে হেমাটাইটের সিলিকা অংশ মিলিত হয়ে একটা রাসায়নিক যৌগ (ক্যালসিয়াম সিলিকেট) সৃষ্টি হয়। এই পদার্থটি হল স্ল্যাগ (slag) যা তরল অবস্থায় ফার্নেসের উপর দিকে থাকে। কোক কয়লায় যে কার্বন আছে তা হেমাটাইটের অক্সিজেনকে টেনে নিয়ে কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরি করে এবং গ্যাসীয় পদার্থটি একটা পথ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই গ্যাসকে আবার উত্তপ্ত করে ফার্নেসে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয় ঐ রাসায়নিক বিক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটানোর জন্য। এখন সিলিকা এবং অক্সিজেন মুক্ত হয়ে যাওয়ার পর হেমাটাইটের শুধু লোহার অংশটাই পড়ে রইল। এই তরল লোহা ফার্নেসের তলার দিকে জমা হয়। তারপর তরল লোহাকে একটা পথ দিয়ে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দেওয়া হয়। বেরিয়ে আসার পর সেটি মাটির ছাঁচের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং শীতল হয়ে ক্রমশ কঠিন হয়ে যায়। উপরে জমা স্ল্যাগকেও অন্য একটা পথ দিয়ে বার করে দেওয়া হয়। ঐ স্ল্যাগ

ছোট ছোট টবে ভর্তি হয় এবং ইঞ্জিনে ঐ মালগাড়ি টেনে নিয়ে যায় কারখানা থেকে কিছু দূরে। সেখানে গিয়ে স্ল্যাগ ঢেলে দিয়ে মালগাড়ি আবার ফিরে আসে ফার্নেসের কাছে। যাঁরা ইস্পাত কারখানা দেখেন নি তাঁরা যদি বার্নপুর, দুর্গাপুর, টাটা বা রউরকেল্লার দিকে যান তবে দেখবেন সারা রাত্রি আকাশটা মাঝে মাঝে আলোকিত হয়ে ওঠে, তারপর আবার অন্ধকার হয়ে যায়। মনে হয় যেন দূরে কোথাও আগুন লেগেছে। আসলে মালগাড়ি-গুলো থেকে যখন একে একে উত্তপ্ত তরল স্ল্যাগ ঢেলে দেওয়া হয়, তখন তার আলোটাই আকাশে ঝলক দিয়ে ওঠে।

হেমাটাইটের রঙ সাধারণত ধূসর অথবা কালো। কিন্তু সাদা চীনে মাটির আনগ্লেজড প্লেটের উপর ঘষলে লাল দাগ পড়ে। হেমাটাইটের গুঁড়ো হাতে ঘষলেও হাত লাল হয়ে যায়। উন্নত শ্রেণীর ম্যাসিভ বা পিণ্ডাকৃতি হেমাটাইটে লোহার পরিমাণ থাকে শতকরা ৬৭ থেকে ৭০ ভাগ। ভেজাল অংশটার মধ্যে থাকে সিলিকা—শতকরা ০.২ থেকে ১.৫ ভাগ এবং অ্যালু-মিনিয়ম অক্সাইড—শতকরা ০.৩ থেকে ১.৩ ভাগ। লোহার খনিতে নীল রঙের হেমাটাইটের গুঁড়ো পাওয়া যায় যাকে বলা হয় ব্লু ডাস্ট। এই ব্লু ডাস্টও ভালো আকর—যার মধ্যে লোহা থাকে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ। এছাড়া পাওয়া যায় লাল রঙের একপ্রকার গুঁড়ো—যাকে বলা হয় রেড ওকার। এটাও ভালো আকর। তবে জানলা দরজা রঙ করার জন্য পেন্ট তৈরির কাজেও এর ব্যবহার হয়। কিন্তু গুঁড়ো আকরকে সরাসরি ব্লাস্ট ফার্নেসে দেওয়ার অসুবিধা হল এই যে ঢালবার সময় বাতাসের ঝাপটায় অনেকটা উড়ে বেরিয়ে যায়। সেইজন্য এগুলিকে একরকম আঠার সাহায্যে দলা পাকিয়ে পেলেট তৈরি করা হয় এবং তারপর ব্যবহার করা যায়।

ভারতবর্ষে নিকৃষ্ট মানের আকরকে—অর্থাৎ যার মধ্যে লোহার পরিমাণ শতকরা ৫৫ ভাগের কম—ব্যবহার করা হয় না। অবশ্য এই আকরকে যদি ধুয়ে নেওয়া যায় (এই পদ্ধতিকে বলা হয় benificiation) তাহলে এর মান উন্নত হয়। উন্নতমানের আকরকেও অনেক সময় ধুয়ে নিতে হয়। কারণ এই আকরে সিলিকা, অ্যালুমিনা বা ফসফরাসের পরিমাণ বেশি হলে ফার্নেসে গলাবার সময় অসুবিধা হয়—স্ল্যাগের পরিমাণও খুব বেশি হয়। তবে আমাদের দেশে এইসব ধোয়াধুয়ির ব্যাপার বিশেষ করা হয় না। তার কারণ এদেশের লোহার আকর বেশ উন্নতমানের এবং তার মজুতও অনেক।

ভারতবর্ষে মোট মজুত লৌহ আকরের পরিমাণ প্রায় ২৫০০ কোটি টন। তবে কেবলমাত্র উন্নতমানের আকরকেই যদি হিসাবের মধ্যে ধরা হয় তাহলে মজুতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৩২ কোটি টন—যার মধ্যে বিহারে রয়েছে ৯২ কোটি টন, ওড়িশায় ২১৮ কোটি টন এবং বাকিটা মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে। বর্তমানের হিসাবে পৃথিবীতে লৌহ আকরের মজুত সোভিয়েত ইউনিয়নে ৩০৪৩০ কোটি টন, কানাডায় ১২০০১ কোটি টন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০৫৫১ কোটি টন। সোভিয়েতের লৌহ আকরের রিজার্ভ পৃথিবীর মধ্যে প্রথম তো বটেই এমনকি এই সঞ্চয়ের পরিমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রের সম্মিলিত সঞ্চয়ের চেয়েও অনেক বেশি। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে জাপানের নিজের দেশে লৌহ আকর নেই বললেই চলে। ভারতের লোহার আকরের সঞ্চয় সারা পৃথিবীর মোট সঞ্চয়ের ১.৩ শতাংশ মাত্র এবং সোভিয়েত, আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু জাপান ভারতবর্ষ থেকে বিপুল পরিমাণ আকর আমদানী করে।

ভারতবর্ষে ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরে ২·২ থেকে ২·৫ কোটি টন পিণ্ডাকৃতি (massive) আকর খনি থেকে তোলা হয়েছে। এছাড়া উঠেছে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের বা ফাইন আকর যার পরিমাণ ১৯৬৫ সালে ছিল সাড়ে ১০ লক্ষ টন এবং ১৯৭২ সালে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ১৬ লক্ষ টন। আমাদের দেশে বর্তমানে যে কয়টি ইস্পাত কারখানা রয়েছে তাতে উৎপাদিত লৌহ আকরের সবটাকে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় খনিশিল্প এবং তার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নূতন নূতন ইস্পাত কারখানা বসাতে হবে। এর বিকল্প উপায় হল বিদেশের বাজারে কাঁচামাল রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা। বর্তমানে সমস্যা উভয় ক্ষেত্রেই। নতুন কারখানা বসাবার জন্য পুঁজি চাই এবং ঐ কারখানায় উৎপাদিত ইস্পাত বিক্রির বাজারও চাই। বিদেশের বাজারে কাঁচামাল রপ্তানীর ক্ষেত্রেও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা আছে। এ হেন অবস্থায়—অর্থাৎ যদি অভ্যন্তরীণ শিল্পবিকাশ এই হারেই ঘটতে থাকে এবং বিদেশের বাজারেও অকস্মাৎ চাহিদা বৃদ্ধি না হয়—আমাদের একটাই পরম সান্ত্বনা ; তা হল দেশের মজুত লোহার আকরের দ্বারাই আমরা আরও কয়েক শতাব্দী নিশ্চিন্ত ভাবে চালিয়ে নিতে পারব। অবশ্য বিজ্ঞানী মহলে অনেকে অনুমান করছেন যে কয়েক শতাব্দী বাদে হয়তো পৃথিবীর কোনো দেশেই লোহার ব্যবহার

এতটা থাকবে না কারণ তার চেয়ে উন্নতমানের কোনো কৃত্রিম পদার্থ লোহা এবং ইস্পাতের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হবে। আর তা যদি হয় তাহলে আরও নিশ্চিন্ত। মাটির তলার লোহা মাটির তলাতেই থাকবে—কষ্ট করে তাকে আর তুলতেই হবে না।

টিস্কো, ইস্কো, ভদ্রাবতী, দুর্গাপুর, ভিলাই, রউরকেল্লা অর্থাৎ সবগুলি কারখানার উৎপাদন ধরে এখন ভারতে মোট ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের এক শতাংশ মাত্র। এই সমস্ত ইস্পাত কারখানার মোট বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৯০ লক্ষ টন—যার মধ্যে টিস্কোর একার উৎপাদন ক্ষমতা ২০ লক্ষ টন। কিন্তু ভারতে ১৯৭১ সালে ৬৩ লক্ষ টন এবং ১৯৭২ সালে ৬২ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদিত হয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে ভারতে বর্তমানে ইস্পাত কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১ সাল—অর্থাৎ চার বছরে বিদেশে ভারতের ইস্পাত রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। এই রপ্তানীর পরিমাণ সূচক (Quantum index) ১৯৬৮, ৬৯, ৭০ এবং ৭১ সালে যথাক্রমে ৩৩১, ২৯৮, ২৫৫ এবং ১৩৮-এ দাঁড়িয়েছে। বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাসের ফলে ভারতীয় ইস্পাত শিল্পে সংকটের কালো মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে। অবশ্য একথা ঠিক যে গত কুড়ি বছরে এ দেশে ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫১-৫২ সালে বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষ টন এবং বর্তমানে উৎপাদিত হচ্ছে ৬৩ লক্ষ টন ইস্পাত। কিন্তু এই উৎপাদন বৃদ্ধি মোটেই সংকটের কারণ নয়। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতের ইস্পাত উৎপাদন আজও নগণ্য। উদাহরণ স্বরূপ জাপানে ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ইস্পাত উৎপাদন প্রতি বছরে এক কোটি টন হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশ থেকে আকর, কয়লা ইত্যাদি কাঁচামাল কিনেও এই হারে উৎপাদন বৃদ্ধি করে আজ জাপান তার ইস্পাত নিয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যেকেই এখন বছরে দশ কোটি টনের বেশি উৎপাদন করে। তবে সম্প্রতি সোভিয়েত এক্ষেত্রে আমেরিকাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে। কিন্তু এই সব দেশের পক্ষে আজও উৎপাদন বৃদ্ধি করা যদি সম্ভব হয় তবে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই সামান্য উৎপাদনই সংকটগ্রস্ত হচ্ছে কেন ?

এর প্রধান কারণ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ বাজারে ইস্পাতের চাহিদা দ্রুত

বৃদ্ধি পাচ্ছে না। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো যদি বহুলাংশে টিঁকে থাকে, দেশের ব্যাপক শিল্পায়নের নীতি না গ্রহণ করা হয়, আজও যদি আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তের ফলে দেশে উৎপাদিত ইস্পাত না কিনে ভারতীয় রেলের জন্য আমেরিকা থেকে ইস্পাত কেনার ব্যবস্থা হয় তবে ভারতীয় ইস্পাতের জন্য অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি কেমন করে হবে?

আর এই গোটা নীতিটাই একচেটিয়া পুঁজির মুখ চেয়ে চালানো হচ্ছে। ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা স্বপ্ন দেখছে ইস্পাত নিয়ে একদিন তারা বিদেশের বাজারে আমেরিকা, জাপান, ব্রিটেন ও পশ্চিম জার্মানিকে টেক্কা দেবে। জাতীয় ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের নীতিকে বানচাল করে তাই তারা কেবলমাত্র বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা মুনাফা করতে চায়! ভারত সরকার এই স্বার্থের সঙ্গে সমঝোওতা করছেন বহু ক্ষেত্রে। কিন্তু ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির এই বাসনা মেটবার কি কোনো সম্ভাবনা আজ আছে?

[ক্রমশ]

উত্তর মেলে না

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কেউ বলতে পারছে না কে কে যাবে। হঠাৎ
সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, এ ওর মুখের দিকে
বিমূঢ় ভঙ্গীতে তাকিয়ে থাকে।

বাইরে এখন বীজ বপনের সময়, এখন মাঠে মাঠে
পরিশ্রমী উদ্যোগ শুরু হবার কথা, হাওয়া
হঠাৎ যেন কোনো পুরনো প্রতিশ্রুতি মনে করিয়ে দেয়,
পুকুর থেকে ওই নীল পদ্মটি তুলে নিতে ইচ্ছা করে,
অনেক দিনের পোড়ো মাটি জেগে উঠে
এখন তীব্র হলকর্ষণের স্বপ্ন দেখছে।

এই সময় মাঠে মাঠে
তোমরা কে কে নামবে? এইখান থেকে শুরু করলেই
তুমি ওই দূরের খামারটাতে পৌঁছাতে পারবে,
তার আগে মাটি ঠিক করা চাই, মাঠের মধ্য দিয়ে পথ,
চলতে চলতে হাওয়ার মুখোমুখী
আকাশের আর্দ্র নীল, মাঠের সবুজ, জলের ঐশ্বর্য।

অথচ এই ছবি এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে,
কে কে যাবে তোমরা?
সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকায়,
উত্তর মেলে না।

এই স্বাধীনতা, প্রাণহীন

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাতাশ বছর ধ'রে এই স্বাধীনতা,
প্রাণহীন,
ধাতব শব্দের উচ্চারণ শুধু !

কে শেখাও আমাকে সংবিধানের মহিমা : গণতন্ত্র : দেশপ্রেম ?
এই দেশে
পদব্রজে এক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে
কঠিন নিষেধ !
তোমাকে পেছন থেকে, সামনে থেকে ভয় দেখাবে
হাজার হাজার শবদেহের নৈঃশব্দ আর শ্মশানের অন্ধকার !

যতদূর যাওয়া যায় শ্মশান ও শবদেহ, নৈঃশব্দ ও অন্ধকার ;
এ-আমার দেশ !
নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়, বুক এমন পাথর :
অথচ পাথরে একদিন দুর্বাশ্যাম কিশলয়
জন্ম নেয় ; আমার তেমন কোনো উত্তরণ,
এই দেশে, ঘোর উন্মাদের প্রলাপের মত মনে হয় ।

সময় ছিল না

কৃষ্ণ ধর

সময় ছিল না ব'লে কথাগুলো বুকে ছিল গাঁথা
অথচ নদীও ছিল বহমান অন্তরঙ্গ জল,
আকাশে ছড়ানো ছিল গোধূলির আরক্তিম ডানা
সে কি হতে চেয়েছিল আমারই মতন স্বেচ্ছাচারী
হৃদয়ের অন্তর্গত ছিল তার এমনি অবাধ্যতা ?

সময় ছিল না ব'লে যাই নাই তোমাদের কাছে
ঘুরপথে নিষিদ্ধ উত্তর দিকে যাবার বাসনা
ফুঁসে উঠেছিল বুকে দুরন্ত ঝড়ের মাথা নাড়া
(মেঘের কুর্তা গায়ে বিজলির ঝলমলে পাজামা)
আমাকে দেখাল সে তোমাদের ঘরের ঠিকানা।

সময় ছিল না ব'লে দেখিনি পাহাড়ে বাজপড়া
অরণ্যের সর্বনাশ, বুকভাঙা বিশাল অশথ
সাক্ষী হয়ে পড়েছিল যেন বা সম্পাতি সে একা
আমাকে দেখায় পথ অন্ধকারে ঝলসানো সে চূড়া ॥

মাকড়সা

সিদ্ধেশ্বর সেন

আমি ফাঁদে
পা
দিয়েছি

যেই চল্‌তি সময়টার সামনাসামনি হলাম, অমনি
সামনে দেখি মস্ত
ফাঁদ

অজান্তে
মাছি,
ডানা-গজানো পিঁপড়ে,
বা মরশুমী
দেয়ালি-পোকা

যেমন আটকে পড়ে
জালে
চতুরপানা মাকড়সার,

আমি বুঝতে পারি, তেমনি
চমৎকার

নিজের লালা দিয়ে তৈরি একটা চটচটে লোভ
জর্জর জাল

কিম্বা ফাঁদ
বিছিয়ে, বিছিয়ে কেউ পাতছে, পেতে যাচ্ছে
আশ্চর্য,
বুঝে কিম্বা না বুঝে
আমরা
প্রত্যেকে
তার মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে পড়তে
দেখছি

—লাইনটা ছোটবড়ো
ক'রে নিন
লাইনটা ওলট-পালোট
ক'রে নিন
জটলাটা কিসের,
রুটির না ভূষির
না কেরোসিন না গদাইলস্করী কিন্তু বাঘের মুণ্ডু-সাঁটা
স্টেটবাসের,
লাইনটা, লাইনটা—

শুধু
দুঃখ এই
আপনি বুঝেও বুঝতে
দেরি করলেন :

এই চোখে-ধুলো-দেবার মতো ফিক্কির,
ঠাস-বুনোট-হয়ে-ওঠা, গোটা একটা
ক্রমশঃ-স্পষ্ট, বীভৎস
জাল

আপনাকেও যা ফাঁদে
আটকাবার তাল
কষে

ছক-বেঁধে
ওৎ
পেতে থাকছে ॥

কথোপকথন

(সমর সেন-কে)

অসীম রায়

বিশ বছর আগে
খ-য়ের প্রশ্ন ছিল ক-কে
মাল খাবার আগে :
—লেখেন না কেন আজকাল ?
—লিখি না লেখার কিছু নেই
মানে মেঘ কি মাস্তান
কোনো কিছু টান
কিছুই টানে না ।
—আশ্চর্য ! পৃথিবীতে এত কিছু লেখার দেখার
ভাবার হবার
অথচ আপনার যে লেখনীর অসম্ভব ধার…
—প্রসঙ্গটা পাল্টান স্যার ।

বিশ বছর পর
গ-য়ের প্রশ্ন ছিল খর
খ-কে
মাল খাবার আগে :
—লেখেন না কেন আজকাল ?
—লিখি না লেখার যা ছিল
প্লেটে ঢেলে সাজিয়েছি প্রত্যেক বছর
এখন যে নিজেকে ঢেলেই
না সাজালে···
—আশ্চর্য !　এত কি ভাবনার
ফুল ফোটে পাখি গায়
তাছাড়া আপনার
লেখার যে অসম্ভব ধার···
—প্রসঙ্গটা পাল্টান স্যার ॥

ডালপালা, গোপন মর্মর

সুনীলকুমার নন্দী

এত উত্তেজনা, এত
রক্তের ভিতরে-খসা ব্যাপ্ত নীল
　　　　বিপুল বিন্যাস, এত
দীর্ঘ পথ ছুটে এসে—মাইল মাইল—
গেটের মাধবীলতা ন'ড়ে উঠতে
　　　　কেঁপে ওঠো, ভয়ে হিম
শরীর, শরীরময় আকণ্ঠ উৎসাহ
নামে
নেমে যায় হেমন্তের বিশীর্ণ খাড়াইয়ে ।

অথচ রক্তের চেয়ে কী আছে তাপিত, রক্তে
ভ্রূকুটি লাঞ্ছিত, দেখো
এই যে আসঙ্গনীল পত্রপুষ্পে অদৃশ্য স্পন্দন
কে পারে রক্তের মতো এমন ফোটাতে, এসো
উদ্যানের অন্তরাল খুলতে খুলতে
আনত বুকের তলে
উন্মোচিত নীহারিকা, গাঢ় হয়
রক্তের ভিতরে-খসা ব্যাপ্ত নীল, ভরা চাঁদ, কোটালের টানে
মুছে আসে ভেদরেখা
মোছে না কি দ্বিধাভার, মোছে না কি সুরক্ষিত
শিকড়ে-চারানো যেন ডালপালা
গোপন মর্মর !

কেউ কারো মতো নয়

শঙ্খ ঘোষ

কেউ কারো মতো নয়, সমস্ত নিঃশব্দ নিজে আলো।

যা ছিল তা নেই আর, যা হবে তা হবার মতো না
যা আছে তা ধ'রে আছে গহনে ফলসারঙা মেঘ

যাও চলে যাও, যাও যতদূরে যেতে পারো যাও
সুপুরিবনের সারি যেখানে চলেছে অবেলায়

কেউ কারো মতো নয়, একা একা বসেছে সকলে
এভাবে থাকার মানে আমারই নিঃশব্দে ফিরে আসা

তাই আমি ফিরে আসি, যতদূর চোখ যায় দেখি
যা আছে তা ধ'রে আছে ঝড় নয়, কিছু কবুতর।

উদ্দেশবিহীন হাওয়া

তরুণ সান্যাল

উদ্দেশবিহীন হাওয়া জানলায় খেলছিল পর্দায়
'সে সব হাওয়া আর নখে মাখি না
কেননা এখন নখগুলি কেমন বর্বর আর হিংস্র হতে চায়
ফুলের বাগান রমণীর মুখশ্রী আর সাজানো গোছানো মানুষ দেখলেই
নখের মধ্যে রিন রিন ক'রে বাজতে থাকে
খুব ধারালো ছুরির মুখে টংকার দিলে যেমন বাজে
তেমনি সেতার
তেমনি জলতরঙ্গ

আমি কেমন ক'রে অগোছালো ছবির লক্ষ্মীছাড়া সংসার থেকে
মনের মধ্যে গুছিয়ে তুলব আমাদের স্বদেশ

বন্ধুগণ, ভুল বুঝবেন না
আমার হিংস্রতা কেবল কাগজপত্রেই
আমি যথেষ্ট পোষমানানো ব'লেই
হিংস্রতা নিয়ে হাওয়ার সঙ্গে খেলতে পারি
অথচ মনে মনে বেরিয়ে পড়েছিলাম আমিও
যখন ঘুম না-ভাঙা চষামাঠের কোমলে
হালকা অতসীরঙা রোদ মাটির অাঁশে মাখামাখি শিশিরে
ওম নিয়ে নামছিল যে বয়স সেই কিশোরবেলায়
ফিলিপাইনের পাহাড়ে
ইয়াংসি নদীর বাঁকে
বেন হাই-এর এপারে ওপারে

আমার সঙ্গে যারা ছিল তারা অনেকে এখন মৃত
মোম-মাখানো শণের দড়িতে চোখ রেখে
দিন গুনছে কেউ ইন্দোনেশিয়ার জেলখানায়
বলিভিয়ার জঙ্গলে হাঁপানিতে দম ফেটে যায়
গুলির শব্দে বিহ্বল বৃষ্টিমন্থর আকাশ

অথবা মনেডা প্রাসাদে হাতে অটোমেটিক
কাঁধে নেওয়া চাষীমজুরের দায় সামাল দিতে
মাথায় হেলমেট সালভাদোর
চোখের সামনে এ-সব আমি ঘটতে দেখেছি
নিজের চোখে দেখেছি
ব্রাণ্ডেনবুর্গ তোরণের মাথায় আমাদেরই বিজয় নিশান

বন্ধুগণ আমার নখের মধ্যে
এখনো রিন রিন বাজে রক্ত
স্নায়ু ঝাঁপ খেলে
আর হাওয়া এলোমেলো উদ্দেশবিহীন আমার জানলায় ॥

সপ্তর্ষি

অমিতাভ দাশগুপ্ত

১.

দেখতে দেখতে পাগল হবে,
শুনতে শুনতে কালা ?
অত সহজ নয়,
এ দেশে জন্মানোর অনেক জ্বালা ।
জেল-ফেরতা
ঐ যে আমার বোনের
হাতে পায়ে গলায়
সিগারেটের ছ্যাকায় আঁকা
চুড়ি, নূপুর, মালা
দেখতে দেখতে পাগল হবে
শুনতে শুনতে কালা
সহজ নয়
অত সহজ নয়—
এ দেশে জন্মানোর অনেক জ্বালা !

২.

বেবিফুডহীন শিশুদিবস কি আজই ?
দুটো ছেলে কাঁদে,
পেটের ভেতর আর-একটা নড়ে-চড়ে-
বেবিফুডহীন শিশুদিবস তো আজই।

৩.

গভীর রাতে
গান্ধী মহারাজ পদযাত্রা করছেন
পার্ক স্ট্রীটের মদের দোকানের দিকে,
গভীর রাতে
শ্যামবাজারের পঞ্চমুখী মোহানায়
সুভাষচন্দ্রের ঘোড়ার লেজ
নিশানা তুলে ধরছে বেশ্যাপল্লীর দিকে,
হাবাগোবা সরল জাতীয়তাবাদী ছেলেটি ভাবছে—
কোনদিকে যাবে ?

৪.

জন-অরণ্যে তক্ষক ডাকে, তক্ষক !
দাঁতে ছুরি এঁটে
ঝাঁপ দিয়ে পড়ে
রেলকলোনির বাড়িতে বাড়িতে
প্রতি মেয়ে-পিছু তিনটি শান্তিরক্ষক।

৫.

খুবই যৌনআবেদনময়ী
ফিলমি নায়িকার ছবি ছাপা-
খবরের কাগজ বিছিয়ে
ফুটপাতে ফুটপাত হয়ে
শুয়ে থাকে একটি ভিখিরি।

নীলাকাশ খুলে ধরে ম্যাপ—
দিশেহারা দুই চোখে তার
বিপ্‌ বিপ্‌ বিপ্‌ বিপ্‌ ওড়ে
ক্ষুধায় নিটোল স্কাইল্যাব।

৬.

রাগী জুতোর চকমকিতে
সিঁড়িতে জ্বেলে আগুন
জীবনদীপ ভবন থেকে
মাথা নুইয়ে নামছে একা তরুণ।
পকেটে খসখস
একটি মরা ইন্টারভিউ লেটার—
কোদালকে তুই কোদালই বল
বেকারকে বল বেকার,
যায় রে তরুণ, হায় রে
পাশের বাড়ির খবুঁটে তার প্রেমিকাকে
কিসের জোরে চাঁদ দেখাতে চায় রে!

৭.

আমি কি বানাতে পারি মিথ্যে ঢেলে, ইনিয়ে বিনিয়ে
এখান-ওখান থেকে ধার-করা ফাঁপা কথা দিয়ে
তোমাকে দুমড়ে, ভেঙে, তুলে নানা পাঁচিলের সীমা
ও আমার দুঃখ-সুখ, লাজ-শান্তি, মাটির প্রতিমা।

সমকালের দুই কবি

নির্মল ঘোষ

সময়কালের হিসেবে আধুনিক বাঙলা কবিতার বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছে; সুতরাং আগ্রহী পাঠকের আকাংক্ষা পূরণ তার সাধ্যাতীত নয়, এমন ধারণাই স্বাভাবিক। কার্যত প্রত্যেক আত্মপ্রকাশের সূত্র ধরে যে প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী কবিতায় গ্রথিত হয়, তাকে কেবলমাত্র গ্রন্থনা হিসাবে বিচার-বিবেচনা যে শুধু কবি এবং কবিতার অপমৃত্যু ঘটায় তাই নয়, প্রায় একই সঙ্গে পরবর্তীকালকে পঙ্গু করে। বর্তমানে সম্ভবত এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে একদা একান্ত বুদ্ধিবাদের আশ্রয়েই বাঙলা আধুনিক কবিতার জন্ম এবং সেই মৌলভূমি থেকেই যথার্থ জীবনবোধ ও মানবিকতায় তার বিস্তৃতি। এবং এমত কারণেই বৈদেশিক শিকড় থেকেও পরিমিত রসসঞ্চারে সম্ভবপর হয়ে ওঠে এদেশীয় সবুজ নিসর্গ; ওঁরাও বা ছত্তিশগড়ী গানে বিপর্যস্ত হয় না কলকাতা কালচার। মৌলিক অর্থেই এর কারণ অনুসন্ধানে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হতে বাধ্য একজন অতিনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী, কর্মে ও প্রাণনায় যার আস্থা সুনিবিড়। এ-ব্যাখ্যায় তিরিশের কাব্যচর্চার সূত্রসন্ধান সকল অর্থেই যথার্থ। বিষ্ণু দে র নামোল্লেখ যদিও এখানে অনিবার্য নয়, তথাপি তাঁর কাব্যচর্চার উজ্জ্বলতম উদাহরণ যেহেতু পরবর্তী বাঙলা কবিতার একমাত্র সারাৎসার, সেকারণেই বারংবার তাঁকেই আনতে হয় প্রসঙ্গে। পরিশ্রমী নিষ্ঠায় তাঁর কাব্য যে অর্থে পর্ব থেকে পর্বান্তরে উপনীত হয়, তা কোনোক্রমেই রবীন্দ্রনাথের ভাবজাগতিক লীলা নয়; বরং উপমিত হতে পারেন উপন্যাসের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালের সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ে, কিঞ্চিৎ ভিন্নতর অর্থে, যার স্বাক্ষর স্বতঃই উপস্থিত। জীবনের প্রবহমানতার প্রতি যেমন এঁদের অটুট আস্থা, তেমনি কাব্যবিন্যাস ও শব্দসংগ্রহে এঁরা উক্তকেই পরম মূল্য দিয়েছেন; ফললাভে কবিতা হয়ে ওঠে শরীরী এবং পাঠকের সঙ্গে স্থাপিত হয় তার অনায়াস যোগসূত্র।

এই এক সময়। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা-৬। পাঁচ টাকা
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ভারবি, কলকাতা-১২। ছ-টাকা

বর্তমানের আলোচ্য কবিদ্বয় কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা মুখ্যত উক্ত ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচিত হতে পারে। কারণ উভয়েই সমাজসচেতন কবি এবং কাব্যপাঠে অনুমিত হয় যে বামপন্থী রাজনীতিতেও এঁরা সমপরিমাণেই আস্থাবান। যদিচ কবিতার পরিমণ্ডল-গত ধারণায় উভয়ের অবস্থান একই বৃত্তে নয়। উভয়ের মানসিকতাও স্বভাবতই ভিন্নতর এবং এ কারণেই সামাজিক ঘটনাবলীর অভিঘাতে উভয়ের প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। একজন যখন ঐতিহ্যের একান্ত আশ্রয়ে কায়ক্লেশে বর্ধিত হতে চান, অন্যজন তখন জনগণসম্পর্কিত রোমান্টিক আইডিয়াকেই সত্য বলে প্রতিপন্ন করার প্রয়াসে তাড়িত হন। কিন্তু সমস্যাটা উভয়ের কাছে শেষ পর্যন্ত একই থেকে যায়; আর তা হল ১৯৫০-এর পরে স্বদেশের বহু ঘটনাবলী, সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে প্রাত্যাহিক সম্পর্কের অনেক পরিচিত পরিবেশের বদল—যাকে প্রকাশ করা বা ভাষা দেওয়া হয়ে ওঠে একজন সমকালীন কবির সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব। এই দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পারলেই একজন কবি স্বভাবতঃ যেমন হয়ে ওঠেন জনচৈতন্যের অংশীদার এবং তাঁর একান্ত একাকী নরকবাস ঘোচে, তেমনি পাঠক ও কবির আত্মীয়তার যথার্থ যোগসূত্রও স্থাপিত হয়. সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্য তো নজির হিসাবেই অদ্যাবধি একারণেই বিছুমাত্র অম্লান হন-না।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কাব্যগ্রন্থ 'এই এক সময়' ১৯৫৪ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত সুদীর্ঘ আঠারো বছর সময়কালের মধ্যে লিখিত কবিতাবলী। এই একটি বিশেষ কাব্যগ্রন্থকে কেন্দ্র করে তাঁর কাব্যালোচনা যথাযথ সঙ্গত কিনা, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ সংশয় থাকায় আমি তাঁর পূর্ব কাব্যগ্রন্থ 'দিনযাপন', 'বৃষ্টি এলো'কেও প্রাসঙ্গিক আলোচনার অংশভাক্‌ হিসাবে বিবেচ্য মনে করি। এবং আমার ধারণা কিরণশঙ্করের পরিচয় এই সমগ্রেই লিপিবদ্ধ। তাঁর পাঠকমাত্রেই অবগত যে তিনি কদাচ চঞ্চল নন, অভিঘাতের প্রতিক্রিয়া কদাচ তাঁকে আত্মপ্রকাশে বাধ্য করে, একান্ত সময়কালের ঘটনায় প্রায়শই তিনি নীরব থাকেন। যদিচ তাঁর ধারণা "আমার শুধুই যাবার চেষ্টা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়" ('শুধুই যাবার চেষ্টা' : 'এই এক সময়')। এই চলমানতা একজন কবির কাছে অবশ্যই কাম্য; কিন্তু একজন আধুনিক সমাজসচেতন কবি ও একজন নিসর্গপ্রেমিক কবির চলমানতায় যেহেতু এক স্বাভাবিক প্রভেদ

বর্তমান, সেহেতুই প্রশ্ন উপস্থাপনা স্বাভাবিক যে এই চলমানতা কোন সত্যে পৌঁছুতে আগ্রহী। ১৯৫২ সালে কিরণশঙ্কর "মায়ের শিশুর স্মিত হাসি, / প্রৌঢ়ের বিগত স্মৃতি, যুবকের নিভৃত উদ্যম / মাটি ও মাঠের কাজ" ('স্বদেশ') ইত্যাদিতেই স্বদেশকে পেয়ে শান্ত ছিলেন, ১৯৬৩ সালে আপন ঘরের অন্ধকার তাঁকে আঘাত করেছে, কিন্তু তখনো তাঁর আকাংক্ষা "জানলা দরজা খুলে,/ ভাবছি এ হতশ্রী ঘরের হৃদয় / আবার সাজাবো" ('ঘরের হৃদয়'), ১৯৬৮-তে তিনি দেখেন, "পৃথিবীতে সারাক্ষণ ছিন্নভিন্ন বৃক্ষের হৃদয়" ('বৃক্ষের হৃদয়') অথবা ১৯৬৯-এ "অন্ধকার গাঢ় হয়, চতুর্দ্দিকে লুব্ধতার লালা, / মূল্যবান রত্নরাজি ক্ষয়ে যায় বুকের ভিতর" ('শতবার্ষিকীর গান্ধিজীকে নিবেদিত') ইত্যাদি। এবম্প্রকার ঘটনার বিবরণ বা সময়ের ট্রাডিশনাল ব্যাখ্যা কিরণ-শঙ্করের কাব্যে বারংবার এসেছে, কিন্তু মনুষ্যনামধারী দ্বিপদ প্রাণীর সমুদয় কর্মকাণ্ড কোনোক্রমেই কোনোকালেই যেহেতু নিতান্ত অন্ধকারে নিঃশেষিত নয়, সেহেতুই তার চলমানতা। তদুপরি ১৯৪২ সালে আমরা মিছিলের মধ্যে যে চলমানতাকে আশ্রয় করেছি, উত্তর-পঞ্চাশে সে প্রকার চলমানতা কাব্যে কোনো সমকালীন মানসিকতা বা সংগ্রামের ভাষা বহনে সক্ষম কিনা এ-ও এক সমস্যা। অর্থাৎ কিরণশঙ্কর 'দিনযাপন' থেকে 'এই এক সময়' পর্যন্ত সমস্ত সময়কালকে যদি একই অন্ধকারের অংশাবশেষ বলে ভাবেন বা প্রকাশ করেন, তাহলে কি তাকে যথার্থ বলে মেনে নেওয়া চলে? কারণ রবীন্দ্রনাথও চলমানতাকে মেনেছেন, অন্ধকারকে 'অন্ধকার'ই বলেছেন, তথাপি রাবীন্দ্রিক ব্যাখ্যার সঙ্গে আধুনিক সমাজসচেতনের ব্যাখ্যায় প্রভেদ বর্তমান। বিষ্ণু দে বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় সে কারণেই বারংবার ঘটে পর্বান্তর। অবশ্যই কিরণশঙ্কর প্রসঙ্গে আমার এমত প্রশ্নের অবতারণা, তাঁর 'খাড়া পাহাড় বেয়ে', 'বুকে বুকে বারুদ' ইত্যাদি কবিতাকেই স্মরণ রেখে। কিন্তু সৌভাগ্য যে কিরণশঙ্কর বক্তব্যের উক্ত সীমিত পরিসরেই নিঃশেষিত হন না, পক্ষান্তরে তিনিই লেখেন 'নষ্ট শতাব্দী'র মতো কবিতা অথবা 'এক এক সময়', যেখানে সমকালীন স্বদেশ ও তার পটভূমি যথার্থ ব্যাখ্যাত হয় এবং প্রায় অনায়াসেই যা পায় এক একটি নিটোল কবিতার কর্ম। এবম্প্রকার কবিতায় তিনি কিছুটা বিষণ্ণ এবং হয়তো বা সামান্য ক্লান্তও, কিন্তু একজন সমাজসচেতন কবির গুণাবলী, এতদসত্ত্বেও অপ্রকাশিত থাকে না।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তাৎক্ষণিক উচ্চারণে অবশ্য এমত দায় নেই।

কাব্যরচনা তাঁর কাছে কোনো নিদিধ্যাসন নয় ; সাময়িক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় প্রায় স্বভাবকবির মতোই তাঁর স্বতোৎসার। এমতো কবিতায় পাঠকের সঙ্গে সাময়িকভাবে হলেও, তাঁর একাত্ম হতে কিছুমাত্র দেরি হয় না এবং এ-অর্থে তুলনামূলকভাবে তিনি জনচৈতন্যের যথেষ্ট নৈকট্যে আসেন সহজেই। কিন্তু কেবলমাত্র জনচৈতন্যের নৈকট্যেই কবিতার যথার্থ সিদ্ধি নয়, এ-তত্ত্ব বহুবার উচ্চারিত হয়েছে স্বদেশে ও বিদেশে। একদা মায়াকভস্কির তুলনায় লেনিনও শিরোপা দিয়েছিলেন পুশকিনকে।

'শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামীয় সংকলনে গ্রথিত হয়েছে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৩৪৯ থেকে ১৩৭৫ সাল পর্যন্ত লিখিত কবিতার মধ্যে থেকে নির্বাচিত প্রায় দেড়শ কবিতা। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিচরিত্র অনুধাবনে উক্ত কবিতাবলীই যথেষ্ট, একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

প্রথমতই উল্লেখ্য যে, কিরণশঙ্করের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ভিন্ন ধর্মের ; প্রথমোক্তের মতো তাঁর কবিতা অন্তত ফর্মের দিক থেকে কোনো প্রাক্-বন্ধনে আবদ্ধ নয়, কালের সঙ্গে তাঁর যোগ প্রাত্যহিকের। ১৩৬২ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় তিনি যখন লেখেন "অশান্ত হৃদয় জ্বলে ; প্রত্যাহৃত প্রেম সন্তর্পণে / সাপের মতন গেছে ; রৌদ্রে পোড়ে চুমুর খোলস, / হিমঝরা কার্তিকে ভেজে / একা রাম, শূন্য রামায়ণ," ('গ্রহণ'), তার সঙ্গে পরবর্তীকালের একই বক্তব্য অব্যাহত রেখে তাকে ছড়ার ঢঙে প্রকাশ উক্ত বক্তব্যের স্বপক্ষে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখিত হতে পারে। ফর্মের বদল কনটেন্ট-এর প্রয়োজনে অবশ্যকর্তব্য ; কিন্তু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় যখন একই বক্তব্য নানা ফর্মে বারংবার পুনরাবৃত্ত হয় তখন স্বভাবতই তাঁর এই প্যাটার্ন বদলে সংশয় জাগে। ছন্দের কারণেই হয়তো ভালো লাগে, "তুমি কি আছো মেঘ / হাসির নীল মেঘ / গানের আলো মেঘ / কোথায় কোন দেশে / নিরুদ্দেশ তুমি / তা হলে।" কিন্তু এর গভীরে শেষ পর্যন্ত কি নিহিত হয় কোনো গভীর অর্থ ? ঠিক একই কারণে প্রশ্ন উপস্থাপনা সম্ভব তাঁর 'ওঁরাও নৃত্যসঙ্গীত অনুসরণে' বা 'শিউলি ঝরা মাসে' বা 'কফিনের সামনে' প্রভৃতি কবিতা প্রসঙ্গে। বিষ্ণু দে বা গারথিয়া লোরকা এ-প্রসঙ্গে অবশ্যই শিক্ষণীয় উদাহরণ। কার্যত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মানসিকতা এত বেশি পরিমাণে ঘটনা-নির্ভর যে, কোনো সাময়িকতায়, কবিতা রচনায় তিনি যে চমক সৃষ্টি করেন, তা তাঁর সহজাত. কোনো পরিশ্রমের ফলশ্রুতি নয় ; স্বভাবতই কখনো কখনো তাঁর কবিতায় আমাদের চেতনা রোমাঞ্চিত হয়, ভাল লাগার মুগ্ধবোধ আমাদের আক্রান্ত করে। এবং সম্ভবত এখানেই তাঁর সার্থকতা বা সিদ্ধি।

জাঙাল

বিমান চট্টোপাধ্যায়

কথাটায় কানপাটায় কে যেন বিস্তর গরম সীসে ঢেলে দেয়।

'হেই বাব্‌বা! হেই হো কাঁড়াবুড়ীরা উঠ্‌…উঠ্‌, দাকাবুকোরা তল্লাট ঘিঁর লিঁছে', বলতে বলতে ভয় খাওয়া মূর্তিটা দমফাটা ছুটে পালিয়ে যায়।

ঝোড়ো আকাশে থমকে থাকা আঁধার। আঁধারের ছায়ায় জমিনও আঁধার। কালিমাখা মানুষটা দুই লাফে মিশে যায় তাতে। মিশে গিয়ে বে-নজরে অন্ধকার হয়ে যায়।

আর এই বাতাস কাঁপানো হুঁশিয়ারির তরটা কান বেয়ে মগজে উঠতেই ওরা দুজনে ছট্‌ খেয়ে খাড়া হয়। দুই মেয়েমানষে মুহূর্তে শোয়া থেকে লাফিয়ে খাড়ায়। ঘুমজাগা চোখ আগুপিছু ঠাহর পাবার আগেই আতঙ্ক চারিয়ে যায় আগাপাস্তালায়। মুহূর্তে থমকে যায় রক্ত! 'দাকাবুকোরা তল্লাট ঘিঁর লিঁছে, আর তুমাদের হুঁশ নাই। এখনও ঘুমাছ! মরণ ঘুম নাকি বাব্‌বা!'

ভয়ে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে শরীর। হাত-পা-গুলান মুহূর্তে কেমন আলগা হয়ে পড়ে।

দুই মেয়েমানুষে থম মেরে দাঁড়িয়ে পড়ে। যেন আলটপকা বিপদটা এসে পড়াতে বোবা মেরে যাওয়া পাথরমূর্তি! তারপর চোখাচোখিতে বিস্ময়! একি! তারা কোন রাজ্যের সুখশয্যায় শুয়েছিল এতক্ষণ! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কোন ফুর্তির স্বপ্নে বুঁদ ছিল?

সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে শুধু কয়লাগুঁড়ির ঢেউ। পায়ের নীচে কালা জমি ঢেউ ভেঙে ভেঙে আধমাইলের রাজ্যি জুড়ে আছে। তার এক খাঁজে আটকে পড়া দুই বাউরি মেয়েমানুষ। কখন যে এলিয়ে গেছে, কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে…।

ছুটন্ত মানুষটার হুঁশিয়ারির অনেক আগেই ভোজবাজির মতো ঢিবিগুলান সব বেবাক ফাঁকা। তড়কা আঁধারে গুমমারা জগত। থমকে আছে।

আকাশের সমুদ্দুরটা এখন-তখন ভেঙে পড়বে বুঝি। লুটোপুটি খাচ্ছে শূন্যের মেঝের ওপর। যেন ভয়ংকর প্রলয় আসছে!

ওরা শুয়েছিল দুই ঢিবির হাঁটুভাঙা নরম কোলে। ঢিবি না টপকালে দেখা যায় না, মানুষ আছে ওখানে। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে জমি উঠেছে, নেমেছে, আবার লাফিয়ে উঠেছে আরও বেশি। কালো কালো অসংখ্য ঢিবি।

হঠাৎ বাতাস বাড়ল। বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ। পরের দিকে আকাশ ভেঙে নিশ্চয়ই মাতন চলছে কোথাও। বর্ষার আকাশ। এই হাসছে, এই ফুঁসছে। অথচ যখন তাল সামলে চোরা পায়ে ভেতরে ঢুকেছিল ওরা, তখনও আকাশে নরম রোদ ছিল। ধূ ধূ কয়লাগুঁড়ির বালিয়াড়ি জুড়ে মনিষ্যি ছিল না কোথাও। বাঁ দিকে কয়লাজমির গা ঘেঁষে আড়াই মানুষ উঁচু ইস্পাত কারখানার পাঁচিল। মাইলের পর মাইলেও যার শেষ দেখা যায় না। হাজারো পেল্লাই নল-চিমনির রুপো ঝলকাচ্ছিল রোদে, গলগলিয়ে ধোঁয়ার মেঘ আকাশ হয়ে যাচ্ছিল অহরহ। পাঁচিলের ওপাশটা যেন রূপকথার জগত। এপাশ থেকে হাজারো কলকব্জা বা মানুষদের কাউকে দেখা যায় না। এপাশটা যেন মনিষ্যিহীন নদীর চড়া। ফাঁকা ধূ ধূ।

মা-কে পেছনে রেখে জোয়ানী মেয়েটা তড়িঘড়ি দু-কদম ঢিবি ঠেলে উঠে যায়। দাকাবুক্কোদের হাঁকডাকের দিক ঠাওরাতে। ইতিউতি চোখ ঠারে, কাউকে নজর হয় না। লাফিয়ে পেছিয়ে আসে। মানুষদের দস্যি মেজাজ হাঁকোড় শুনতে কান খাড়ায়। কিন্তু তার আগেই আকাশের বুকে চিড় ধরিয়ে নেমে আসে প্রকৃতির ত্রিশূল! —কড় কড় কড়াৎ! শব্দ হয়। কেঁপে যায় ব্রহ্মাণ্ড। চমকে ওঠে দুই বাউরি পরাণের অন্তরাত্মা।—'হেই বাব্‌ বা, হেই মাই মহামায়া, কাড়ান দেও', বিড়বিড়িয়ে ঠাকুর জপে ওঠে রমণীর মা।

একটু আগে হুঁশিয়ারি দিয়ে গেল কে? তাদেরই কেউ। 'আরও আগে কেন জাগাল দিলেক নাই।' সেকি পালাতে পেরেছে? নাকি ধরা পড়ে যাবে? কোন দিকে গেল। কোন দিকে আছে খুনেড়াগুলোর খাঁকি সার। কতটা জমি ঘিরেছে। বন্দুক-লাঠির নাচন-কোঁদন কেমন। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

মা-মেয়ে দুজনেই কান পাতল বাতাসে। চারদিক নিস্তব্ধ নির্জন!

মনে হবে দুশো গজের মধ্যে মানুষ নেই কোথাও। শুধু বাতাসের হা হা শব্দ। অনেক দূরে—কালো মেঘ যেখানে ঝাঁপিয়ে নেমে এসেছে, কালো জমি ছুঁয়েছে—শুধু সেখানে কয়েকটা কালো কাক এলোপাথাড়ি দামাল হাওয়ায় ফুর্তি লুটছে। বাতাসে কুটো উড়ছে।

তেমন হলে, হল্লা আর ধরপাকড়ের খেউড় তো কানে বাজবে দু-একটা। কিন্তু কিছুই শোনা যায় না। তবে কি ধরপাকড়ের কাজ শেষ! মায়ের পিঠে সরসরিয়ে হিম নামে। মাথার মধ্যে ঘোঁট পাকিয়ে যায় বুদ্ধির হিসাব নিকাশ। পায়ের কাছে বস্তাগুলো পড়ে। ভরা দুটো বস্তার মুখ বাঁধা। বাকি দুটো আ-ভরা। তার ওপরই হুঁশকাবার শরীর দুটো শুয়েছিল এতক্ষণ।

দেড় কুড়িতক কালো কালো মূর্তি তারা আগে পেছনে বেড়া টপকেছিল। আধ-আঙুলী কাঁটাতারের দু-মানুষ বেড়া, বল্লীতে বল্লীতে পাক খাইয়ে যেন দুগ্‌গ বানিয়ে ফেলা। তার ভেতরে হীরে খনির পাহাড়। কালাহীরের হেলা ফেলা পড়ে থাকা।

রোজকার মতো দুজন-চারজন করে আজও ঢুকেছিল ওরা। সকাল থেকেই ঢুকতে থাকে। বাঁকানো তারের ফাঁকগুলো দিয়ে মেয়ে পুরুষ ডাগর শিশু যে পারে সেঁধিয়ে পড়ে। বেড়ার ভেতর মাটিতে পা দিয়েই ভক্তি জানায় জমিকে নয়তো ভয় করে বিপদকে। মাটিতে হাত ছুঁইয়ে সবাই কপালে ঠেকায়। কাঁধে বস্তা। ভেতরে ঢুকেই ঝুপঝাপ সরে যায় ঢিবির আড়ালে। নজর রাখে এদিক ওদিক।

আজও রেখেছিল। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে নি। শব্দ করে নি। কারণ যে কোনো সময়ে খাকি নেকড়েগুলোর শিকারী তাড়া ঝাঁপিয়ে ধরে ফেলতে পারে, সড়কির বৃষ্টিতে তছনছ হতে পারে মাথাগুলান, এমনকি বন্দুকও চলতে পারে। ভেতরে ঢুকেই শুরু করেছিল বস্তা ভরা। খাবলা খাবলা উঠিয়ে নাও, ভরে নাও—সারা জন্মেও শেষ হবে না। কমবে না একরত্তি।

কারখানার বুকের ভেতর যেন রাবণের চিতা জ্বলছে হু হু। রানীগঞ্জের খাদান থেকে রেলে বয়ে আনা গাড়ি গাড়ি কয়লা খাচ্ছে। খেয়ে উগরে দিচ্ছে আঙার। রস নিঙড়ানো আঙারগুলো লরি লরি এসে জমছে পাঁচিলের বাইরে। জমছে তো জমছেই। জমে জমে ঢিবি হচ্ছে। ঢিবির পরে ঢিবি। দু-মানুষ তিন মানুষ উঁচু। কিন্তু তবুও এই বেড়া—নেকড়ের পাহারা—কড়া নজর চুরির ওপর।

—'জমিটো নাকি বিঁকাই গেছে। কুতো লাখোয় যেন ?' কেউ জানে না।

হঠাৎ আবার আকাশে সাপের জিভ জ্বলে ওঠে লকলকিয়ে। স্বর্গের সানের ওপর গদা গড়ানোর শব্দ হয়···গুড় গুড়! এখুনি বুঝি কান ফাটানো শব্দে গোটা আকাশটাকে কেউ মাটিতে পেড়ে ফেলবে।

মা-মেয়ে চমকে উঠে আকাশ দেখে। মেয়েকে বলে—'খর খর মাল ফেলে বস্তাগুলান গুটাঁই লে। গুটাটো ঘিঁর লিঁছে। কি মরণ ঘুম ঘুমলাম গ-অ বাব্‌বা···খালভরা, তু-অ ঘুমাই গ্যৌলি।' বলতে বলতে শাড়িটাকে হাঁটুর ওপর তুলে কষিতে গুঁজে দেয়। হাতটা যেন কাঁপছে একটু একটু! গলায় জল নেই! বেরতে পারবে তো ?

আট হাতি শাড়ি এমনি খাটো পড়ে। কষিতে গুঁজতেই উরু বেরিয়ে পড়ে। নীচে সায়া নেই। গায়ে জামা নেই। দেখায় যেন এক মেয়েছেলে পালোয়ান লড়াইয়ে নামবে এখুনি। মা-মেয়ে দুজনই আদুড় গায়ের মানুষ। জটধরা নোঙরা চুলগুলো হাত ঘুরিয়ে নেয়। যে কোনো সময়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হতে পারে, লাফাতে হতে পারে।

দুজনেরই বস্তা-বওয়া শরীর। মেয়েরটা গড়া পেটা। মায়েরটা একটু ঝোঁক খাওয়া। হাঁপ জাগানো বয়েস ঘোরার দিকে। হাত পা-গুলো রোগা আর ফাটাফাটা চামড়ায় ঢাকা। মুখে বসন্তের বসা গর্তের দাগ। মেয়ের বেড় বাড়ের দিকে। ডাকানো শরীর দিন দিন জাগছে। কিন্তু কয়লার গুঁড়িধরা খসখসে চামড়া দিন দিন যেন আরও কালো হচ্ছে। মাটির সঙ্গে শরীরের আঁতাত বুঝি বাড়ছে। মাটি যেন মানুষকেও কয়লা বানিয়ে ফেলবে। তার ওপর ভর করা জানটার ঘাড়ে সুযোগ নেবে।

রমণী নীচু হয়ে কাঁপা হাতে বস্তা খুলতে থাকে। বলে, 'টামলার নালা পের‍্যাই চল্‌ যাব-অ উ···দিকটো ফাঁকা আছেক।' দাঁত দিয়ে দড়ি কাটতে কাটতে ঢিল খাওয়া আঁচল খসে পড়ে মাটিতে। আলগা শরীর যেন পাথর কোঁদা। আঠার বছরের কুঁড়িলাগা বুকের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখে মা-টা। শরম জোড় খায় না মগজে। ওলট-পালট মনে এখন শুধু পালিয়ে বাঁচার চক্কর। অথচ অন্য সময়ে হলে খেউড় ছাড়ত—'ঢেমনী, দুবো গড়ারে, বাগা-আ না-রে কা-পড় ঢেকে—। বয়েস বাড়ছেক নেঁই ?' তারপর নিজেই বাগিয়ে দিত নীল ডুরের খাটো আঁচলটাকে। টান করে পেঁচিয়ে দিত খোলা পিঠে। মেয়েটা সরল। কখনও একা থাকে নি।

থলেগুলোকে বগলে নিয়ে ব্যাকুল চোখে রমণী বলে, 'চল্ বটে ?' মা ঠিক করতে পারে না কোন দিকে যাবে। শ্বাসে আবার বাতাসে কান রাখে। কোনো শব্দ নেই। বোধহয় দস্যিগুলান চলে গেছে। হয়ত কাউকে পায় নি। হয়ত সবাই খোলা জায়গাটা গলে ভেগেছে। কেবল তারাই হয়ত আটকা পড়েছে।

কোনো ঢিবির চূড়োয় না উঠলে আশপাশ ঠাহর হয় না। নজর ঠেক খায় চূড়োর গায়। বেড়ার খোলা দিকটা যাবার কথা মনেই হয় না। কারণ এতক্ষণ খোঁজারুগুলো নির্ঘাত ঠেকান দিয়েছে সেদিকে। আকাশের সাথে সাথে তারাও হয়ত ফুঁসছে, গর্জাচ্ছে।

অথচ দু-সন আগেও জমিটার কোনো ভাগীদার ছিল না। দেদার ডাঁই পড়ে থাকত। দশ-বিশ বস্তা ভরে নিয়ে মহাজনের গোলায় পোঁছে দিতে পারলেই বস্তা পিছু বিশ পয়সা পাওনা।

রমণীর পরিষ্কার মনে আছে, সে বছর একদিন পৌষের ভোররাতে ওরা একদল এসে দেখল জমিটা ঘের পড়ে গেছে। বিকিয়ে গেছে, রাতারাতি কাঁটাতারের বেড়া পড়েছে! পাহারা বসেছে তাঁবুতে তাঁবুতে। কিন্তু মাল তো চাই ? নইলে রুজি বন্ধ যে! তাই প্রথম প্রথম দু-চারদিন ফিরে গিয়ে পরে চোখ এড়িয়ে ঢুকেছিল। কত ঝক্কি তা প্রথমে বোঝে নি, পরে দু-চারবার তাড়া খেয়ে বুঝেছে। আর চামার মহাজনটা তবু এক পয়সা দাম বাড়াল না। যে রুজিকে সেই রুজিই রইল, কিন্তু তা একরাতে পালটে গেল চুরিতে।

এখন অন্যরকম। জনায় জনায় আরও ভাব। কালো কালো মূর্তিগুলো বোঝাই বস্তা বয়ে এনে আং-বাঁকানো বেড়ার গায়ে জমায়। তারপর হাতে হাতে পাচার হয়। একে অপরকে সাহায্য করে। চুরির সাহায্য। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই—তা নয়। চোরে চোরে তখন গাঁওতুতো নয়ত জাত-তুতো ভাই। রুজি কামাবার এক জাত। বুকে বুকে বুঝসমঝ। নয় কেন ? একে অন্যের ঘর চেনে, হাঁড়ি দেখে। বুক জানে। আর তখন কালো চামড়া কালোয় কালোয় হয়ে ওঠে কুচকুচে কালো। গামছা কাপড়ের রঙ চেনা যায় না। একরঙা মানুষ সব।

মা ঠিক করে, প্রথমে পেছন দিকের জমিতে এগোবে। একশ গজ আড়ালে আড়ালে এগোতে পারলেই ঘের বেড়ার গায়ে পৌঁছবে। তারপর বেড়া

গললেই কারখানায় যাবার বড় সড়কে পা পড়বে। কিন্তু তার বাঁকানো হবে আর এক সমস্যা। এই জাগা জাগা কাঁট'। লাগলেই চামড়া ফালা হবে।

প্রথমে সাবধানে নিশ্বাস চেপে মা পা ফেলে। মেয়ে তার পেছনে। বুকের কাঁপ জাগানো টিপটিপ শব্দ। রম্‌ণীর চাগানো বুক যেন ভয় জাগানো হাপর তখন। কিন্তু এক পা ফেলেই কাতরে ওঠে, 'ওঃ !'

—'কি হল ?'

—'ই বাব্‌-বা পা-টো ফেলতে লারছি। বাজছে খুব।'

এতক্ষণ ভুলেছিল ব্যথাটা। মেয়ে মায়ের পায়ের দিকে তাকিয়ে ঘাবড়ে যায়। এই ক-ঘণ্টায় যেন আর একটু ফুলে উঠেছে পায়ের পাতা। কদিন আগে তারের কাঁটা লেগে ফালা হয়ে গিয়েছিল চামড়া। রক্ত গড়িয়েছিল পাঁচ আঙুলের ফাঁকে। ঘরে ফিরে কাউরকাটা গাছের রস ঘষে দিয়েছিল। কিন্তু সারার বদলে হয়ত বিসিয়ে গিয়েছিল তাতে। ক্রমশই ফুলো বাড়ছে। ব্যথা বাড়ছে। ন্যাকড়া দিয়ে চেটোর মাথাটা বাঁধা আছে। বাঁধনের সাদাটা কয়লার ধুলোয় এখন কয়লার চেয়েও বুঝি বেশি কালো দেখাচ্ছে। রস কাটছে ভেতরে। গা-টা গরম লাগছে। 'ঘোর লাগছে শরীরটোয়, বাজছে খুব'—স্বগতোক্তি করে রম্‌ণীর মা। হয়ত জ্বর এসেছে, ঘুমে ঘুমে ছিল বলে বোঝা যায় নি আগে।

তবু যেতে হবে। পা ঘষটে ঘষটে টিবিতে ওঠে। সাবধানে! আকাশে হাওয়ার ঘূর্ণি! ভয়ংকর ফাঁদের মতো গুঁড়োর গাদা—পা বসে যাচ্ছে! মানুষের শব্দ নেই কোথাও! শুধু মাঝে মাঝে গুড়···গুড়···গড়···গড়···শব্দ! যেন কোনো বধ্যভূমিতে পৌঁছে গেছে তারা।

চার হাত-পায়ে টিবি বেয়ে ওঠা দুই মূর্তি। অন্ধকারের পর্দায় অনেকটা প্রাগৈতিহাসিক বুকে হাঁটা সরীসৃপের মতো। পায়ে পায়ে প্রথম টিবিটার মাথায় উঠে যায়। এতক্ষণে পঞ্চাশ-ষাট গজ আশপাশ দেখা যাচ্ছে। কেউ নেই। আর একটু উঠতেই চোখে পড়ে, অনেক দূরে, টামবলার নালার ওপারে কলিপুরের মাঠে তাণ্ডব হাওয়ার মাতামাতি। ব্রহ্মডাঙার মতো এখন কেমন ভুতুড়ে হয়ে উঠেছে জায়গাটা। শালগাছগুলো ঝুপঝাপ বেঁকছে চুরছে। কখনও হয়ত চলেফিরে বেড়াবে। তার পাশে আল ভেঙে ভেঙে ধানক্ষেত। দু-একটা বিক্ষিপ্ত ঝুপড়ি। ঝড়ে পড়ে যাবে হয়ত।

ওই মাঠটার পশ্চিম ঘেঁষেই ওদের মানুষগুলো পালিয়েছে। এসেও ছিল

ওদিক ছুঁয়ে। ঝোপের ভেতর ভেতর টামবলার নালার জল পর্যন্ত লুকনো পায়ে হাঁটা রাস্তা আছে। তারপর যেখানে নালাটার কোমর সব চেয়ে সরু সেখানে হাতে হাতে বানানো একটা গোপন ছোট্ট সাঁকো পাতা। ওরাই বানিয়েছে। সারা বছরের বন্তা পেরোয়, রুজি কামায়। শত্রুপক্ষ জানে না সাঁকোর কথা। তবে আশেপাশের ঝুপড়িবাসী, গাঁয়ের চাষীরা জানে।

সাঁকোটা বর্ষার তোড়ে মাঝে মাঝে ভেঙে যায়, ভেসে যায়, আবার বাঁধা হয়। কারণ নালাটা নামে নালা হলেও আসলে খালেরও বাড়া। বিশাল কারখানার ঝাপড়ঝাঁই শরীর-চাপা জল এই খাল দিয়েই বেরিয়ে যায়। জল আর তেল বুকে নিয়ে। কেউ বলে এ খাল দামোদরে গিয়ে মিশেছে কেউ বলে, না, আরও দূর।

ইয়ারসই মেয়েদের লাল মাড়ি দেখিয়ে রমণী বলত, 'না, উটো কারখানার মুত বটে।' ওর এক গাঁ-তুতো বিজ্ঞ কাকা উদাস স্বরে বলেছিল, 'কারখানায় গরীবগুলান ভুখা পেটে খাটে আর কাঁদে। উয়াদের চোখের জল ওই খালটো।' কোনো কথাই ঠিক নয়। শুধু ঠিক যে খালটা ওদের মাল পাচারের অন্তরায়।

ঢিবির ঢালের দিকে রমণীরা দু-চার পা নেমে যায়। হঠাৎ মানুষের গলা বেঁধে কানে। আঁতকে ওঠে! কারা যেন কথা বলে চলেছে। সর্বনাশা শত্রুরা খুব কাছেই রয়েছে। মুহূর্তে মা পেছন ঠেলে উঠে আসে। মেয়ের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়। দুজনেই গাদায় উল্টে পড়ে। কয়লার ওপর মানুষ। কালোয় কালো যোগ হয়। গুঁড়োয় শরীর মাখামাখি। লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। অসুবিধে হয় না। মাটি যেন হাত ধরে নিজেই তুলে দেয়। কারণ এ মাটি ওদের বড় চেনা! সখ্যতা অনেকদিনের। ছুটতে আরম্ভ করে। মা-টার পায়ে ব্যথা। এই মুহূর্তে হয়ত তা ভুলে গেছে। পা টেনে টেনে তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো উর্ধ্বশ্বাস পালাতে থাকে। যেন ফোঁড় হওয়ার আগে দুটো মাদী শুয়োর পালিয়ে প্রাণে বাঁচতে চাইছে। ঘন ঘন নিশ্বাসে হাঁপ-খাওয়া বসা নাকের ফুটো বাড়ছে কমছে।

আট-দশ ঢিবি দূরের কোনো আড়াল থেকে হিংস্র খুনেড়াদের স্বর বেরিয়ে আসছে, যেন শিকার ধরার আগের পাঁয়তাড়া।

—'মালুম হউরত কি হেনেহিয়েই ছুপা গালাই। ভোসরিলোকে পকড়়-ক

টামলা-কে মোহরীয়ামে পটক দিঁহি।' মনে হচ্ছে এখানেই কোথাও লুকিয়ে পড়েছে। ধরে টামবলারের মোহরীতে ছুঁড়ে দাও।

—'বাতিয়া লে-ক তু উপ্পর চহড় যাই হ। হম হোনে ঢুঁড় লে-তানি।' টর্চ নিয়ে তুমি উঠে দেখ। আমি ওদিকে দেখছি।

বোঝা যায় না ওরা কজন। কাকে খুঁজছে। কোনদিকে খুঁজছে। হয়ত সেই শেষমেষ ছুটে যাওয়া লোকটাকে দেখে ফেলেছে। নয়ত ওদের মতো আরও কেউ কেউ আটকা পড়েছে। তারাও ছুটছে—ভাগছে।

—'হামনিলো-খে এহিলোক শালে দিক্ করথই। কোই কিসিম-সে হারামীলোক কে আজ পকড়বে করি।' এরাই আমাদের বিরক্ত করে। হারামীদের আজ কোনোরকমে ধরবই।

অবশ্যই তাই। এই বাওয়ালী মরকটগুলোই তো ওদের বিরক্তির কারণ। নইলে পাঁচিলের বাইরের তাঁবুতে কমাণ্ডারের চোখের আড়ালে নিরিবিলি সময় কাটাতে আর অসুবিধে কি? এই শালারাই আমাদের আরাম-কাড়া দাগী আসামী। পাকড়ালে জোর দাবাই, তারপর সিধা চালান। তাই ওরা এখন বাঘের মতো থাবা লুকিয়ে খুঁজছে। আজ হয় এস্পার নয় ওস্পার।

হাঁসফাঁস দৌড়ে এসে বড়সড় ঢুটো টিবির উপত্যকায় মা-মেয়ে থেমে যায়। পশ্চিমের দিকে আর এগোতে সাহস হয় না। দমবাঁধা কাশি চাপছে। মা-টা হয়ত কাঁদছে। নয়ত ঠাকুরকে ডাকার আর্তিতে মুখটা কান্না কান্না লাগছে, 'হেই মা মহামায়া, তোর থানে কলা দুবো। ঠেকান দে-গ মা!'—টানা নিশ্বাসে রমণীর জোয়ারের বুক উঠছে নামছে। ভয়ে শরীর কাঁপছে। মায়ের কষে ফেকো গেঁজে উঠেছে।

এই সময় চোখ চিরে তীক্ষ্ণ আলো নামে। টুকরো হয়ে যায় আকাশ—কড়···কড়···কড়াৎ! দিগন্তের কালো রেখায় তার প্রতিধ্বনি হয়। দিশেহারা মেয়েমানুষ দুটো ভয়ে চৌচির!

কুটিল অন্ধকার বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ে চরাচর আরও কালো করে। আকাশ ও মাটি আরও কাছিয়ে আসে। আকাশের বিদ্যুৎ-জিহ্বা মাটিকে চুমো খাবে।

মেয়ের ওপর মায়ের রাগ হয়। 'উয়ার জিদেই এমন আপাকে পা পড়ল। উয়ার লোভ দিন দিন বাড়ছেক। বড় লুবো। বড় আঙারে পয়সা বেশি। আরও ভিতরকে চল্—পয়সার নোলা—। অখন খালভরা?' বড়

আন্ধারের আওরা বাছতেই তো এত ভেতরে এসে পড়ল। নয়ত আং-কাঁটার খোলা দিকেই তো থাকতে পারত। তাড়া পেলে কখনই বেরিয়ে যেত।

—'বিটিটো ডাগর হচ্ছে তো লাইএক হচ্ছে।' দল বেঁধে টাউনশিপে যায়। কৃষ্ণচূড়ার ডাল ভেঙে মাথায় গোঁজে। সদর বাজার চয়ে লাল ফিতে কিনেছে, নথ কিনেছে। 'অখন লয়া বায়না, ঝুপড়িতে মাটি গাঁইথবো। মড়কুন তুইলব।' ইচ্ছের সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকিও বেড়ে চলেছে। আর ঝুঁকির শেষ মার এই ল্যাঠা।

'মড়কুন' কথাটা মনে হতেই মা তড়িতে কষিতে হাত রাখে। ধবক করে বুকের ভেতর লাথি খায়। টিপে দেখে কোমরের পাশ। না, ঠিক আছে।

যক্ষীর ধনের মতো আগলে বেড়াতে হচ্ছে এই এগারোটা টাকা। এক মাসে চার গণ্ডা, ছ-গণ্ডার পাতী। বুকের ভেতর রক্তের পাশে পাশে দর্মা-বাখারির খরচ জমছে। এটাও মেয়েটার নথঝামটা রুখ। 'পনারো টেকা হলেই ঘরটো পুরা হবেক।'

উত্তেজনায় রমণী বার বার সামনে পেছনে চোখ রাখছে। আড়াল থেকে রক্তখেকোগুলান যে, কোনো সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, ধরে ফেলতে পারে। রমণী ভাবে, পিটিয়ে শেষ করে দেবে ধরলে। মা ভাবে, 'ইজ্জতটো লি লিবেক' এবং আরও কিছু—।

এগোব না এগোব না করেও দুজনেই পশ্চিমের দিকে কয়েক পা উঠে যায়। কোনো শব্দ নেই! মানুষও নেই! শুধু ছু-ই বাঁদিকে পেল্লাই সব কল-কব্জার দূরাগত বুকদাবা শব্দ। তাকে ছাপিয়ে কখনও কখনও হেদিয়ে যাওয়া মেঘের ডাক।

ডান দিকে উতরাইয়ের ঢালুতে বর্ষার বাড় নিয়ে টামবলার খালটা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুটছে। একটা—দুটো—তিনটে—চারটে—! চার-চারটে ঢিবি পেরিয়ে যাবার পর আং-বাঁকানো জায়গাটাকে আর খুব দূর বলে মনে হয় না। মানুষ না ও থাকতে পারে। দস্যিগুলান চলেও যেতে পারে। আশাটা মনে মনে বাড়ছে দুজনেরই। মায়ের কালো ঠোঁট বেঁকে দুমড়ে ঘন ঘন ঠাকুর ডাক চলতে থাকে—'হেই মাঝি, মানত কাড়ি···তোর থানে পূজো দুব-অ···!'

এগোতে এগোতে এবার খুব নীচু ঢিবি। কোমরও ঢাকা পড়ে না। আড়াল ছাড়া চলা বিপদজনক! জায়গাটা পেরোতে হাঁটু ভেঙে দুজনেই

বসে পড়ে। ঢিলে ঘেঁষের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে চলে। হাঁটু, হাত বসে যাচ্ছে। যেন মন্দিরের সামনে হত্যে দেওয়া চলছে। সময় লাগছে বেশি।

হাতের মুঠোয় কয়লা চেপে রমণীর বাপের স্মৃতি ভেসে ওঠে মায়ের মনে। এই কয়লারই মানুষ ছিল সোয়ামীটা। বেঁচে থাকলে বুকে বল পেত। মানুষটার চওড়া বুক ভরসার খনি ছিল। কিন্তু কত সহজে লোকটা মরে গেল! পাঁচ বছর আগে দুপরে খেয়ে দেয়ে খাদানে নামল, বিকেলেই ছাদ ধ্বসে এক কুড়ির ওপর লোক মরে গেল। উঃ। সে রাতে খাঁচা গোড়ায় ওদের সে কি বুক ফাটা কান্না! সারারাত মেয়ে মানুষগুলানের দাপাদাপি! স্বামীর মৃতদেহ ফিরে পেল না অনেকেই।

এখন বুঝি ঠিক তেমনই একটা শোক উথলে উঠছে। ভেতর ভেতর বুক ফাটছে। খাদানটা তিন সন বাদে কেটেকুটে আবার সুরু হয়েছে। কিন্তু মানুষগুলোকে আর কেউ মনে রাখে নি।

দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে সরে যেতে যেতে মায়ের মনে হয়, কে জানে, সোয়ামীর হাড়মাসই সেই খাদালের কয়লা হয়ে তার হাতের নীচে চাপ খাচ্ছে কিনা?

নীচু ঢিবিটা পেরিয়ে যাবার পর আং-বাঁকানো জায়গাটাকে খুব কাছাকাছি মনে হয়। আর মাত্র গোটা তিনেক ঢিবি জোর। মনে হয় কেউ নেই ওখানে। ঠাকুর মানত শুনেছেন হয়ত। রমণী খোড়ো বাছুরীর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠছে—এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

বেঁচে যাওয়া মানুষগুলান এতক্ষণ হয়ত কলিপুরের ডহর পেরিয়ে গেছে। ভয়-খাওয়া চোখে ওদের লেগে জটলা শুরু করে দিয়েছে। কিংবা জানেই না, ওরা এখানে আটকা আছে। '…হেই ভগমান! আর একটুকু…পার করে দাও, ভগমান…!' একবার বেড়া পেরতে পারলেই এক ছুটে কলি সাঁকো। আর সাঁকো পেরিয়ে কলিপুরের মাঠে পড়তে পারলেই বেঁচে যাবে। মুক্তি!

কিন্তু পেছনদিক থেকে যদি গুলি ছোঁড়ে! খুনেড়াগুলান গতবছর গুলি ছুঁড়ে চুমকার ভুঁধির দাদা হাঁসদার বাঁ ঠ্যাংটা খেয়ে নিল। ভাবতেই কেঁপে যায় রমণীর শরীর। সাবধানে পা ফেলে। উঠে যায় আরও কয়েক পা।

কিন্তু মাথায় ওঠার আগেই হঠাৎ আবার। মানুষের স্বর। এবার খুব

কাছে। মুহূর্তে রমণী লাফিয়ে পড়ে নীচে। মায়ের হাতে হ্যাঁচকা টান মেরে উল্টোদিকে বুকফাটা ছুট। যমদূত স্বরগুলো এবার পশ্চিমের দিক থেকে দক্ষিণের দিকে বয়ে যায়। বন্দুক আর কড়া আলোর নলবাতিওয়ালা খাকী শরীরগুলো হয়ত ফুঁসছে। কাউকে পেলে এই ঢিবির ওপর পয়লা ফয়সালা সেরে ফেলবে।

আবার সেই আগের উপত্যকাটায় পৌঁছে দুজনেই থামে। হাঁপধরা বুক উঠছে নামছে। আতঙ্কটা এবার দ্বিগুণ। ওদিকের উপায়টাও বন্ধ।

হঠাৎ রমণীর নজর পড়ে কালোয় মাখামাখি নীল ডুরেটার পায়ের দিকে। ফালা হয়ে গেছে। পায়ে গিরা লেগে কখন যে ফেঁসেছে। মায়ের চোখে চোখ। কেউই কথা বলে না। রমণীর জোয়ান সখে মোচড় লাগে। এটা একদম আস্ত ছিল। কিন্তু আগে প্রাণ।

আকাশ থেকে হুড়মুড়িয়ে পাহাড় নামছে। বিশাল চাঁই। এক-একটা চিমনির এক-একরকম ধোঁয়ার রঙ—পাটকেল, সাদা, কালো। ধোঁয়াটা এখন ওপরে উঠছে না। রাক্ষুসে হাওয়ার ভেতর নীচের দিকে ভেঙে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। দাকাবুকোদের ইশারায় ওটাও যেন আর এক ফাঁদ!

একটু দূরে, পাঁচিলের ওপাশে, এসটিলে খাটা মানুষগুলান নিশ্চিন্তে কাজ করছে। চিন্তা নাই, ডর নাই। আকাশে কাক উড়ছে ফুর্তিতে। আর ওদের এখানে কি ভীষণ আশায় বুক কাঁপছে। 'উঃ! একটুকু মায়া নাই কমিনে জানোয়ারগুলার।' এতক্ষণে মনে হয় তিনদিকেই হয়ত ঘেরা আছে ওরা।

চাপাস্বরে রমণী বলে, 'টামলা বাগে চল্ কেনে? জল পেরাঁই চল্ যাব—অ।'

'—উঠো বাড়ে আছেক। লামছেক।' আলো নেভা চোখে মা বলে।

তবুও ডোবার আগের আতঙ্কে মানুষ যেমন কুটো আঁকড়ে ধরে, তেমনি কি এক আশায় মেয়েমানুষটা রমণীর আগেই তরতরিয়ে নীচে নেমে যায়। যদি কোনো উপায় ঠাহর হয়।

কালো জমির শেষ রেখায় হিজবিড়া আর গদভেরার ঝোপ। ঝোপের ভেতর থেকেই বাড়ের জলটা শুরু। ভয়ংকর বেগে ঢালের দিকে নেমে যাচ্ছে। ফুঁসছে, নাচছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ধাক্কা। সাদা ফেনার জল। তোড়ে নেমে গিয়ে টামলা পুলের গাঁথনিতে ভেঙে পড়ছে। চওড়ায় এখানে অনেক বড়। হয়ত কারখানাটাও জল ছেড়েছে।

যেন সবদিক থেকেই ষড়যন্ত্র হয়েছে। অসহায় মানুষ চারদিক থেকেই ফাঁদকলে পড়েছে। মরবে।

মা-মেয়ে জল ছুঁয়ে দাঁড়াল। একবার ওপারের দিকে তাকাল। ফাঁকা ডাঙা। মানুষের ওখানে ভয় নেই, ডর নেই। বাঁচনে ঋতুর বাতাস লাগে। তারপর ঘূর্ণির টানের দিকে চোখ রাখল। জল পাক খেতে খেতে এগোচ্ছে। যেন পেলেই পাতালে টেনে নেবে। গিলে নেবে।

রমণী ও রমণীর মা নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে। অসম্ভব! এ জল সাঁতার দিয়ে পেরতে পারবে না। পুলের দিকে কি বিশাল টান! তাছাড়া মায়ের পায়ের ফুলোটায় থেকে থেকে খুব বাজছে। বাওড়ে শরীর হলে কি হয়? মনটা তো মেয়েমানুষ? মা বলে, 'পেরাঁতে লারবি।' অথচ এখান থেকে সাঁকোটাকে কতদূর মনে হয়। মনে হয় আর কখনও ওখানে যেতে পারবে না। ওটা যেন বে-দখল কোনো নিজের জিনিস।

বিজলীহানা আকাশ আলোয় আলো। পর মুহূর্তে দ্বিগুণ অন্ধকারে ঢেকে যায় চরাচর। প্রচণ্ড শব্দ আকাশ ফাটে।

ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে কালো টানা জমিটা। রমণীর মা দেখে। কত চেনা মনে হয়। বড় আঙরার ঢিবিটা বাঁ দিকে। জমিটা কতদিন ধরে ওদের বাঁচিয়েছে, পেটে কুঁড়ো যুগিয়েছে। ওদেরই মুঠোয় মুঠোয় ভাগ হয়ে দুনিয়াময় পুড়েছে। মানুষকে তাত দিয়েছে, আরাম দিয়েছে। সঙ্গে ওরাও পুড়েছে। বোশেখের রোদের ঝলকানিতে কালো চামড়া পুড়ে আরও কালো হয়েছে।

এই ঢিবিগুলানের সঙ্গে মানুষগুলানের কোথায় যেন একটা বুকের টান রয়েই গেছে। পোড়াপুড়িতে। কালোতে কালোতে। কয়লা কালো, মানুষ কালো।—কয়লা পোড়ে, মানুষ পোড়ে। পুড়ে পুড়ে সুখ পায়, বাঁচে। কিন্তু এখন জমিটা মরণ-ফাঁদ! শয়তানের আখড়া!

হঠাৎ রমণী হ্যাঁচকা টানে মাকে সরায়—'ই বাব্‌—বা! সাঁপ বটে!' দেড় হাত লম্বা। জলের পাড় ধরে স্রোত কেটে যাচ্ছে হিলহিলিয়ে। মা বলে, 'সোনা ঢ্যামনা। বিষ নাই।' রমণী মনে করিয়ে দেয়, 'আজ মঙ্গলবার। বিষ হবেক।'

হু হু ভেসে যাওয়া সাদা চোখে পড়ে দূরে। কাছে আসে। মরা বাছুর পচে গেছে। বিশ্রী গন্ধ উঠছে।

সবকিছু মিলিয়ে একটা ভয়াবহতার মাতন ক্রমশই চেপে বসছে। পাকিয়ে

ধরছে ভয়ের কালো হাত ! তার থেকে রেহাইর আশাটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। তবে কি ধরা পড়ে যাবে এই খুনেড়াগুলোর হাতে !

গত বছরও একদল লোককে পা টিপে টিপে আচমকা ঘিরে নিয়েছিল। ঘেরটোপের বাইরে থাকা যারা পালাল, তাদের দিকে গুলি ছুঁড়ল। মনসুর হাঁসদা একদম পেছনে ছিল। পালাতে দেরি হয়েছিল। গুলি লাগল পায়ের গোছে। পড়ে গেল। যাদের ধরেছিল তাদের বেপরোয়া পিটিয়েছিল। কারুর মাথা ভেঙে ছিল, কারুর বাঁ হাত। কোন জোয়ান মেয়েকে একদম নাকি ন্যাংটো করে মজা পেয়েছিল জন্তুগুলান। হেসেছিল। তারপর সবাইকে ধরে আসানসোলের সদরে চালান করে দিল। ফি বচ্ছর ওরা নাকি লাখো টাকার মাল চুরিয়ে নেয়। নিতাই, রামেশ্বর, পার্বতী সবাই তো দু'মাস করে জেল খেটে এল। ওরা মা-মেয়েতে তখন দু'মাসের জন্য টাউনশিপে মাটি তোলার কাজে জোতা ছিল। তাই হয়ত বেঁচে গিয়েছে।

কিন্তু বিশদিন বাদে মানুষগুলান আবার সেঁধিয়েছে। কি করবে ? পেট মানে না। পেটের ভেতর যে আর একটা উনান আছে। দাউ দাউ জ্বলে উঠলে আরও কয়লা খেতে চায়। পুড়তে চায় নিজে।

রমণীর মা বলে, 'ওপরকে চল্। ইখানকে নজর ঠেকবেক।'

বুঝতে পারে জায়গাটা বিপদজনক। ওপর থেকে শত্রুরা দেখতে পেয়ে তাড়া দিলে পালাবার পথ নেই। ভয়ংকর স্রোতে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। তাই তড়িঘড়ি আবার উঠে আসে। কিন্তু মা-মেয়ে কেউই ঠিক করতে পারে না এবার কি করবে। কোনদিকে যাবে ? তিনদিকেই তো নরকের রাস্তা বন্ধ। তবে কি ধরা পড়ে যাবে ? পিটুনির ঘায়ে আধমরা হবে ? মগজে ধ্যায়ে পড়ে আসানসোলের জেল---লোহার গরাদ। মায়ের কাহিল চোখ, ধসা ঠোঁটের ঠাকুর ডাক কখন যেন থেমে গেছে।

হঠাৎ রমণীর মনে পড়ে বস্তাগুলোর কথা। পাকানো বাণ্ডিল বগল-চেপা ছিল সবসময়। নেই তো ! অপরাধী চোখে মা-র চোখে চোখ।

'বস্তাগুলান হার'াই গেল। বড় ঢিপি পেরাঁই আংবাগে কুথাকে পড় গেল।'

মায়ের ঝাপসা চোখে কাতরতা নামে। হুশ আসে, চারটে বস্তা ছিল। চারটে বস্তা ষোল গণ্ডার ধন। এক রাতের পেট ভাতা। খায় নি সেদিন। সকালেরই রাখা পান্তা অনেক বেলায় খেয়েছিল। যাতে ও-বেলায় খিদে না পায়। তারপর সাত সন্ধ্যেয় শুয়ে পড়েছিল। কাল বস্তা কিনবে তাই।

মনে হতেই পায়ের যন্ত্রণাটা লাফ দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত উঠে আসে। দপদপ কাঁপছে শিরাগুলো। কিছু বলে না মেয়েকে। চুপ থাকে। কাঁদতে পারে না। রাগতে পারে না শুধু ভেতরে ভেতরে একটা হাহাকার জেগে উঠলে মুখের চামড়া আয়ও কুঁচকে আসে, স্বর চেপে বলে—'খালভরা।'

রম্‌ণী কি একটা বলতে যেতেই মা থামিয়ে দেয় রম্‌ণীকে, 'চুপ্ কেনে। শুন্!'

মানুষের কথা বলার শব্দ স্পষ্ট হচ্ছে। 'কাঁচা মাথার মেয়ে বিটিটো—হড়ড়া।' কথার এক একটা ফুলকি ছিটকে আসে কানে আর টিবির কালো আংরাই বুঝি লাল হয়ে কান পুড়িয়ে দেয়।

রম্‌ণী আতঙ্কে মায়ের শাড়িতে টান মারে—'উ দিক্‌টো পালাই চ। হেই বাগে আসছেক।'

মায়ের থ্যাবড়া ফাটা পাদুটোকে মাটি যেন আঁকড়ে ধরছে, শিকলি পরাতে চায়।

মা বলে, 'উদিকেও আসছেক!' বলতে না বলতেই দক্ষিণের স্বরগুলো বড় টিবির মাঝামাঝি উঠে আসে মনে হয়। অনেকগুলান মানুষ একসঙ্গে টিবি ভাঙছে। টিবির চুড়োয় উঠলেই ওদের দেখতে পাবে। জোর দেড় মানষ উঁচু আর। বৃষকাষ্ঠের মতো মায়ের কালো পা দুটোয় কাঁপন ধরেছে। আদিম চামড়ার বসন্তের দাগগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভাবে, লাঠি যদি পায়ের ক্ষতে পড়ে? লুটিয়ে পড়বে, অজ্ঞান হয়ে যাবে!

অস্পষ্ট মূর্তি আর ভাঙাচোরা স্বরগুলো ক্রমশই এগিয়ে আসছে! এখুনি পূবের দিকে গুড়ি মেরে এগোতে হবে। রম্‌ণীকে ডেকে ফিসফিসিয়ে বলতে যায়। কিন্তু ক্ষীণ আলো আর ঝাঁপিয়ে নামা অন্ধকারের মেশামেশিতে রম্‌ণী-কে মুহূর্তের মধ্যে খুঁজে পায় না সে! 'বিটিটো কুথাকে…হেই বাব্‌বা—' ঝাপসা মণিতে তড়িঘড়ি এদিক ওদিক তাকায়! নজর পড়ে না। মুহূর্তে মাথার মধ্যে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যায়।

'ই বাব্‌-বা ঢেম্‌নী, কুথাকে গেলিরে! বুকটা বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে! 'কুথাকে গেল্‌ছে—!' প্রচণ্ড ভয়ে দিশেহারা মাথা উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারদিকে ঘনঘন ঘুরতে থাকে। রম্‌ণী নেই! আশেপাশে কোথাও নেই। এই তো ছিল, মুহূর্তের মধ্যে কোথায় গেল! মগজের মধ্যে ফাঁকা হয়ে যায় সবকিছু।

আর ঠিক সেই সময়, সামনের দিকে এক পা এগোতেই ঝাপসা উন্মত্ত চোখে আবার রম্‌ণীকে দেখতে পায়। রম্‌ণী তার সামনেই রয়েছে। দশ-বারো হাত চুড়োটায় উঠে সুমুখের জমিটোয় ঠাহর নিচ্ছে। কি আশ্চর্য! রম্‌ণীতো সামনেই ছিল, সে তাকে কিভাবে হারিয়ে ফেলল? মুহূর্তের জন্যে সব-কিছু বুঝি ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল। খেই হারানো মগজে ধাঁ-ধাঁ লাগা মন।

চোখের পলকে রমণীর মা বুঝতে পারে কালো জমির কালো কোলে তার মেয়ে মিশে গিয়েছিল। রমণীর কালো চামড়ার সঙ্গে জমির রঙের ফারাক নাই। ফারাক কেবল ওই নীল রঙের ডুরেটার। 'নীল ডুরেটো না থাইকলে বিটিটো মাটিতে মিশ খেত'—ওই নীল রঙের জন্যেই বিটিকে চোখে পড়ল মায়ের।

কথাটা মনে হতেই একটা ডরকাটা আলো মাথার মধ্যে ঝিলিক দিয়ে যায়! 'তবে মানুষ জমি ফারাক কুথাকে'! তার পরণেও তো একফালি কানি আছে। কানিটোই মানুষ চিনিয়ে দেয়। কানিটোই বুঝি শত্তুর!

হঠাৎ চোখে পড়ে, একদল খুনেড়া পশ্চিমের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে। নামাটা শেষ হলেই ওদের মুখোমুখি হবে। আর তখনই—! সময় নেই আর। মানুষগুলোর রাক্ষুসে হাঁ-এর ভেতর ওদের পা!

আগুপিছু জ্ঞান নাই। ভালোমন্দ বোধ নাই। শরম-বেশরম ভুলে মুহূর্ত মধ্যে সেই কুটোর মতো চিন্তাটাকে আঁকড়ে ধরে—'মানুষ-জমি ফারাক কুথাকে! সবই তো কালো! কানিটোই শত্তুর।'

মা আর মা থাকে না। দ্রুত সরে এসে রম্‌ণীর কানে ফিসফিস করে কথাটা বলে দেয়। শুনে রম্‌ণী এক মুহূর্ত থ দাঁড়িয়ে থাকে। মা পাল্টে যায় জন্তুতে। তারপর ঘটনা ঘটে।

আদিম আরণ্যক দুটি প্রাণী—মানুষ না পশু বোঝা যায় না। এক হ্যাঁচকা টানে শাড়ি খুলে ফেলেছে। মুহূর্তে বেরিয়ে পড়েছে ঘোর কালো কয়লা দিয়ে তৈরি দুটো উদোম মেয়েমানুষের শরীর। দুই লাফে সরে যায় উত্তরের ঢালের দিকে। বিশ হাত দূরে একজোড়া শুয়োরীর মতো কয়লার মধ্যে ছুটে গিয়ে থেবড়ে বসে পড়ে!

আর ঠিক তার পরের মুহূর্তে খুনেড়াগুলো হুড়মুড় করে এসে পড়ে সেই

জায়গাটায় যেখানে এইমাত্র ওরা দাঁড়িয়েছিল। বিশ শতকী কারখানাটার পাশে কালো জমিটা উলঙ্গ আরণ্যক মানুষদের বুকে ধরে এক মুহূর্তে পাল্টে যায় প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে!

মা মেয়ে বুকে কয়লা চেপে শুয়ে পড়লে তাদের আর আলাদা করে চেনা যায় না। মানুষ কয়লা একাকার হয়ে যায়।

আকাশ চিরে বিদ্যুৎ নামে। শব্দ হয়। তারপর অনেকক্ষণ ধরে তীব্র ঝড় বইতে থাকে কলিপুরের মাঠ থেকে সোজা দক্ষিণের দিকে। খুনেড়াদের কথা-বার্তা অনেকক্ষণ শোনা যায় না।

শুধু এই সময় ভীষণ উৎকণ্ঠায় মেয়ে মা-কে আচমকা ফিসফিসিয়ে বলে—'ই বাব্-বা! সী এগারোটা টেকা শাড়ি গিরায় র'ই গেল-অ যে-গ!'

বিবিধ প্রসঙ্গ

রমাপ্রসাদ চন্দ (১৮৭৩-১৯৪২)

বাঙালি তথা ভারতীয় চারিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোনও মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন ; আমাদের স্বভাবের এক বিস্ময়কর দিকই হল—অনতিক্রম্য অনীহা এবং ঔদাসীন্য : বস্তুত বিদ্যাচর্চায় উৎসর্গিতপ্রাণ মনীষা সম্পর্কে, সমানে লালন করার চমকপ্রদ কৌশল। আর আমার এমতো সিদ্ধান্তের সপক্ষে এই মুহূর্তেই রমাপ্রসাদ চন্দের বিষয়টি পেশ করা যায়। কলকাতার ইনস্টিটিউট অব হিস্টরিক্যাল স্টাডিজের অধিকর্তা এস. পি. সেন সম্পাদিত ও প্রকাশিত *Dictionary of National Biography* (Vol. 1, 1972) কিংবা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'ভারতকোষ' (পঞ্চম খণ্ড, ১৯৭৩)-এও রমাপ্রসাদের নামোল্লেখ নেই। যদিচ বলা বাহুল্য, তাঁর মহার্ঘ গবেষণাকর্ম অধুনাও দেশবিদেশের বিদ্যাবানদের বিস্ময়ের বস্তু রূপে বিবেচিত।

ঢাকা জেলার শ্রীধরখোলায় (বর্তমানে বাঙলাদেশ) রমাপ্রসাদের জন্ম (১৫ আগস্ট ১৮৭৩)। আপন 'অসমাপ্ত ইতিহাস'-এর (অপ্রকাশিত) শুরুতে তিনি স্পষ্টত লিখেছেন, 'অধ্যয়নশীল' পিতা কালীপ্রসাদই কার্যত তাঁর মধ্যে আশৈশব অধ্যয়নস্পৃহা সংক্রমিত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কৈশোরাবস্থা অতিক্রমের আগেই রমাপ্রসাদ তাঁর পিতাকে হারান (পনরো বছর বয়সে)। অতঃপর আপন অধ্যবসায় এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. (১৮৯৬) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ; এবং বাঙলাদেশ ও উত্তরপ্রদেশের কতিপয় বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পর তিনি কলকাতার হিন্দু স্কুলে যোগদান করেন। অবশ্য অন্নসংস্থানের দৌরাত্ম্যে তাঁর অত্যুগ্র অনুসন্ধিৎসা আদৌ শান্ত হয় নি। অন্তত কলকাতার *The Dawn* ও সিমলার *East and West* পত্রিকার সাক্ষ্যে প্রমাণিত যে বিশ শতকের প্রথম দশকেই রমাপ্রসাদের ডজনখানেক মূল্যবান গবেষণাপত্র বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টিগোচরে আসে। 'Some forgotten chapters of early Indian history' (*The dawn,* July 1900) ; 'The middle ages of

India' (*Ibid.*, February-March 1901) ; 'Early history of Mewar in the light of latest researches in archaelogy' (*Ibid.*, October 1901) ; 'Rana Kumbha' (*Ibid.*, April, June-July 1902) ; 'Aryan migration into Bengal' (*Ibid.*, March 1904) ; 'Earlier and later Indo-Aryan migrations' (*East and West*, October 1904) ; 'Race and Cast' (*Ibid.*, November-December 1904) ; 'India and Babylonia' (*Ibid.*, August 1905) ; 'The Study of Indian social history' (*Ibid.*, June, July-August 1906) ; 'The origin of the Bengali people' (*Ibid.*, April-May 1907) প্রভৃতি রমাপ্রসাদের গবেষণাপত্রের উল্লেখ প্রসঙ্গত অনিবার্য। ইতিমধ্যে তিনি রাজসাহীতে স্থানান্তরিত হন।

রাজসাহীবাস রমাপ্রসাদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন (১৮-১৯ মাঘ ১৩১৫ বঙ্গাব্দ) হয় রাজসাহীতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে; এই সম্মিলনে পঠিত রমাপ্রসাদের গবেষণাপত্র 'বাঙালীতত্ত্ব' বিদ্বজ্জনের তারিফ পায়। ফলত এই অধিবেশনে দিঘাপতিয়ার বিদ্যোৎসাহী শরৎকুমার রায় তাঁকে চর্চিত বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্বদানে প্ররোচিত করেন। পরের বছরে ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে (১-৩ ফাল্গুন ১৩১৬ বঙ্গাব্দ) রমাপ্রসাদ 'জাতিতত্ত্ব' নামীয় এক মূল্যবান গবেষণাপত্র পাঠ করলেন; এবং স্বনামধন্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও শরৎকুমারের সাদর সাহচর্যে অঙ্গরাজ্যের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রত্যক্ষীকরণে বিস্ময়াবিষ্ট হন। প্রত্যাবর্তনের পর এই "পুণ্যশ্লোক ত্রয়ী" রাজসাহীসংলগ্ন অঞ্চলের পুরাবস্তু আবিষ্কারে আয়াস করেন; এবং প্রথম অভিযানে (এপ্রিল ১৯১০) তাঁরা পূর্ণাকার পার্বতী মূর্তিসমেত ন্যূনপক্ষে বত্রিশটি ভাস্কর্যের নমুনা সংগ্রহণে সৌভাগ্যবান হলেন। এই সামান্য সংগ্রহের মাধ্যমেই বলা যায়, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির সূত্রপাত। অতঃপর অচিরেই তাঁরা অব্যবহিত অভিযানে (জুন ১৯১০) অনেক অমূল্য প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্করণের হন পুরোধা। বলা বাহুল্য বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির পরবর্তী বিস্ময়াবহ বিস্তৃত ইতিবৃত্ত বাঙালির পরম গৌরবের।

অধীত বিদ্যার সঙ্গে সহজাত প্রজ্ঞার সমন্বয় সর্বদেশকালেই বিরল; এবং এমতো দুর্লভ সংশ্লেষ ব্যতিরেকে গবেষণা কদাচ উত্তরকালের ইতিহাস হয় না।

বাঙালির ইতিহাসচর্চার ইতিবৃত্তে রমাপ্রসাদের 'গৌড়রাজমালা' (১৩১৯ বঙ্গাব্দ) প্রকাশন প্রকৃতপ্রস্তাবে এক বিস্ময়কর ঘটনা। এ বিষয়ে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য উল্লেখ্য: "পরবর্তী একশত বৎসরে পুরাতত্ত্ব আলোচনার ফলে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত 'গৌড়রাজমালা' গ্রন্থখানি তাহার প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।...'গৌড়রাজমালা' আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে লিখিত বাংলার প্রথম ইতিহাস" ('বাংলা দেশের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ)।

রমাপ্রসাদের সুবিখ্যাত *The Indo-Aryan Races* (১৯১৬)-এর প্রকাশকও বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি; শরৎকুমার (সমিতির সভাপতি) লিখিত মুখবন্ধ এবং লেখকের উপক্রমণিকা পাঠে জানা যায় যে প্রথমোক্তের প্রবল প্ররোচনা শেষাবধি শেষোক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। প্রসঙ্গত বলাই বাহুল্য, এই গ্রন্থের প্রথম দুটি অধ্যায় অনেককাল আগে *East and West* (১৯০৪ ও ১৯০৭)-এ প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরবর্তী অধ্যায়টি ইতিপূর্বে লর্ড কারমাইকেলের সভাপতিত্বে দার্জিলিঙে এক প্রকাশ্য সমাবেশে (জুন ১৯১৩) পঠিত হয়। *The Indo-Aryan Races*-এর আলোচনায় জনৈক আর্থার বেরিডেইল কীথ লেখেন: "This...forms a valuable addition to the literature dealing with the origin of the Indo Aryan peoples...his opinions gain greatly both in value and clearness from their ordered exposition, and whatever conclusions be arrived at as regards his main thesis, all interested in the question must recognise the catholic character of his erudition, and the ingenuity and effectiveness of his arguments, which render his work a serious contribution to the subject with which it deals" (*Journal of the Royal Asiatic Society*, 1917, p. 167-175). দীর্ঘকাল পরে *Indian Studies: Past & Present*-এর উদ্যোগে এই বহুমূল্য গবেষণাকর্ম পুনর্মুদ্রিত হয়েছে (১৯৬৯)।

উপর্যুক্ত গবেষণাকর্ম প্রকাশনের পরের বছরে রমাপ্রসাদ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে গবেষক হিসেবে যোগদান করেন (১৯১৭) স্বনামপ্রসিদ্ধ জন মার্শ্যালের সহযোগিতায়। এই সময় অনেক অন্বেষণ আবিষ্কার ব্যতিরেকে তিনি দুটি

মূল্যবান মন্যাগ্রাফ্—'Date on the votive inscription in the stupas at Sanchi' (*Memoirs of the Archaelogical Survey of India*, No. 1) ও 'Archaelogy and Vaishnaba tradition' (*Ibid.*, No. 5) প্রকাশ করলেন। অতঃপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রবর্তিত হলে রমাপ্রসাদ উক্ত বিভাগে উপাধ্যায় হিসেবে যোগ দিলেন (১৯১৯)। এবং পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রবর্তন করলে তিনি প্রধান অধ্যাপকের পদলাভে সমর্থ হন। কিন্তু দু-বছরের মধ্যেই তাঁর গুণমুগ্ধ মার্শ্যাল সাহেবের আহ্বানে তিনি ভারতীয় জাদুঘরের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে যোগদান করলেন (২৩ মে ১৯২১)। এই বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে কার্যকালীন রমাপ্রসাদ কতিপয় মন্যাগ্রাফ্ প্রকাশনে যত্নবান হন। 'The beginning of art in eastern India with special reference to sculptures in the Indian Museum' (*Memoirs of the Archaeological Survey of India*, No. 30) ; 'The Indus valley in the Vedic period' (*Ibid.*, No. 31) ; 'Survival of the prehistoric civilization of the Indus valley' (*Ibid.*, No. 41) প্রভৃতি গবেষণাকর্মে রমাপ্রসাদের বিদ্যাবত্তার সাক্ষর স্পষ্টতর। দীর্ঘ এগার বছর কর্মাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর তিনি অবসরগ্রহণ করেন (১৯৩২)।

অতঃপর রমাপ্রসাদ ইংলণ্ডে ফার্স্ট ইনটারন্যাশনল আন্থ্রোপলজিক্যাল কংগ্রেসে যোগদান করলেন (১৯৩৪)। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তিনি বৃটিশ মিউজিয়মের ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগটির পুনর্বিন্যাস করেন। এবং তৎকালেই তাঁর *Mediaeval Indian Sculpture in the British Museum* (১৯৩৬) নামীয় পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকা পুরাতত্ত্ববিৎ ও পণ্ডিতদের প্রশংসা পায়।

রমাপ্রসাদের বহুসংখ্যক মূল্যবান গবেষণাপত্র অদ্যাবধি বিদ্বৎসমাজের পত্রপত্রিকায় প্রচ্ছন্ন। উক্ত রচনাগুলি সংকলিত ও গ্রন্থবদ্ধ হলে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেক দিক আমাদের কাছে স্পষ্টতর হবে।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

লেনার্ড নাইট এলমহারসট (Leonard Knight Elmhirst)

বিরাশি বছর বয়সে এলমহারসট-এর মৃত্যু বয়সের হিসেব ধরলে নিশ্চয়ই অকালমৃত্যু নয়, কিন্তু এলমহারসট ছিলেন এমন আশ্চর্য প্রাণবন্ত লোক যে অল্পদিন আগেও যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁদের পক্ষে তাঁকে মৃত বলে কল্পনা করাও কঠিন। এলমহারসট-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় হয় আমেরিকায় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। ইংল্যাণ্ডে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপনান্তে আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা করে তিনি তখন পুরো কৃষিবৈজ্ঞানিক হয়ে উঠেছেন। ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে এলমহারসট শান্তি-নিকেতনে আসেন রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠনের আদর্শকে মূর্ত করে তোলার সংকল্প নিয়ে। ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে (৮ই পৌষ) শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে একটি স্মরণীয় সভায় বিশ্বভারতীর উদ্বোধন হয়। নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-ভারতীর পল্লীসংগঠন কেন্দ্র স্থাপিত হল সুরুল গ্রামের পাশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির একটি প্রাচীন কুঠিবাড়িতে। এই কুঠিবাড়ি ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির পর রায়পুর গ্রামের জমিদার সিংহদের দখলে আসে ও রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-ভারতী প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর আগে এই বাড়িটি কিনেছিলেন লর্ড সিংহের কাছ থেকে।

এলমহারসট হলেন বিশ্বভারতীর পল্লীসংগঠন বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ ও তাঁর কর্মকেন্দ্র হল সুরুলের প্রাচীন কুঠিবাড়ি। শ্রীনিকেতন নামটি দেওয়া হয় পরে। এলমহারসট শুধু এখানকার কর্মপরিচালনা করেন নি, প্রচুর পরিমাণে অর্থ সরবরাহেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। এই অর্থ আসে তাঁর স্ত্রীর স্বকীয় তহবিল থেকে।

এলমহারসট শ্রীনিকেতনের অধ্যক্ষতা করেন ১৯২৪ সাল পর্যন্ত। ঐ বৎসর স্বদেশ ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে এলমহারসট ডার্টিংটন হল নামে একটি বিরাট কৃষিক্ষেত্র, কৃষিবিদ্যালয় ও ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষায়তন স্থাপন করেন। তিনি বলতেন এই কাজে তিনি প্রেরণা পান রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। বিদায় নেবার সময়ে কবি তাঁকে বলেছিলেন, "সব চাইতে সুন্দর জায়গা বেছে নেবে। মনে রেখো সুন্দর পরিবেশ থেকে শিশুদের বঞ্চিত করার অধিকার

তোমার নেই।" ডার্টিং হল যাঁরা দেখেছেন তাঁরা অকুণ্ঠভাবে প্রশংসা করেন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষাব্যবস্থার ও প্রাকৃতিক পরিবেশের।

ইংল্যাণ্ডবাসী হলেও এলমহারসট-এর সঙ্গে বিশ্বভারতীর—বিশেষ করে শ্রীনিকেতনের—যে নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল তা ছিন্ন হয় নি। তিনি বারবার এদেশে এসেছেন। কবির সঙ্গে তিনি গিয়েছেন চীন দেশ ও দক্ষিণ আমেরিকায়। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় তিনি দিয়েছেন যেমন তাঁর কাজে, তেমনি কথাবার্তায়, বক্তৃতায় ও রচনায়। ভারতবর্ষকে যাঁরা অকৃত্রিম ভাবে ভালোবেসেছেন এলমহারসট তাঁদেরই একজন। তাই পরিণত বয়সেও তাঁর মৃত্যু আমাদের কাছে আত্মীয়ের মৃত্যুর মতনই মর্মান্তিক।

হিরণকুমার সান্যাল

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ত্রিশের দশকের এক অধ্যায়

'পরিচয়'-এর ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮০, ইং মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৪, সংখ্যায় লোকসভার সদস্য রণেন সেন কর্তৃক ১।৪।৭৪ তারিখে লিখিত একখানা চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। রণেন সেন উক্ত চিঠিতে 'পরিচয়'-এর গত শারদীয় সংখ্যায় ও পরবর্তী একটি সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ত্রিশের দশকের এক অধ্যায়' শিরোনামায় আমার লিখিত দুটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেছেন "১৩৮০-র শারদীয় 'পরিচয়' সংখ্যা অনেকদিন পরে পড়ি। কমরেড ধরণী গোস্বামীর তিরিশ দশকের ('ত্রিশের দশকের') কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে প্রবন্ধটি পড়ে বিস্মিত হই। কেননা কিছু ভুল তথ্য ও একপেশে প্রসঙ্গের অবতারণা পাই।"

রণেন সেন ভেবেছিলেন "কিছু সংশোধনী ধরণীদার কাছেই পাঠাব বা একান্তে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে ভুল সংশোধন করাব। কিন্তু নানা কারণে এর কোনোটাই সম্ভব হল না।"

'পরিচয়'-এর গত অগ্রহায়ণ ১৩৮০, ইং ডিসেম্বর ১৯৭৩, সংখ্যায় প্রকাশিত আমার উক্ত প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্ব পড়ে "পুনরায় অনেক ভুল তথ্য ও একপেশে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে" দেখে শেষ পর্যন্ত ভেবে চিন্তে তিনি আর আমার নিকট সংশোধনী পাঠানো বা "একান্তে···আলোচনা" করা প্রয়োজন বোধ করলেন না এবং 'পরিচয়'-এর মাধ্যমেই আমার ভুল তথ্যের সংশোধন করাটা শ্রেয় মনে করলেন। কারণ "ব্যাপারটা এখন শুধু ধরণীদার রইল না।"

কমরেড রণেন সেন আমাদের একজন প্রবীণ কমিউনিস্ট ও শ্রমিক নেতা এবং পার্টির সর্বোচ্চ সংস্থার সদস্য। সুতরাং একজন সাধারণ কর্মীর ভুল-ত্রুটির সংশোধন যেভাবে করা সঙ্গত বিবেচনা করেছেন তিনি, তাই করেছেন। সেজন্য আমার কোনো ক্ষোভ বা অভিযোগ নেই। আমি বরং খুশী হয়েছি যে, আমার প্রবন্ধ দুটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তিনি পড়েছেন এবং 'ভুল তথ্য' 'সংশোধন'-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু "প্রবন্ধটি পড়ে বিস্মিত হই" তাঁর এই উক্তিটির অর্থ আমি এখনও বুঝলাম না। ভুলত্রুটি কি মানুষের

হয় না ? বিশেষতঃ এত পুরানো দিনের ঘটনাবলীর আলোচনায় তা হওয়া কি খুব অস্বাভাবিক ? আর আমি তো 'বিস্মিত' হওয়ার মতো কিছু লিখিও নি।

আমার প্রবন্ধ দুটিতেই তিনি "একপেশে প্রসঙ্গের অবতারণা" উত্থাপিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। আমার আলোচ্য প্রসঙ্গ একটি মাত্রই। সুতরাং কোন পাশ ঘেঁষে আমি "একপেশে প্রসঙ্গের অবতারণা" করেছি সেটা কিন্তু তিনি খুলে বলেন নি। তিনি আমার প্রবন্ধ দুটিতে "প্রথমত" ও "দ্বিতীয়ত" ক্রমিক নম্বর চিহ্নিত করে শুধু ভুলের কারণ নির্ণয় করেছেন। ভুল তথ্য ও তার সংশোধনীর বিষয়বস্তুর কোনো আলোচনা করেন নাই।

তিনি লিখেছেন: "প্রথমত, ধরণীদার ভুল হয়েছে তাঁদের মীরাট গ্রেফতারের পরবর্তী যুগের ইতিহাস হয় সরকারী দলিল (যা বেশিভাগ ক্ষেত্রেই নির্ভুল নয়) বা শ্রীসুধাংশু অধিকারীর বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে লেখাটা।" "দ্বিতীয়ত, মীরাটোত্তর যুগে যাঁরা বাঙলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনা করেছেন তাঁদের কাছে খোঁজখবর না করে লেখা দ্বিতীয় ভুল।" "এই দুইটি ভুলের জন্যই তাঁর লেখা দুটি ইতিহাসসিদ্ধ হয় নি।" তিনি আরও একটি মন্তব্য করেছেন, " 'ইয়ং কমরেডস লীগ' এর ভূমিকা যেভাবে দেখিয়েছেন সেটাও সঠিক নয়। এই লীগের অনেককে আমি ১৯২৯ থেকে ভালোভাবেই জানতাম এবং তাঁদের কার্যকলাপও লক্ষ্য করেছি।"

আমার অনুরোধ তিনি দ্বিতীয়বার আমার প্রবন্ধ দুটি পড়ুন। তিনি এবং যে কোনো নিবিষ্টচিত্ত ও নিরপেক্ষ পাঠক আমার প্রবন্ধ দুটি পড়লেই বুঝতে পারবেন যে ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়, ঘটনার অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যেই সেগুলি লিখিত। সুতরাং ভুলত্রুটিহীন স্বয়ংসম্পূর্ণতার দাবি আমি রাখি না।

আমার প্রবন্ধ দুটিতে যথাসম্ভব এবং যথালভ্য দলিলপত্র ও বেশ কিছু বন্ধুর সঙ্গে আলোচনার কথারও উল্লেখ আছে। কমরেড রণেন সেনের সঙ্গে আলোচনার কথারও উল্লেখ আছে। সরকারী দলিল অর্থাৎ বিশেষ করে গোয়েন্দা বিভাগীয় রিপোর্ট যে সব সময় নির্ভরযোগ্য নয় বরং অনেক সময় তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয় সে সম্বন্ধেও পাদটীকায় উল্লেখ আছে। "মীরাটোত্তর যুগে যাঁরা বাঙলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনা করেছেন…" তাঁদেরও অনেকের সঙ্গেও আলোচনা আমি করেছি যেমন কমরেড রণেন সেন নিজে একজন। বাঙলার বাইরে বোম্বে এবং পার্টির কেন্দ্রীয় প্রবীণ

নেতৃস্থানীয় ও অন্যান্যদের সঙ্গেও আলোচনা করেছি, যাঁরা পার্টির ঐতিহাসিক দলিলপত্রাদির তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার কাজ করছেন। তাঁরা প্রবন্ধ দুটি পড়েছেন এবং অনুবাদই প্রকাশ করেছেন, বিরূপ মন্তব্য করেন নি। আমি পার্টিকেন্দ্রের মুহাফিজখানায় সংগৃহীত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দলিলপত্রাদিরও যথাসম্ভব খোঁজ ও ব্যবহার করেছি। এসব কথারই তো সংক্ষেপে আমার প্রবন্ধে উল্লেখ আছে। সুতরাং শুধু সুধাংশু অধিকারীর বক্তব্যের উপর ভিত্তি করেই আমি প্রবন্ধ লিখেছি এটা তাঁর একটি কল্পনাপ্রসূত ও "একপেশে" ধারণা।

কমরেড রণেন সেনের আরও ধারণা যে "ধরণীদা সুধাংশুবাবুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্যই জানতে পারেন নি যে, ১৯৩০-এর শেষভাগে ৭নং মৌলভী লেনে 'কলিকাতা কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' গঠিত হয়।" এটি একটি সুখবর যা রণেন সেন আগে বলেন নি। এ সম্বন্ধে কি আমার প্রবন্ধে কোনো বিতর্কের উল্লেখ আছে? তাঁর সঙ্গে আলোচনার সময় (যদিও দীর্ঘ নয়) একথা প্রকাশ করলে আমার প্রবন্ধেও ঠিক তারই উল্লেখ থাকত। কারণ 'কলকাতা কমিটি'র সংগঠন ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করা আমার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আমি এ সম্বন্ধে সন্তোষজনক তথ্য সংগ্রহ করতে পারি নাই। "মীরাটোত্তর যুগে যাঁরা বাঙলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনা করেছেন" তাঁদের মধ্যে সুধাংশু অধিকারীও অন্যতম। তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না বটে। বাঙলায় সে যুগে কজনই বা পার্টিসদস্য ছিলেন—প্রাদেশিক পার্টি সংগঠন বলেও কি কিছু ছিল? কিন্তু সুধাংশু অধিকারী একজন নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট আদর্শবাদী ছিলেন। এবং তিনি ছিলেন 'ইয়ং কমরেডস লীগ'-এর একজন নেতৃস্থানীয় এবং কিশোরগঞ্জের কৃষক-উত্থান-আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। ভুল কি করে হল সেটা? রণেন সেন বলেছেন যে " 'ইয়ং কমরেডস লীগ'-এর ভূমিকা যেভাবে দেখিয়েছেন সেটাও সঠিক নয়।" সঠিক ভূমিকাটি কি ছিল তা যদি তিনি ব্যাখ্যা করতেন তো খুশী হতাম। 'ইয়ং কমরেডস লীগ'-এর ভূমিকা সম্বন্ধে মীরাট মামলায় বাদীপক্ষ কর্তৃক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত দলিল অনুসন্ধান করলেই কমরেড রণেন সেন এই লীগের সঠিক ভূমিকা সম্বন্ধে জানতে পারবেন। তিনি লীগের অনেককে ১৯২৯ সন থেকে জানতেন এবং তাদের কার্যকলাপও লক্ষ্য করেছেন। তিনি

নিশ্চয়ই জানেন, আশা করি, যে 'ইয়ং কমরেডস লীগ'-এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলাম আমি ও ফিলিপ স্প্র্যাট এবং আমি ছিলাম সাধারণ সম্পাদক। ১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ আমাকে মীরাট মামলায় গ্রেপ্তারের দিন পর্যন্ত আমি কমরেড রণেন সেনকে একদিনও 'ইয়ং কমরেডস লীগ'-এ দেখি নাই, 'ওয়ার্কার্স-পেজান্টস পার্টি'র সংস্পর্শে দেখি নাই, কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শেও নয়। তিনি হয়তো দূরে থেকে আমাদের অনেকের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে থাকবেন। নেতৃবর্গের গ্রেপ্তারের পর ১৯৩০-এর শেষের দিকে লীগের সংগঠনের দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল এবং নানা ধরনের লোকের অনুপ্রবেশও ঘটেছিল—এসব কথার উল্লেখও আমার প্রবন্ধে আছে। "১৯৩০-এর শেষভাগে···'কলিকাতা কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' গঠিত হয়" কমরেড রণেন সেনের এই তথ্য সঠিক হলে, আবদুল হালিমের বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হয়। ১৯৩০-এ গাড়োয়ান ধর্মঘটের সংস্পর্শে গ্রেপ্তার ও দণ্ডিত হয়ে আবদুল হালিম প্রায় এক বছর খুলনা জেলে আটক ছিলেন এবং ১৯৩১-এর জানুয়ারিতে ছাড়া পান। আবার ২৬শে জানুয়ারি গ্রেপ্তার হয়ে আলিপুর জেলে আটক থাকেন। অতঃপর খালাসের পর মীরাটে চলে যান মীরাট মামলার তদ্বিরের কাজের জন্য। সেখানে প্রায় ৬/৭ মাস থেকে তিনি কলকাতা ফিরে আসেন। সুতরাং ১৯৩০-এর শেষে 'কলকাতা কমিটি'র সংগঠনের সময় আবদুল হালিমের উপস্থিতি সম্বন্ধে রণেন সেনের এই তথ্যটি ভুল। তিনি আমার সঙ্গে আলোচনার সময়ে যা বলেছিলেন অর্থাৎ হালিম 'কলকাতা কমিটি' সংগঠনের সময় উপস্থিত ছিলেন কিনা তাঁর এখন মনে নাই, কিন্তু হালিমের নাম প্রস্তাবিত ছিল কমিটিতে—এ কথাটাই সঠিক।*

কমরেড রণেন সেন লক্ষ্য করে দেখবেন যে আমি সুধাংশু অধিকারী বা অন্য কারু উপরে বিশ্বাস স্থাপন যতটা করেছি তার চেয়ে কমরেড আবদুল হালিমের বক্তব্যের উপরই খুব বেশি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তাই এখনও, কমরেড রণেন সেনের চিঠির বয়ান পড়েও, আশ্চর্য মনে হচ্ছে আবদুল হালিম তাঁর স্মৃতিচারণে এত কথার উল্লেখ করলেন কিন্তু একটি বারও 'কলকাতা কমিটি'র সংগঠনের সম্বন্ধে কিছু বললেন না কেন?

* সম্প্রতি প্রাপ্ত একটি তথ্যে জানা যায় ১৯৩৩ সালের কোনো এক সময় কমরেড আবদুল হালিমের উদ্যোগে কলকাতায় নাকি 'ওয়ার্কার্স পার্টি' নামে একটি সংগঠন হয়েছিল। এই মূল্যবান তথ্যটির অনুসন্ধান প্রয়োজন (তথ্যটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহাফেজখানায় প্রাপ্ত দলিল থেকে সংগৃহীত)।—লেখক

কমরেড রণেন সেন 'কলকাতা কমিটি'র সংগঠন সংক্রান্ত তথ্যের আলোচনায় একটি অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার অবতারণা করেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে আমাদের সর্বজনপ্রিয় শ্রদ্ধাভাজন প্রবীণ পার্টিনেতা প্রয়াত কমরেড ভবানী সেনকে টেনে এনেছেন এবং তাঁর সম্বন্ধে যে অর্থপূর্ণ মন্তব্য করেছেন—অর্থাৎ তাঁর (ভবানী সেনের) 'কলকাতা কমিটি'তে যোগদানের অঙ্গীকার ও পরে 'কারখানা গ্রুপ'-এ যোগদান—তার কি যুক্তি এবং সার্থকতা আছে এই আলোচনা প্রসঙ্গে এতকাল পরে ?

ভুল তথ্য দ্বারা ভুল সংশোধন

কমরেড রণেন সেন একটি প্রকাণ্ড ভুল তথ্যের দ্বারা আমার প্রবন্ধের ভুল তথ্য সংশোধনের চেষ্টা করেছেন ! তিনি দেশপাণ্ডে ও রণদীভেকে বন্ধনীযুক্ত করে মন্তব্য করেছেন "বস্তুত এই গ্রুপ ('কারখানা গ্রুপ') বোম্বাই-এর দেশপাণ্ডে-রণদীভে গ্রুপের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে যাতে বাঙলাদেশে কোনও সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত না হয় তারই প্রচেষ্টা চালিয়েছে।...সুধাংশু অধিকারীও এই গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।" তিনি কি করে দেশপাণ্ডের মতো একজন সঠিক পার্টিনীতির নিরলস প্রবক্তা ও প্রবীণ একনিষ্ঠ নেতাকে পার্টিবিরোধী ভূমিকার আসরে নামালেন এবং কোন ইতিহাসসিদ্ধ সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে এরূপ মন্তব্য করলেন তা একটু পরিষ্কার করে বললে ভালো করতেন। কি নতুন কি পুরাতন পার্টির উচ্চতম নেতৃবর্গ থেকে সাধারণ কর্মী মাত্রই অবগত আছেন যে ১৯৩০-এ গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কি ভূমিকা হবে তা নিয়ে রণদীভে ও দেশপাণ্ডের মধ্যে মতবিরোধ হয় এবং তা চরম পর্যায়ে উঠে। ফলে বোম্বাইয়ের পার্টি তখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ঐ সময় (১৯৩১) একজন প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ও হস্তক্ষেপে দুই বিবদমান গ্রুপের মধ্যে সমঝোতার ও ঐক্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রণদীভের বক্তব্য ছিল বুর্জোয়া আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি কোনোরূপ সহযোগিতা দিতে পারে না, আর দেশপাণ্ডের বক্তব্য ছিল বুর্জোয়ানেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালিত হলেও শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীসহ লক্ষ লক্ষ মানুষ যে স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা নিয়ে দূরে সরে থাকতে পারে না। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট প্রতিনিধি দেশ-

পাণ্ডের মতের সমর্থক ছিলেন। পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কর্তৃক এই নীতি সমর্থন লাভ করে এবং এরপর বিভিন্ন পার্টি কর্তৃক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন আসতে থাকে। বোম্বাইয়ের বিবদমান দুই গ্রুপেরই নেতৃবৃন্দ বাঙলায় ও অন্যান্য রাজ্যে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন। মীরাটেও উভয়পক্ষের প্রতিনিধিরা যাতায়াত করতেন। এটাকে "বাঙলাদেশে কোনও সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত না হয় তারই প্রচেষ্টা" বলা যায় কি? সুধাংশু অধিকারী প্রমুখ দেশপাণ্ডের দলেই ছিলেন। আমান ও 'কারখানা গ্রুপ' তার পূর্বেই বিচ্ছিন্ন। রণেন সেনের ভাষায় "ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়।"

"১৯৩২ ও ১৯৩৩-এ 'ইমপ্রেকর'-এ ভিবমাকের নামে কয়েকটি লেখা বের হয় যাতে পূর্বোক্ত কলিকাতা কমিটির ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ থাকে।" রণেন সেনের এই মূল্যবান তথ্যটি সম্বন্ধে তিনি যদি আরো আলোকপাত করেন তাহলে আমি খুশী হব এবং আমাদের আলোচনা সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু এসব ঘটছিল এমন সময় যখন নতুন করে পার্টি কেন্দ্রীয়ভাবে পুনঃসংগঠনের উদ্যোগপর্ব প্রায় শুরু হয়েছে।

কমরেড রণেন সেন বলেছেন "আবদুল হালিম তাঁর স্মৃতিচারণায় এসব বিষয়ে লেখেন নি, কারণ আমাদের মধ্যে ঠিক হয় যে একত্র বসে সব ঘটনাবলী আলোচনা করে লেখা হবে। তাঁর সঙ্গে বসে আমি অনেকদিনের ঘটনাবলীর নোট করেছিলাম। তাই সবই মনে আছে।"

তাঁদের এই আলোচনার পর থেকে নদীর জল অনেক গড়িয়ে গেছে। তাঁদের একসঙ্গে বসার সুযোগও বোধহয় কেটে গিয়েছিল। আর আজ আবদুল হালিমও বেঁচে নেই। সুতরাং এখন তাঁর হেফাজতে যে সমস্ত দলিল-পত্র আছে এবং যে সমস্ত নোট তাঁরা দুজনে বসে করেছিলেন সেগুলি নিয়ে একটি সঠিক তথ্যসমৃদ্ধ ও 'ইতিহাসসিদ্ধ' প্রবন্ধ তিনি লিখুন। রণেন সেন ত্রিশের দশকের সম্বন্ধে আমার চেয়ে অনেক বেশি জানার দাবি নিশ্চয়ই রাখেন। কারণ সম্ভবত সারা ত্রিশের দশকে তিনি মুক্ত ছিলেন। জেল, ক্যাম্প কিংবা অন্তরীণে তাঁকে কাটাতে হয় নি। সুতরাং ঘটনাবলীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসার সুযোগ তাঁর ছিল।

'কারখানা গ্রুপ'-এর সঙ্গে উক্ত কালে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের কেউ কেউ এখনও বেঁচে আছেন এবং আমার সঙ্গে কারু কারু সাক্ষাতও হয়েছে ও

হচ্ছে। তাঁরা সকলেই আমাদের পার্টির দরদীও বটে। তাঁদের কাছ থেকে আমি আরো কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং করছি। ভবিষ্যতে সেগুলিও কাজে লাগতে পারে।

আমি এই আলোচনা প্রসঙ্গ এখানেই সমাপ্ত করতে চাই। কমরেড রণেন সেন আমার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানিয়ে আমার একান্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধা ভাজন হয়েছেন এবং আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

ধরণী গোস্বামী

কমলকুমার মজুমদার প্রসঙ্গে

সম্পাদক, 'পরিচয়' সমীপেষু,

গত সমালোচনা সংখ্যায় কমলকুমার মজুমদারের গদ্যরীতি সম্পর্কে দেবেশ রায় একটি প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন: "ব্যক্তিমানুষের আশাআকাংক্ষা হতাশা ও সামাজিক মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়াসের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত থেকে বাঙলা গদ্যসাহিত্য সমাজপরিবেশহীন ব্যক্তিত্বহীন চরিত্রের নেহাৎ ক্ষুদ্রতর পরিবেশে সংকীর্ণ হয়েছে। এই ক্ষুদ্রতর পরিবেশ থেকে কমলকুমার মজুমদার নিজস্ব প্রকরণের সাহায্যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। এই বিচ্ছিন্নতা তাঁকে বিশিষ্ট করেছে। এই বিশিষ্টতা তাঁকে জীবনের নানা মূল প্রশ্নের সঙ্গে অন্বিত করেছে। ফলে এই অন্বয় তাঁকে সাম্প্রতিক বাঙলা গদ্যসাহিত্যের সংকীর্ণতা থেকে জীবনের বৃহত্তর পরিধিতে মুক্তি দিয়েছে।"

প্রথম তিনটি বাক্য নিয়ে আপত্তির বোধহয় কোনো কারণ নেই। ঘটনার বিবরণ দিতে খপরকাগুজে ভাষাই যথেষ্ট। কিন্তু গল্পে-উপন্যাসে তো শুধু বিবরণ থাকবে না, কিছু বোধব্যাখ্যাবিশ্লেষণও যুক্ত থাকবে। কমলকুমার মজুমদার নিশ্চয়ই নিজেকে বিমল মিত্র-সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়দের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন, ফলে বিশিষ্টও হয়েছেন। কিন্তু তর্ক ওঠে: শুধুমাত্র এরই ফলে তিনি জীবনের নানা মূল প্রশ্নের সঙ্গে আদৌ অন্বিত হয়েছেন কিনা, এবং জীবনের বৃহত্তর পরিধিতে মুক্তি পেয়েছেন কিনা।

গোড়ায় একটা ব্যক্তিগত কথা বলি। পঞ্চাশের শেষ ও ষাটের দশকের গোড়ায় যখন বাঙলা ছোটগল্পে নতুন জেনারেশনের আন্দোলন চলছে, তখন 'এক্ষণ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (১৯৬০) বেরিয়েছিল 'গোলাপসুন্দরী'। আমাদের মতো সদ্য গোঁফগজানো বা না-গজানো ছেলেরা তার আগে

কমলকুমার মজুমদারকে চিনতুম না। তারপর একে একে পড়েছি 'অন্তর্জলী যাত্রা' 'নিম অন্নপূর্ণা' (গল্প সংকলন) ও দু-তিনটি পত্রিকার পাতায় আরও অন্যান্য গল্প, ছোট-উপন্যাস, বক্তৃতা ও প্রবন্ধ। 'গল্পসংগ্রহ'-এই প্রথম তাঁর আগের গল্পগুলি পড়লুম। কিন্তু সব মিলিয়ে দেবেশ রায়-কথিত প্রক্রিয়ার শেষ অংশের কোনো বাস্তব সমর্থন পেলুম না।

'জল' গল্পের (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ) যে-গদ্যরীতির কথা চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশেষ করে উল্লেখ করেছিলেন, কমলকুমার মজুমদার পরে তা আমূল পাল্টেছেন, প্রায় বিশ্বকর্মার মতো নতুন করে বিশ্বজগৎ তৈরির কাজে লেগেছেন, বাঙলা ভাষায় গদ্যের বহুবিচিত্র ইতিহাসকে অস্বীকার করে ফিরে গেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়, শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ও শিক্ষকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাঙলা গদ্যের গোড়াপত্তন শুরু করেছেন। বাঙলার নিজস্ব বাগ্‌বিধি, তার ভঙ্গি ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের ঐশ্বর্য ('বাংলা ভাষা পরিচয়'-এ রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ দিয়ে দিয়ে যার বিশ্লেষণ করেছেন)—সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে তিনি নিজের মতো এক গদ্যরীতি তৈরি করেছেন, যার শব্দবিন্যাস ও বাক্যবন্ধ অ-বাঙলা, যেখানে বর্তমান কাল প্রসঙ্গে হরবখৎ "হওয়া" ধাতুটি বসে, যে-গদ্য ফরাসি বা নিদেন পক্ষে ইংরিজি অনুবাদ করে নিলেই জলের মতো সোজা হয়ে যায়। অনেক সময় হুতোমের সেই বারোইয়ারিতলার সঙের কথা মনে পড়ে, "সংগুলি বর্ধমানের রাজার বাংলা মহাভারতের মতো, বুঝিয়ে না দিলে মর্মগ্রহণ করা ভার!" ১৩৭০ সালে প্রকাশিত 'নিম অন্নপূর্ণা' বইটিতে যে ক টি গল্প ছিল, তার সবই মোটামুটি একই ধরনে লেখা: তৎসম শব্দের ভার কম, সংলাপ ও বর্ণনা দুয়েরই ক্রিয়াপদ বিশ শতকের বাঙলার স্ট্যাণ্ডার্ড কথ্যভাষার (সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার কথা আলাদা)। তার মধ্যেও কিছু কিছু ইডিওসিনক্রাসির নমুনা ছিল ("ভদ্-অন্তে", "কানাই হয় তার নাম," "হাতটা কিয়ৎক্ষণ আপনকার থেকে বলশালী"), কিন্তু 'অন্তর্জলী যাত্রা' বা 'রুক্মিণীকুমার'-এর মতো সব কিছুতে আলাদা হবার প্রবণতা ছিল না। ষাটের দশক থেকে কমলকুমার মজুমদার হয়ে উঠেছেন (প্রাচীনত্বের জাল দাবিটুকু বাদ দিয়ে) ম্যাকফারসন-চ্যাটার্টন অথবা ভানুসিংহের গদ্য সংস্করণ। দেবেশ রায় কি এই দুই রীতিকেই একই লেভেলে রেখে বিচার করতে চান? 'গল্পসংগ্রহ'-য় কিন্তু দুটি আলাদা ভাষারীতি আছে।

কেন এই বিচিত্র গদ্য ? জীবনের নানা মূল প্রশ্নের সঙ্গে অন্বিত হবার জন্যে ? কই, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেলা তো এর দরকার হয় নি। যে কোনো ভালো লেখকই তাঁর রীতিতে অন্যদের থেকে বিশিষ্ট। কিন্তু কমলকুমার মজুমদারের মতো এই মাত্রায় আলাদা না হলে কি সে-অন্বয় আসে না ?

"আদিবাসী বা অন্ত্যজ জীবনে স্বক্ষেত্র আবিষ্কার" ? অনেক স্খলন-পতন সত্ত্বেও এ-ব্যাপারে বাঙলাদেশের একমাত্র কনসিসটেন্ট সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে তো এমনভাবে আলাদা হতে হয় নি। অথচ 'হাঁসুলী-বাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' থেকে শুরু করে 'অরণ্যবহ্নি' (১৯৬৬) পর্যন্ত অন্ত্যজ সমাজের যে ছবি তাঁর গল্পে-উপন্যাসে আছে, কমলকুমার মজুমদার এখনও তার একশ মাইলের মধ্যেও আসতে পাবেন নি।

অনুভূতিপ্রধান কবিতার ভাষায় যে নতুন বিষয়গুলি কখনো-কখনো মূর্তি পেত, কমলকুমার মজুমদারই কি সেগুলি গদ্যে আনলেন ? ঠিক বুঝতে পারছি না নতুন বিষয়গুলি কী কী। কিন্তু বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক'-এ তো অনেক কবিতার বিষয়ই মূর্তি পেয়েছে।

"লেখকব্যক্তিত্বের এমন সমগ্র রচনাময় সর্বব্যাপী উপস্থিতি বাঙলা কথা-সাহিত্যে তো নেই-ই, কোনো বিদেশী তুলনাও মনে আসে না।" খুবই স্বাভাবিক, কারণ কমলকুমার মজুমদার বোধহয় এইটুকুই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন ও পেরেছেন। একটু দূরের হলেও, তুলনা হিসেবে লরেন্স স্টর্ন-এর কথা ভাবা যায়, বিশেষ করে ডাইগ্রেশনের বাহুল্যের দিক দিয়ে। তবে ম্যাকফারসন-ই তুলনা হিসেবে ভালো। কোনো আধুনিক লোক 'ওসিয়ান' লিখতে পারে কি না এর উত্তরে ডক্টর জনসন বলেছিলেন "হ্যাঁ স্যার, অনেক পুরুষ, অনেক মহিলা এবং অনেক শিশু।" সেই তথাকথিত ক্যালিডনিয়ান হোমর-এর মতো কমলকুমার মজুমদারও এক আপাত-ইংরেজপূর্ব বাঙলা গদ্যে নানা যুগের আখ্যান লিখতে শুরু করলেন। বিষয়বস্তুতে তিনি সর্বদা খুব প্রাচীন নন, কিন্তু লেখার ঢঙে প্রায় বাবা আদমের কালের লোক। বছর দশ-বারো আগে শ্রীশান্তি বসু যেমন ভগবান শ্রীশ্রীরামপ্রসাদ ও ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উদ্ধৃতি দিয়ে ভয়ংকর রকমের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হয়েছিলেন, "জয় রাধামাধব, জয় রামকৃষ্ণ" বলে প্রবন্ধ শুরু করে কমলকুমার মজুমদারও সেই রকম বিশিষ্ট হয়েছেন। এখনও এ-দেশে গঙ্গা আছেন, সাক্ষাৎ নারায়ণ নররূপে এ-দেশে

লীলা করে গেছেন—বাঙলা গ্রন্থচিত্রণ নিয়ে একটি প্রবন্ধের মধ্যে এ-সব পড়লে আমরা হেসে ফেলি, সে না হয় আমাদের নাস্তিকতার কুফল, কিন্তু ধর্মবিশ্বাসী লোকজনও যে অবাক হয়ে যান। প্রবন্ধে এত ভক্তিভাব তাঁরাও আর আশা করেন না। আর এই ভাবের বাহন যে-ভাষা, রামমোহন বা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও তাতে অস্বস্তিবোধ করতেন। কমলকুমার মজুমদার যদি তাঁর গদ্যরীতিকে শুধু গল্প বা ছোট উপন্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতেন তাহলে অন্য কথা ভাবা যেত। কিন্তু তিনি তো এই গদ্যেই প্রস্তুত নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। সেখানেও কি কমিউনিকেশনের সমস্যাই একমাত্র কারণ? হালে একটি পত্রিকায় 'বাংলা জানা বিদেশী' হিসেবে কমলকুমার মজুমদারের নাম করা হয়েছে। কথাটা ঠিক নয়। কমলকুমার মজুমদার ঘোরতর রকমের বাঙালি (বৈষ্ণব), শুধু প্রচলিত বাঙলাটা ভুলে গেছেন, তাই নিজের মতো একটি সংকীর্ণ ভাষা ও ভঙ্গি তৈরি করে নিতে হয়েছে।

আমার তো মনে হয়, কমলকুমার মজুমদার খুব সচেতন ভাবেই কালব্যত্যয় করে চলেছেন। এ এক বিচিত্র খেলা—অতিবৃদ্ধের ভাষাভঙ্গিতে গল্প লিখে নিজেকে পাঠকের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভাজন করে তোলার অত্যন্ত চতুর প্রয়াস—শেষ পর্যন্ত লাভের ঘর শূন্য। নিজেদের কাহিনীকে সমসাময়িক বাস্তবতার কাছাকাছি আনার জন্যেই আগের লেখকরা অনেকদিন সাধুভাষায় লেখার পর আস্তে আস্তে চলতি ভাষা ধরেছিলেন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—সকলেই। খপরকাগজে ভাষার সঙ্গে তা কখনোই এক হয়ে যায় নি। আধুনিক কালের গল্প লেখা হবে আজকের ভাষায়—তত্ত্ব হিসেবে এতে ভুলটা কোথায়? সাহিত্যে বাস্তবতার চাহিদাই তো এ-ই। এর প্রতিক্রিয়াতেই যদি কমলকুমার মজুমদার প্রায় দু-শ বছর পিছু হঠে থাকেন তো সেটা নেহাতই তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া: এর সঙ্গে "জীবনের নানা মূল প্রশ্নের সঙ্গে অন্বিত হওয়া" বা "জীবনের বৃহত্তর পরিধিতে মুক্তি পাওয়া"-র কোনো বিশেষ আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। কমলকুমার মজুমদার এমন কোনো বিষয় নিয়ে লেখেন নি যা তাঁর আগে কেউ লেখেন নি, তাঁর বিষয়ের পরিধি এমন কিছু ব্যাপক নয় যে তাকে সার্থকতার অনস্বীকার্য চিহ্ন বলতে হবে।

তাছাড়া তাঁর গদ্যকে "উপমাহীন অলঙ্কারহীন" বলাটা বড়োই আপত্তিকর

অত্যুক্তি। "এই হৃদয়বিদারক শব্দে পরিচ্ছন্ন লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত বাড়ীখানি বিড়ালের চোখের মত বড় হয়ে গিয়েছিল এবং তন্নিমিত্ত এ গৃহস্থিত চিনি পাতা জীবন মুহূর্ত কালের জন্য পাশার অক্ষের মত নিষ্পেষিত শব্দ করে ওঠে"—একটি বাক্যে এত (এবং এমন ধরনের) উপমাঅলংকার কমলকুমার মজুমদার ছাড়া কে-ই-বা দেন? অতীতে এক হেনরি ফিলডিং দিতেন।

গদ্যরীতি, ভাষাশিল্প, প্রকরণ—এ-সবের প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন লেখক সত্যিই জীবনকে দেখতে চাইছেন, ..the principle question Aboot a work o'art is frae hoo deep A life it springs—and syne hoo faur up frae't it has the poo'er to leap, একটি শিল্পকর্মের ব্যাপারে মূল প্রশ্ন হল জীবনের কত গভীর থেকে এটি উঠেছে ও তারপরে এর থেকে কত ওপরে লাফ দিয়ে ওঠার ক্ষমতা তার আছে। রুক্মিণীকুমারের আখ্যানে স্বদেশী চলচিত্রের মধ্যে যখন বেশ্যাপল্লীতে হোলি এবং সুন্দর দালাল (ঐ অঞ্চলে ঘোরাঘুরিতে অভিজ্ঞ পাঠকের সুবিধের জন্যে পাদটীকায় বলে দেওয়া হয়েছে: "প্রকাশ থাক ..জিদ বাড়ির...অবি...কবিরাজ নিবাসী সুন্দর দালালের—যে প্রত্যহ সকালে গরুকে ॥০ জিলাপী খাওয়াইত নিজ পাপ খণ্ডন নিমিত্ত—সহিত কোন সম্পর্ক নাই।") এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন কমলকুমার মজুমদারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ না-জেগে পারে না। চ্যাটার্টন বা ভানুসিংহ সিরিয়াস ভঙ্গিতে প্র্যাকটিক্যাল জোক করেছিলেন, কমলকুমার মজুমদারও বোধহয় সেই করেই আনন্দ পাচ্ছেন। আরও আনন্দের কারণ এই, ছদ্মবেশটাও লাগছে না। বর্তমান বাঙলা কথাসাহিত্যের মরা গঙ্গায় কমলকুমার মজুমদারের সাহিত্যকর্ম একটি চরমাত্র, গত সাঁইত্রিশ বছরে মাঝে মাঝে জেগেছে, আবার ডুবে গেছে। পাঠক হিসেবে দেবেশ রায়ের আত্ম-সমালোচনার সঙ্গে প্রায় একমত হয়েই বলতে পারি: কমলকুমার মজুমদারের অ-বাঙলা ভাষাশিক্ষায় আগ্রহ দেখানো যেত যদি তিনি সত্যিই জীবনের সঙ্গে অন্বিত হতেন। হয়তো 'মতিলাল পাদরী'র মতো আরও গল্প লিখলে আমাদের অশিক্ষা ও অক্ষমতা কাটানোর পক্ষে যুক্তি পাওয়া যেত, দেওয়াও যেত। কিন্তু মানুষের মুখের কথার সঙ্গে সম্পর্কহীন (শব্দমূল বা এটি-মলজির দিক দিয়ে যা উদ্ভট) নিজের তৈরি এক ভাষায় তিনি শুদ্ধ-বিমূর্ত সৌন্দর্যসন্ধান করবেন, আর সে-জিনিস পড়ার জন্যে (ফরাসি-জর্মন না-শিখে) আমাদের ঐ ভাষা শিখতে হবে—দাবি হিসেবে এটাও একটু বাড়াবাড়ি হয়ে

যায় না ? কমলকুমার মজুমদার নিশ্চয়ই লাল নাইটের মতো দাবি করতে পারেন, "It's my own Invention" (Through the Looking-Glass). বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্ট ইয়ার্কি ও মজার খুঁটিনাটি খবরের জন্ত তাঁকে অভিনন্দন জানাতেও দ্বিধা নেই। তাঁর এখনকার লেখাগুলোকে 'বড়োদের হ য ব র ল' ভাবলে আর কোনো গণ্ডগোলই থাকে না। কিন্তু দেবেশ রায় তো সে-কথা বলছেন না, সিরিয়স কথাসাহিত্য হিসেবেই তিনি কমলকুমার মজুমদারের মূল্যায়ন করতে চাইছেন।

শেষে আর একটি কথা। দেবেশ রায় বলেছেন, বাঙ[illegible]শের লোকায়ত নানা ধারণা আর ব্যাখ্যানে নাকি হাজার বছরের পুরোনো অস্তিবাদের পরিচয় আছে (ভুল বুঝে থাকলে আগেই মাপ চেয়ে রাখছি)। দর্শনের ইতিহাসে আমার আদৌ ব্যুৎপত্তি নেই, তবু মনে হয়, দেবেশ রায় যাকে অস্তিবাদ বলছেন আমরা বোধহয় এতদিন তাকে নিয়তিবাদ বা ফ্যাটালিসম বলেই জানতুম। চিরায়ত সাহিত্যে, যেমন 'ইলিআড' 'ঈনিড' বা 'বেওউলফ'-এও এক-এক ধরনের নিয়তিবাদ আছে, কিন্তু তার সঙ্গে বাঙলার নিয়তিবাদ কি এক ? যোগ্য লোকরা যদি এ-বিষয়ে কিছু বলেন তো উপকৃত হই।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য